# মানসী

সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

দ্বিতীয় ভাগ

১৩১৬। ১৩১৭।

কলিকাতা

মূল্য দুই টাকা ছয় আনা।

# চিত্র সূচী।


| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | ৺সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | ... | ১ |
| ২। | জ্যোতির্ম্মণ্ডল | ... | ৪৬ |
| ৩। | শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র | ... | ৬১ |
| ৪। | কমলে কামিনী | ... | ৮৯ |
| ৫। | ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম | ... | ৮৯ |
| ৬। | ভূতপূর্ব্ব সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড | ... | ১১৭ |
| ৭। | গৈবীনাথ | ... | ১২৪ |
| ৮। | গৈবীনাথে প্রাপ্ত খোদিত লিপি | ... | ১২৪ |
| ৯। | ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ | ... | ১৬৮ |
| ১০। | ভারত সম্রাজ্ঞী—রাণী মেরী | ... | ১৬৮ |
| ১১। | গৈবীনাথে নারায়ণের অনন্ত শয্যা | ... | ১৯৪ |
| ১২। | গৈবীনাথে সূর্য্যমূর্ত্তি | ... | ১৯০ |
| ১৩। | সমুদ্র ফেণা | ... | ২২৫ |
| ১৪। | যৌবনে রমেশচন্দ্র | ... | ২৭৮ |
| ১৫। | ফুলের ফসল | ... | ২৮৫ |
| ১৬। | স্বর্গীয় রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর | ... | ৩০৫ |
| ১৭। | স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু | ... | ৩০৫ |
| ১৮। | স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন | ... | ৩০৫ |
| ১৯। | পর্ব্বতে মেঘ | ... | ৩৪৬ |
| ২০। | কালকা পথে | ... | ৩৯৫ |
| ২১। | কবি রজনীকান্ত | ... | ৩৯৬ |
| ২২। | শারদীয় উপহার | ... | ৪০৯ |
| ২৩। | শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস | ... | ৪৪৮ |
| ২৪। | জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্য | ... | ৪৫৭ |
| ২৫। | শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী | ... | ৪৬৬ |
| ২৫। | শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | ... | ৪৯৪ |

২৭। শরৎশোভা ... ৪৯৭
২৮। ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় ... ৫০৪
২৯। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত ... ৫২৪
৩০। চরকায় সুতা কাটা ... ৫৪৫
৩১। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ... ৫৭৬
৩২। মিষ্টান্ন বিক্রয় ... ৬১১
৩৩। এলাহাবাদ প্রদর্শনীর সাধারণ দৃশ্য নং ১ ... ৬৪৩
৩৪। ঐ নং ২ ... ৬৪৩
৩৫। অন্ধাবস্থায় হেমচন্দ্র ... ৬৮১

---

# সূচী।

১। শ্রীঅনন্ত নারায়ণ সেন
মৃত্যুর দান ( কবিতা ) ৬৫৩
২। শ্রীঅনুরূপা দেবী
দশপুত্তলিকা ব্রত ৫৩৮
৩। শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মিত্র
প্রার্থনা ( কবিতা ) ২০৬
৪। শ্রীঅমলা দাস গুপ্তা
নিয়তি ( কবিতা ) ৫৭৮
অসমাপ্ত কাব্য ( গল্প ) ৬৬০
৫। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ
বৈচিত্র্য ৫৭
৬। শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়
৺প্রমদাচরণ সেন ৩০৫
বর্ষা-উপহার ( কবিতা ) ৫১৬
৭। শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক এম, এ, এম, ডি, বি, এল,
আমাদের জাতীয় দুর্ব্বলতার কতকগুলি কারণ ৩৫৬
প্রভাত চিন্তা ৫৫



৮। শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ বাগচী এম, এ, বি, এল,
মানবের অভাব ও তাহা নিবারণের চেষ্টা ১৬৭, ৩৬২
৯। শ্রীঊর্ম্মিলা দেবী
হিন্দুজাতির আদর্শ ২৩
১০। শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়
বাসনা ( কবিতা ) ৬১
বনপথে ( ঐ ) ১৭৫
আজ ( ঐ ) ২৬৯
নূতন খেয়া ( ঐ ) ৩৫২
মনোহারিকা ( ঐ ) ৬৮৩
১১। শ্রীকালিদাস রায়
অমিল ( কবিতা ) ৬০৭
১২। শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম, এ
প্রেমে প্রতিদ্বন্দ্বী ( গল্প ) ৩৪৬
পূজার ছুটি ৫৩৫
১৩। শ্রীগণপতি রায় এম, এ
জাপানে স্ত্রীজাতির ইতিহাস ৭৩২
১৪। শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী
জীবন পথিক ( কবিতা ) ১৪
১৫। শ্রীগৌরহরি সেন
স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত ৪৯১, ৫২২, ৫৯৪, ৬৫৪, ৭২৩
১৬। শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
বঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র ১৪১
সাহিত্য পণ্য ৫৪৪
১৭। শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র এম, এ, বি, এল
ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম ৮১
জহ্নু-আশ্রম—গৈবীনাথ ১১৮, ১৯০
১৮। শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস এম, এ, ( বার-এট-ল )
আপনার মাঝে ( কবিতা ) ৩৬০
বিয়োগে ৪৪৯

১৯। শ্রীজগদানন্দ রায়
মূক বধিরতা ১৩৫
তামাকের ধোঁয়া ৫১২
২০। শ্রীজলধর সেন
বিশুদাদা ( উপন্যাস ) ৪৭, ১০২, ১২৭, ২০০, ২৭২, ৩৩৫, ৩৯৭, ৪৩০, ৬০৩, ৬১১, ৭১৩,
২১। ৺শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
মহানাটক ১৩২, ৪৬১,
২২। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী এল, এম, এস
লজ্জার উৎপত্তি ও অভিব্যক্তি ৫১৭, ৬৩৯, ৬৮৪
২৩। শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ
চিত্র ও চিত্রকর ৩২৩
২৪। শ্রীতারাপ্রসন্ন মিত্র
বঙ্গরমণী ৪৯২, ৫২৭, ৬৫৪
২৫। শ্রীতুষিতকুমার তলাপাত্র
বাঙ্গলা নাটক সমালোচনা ১৪৬, ১৭৬, ২৭৯, ৩১১, ৪০১, ৫৪৩, ৬৭২
২৬। শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
মানসী ( কবিতা ) ৭৪০
২৭। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন এম, এ, বি, এল
মাধবীলতা ( কবিতা ) ৫০৬
২৮। শ্রীদেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
জেনারেল মার্টিন ৩৭৩
২৯। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী এম, এ
বিরহ কাব্য ২২৫
প্রেমের রাজ্য ( কবিতা ) ৫৬২
৩০। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত
অকৃতজ্ঞের প্রতি ( কবিতা ) ১১০
৩১। শ্রীনরেন্দ্রনাথ চৌধুরী
লেখকের স্ত্রী ( গল্প ) ২০৭



৩২। শ্রীনফরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
বুড়ী ( গল্প ) ২৬২
পুনরাগমন ( ঐ ) ৫৬৬
৩৩। ৺নবীনচন্দ্র সেন
নৈদাঘ-নিশীথ-স্বপ্ন ৪০৯, ৫১০, ৬২৫
৩৪। শ্রীনিখিলনাথ রায় বি, এল
মুসলমান রাজা ও হিন্দু প্রজা ৫৭৯
৩৫। শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ
যুগল বিধবা ( কবিতা ) ৬৫৯
৩৬। শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ঘোষ এম, এ
রবীন্দ্রনাথের প্রতি ( কবিতা ) ১১৭
ভূল ( ঐ ) ৬৯৭
৩৭। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় এম, এ, ডি, এস. সি,
বঙ্গীয় যুবকসম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ জীবিকা অর্জ্জন ৪৯৭
৩৮। শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কালকা পথে ৩১৬, ৩৮৯, ৫৭৫, ৬৯৮
মাঝি ( গল্প ) ৪৮৫
৩৯। শ্রীমোহিতলাল মজুমদার বি, এ,
ধূমকেতু ( কবিতা ) ১২৪
বিজয়িনী ৫৫৫
৪০। শ্রীযদুনাথ বক্রবর্ত্তী বি, এ,
কালীপ্রসন্ন প্রসঙ্গ ৬৩৬
৪১। শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী বি, এ,
মাছধরা ( কবিতা ) ৪৪৫
বিড়ম্বনা ( চিত্র ) ৩৭৮
রুগ্ন কবি রজনীকান্ত সেনের প্রতি ( কবিতা ) ৩০৪
আগন্তুক ( কবিতা ) ১
ডাক্তার ( গল্প ) ৩৮
'দেবালয়ে' উপদ্রব ২১৬
সমুদ্র-ফেনার প্রতি ( কবিতা ) ২৫৬

৪২। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম, এ,
সেকালের কালী কলম ৪৩৪
৪৩। শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি, এ, এফ, আর, এস
অর্থনীতি ১৫, ৯৩, ২৫৮, ২৯৫, ৫৬৩, ৬৮৯
৪৪। শ্রীরজনীকান্ত বসু এম, এ
অলঙ্কার নির্ম্মানে অপব্যয় ও অপচয় ৭০৪
৪৫। শ্রীরজনীকান্ত সেন বি, এল
দুরাশা ( গান ) ২২১
পতিত ব্রাহ্মণ ( কবিতা ) ৩৭১
অনন্ত মূর্ত্তি ( ঐ ) ৪২৩
কেরাণী-জীবন ( ঐ ) ৫৩০
৪৬। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গান ( কবিতা ) ২২
স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত সম্বন্ধে কয়েকটী কথা ২৭৮
নাম গান ( কবিতা ) ৩৪৫
শেষ ৪৯৪
৪৭। শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ, পি, আর, এস
যন্ত্রবদ্ধ শিক্ষাপ্রণালী ৪৬৬
৪৮। শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ,
পান ৪৫৩
৪৯। শ্রীবগলারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
খোকা ( কবিতা ) ৭৩১
৫০। শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত এম, এ,
দুটি কথা ৩২৯
সুরসভা ৪৪১
৫১। শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী বি, এ
নববর্ষে ২
৫২। শ্রীশিবরতন মিত্র
কবি জগদানন্দ ৪১৭



৫৩। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
জ্যোতির্ম্মণ্ডল ( কবিতা ) ৪৯
মুগ্ধ ( ঐ ) ৯২
চড়কের ঢানাচুর ( ঐ ) ১০৬
ফুলের ফসল ( ঐ ) ২৮৫
মাদাগাস্কারী কবিতা ( ঐ ) ৫৪২
অন্তঃপুরিকা ( ঐ ) ৫৯৩
বিশ্বাস ( ঐ ) ৬০৮
৫৪। শ্রীসন্তোষকুমার বসু এম, এ,
নব আলেখ্য ( কবিতা ) ৩৮৬
৫৫। সম্পাদকীয়
মাসিক সাহিত্য সমালোচনা ৫৯, ১১৩, ১৬৪, ২২২, ২৮৩, ৩৪২, ৬১০, ৬৭৯, ৭৬১
গ্রন্থ সমালোচনা ১১২, ৪০৬, ৬৮১, ৭৬২
চিত্র পরিচয় ৬৭৯
৫৬। শ্রীসারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল
বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন ৬, ৬৫, ১৫৭
৫৭। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
পূজার অভিভাষণ ৪৩৩
৫৮। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন এম, এ,
সিন্দুর ( কবিতা ) ৮০
৫৯। শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,
আপনার ও পর ৩২
মধুয়া ( চিত্র ) ২৮৬
হরিদাস ( ঐ ) ৫৮৩
৬০। শ্রীসুশীলাসুন্দরী দাসী
স্বামী ৭১০
৬১। শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি, এ,
কৃতজ্ঞতা ( গল্প ) ৬৯
কথামালার গল্প ( কবিতা ) ১০৮
জীবন ও মৃত্যু ( ঐ ) ৩০৯

৬২। শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস ৯৭
জ্যোৎস্না-নিশীথে ( কবিতা ) ৫২১
৬৩। শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত
ভূবিদ্যা ৭৪
৬৪। শ্রীহেমলতা দেবী
চিরনির্ভর ( কবিতা ) ১৯৯
৬৫। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল, সি, আর, এস
দেবতা-কাণ্ড ৫৩০
৬৬। শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি, এ,
হেমচন্দ্র সদনে ৭৫৭

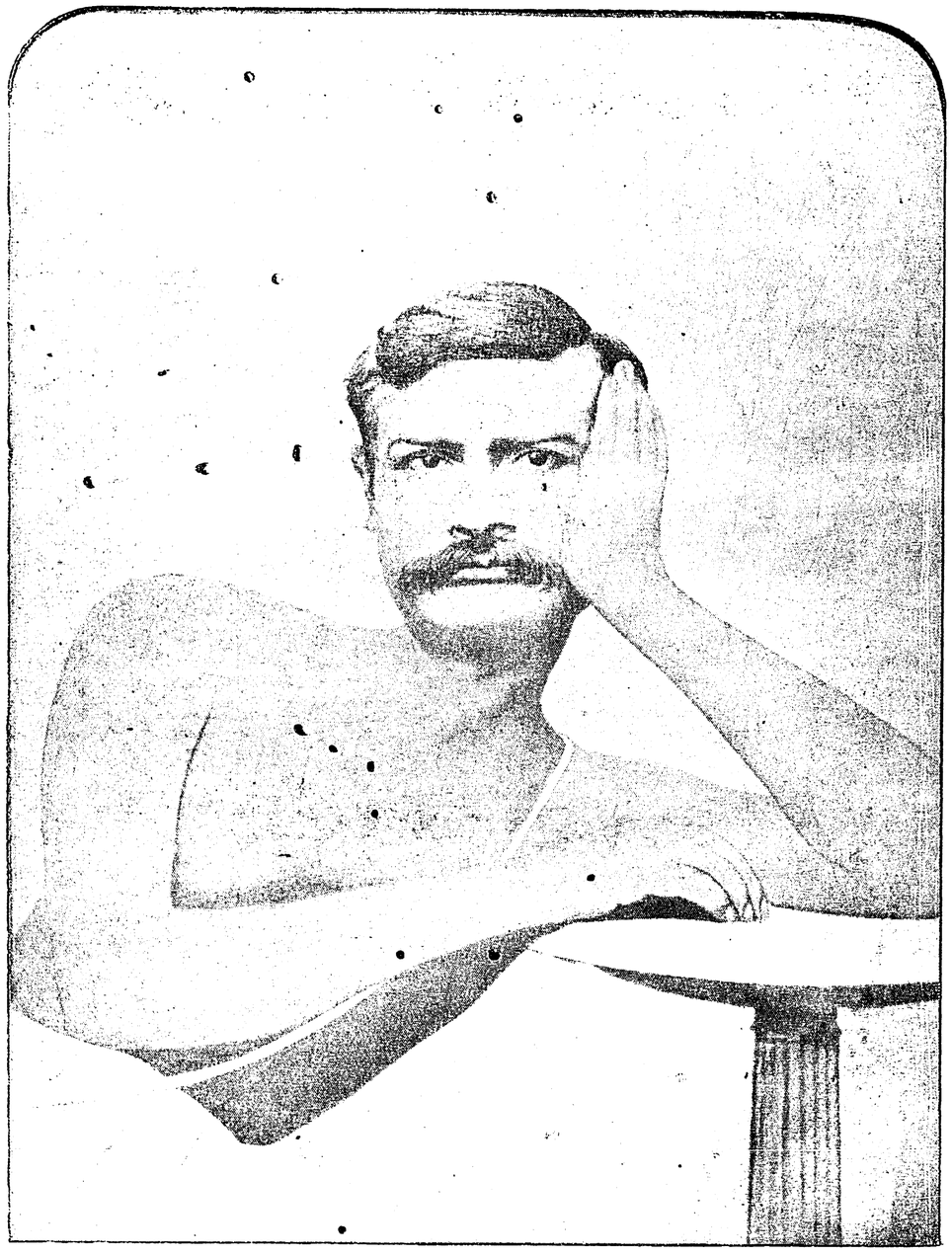

*Printed by K. V. Seyne & Bros.*

# মানসী

দ্বিতীয় ভাগ। ফাল্গুন ১৩১৬ সাল ১ম সংখ্যা

## আগন্তুক।

—০:*:০—

এরি মাঝে বসন্ত আসিল!
শ্যামাকণ্ঠে ওকি সাড়া মাতায়ে তুলিল পাড়া,
কৃষ্ণচূড়া কখন ফুটিল!
ভাঙ্গা-ছেঁড়া এলোমেলো শীতের সঞ্চিত ধূলো
পলকেতে কে হরিয়া নিল?
নাহি কোনো সজ্জাসাজ অসমাপ্ত সর্ব্বকাজ,
এ ত আজ বড় লাজ দিল—
এরি মাঝে বসন্ত আসিল!

একেবারে হাজির দুয়ারে!
লতায় পাতায় ঘাসে স্থলে জলে নীলাকাশে
ভরি' দিয়া লাবণ্যজুয়ারে,
নাহি কোনো বলা কওয়া নাহিক সংবাদ লওয়া
ওকি হাওয়া—চিনি যে উহারে!
শঙ্কিত, সঙ্কীর্ণ, ম্লান এ মোর কলঙ্কী প্রাণ—
কোথা স্থান, বসাব তুহারে?
একেবারে হাজির দুয়ারে!

এলে যদি, যেয়োনাক ফিরে।
পার হয়ে গিরি নদী এত পথ এলে যদি—
কেন তবে দাঁড়ায়ে বাহিরে?
প্রাচীরের দীর্ণ গায়ে তোমার নিশ্বাস-বায়ে
ফুটাইলে শীর্ণ লতাটিরে;—
আমার এ জীর্ণ প্রাণে তব পদস্পর্শদানে
হৃদি-পুষ্প ফুটাও অচিরে—
এলে যদি, যেয়োনাক ফিরে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

## নববর্ষে।

—:০:—

ভগবানের কৃপায় গত বৎসরের এই এমনি দিনে,—ভগবতী বাসন্তীর এই বিশ্বায়তন কেলিগৃহের এই নবীনসজ্জার সময়ে,—বসন্তের এই মধুর জাগরণের এক নবীন প্রভাতে বাঙ্‌লার বহুসাধকসেবিত, বিচিত্রতাময় সাহিত্যকাননে "মানসী" ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। বর্ত্তমান-সাহিত্যযুগ-বিধাতা রবীন্দ্রনাথ সূতিকা-গারেই ইহার 'ললাট-লিখন' লিখিয়া ইহার ভাগ্য-পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন আর তাঁহারই লিখিত ভূমিকা-মন্ত্রে ইহার জাতকর্ম্ম সুসম্পন্ন হইয়াছিল।



বাঙ্‌লার শিশু—বাঙালীর শিশু—রক্তমাংসেরই হউক আর কল্পনার ক্রোড়জাতই হউক—শৈশবে তাহাকে অনেক সহিতে হয়। 'মানসী'র মত ক্ষুদ্র নগণ্য অনেক শিশু খেলা করিয়া বেড়ায়; কিন্তু এত বুঝি কাহাকেও সহিতে হয় না! এই ক্ষুদ্র শিশুটির সুক্ষুদ্র জীবনে অনেক ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে। কুক্ষণে কি শুভক্ষণে—নিশ্চিত জানিনা—অভাগী একটু রূপ, একটু সৌষ্ঠব, একটু আশার আশ্বাস লইয়া জন্মিয়াছিল,—তাই বুঝি শৈশবেই এত লাঞ্ছনা!

যে দেবী 'ভারতী'র সাধনায় 'মানসী' জন্মিয়াছে,—তিন মাস যাইতে না যাইতে,—জানি না,—চঞ্চল শিশু কেমন করিয়া, কিসে তাঁহার কোপ-দৃষ্টিতে পড়িয়া গিয়াছিল! উপযুক্ত পুরোহিতের উপযুক্ত আপদুদ্ধারস্বস্ত্যয়নে আর ভগবানের দয়ায় সে কোপ বোধ হয় যথাসময়েই নষ্ট হইয়াছিল, তাই আবার তিন মাসের ক্ষুদ্র শিশুটি সাহিত্য-কাননের কোনৈকদেশে আপন মনে হাসিয়া নাচিয়া খেলাইয়া বেড়াইবার শক্তি পাইয়াছিল। কিন্তু শিশুরিষ্টি অনেক, ছ-মাসের পর আবার ইহার কোষ্ঠীচক্রে যে রিষ্টি দেখা দিল, বুঝি তাহা কাটিত না, যদি 'গুরুবল' তাহাকে রক্ষা না করিত! ছ-মাসের শিশু কেবলমাত্র উঁ-আঁ করিতে শিখিয়াছে,—ক্ষুদ্র উজ্জ্বল চক্ষুদুটি লইয়া ইতস্ততঃ এদিক ওদিক দেখিতে শিখিয়াছে, আত্মীয় স্বজনের স্বর ব্যতীত অন্য স্বরের পার্থক্য বুঝিতে অভ্যস্ত হইতেছে—এমন সময় মহীয়ান্ সাহিত্যের পৃষ্ঠায় একটা ঘোর হুহুঙ্কার শুনিয়া অল্পপ্রাণ শিশুটি যে ভাবে চম্‌কাইয়া তারস্বরে কাঁদিয়া উঠিল, তাহাতে সমস্ত সাহিত্য-কানন বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়িল। সেই বিক্ষোভে উপদ্রুত হইয়া কয়েকজন সাধক সমাধিচ্যুত হইয়া পড়িলেন, গীর্ব্বাণ-বাণী শান্তভাব ত্যাগ করিল। চতুর্দ্দিকের রোষদীপ্ত উষ্ণ নিঃশ্বাসে শিশু-জীবন প্রায় শুকাইয়া উঠিল। বৈদিক ভারতে যে ইন্দ্র বর্ষণ-কারী, প্লাবনকারী ছিলেন, তিনিই কৃষিরক্ষক ও প্রজাপালকও ছিলেন এবং তিনিই নেতা ও শাসক ছিলেন। এই ক্ষুদ্র শিশুর ক্ষুদ্রজীবন-নাট্যে ছয় মাসেই যে অঙ্কের অভিনয় হইতেছিল,—তাহাতে এক ইন্দ্র মূল, অন্য ইন্দ্র উত্তেজক এবং আর এক ইন্দ্র উপশমক রূপে দেখা দিলেন! যাক্,—যাঁহার ইচ্ছায় প্রতি নিমিষের প্রতি গতি নিয়মিত হইতেছে, তাঁহারই ইচ্ছায় সাহিত্য-কাননে উত্থিত সেই কোলাহল না থামিলেও শিশুর জীবন নিরাপদ হইয়া গিয়াছে! ধীরে ধীরে সে সেই

হুহুঙ্কারের আতঙ্ক সাম্‌লাইয়া আবার কয়েক মাস ধীরে ধীরে কাননের চতুর্দ্দিকে হামা দিতে —হাঁটিতে অভ্যাস করিতেছে আশা হয়, যাঁহার করুণায় সুক্ষুদ্র মানসীর কোষ্টিচক্রে সর্ব্বারিষ্ট-ভঙ্গ-যোগ সংঘটিত হইয়া, তাহাকে জীবনের একটি বৎসরের পারে আজ আনিয়া দিয়াছে, তাঁহাকে নমস্কার—শত নমস্কার!

তার পর, মানসীর ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্রকথা দুরে ফেলিয়া দিয়া তাহার তপস্যার দুটা কথা কহিতে হয়! মানসী কেন জন্মিয়াছে—তাহা তাহার ভূমিকায় আছে। এই এক বৎসরের সাধনায় সে তাহার কতটুকু করিতে পারিয়াছে, তাহা নিজ মুখে বলিয়া আত্মগৌরব প্রকাশ করিবার আবশ্যক নাই, তবে যাহাকে দশজনের মুখ চাইয়া দশজনের জন্য খাটিতে হয়, তাহাকে নিজের কাজের—নিজের দায়িত্বের কৈফিয়ত দিতে হইবে বৈকি।

মানসীর প্রথম কার্য্য—নবীন-প্রবীণে মিলাইয়া মিশাইয়া সাহিত্যানুরাগী-দিগের তৃপ্তিবিধান করা,—যতটা সাধ্যে কুলাইয়াছে, 'মানসী' তাহা করিয়াছে। প্রবীণ লেখক—যাঁহারা মানসীর পৃষ্ঠা নিজের লেখায় অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তাঁহারা কিছুই লাভ করেন নাই, প্রত্যুত মানসীর নিজের আর মানসীর পাঠকের লাভ হইয়াছে। আর নবীন লেখক—যাঁহারা মানসীতে সাহিত্য-সাধনার অভ্যাস করিতেছেন, সাধারণের সমালোচনায়, আদরে এবং আগ্রহে তাঁহারা নিজেরা উপকৃত যে না হইতেছেন এমন নহে, অধিকন্তু 'মানসী'র আদর তাঁহারা দিন দিন বাড়াইয়া তুলিতেছেন।

মানসীর আর একটি ব্রত ছিল,—সাহিত্যিকগণের ছবি-প্রকাশ। সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমের যৌবন মূর্ত্তি উদ্ধার ও প্রচার করিয়া মানসী আপনাকে ধন্য বলিয়া মনে করে! তদ্ব্যতীত আর যাঁহাদের ছবি বাহির হইয়াছে, সকলেই বরেণ্য এবং সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। জনকয়েক নবীন কিন্তু বহু-বিষয়ে প্রতিভাবান লেখকের ছবি মানসীর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হওয়াতেও মানসী লজ্জিত নহে। যদি "সাহিত্যিক সব ছোট বড়, হেথায় আজি হয়ে জড়" মেলা-মেশা কর্ত্তে হয় আর পূর্ণিমা-মিলনের ন্যায় সুষ্ঠু-সম্মিলনের তাহাই সঙ্কল্প হয়, তবে মানসীর এ কার্য্যটাও সাহিত্যিকেরা নিতান্ত বিদ্বেষ বা ক্ষমার চক্ষে না দেখিয়া আদরের চক্ষেই দেখিবেন সন্দেহ নাই।



মানসীর আর একটা কাজেও কেহ কেহ নাসা কুঞ্চিত করেন—সেটা এক প্রবন্ধের বহু স্থানে প্রকাশ। মানসী ইহার জন্যও লজ্জিত নহে। কোন বহুশ্রুতনাম লেখকের লিখিত প্রবন্ধ অঙ্কে ধারণ করিয়া গৌরব সংগ্রহ করা ইহার উদ্দেশ্য নহে। যে বিষয় মানসী নিজের পাঠকবর্গের মধ্যে প্রচার করা যুক্তিযুক্ত এবং কর্ত্তব্য মনে করে—তাহা সে সংগ্রহ করিয়া ছাপিতে কোনই কুণ্ঠা বোধ করে না। যে উদ্দেশ্যে আজকাল ভিন্ন ভাষার প্রবন্ধ হইতে সার অংশ বাহির করিয়া তাহা 'সংকলন ও সংগ্রহ' নামে প্রকাশ করিবার প্রথা প্রসিদ্ধ-প্রসিদ্ধ পত্রিকায় অবলম্বিত হইয়াছে, যে উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভাষায় লিখিত প্রত্নতত্ত্ব, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের অনুবাদ প্রকাশ অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হয় না,—সেই উদ্দেশ্যে 'মানসী' উপযুক্ত বুঝিলে কোন সহ-যোগীর কোন প্রবন্ধ স্বীয় পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিতে বা প্রবন্ধ লেখকের অনুমতি অনুসারে স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত করিতে পশ্চাৎপদ হইবে না।

মানসীর অধিকাংশ লেখক নবীন,—তাঁহাদের অভিজ্ঞতা অল্প, ক্ষমতাও অল্প,—তাই মানসীতে গল্প ও কবিতার আদরই বেশী হইয়াছে;—কোন বিজ্ঞ বন্ধুর কাছে মানসীর পরিচালকবর্গ এজন্য আক্ষেপ করায়, তিনি যাহা বলিয়া তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন, তাহাই এ বিষয়ের মীমাংসারূপে উদ্ধৃত হইল। শ্রদ্ধাভাজন বন্ধুপ্রবর বলিয়াছিলেন,—"মানসী যুবক-লেখক-সম্প্রদায় লইয়া গভীর অভিজ্ঞতার বাগাড়ম্বর বা গুরুতর বিষয় লইয়া কেবলমাত্র কতকটা অপরিপক্ক, অবোধ্য অনুবাদ মাত্র করিয়া যে 'জেঠামী' করেন না, ইহা ভালই বলিতে হইবে"।

এইত গেল মানসী কি করিয়াছেন;—কি করেন নাই, তাহার সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে,—মানসী জাতি-গৌরব-প্রকাশক দেশের অতীত-গৌরবের, প্রাচীন ইতিহাসের কথা, পুরাতন সাহিত্যের, সমাজতত্ত্বের কথা, জাতিতত্ত্বের কথা প্রভৃতি বেশী করিয়া আলোচনা করিতে পারেন নাই;—পারেন নাই, তাহার প্রধান কারণ—তাহার অঙ্গ ক্ষুদ্র, দ্বিতীয়, ঐ সকলের জন্য যতটা আয়োজন, প্রথম বৎসরে তাহা তাহার পক্ষে সংগ্রহ করা অসম্ভব ছিল। তবে, উহারই মধ্যে যতটুকু পারিয়াছে, তাহা সে করিতে ত্রুটী করে নাই। মোট

কথা, রবীন্দ্রনাথের আশীর্ব্বচন ও উপদেশ সফল করিতে যত কিছু করা আবশ্যক তাহার করা হয় নাই অনেক। ক্ষুদ্র জীবনের অভিব্যক্তির সঙ্গে সকল ক্ষমতার অভিব্যক্তি ক্রমশই হইয়া থাকে, এজন্য আমরা সাধারণের কাছে ধৈর্য্য প্রার্থনা ভিন্ন আর কি করিতে পারি?

অতঃপর—ভবিষ্যতের কথা, মানসী ভবিষ্যতে কি করিবে?—ব্রতগ্রহণ কালে যাহা সঙ্কল্প করিয়া নামিয়াছে, অল্পে অল্পে, ধীরে ধীরে তাহাই সাধন করিতে চেষ্টা করিবে,—ইহা অপেক্ষা অধিক আর কিছু বলা ইহার পক্ষে শোভনীয় হইবে না, উচিতও হইবে না।

সর্ব্বশেষে, যে সাহিত্যকাননে মানসী বর্ষপরিমিত কাল হাসিয়া কাঁদিয়া বেড়াইল, তাহার অবস্থা সম্বন্ধে দুটা কথা বলিতে পারিলে ভাল হইত, কিন্তু একবৎসরের শিশুর সে ক্ষেত্রের যথোচিত পরিদর্শন ক্ষমতা কোথায়? শিশু দৃষ্টিতে যে অভিজ্ঞতাটুকু সে লাভ করিয়াছে, তাহার ফল সে একাই ভোগ করুক,—তাহা সাধারণকে নিবেদন করিবার মত যখন হইবে, তখন সে দিতে কাতর হইবে না।

উপসংহারে মানসী, সকলের—গ্রাহক, পাঠক, লেখক, সহযোগী এবং অনুগ্রাহকবর্গের সদ্ভাব, স্নেহ, আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া বিঘ্নবিনাশনের মঙ্গলময় নাম স্মরণ করিয়া নববর্ষে পুনরায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী

# বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের

## তৃতীয় অধিবেশন।

## সভাপতির অভিভাষণ।

—০○০—

বিদ্বজ্জন ও বিদ্যোৎসাহী মহোদয়গণ! অদ্য আমরা বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে সম্মিলিত; অদ্য আমাদের পরম আনন্দের দিন; অদ্য এই মহাসভায় সজ্জনসমূহের সমাগম হইয়াছে। অদ্বিতীয় পরিব্রাজকাচার্য্য শঙ্করাংশ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—



"ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥"

ক্ষণমাত্রের জন্যও কেবল সজ্জন-সহবাস দ্বারা ভবার্ণব উত্তীর্ণ হওয়া যায়। এই বিরাট সভার সভ্য-শ্রেণী-ভুক্ত হইয়াই আমি কৃতার্থ হইয়াছি, পরন্তু পরম-শুভাদৃষ্টবশতঃ আমি সভাপতিত্বেও বৃত হইয়াছি। আমাদের সম্মিলনের উদ্দেশ্য সুমহৎ—পরস্পরের সখ্যভাবসম্বর্দ্ধন ও সাহিত্যের উন্নতিসাধন। রাজনীতি বা রাজ্যশাসনপ্রণালীর সহিত আমাদের কোনও সম্বন্ধ নাই। রাজনৈতিক আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলেও, ঘনঘটার ভীষণ শব্দের অনবরত প্রতিধ্বনি হইলেও, শান্তি-বিরোধী ঘৃণিত কার্য্য দ্বারা মধ্যে মধ্যে ভারতবর্ষ কলুষিত হইলেও, আমাদের শান্তিময় কার্য্যে কোনও ব্যাঘাত নাই। সাহিত্যের উৎকর্ষসাধনার্থ রাজার সাহায্য প্রার্থনীয় বটে, কিন্তু নীতিবিৎ যথার্থই বলিয়াছেন—

"বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে॥"

বিদ্বান্ ও রাজা কখনই সমতুল্য নহেন। রাজা কেবল স্বদেশেই পূজ্য, বিদ্বান্ সর্ব্বত্রই পূজ্য।

দিগ্বিজয়ী সেকেন্দার (Alexander), জেঙ্গিজ, তাইমুরলঙ্গ, নেপোলিয়ন প্রভৃতি বিজেতা স্বাধীনতাহারী যুদ্ধবীরগণ যতই দুর্দ্ধর্ষ বা তেজস্বী থাকুন না কেন, ব্যাস বাল্মীকি, হোমার ও সেক্সপিয়ার সকল সময়েই সর্ব্বদেশপূজিত।

এরূপ বিদ্বজ্জন-সমাগমে পরস্পরের প্রীতিবর্দ্ধনের বিশিষ্ট উপায় ও সকলের সহযোগে ভারতবর্ষের সাহিত্যের অবশ্যম্ভাবী অভ্যুদয়ের উপায় আমরা এই সভায় অনেকটা স্থির করিতে পারিব। আমাদের পরস্পরের বহুদিনের পরিচয় না থাকিলেও,

"সতাং হি সৌহার্দ্দং সাপ্তপদীনমুচ্যতে।"
সাত কথাতেই সাধুগণের সৌহার্দ্দ্য হয়।

মধ্যে মধ্যে এরূপ সাহিত্য-সম্মিলন নিতান্ত আবশ্যক। উত্তর-বঙ্গে দুইবার সাহিত্য-সম্মিলন হইয়াছে, এবং সে দিন গৌরীপুরেও একটী সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। বরদায় মহারাষ্ট্রীয় সাহিত্য-সম্মিলন অনেকেরই স্মরণ থাকিবে। স্বর্গীয়

রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের শেষ কীর্ত্তি মহারাষ্ট্রীয় সাহিত্য-সম্মিলন। অকালে তাঁহার অন্তর্ধানে আমাদের যৎপরোনাস্তি মনোবেদনা হইয়াছে, এবং তাঁহার স্মৃতিরক্ষার উপায় বিধান এই বিরাট সভারই অন্যতম আলোচ্য। তিনি প্রকৃতই কর্ম্মবীর ও সাহিত্যবীর ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মৃত্যুতে সংস্কৃত সাহিত্যের একটী অদ্বিতীয় জ্যোতিষ্ক তিরোহিত হইয়াছে। বিদ্যোৎসাহী কাকিনার রাজা মহিমারঞ্জন রায়ের স্বর্গগমনেও বঙ্গসাহিত্যের অসীম ক্ষতি হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় ভূতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক বিবরণে অদ্যকার সাহিত্য-সম্মিলনের উচ্চস্থানের অধিকারী। গ্রানাইটময় মন্দারগিরিক্ষেত্রে ও কর্ণগড় এই প্রদেশের পুরাতনত্ব ঘোষণা করিতেছে। সুদূর অতীতকালে, যখন মহাসাগরের নীলাভ সলিলরাশি পুরাতন বিন্ধ্যগিরিশ্রেণীর প্রাচ্য বিভাগে রাজমহলপর্ব্বতসমূহের পাদদেশ অভিষিক্ত করিত, তখন অঙ্গদেশ বর্ত্তমান বঙ্গোপসাগরের উত্তরসীমা ছিল। ক্রমশঃ অব্‌তেজপ্রভাবে মহাসমুদ্রের তরঙ্গ-মালার লীলাভূমি দক্ষিণাভিমুখ হওয়ায়, অঙ্গের সীমাবর্দ্ধিত হইয়া বর্ত্তমান বঙ্গদেশের ব-দ্বীপ সহস্র নদ-নদী সহ বরুণরাজ্য হইতে উত্থিত হইয়াছে। ক্রমশঃ অঙ্গদেশ হইতে আর্য্যবসতির দক্ষিণে ও পূর্ব্বে বিস্তার হইয়াছে। প্রথমে অনার্য্য জাতির বাসভূমি থাকিলেও ভারতবর্ষের সমস্ত প্রাচ্য প্রদেশ অত্যল্পকালেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের বাসোপযোগী হইয়াছিল। আর্য্যক্ষত্রিয় রাজগণ সহজেই সুজলা শ্যামলা শস্যপূর্ণা নবোত্থিতা উর্ব্বরা ভূমিতে রাজত্ব বিস্তার করিয়া আর্য্যসভ্যতা সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। আর্য্যভাষা, আর্য্যরীতি, আর্য্যসাহিত্য ক্রমশঃ প্রাচ্য রাজ্যে বিকাশ পাইয়াছিল, এবং অনতিদীর্ঘকাল পরেই অজয় নদীর কূলে সংস্কৃত সাহিত্যের অদ্বিতীয় কুসুমস্তবক 'গীতগোবিন্দ' রচিত হইয়াছিল।

অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ—এই তিনটী প্রদেশ অতীত আর্য্যভারতের প্রাচ্য জনপদ। এই প্রাচ্য জনপদই প্রাচ্য সভ্যতার কেন্দ্র ছিল। এই প্রাচ্য জনপদে ধর্ম্ম, শাসন ও বাণিজ্যের গৌরব একদিন কেবল ভারতবর্ষ বলিয়া নহে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সমস্ত জগতের সভ্য প্রদেশে বিস্তৃত হইয়াছিল। দিগ্বিজয়ী সেকেন্দারের সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ এই "প্রাচ্য" ভূভাগকেই



একটী সাম্রাজ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। অঙ্গ অর্থাৎ বর্ত্তমান্ ভাগলপুর জেলা ও তৎসন্নিহিত সৌন্দর্য্যময় প্রদেশ এই প্রাচীন সাম্রাজ্যের শিরোভাগ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। চম্পানগরী বহুযুগ হইতে অঙ্গরাজ্যের রাজধানী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। বিভিন্ন পুরাণ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ইক্ষ্বাকুবংশাবতংস দানবীর হরিশ্চন্দ্রের প্রপৌত্র চম্প চম্পানগরীর প্রতিষ্ঠা করেন; সুতরাং অতি প্রাচীন কাল হইতেই এখানে আর্য্যপ্রভাব বিকশিত হইয়াছিল। এখন যাহা ভাগলপুর সহর, তাহাই পূর্ব্বকালে চম্পা রাজধানীর সহরতলী ছিল; এখনও ইহার চারি দিকে কর্ণরাজ্যের অতীত কীর্ত্তি ধ্বস্তনিদর্শনমধ্যে ও লোকমুখে জাগরূক রহিয়াছে। যখন সভ্য-জগদ্‌বিখ্যাত প্রাচ্য ভারতের রাজধানী পাটলীপুত্রের পতন হয় নাই, তৎপূর্ব্ব হইতেও চম্পার প্রসিদ্ধি। কি ব্রাহ্মণ্য, কি জৈন, কি বৌদ্ধ, অতি পুরাতনকাল হইতে সকল সম্প্রদায়ের প্রভাব চম্পা রাজধানীতে দেদীপ্যমান ছিল। জৈন সম্প্রদায়ের তীর্থঙ্কর বা অবতার বাসপূজ্য স্বামী এই চম্পাতেই আবির্ভূত ও সিদ্ধ হইয়াছিলেন; শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর উপদেশে একদিন চম্পা জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিল। তজ্জন্য জৈন সম্প্রদায়ের নিকট চম্পানগরী অতি পুণ্য ক্ষেত্র বলিয়া আজও পরিচিত। শাক্যবুদ্ধের অভ্যুদয়কালে চম্পা মগধাধিপ বিম্বিসারের অধিকারভুক্ত ছিল;—তাঁহার প্রিয় পুত্র অজাতশত্রু রাজপ্রতিনিধিরূপে চম্পার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শাক্যসিংহ এখানে ঘরে ঘরে বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান দেখিয়াছিলেন, এবং তিনি বহুবার এখানে আসিয়া জনসাধারণকে বিমল উপদেশ প্রদানে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নিকটও এই স্থান একটী পবিত্র বৌদ্ধতীর্থ ও ছয়টী প্রধান বৌদ্ধ কেন্দ্রের একতম বলিয়া সমাদৃত ছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দে চীনপরিব্রাজক হুএঙ্গ-চুএঙ্গ এখানে উভয় বৌদ্ধ সম্প্রদায় ও জৈন সম্প্রদায়েরও প্রতিভা দেখিয়া গিয়াছিলেন। এখানে ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায় এক-সময়ে পরস্পর ভ্রাতৃভাবে বিরাজমান ছিলেন। সেই অতীত সুদিনের সময়েই, এখানকার অধিবাসিগণ সুদূর প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে আর্য্য সভ্যতার বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তাঁহাদের অপূর্ব্ব অতীত কীর্ত্তির নিদর্শন আজও চীনসমুদ্রতীরবর্ত্তী আনামদেশে জাজ্বল্যমান;—আজও সেই স্থান অনং-

চম্পা বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ! দ্বিসহস্র বর্ষ পূর্ব্বে অঙ্গবাসীগণ যে অসাধারণ স্থাপত্য ভাস্কর বিদ্যার পরিচয় দিয়া গিয়াছিলেন, এবং পরবর্ত্তী কালে তাঁহাদের ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মাবলম্বী বংশধরগণ সুপ্রাচীন দেবস্থানে উৎকীর্ণ শিলাফলকে ভারতীয় সভ্যতা-বিস্তারের যে সকল ইতিহাস প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলেও বিস্ময়বিমুগ্ধ হইতে হয়!

এক্ষণে বাঙ্গালার লেফটেনেণ্ট গভর্ণরের অধীন তিনটী প্রধান বিভাগ—বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা। তিনটী বিভাগের প্রচলিত ভাষার অনেক সাদৃশ্য থাকিলেও পার্থক্যও আছে, তিনটী ভাষার নাম বাঙ্গালা, হিন্দী ও উড়িয়া। অদ্য আমরা বাঙ্গালা ও হিন্দীপ্রধান প্রদেশের সন্ধিস্থলে সমবেত হইয়াছি। ভাগলপুর হিন্দী-প্রধান দেশ হইলেও, এখানে বাঙ্গালী অনেক; অনেকেরই মাতৃভাষা। বস্তুতঃ ভাগলপুরের কমিশনরের বিভাগে উভয় ভাষাই বিশিষ্টরূপে প্রচলিত; খাঁটী বাসিন্দাদিগের ভাষা মিশ্রিত।

নৈসর্গিক কারণে ভাগলপুর ও তন্নিকটস্থ প্রদেশের চলিত ভাষা হইতে বঙ্গ ভাষা বিভিন্ন হওয়া অবশ্যম্ভাবী দেখিতে পাওয়া যায়। সামান্য এক গ্রামের ভাষা অনেক সময়ে নিকটবর্ত্তী গ্রামের ভাষা হইতে কিয়ৎ পরিমাণে বিভিন্ন। এমন কি, এক গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকেরই ভাষার কিছু কিছু পার্থক্য আছে। বস্তুতঃ প্রতি যোজন অন্তরেই চলিত ভাষার বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব্ব-বঙ্গের ও কলিকাতা ও তন্নিকটস্থ প্রদেশের ভাষার বিলক্ষণ বৈলক্ষণ্য আছে। মুদ্রিত পুস্তকেও সে বৈলক্ষণ্যের আভাস পাওয়া যায়। বীরভূম ও বৈদ্যনাথের ভাষা ঠিক কলিকাতার বাঙ্গালা নহে; প্রভেদ অনেক। দূরতানিবন্ধন ভাগল-পুরের ভাষার পার্থক্য আরও অধিক। তবে এ অঞ্চলে পাশ্চাত্য লোকের অধিক সমাগম থাকায়, অধুনা উর্দ্দু বা পারস্য ভাষার মিশ্রণ অধিক হইয়াছে। কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে এরূপ ছিল না।

স্থানভেদে ও অন্য প্রদেশের ভাষার মিশ্রণে চলিত ভাষার ভেদ যে কিয়ৎ-পরিমাণে অপরিহার্য্য, তাহা বুঝিবার জন্য আয়াস আবশ্যক নহে। কলিকাতা হইতে তের ক্রোশ দূরে হুগলী জেলায় আমি জন্মগ্রহণ করি ও প্রথম শিক্ষা লাভ করি। খাঁটী কলিকাতার অনেক লোকই আমার অনেক কথায় বিদ্রূপ করিতেন।



তাঁহাদের নিকট আমি রেঢ়ো (রাঢ়ীয়) ছিলাম। "শয়ন করিলাম," "গমন করিলাম", "আহার করিলাম", এ সকল সাধু ভাষা, ঠিক চলিত ভাষা নহে; আমি আমার প্রদেশের চলিত ভাষা ব্যবহার করিয়া বলিতাম, "গেনু", "খেনু", "শুনু"। খাঁটী কালিকাতার লোকেরা "গেলুম", "খেলুম" ও "শুলুম" বলেন। গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর প্রভৃতি প্রদেশের লোকেরা "গেলাম", "খেলাম", "শুলাম" বলেন, এবং পূর্ব্ববঙ্গবাসীরা "যাইলাম", "খাইলাম" প্রভৃতি বলেন। আমরা "তক্তপোষ" বলি, কলিকাতায় তাহাকেই "চৌকী", বলে; আমরা ছোট ছোট বসিবার কাষ্ঠাসনকে "চৌকী" বলি। পাশাপাশি জেলায় এরূপ শব্দের ও বিভক্তির প্রভেদ বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। খাঁটী বঙ্গদেশের অনেক স্থানের নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের কথা আমাদের বুঝিতে কষ্ট হয়।

মহাভাগবত শ্রীকৃষ্ণদাস-কবিরাজগোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায় লিখিয়াছেন—

"দণ্ডবৎ হৈয়া আমি পড়িনু পায়েতে।
নিজ পাদপদ্ম প্রভু দিলা মোর মাথে॥
উঠ উঠ বলি মোরে বলে বার বার।
উঠে তার রূপ দেখি হৈনু চমৎকার॥

বলা বাহুল্য, শ্রীকৃষ্ণদাসকবিরাজ ও অধিকাংশ বৈষ্ণব কবিই বর্দ্ধমান বিভা-গের বাসিন্দা ছিলেন। মাণিক গাঙ্গুলি তাঁহার রচিত শ্রীধর্ম্মমঙ্গলেও বর্ত্তমান সাধুভাষায় অপ্রচলিত অনেক শব্দ ও বিভক্তির ব্যবহার করিয়াছিলেন।

"তোমা লেগে সপ্তশালে ঝাঁপ দিয়াছিনু।
না দেখিলে তিলার্দ্ধেতে দহে মোর তনু॥"

এখন আমরা "লেগে", "মোর", "দিয়াছিনু;' কথা ব্যবহার করিলে গ্রাম্যতাদোষে দোষী হইব। রাঢ়দেশীয় বর্দ্ধমান জেলা নিবাসী আমার মাতামহের গুরুবংশের প্রধান পুরুষ কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিয়াছেন—

"ভাই বন্ধু মাতা পিতা, ত্যাজিয়া আইলাম এথা,
তোমারে করিনু আমি সার।"

এইরূপ বঙ্গের পুরাতন লেখকগণ অনেক কথা, প্রত্যয় ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, যাহা এখনও নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে বিলক্ষণ প্রচলিত, কিন্তু সাধু বা ভদ্র সমাজে তাহা ব্যবহৃত হয় না। ভাষা এক শ্রেণীতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, অপর শ্রেণীতে অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে; এক প্রদেশে পূর্ব্ব প্রচলিত ভাষা সামান্য পরিবর্ত্তিত হইয়া এখনও চলিতেছে; নিকটবর্ত্তী প্রদেশে বিবিধ-কারণবশতঃ ভাষায় গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু তজ্জন্য কি দুইটী ভাষা পৃথক্ জ্ঞানে বিভিন্ন সাহিত্যের সৃষ্টির উদ্যোগ করিতে হইবে? তজ্জন্যই কি এক প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের পাঠ্যপুস্তক ও সাহিত্যের প্রভেদ বিধান করিতে হইবে? একতা-জ্ঞান সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকারেই মঙ্গলকর।

আট শত বর্ষ পূর্ব্বে, পূর্ণিয়া, উত্তর ভাগলপুর ও দ্বারভাঙ্গা বঙ্গের সেনরাজ-গণের শাসনাধীন ছিল, এবং নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, তথায় বঙ্গলিপিও প্রচলিত ছিল। উপাধ্যায়গণ (ওঝাগণ) বঙ্গাক্ষর ব্যবহার করিতেন; এখনও সে ব্যবহারের সম্পূর্ণ লোপ হয় নাই। তাঁহাদের ভাষাও বঙ্গভাষা হইতে বিশেষ বিভিন্ন ছিল না। মৈথিল কবিশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপতি ঠাকুর চল্লিশ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বঙ্গের দ্বার দ্বারভাঙ্গার রাজসভায় রাজকবি বিদ্যাপতি ঠাকুর তৎকালপ্রচলিত মৈথিল ভাষায় বঙ্গাক্ষরে লিখিয়াছিলেন—

"সখি কি পুছসি অনুভব মোয়
সেহো পিরিতি অনুরাগ বখানইত
তিলে তিলে নূতন হোয় ॥ ২ ॥
জনম অবধি হম রূপ নিহারল
নয়ন ন তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনল
শ্রুতিপথে পরশ না গেল ॥ ৪ ॥
কত মধু যামিনিয় রভসে গমাওল
না বুঝল কৈসন কেল।



লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখল
তইও হিয়া জুড়ল না গেল ॥ ৬ ॥
কত বিদগধ জন রস অনুমগন
অনুভব কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইত
লাখে না মিলল এক ॥" ৮ ॥

শ্রীরাধা বলিতেছেন,—সখি রস-অনুভবের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কি করিতেছ? সেই প্রেমানুরাগের ব্যাখ্যা করিতে তিলে তিলে নূতন হয়। জন্মাবধি আমি সেই রূপ দেখিলাম, কিন্তু নয়নের তৃপ্তি হইল না। সেই মধুর বাণী কতই শ্রবণ করিলাম, কিন্তু তাঁহার কথা শ্রবণে লাগিয়া রহিল না। কত মধুযামিনী আনন্দে কাটাইলাম, কিন্তু কেলি কি, তাহা বুঝিলাম না; লক্ষ লক্ষ যুগ হৃদয়ে হৃদয় রাখিলাম, কিন্তু হৃদয় জুড়াইল না। কত বিদগ্ধ জন রসে অনুমগ্ন আছেন, কিন্তু অনুভব দেখিতে পাই না। বিদ্যাপতি বলেন যে, প্রাণ জুড়াইতে লক্ষের মধ্যে একটি পাওয়া যায় না।

কিয়ৎকাল পরেই সশিষ্য নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এই অপূর্ব্ব রসাত্মক গীতি দ্বারা নবদ্বীপপ্রবাহিনী শুভ্রসলিলা ভাগীরথীলহরী ও পুরুষোত্তমক্ষেত্রে নীলাভ সাগরতরঙ্গ প্রতিধ্বনিত করিয়া বঙ্গবাসী ও উড়িষ্যাবাসীদিগকে উন্মত্ত করিয়াছিলেন। তখন বঙ্গবাসিগণ বুঝিতে পারেন নাই যে, সুকবি বিদ্যাপতি ঠাকুরের প্রেমাত্মক কাব্যরসপূর্ণ পদ সকল বঙ্গভাষায় রচিত নহে। তখনও বঙ্গবাসী ও উড়িষ্যাবাসিগণ, মৈথিল, বঙ্গ ও উড়িয়া ভাষার সবিশেষ পার্থক্য বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা সহজেই পরস্পর পরস্পরের ভাষা বুঝিতে পারিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, শত-বর্ষ-মধ্যে প্রভেদজ্ঞান বলবৎ হইয়াছে। আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা অল্প সময়েই বিভিন্নভাষী, বিভিন্নজাতীয়, বিভিন্নসাহিত্যাবলম্বী বলিয়া আপনাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছি। বহু শত বৎসর বঙ্গবাসীদিগের হৃদ্‌বোধ ছিল যে, বিদ্যাপতি ঠাকুর বঙ্গবাসী, চণ্ডীদাসের ন্যায় বাঙ্গালী ছিলেন। এমন কি, অনেকেরই বিশ্বাস ছিল যে, তিনি বীরভূমে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভাগলপুর ও নিকটবর্ত্তী প্রদেশের দেশীয় লোকের চলিত ভাষা ঠিক হিন্দী নহে; উত্তর ভাগলপুরে অর্থাৎ মধুবন্ বিভাগে, এককালে যে খাঁটী বঙ্গভাষা প্রচলিত ছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়। ব্রিটিশ রাজ্যশাসনপ্রণালী অনুসারে বঙ্গদেশ বিভক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু পশ্চিম বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা এক শাসনের অন্তর্গত রহিল। পরস্পরের ভেদজ্ঞান তিরোহিত করিয়া, কয়েক শত বৎসরের পূর্ব্বের অবস্থা মনে করিয়া, আমাদের একতাজ্ঞানের পুনরুত্থানের সময় অসিয়াছে; বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের সম্যক্ সাহিত্যিক উন্নতির জন্য এই একতা অত্যন্ত আবশ্যক। (ক্রমশঃ)

শ্রীসারদাচরণ মিত্র।

---

# জীবন পথিক।

করিনু তোমার সেবা জনম জনম ধরি'
কতই না তুষিতে তোমারে,
কে তুমি কপট পান্থ কে তুমি নিঠুর কান্ত,
তবু যাও তেয়াগি' আমারে।
নিবসি আমার অঙ্গে ভুঞ্জিলে কত না রঙ্গে,
কত রস করিলে আস্বাদ।
তবু তুমি ধীরে ধীরে পলে পলে যাও সরে,
কভু জানালে না তব সাধ!
কখনো কুরগী হয়ে ভ্রমিয়াছি তোমা লয়ে,
নবশষ্প সুকোমল ভূমে!
(কভু) মুখে তুলি পদ্মনাল, বঙ্কিম ধবল গ্রীবা,
ফিরেছি লহরী চুমে চুমে!
পাতার আড়ালে কভু ফুটেছি সুরভি মাখা.
ক্ষুদ্র যুথী স্তবকে স্তবকে,
দলমল শ্যামপাতা, কখনো ললিত লতা,
দুলেছি অশোক তরু শাখে!
কভু বন বিহঙ্গিনী গেয়েছি মধুর গাথা
লয়ে তোমা তরুর কোটরে
কখনো উপল অঙ্গে ছুটিয়াছি নির্ঝরিণী
গেছ তুমি শুখায়ে আমারে।
কে তুমি কপট পান্থ, কে তুমি নিঠুর কান্ত,
বার বার এসে কর বাস।
কত না যতন করে রাখিবারে চাই ধরে,
যাও চলে না পুরায়ে আশ।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

---



# অর্থ-নীতি।

—:o:—

(১)

আমাদের অভিধান-কারকেরা বলিয়া গিয়াছেন যে যাহাতে প্রয়োজন সিদ্ধি হয় তাহাই অর্থ। ইংরাজিতে Wealth অর্থে "anything which has an exchange value" যে দ্রব্যের বিনিময়-মূল্য আছে তাহাকেই অর্থ বলা হয়। যে বাতাসে আমরা শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করি, তাহা একান্ত আবশ্যক। জল ও আর একটী নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য। কিন্তু সাধারণতঃ বাতাস ও জলের কোন মূল্য নাই। কিন্তু অবস্থা বিশেষে জলেরও যথেষ্ট মূল্য আছে; আজকাল বাজারে অনেক প্রকার Mineral water (খনিজ জল) বিক্রয় হয়। যে স্থানে ঐ জল উৎপন্ন হয় সে স্থানে উহার কোনই মূল্য নাই, উহার বিনিময়ে কোন দ্রব্যই পাওয়া যায় না; কিন্তু ঐ জল অন্যত্র প্রেরিত হইলেই তাহাকে বিক্রয় করা যায়। উহাকে চিনিময় করা যায় এবং তখন উহাকে অর্থ বলিয়া পরিগণিত করা হয় ও যায়। সুতরাং অবস্থা বিশেষে কোন দ্রব্যে কোন সময়ে অর্থরূপে বিবেচিত হয়, কোন সময়ে হয় না। অর্থের উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময় সম্বন্ধীয় বিষয়াদি যে শাস্ত্র চর্চ্চা করে তাহাকে অর্থনীতি আখ্যা দেওয়া হয়।

অধ্যাপক মার্শাল বলিয়াছেন যে, যে শাস্ত্র মানবসকলের দৈনন্দিন কার্য্য-সমূহের পর্য্যালোচনা এবং কি করিয়া সকলের অর্থাগম হয় ও কি প্রকারে

তাহা ব্যয় হয় তাহার অনুসন্ধান করে উহাই অর্থনীতি। কেয়ার্ণস বলেন যে, যে গ্রন্থ অর্থের উৎপাদন ও বণ্টন সম্বন্ধীয় প্রক্রিয়া সমূহ আলোচনা করে উহাকে অর্থনীতি বলা যায়। সাধারণতঃ, মনুষ্যসকলের অর্থের উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময় সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী যে গ্রন্থে শিক্ষা দেয় তাহাকে অর্থনীতি পুস্তক বলা যাইতে পারে।

অর্থনীতির ঠিক উদ্দেশ্য কি এই সম্বন্ধে অনেক মনস্বীগণ অনেকরূপ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ আদমস্মিথ তাঁহার যুগান্তরকারী Wealth of nations গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে অর্থনীতির দুইটি উদ্দেশ্য, প্রথম লোকে যাহাতে অধিক পরিমাণে অর্থ উৎপাদন করিতে পারে তাহার শিক্ষাদান এবং দ্বিতীয়তঃ, যাহাতে অধিক অর্থ উৎপাদিত হইয়া সাধারণের কার্য্যে ব্যয়িত হইতে পারে তাহারই চেষ্টা করা। তাঁহার মতে অর্থনীতি, রাজাপ্রজা উভয়েই কি প্রকারে ধনশালী হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা দেয়। আদমস্মিথ তাঁহার পুস্তকে প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে কি করিয়া গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতিরেকে কোন জাতির উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করা যায়, সমাজে বিভিন্ন প্রকার লোকের মধ্যে এই উৎপন্ন দ্রব্য কি প্রকারেই বা বিভাগ করা যায় এবং অর্থ জমাইয়া রাখিলেই বা কি ফল হয়, এই সমস্ত বিষয়ের বিবেচনা করিয়াছেন। তৃতীয় ভাগে তিনি বিনিময়ের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া চতুর্থ ভাগে সমাজের ক্রমিক উন্নতিতে উৎপাদন ও বিভাগ কি প্রকার ব্যতিক্রম হয় এবং পঞ্চম ভাগে গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা কি ভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত তাহার সম্বন্ধে বিস্তারিত নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। স্মিথের মতে, গবর্ণমেণ্ট কিংবা রাজকর্ম্মচারীগণের ব্যবসাদি বিষয়ে সাধারণের উপর হস্তক্ষেপ করা সমীচীন নহে।

আদমস্মিথ গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ সম্বন্ধে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করার ফলে, একদল লেখক অর্থনীতিকে সমাজবিজ্ঞানের এক অংশ ধরিয়া থাকেন *

* "Political Economy, in short, came to be conceived as a part of the Science of human society, rather than a part of the art of Government; the guidance which the Science had to give to Government being, apart from questions of taxation, mainly summed up in the simple phrase Hands off" Dictionary of Political Economy.



এবং অর্থনীতির সহিত রাজনীতির কোনরূপ সম্পর্ক নাই এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন। এই জন্যই স্মিথের পরবর্ত্তী অর্থনীতিপ্রণয়নকারী ব্যক্তিগণ স্মিথের মতাবলম্বন করিয়া যে সমস্ত পুস্তকাদি প্রণয়ন করেন তাহাতে যে শাস্ত্র কেবল মাত্র আর্থিক বিষয়ই আলোচনা করে, তাহাকেই অর্থনীতি বলা যায়, এইরূপ সংজ্ঞা প্রদান করেন। স্বনামখ্যাত রিকার্ডো তাঁহার পুস্তকের নাম "Principles of Political Economy and Taxation" বলিয়া আখ্যা দেন। এই আখ্যাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার মতে রাজস্ব সম্বন্ধীয় বিষয় অর্থনীতির বহির্ভূত বলিয়াই তিনি "এবং" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে সিনিয়র সাহেব এক পুস্তকে অর্থনীতিকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন। প্রথম ভাগে তিনি ঔপপত্তিক (Theoretical) অংশে উৎপাদন ও বণ্টন বর্ণনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় ভাগে কার্য্যকরী (Practical) অংশে যে সমস্ত বিধি প্রতিপালন করিলে আর্থিক উন্নতি হয় তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

মোটের উপর ধরিতে গেলে অর্থনীতির ঔপপত্তিক এবং কার্য্যোপযোগী (কার্য্যকরী) উভয় বিভাগই আছে। সংক্ষেপে এই দুই বিভাগকে অর্থনীতির art বিভাগ ও science বিভাগ বলা যাইতে পারে। † অর্থনীতিতে পদ্ধতি ও দুই প্রকার। প্রথম Deductive; দ্বিতীয় Inductive অধ্যাপক সিজউইকের মতে প্রথমোক্ত পদ্ধতি বণ্টন ও বিনিময়াদি ব্যাপারে বিশেষ কার্য্যকারী। মার্শাল বলেন যে বৈদেশিক বাণিজ্য প্রভৃতিতে এই প্রক্রিয়াই বিশেষ উপযোগী। তাঁহার মতে শুধু ঘটনা দ্বারা কোন কার্য্যই হয় না—অনুমান অত্যাবশ্যক। অর্থের উৎপাদন ও বণ্টন পরিবর্ত্তনের প্রণিধান করিতে হইলে আমাদের দ্বিতীয় পদ্ধতির অনুসরণ করিতে হয়।

অর্থনীতি আলোচনাকারী মনস্বীগণের মধ্যে তিনটী সম্প্রদায় বা বিভাগ

† "For brevity it seems convenient to refer to them as the Science of the art of Political Economy: the latter being historically the subject to which the term was mainly applied in its earlier use, whereas among English Political Economists of the present century, there has been a tendency to restrict it to the former". Ibid.

আছে। প্রথম English School. এই সম্প্রদায়ের লোকেরা ধরিয়া লয়েন যে সকল লোকেই অর্থের প্রতি অতৃপ্ত বাসনা এবং অন্যান্য ইচ্ছা বা উত্তেজনা দমন করিয়া কেবল মাত্র অর্থেরই আকাঙ্খা করিয়া থাকে। একই ইচ্ছা যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন লোকে কার্য্য করে এবং সংসারে অন্য কোন সদিচ্ছার প্রতি আসক্ত না হইয়া কেবল মাত্র অর্থে আসক্তি হইলে যে সে ব্যক্তি মনুষ্যপদবাচ্য হইতে পারে না তাহা ইহারা আদৌ আসলে মানেন না। ‡

দ্বিতীয় সম্প্রদায়কে Historical বা German School নামে অভিহিত করা হয়। ইহারা কোন দেশের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থার সহিত ইহার পূর্ব্বতন ইতিহাসের সম্পর্ক বিচার করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন। ইহাদের মতে প্রত্যেক বিষয় সম্যক্‌রূপে পর্য্যালোচনা না করিয়া কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সমীচীন নহে।

তৃতীয় সম্প্রদায়ের নেতা অধ্যাপক মার্শাল। এই সম্প্রদায় মনে করেন যে প্রত্যেক ব্যক্তির চরিত্র এবং কার্য্যক্ষমতা ঘটনানিচয়ের উপরেই নির্ভর করে। ইহাদের মতে শিল্পোন্নতি করিতে হইলে উপযুক্ত স্থলে উপযুক্ত ব্যক্তির নিয়োগ এবং তাহাদের ইচ্ছা মত কার্য্য করিবার ক্ষমতা দেওয়া উচিত। প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ নিজ দায়িত্বে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে দেওয়াই কর্ত্তব্য ইহারা এইরূপ মনে করেন। "Some Aspects of Competition" নামক গ্রন্থে অধ্যাপক প্রবর লিখিয়াছেন. "They are most anxious to preserve the freedom of the individual to try new paths on his own responsibility. They regard this as the vital service which free competition renders to progress, and desire on scientific grounds, to disentangle the case for it from the case for such institutions as tend to maintain extreme inequalities of wealth. Economists of this way of thinking consider that the privileges of capital and wealth exceed those which necessarily attach to "the function of the undertaker of business enterprises."

‡ Mr. Ruskin এই সম্প্রদায়ের ব্যক্তিকে "যন্ত্র বিশেষ" আখ্যা দিয়াছেন "abstract economic man is a mere covetous machine".



আমরা অর্থনীতিবিৎগণকে মোটামুটি হিসাবে তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়াছি। এইক্ষণ আমরা এই সম্প্রদায়ের যে সমস্ত শাখা প্রশাখা হইয়াছে তাহারও কিছু কিছু বিবরণ দিবার প্রয়াস পাইব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে প্রাচীন কালে অর্থনীতি কি অর্থে ব্যবহৃত হইত এবং সেই সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত এই শাস্ত্রের যে কি উন্নতি হইয়াছে তাহার পর্য্যালোচনা করিব।

প্রাচীন গ্রীসে অর্থনীতি অর্থে তথাকার লোকে প্রত্যেক গৃহস্থের নিজ নিজ পারিবারিক কার্য্যনির্ব্বাহ এবং বিশেষতঃ গৃহস্থের আয় ও তাহার বন্দোবস্ত সূচক ব্যাপার ইহাই মাত্র বুঝিত। গ্রীসদেশবাসীরা ব্যবসায় বাণিজ্যকে হীনজ্ঞান করিত। স্পার্টার স্বনামপ্রসিদ্ধ নিয়মপ্রণয়ণকারী লাইকারগাস্ স্পার্টাবাসীদিগকে সকল প্রকার শিল্প কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে নিষেধ করিয়া গিয়াছিলেন। আথেন্সে এই কার্য্য ক্রীতদাস দ্বারা নির্ব্বাহিত হইত। অধ্যাপক মাহোপি বলিয়াছেন যে তথাকার সভ্যতার একটী বিশেষ লক্ষণ স্বরূপ বাণিজ্যে অথবা যে সমস্ত কার্য্যে যথেষ্ট অবসরের অভাব হইত, সেইরূপ সকল কার্য্যকেই আথেনীয়ানগণ ঘৃণা প্রদর্শন করিত।

অর্থনীতিবিশারদ কোন গ্রীসীয় গ্রন্থকারের মধ্যেই আমরা "ব্যক্তিগত ভাবের লক্ষণ" কিছুই দেখিতে পাই না। আমরা দেখিতে পাই যে কি প্রকারে সুদক্ষ নাগরিক গড়া যাইতে পারে প্রত্যেক গবর্ণমেণ্টের এই মাত্রই উদ্দেশ্য ছিল। প্রাচীন পণ্ডিতগণ অর্থ সংগ্রহ শিক্ষা দেওয়ার বিরুদ্ধে ছিলেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে অর্থ হইলেই মানুষ বিলাসী হয় এবং বিলাসী হইলে তাহাদের যুদ্ধ করিবার প্রবৃত্তি লোপ পায়। প্লেটো তাঁহার Republic ( সাধারণ তন্ত্র ) গ্রন্থে একটী আদর্শ নগরীর চিত্র দিয়াছেন। এই চিত্রে তিনি কারিকর এবং সওদাগরদিগকে আদর্শ নগরী হইতে বহিষ্কৃত করিতে আদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে প্রকৃতি দেবী চর্ম্মকার অথবা কর্ম্মকার প্রস্তুত করেন নাই, কেননা এই প্রকার ব্যবসা মাত্রেই মনুষ্যকে অধোগামী করায়। তাঁহার

মতে আদর্শ নগরী (বা দেশ) যেন অন্যান্য দেশের সহিত অনাবশ্যক সম্বন্ধ না রাখে। শিশুসন্তানদিগকে বিনষ্ট করিয়া এবং বাল্যকালে বিবাহ প্রথা বদ্ধ রখিয়া লোকসংখ্যা সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে। মূল্যবান প্রস্তরাদি যতদূর সম্ভব দেশ হইতে দূরীভূত করিতে হইবে এবং সুদের আশায় টাকা কর্জ্জ দেওয়া বন্ধ করিতে হইবে।

প্লেটোর পর জেনোফন তাঁহার Economicus গ্রন্থেও অর্থনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। কি করিয়া প্রত্যেকের পারিবারিক খরচ ও বিষয়াদির সুবন্দোবস্ত করা যায়, তিনি সেই সম্বন্ধে কিছু কিছু উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। আরিষ্টটল্ তাঁহার Politics নামক পুস্তকেও অর্থনীতি সম্বন্ধীয় বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। তিনিও প্লেটোর পথাবলম্বন করিয়া ব্যবসায়ীকে ঘৃণা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে যে রাজ্য প্রকৃতরূপে সুশাসিত হইতে চায়, সে রাজ্যের অধিবাসীরা যেন কারিকর কিংবা ব্যবসায়ী না হয়, কেননা এই সমস্ত ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবনাতিপাত করিতে হইলে অধর্ম্মে পতিত হইতে হয়। তবে' আরিষ্টটল এক বিষয়ে অনেকের অগ্রণী হইয়াছিলেন—তিনি পরিষ্কারই বলিয়া গিয়াছেন যে অর্থ ও মুদ্রা এক নহে। আমরা পরে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে আরিষ্টটল এই প্রসঙ্গে যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা সর্ব্বতোভাবে ঠিক।

রোমক রাজ্যেও শিল্পী ও কৃষী কার্য্যাদি ক্রীতদাস দ্বারা সম্পাদিত হইত। এই কারণে ভূমির উৎপাদিকা শক্তিও অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল। ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের জমিদারীতে কেবলমাত্র ক্রীতদাসগণই কার্য্য করিত। পণ্ডিত প্রবর শিসিরিও রোমকদিগের বাণিজ্যনৈপুণ্য দেখিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিতেন। কারখানায় কার্য্য করিলে সম্মানের লাঘব হয় এবং মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার আশ্রয় না লইলে ব্যবসায়ে সফলতা লাভ করা যায় না, ইহাই তৎকালীন ধারণা ছিল। রোমকগণ মনে করিত যে দেশে যত স্বর্ণ থাকিবে সেই দেশ ততই ধনশালী বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং সেই জন্য তাহারা স্বর্ণের রপ্তানী আদৌ পছন্দ করিত না। সিসিরো তাঁহারা পুস্তকে বিশেষ আহ্লাদের সহিত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন যে "সিনেট বিশেষ বিবেচনার সহিত স্বর্ণের রপ্তানীর বিরুদ্ধে অনুশাসন প্রচলিত করিয়াছেন।"



ফিউডালিসিম্ প্রচলিত ইউরোপের মধ্যযুগে যে জমিদারগণ বাণিজ্যাদি বিষয়ে একান্ত বিরুদ্ধবাদী ছিল তাহা বলাই বাহুল্য এই সময়ে জমিদারগণ শিল্পের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন এবং কেবলমাত্র যুদ্ধ বা শীকারোপযোগী অস্ত্রাদি নির্ম্মাতা কারিকরগণ ব্যতীত অন্যান্য কারিকরগণকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। * যাহা হউক ধর্ম্মযুদ্ধের ( Crusades ) ফলে এবং ইউরোপের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্রমিক উন্নতিতে উপরোক্ত ভ্রান্তি ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতে থাকে। ইংলণ্ডের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে অর্থনীতি বিষয়ক ধারণার ক্রমোন্নতি বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়। রাজা এথেলষ্টনের সময় এক রাজাজ্ঞা প্রচারিত হয়—উহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে লণ্ডননগরীস্থ যে কোন সওদাগর বাণিজ্যার্থ তিনবার সমুদ্র যাত্রা করিলে "থেন" ( Thane বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ) বলিয়া পরিগণিত হইতেন। ম্যাগ্না কার্টায় বৈদেশিক বণিকদিগকে ইংলণ্ডে অবাধে যাতায়াতের ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং ১৩০৩ সনে প্রচারিত Carta Mercatoria ইংলণ্ডে অবস্থিত বৈদেশিক সওদাগরদিগকে নানারূপ স্বত্ব প্রদান করে। রাজা তৃতীয় এডোয়ার্ডের সময় পশমের ব্যবসায় ইংলণ্ড একরূপ একচেটিয়া করিয়া লয়, এবং ১৩৫০ সনে ইংলণ্ড ১১৬৪৮০৯০ পাউণ্ড মূল্যের পশম রপ্তানী করে। এই সময় হইতে ক্রমে ইংলণ্ডে বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতি দেখা যায়। ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে রুসের সহিত বাণিজ্যের জন্য রুসিয়া কোম্পানি নামে একটী কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই ভারত বর্ষের সহিত বাণিজ্যার্থ সুপ্রসিদ্ধ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পর হইতেই ক্রমে ক্রমে ইংলণ্ডে অবাধ বাণিজ্য বিস্তারিত হইতে থাকে।

( ক্রমশঃ )

শ্রীযোগীন্দ্র নাথ সমাদ্দার।

---

* "The class which predominated in it was not sympathetic with industry and held the handicrafts in contempt, except those subservient to war or meal sports".

# গান।

বেহাগ—কাওয়ালী।

—:*:—

হেথা যে গান গাইতে আসা
আমার হয়নি সে গান গাওয়া ;
আজো কেবলি সুর সাধা আমার
গাইতে কেবল চাওয়া !

আমার লাগে নাই সে সুর
আমার বাঁধে নাই সে কথা,
শুধু প্রাণেরি মাঝখানে আছে
গানের ব্যাকুলতা—
আজো ফোটে নাই সে ফুল
শুধু বহেছে এক হাওয়া !

আমি দেখি নাই তার মুখ
আমি শুনি নাই তার বাণী,
কেবল শুনি ক্ষণে ক্ষণে
তাহার পায়ের ধ্বনি খানি ;
আমার দ্বারের সমুখ দিয়ে
সে জন করে আসা যাওয়া।

শুধু আসন পাতা হ'ল
আমার সারাটা দিন ধরে,
ঘরে হয়নি প্রদীপ জ্বালা
তারে ডাকব কেমন করে ?
আছি পাবার আশা নিয়ে
তারে হয়নি আমার পাওয়া !

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



# বিবাহ ও পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে হিন্দুজাতির আদর্শ

—:০:—

হিন্দু বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য যজ্ঞ সাধন। আজকাল যজ্ঞ বলিলে আমরা একটা অতি বাহ্য ও স্থূল বস্তু বুঝিয়া থাকি। আমরা দেখিতে পাই যে সুখৈশ্বর্য্য লাভের প্রত্যাশায় দেবতাগণের তুষ্টিসাধনের জন্য ঘৃত, যব, ছাগ, মহিষ, সোমরস, পিষ্টক প্রভৃতি প্রজ্বলিত অগ্নিতে আহুতি দিয়া যজ্ঞ করা হয়। কিন্তু যজ্ঞের আদর্শ সর্ব্বদাই এরূপ স্থূল নহে। জগতের অন্যান্য বস্তুর যেমন ক্রম-বিকাশ হইয়াছে, বিদ্যাচর্চ্চা ও জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যেমন সর্ব্ব বিষয়ের উন্নতি হইয়াছে, যজ্ঞের আদর্শেরও ঠিক সেইরূপ ক্রম-বিকাশ হইয়াছে। পুরা-কালে মনুষ্য যখন অজ্ঞান ছিল, যজ্ঞের আদর্শও তখন বাহ্য ও স্থূল ছিল। তখন মনুষ্য উপাস্য দেবতাকে অলৌকিকশক্তি-সম্পন্ন জীবধর্ম্মী বাহ্যসত্তা বলিয়া মনে করিত, সুতরাং নানা প্রকার বাহ্য উপকরণ দ্বারা যজ্ঞ করিত। যজ্ঞের তখন দুই উদ্দেশ্য ছিল,—এক, দেবতাকে সন্তুষ্ট করিয়া ঐহিক ও পারত্রিক সকল প্রকার সুখৈশ্বর্য্যের অধিকারী হওয়া,—আর দেবতার নিকট হইতে যে দান প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

গীতাকার বলিয়াছেন :—( গীতা ৩য় অধ্যায় ১১।১২ )

"দেবান ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তুবঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞ ভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভংক্তে এব সঃ॥"

"যজ্ঞ দ্বারা তোমরা দেবতাদিগের সংবর্দ্ধনা কর ; দেবতারাও বৃষ্ট্যাদি দ্বারা তোমাদিগকে সংবর্দ্ধিত করুণ ; এইরূপে তোমরা পরস্পর সংবর্দ্ধিত হইয়া পরম মঙ্গল প্রাপ্ত হইবে। যেহেতু দেবতারা যজ্ঞে তৃপ্ত হইয়া তোমাদিগকে ঈপ্সিত দিবেন ; সেই জন্য দেবতাদিগের প্রদত্ত অন্নাদি সেই দেবতাদিগকে যজ্ঞ দ্বারা না দিয়া যে ভোজন করে সে নিশ্চয়ই চোর।"

দেবতাদিগের তুষ্টির জন্য এবং তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য এইরূপ যজ্ঞসাধন ভিন্ন ভিন্ন আকারে জগতের প্রায় সমস্ত জাতির মধ্যেই ছিল। অতি প্রাচীনকালে ইহুদিদেরও দেবতা সম্বন্ধে ধারণা অত্যন্ত বাহ্য ও স্থূল ছিল। তাহারাও তাহাদের Passover Feast এর সময় দেবতার তুষ্টি ও দেবতার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য ছাগবলি দিত বেদীর উপর অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া ধূপদীপাদির সহিত তাহাতে মেষ উৎসর্গ করিত।

জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু জাতির যজ্ঞের আদর্শেরও উন্নতি হইতে লাগিল। তখন জ্ঞানীরা অনুভব করিতে লাগিলেন যে, উপাস্য দেবতা কখনও বাহ্য হইতে পারেন না। তিনি চিন্ময়, অন্তরাত্মায় অবস্থিত। তাঁহারা বলিলেন,—

"হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং।"

"অখণ্ড নিষ্কলঙ্ক ব্রহ্মা অন্তরাত্মার হিরণ্ময় শ্রেষ্ঠ কোষ মধ্যে অবস্থিত আছেন।"

তখন উপাস্যের আদর্শের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞের বা উপাসনার আদর্শেরও উন্নতি হইতে লাগিল। যজ্ঞ বা উপাসনা তখন দুইভাগে বিভক্ত হইল। যাঁহারা বাহ্য দেবতায় বিশ্বাস করিতেন তাঁহারা বাহ্য উপকরণ দ্বারা যজ্ঞ সাধন করিতেন। সেই যজ্ঞের নাম মনুসংহিতায় "বাহ্যযজ্ঞ" এবং গীতায় "দেবযজ্ঞ"। কিন্তু যাঁহারা চিন্ময় পরমাত্মাকে উপাস্য বলিয়া জানিয়াছিলেন তাঁহারা বাহ্য আকারে যজ্ঞ না করিয়া আন্তরিক ভাবে যজ্ঞ করিতেন। এই যজ্ঞের নাম মনুসংহিতায় "অন্তর্যজ্ঞ", এবং গীতায় "জ্ঞানযজ্ঞ" বা "ব্রহ্মযজ্ঞ" প্রভৃতি।

গীতাকার বলিয়াছেন,—

( গীতা ৪র্থ অধ্যায় ২৫-৩০ )

"দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি॥
শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়ান্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্যে ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি॥
সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণিচাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে॥



দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ শংসিতব্রতাঃ॥
অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতীরুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়নাঃ॥
অপরে নিয়তাহারা প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।
সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ॥"

"কর্ম্মযোগীরা দেবযজ্ঞই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করেন। জ্ঞানযোগীরা ব্রহ্ম-অগ্নিতে যজ্ঞসাধন দ্বারাই যজ্ঞ করেন। ব্রহ্মচারীরা শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সকল ইন্দ্রিয় সংযম রূপ অগ্নিতে হোম করেন। অন্যেরা শব্দাদি বিষয় সকল ইন্দ্রিয়াগ্নিতে হোম করেন, অর্থাৎ অনাসক্ত ভাবে বিষয় ভোগ করেন। ধ্যানযোগীরা জ্ঞান-প্রজ্জ্বলিত আত্মার একাগ্রধ্যানরূপ অগ্নিতে সকল ইন্দ্রিয়-কর্ম্ম ও প্রাণকর্ম্ম হোম করেন। কেহ দ্রব্যদান যজ্ঞ, কেহ তপোযজ্ঞ, কেহ সমাধি-যোগযজ্ঞ, আর কেহ বেদাধ্যয়নযজ্ঞ করেন, এবং কেহ তীক্ষ্ণ-ব্রত-যতি। আর কেহ প্রাণায়াম-যজ্ঞ করেন, আবার কেহ নিয়তাহারী হইয়া কুম্ভকযজ্ঞ করেন। এই যে দ্বাদশ প্রকার যোগীর কথা বলা হইল ইহারা সকলেই যজ্ঞবিদ্ এবং যজ্ঞদ্বারা ক্ষয়িতপাতক। গীতাকার যেরূপ দৈবযজ্ঞ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি দেবতাগণের উদ্দেশ্যে বাহ্যযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, অনাসক্ত ভাবে বিষয়-ভোগ যজ্ঞ, ধ্যানযজ্ঞ, সংযমযজ্ঞ, তপস্যাযজ্ঞ, সমাধিযজ্ঞ, যত্যাচার-যজ্ঞ, প্রাণায়াম ও কুম্ভকযজ্ঞ প্রভৃতি নানা যজ্ঞের উল্লেখ করিয়াছেন, মনুও ঠিক সেইরূপ বলিয়াছেন,— ( মনুসংহিতা ৪র্থ অধ্যায় )

"এতানেকে মহাযজ্ঞান্ যজ্ঞশাস্ত্রবিদোজনাঃ।
অনিহমানাঃ সততমিন্দ্রিয়েষ্বেব জুহ্বতি॥
বাচ্যেকে জুহ্বতি প্রাণাঃ প্রাণে বাচঞ্চ সর্ব্বদা।
বাচি প্রাণেচ পশ্যন্তো যজ্ঞ নির্বৃত্তিমক্ষয়াং॥
জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রাযজন্ত্যৈতৈর্ম খৈঃসদা।
জ্ঞানমূলাং ক্রিয়ামেনাং পশ্যন্তো জ্ঞান-চক্ষুষা॥"

"যাঁহারা বাহ্য ও অন্তর যজ্ঞের শাস্ত্র জানেন, তাঁহারা বাহ্যে কোন যজ্ঞানুষ্ঠান না করিয়া চক্ষু শ্রোত্র প্রভৃতি যে পাঁচ ইন্দ্রিয়, তাহাতে পঞ্চ বিষয়কে সংযম

করিয়া পঞ্চ যজ্ঞ সাধন করেন। আর কেহ কেহ বাক্যে নিশ্বাসের আহুতি দেওয়াকে অক্ষয়-ফল-দায়ক যজ্ঞ জানিয়া তাহাই করেন। অর্থাৎ তাঁহারা বাহ্যে কোন প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠান না করিয়া কেবল নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ, অর্থাৎ প্রাণ ধারণ ও জ্ঞানোপদেশ প্রদান মাত্র করিয়া থাকেন। আর কেহ কেহ শাস্ত্রে যে যে যজ্ঞ বিহিত আছে, তাহা কেবল ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারাই নিষ্পন্ন করেন। অর্থাৎ এক ব্রহ্মজ্ঞান সাধন দ্বারাই তাঁহাদের অপর সকল যজ্ঞ সাধন করা হয়। তাঁহাদের অপর কোন যজ্ঞ সাধন করিবার প্রয়োজন থাকে না।"

বাইবেল পাঠ করিলে দেখা যায় ইহুদি জাতির মধ্যেও যজ্ঞের আদর্শ ক্রমে এইরূপ উন্নত হইয়াছিল। মহর্ষি আমসের ( Prophet Amos ) বাক্যে ইহুদি গণের উপাস্য দেবতা জীহোভা বলিতেছেন,—

"I hate, I despise your feast days, and I will smell no savour in your solemn assemblies. Though ye offer me burnt-offerings and meat-offerings I will not accept them ; neither will I regard the peace-offerings of your fat beasts. But let judgment run down like water, and righteousness as an ever-flowing stream, Did ye offer unto me sacrifices and offerings in the wilderness forty years, O house of Israel ? (Amos V- 21-25.)

"আমি তোমাদিগের ভোজ ও মহোৎসবকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করি, এবং তোমাদিগের ঐ গম্ভীর জনসঙ্ঘে একটুও পরিতৃপ্তি লাভ করি না। যদিও তোমরা সুগন্ধি দ্রব্য জ্বালাইয়া আমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিতেছ এবং মাংস দ্রব্য দ্বারা আমার পূজা করিতেছ তথাপি ঐ সকল আমি গ্রহণ করিব না। অথবা তোমাদের হৃষ্টপুষ্ট পশুবলির প্রতিও মনযোগ প্রদান করিব না। কিন্তু সুবিচার জলের মত প্রবাহিত হউক এবং সাধুতা দুকূলপ্লাবী স্রোতস্বিনীর ন্যায় ধাবিত হউক। হে ইজ্‌রাইল বংশধরগণ! তোমরা কি চল্লিশ বৎসর নির্গুণ প্রান্তরে আমাকে বলি ও পূজা উপহার প্রদান করিয়াছিলে ?"

"I delight in loving kindness and not in sacrifice ; and



in the knowledge of God more than in burnt-offerings". (Hosea VI. 6.)

"আমি বলি অপেক্ষা স্নেহপরিপূর্ণ দয়ার কার্য্যে, সুগন্ধি দ্রব্য পোড়ান অপেক্ষা ঈশ্বর সম্বন্ধীয় তত্ত্বজ্ঞানে অধিক আনন্দ ভোগ করি।"

"Even if you make me many prayers I will not hear ; your hands are full of blood. Wash you, Make you clean, take away the evil of your works from before my eyes ; cease to do evil, learn to do well, seek out justice, righten the violent man, do justice to the orphan, plead for the widow." (Isiah I. 11-17.)

"তোমরা বহু প্রার্থনা করিলেও আমি তাহাতে কর্ণপাত করিব না, কেননা তোমাদের হস্ত রক্তরঞ্জিত; তোমরা নিজেদের ধৌত কর এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হও। তোমাদের পাপকার্য্য সকল আমার চক্ষুর সম্মুখ হইতে অপসারিত কর; অসৎ কার্য্য হইতে বিরত হও; সৎ কার্য্য করিতে শিক্ষা কর; ন্যায়ের অনুধাবন কর; দুরাচারী লোকদিগকে সৎপথে আনিতে চেষ্টা কর, পিতৃমাতৃহীনের প্রতি দয়া কর এবং পতিহীনার জন্য কাতরে প্রার্থনা কর।" গীতাকার ও মনুর ন্যায় ইহুদি জাতির ঋষিগণও বাহ্যযজ্ঞ অপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞান, সংযম, সাধুতা, দান প্রভৃতিকে শ্রেষ্ঠ বলিতেন। তাহার পর খ্রীষ্ট ক্রুশকাষ্ঠের উপর জীবন বিসর্জ্জন করিলে যজ্ঞ বিষয়ে ইহুদি জাতির আদর্শ এই :—খ্রীষ্ট " lamb of God " ভগবানের পবিত্র মেষ। জগতের পাপ হরণের জন্য এখন ক্রুশকাষ্ঠে খ্রীষ্টরূপ মেষেরই বলি হইল। কালক্রমে তাহাদের মধ্যে যজ্ঞের আদর্শ এই দাঁড়াইল যে, খ্রীষ্ট যেমন ক্রুশ বহন করিয়াছেন, সেই রূপ আমরাও ক্রুশ বহন করিতে পারিলে অর্থাৎ জীবনের দুঃখ কষ্ট সকল ধৈর্য্য সহকারে সহ্য করিতে পারিলে, আমাদের শরীরকে দমন ও পীড়ন করিতে পারিলে, আমাদের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ সাধন করা হইবে।

হিন্দুদিগের মধ্যে যজ্ঞের আদর্শ যখন পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অতি উন্নত হইয়া উঠিল, তখন মনু গৃহস্থের পক্ষে এই বিধান করিলেন :—

"ঋষি-যজ্ঞং দেবযজ্ঞং
ভূতযজ্ঞঞ্চ সর্ব্বদা
নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞঞ্চ
যথাশক্তি ন হাপয়েৎ।"

"ঋষিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, ও পিতৃযজ্ঞ এই পঞ্চ মহাযজ্ঞকে সর্ব্বদা যথাশক্তি গৃহস্থে ত্যাগ করিবেক না।" এই শ্লোকে মনু অপরাপর স্থূল ও সকাম যজ্ঞ অবহেলা করিয়া গৃহস্থের পক্ষে পঞ্চ মহাযজ্ঞের প্রাধান্য কীর্ত্তন করিলেন। এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের উদ্দেশ্য অতি সুন্দর, অতি গভীর, ও অতি মহৎ। হিন্দু জাতির বিবাহের উদ্দেশ্য শুধু সুখভোগ নহে। হিন্দুরা বিবাহ কার্য্যকে একটি ধর্ম্মকার্য্য মনে করেন। সেইজন্য বিবাহ তাঁহাদের বিবেচনায় অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। স্ত্রী কিম্বা পুরুষ যাবৎ বিবাহ না করেন তাবৎ পূর্ণাঙ্গ হন না। স্বামী স্ত্রী এক সঙ্গে মিলিত না হইলে হিন্দু জীবনে সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য যে যজ্ঞ সাধন, তাহা হয় না। সেই জন্যই শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে যে, বিবাহের পর গৃহপ্রবেশমাত্র দম্পতি অগ্ন্যাধান কার্য্য সম্পন্ন করিবেন—অর্থাৎ স্বামী স্ত্রী একসঙ্গে মিলিত হইয়া গৃহে যজ্ঞাগ্নি স্থাপন করিবেন। যাবৎ দম্পতি গৃহে থাকিবেন, তাবৎ সেই পবিত্র যজ্ঞাগ্নি নির্ব্বাপিত হইবে না। সেই অগ্নি সাক্ষী করিয়া দম্পতি নিত্য পঞ্চ-মহাযজ্ঞ সাধন করিবেন।

এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ বুঝিতে হইলে হিন্দুদিগের ঋণ বা কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কি ভাব তাহা জানিতে হয়। হিন্দুরা পাঁচটি ঋণকে প্রধান বলিয়া মনে করেন। প্রথম ঋষিঋণ অর্থাৎ জগতের জ্ঞানী ও মহাপুরুষগণের প্রতি ঋণ। দ্বিতীয় দেবঋণ—অর্থাৎ ইন্দ্রাদি দেবতাগণের প্রতি ঋণ। তৃতীয় পিতৃঋণ—অর্থাৎ পিতৃপুরুষ-গণের প্রতি ঋণ। চতুর্থ নৃঋণ—অর্থাৎ মনুষ্য সাধারণের প্রতি ঋণ। পঞ্চম ভূতঋণ অর্থাৎ যাবতীয় উদ্ভিদ ও ইতর প্রাণীগণের প্রতি ঋণ।

যদি আমরা ধীরভাবে আমাদের সমগ্র জীবন আলোচনা করিয়া দেখি, তবে দেখিতে পাইব যে, জগতের সাধুপুরুষগণ, আমাদের পিতৃপুরুষগণ, দেবতা বা প্রাকৃতিক শক্তি নিচয়, জন সাধারণ, ইতর প্রাণী ও যাবতীয় উদ্ভিদগণের নিকট আমরা প্রকৃতই কত ঋণী? আমাদের কি শারীরিক জীবন, কি আধ্যাত্মিক



জীবন সমস্তই ইহাদিগের উপর কি পরিমাণে নির্ভর করিতেছে! আমরা যদি কল্পনা করিয়া দেখি বুদ্ধ, চৈতন্য, শঙ্করাচার্য্য, খ্রীষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ জন্ম গ্রহণ করেন নাই; তাঁহারা নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিয়া এবং সর্ব্বো-পরি মানব জীবনের মহোচ্চ আদর্শ দেখাইয়া আমাদিগকে মোক্ষের পথ দেখাইয়া দেন নাই; যদি কল্পনা করি আমাদের পিতৃপুরুষগণ পরিবার ও সমাজ বন্ধন করিয়া আমাদের মধ্যে সত্য, সংযম, দয়া, দাক্ষিণ্যাদি ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন নাই, তাহা হইলে মানব জাতি আজ কি অবস্থায় থাকিত, আমাদের সমাজেরই বা কি দশা হইত ভাবিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। যদি জনসাধারণের নিকট হইতে আমরা যে সহস্র প্রকার উপকার লাভ করি তাহা হইতে বঞ্চিত হইতাম—আমাদিগের দাসদাসী বন্ধুবান্ধব, প্রভু প্রভৃতি বিমুখ হইত, তাহা হইলে আমাদের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা সম্ভব হইত কিনা! যদি আমরা কল্পনা করি, বৃক্ষলতা প্রভৃতি আমাদিগকে ফলমূল ও শস্য দিতে বিরত হইয়াছে; গাভীগণ আর শিশুদিগকে দুগ্ধ দিতেছে না; গো, মহিষ, অশ্বাদি প্রাণীগণ আমাদের শস্য ক্ষেত্রে জল ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে ভার বহন করিতেছে না, তাহা হইলে আমাদের মুহূর্ত্তেকের জন্য প্রাণধারণ করা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়।

এই সমস্ত ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি এই সকলের নিকট আমরা মহা-ঋণে ঋণী; এই সকল ঋণ পরিশোধ করিয়া ইহাদিগের সহিত আমাদিগের যে ঘনিষ্ঠ যোগ, সেই যোগ অন্তরাত্মায় অনুভব করিয়া সর্ব্বমূলাধার ভগবানের সহিত যোগযুক্ত হওয়াই পঞ্চ মহাযজ্ঞের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই জন্যই মনু অন্য সকল যজ্ঞ অবহেলা করিয়া এই পঞ্চ মহাযজ্ঞই গৃহস্থের পক্ষে বিহিত করিয়াছেন।

পঞ্চ মহাযজ্ঞের প্রথম যজ্ঞ—ঋষিযজ্ঞ, ইহা সাধনের উপায় নিত্য বেদাধ্যয়ন। ঋষিগণ শাস্ত্রাদি রচনা করিয়া আমাদিগকে মোক্ষ পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা আমাদিগের গুরু ও পরিত্রাতা; আমরা তাঁহাদিগের অনুগত শিষ্য। তাঁহাদিগের সহিত এই যে পবিত্র সম্বন্ধ তাহার গুরুত্ব ও পবিত্রতা উপলব্ধি করিয়া তাহাদিগের সহিত এবং তাঁহাদিগের ভিতর দিয়া সর্ব্বজ্ঞানাধার পরমাত্মার সহিত যোগ স্থাপন করিবার প্রধান উপায় নিত্য বেদাধ্যয়ন। সেই জন্যই ঋষি-যজ্ঞ নিত্য বেদাধ্যয়ন।

পঞ্চ মহাযজ্ঞের দ্বিতীয় যজ্ঞ—দেব-যজ্ঞ। প্রাচীন দেবজ্ঞানীরা প্রত্যেক বস্তুতেই বা শক্তিতেই এক এক দেবতার অধিষ্ঠান দেখিতেন। তাঁহারা মেঘের শক্তিতে যে দেবতার অধিষ্ঠান দেখিতেন তাঁহাকে বলিতেন ইন্দ্র; নভোমণ্ডলে অধিষ্ঠিত দেবতাকে বলিতেন বরুণ,—সূর্য্যাধিষ্ঠিত দেবতাকে বলিতেন সূর্য্য বা সবিতা। এইরূপ তাঁহারা চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্‌পাণি ইত্যাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় ও সকল ইন্দ্রিয়ের নায়ক মন এ সকলেতেই এক এক দেবতার অধিষ্ঠান দেখিতেন। এই সকল ভৌতিক ও শারীরিক শক্তি হইতে তাঁহারা যে উপকার লাভ করিতেন তাহা স্মরণ করিয়া সেই সেই দেবতার উদ্দেশ্যে দেব-যজ্ঞ সাধন করিতেন। কিন্তু তৎকালেও অনেকে এক ব্রহ্ম স্বীকার করিতেন, অন্য দেবতা স্বীকার করিতেন না। বর্ত্তমান কালেও দেববাদী ও ব্রহ্মবাদী উভয় শ্রেণীর লোকই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে দেববাদীরা দেবযজ্ঞ সাধন করিয়া ভৌতিক ও শারীরিক শক্তি সমূহের সঙ্গে যোগ অনুভব করিয়া ভগবানের সহিত যোগযুক্ত হইতে পারেন। আর ব্রহ্মবাদীরা সাক্ষাৎ ভাবেই সর্ব্বশক্তির মূলাধার পরব্রহ্মের সহিত যোগযুক্ত হইয়া মনু প্রভৃতির বিধানানুযায়ী এক ব্রহ্মযজ্ঞ দ্বারাই সমস্ত দেবযজ্ঞ সাধন করিতে পারেন।

পঞ্চ মহাযজ্ঞের তৃতীয় যজ্ঞ—পিতৃ-যজ্ঞ। ইহা সাধনের উপায় পিতৃপুরুষ গণের উদ্দেশ্যে তর্পণ। তাঁহাদিগের নিকট হইতে আমরা শরীর, মন, জ্ঞান, বুদ্ধি এবং গার্হস্থ্য ও সমাজ ধর্ম্ম সমস্তই পাইয়াছি, সুতরাং তাঁহাদিগের নিকট আমরা অশেষ ঋণে ঋণী! সেই ঋণ পরিশোধ করিবার এবং তাঁহাদিগের সহিত যোগ রক্ষার প্রধান উপায় তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যে তর্পণ। এই তর্পণ যে শুধু তিল তুলসী প্রভৃতি বাহ্য বস্তু দ্বারাই সাধন করিতে হইবে এমন নহে। তর্পণের উদ্দেশ্য নিত্য তাঁহাদিগকে ও তাঁহাদিগের নিকট যে সমস্ত আধ্যাত্মিক সম্পত্তি পাইয়াছি তাহা স্মরণ করা। এইরূপ না করিলে তাঁহাদিগের সহিত যোগ রক্ষা করিবার অন্য উপায় নাই। এই জন্যই পিতৃ-যজ্ঞ গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। এই যজ্ঞ পিতৃ-পুরুষগণের সহিত এবং যিনি পিতৃগণের পিতা তাঁহার সহিত যোগসাধনের একটি প্রকৃষ্ট উপায়।

পঞ্চ মহাযজ্ঞের চতুর্থ যজ্ঞ—নৃযজ্ঞ; এই যজ্ঞ সাধনের উপায় অতিথি, অভ্যাগত



জন সাধারণ, আত্মীয় স্বজন ও দাস দাসীর সেবা। মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ যেমন অতি বিচিত্র, তেমনই পবিত্র ও মধুর। এই সম্বন্ধ মনুষ্যকে সহস্র বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে; এবং সহস্র প্রকারে মনুষ্যের কল্যাণ সাধন করিতেছে। এই কল্যাণের পরিমান চিন্তা করিতে গেলে আমাদের চিত্ত অভিভূত হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ মনুষ্যের নিকট মনুষ্যের ঋণ অপরিশোধনীয়; ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত নরনারীর সেবা করিতে পারিলে এই ঋণের কথঞ্চিৎ পরিশোধ হইতে পারে। এই জন্যই গৃহস্থের গৃহে নৃযজ্ঞের ব্যবস্থা। এই যজ্ঞসাধনও মানবজাতি ও মানবজাতির অধীশ্বরের সহিত যোগ সাধনের একটি মহৎ উপায়।

পঞ্চ মহাযজ্ঞের পঞ্চম যজ্ঞ—ভূত-যজ্ঞ। এই যজ্ঞসাধনের উপায় যাবতীয় উদ্ভিদ্ ও ইতর প্রাণীর সেবা ও যত্ন করা। তাহাদের নিকট আমরা কত ঋণে ঋণী। বৃক্ষের ফলমূল খাইয়া আমাদের শরীরের পুষ্টি হয়;—ফুল আমাদের নয়ন রঞ্জন করে,—বৃক্ষের ছায়ায় আমাদের তাপিত দেহ মন শীতল হয়, উদ্ভিদ্ রাজ্যের সৌন্দর্য্যে চিত্ত প্রফুল্ল হয় এবং বীজাঙ্কুর হইতে তাহাদের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করিলে আমাদের কত জ্ঞানলাভ হয়। এক কথায় বৃক্ষলতাদির সহিত আমাদের শরীর মনের অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। বৃক্ষলতাদিপরিশোভিত গ্রাম্য স্থান ও বৃক্ষলতাশূন্য নগর আমাদিগের শরীর মনের উপর কি বিভিন্ন ভাবে কার্য্য করে, তাহা সকলেই জানেন। ইতর প্রাণীগণের সহিতও আমাদিগের অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ! বাল্যে তাহাদের কেহ কেহ আমাদের স্তন্যদায়িনী জননী; পরিণত বয়সে কেহ কেহ আমাদের অন্নদায়িনী মাতা এবং কেহ কেহ বিশ্বস্ত ভৃত্য ও বন্ধু। ইতর প্রাণীগণের সহিত আমাদিগের এই যে পবিত্র সম্বন্ধ তাহার গুরুত্ব ও পবিত্রতা উপলব্ধি করিবার প্রকৃষ্ট উপায় তাহাদিগের যত্ন ও সেবা করা। ইতর প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌গণের এই যত্ন ও সেবাই ভূত-যজ্ঞ। ইহাদ্বারা সর্ব্বভূতের সহিত যে শুধু আমাদের যোগ স্থাপিত হয়, তাহা নহে,—সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান যে ভগবান তাঁহারও সহিত যোগযুক্ত হইবার ইহা একটি প্রকৃষ্ট উপায়।

হিন্দু শাস্ত্রোক্ত এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের মূলতত্ত্ব আলোচনা করিলেই বুঝা যায় যে হিন্দু বিবাহের মূল আদর্শ—একত্ব। কেবল স্বামী স্ত্রীর একত্ব নহে। বিবাহের

পর স্বজনবর্গ হইতে পৃথক হইয়া একটি স্বতন্ত্র পরিবারে কেবল স্বীয় পুত্র কন্যা লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করা কস্মিন কালেও হিন্দু বিবাহের আদর্শ বলিয়া গৃহীত হয় নাই। হিন্দু বিবাহ একটি পবিত্র কার্য্য। এই বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য একত্ব স্থাপন, যোগ স্থাপন। প্রথমতঃ দম্পতির হৃদয়ের যোগ—"তোমার যে হৃদয় তাহা আমার হউক, আমার যে হৃদয় তাহা তোমার হউক"—বিবাহ কালে দম্পতির এই প্রতিজ্ঞা হিন্দু শাস্ত্রেরই উক্তি। তারপর পিতৃপুরুষ, আত্মীয়স্বজন, দাসদাসী অতিথিঅভ্যাগত, দরিদ্রভিক্ষুক, জনসাধারণের সহিত যোগ। তৎসঙ্গে যাঁহারা মানব জাতির চিরপূজ্য সেই সাধু ঋষিগণের সহিত যোগ। কেবল তাহাই নহে ইতর প্রাণী ও উদ্ভিদ রাজ্যের সহিত যোগ; এবং এই সর্ব্ববিধ যোগের সহিত সাক্ষাৎ যোগ।

এই যে উচ্চ ও মহৎ আদর্শ, সমস্ত জগতের সহিত একত্ব স্থাপনের এই যে ইচ্ছা ও চেষ্টা, ইহা হইতে আমরা ক্রমেই বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছি। এই যে পঞ্চ মহাযজ্ঞ, যাহা সাধন না করিলে হিন্দু বিবাহ ও হিন্দু জীবন সম্পূর্ণ হইত না, তাহা আর আমাদিগের মধ্যে নাই। ইহার গুরুত্ব ও পবিত্রতা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা আমরা ক্রমেই হারাইয়া ফেলিতেছি।

ভারতের গৃহে গৃহে ভগবান এই আদর্শের পুনরুদ্ধার করুন।

শ্রীমতী ঊর্ম্মিলা দেবী

—:০:—

# আপনার ও পর।

—:০:—

সরলা মা বাপের বড় আদরের মেয়ে। বৃদ্ধ কৃষ্ণকমল মেয়েকে একদণ্ড চক্ষের আড়াল করিতে পারেন না,—কেমন করিয়া মেয়েকে পরের ঘরে পাঠাইবেন তাহাই ভাবিয়া অধীর।

মেয়ে বড় হইয়া পড়িয়াছে—আর তাহার বিবাহ না দেওয়া ভাল দেখায় না। সকলে পাত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিল।



সরলার বিবাহ হইল। পিতা মাতা অশ্রু মুছিতে মুছিতে অঞ্চলের ধন কন্যাটিকে একটি অপরিচিত যুবকের হাতে সমর্পণ করিলেন। বৃদ্ধের ঘর আঁধার বোধ হইল, মায়ের একমাত্র স্নেহের ধন পরের জিনিষ হইয়া গেল।

বিবাহের পর মেয়ে যখন বাপের বাড়ী আসিল, তখন তাহার বোধ হইল যেন সে মায়ের সেই আদরের মেয়ে নয়, যেন মায়ের ও তাহার মধ্যে একটা অদৃশ্য ব্যবধান তাহাদের অজ্ঞাতসারে আসিয়া পড়িয়াছে; মেয়ে হাসিল—কিন্তু পূর্ব্বের মত কাছে ছুটিয়া আসিল না; মাও মেয়েকে দেখিয়া হাসিল,—কিন্তু ছুটিয়া গিয়া তাহাকে কোলে তুলিল না—যেন কত কালের অবিশ্রাম গতিতে তাহাদের স্নেহের ডোরটি শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। বৃদ্ধ কৃষ্ণকমল একবার মেয়ের কাছে আসিলেন—দুটি একটি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। পূর্ব্বের সেই স্নেহের আবেগ দেখা গেল না, কন্যাও আর ছুটিয়া গিয়া বাপের গলা জড়াইয়া ধরিল না।

কৃষ্ণকমল এতকাল পায়ের উপর পা দিয়া কাটাইয়াছেন, মায়ের অতুল সম্পত্তি, তাই ছেলেকে অন্নের জন্য কখনো ভাবিতে হয় নাই। কৃষ্ণকমলের বৃদ্ধা মায়ের পা আর মাটীতে পড়ে না—এত তাঁর অহঙ্কার। এই সময় হঠাৎ একটা মোকদ্দমায় হারিয়া কৃষ্ণকমল অনেক অর্থ ধ্বংস করিলেন। বৃদ্ধা জ্বলিয়া উঠিল। সেইদিন হইতে কৃষ্ণকমলের ভাবনার বৃদ্ধি হইল। মা যদি রাগিয়া সমস্ত বিষয়সম্পত্তি হইতে তাহাকে বঞ্চিত করেন, তাহা হইলে কি গতি হইবে!

সরলা শ্বশুর বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। যখন তাহার বাপের মানসিক অবস্থা বড়ই খারাপ, যখন তাহার মাও নানা দুশ্চিন্তায় পীড়িত, সেই সময় সে একবার বাপের বাড়ী আসিতে চাহিল। মা বলিলেন "এখন থাক্—অনেক যন্ত্রনা ভুগ্‌ছি, এখন তো'কে যত্ন কোর্‌তে পার্‌বো না"

মানুষ আপনাকে লইয়া যত ব্যস্ত হইতে পারে, পরকে লইয়া ততটা ব্যস্ত হইতে পারে না। পুত্রই হোক, আর কন্যাই হোক আপনার চিন্তা সকলের চেয়ে গুরুতর।

সরলা এবার যখন বাপের বাড়ী আসিল, তখন আর কাহারো তেমন আগ্রহ দেখিল না। সে বেশ বুঝিল—সে বাপ মা আর নাই, তাহারা এখন পর হইয়া গিয়াছে, সেও আজ বাপমায়ের কাছে পর।

জগতে আপনারই বা কে, আর পরই বা কে! আজ যে আপনার, কাল সে পর। আজ যে পর, কাল সে আপনার। জগতে একটা অশ্রান্ত পরিবর্ত্তনচক্রের ঘূর্ণন ভিন্ন আর কিছু কি নাই!

চেতন জগতে "আপনার" ও "পর" এই দুটি কথা অত্যন্ত প্রচলিত। কিন্তু ইহাদের অপপ্রয়োগ চেতন জগতে যত বেশী, তত বোধ হয় আর কোথাও হয় না। সে আপনার ছিল, এখন যদি সে পর হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে 'আপনার' বলা কখনই উচিত নয়। যে আপনার, সে ত পর হইতে পারে না, যাহার সহিত এক হইয়া গিয়াছি, যে আমার প্রাণে প্রাণে মিশিয়াছে, সে কখনো ভিন্ন হইতে পারে কি? যদি সে ভিন্ন হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সে এতকাল "আপনার" ছিল না, "আপনার" বলিয়া বোধ হইতেছিল।

জগতে তাহা হইলে আপনার কে? অনেকে বলিবেন "আমি আপনার, আর কেহ আপনার নাই"। কিন্তু একটু বুঝিয়া দেখিলে এ কথারও কোনো সার্থকতা দেখা যায় না।

শিশু যাহা লইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, তাহাই তাহার স্বত্ব এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। একটি ক্রোধী লোককে দেখিয়া আমরা বলিতে পারি না ক্রোধ ইহার "স্বত্বের" অন্তর্গত। নানা কারণ বশতঃ সে ক্রোধী হইয়া পড়িয়াছে। তাহার পূর্ব্বপুরুষ ক্রোধী ছিল বলিয়া হয়ত সে-ও ক্রোধী হইয়াছে।

পূর্ব্বপুরুষের দোষগুণের উপর যখন পুত্রের দোষগুণ নির্ভর করিবার সম্ভাবনা থাকে তখন বুঝিতে হইবে জন্মের বহুপূর্ব্ব হইতেই তাহার স্বত্বের বিকৃতির সম্ভাবনা; তাহা হইলে শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন আর কেমন করিয়া বলিব সে নিশ্চয়ই তাহার স্বত্ব লইয়া আসিয়াছে।

আমরা ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই আপনার কাছেও পর হইয়া যাই। আমরাই যদি আপনার পর হইলাম তাহা হইলে "আপনার" ও "পর" এই কথা দুটি কি রূপ অর্থহীন হইয়া পড়ে।

আমরা যখনই ভূমিষ্ঠ হইয়াছি, তখনই আমাদের স্বত্বের উপর একখানা পরদা আসিয়া পড়িয়াছে। তার পর বাহ্যজগতের ছায়াপাতে সেই পরদাখানি আরো, নিবিড় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন আমরা আর বড় স্বত্বের সহিত সংস্রব রাখিতে পারিনা, আমরা এখন পর হইয়া গিয়াছি।



বিশ্ব পরের রাজত্ব; এখানে স্বত্বের চেয়ে পরত্বেরই প্রভাব বেশী। এক স্থান হইতে আসিয়া এক নীড় হইতে জন্মিয়া সহসা আমরা পরস্পরকে ভুলিয়া দিশেহারার মত যে যাহার পথপানে ছুটিয়াছি। পথে যাহার সহিত দেখা হয় তাহাকেই চিনি না, যখন আপনার স্বার্থের জন্য পরের সাহায্য আবশ্যক হয়, তখন একজন পরকে কাছে ডাকিয়া তাহাকে আপনার বলি, তারপর স্বার্থসাধন হইলে আর তাহাকে চিনিতে পারি না, সে পর হইয়া যায়। আপনার পথে যখন ছুটিয়া যাই, তখন বোধ হয়, সমস্ত জগত যেন সহস্র বাহু প্রসারিত করিয়া আমাকে বাধা দিতেছে, তখন আর জ্ঞান থাকে না, বিশ্ব যেন শত্রু হইয়া দাঁড়ায়, মানুষের উপর ঘৃণা আসে, পরত্ব আরো ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। আমি একপথে চলিয়াছি, অন্য সকলে আর একপথে চলিয়াছে, কাজেই মনে একটা ভিন্নতার ভাব থাকে। মাঝে মাঝে যখন দেখি, আর একজন ঠিক আমারই মত, আমারই পথে চলিয়াছে, তখন তাহাকে যত্ন করিয়া বলি "ভাই তুমি আমার আপনার," অনেক কথা বলিতে বলিতে দুইজনে অগ্রসর হই, তাহার পর পথের বাঁকে আসিয়া সে যখন নিজের পথে যাইবার জন্য আমার কাছে বিদায় প্রার্থনা করে, তখন আর তাহাকে কিছুই বলিতে পারি না, কিন্তু মনে মনে বলি "তোমাকে আপনার বোলে ভেবেছিলুম, কিন্তু তা হোলো না"

সকলেই আমরা পর। নিরন্তর পরত্বের ব্যাপ্তি। মানুষ আপনার লোক কেমন করিয়া পাইবে। তাইত এত কলহ, তাইত এত বিরোধ!

কিন্তু বিরোধ সৃষ্টির মূলে, একথা অস্বীকার করিলে চলিবে কি? সমস্ত বস্তু যখন একটা উপযোগীতা, একটা অনুভূত আদর্শের পানে ছুটিয়াছে, তখন তাহারা যে একেবারে বিরোধ হইতে মুক্ত থাকিবে, একথা বিশ্বাস করা কি চলে?

তবে এ বিরোধ স্বভাবের ধর্ম্ম, ইহার প্রতিকারের আবশ্যকতা নাই, কেননা ইহা জগতের উন্নতির কারণ, অবনতির নয়।

আমরা যে বিরোধ ঘটাইয়াছি, তাহারই কথা এখানে বলিব। নানারূপ ধরিয়া চারিদিকে আনুকূল্য খুঁজিতে খুঁজিতে আমরা এত ব্যস্ত হইয়াছি যে, আমাদের কাণ্ডজ্ঞান একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমরা চারিদিকে প্রতিবন্ধক গড়িয়া তুলিয়াছি—তাই চারিদিকে অসুবিধা অশান্তি আমাদের নিয়ত উৎপীড়িত করিয়া তুলিতেছে।

এই উৎপীড়ন, এই যন্ত্রনা জগতের সমস্ত লাবণ্যটুকু অপহরণ করিয়াছে। চিরকাল পরত্বকে প্রশ্রয় দিয়া আমরা কোথাও সুখের সামান্য কণাটি পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছি না।

আমরা আপনাকে ভাল করিয়া জানি না বলিয়াই হয়ত আমাদের সহিত অন্যের কিরূপ সম্বন্ধ তাহাও জানিতে পারি না; বিশ্বের মধ্যে আমার স্বত্ব কি, অন্যের সহিত বা আমার কি সম্বন্ধ এবং বিশ্বের সহিত আমাদের প্রকৃত বিরোধ কোন্ সময়, যদি তাহা বুঝিতে পারি, তাহা হইলে এ সমস্ত বিরোধের কোনো কারণ সম্ভবতঃ থাকিতে পারে না।

একটু বুঝিয়া দেখিলে সব গোলযোগ মিটিয়া যায়। জগতের সঙ্গে আমাদের কিরকম সম্পর্ক? কেন আমরা বৈরীভাবকে অন্তরে প্রশ্রয় দিই? জগতের সহিত বিরোধের কোনো কারণত দেখিতে পাই না। যখন বিশ্বজগত আপনার প্রকৃত স্বত্ব লইয়া সৃষ্টির তোরণদ্বারে আসিয়াছিল, ভাবী অস্তিত্বের স্বপ্ন যখন তাহার অঙ্গে অঙ্গে অস্পষ্ট কম্পনও আনিয়া দেয় নাই, তখন কি কেহ বলিয়াছিল "ওগো, তোমরা কোমর বাঁধ, তোমরা যে পরস্পর শত্রু?"

তারপর সহসা আমরা শত সহস্র জীবপদার্থ ভাবী অস্তিত্বকে আলিঙ্গন করিলাম, তখন হইতে বিরোধের সুরু হইল। তারপর স্বাভাবিক নিয়মের উপরেও আমরা কৃতিত্ব দেখাইতে লাগিলাম।

বড় হইলাম, নিজের স্বার্থ বুঝিলাম; ইহাতেও নিশ্চিত নই, প্রকৃতিকে হার মানাইলাম, যাহা অপ্রাকৃতিক তাহাতে মুগ্ধ হইলাম; বাপের কাছে হইলাম বিনয়ী শান্ত ছেলে, ছেলের কাছে হইলাম স্নেহময় গম্ভীর পিতা, স্ত্রীর কাছে হইলাম প্রেমিক যুবা, বন্ধুর কাছে হইলাম প্রকৃত রসিক; নানা মূর্ত্তি ধরিয়া একবারও প্রকৃত স্বত্ব প্রকাশ করিবার অবসর পাইলাম না।



এই রকমে নিজের গড়া বাধাবিপত্তি যখন চারিদিক হইতে আকুল করিয়া তুলে, তখন আমরা তাহার প্রতিকার করিতে চেষ্টা করি। বিরোধ হইতেই আমাদের বিপদের উৎপত্তি জানিয়া আমরা সেই বিরোধের প্রতি কখনো কখনো তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করি।

আমরা একটা পথ ধরিয়া অনেক দূর চলিয়া আসিয়াছি, এখন আর ফেরা চলে না,—আপনাকে খুঁজিবার জন্য এতটা পথ আবার অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বের সীমায় আসা অসম্ভব বলিলেও বেশী বলা হয় না। শুধু সেই সীমা নয়, আমাদের আরো পিছনে যাইতে হইবে।

এ যাত্রা পায়ে হাঁটিলে শেষ হইবে না, আমাদের অন্য উপায় খুঁজিতে হইবে। শরীরের দ্বারা সকল কাজ শেষ করা যায় না, আমাদিগকে মনের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে।

এই মনই আমাদিগকে পথের পূর্ব্বপ্রান্তে টানিয়া আনিবে। তারপর সেই স্থান ছাড়াইয়া আরো পিছনে আরো একটি নিভৃত জায়গায় আমাদের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিবে, যেখানে পৃথিবীর দীপ্ত আলো আমাদের নয়ন ঝলসিয়া দিবে না।

সেই নিভৃতে আপনাকে লইয়া আমরা কি জড় জগতে, কি চেতন জগতে, প্রতি বস্তুতে, প্রতি বিষয়ে, বিলীন থাকিতে পারিব। অনুপরমাণুর সূক্ষ্মতা, গিরিশৃঙ্গের মহত্ত্ব সকলই সমানভাবে আমাদের অন্তরে তীব্র পুলক জাগাইয়া তুলিবে।

এ যে কেবল একটা কাল্পনিক কথা তাহা নয়। এমন এক একটা সময় আসে যখন আমাদের মন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অনন্তে বিলীন হইতে চায়,—একটা সীমাহীন সুদূর স্বপ্নরাজ্যে যেন কি এক নীরব গুঞ্জনের আভাষ পাইয়া আমরা একবার সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া দ্রুত ছুটিতে চেষ্টা করি। এমন এক একটা সময় আসে, যখন আত্মসমর্পণ বড় সোজা হইয়া পড়ে, সামান্য বৃক্ষ পত্রের মর্ম্মরে, পুষ্পকেশরের মৃদু শিহরণ টুকুতেও প্রাণে একটা ভাষাহীন কথা জাগিয়া উঠে—যেন কত যুগ-যুগান্তের নীরব ব্যাকুলতা প্রাণে একটা দীপ্তরেখা টানিয়া দেয়।

আমাদের বর্ত্তমান স্বত্ব যখন এইরূপে হারাইয়া যায়, তখন আমাদের প্রকৃত

স্বত্বের স্থির অচঞ্চল স্নিগ্ধ আভা প্রকাশিত হয়। যখন আপনাকে দেখা যায়, তখন আর পর বলিয়া কেহ থাকে না, বিশ্বের সমগ্র পরত্ব স্বত্বে বিলীন হইতে থাকে। তখন পৃথিবীর সামান্য বালুকণাটি পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ পাতাইয়া বসে। আপনাকে আপনার করিয়া সমস্ত জীব পদার্থের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিয়া তখন আমরা বলিতে পারি "Creation's heir, the world—the world is mine".

শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ

# ডাক্তার।

—অভীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী

( গল্প )

ডাক্তার অরুণপ্রকাশ মিত্র, হরিশপুরে প্র্যাক্‌টিস্ করেন। হরিশপুর কলিকাতা সহরের মত না হইলেও বেশ শ্রীসম্পন্ন গ্রাম, রাস্তা-ঘাট সুন্দর, পরিষ্কার ও পাকা। জমিদারদের অনেক গুলি গাড়ি ঘোড়া আছে, অরুণপ্রকাশও গাড়ি রাখিয়াছেন। গ্রামে আর একজন ডাক্তার আছেন,—কানাই ডাক্তার। তিনি নেটিভ্ ডাক্তার এবং প্রাচীন। ডাক্তার অরুণপ্রকাশ তরুণ হইলেও বৃদ্ধ কানাইয়ের অন্ন মারিবার যোগাড় করিয়া তুলিয়াছেন। তবে গ্রামের লোক অধিকাংশই বড় দরিদ্র তাহারা চারি টাকা ভিজিট দিয়া ডাক্তার অরুণকে ডাকিতে পারে না। কখন এক টাকা, কখন বা কিছু না দিয়া শুধু কাঁদিয়া কাটিয়া তাহারা কানাই ডাক্তারকে সময়ে অসময়ে ডাকিয়া লইয়া যায়; তাই কানাইয়েরও একরকম করিয়া চলিয়া যায়।

আজ ডাক্তার অরুণপ্রকাশের সম্মুখে একটি প্রাচীন ব্রাহ্মণ করযোড়ে কাকুতি মিনতি করিতেছে।

"দোহাই তোমার ডাক্তারবাবু, একবারটি এস; আমার নাতিটিকে দেখিতে হইবে। কাল রাত্রি হইতে 'খোকা' ভুল বকিতেছে। কানাই ডাক্তার গাঁয়ে নাই—একবারটি এস ডাক্তার বাবু—আমি বড় গরিব—কিছু দিতে পারিব না বাবা, এই দয়াটুকু তোমাকে করিতে হইবে।" বলিয়া বৃদ্ধ শুষ্ক মুখে ডাক্তার বাবুর মুখের দিকে—আকুল ভাবে উত্তরের প্রত্যাশায় চাহিয়া রহিল।



ডাক্তারবাবু অর্দ্ধদগ্ধ চুরুট মুখ হইতে নামাইয়া আঙ্গুলের টোকা দিয়া তাহার ছাই ঝাড়িয়া ফেলিলেন; অবশ্য তাহা বৃদ্ধের গায়েও কিঞ্চিৎ উড়িয়া পড়িল মুখে একটু বিনয়ের ভাব আনিতে চেষ্টা করিয়া কহিলেন—"জানেন কি—আমার যাইতে বিশেষ কোন আপত্তি ছিল না, তবে কি আমার শরীরটা কাল হইতে তত সুবিধা বোধ কচ্ছি না; আজ ডাকে বেরোব কিনা এখনও ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই।" মাপ করুন। বলিয়া পুনশ্চ চুরুট মুখে লইলেন।

বৃদ্ধ তাহার শেষ চেষ্টা সংগ্রহ পূর্ব্বক ব্যগ্রকণ্ঠে কহিল "বাবা, বেশী দূর নয়, রায় পাড়া আর কতটুকু পথ! পাঁচ মিনিটের পথ নয়, একবার এস বাবা, ভগবান তোমার ভাল করিবেন। বাড়ীতে লোক নাই—এতক্ষণ কি হইতেছে কে জানে?" এবারে বৃদ্ধের স্বর ভাঙ্গিয়া আসিল। যোড় হাতে কহিল "বাবা আর দেরি করিও না, এ বিপদে আজিকার মত রক্ষা কর," বলিতে বলিতে বৃদ্ধের নয়ন ফাটিয়া তিন চারি ফোঁটা অশ্রু ভূমিতে পড়িল। অরুণপ্রকাশ তাহা লক্ষ্য করিয়াও যেন দেখিলেন না। ডাক্তার বাবু কোন কথা কহিলেন না। কি জানি কি ভাবিয়া বৃদ্ধও আর তিলার্দ্ধ অপেক্ষা না করিয়া ফিরিয়া চলিল। সেই সময় ডাক্তারবাবু একটু খানি কৃত্রিম বিষাদের স্বরে বলিলেন—'তাইতো,' ব্রাহ্মণ তাহা শুনিতে পাইল কি না জানি না।

তিনি ত্বরিতপদে গৃহে ফিরিলেন এবং দরজার বাহির হইতেই জিজ্ঞাসা করিলেন "খবর কি মা? খোকা কেমন আছে?"

গৃহমধ্য হইতে একটি স্ত্রীলোক আর্দ্রকণ্ঠে উত্তর দিল—"চুপ কর, আস্তে; অনেক কষ্টে এইবার একটু ঘুমাইবার মত করিয়াছে।" বৃদ্ধ তাঁহার মনের ভয়ানক আশঙ্কাটি একটী দীর্ঘনিশ্বাসে কতক বাহির করিয়া দিয়া নম্রকণ্ঠে একবার দুর্গার নাম লইলেন এবং অনুচ্চস্বরে কহিলেন কিরণ গিয়াছে—একটু দুধ দেখিতে?

রমণী ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন—গিয়াছে।

বৃদ্ধ আবার যেন একটু আশ্বস্ত হইলেন ও ঘরের বাহিরে আসিয়া তামাকের আয়োজন করিতে লাগিলেন, তাহাতেই যদি শান্তির কিছু সহায়তা করে!

ব্রাহ্মণ তামাক খাইতে খাইতে ভাবিতে লাগিলেন, শশীর বাড়ী পৌঁছিতে রাত্রি হইবে। একবার ভাবিলেন—চিঠি তাহার হাতে পড়িয়াছে ত? সে যদি

বিলাসপুরে না থাকে? কোথায় আর যাবে? বৃদ্ধ যেন আর ভাবিতে পারিলেন না, ভয়ে ঘন ঘন তামাক টানিতে লাগিলেন।

২

বৃদ্ধের নাম ভবকিঙ্কর। তাঁহার দুই কন্যা ও এক পুত্র। কন্যা দুইটিরই দূরে বিবাহ হইয়াছে—তাহারা শ্বশুরগৃহে আছে। পুত্র শশিশেখর গ্রাম হইতে বার ক্রোশ দূরে বিলাসপুরে সাহেবদের রেশমকুঠিতে আমিনী করে। ছমাস আড়াই মাস পর দশ বার দিনের জন্য বাড়ীতে আসে। তাহার ইচ্ছা সকলকে লইয়া গিয়া চাকুরীস্থলেই কোন রকমে থাকিবে। কিন্তু তাহার বেতন অতি সামান্য নয় টাকা মাত্র, তথায় খরচ পত্রও কিছু বেশী পড়ে; এখানেই প্রতি মাসে কুলাইয়া উঠে না। তবে এখানে দু বিঘা জমি ও একটু বাগান আছে—তাহাতেই কোন রকমে চলিয়া যায়। আরও এখানে যাহোক দুইখানি ঘর আছে, সেখানে তাহাও ত নূতন করিয়া করিতে হইবে। সেও খরচের ব্যাপার আর সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর আপত্তি বৃদ্ধের। তিনি পৈতৃকভিটা ত্যাগ করিয়া কোনমতেই যাইতে চাহেন না। বলিলে বলেন—"আমার বাপু আর কদিন? আমার এখানে যাহোক বন্দোবস্ত একটা করেকর্ম্মে তোরা সেখানে গিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিস্।

পুত্রবধূ অমলা, শ্বশুরকে রাঁধিয়া দিবার জন্য বাড়ীতেই থাকেন। কন্যা কিরণ তিন বৎসরের খোকাটি এবং প্রাচীন শ্বশুর এই তিনটিকে তাঁহাকে দেখিতে হয়।

এই ক্ষুদ্র দরিদ্র পরিবারে আর আছে একটি অনেক দিনের পুরাতন চাকর সনাতন।

বৃদ্ধ পূর্ব্বদিন সনাতনকে দিয়া পুত্রের কাছে পত্র পাঠাইয়া বসিয়া আছেন। সেও এখন পর্য্যন্ত ফিরে নাই।

৩

কলিকাতা ও মফঃস্বলে অনেক সময়ে আমার প্রতীচ্য ও প্রাচ্য বলিয়া মনে হয়। কলিকাতার কর্ম্মকল্লোল এবং কলিকাতার জীবন, ইহার বহির্মুখীন প্রতিভা বাহ্য চাকচিক্য ও শোভা, ইহার শিক্ষা ও সাধনা, ইহার দোকানদারী এবং



শূন্যগর্ভতা সবই আমার প্রতীচ্যের প্রতিভার মত বোধ হয়। পক্ষান্তরে—ইহাও মনে হয় যে, মফঃস্বলের বিরল স্তব্ধতা এবং শান্তভাব, ইহার অন্তর্মুখীন প্রতিভা, সহজ সরলতা, ইহার শিক্ষা ও সাধনা ইহার অভাব, আন্তরিকতা এবং আড়ম্বর বিহীনতা প্রাচ্য প্রতিভার সহিত তুলনীয়।

আমাদের অরুণপ্রকাশ এই ঐশ্বর্য্যময়ী কলিকাতার ছেলে এবং তাঁহার তরুণী স্ত্রী অমলা এই শান্তি পরিপূর্ণ মফঃস্বলের মেয়ে।

বিবাহের কয়েক বৎসর পরই অরুণপ্রকাশ ডাক্তারি পাশ করিয়া শ্বশুরবাড়ী হরিশপুরেই Practice আরম্ভ করেন। প্রথম প্রথম তিনি শ্বশুরের বাড়ীতেই ডিস্পেন্সারি করিয়া বসেন। কিন্তু শ্বশুর সেকেলে লোক; জামাতার সাহেবি আনা মোটেই স্নেহের চোখে দেখিতে পারিতেন না। অরুণ যে তাহা না বুঝিতে পারিতেন তাহা নহে, তবুও তাহা এমন কিছু গুরুতর নহে যাহাতে প্রকাশ্য কোন মনোমালিন্য ঘটিত। মাঝে আর একটা কি কারণ ঘটিয়াছিল, ঠিক জানি না; তবে শুনিয়াছি স্ত্রীকে কোনও অখাদ্য খাওয়াইবার জন্য শ্বশুর নাকি তাঁকে কি বলিয়াছিলেন; তাতেই নাকি তিনি শ্বশুরের বাড়ী ত্যাগ করিয়া আসেন। অরুণের স্ত্রী পিত্রালয় ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে স্বামীকে বিস্তর বুঝাইয়াছিলেন,—"শ্বশুর পিতৃস্থানীয়, তাঁর কথায় কি রাগ করিতে আছে; তিনি বুড়া হইয়াছেন, কি বলিতে কি বলেন তাতে তোমার মত জ্ঞানী লোকের অভিমান করা অন্যায়"। কিন্তু অরুণপ্রকাশ সে স্তোতকে মোটেই কাণ দিল না! এদিকে চার পাঁচ বৎসরে একটু পসার ও প্রতিপত্তি হইতেছে; সুতরাং স্থানত্যাগ একেবারে যুক্তিযুক্ত না ভাবিয়া তিনি গ্রামেই আর একটা বাড়ী লইয়া তাহাতে বাস করিতেছেন।

অরুণের মেজাজ কিছু সাহেবী ধরণের তিনি খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে বাধাবিপত্তি হীন, ধর্ম্মকর্ম্ম সম্বন্ধে নাস্তিক, পোষাক পরিচ্ছদ তাঁহার যথাসম্ভব বিলাতি ধরণের, কলার টাই, হ্যাট, বুট, খাটোচুল এবং গোঁফদাড়ী কামানর একান্ত ভক্ত। স্ত্রী অমলা কিন্তু তাহার ঠিক বিপরীত। সে পল্লীরমণী, সুলভ লজ্জাশীলা এবং মৌন-মাধুর্য্যে মণ্ডিতা, গৃহকর্ম্মনিপুণা এবং স্নেহময়ী। অরুণ এত চেষ্টা করিয়াও তাহাকে শিক্ষিতা করিতে পারিতেছেন না; কিন্তু তাই বলিয়া সে তাহার অনুরক্ত কম নহে।

৬

অবশ্য ডাক্তার বাবু ডাকে বাহির হইবেন কি না স্থির করিতে না পারিলেও যথাসময়ে সাহেব সাজিয়া বাড়ীর বাহির হইলেন এবং বাড়ী ফিরিতে রোজ যেমন রাত্রি হয় সে দিনও তেমনি রাত্রি করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। ঘরে ঢুকচেন; দেখেন—অমলার নিকট একটী স্ত্রীলোক বসিয়া তাহার পা ধরিয়া কাঁদিতেছে। অমলার নয়ন যে শুষ্ক ছিল তাহা নহে। সেও মৃদু মধুর সান্ত্বনা বাক্যে তাহাকে যেন কি বুঝাইতেছে, দেখিয়া আর তিনি সে ঘরে না গিয়া গৃহান্তরে পোষাক ছাড়িতে গেলেন।

এদিকে অমলা শোকাতুরা রমণীকে আশ্বাস দিয় কহিলেন,—"তুমি বাছা বাড়ী যাও আমি যেমন করিয়া হোক উহাঁকে পাঠাইয়া দিতেছি। বাড়ীতে কেহ নাই তুমি ফিরিয়া যাও, তোমার মল ফিরাইয়া লইয়া যাও, উহাতে রোগীর ঔষধ পথ্যাদি সংগ্রহ করিও। যাও বাছা, আমি তাঁহাকে এখনি পাঠাইয়া দিতেছি। আর এই পাঁচটি টাকা ধর, দেখিতেছি তোমার হাতে টাকা নাই, এই রাত্রিতে কোথায় মল বাঁধা দিবে বা টাকা সংগ্রহ করিবে।" অবগুণ্ঠনবতী আবার তাঁহাকে মিনতি করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বিদায় হইলেন ও বলিয়া গেলেন,—"এ উপকার জীবনে ভুলিব না। ভগবতী যেন শীঘ্র তোমাকে পুত্রের মা করেন।"

অমলা আসিয়া স্বামীকে কহিল,—"তোমাকে যাইতেই হইবে।"

ডাক্তার বাবু ঈষৎ হাসিয়া শুধাইলেন,—"কোথায়?"

অমলা তাহাতে মনোযোগ না দিয়া কহিল,—"আচ্ছা বেচারীর ছেলেটি যায় যায়, স্বামীকে খবর দেওয়া হইয়াছে, এখনও বাড়ী আসেন নাই। তার শ্বশুর নাকি আসিয়া তোমার কাছে কাঁদাকাটা করিয়া গিয়াছেন, তুমি যাইতে পারিবে না বলিয়াছ কেন? তোমরা কি পাথরের মানুষ, একটু দয়ামায়া নাই। নাই বা দিতে পারিল ভিজিট; একজনের নিকট ভিজিট না লইলে কি কাঙ্গাল হবে?"

ডাক্তার বাবু একটু বিরক্ত হইয়া কহিলেন,—"তোমাকে উকিল দিয়াছে দেখিতেছি; কোথায় যাইতে হইবে না হইবে আমি যথেষ্ট বুঝি। পয়সা দিবে যারা, তারা কাজ পাইবে না। যারা—"অমলা বাধা দিয়া কহিল,—"আহা! ছেলেটি যে যায় যায়, আর সেত দুই গাছি মল রাখিয়া গিয়াছে। তাহাতে কি তোমার ভিজিটের টাকা কুলাইবে না? যাও না একবার তুমি?



"কই দেখি?"—বলিয়া অরুণ চুরুট ধরাইলেন এবং কোচের উপর শুইয়া পড়িলেন।

অমলা বলিল—"তাহা তাহাকে ফিরাইয়া দিয়াছি ভিজিটের টাকা, আমি দিব" বলিতে বলিতে অমলার নয়ন হইতে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। অমলা বলিল,—"শুইলে যে?"

অরুণ পূর্ব্ব হইতেই একটু বিরক্ত হইয়াছিল। ক্লান্ত হইয়া একটু শুইবার চেষ্টা করিতেছে, ইহাতে স্ত্রীর বাধা এবং উপেক্ষা তাহাকে নিতান্ত বিরক্ত করিয়া তুলিল। তিনি কহিলেন,—"পুনরায় আমাকে আর বিরক্ত করিও না বলিতেছি! কোথায় যাইতে হইবে না হইবে আমি তাহা বেশ জানি; Professionএ ওরূপ করিতে গেলে চলে না, সংসারে কত গরীব আছে এবং তাহারা সর্ব্বদাই ঐরূপ সাহায্যের প্রার্থী, তাহাদিগের কথা শুনিতে গেলে—কোনরূপেই চলিতে পারে না।" ইত্যাদি নানা প্রকার অদ্ভুত যুক্তিতর্কের দ্বারা অমনি দশ মিনিট বক্তৃতা করিয়া গেলেন, অমলা আর কিছু বলিতে সাহস করিল না, সে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া শুইয়া পড়িল। সে রাত্রে স্বামী স্ত্রীতে আর কোনও কথা হইল না। একটা মৌন বিষাদের ধ্বনি অন্ধকার গৃহে সমস্ত রাত্রি গম গম করিতে লাগিল। অমলার নিদ্রা হইল না, সে সারারাত্রিকাল কাণ খাড়া করিয়া রহিল—প্রতিমুহূর্ত্তেই যেন সেই বিপন্নার কাতর আহ্বান বাতাসে প্রতিধ্বনিত হইতেছে মনে হইল।

শেষ রাত্রে ডাক্তারের বাড়ীর দরজায় ভয়ানক আঘাতের শব্দে বাড়ীর লোকের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বেহারা দরজা খুলিতে না খুলিতেই বৃদ্ধ ভবকিঙ্কর মৃত খোকাকে কোলে করিয়া চীৎকার করিতে করিতে উপরে উঠিয়া গেল এবং ডাক্তারের পায়ের কাছে আছাড় খাইয়া পড়িল। কপালে করাঘাত করিতে করিতে বৃদ্ধ বলিতে লাগিল,—"কি করিলে, তুমি আমার খোকাকে মারিয়া ফেলিলে?" পরিতাপের বিষয় শিশুর প্রাণ তখন বাহির হইয়া গিয়াছে, তবুও বৃদ্ধ একেবারে আশা ছাড়িয়া দিতে পারে নাই। সে সন্দেহজনিত স্বরে কহিল,—"ডাক্তার কর কি? আর বিলম্ব করিও না, একবার দেখ খোকা কি নাই?" ডাক্তার তুমিও ত আমাদের মত মানুষ! তোমার কি দয়ামায়া নাই?

ডাক্তার বাবু আর কোনও কথা কহিতে পারিল না। সম্মুখে অপর ব্যক্তির

মাথায় বজ্র পড়িতে দেখিলে মানুষ যেরূপ স্তম্ভিত হয়; ডাক্তারও সেইরূপ হইলেন। বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন যে, আর হাত দেখিয়া কোনও ফল নাই। তবুও বৃদ্ধের অনুযোগ উপেক্ষা করিতে আর কিছুতেই সাহসী হইলেন না। তিনি কম্পিত হস্তে হাত দেখিলেন এবং মৃদুস্বরে বলিলেন, "কিছু নাই।"

"ডাক্তার তুমি কি করিলে?" বলিয়া বৃদ্ধ আবার চীৎকার করিয়া উঠিল।

অমলা সেই শোকাবহ ঘটনার ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া দ্বারপ্রান্তে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। ডাক্তারবাবু একেবারে বসিয়া পড়িলেন। নানাপ্রকার চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে ঘন ঘন কশাঘাত করিতে লাগিল।

বৃদ্ধ মৃতদেহ পুনরায় বুকে তুলিয়া লইয়া উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। সে চীৎকার যেন গৃহের চতুর্দ্দিকে ধ্বনিত হইতে লাগিল।

দীর্ঘকাল বাদে অমলার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল। বহুদিন কঠিন রোগে ভুগিয়া মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গেলে মানুষ যেমন ভাল করিয়া কথা কহিতে পারে না, অল্পেতেই ভয় পায় এবং সদাসর্ব্বদা পরের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকে, কেহ সামান্য কোনও বেদনার কথা কহিলে চক্ষুপ্রান্তে সহজেই অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে থাকে অমলার সেইরূপ হইল। সে যেন, কি এক রকম হইয়া গেল।

ডাক্তার তাহাকে অহরহ কত সান্ত্বনা, কত শান্তি দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। এক দিনের একটী ভুল ডাক্তারের সমস্ত জীবনব্যাপী কণ্টক হইয়া রহিল। অমলা আর যেন পূর্ব্বের মত কথা কয় না, তাঁহার সাথে কথা কহিতে বা ব্যবহার করিতে ভয় করে।

অপুত্রক হইলেও তাহার মধ্যে যে স্নেহবতী জননী ছিল, সে যেন এই ঘটনাতে অন্তরের অন্তরতম হইতে এক গভীর আঘাত পাইয়াছিল, সে যেন জন্মের মত আপনাকে পুত্রহারা বলিয়া বোধ করিল এবং পুত্রশোকের সুকরুণ ব্যথা সাগ্নিকের অগ্নির ন্যায় অহোরাত্রি মর্ম্মে পুষিয়া রাখিয়া দিনের পর দিন, সে আপনার জীবন হইতে তিল তিল করিয়া তাহার ইন্ধন যোগাইতে লাগিল।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের অভিশাপাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল; ডাক্তারের জন্য কিন্তু তাহাতে পুড়িয়া ছাই হইতে লাগিল অমলা।



তবে ডাক্তারও সেই হইতে কিঞ্চিৎ দমিয়া গেলে, বিশেষতঃ অমলার ভাব দেখিয়া তিনি আপনার সুখশান্তি হারাইতে বসিলেন। তিনিও যেন নিজেকে অমলার নিকট মহা দোষী বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। অমলার সহিত পূর্ব্বের ন্যায় সাহস করিয়া বাক্যালাপ করিতে পারেন না এমন কি অনেক সময় তাহার বিমর্ষ চক্ষুর দিকেও ভাল করিয়া তাকাইতে পারেন না। কাহাকেও ভয়ানক পীড়া দিয়া এবং অপমানিত করিয়া তাহার নিকট মুখ দেখাইতে যেরূপ লজ্জা ও সঙ্কোচ বোধ হয়, ক্ষমা চাহিতেও সাহস হয় না, কুণ্ঠিত অরুণপ্রকাশের অনেকটা সেই প্রকার ভাব হইল।

এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ গ্রাম হইতে উঠিয়া গিয়াছে। শশিশেখর যখন গৃহে পৌঁছিয়াছিল, তখন সকল শেষ হইয়া গিয়াছে। পুত্রহীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ কয়েকদিন গৃহে থাকিয়া বৃদ্ধ পিতা এবং পরিবার লইয়া জন্মের মত হরিশপুর ত্যাগ করিয়া গেলেন।

৪

ইতিমধ্যে কোনো সাহেবের সুনজরে পড়িয়া ডাক্তার অরুণপ্রকাশ কলিকাতায় ক্যাম্বেলের অধ্যক্ষতার পদে নিযুক্ত হইলেন। সাহেব তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়া তাঁহাকে নানা প্রকারে সাহায্য করিতে লাগিলেন। অরুণের সাহেবী আনা এবং ইংরাজি কায়দা তাহাকে তাহার উন্নতির পথে তুলিয়া ধরিল। সে মনে মনে ভাবী অবস্থার স্বপ্ন দেখিতে লাগিল এবং সাহেবের ইচ্ছাক্রমে অনায়াসে তাহার পাঁচ বৎসরের পশার হইল, এবং তিনি হরিশপুর ত্যাগ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

এদিকে বাহিরে যতই তাহার সুখ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, গৃহে সেই পরিমাণে তাহার শান্তি কমিতে লাগিল। অমলা এবং তাহার মধ্যে যেন সেই দিন হইতে একটা অদৃশ্য পরদা পড়িয়া গিয়াছে, শত চেষ্টা করিয়াও সে তাহা সরাইয়া ফেলিতে পারিতেছে না। যত্ন মনোযোগ সত্ত্বেও অমলা যেন দিন দিন শুকাইয়া উঠিতে লাগিল।

অবশেষে পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত আসিল। সেইদিন, যেদিন সন্তান হইবার আশা করিয়া অমলা এক মৃত পুত্র প্রসব করিল এবং প্রসবের পরেই প্রবল-জ্বরে আক্রান্ত

হইল। তিন দিন, তিন রাত্রি অসহ্য যন্ত্রণায় ভুগিয়া পুত্রহীন জননী নিষ্কলঙ্কা অমলা প্রাণত্যাগ করিল। মরিবার পূর্ব্বরাত্রে, বিকারের ঘোরে একবার বলিয়াছিল,—"কি করিলে; তুমি আমার খোকাকে মারিয়া ফেলিলে।" আর কেহ এ কথার অর্থ বুঝিতে পারিল না। ডাক্তার মর্ম্মে মর্ম্মে তার অর্থ উপলব্ধি করিল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মর্ম্মের অব্যক্ত অভিশাপ অরুণের অন্তঃকরণে জ্বলন্ত অঙ্গার দিয়া আজ যে কলঙ্ক-চিহ্ন অঙ্কিত করিয়াছিল, তাহা আর এ জীবনে বুঝি মুছিল না।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী বি, এ।

---

# জ্যোতির্ম্মণ্ডল।

—০:*:০—

যাঁহাদের পুঞ্জতেজে দীপ্ত আজি বঙ্গের গগন,
চিত্রপট তাঁহাদেরি ঘটায়েছে একত্র মিলন।
মণ্ডলের মধ্যে রবি মহিমায় করেন বিরাজ,
সৌর জগতের সত্য সাহিত্য জগতে, দেখি আজ।
হ'য়ে আছে সপ্রমাণ! ঊর্দ্ধে তার নিস্পন্দ আলোক,
যুগযুগান্তর রাজা, আছেন রচিয়া ধ্রুব লোক;
আর্ষ-লোক পার্শ্বে তার,—তপঃক্লিষ্ট সপ্তর্ষি-মণ্ডল,—
স্তব্ধ, শান্ত, সুগম্ভীর পুরাতন জ্যোতিষ্কের দল,—
অক্ষয় সে জ্ঞান যোগী, কর্ম্ম যোগী বিদ্যার সাগর,
দূরতায় মন্দীভূত রশ্মি, তবু, স্পষ্ট, সুগোচর।
রবির দক্ষিণে ওই বঙ্কিম বঙ্গের বৃহস্পতি;
বামে মধু শুক্র গ্রহ;—বিতরিল যেই শুভ্র জ্যোতি
রবি উদয়ের (ও) আগে। নিম্নদেশে নীহারিকা-সেতু,
উল্কা আছে, গ্রহ আছে, আছে তারা, আছে ধূমকেতু।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

---

# মানসী।

জ্যোতির্ম্মণ্ডল।

*Printed by K. V. Seyne & Bros.*

# বিশু দাদা।

—:o:—

হুগলী-জেলার তীরে একখানি গণ্ডগ্রাম, তাহার প্রকৃত নাম গোপন করিয়া আমরা তাহাকে কল্যাণপুর নামে অভিহিত করিব। কল্যাণপুরে অনেক ভদ্র লোকের বাস; অবস্থাপন্ন লোকের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে; মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সংখ্যাই অধিক। গ্রামে একটা পোষ্ট আফিস আছে, একটা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে, একটা বালিকা বিদ্যালয়ও আছে।

এই গ্রামে নরেশচন্দ্র বসু নামে এক ভদ্রলোক বাস করিতেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন নরেশবাবু স্থানীয় ইংরাজী বিদ্যালয়ের তৃতীয় শিক্ষকের কার্য্য করিতেন; মাসিক বেতন ত্রিশ টাকা। কথাটা বলিয়া রাখা ভাল যে, পল্লীগ্রামের বিদ্যালয় সমূহে শিক্ষকদিগের নিকট হইতে ত্রিশ টাকার রসিদ লইয়া পঁচিশ টাকা প্রদান করিবার যে সনাতন নিয়ম আছে, কল্যাণপুর বিদ্যালয়ে সে নিয়ম প্রচলিত ছিল না,—নরেশবাবু ত্রিশ টাকা বেতনই পাইতেন। তিনি অনেক দিন হইতে এই থার্ড মাষ্টারী করিতেছিলেন; উন্নতির কোন সম্ভাবনাও ছিল না, নরেশবাবু তাহার জন্য বিশেষ চিন্তিতও ছিলেন না।

সংসারে লোক অধিক ছিল না; তিনি নিজে, তাঁহার স্ত্রী, একটী কন্যা ও একটী পুত্র। বেতন ত্রিশ টাকা হইলেও ভদ্রতা রক্ষার জন্য বাড়ীতে একজন চাকর রাখিতে হইয়াছিল, এই ভৃত্যটীর নাম বিশ্বনাথ,—জাতিতে কৈবর্ত্ত। এই বিশ্বনাথকে নরেশবাবুর কন্যা সুমতি ও পুত্র ভরেশচন্দ্র "বিশুদাদা" বলিয়া ডাকিত। বর্ত্তমান কালের নিয়ম অনুসারে পিতামহের বয়সী পুরাতন ভৃত্যকে নাম ধরিয়া ডাকিবার প্রথা তখনও প্রচলিত হয় নাই।

আমরা যে বৎসরের কথা বলিতেছি, তাহার পূর্ব্ব বৎসরে নরেশবাবু অবস্থাতিরিক্ত অর্থব্যয় করিয়া একমাত্র কন্যা সুমতির বিবাহ দিয়াছিলেন। এই বিবাহে তাঁহার প্রায় সাত আট শত টাকা ঋণগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। ত্রিশ টাকা বেতনের স্কুল মাষ্টার আর কি সঞ্চয় করিতে পারিবেন। নরেশবাবু ভাবিয়াছিলেন, কোন প্রকারে এ ঋণ শোধ হইবে, কন্যাদায় হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারিলে

তাঁহার আর কোনই দায় নাই। পুত্র ভবেশচন্দ্রের বয়স তখন তের বৎসর, কন্যা সুমতির বয়স চৌদ্দ বৎসর।

মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। নরেশবাবু মনে করিলেন কন্যাদায় হইতে তিনি অব্যাহতি লাভ করিলেন; কিন্তু নিয়তি কে খণ্ডন করিতে পারে। বিবাহের এক বৎসর পরেই সুমতি বিধবা হইল এবং চিরদিনের জন্য পিত্রালয়ে বাস করিতে আসিল,—তাহার শ্বশুর বাড়ীর অবস্থা ভাল ছিল না; নরেশবাবু কেবল ছেলেটী ভাল দেখিয়াই এত অর্থব্যয় করিয়া কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন।

নরেশবাবুর সুখের সংসারে এই প্রথম দুঃখ প্রবেশ করিল। তিনি বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি, কন্যার এই দশা দেখিয়া হৃদয়ে দারুণ বেদনা পাইলেন বটে, কিন্তু বাহিরে তাহা প্রকাশ করিলেন না। তাঁহার স্ত্রী কিন্তু এ শোক সহ্য করিতে পারিলেন না, কন্যার বৈধব্যের একমাস পরেই সাধ্বী পতি পুত্র কন্যা রাখিয়া অনন্তধামে চলিয়া গেলেন। নরেশবাবু পত্নীশোকও মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিলেন। বিশুদাদা কাঁদিয়া আকুল হইল।

বিশ্বনাথের এ সংসারে কেহই ছিল না। বাল্যকালে তাহার পিতামাতার মৃত্যু হইলে সে নরেশবাবুর বাড়ীতে আসে। নরেশবাবুর স্ত্রী তাহাকে আপনার সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতেন। বিশ্বনাথের বয়স যখন কুড়ি বৎসর হইল তখন নরেশবাবু তাহার বিবাহ দিতে চাহিলেন, পৃথক বাড়ী করিয়া দিতে চাহিলেন; কিন্তু বিশ্বনাথ তাহাতে সম্মত হইল না। বিশ্বনাথ বলিল "কাকা বাবু, আবার নূতন একটা সংসার পাতিব কেন? সুমতি ভবেশ বাঁচিয়া থাকুক, তাহাদের লইয়াই আমার সংসার। আমাকে বিবাহ করিতে বলিবেন না।" নরেশবাবু অনেক বুঝাইয়াছিলেন, কিন্তু বিশ্বনাথের প্রতিজ্ঞা অটল। সুমতি যে বৎসরে বিধবা হয় সে বৎসরে বিশ্বনাথের বয়স বত্রিশ বৎসর। বিশ্বনাথ নরেশবাবুর সংসারেরই একজন। সুমতি ও ভবেশ বিশ্বনাথকে সত্য সত্যই বড় ভাইয়ের মত ভাল বাসিত ও ভক্তি করিত; বিশ্বনাথ যে জাতিতে কৈবর্ত্ত—বিশ্বনাথ যে বাড়ীর চাকর, একথা তাহাদের মনে আসিত না।

তাহার পর তিন বৎসর চলিয়া গিয়াছে। নরেশবাবু স্কুলে যান, ছেলে পড়ান বাড়ীতে আসিয়া পুত্র ভবেশচন্দ্রের পড়া বলিয়া দেন। বিশ্বনাথ গৃহস্থালীর



কাজকর্ম্ম করে, যাহাতে দুই পয়সা সংস্থান হয় তাহার চেষ্টা করে। কিন্তু বিশ্বনাথের মনে সর্ব্বদাই এক ভয়। সে ভয় সুমতির জন্য।

সুমতির বয়স এখন অষ্টাদশ বৎসর। সুমতি সুন্দরী; যৌবনের সৌন্দর্য্য তাহার সমস্ত শরীর প্লাবিত করিয়া যেন উথলিয়া পড়িতেছে। সুমতি সংসারের কাজকর্ম্ম করে, পিতার সেবা করে, ভ্রাতার তত্ত্বাবধান করে,—আর অবসর সময়ে বসিয়া কি যেন ভাবে। বিশ্বনাথের দৃষ্টি সর্ব্বক্ষণ সুমতির উপর; সে একদণ্ড অন্য কোথাও গিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। সুমতির ব্যবহারে কোন প্রকার সন্দেহের কারণ না থাকিলেও বিশ্বনাথের সতর্ক দৃষ্টি সর্ব্বদা তাহার উপর থাকিত। কি জানি কেন, সে যেন সুমতির ঐ উদাস ভাবকে বড় সুলক্ষণ বলিয়া মনে করিত না।

সুমতি লেখাপড়া এক রকম শিখিয়াছিল; অবসর সময়ে সে যখন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত, আকাশ পাতাল কি ভাবিত, তখন বিশ্বনাথ ধীরে ধীরে তাহার নিকটে আসিয়া বসিত এবং তাহাকে রামায়ণ পড়িয়া শুনাইতে বলিত; কিন্তু সুমতি অনেক সময়েই "ওসব ভাল লাগে না," বলিয়া অন্য কথা আরম্ভ করিত। বিশ্বনাথ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া যাইত।

এই বৎসর ভবেশ প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবে। নরেশবাবু দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া ভবেশকে এই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করিতেছেন। ভবেশও ভাল ছেলে, সে পড়াশুনায় কখনও অমনোযোগ করে নাই। পরীক্ষার দিন ক্রমেই নিকট হইল। ভবেশ বলিল "বাবা, আপনি আমার সঙ্গে হুগলী চলুন।" নরেশবাবু প্রথমে মনে করিয়াছিলেন বিশ্বনাথকেই ভবেশের সঙ্গে দিবেন, কিন্তু ভবেশের কথা শুনিয়া তিনি নিজেই হুগলী যাওয়া স্থির করিলেন। পরীক্ষার দুই দিন পূর্ব্বে তিনি ভবেশকে সঙ্গে লইয়া হুগলী চলিয়া গেলেন। বাড়ীতে সুমতি ও বিশ্বনাথ রহিল; বিশ্বনাথের উপর নির্ভর করিয়া নরেশবাবু চলিয়া গেলেন।

কিসে কি হয় তাহা আমরা কেমন করিয়া বলিব। নরেশবাবুর স্নেহ, ভবেশের সংসারের মমতা কিছুতেই যে যুবতী বিধবাকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই তাহা কেহ না বুঝিলেও বিশ্বনাথ একটু একটু বুঝিত, কিন্তু ঐ কথা মনে করিতেও তাহার কষ্ট হইত—তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইত। এক এক সময় তাহার মনে

হইত, সে অকারণ সুমতির উপর সন্দেহ করিতেছে, তখন তাহার বড়ই আত্মগ্লানি উপস্থিত হইত; সে প্রতিজ্ঞা করিত, না আর সুমতিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিব না; তাহাতে পাপ হয়; কিন্তু পরক্ষণেই সুমতির ভাবভঙ্গীর কথা মনে হইলে তাহার প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিত। সুমতিকে বুকের মধ্যে রাখিয়া তাহাকে সকল বিপদ, সকল পাপ প্রলোভন হইতে রক্ষা করিতে পারিলে বুঝি তাহার শান্তি বোধ হইত। কিন্তু যাহার অদৃষ্টে যাহা লিখিত আছে, কে তাহার খণ্ডন করিবে। বিশ্বনাথ এই সকল কথা এক এক সময়ে বসিয়া ভাবিত। তাহাকে এই প্রকার চিন্তামগ্ন দেখিয়া কোন কোন দিন হয়ত সুমতি জিজ্ঞাসা করিত "বিশুদাদা, কি ভাব তুমি?" বিশ্বনাথ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিত "আর কি 'ভাব্‌বো দিদি, তোমার কথাই ভাবি। সংসারে তোমরা ছাড়া আমার আর কে আছে? মা মর্‌বার সময় তোমাদের দুটীকে আমার হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন, আমার অদৃষ্টে কি আছে কে জানে?" বিশ্বনাথের এই কাতর ভাব দেখিয়া সুমতি হাসিয়া ফেলিত, বলিত "বিশুদাদা, তোমার বুঝি হাতে কোন কাজ নাই যত অনাছিষ্টি ভাবনা। ভগবান যার অদৃষ্টে যা লিখেছেন তাই হবে, তুমি আমি ভেবে কি তা উল্‌টাইয়া দিতে পার্‌বো।"

বিশ্বনাথ বলিত "তা জানি দিদি, তা বুঝি ভাই, তবুও মন কেমন করে। তোমাদের ভালয় ভালয় রেখে আমি মার কাছে যেতে পার্‌লে রক্ষা পাই।"

সুমতি উচ্চ হাস্য করিয়া বলিত "বিশুদাদা বেশ সং; বলি, তোমার কি এখনই মরণের সময় হোয়েছে যে বুড়ো মানুষের মত বৈতরণী পারের কড়ি সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হোয়েছ। হাতে কাজ না থাক্‌লে ঐ সব খেয়ালই হয়।"

বিশ্বনাথ চুপ করিয়া থাকিত। তাহার মুখ দিয়া আর কথা সরিত না; কিন্তু সর্ব্বদাই তাহার মনে হইত কি যেন একটা বিপদ ক্রমে তাহাদের দিকে ঘনাইয়া আসিতেছে।

বিশ্বনাথের সদা সতর্ক দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া সুমতি কিভাবে কেমন করিয়া ধীরে ধীরে কুপথে অগ্রসর হইতেছিল তাহা আমরা জানি না। কবে, কি প্রকারে সুমতির উপর কুমতির প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল তাহাও আমরা বলিতে পারি না। হায় রমণী!



নরেশবাবু ও ভবেশ শনিবারে হুগলী চলিয়া গেলেন—সোমবারে পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। বিশ্বনাথ একাকী সুমতির তত্ত্বাবধানের জন্য বাড়ীতে রহিল। রবিবার গেল সোমবারও গেল। মঙ্গলবার প্রত্যুষে উঠিয়া বিশ্বনাথ দেখে যে সুমতির তখনও নিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই। বাড়ীর মধ্যের একখানি ঘরের মধ্যে সুমতি শয়ন করিত, বারান্দায় বিশ্বনাথের শয়নের ব্যবস্থা করিয়াছিল।

সূর্য্যোদয় হইল, তবুও সুমতি ঘরের দ্বার খুলিল না দেখিয়া বিশ্বনাথ দ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিতে লাগিল "সুমতি, দিদি, উঠ, বেলা হোয়েচে; আর কতক্ষণ শুয়ে থাক্‌বে।" কিন্তু ঘরের মধ্য হইতে কেহই কোন উত্তর দিল না। বিশ্বনাথ আবার ডাকিল "দিদি, ওঠ।" কোন উত্তর নাই। তখন তাহার ভয় হইল; সে ধীরে ধীরে ঘরের অপর পার্শ্বে যে দ্বার ছিল সেই দ্বারের কাছে গেল। দ্বার ঠেলিতেই খুলিয়া গেল। বিশ্বনাথ তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে গেল, দেখে ঘরে কেহ নাই, বিছানায় কেহ শয়ন করিয়া নাই। তখন তাহার মনে হইল সুমতি বোধ হয় ঐ দ্বার দিয়া বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

বিশ্বনাথ তখন দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া বারান্দায় বসিল; তাহার মনে নানা কথা উঠিতে লাগিল। সুমতি ত এমন করিয়া কখন ঘরের বাহির হয় না; বিছানা হইতে উঠিয়া লোকে যেমন দুর্গা নাম করে সুমতি তেমনি সর্ব্বাগ্রে "বিশুদাদা" বলিয়া ডাকিয়া তবে ঘরের বাহির হয়। আজ এ কি হইল!

বিশ্বনাথ বারান্দায় বসিয়া একছিলিম তামাক সাজিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু তাহাও তাহার ভাল লাগিল না; কলিকা হুঁকা ফেলিয়া সে উঠিল। তাহার মনে হইল একবার পুকুর ঘাটটা দেখিয়া আসে। তখনই সে পুকুরঘাটে গেল। সেখানে সুমতি নাই। পার্শ্বেই সরকারদিগের বাড়ী, বিশ্বনাথের মনে হইল সুমতি হয় ত সরকারদিগের বাড়ীতে গিয়াছে। সেখানে যাইয়াও দেখিল সুমতি নাই। কাহাকেও কিছু না বলিয়া সে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল, মনে হইল, হয়ত এতক্ষণ সুমতি বাড়ীতে আসিয়াছে। কিন্তু কৈ, বাড়ীতে ত কেহই নাই। তখন বিশ্বনাথ মাথায় হাত দিয়া বসিল, তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

তখন সে গোপনে পাড়ার বাড়ী বাড়ী সন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু কোথাও সুমতিকে দেখিতে পাইল না। দুই তিন বাড়ীতে যায়, আবার দৌড়িয়া বাড়িতে

আসে,—আশা হয় ত এতক্ষণ সুমতি বাড়িতে আসিয়াছে। ঘরের মধ্যে যাইয়া দেখিল যেখানকার যে জিনিস সেই স্থানেই আছে; পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত যথাস্থানে রহিয়াছে। বালিশ তুলিয়া দেখিল, বাক্সের চাবিগুলি সেখানে রহিয়াছে; চাবী লইয়া এ বাক্স ওবাক্স খুলিয়া দেখিল সকল দ্রব্যই যথাস্থানে রহিয়াছে।

তখন অনন্যোপায় হইয়া বিশ্বনাথ প্রতিবেশী সরকারমহাশয়দিগের বাড়ীতে আবার গেল। বৃদ্ধ রামহরি সরকার মহাশয় তখন ঠাকুর দালানের বারান্দায় বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন, বিশ্বনাথকে আসিতে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বিশু এত সকালে কি মনে করিয়া। ওকি, তোমার চেহারা অমন কেন? নরেশ ভবেশ হুগলীতে ভাল আছে ত? সুমতি ভাল আছে ত?"

বিশ্বনাথ তখন বলিল "হুগলীর কোন খবর পাই নাই, কিন্তু আজ সকাল থেকে সুমতি দিদিকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না।"

সরকার মহাশয় এই কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন "সে কি রে। সুমতিকে দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ না? সে কি কথা?'

বিশ্বনাথ। সকালে উঠে দেখি ঘরের দ্বার বন্ধ; পাশের দ্বারের কাছে গিয়ে দেখি দ্বার খোলা; ঘরের মধ্যে কেউ নাই। তখন মনে কোরলাম, সুমতি দিদি কোথাও গিয়েছে। তারপর পাড়ার সব বাড়ী খুঁজে দেখেছি, কোথাও তাকে দেখ্‌তে পেলাম না, এতখানি বেলা হোয়ে গেল, তবুও তাকে না দেখে আপনাকে সংবাদ দিতে এসেছি। কাকাবাবু ত বাড়ী নেই; একা কি কোরবো বলুন।"

সরকার মহাশয় ধীরে ধীরে হুকাটা নামাইয়া রাখিলেন; অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলেন; তাহার পর বলিলেন "হুঁ।"

বিশ্বনাথ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াই রহিল। কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধ সরকার মহাশয় বলিলেন "আচ্ছা বিশু, কারো উপর তোর সন্দেহ হয়।"

বিশ্বনাথ বলিল "কৈ না; আমি ত কিছুই ভেবে পাচ্ছি না।"

সরকার মহাশয় তখন উঠিয়া দাঁড়াইলেন; বারান্দার পার্শ্বেই একখানি যষ্টি ছিল তাহা লইয়া বলিলেন "চল, তোদের বাড়ী যাই।" এই বলিয়া সরকার মহাশয় বাড়ীর বাহির হইলেন। নরেশবাবুর বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হইয়াই তিনি বিশ্বনাথকে বলিলেন "বিশু, এক কাজ কর। দৌড়ে গিয়া হলধর ভট্টাচার্য্য আর



রসিক মিত্রকে ডেকে আন। কোন কথা বল্‌বার দরকার নেই; শুধু বলবি যে কি একটা বিশেষ প্রয়োজনে আমি তাদের এখনই ডেকেছি।" বিশ্বনাথ চলিয়া গেল; সরকার মহাশয় নরেশবাবুর বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া একখানি ঘরের বারাণ্ডায় মৃত্তিকা আসনেই উপবিষ্ট হইয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

একটু পরেই হলধর ভট্টাচার্য্য ও রসিক মিত্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন; সরকার মহাশয় তাঁহাদিগকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন। তাঁহারা এই কথা শুনিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। এ কি অসম্ভব কথা! এ কি ভয়ানক কাণ্ড! সকলেরই মুখে এই ভাব প্রতিভাত হইল।

সরকার মহাশয় বলিলেন "এখন কি কর্ত্তব্য? মেয়েটার ত অনুসন্ধান কোরতে হয়। আর কোন্ পাষণ্ড এমন কাজ কোর্‌লো তারও ত সন্ধান নিতে হয়।"

রসিক মিত্র বলিলেন "তাতে লাভ। মেয়েটার আর খোঁজ কোরে কি হবে? যে গিয়েছে সে তার অদৃষ্ট নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু গ্রামের কোন ছেলে যে এমন কাজ কোরেছে তা ত আমার বোধ হয় না। গ্রামের কারু এমন সাহস হবে না।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বোল্লেন "এ গ্রামের কোন হতভাগারই কাজ; ভিন্ন গাঁ থেকে কি কেউ এসে এমন কাজ কোর্‌তে পারে। এর যথারীতি অনুসন্ধান চাই। যে এমন কাজ কোরেছে তার শাস্তি দিতেই হবে।"

রসিকবাবু। আমি বলি আগে নরেশকে খবর দেওয়া যাক্। সে বাড়ী এলে পরামর্শ কোরে যা হয় করা যাবে।

সরকার মহাশয়। সে কাজটা ভাল হবে না। নরেশ খবর পেলেই অধীর হয়ে বাড়ী ছুটে আস্‌বে, ভবেশের একজামিনটা মাটী হবে। যা হবার তা হোয়েছে; নরেশকে কোন খবর দিয়ে কাজ নেই। সে বাড়ী আসুক, তারপর যা হয় করা যাবে। হায়, হায়, নরেশের অদৃষ্টে যে এমন হবে তা কেউ ভাবে নাই।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় তখন বিশ্বনাথকে বলিলেন 'বিশু, আর কেঁদে কি হবে। যা হবার তা ত হোয়েছে। এ সংবাদ আর নরেশকে পাঠিয়ে কাজ নাই। ছুঁড়ীটা কোথায় গেল আমরা তার অনুসন্ধান অতি গোপনে কোরছি। আর অনুসন্ধান কোরেই বা লাভ কি? কুলত্যাগিনীকে কে আর ঘরে নেবে।"

এই কথা বলিয়া সকলে চলিয়া গেলেন, বিশ্বনাথ বারান্দায় বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সুমতি কোথায় গেল? কেমন ক'রে গেল? কার সঙ্গে গেল? ব্যাপার কি? এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে না কি? যে পারে সে নরকের পথের বর্ণনা করুক, এ বৃদ্ধ লেখক তাহা পারিতেছে না। কুলত্যাগিনীর ইতিহাস শুনিয়া কাজ নাই, সে দৃশ্য দেখিয়া কাজ নাই। সকলে ভুলিয়া যাও, কল্যাণপুরের নরেশচন্দ্র বসুর একটী কন্যাছিল;—সকলে ভুলিয়া যাও যে, ভদ্র গৃহস্থের যুবতী কন্যা প্রবৃত্তির তাড়নায় পিতামাতার ঘর সংসার ছাড়িয়া অকূলে ভাসিয়া গেল;—পবিত্র হিন্দু ললনার অপবিত্র কাহিনী বিস্মৃতির অতলে ডুবিয়া যাউক। তাহার কথা তুলিও না! কল্যাণপুরের নরেশচন্দ্র বসুর একমাত্র কন্যার পরিণাম চিন্তা করিয়া, ওগো আমার মাতা! ওগো আমার ভগিনি! ওগো আমার কন্যা! তোমরা একবিন্দু অশ্রুমোচন কর,—আমাদের গৃহ পরিবার সেই অশ্রুবিন্দুতে পবিত্র ও নির্ম্মল হউক।

শুক্রবারে পরীক্ষা শেষ হইয়া গেল। নরেশবাবু পূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, শুক্রবারে পরীক্ষা শেষ হইলেই তাঁহারা বাড়ী চলিয়া আসিবেন! নৌকাযোগে হুগলী হইতে কল্যাণপুর যাইতে দুই তিন ঘণ্টা লাগে; কিন্তু সেদিন অপরাহ্নকালে গঙ্গায় ভাটা পড়িয়াছিল এজন্য তাহাদের পৌঁছিতে পাঁচ ঘণ্টা লাগিল। রাত্রি সাড়ে এগারটার সময় নৌকা কল্যাণপুরের ঘাটে লাগিল। গ্রাম নিস্তব্ধ, মধ্যে মধ্যে দুই একটী কুকুরের শব্দ সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল।

একজন মাজীর মাথায় দ্রব্যাদি দিয়া নরেশবাবু ও ভবেশ বাড়ীর দিকে চলিলেন। চারিদিক অন্ধকার; সেই অন্ধকার রজনীতে ভবেশকে আগে করিয়া নরেশবাবু বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। সদর দ্বার বন্ধ ছিল, নরেশবাবু ডাকিলেন "বিশু!"—ভবেশ ডাকিল "দিদি!" কেহ কোন উত্তর দিল না; তখন ভবেশ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল "বিশুদাদা! দিদি!"

বাড়ীর ভিতর হইতে কে যেন কি একটা শব্দ করিল, নরেশবাবু বুঝিতে পারিলেন দ্বার খুলিবার জন্য বিশ্বনাথ আসিতেছে! ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া



গেল! নরেশবাবু যেমন প্রবেশ করিতে যাইবেন অমনি বিশ্বনাথ "কাকাবাবু" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং তাঁহার চরণপ্রান্তে পড়িয়া গেল।

এই ব্যাপার দেখিয়া নরেশবাবু ও ভবেশ অবাক্ হইয়া গেল, কিছুক্ষণ কাহারও মুখে কথা সরিল না। একটু সংযত হইয়া নরেশবাবু কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন "বিশু, কি হোয়েছে রে? সুমতি ত ভাল আছে?" বিশ্বনাথ এই কথা শুনিয়া আরও কাঁদিয়া উঠিল। নরেশবাবু তাহাকে কিছুতেই সান্ত্বনা করিতে পারিলেন না।

এদিকে ভবেশও হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু বিশ্বনাথের ক্রন্দন ক্রমেই বাড়িতে লাগিল দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি বাড়ীর মধ্যে যাইয়া ডাকিল "দিদি!"

কে উত্তর দিবে? ভবেশ আবার ডাকিল "দিদি, ও দিদি!" বিশ্বনাথ আর স্থির থাকিতে পারিল না, দৌড়িয়া আসিয়া বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল "দাদা, দিদি নেইরে ভাই!"

( ক্রমশঃ )

শ্রীজলধর সেন।

---

# প্রভাত চিন্তা।

—:o:—

রাত্রে সুনিদ্রার পর ঘুম ভাঙ্গিলে, মনে এক নিমিষে কত কথাই জেগে উঠে। মস্তিষ্কের কোষগুলি বিশ্রামের দ্বারা তখন পরিপুষ্ট ও সঞ্জীবিত হয় বলিয়া, তখন অতি সুন্দর ভাবে কাজ করে। তাই এই সময়েই মনুষ্যজীবনের অনেক জটিল সমস্যার মীমাংসা হয়। মনীষী লোকের অদ্ভুত ও জ্ঞানগর্ভ আবিষ্কার অস্পষ্ট ভাবে এই সময়েই প্রথম মনে আসে। যেমন জলের সহিত মিশ্রিত লবণ থিতাইতে দিলে ক্রমে সুন্দর দানা বাঁধিয়া পড়ে তেমনি এই মীমাংসা গুলি। সমস্ত দেহ মন তখন প্রকৃতির নিয়মের সম্পূর্ণ অনুগত বলিয়া প্রশান্ত জলে প্রতিবিম্ব পড়ার মত বিশ্বরাজ্যের প্রতিবিম্ব মনশ্চক্ষুতে পড়ে। তাই সেই সময়ের চিন্তার এত মাধুর্য্য এত মাহাত্ম্য ও অত শান্তি ঢালা ক্ষমতা।

এই সময়ের ঐ চিন্তাগুলি আমি তখনি নির্জ্জনে বসিয়া বাতির আলোয় লিখি। একটি ছত্র লিখিলেই অপর একটি ছত্র তার সঙ্গে সঙ্গে আসে। সবই অল্প কথায় ও সরল ভাবে আসে। চিন্তার স্রোত তখন উৎসের মত আপনিই স্বাধীন ভাবে ছুটে।

ওইরূপ নিস্তব্ধ গম্ভীর মুহূর্ত্তেই বোধ হয় আর্য্য ঋষিরা প্রথমে বেদগান গাহেন, উষা ও অরুণের কথা দিবা ও বিভাবরীর কথা।

যেগুলিকে আমরা প্রবাদ বা চলিত কথা বলি সে গুলিও ঐ সময়কার, সব এইরূপ নিস্তব্ধ। সার অংশ বহুকালের জ্ঞানভাণ্ডারেরই থিতাইয়া পড়া। সেগুলি মানুষের বহুদিনকার জ্ঞানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

দৈনিককাজেও এই গুলি সব অতিশয় হিতকর কথা। অকূলে পথ চলিবার নিদর্শনের মত। আমি আবার এই গুলি বিভিন্ন স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া নিজের পকেট বহিতে লিখিয়া রাখি। ও অবসরের সময় সেগুলি মাঝে মাঝে খুলিয়া দেখি। তাতে কত যে অপার আনন্দ ও আলো ও শক্তি দেয় বুঝান যায় না।

এই সকল গুলি শিশুকালেই ইস্কুলে শিখান উচিত—সব মহৎ লোকের উক্তি ও প্রবাদ কথা ও তাঁহাদের পুণ্যময় জীবনের ইতিবৃত্ত। লোকের মনে মাঝে মাঝে এই সব কথা জাগিলে তাতে তারা অলক্ষিতে কত আনন্দ পাইবে। সে গুলি মনে থাকিলে সৎসঙ্গের ফল হয়। সে অমৃত সরোবরের কাছে থাকিলে পিপাসার সময় জলপান করিবার আর অভাব হয় না। আমি এইরূপ মধুর কথা গুলি মনের ভিতর লুকান অন্তরতম স্থান হইতে জাগাইয়া পিপাসার সময় আকণ্ঠ পান করি। দুর্দ্দিনের অবসাদ ঘুচে যায়, ক্লান্ত মনে কত বল ও শান্তি পাই। তাঁদের বুলি, তাঁদের কথা মনে রাখা, অমন সৎসঙ্গ আর নাই। থাকিতে থাকিতে সেই সকল মধুর কথা আপনিই মনে জাগিয়া উঠিয়া সময়ে সময়ে কাজের সময়ও অন্যমনস্ক করে। মানবচরিত্রকে সমূলে দৃঢ় ও ভদ্র করিয়া গড়ে।

সুনিদ্রার পর প্রাতে উঠিয়া এই সময়কার চিন্তাগুলি সবাকারই লিখা উচিত। অতি ছোট হইলেও তাতে মহান্ ভাব মাখান থাকে। উপযুক্ত ক্ষেত্রে পড়িলে তাহা হইতে কত সুন্দর সুন্দর ফসল হয়, মন্দলোক সৎকর্ম্মে প্রণোদিত হয়—ব্যথিত ও আতুর শক্তি পায়। অমন সঞ্জীবনীসুধা ভূভারতে আর নাই।



দিনের কার্য্যে যে সকল সমস্যা মনে উঠে সেগুলি ব্যস্ততাবশতঃ তখন মীমাংসা হয় না। কিন্তু মনের অন্তরতম স্থানে সে গুলি লুকান থাকিয়া সেই অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে আপনাদের উপযোগী আরও খবর সংগ্রহ করে ও পরিশেষে আবশ্যকের সময় হঠাৎ সেই গুলিকে সঙ্গে লইয়া সেই মানস সরোবরে ভাসিয়া উঠে। তখন তারা ঠিক যেন সাগর মন্থনের রত্ন স্বরূপ।

কেহই কোনও কথা ভুলে না। মন হইতে কোন কথাই অন্তর্হিত হয় না। যা আসে অলক্ষিতে বহুদিন থাকিয়া ফুল ফল লইয়া সময়ে আবার ফুটিয়া উঠে।

মানুষের কল্পনার বিস্তার ব্রহ্মাণ্ডের প্রান্ত অবধি। বাহিরের সকল জিনিষেরই সেই কেন্দ্রে অল্পবিস্তর ছায়া পড়ে। বাহিরের শক্তিই ভিতরের শক্তি হইয়া আবির্ভূত হয়। তাই তাহারও শক্তি অক্ষয় ও অনন্ত, মনুষ্য চেষ্টায় কি যে অসাধ্যসাধন না হইতে পারে তা সকল সময় অনুমানেও আসে না।

সুপ্রভাত হইলে সারা দিনই যে ভাল যাইবে একথাটি কি ঠিক। মাঝে কি কোথাও কোন মেঘ উঠিতে পারে না, শেষে কি কোনও উপদ্রব ঘটিতে পারে না। তবে মোটের উপর—Childhood shows the man as morning shows the day অর্থাৎ শিশু অবস্থা হইতেই বালকটি পরে কিরূপ প্রকৃতির লোক হইবে এটি যেমন অনেক লক্ষনে জানা যায় সকালের সেইরূপ প্রভাবও সমস্ত দিনের ঘটনাকে অনেকটা সূচনা করে।

শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

---

# বৈচিত্র্য।

## অভাবে প্রমান।

এক বাঙ্গালী ও এক সাহেব-মুখো বাঙ্গালী পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে তর্ক করিতেছিলেন।

সা-বা। আপনি কি শুনেন নাই সেদিন বিলাতে পঞ্চাশ হাত মাটির নীচে তারের টুক্‌রা পাওয়া গিয়াছে? ইহা হইতে আমরা অনুমান করি প্রাচীন শ্বেতদ্বীপ বাসীরা বহুকাল পূর্ব্বে তাড়িতের ব্যবহার জানিত।

বা। ভারতবর্ষে একশত হাত মাটি খুঁড়িয়াও এক টুক্‌রা তার কখনও পাওয়া যায় নাই। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমানিত হয় যে আর্য্যেরা তারহীন-তাড়িত-বার্ত্তার-(Wireless Telegraphy) বিষয় বহুকাল পূর্ব্বেও অবগত ছিলেন।

## ডাক্তারের উপকার।

কন্যাকর্ত্তা। ডাক্তার, কাল আমার এখানে নিমন্ত্রণে এস নাই কেন? অনেক বড় লোক এসেছিলেন, যাঁহাদের দ্বারা ভবিষ্যতে তুমি অনেক উপকার পেতে।

ডাক্তার। ইতিমধ্যেই উপকার পেয়েছি, বরযাত্রীদের মধ্যে তিনজনকে আমি এইমাত্র দেখে আস্‌ছি।

## অন্তিমে।

ছেলেরা ভারি খুসী কারণ রেঃ ডাক্তার রে আজ বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসিবেন, তদুপলক্ষে একটার সময় ছুটি হইবে।

যথাসময়ে ডাঃ রে পরিদর্শনে আসিয়া নিম্নশ্রেণীর একটি ছোট বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা খোকা আমাদের সকলের স্বর্গে স্থান পাবার জন্য কি করা উচিত?

খোকা নিরীহ ভাবে উত্তর করিল "মরে যাওয়া উচিত।"

ডাক্তার ছাড়িবার পাত্র নহেন, পরবর্ত্তী বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে কথা ঠিক্ তবে মর্‌বার আগে আমাদের কি করা দরকার?"

২য় বালক। "ঈশ্বরকে ডাকা দরকার।"

১ম বালক। (প্রথম প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিয়াছে এই ভরসায় সাগ্রহে) "ও ঠিক্ হ'লোনা, মরে যাবার আগে অসুখ করা দরকার এবং আপনাকে ডাকা।"

## মাস্‌তুতো ভাই।

সতীশবাবুর থিয়েটার দেখিবার পয়সা কুলায় না অথচ যে কোনও নূতন নাটক অভিনয় হইবে না দেখিলে ভাত হজম হইবে না—রাত্রে ঘুম হইবে না।



তিলোত্তমা রঙ্গমঞ্চে যে দিন প্রথম হনুমানের বস্ত্রহরণ অভিনয় হয়, সতীশবাবু সটান টিকিট ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন "আমি নিরাকার সংবাদ পত্রের সম্পাদকীয় ষ্টাফে কার্য্য করি, একখানি পাস দিন।" টিকিট বিক্রেতা বলিলেন মহাশয়—"এইমাত্র ঐ কাগজের সম্পাদক পাস দেখাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছেন; আপনি আমার সঙ্গে আসুন যদি আপনাকে তিনি চিনিতে পারেন তবে আপনি অবশ্যই বিনামূল্যে অভিনয় দর্শন করিবেন।" সতীশবাবু শ্রীহরি স্মরণ করিয়া সাহসে বুক বাঁধিয়া টিকিট বাবুর সঙ্গে সম্পাদকের নিকট গেলেন। টিকিট বাবু ব্যাপার বুঝাইয়া বলিলে সম্পাদক একবার সতীশবাবুর দিকে চাহিয়াই বলিলেন "হাঁ মহাশয় এই বাবুকে আমি চিনি ইনি আমাদের ষ্টাফের লোক।" যবনিকা পতনের কিছু পূর্ব্বে সতীশবাবু সম্পাদককে খুঁজিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয় নিরাকার আফিষে আমি কোনও পুরুষে কাজ করি নাই বা আপনার কাগজের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই, তবে আপনি আমাকে চিনিলেন কি করিয়া?" সম্পাদক একটু হাসিয়া বলিলেন "বটে? আমিত নিজে সম্পাদক নহি, তাঁহার পাড়ার লোক, পাস খানি চেয়ে নিয়ে থিয়েটার দেখ্‌তে এসেছি মাত্র। আমি আপনাকে দেখে ভয়ে সারা হ'চ্ছিলাম পাছে আপনি আমাকে না চিনে ধরিয়ে দেন, এখন দেখ্‌চি আপনি আমার মাস্‌তুতো ভাই।"

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ

---

# মাসিক সাহিত্য-সমালোচনা।

জাহ্নবী, অগ্রহায়ণ।—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত "জাহ্নবী" কবিতা মন্দ হয় নাই। শেষ পংক্তি কয়টি আরো মার্জ্জিত ও সরল হইলে ভাল হইত। "সাঁওতালদিগের পুরা কাহিনী"তে অনেক জানিবার কথা আছে। "ব্রজদাস" একটি ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে লিখিত কবিতা; শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক রচিত। কবি যদি একটু সংযমী হইয়া কবিতাটি আরো ছোট করিয়া লিখিতেন তাহা হইলে ভাল হইত। অল্পকথায় অধিক ভাব প্রকাশ করাই লেখকের কৃতিত্ব।

আশা করি, কবি ভবিষ্যতে এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন। শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত "প্রবাসী" গল্পে কিছু নূতনত্ব থাকিলেও তাহা ভাল বলিয়া বোধ হইল না, দুই একটি ঘটনার সার্থকতা বুঝা আমাদের পক্ষে বড়ই শক্ত হইয়া পড়িয়াছে। "শিশুর হাসি" কবিতা কিছুই হয় নাই। "তাঞ্জোর" শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক তাঞ্জোরের অনেক কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "মন্দির-দ্বারে" শ্রীমোহিত-লাল মজুমদার রচিত, কবিতাটি সুন্দর হইয়াছে। "শাখীনামা" এখনো চলিতেছে। "একখানি পত্র" চিত্তাকর্ষক।

দেবালয়, পৌষ।—রবিবাবুর "নিবেদনে" ভক্তের আনন্দ উচ্ছ্বাস পরিস্ফুট হইয়াছে। ছোট একটি গান সুরের সহিত সংযুক্ত না হইলেও যে এতটা মহান্ ভাব প্রকাশ করিতে পারে, তাহার অনেক উদাহরণ রবিবাবুর গানে পাইয়াছি। রবিবাবুর আধুনিক গানগুলি ভক্তের জিনিষ, ভাবিবার জিনিস; যাঁহার প্রাণ আছে তিনি বুঝিবেন, যাহার নাই, তাঁহাকে এগুলি পাঠ করিতে নিষেধ করি। "পৌত্তলিক ও পৌত্তলিকতা" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সাম্প্রদায়িক হইলেও তাহার সহিত সকলেরই এক মত হওয়া উচিত। "ধ্যান" কবিতা শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী রচিত; মাঝে মাঝে সুকবি দেবেন্দ্র নাথ সেনের ভাব ও ভাষা আসিয়া পড়িয়াছে। তাহাও আবার কৃতিত্বের সহিত লিপিবদ্ধ হয় নাই। এমন কবিতা কি লিখিতেই হইবে? "চোখ গেল" কবিতাটির না আছে ভাষা, না আছে ভাব? "প্রার্থনা" শ্রীঅক্ষয় কুমার বড়াল রচিত, সরল সুন্দর কবিতা, সোজা কথায় সুন্দর ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। "নৈসর্গিক ধর্ম্ম" প্রবন্ধ সারগর্ভ। "যাচনা" চর্ব্বিত চর্ব্বণ হইলেও কবিতাটি নিহাৎ মন্দ লাগিল না। "প্রার্থনার গুরুত্ব" আরো সুচিন্তিত হইলে ভাল হইত। "মিলন-আহ্বান" কথার সমষ্টি মাত্র।

শ্রীযুক্ত সারদা চরণ মিত্র।

*Printed by K. V. Seyne & Bros.*

# মানসী

দ্বিতীয় ভাগ। চৈত্র ১৩১৬ সাল ২য় সংখ্যা

## বাসনা।

ছুট্‌ব আমি সরল প্রাণে
পর্ণ-কুটীর হ'তে,
ধান-নাচানো মাঠের হাওয়ায়
ছুট্‌বো আলিপথে।
বনের মাথায় আঁধার ফুঁড়ে,
শুকতারাটি জাগ্‌বে দূরে,
কাণ জুড়াবে পাখীর গানে
সুরের মিঠে স্রোতে।

এলিয়ে দেব নগ্ন বাহু
গাঙের রাঙা জলে,
ঝাঁপিয়ে পড়ে' উজান যাব
ঢেউয়ের টলমলে;

তুচ্ছ কোরে জোয়ার ভাঁটা
এপার ওপার সাঁতার কাটা,
নাচ্‌বে আলো জলের বুকে
নীল আকাশের তলে।

বুক ফুলায়ে হাল ধরিব,
পাল তুলিব নায়ে,
মাঝ্‌গঙ্গায় জাল ফেলিব
উদাস আতুল গায়ে;
গাঙ্‌চিলেরা ঝাঁকে ঝাঁকে
উড়্‌বে ভাঙ্গা পাড়ের বাঁকে,
ডাক্‌বে চাতক ফটিক জল
মেঘের ছায়ে ছায়ে।

বর্ষা যখন ছড়িয়ে দেবে
মোতির "সাত-নরী";
কদম কেশর শিউরে উঠে
পড়্‌বে ঝরি ঝরি।
মাঠের কোণে যাবে দেখা
বৃষ্টিধারার 'চিকে' ঢাকা
কেয়াঝাড়ের মাথার 'পরে
নারিকেলের সারি।

শিল কুড়ায়ে বাঁধব "মোয়া",
লাঙল দেব ভুঁয়ে,
কড়্‌ কড়্‌ কড়্‌ ডাক্‌বে "দেয়া",
আস্‌ব আমন রুয়ে।
আকাশ-ভাঙা মুষলধার,
বাঁশের ঝাড়ে কি তোলপাড়,



পাকুড় তেঁতুল ঝাউয়ের ঝাড়
পড়্‌বে নুয়ে নুয়ে।
কামারশালে বস্‌ব গিয়ে
রৌদ্র এলে পড়ি,
কয়লাগুলো রাঙ্গিয়ে দিয়ে
টান্‌ব যাঁতার দড়ি;
ঝুলের কাছে জম্‌বে ধোঁয়া,
কাঁপিয়ে 'নেয়াই' পিট্‌ব লোহা,
ছিটিয়ে দেব আগুন-যুঁই—
আলোর ছড়াছড়ি।

শুন্‌তে যাব ভারত-কথা,
রামায়ণের গান,
সীতার দুখে চোখের জলে
গল্‌বে মনঃপ্রাণ;
বনবাসের করুণ কথা
শুন্‌তে বুকে বাজ্‌বে ব্যথা,
ফিরবো ঘরে দুঃখ ভরে
ক্ষুব্ধ ম্রিয়মাণ।

মেয়েটি মোর আগ্‌বাড়ায়ে
দাঁড়িয়ে রবে দ্বারে,
দোপাটি ফুল খোঁপায় পরে'
সাঁঝের আঁধিয়ারে;
কাজল-দেওয়া চক্ষু দুটি
আদর-দোলে উঠ্‌বে ফুটি'
'ফণী-মন্‌সার' বেড়ায়-ঘেরা
"দুর্গা-দীঘির" ধারে।

শিউলি ফুলের গন্ধে যাবে
সন্ধ্যাখানি ভরে',
জ্যোৎস্নাধারা পড়বে ঝরে'
দূর দেউলের পরে।
অঙ্গ মাজি' দুধের সরে
ঘাটটি হ'তে ঘটটি ভরে',
সইএর সাথে গৃহিনী মোর
আস্‌বে ফিরে ঘরে।

সারাদিনের কর্ম্মে-কাতর
ক্লান্ত আঁখির পাতে
স্বপ্নহারা ঘুমের আরাম
ভোগ করিব রাতে।
না ফুটিতেই ঊষার আঁখি,
না ডাকিতেই ভোরের পাখী,
ঝঙ্কারিব 'জয় জগদীশ'
প্রাণের 'একতারা'তে।

ছুট্‌ব আমি সরল প্রাণে
পর্ণকুটীর হ'তে,
ধান-নাচানো মাঠের হাওয়ায়
ছুট্‌বো আলিপথে।
বনের মাথায় আঁধার ফুঁড়ে,
শুকতারাটি জাগ্‌বে দূরে,
কাণ জুড়াবে পাখীর গানে
সুরের মিঠে স্রোতে।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

---



# বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের

তৃতীয় অধিবেশন।

## সভাপতির অভিভাষণ।

( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর )।

—০○০—

কবিকঙ্কণ লিখিয়াছেন,—

"খুল্লনা চলিল যদি পুত্রের তল্লাসে।
আঁখি ঠারে লহনা সখীর পানে হাসে॥
আর শুনেছ খুল্লনা আছেন ভাল নাটে।
ঘরের পো ঘরে আছে চাহে গোলা হাটে।
যৌবন কর্য্যাছে ডালি পো চাহিবার ব্যাজে॥"

তলাস, আঁখি, ঠার, পানে, নাটে, পো, চাহে, ব্যাজে, এসকল কথার আর ভদ্রসমাজে ব্যবহার নাই; এমন কি, কলিকাতার ভদ্র বাঙ্গালীর বাটীর স্ত্রীলোকরা এ সকল কথা বুঝিতে পারে না, কিন্তু রাঢ়দেশে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ইহাদের এখনও বেশ ব্যবহার আছে। ভাষার এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, উপরি-উক্ত কয়েক পঙ্‌ক্তির অর্থ অনেকেরই বুঝিতে এখন টীকার আবশ্যক হইবে।

গুণাকর রাজকবি ভারতচন্দ্র বর্দ্ধমান বিভাগে জন্মগ্রহণ করিয়া ও শিক্ষিত হইয়া মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কৃষ্ণনগরের রাজসভায় গাহিয়াছিলেনঃ—

"কাণ কাটারিতে মোর কাণ হৈল কালা।
কেটা মোরে বুড়ি বলে এত বড় জ্বালা॥"
"কহ ওলো হীরা তোরে মোর কিরা।"

এখন কি এ ভাষা চলিতে পারে? এ ত বেশী দিনের কথা নয়! অনেকেই কাণকাটারি, মোর, কেটা কিরা কথার অর্থ জানিবার জন্য অভিধানের সাহায্য লইতে বাধ্য হইবেন। বস্তুতঃ রাঢ়দেশের ও পূর্ব্ববঙ্গের চলিত ভাষায় এখনও সহস্র সহস্র শব্দ ব্যবহৃত আছে, যাহা আধুনিক বাঙ্গালা গ্রন্থে চলিত নাই। সে

সকল শব্দ গ্রাম্য হইয়াছে। আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ, কটক রেভেন্‌স্ কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায় এম, এ, একখানি রাঢ়ীয় কোষ প্রস্তুত করিয়াছেন; তাহাতে দ্বাদশ সহস্রের অধিক রাঢ়ীয় শব্দ আছে। উপস্থিত প্রতিনিধি-সভ্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও প্রচলিত গ্রাম্য শব্দের কোষ সঙ্কলন করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিতেছেন।

কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে আসাম গৌরীপুরে যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন হইয়াছিল, তাহাতে বিশদরূপে দেখান হইয়াছে যে, আসামীভাষা প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙ্গালা। দেশভেদে সামান্য বিভিন্নতা থাকায় আসামদেশীয় ভাষাকে ভিন্ন ভাষা বলা যাইতে পারে না।

আমরা অনেকেই উড়িয়া অক্ষর পড়িতে পারি না; বর্ণমালা এক হইলেও লিপির বিভিন্নতা আছে। সাধারণ উড়িষ্যাবাসীদিগের ভাষা হইতে বাঙ্গালার কিছু কিছু বিভিন্নতাও আছে বটে, কিন্তু উড়িষ্যার কবি শ্রীযুত ফকিরমোহন সেনাপতি উড়িয়া ভাষায় লিখিয়াছেন,—

"ন হেলা হৃদয়ে মোর পুণ্যর সঞ্চার।
দগ্ধ হেত অচ্ছি পাপানলে বারংবার॥
শীতল করন্তু প্রভু করুণা জলরে।
জয় জয় দেব জয় জগদীশ হরে॥"

(আমার হৃদয়ে পুণ্যের সঞ্চার হইল না; আমি পাপানলে বারংবার দগ্ধ হইতেছি। করুণা-জলে আমার হৃদয় শীতল করুন; জয় জয় জগদীশ হরে!)

বাঙ্গলাতে ও উড়িয়াতে প্রভেদ কোথায়?

দেবনাগর অক্ষরে লিখিত থাকায় আমি কবিতাটী অতি সহজে পাঠ করিতে পারিয়াছি। উড়িয়া অক্ষরে লিখিত হইলে বোধ হয় পাঠ করাই হইত না। বস্তুতঃ উড়িষ্যার ভাষা বঙ্গবাসিগণ এবং উড়িষ্যাবাসিগণ বঙ্গভাষা বেশ বুঝিতে পারে। শ্রীবৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত উড়িষ্যার গ্রামে গ্রামে পঠিত হয়, এবং অধিকাংশ লোকই অতি সহজে বুঝিতে পারে। বঙ্গসাহিত্যই উড়িষ্যার সাহিত্য হওয়া উচিত; পৃথক উৎকল সাহিত্য নাই বলিলেই হয়। পৃথক্ উৎকলসাহিত্যের সৃষ্টির উদ্যোগ অপরিণামদর্শিতামূলক। অনেকে বাঙ্গালা, হিন্দি ও উৎকল-সাহিত্যের পার্থক্য অভিলষিত মনে করেন, কিন্তু তাহাতে ভারতবর্ষীয় সাহিত্যের পরিপুষ্টির সম্পূর্ণ ক্ষতি হইবে।



আজ কাল হিন্দী ক্রমশঃ যেরূপ আকার ধারণ করিতেছে, ইহাতে যেরূপ সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাতে বোধ হয় অতি অল্প দিনেই হিন্দী ও বাঙ্গালাতে বিশেষ প্রভেদ থাকিবে না। লিপির বিভিন্নতা নিবন্ধন ভাষার বিভিন্নতা চক্ষে প্রতীয়মান হইতে পারে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে এবং এক লিপি ব্যবহৃত হইলে, ভারতবর্ষীয় সাহিত্যের যে অলোকসামান্য পরিপুষ্টি হইবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ বর্ত্তমান হিন্দী ও বঙ্গভাষাতে কেবলমাত্র কয়েকটী ছোট ছোট শব্দের ও বিভক্তির বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। এখন বিদ্বজ্জন ও বিদ্যোৎসাহিগণের কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা অদূরদর্শিতা ত্যাগ করিয়া সহযোগে ভারতবর্ষের সাহিত্যের সম্যক্ পরিপুষ্টির জন্য সযত্ন হউন; একতার জন্য সচেষ্ট হউন।

ভক্তিভাজন ভাবুকশ্রেষ্ঠ কবিশেখর তুলসীদাস গোস্বামীর—

"চিদানন্দ সুখধাম শিব বিগতমোহমদকাম।
বিচরহি মহী ধরী হৃদয় হরি সকল লোক অভিরাম॥"
"অহঙ্কার কী অগ্নিমে দহত সকল সংসার।
তুলসী বাচে সন্ত জন কেবল শান্তি আধার॥"

("চিদানন্দ, সুখধাম, বিগতমোহমদকাম, সকললোকঅভিরাম মহাদেব হৃদয়ে হরিকে ধারণ করিয়া মহী বিচরণ করেন।" "অহঙ্কার রূপ অগ্নি সকল সংসারকে দহন করিতেছে; তুলসী বলেন, কেবল সাধু ব্যক্তিই শান্তির আধার।")

কোন শিক্ষিত বঙ্গবাসী তুলসীর হিন্দীও বেশ বুঝিতে না পারেন? তুলসীদাস ভারতবর্ষীয় কবিগণের অগ্রণী। কবিরের ও হরিশ্চন্দ্রের নামও ভারত-বর্ষীয় সাহিত্য-সংসারে চিরস্মরণীয় থাকিবে।

কেবল বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা দেশে এইরূপ শব্দের ও বিভক্তির প্রভেদ কেন, সকল দেশেই এইরূপ ভাষার বিভিন্নতা আছে। ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, ওয়েলেস্ এবং আয়ারলণ্ডেও এইরূপ ভাষার প্রভেদ আছে। ক্যানেডা প্রভৃতি ইংলণ্ডের উপ-

নিবেশে ইংরাজী ভাষা রাষ্ট্রভাষা হইলেও চলিত ভাষার অনেক প্রভেদ। দক্ষিণ ইংলণ্ড ও উত্তর ইংলণ্ডেও এইরূপ চলিত ভাষার প্রভেদ। ক্ষুদ্র গ্রীক্ দেশেও আইয়োনিয়েন ( Ionian ), ডোরিয়ান ( Dorian ) প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষা ছিল; কিন্তু হোমার্ ( Homer ), পণ্ডার্ ( Pinder ), ইস্কাইলস্ ( Aeschylus ) প্রভৃতি সুকবি ও সুলেখকগণ সমগ্র গ্রীসের সাহিত্যিক ছিলেন। আমেরিকার yankeeism প্রসিদ্ধ।

স্কটলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ কবি বার্ণস্ ( Burns ) লিখিয়াছেন,—

"We sleekit cow'rin, tim'rous beastie.
O, what a panic's in thy breastie ;
Thou need na start awa sae hastie,
Wi bickering brattle.
I wad be laith to rin an' chase thee,
Wi' murdring pattle."
"The powers aboon will tent thee,
Misfortune sha' na 'steer thee ;
Thou'rt like themselves sae luvely,
That they ill ne'er let thee."

এই ত ভাষার প্রভেদ; তত্রাপি স্কটলণ্ডের রাষ্ট্র-ভাষা ইংরাজী; বার্ণস্ ( Burns ) তাঁহার দেশের ভাষা ব্যবহার করিয়াও ব্রিটেনের কবিকুলাগ্রগণ্য হইয়াছিলেন। স্কটলণ্ডের ও ওয়েলসের রাষ্ট্রভাষা ইংরাজী; স্কটলণ্ডবাসী ও ওয়েল্স্‌বাসিগণ মনে করে না, ইংরাজী বিভিন্ন ভাষা।

বিহার প্রদেশের কিংবা উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশের ভাষার বঙ্গভাষা হইতে কিছু কিছু প্রভেদ থাকিলেও, সে ভেদনিবন্ধন সাহিত্যিক বা রাষ্ট্রভাষার বিভিন্নতা থাকা শ্রেয়স্কর নহে। পুরাকালে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে মাগধী, অর্দ্ধ-মাগধী, সৌরসেনী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত থাকিলেও, সংস্কৃত সর্ব্বত্র ভদ্র সমাজের ভাষা ছিল, সাহিত্যের ভাষা ছিল। প্রতীচ্য গান্ধারদেশ হইতে প্রাচ্য মণিপুর পর্য্যন্ত, পৃথিবীর মানদণ্ডস্বরূপ হিমমণ্ডিত নগাধিরাজের



অধিত্যকা হইতে বিন্ধ্যগিরি-শ্রেণী পর্য্যন্ত প্রদেশে সাধারণতঃ ভিন্ন ভিন্ন ভাষা চলিত থাকিলেও, ঐ সকল ভাষার বিলক্ষণ সাদৃশ্য ছিল, এবং বিদ্বজ্জনের ব্যবহৃত সংস্কৃত ভাষা সকল প্রদেশকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিত। অতিবিস্তৃত দেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভাষার কিছু কিছু পার্থক্য অপরিহার্য্য; বাঙ্গালা, হিন্দী, নেপালী, পঞ্জাবী, গুজরাটী, মহারাষ্ট্রী, উড়িয়া প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় ভিন্ন ভিন্ন ভাষাসমূহের ভিন্ন ভিন্ন সাধারণ জনগণের মধ্যে প্রচলন অপরিহার্য্য। কিন্তু আমাদের, বিশেষতঃ একরাজশাসনান্তর্গত, বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যায়, একটী রাষ্ট্র বা সাধারণ ভাষা হয় না কেন? আমরা একধর্ম্মাবলম্বী, এক রাজার শাসনাধীন, একজাতীয়; ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সাধারণ লোকের ব্যবহৃত ভাষার পার্থক্য থাকিলেও, আমাদের একটী সর্ব্বজনসমাদৃত সাধুজনব্যবহার্য্য ভাষা আবশ্যক। যেমন ইংলণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে, স্কটলণ্ডের দক্ষিণে ও উত্তরে, আয়ার্লণ্ডে, ওয়েলসে ও উপনিবেশসমূহে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা চলিত থাকিলেও, ইংরাজী সর্ব্বত্র প্রচলিত ও সাধুভাষা, আমাদেরও সেইরূপ একটি ভাষা আবশ্যক।

ইংরাজী আমাদের সাধারণ ভাষা হইতে পারে না। ইংরাজীশিক্ষা আমাদের সাহিত্যিক উন্নতির ব্যাঘাতের কারণ। ইউরোপীয় পাশ্চাত্য ভাষার সাহিত্য দ্বারা আমাদের অনেক উপকার হইয়াছে সন্দেহ নাই; রাজসেবার জন্য ইংরাজী প্রয়োজনীয় হইতে পারে; কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন উপাদানের ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য কত কষ্ট, তাহা সহজেই অনুভব করা যায়। ভাষা শিখিতেই জীবনের মূল্যবান সময় অতিবাহিত করা অকর্ত্তব্য। ক্রমশঃ

শ্রীসারদাচরণ মিত্র

---

# কৃতজ্ঞতা ?

( গাঁদে মোপাসাঁর গল্প অবলম্বনে )

১

আমারি একটি রোগীর কথা বলিতেছিলাম! রোগী নহে, রোগিণী! আজ আর তিনি ইহলোকে নাই, তাই বলিতে বসিয়াছি। কাহিনীটিতে একটু বৈচিত্র্য আছে!

২

রুসিয়ায় তাঁহার জন্মভূমি—আবাল্য রুসদেশেই তিনি প্রতিপালিতা। অপূর্ব্ব সুন্দরী ও কিশোরী, এই কাউণ্টেস মেরি বারাণো! সুগঠিত নাসা, উজ্জ্বল, নীল চক্ষু, সুন্দর মুখ! কয়েক মাস ধরিয়া রোগ ভোগ করিলেও লাবণ্যের এতটুকু রেখাও ঝরিয়া পড়ে নাই! ডাক্তারের পরামর্শে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য তিনি ফ্রান্সে আসিতেছিলেন!

ট্রেনের কামরায় তিনি একাকিনী! ভৃত্য পরিজনবর্গ অন্য কামরায় আসিতেছিল। জানালার ধারে বসিয়া কাউণ্টেস্ পথের দুধারে অবস্থিত গ্রাম নদী শৈলমালা ও ক্ষেত্রগুলির উপর দিয়া চক্ষু বুলাইয়া লইতেছিলেন! তাঁহার জন্মভূমি, এই রুসের প্রতি গাছপালাটির উপরও প্রাণের মায়া এত বিস্তৃত তাহা তিনি যেন, আজ প্রথম অনুভব করিলেন। এই সাধের জন্মভূমি ছাড়িয়া কোথায় তিনি আজ কোন্ অপরিচিত বিদেশ চলিয়াছেন!

প্রতি ষ্টেশনে পুরাণো ভৃত্য আইভ্যান্ আসিয়া 'কি চাহি, না চাহি' তাহারি সন্ধান লইয়া যাইতেছিল। বৃদ্ধ, পুরাণো, বিশ্বস্ত ভৃত্য, আইভ্যান্!

রাত্রি হইল। চারিদিকে আঁধার ছড়াইয়া পড়িল। ট্রেণ দ্রুত ছুটিতেছিল। কাউণ্টেস সেই আঁধারে-ঘেরা বাহিরের দিকেই চাহিয়া—এ কি অন্তহীন, সীমাহীন, রহস্যময় অন্ধকার! চোখে নিদ্রা ছিল না। তাঁহার মনে হইল, একবার ফরাসী মুদ্রা কয়টা তিনি ভালো করিয়া গণিয়া রাখেন! ছোট ব্যাগটি খুলিয়া, ক্রোড়ের উপর রুমাল বিছাইয়া, মুদ্রাগুলি ঢালিলেন। সহসা ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগায়, তিনি চাহিয়া দেখিলেন, কামরার দ্বার খুলিয়া একটি লোক ভিতরে প্রবেশ করিল—রাত্রির পোষাক-পরা, মাথায় তার টুপি নাই, চোখ দুইটা বসিয়া গিয়াছে, শ্রান্ত, বিবর্ণ মুখ। লোকটা কামরার দ্বার বন্ধ করিয়া একটা রুমালে হাতের কবজী জড়াইয়া লইল। কাউণ্টেস ক্ষিপ্রভাবে ক্রোড়ের মুদ্রার উপর ছোট শালখানির আবরণ টানিয়া দিলেন। তাঁহার ভয় হইতেছিল! এ লোকটা, বুঝিবা, কোন দস্যু—তাঁহাকে মুদ্রা গণিতে দেখিয়া কামরায় উঠিয়াছে। কাউণ্টেস ভীতিবিহ্বল স্থির দৃষ্টিতে লোকটার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। লোকটা যেন কাউণ্টেসের ভয়ের কারণ বুঝিতে পারিল,



কহিল, "আপনার কোন ভয় নাই!" কাউণ্টেস কথা কহিলেন না। লোকটা আবার কহিল, "আমি চোর-ডাকাত নহি!"

কাউণ্টেস এবারো কথা কহিলেন না। শালখানা ভালো করিয়া টানিতেই মুদ্রাগুলি ঝন ঝন শব্দে পড়িয়া গেল। লোকটা বিস্ময়ে ফিরিয়া দেখিল। কাউণ্টেস তাড়াতাড়ি উঠিয়া দ্বার খুলিয়া ফেলিলেন। নীচে লাফাইয়া পড়িবেন, এমন সময় লোকটা উঠিয়া সবলে তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিল। বেঞ্চে বসাইয়া কহিল, "আমার কথা শুনুন! আমি চোর নহি! তার প্রমাণস্বরূপ, আমি এখনি আপনার মুদ্রাগুলি সংগ্রহ করিয়া দিতেছি। তবে, আমি দুর্ভাগা, নিতান্ত বিপন্ন। আজ এই রাত্রে রুসের সীমানা অতিক্রম করিতে না পারিলে, আমার প্রাণ যাইবে। আপনি আমাকে রক্ষা করুন! আপনার সাহায্য না পাইলে, আমার আর আশা নাই। মিথ্যা অপবাদে আমার প্রাণ যাইতে বসিয়াছে। আমি বিদেশী—দেশে আমার হতভাগিনী মাতা আমারি পথ চাহিয়া বসিয়া! সব কথা বলিবার সময় নাই! আর এক ঘণ্টার মধ্যেই আমার ভাগ্য-পরীক্ষা! হয়, নিষ্কলঙ্ক জীবন বহন, নয় মিথ্যা অপবাদে রাজদণ্ডে ভীষণ মৃত্যু!"

লোকটা, নতজানু হইয়া মুদ্রাগুলি সংগ্রহ করিল, রুমালে বাঁধিয়া, কাউণ্টেসের হাতে দিয়া, গাড়ীর একপার্শ্বে গিয়া বসিল। গাড়ী চলিতে লাগিল!

উভয়েই নিস্পন্দ, স্থির! কাহারো মুখে কথা ছিল না! কাউণ্টেস তাহার মুখের পানে মাঝে মাঝে চাহিয়া দেখিতেছিলেন। তার বয়স ত্রিশ বৎসর হইবে! চেহারা সুন্দর, ভদ্রলোকের উপযুক্ত বটে! গাড়ী থামিল। আইভ্যান্ আসিয়া কামরার দ্বারে দাঁড়াইল। কাউণ্টেস তাঁহার সহযাত্রীর পানে আর একবার চাহিলেন, ভৃত্যকে কহিলেন, "আইভ্যান, তুমি বাড়ী ফিরিয়া যাও! তোমাকে আপাততঃ আমার দরকার নাই"।

স্তম্ভিত দৃষ্টিতে আইভ্যান্ মনিবের পানে চাহিল, কহিল, "কিন্তু—কিন্তু—"

"না, কোন প্রয়োজন নাই! আমি দু-একদিন আরো পথে দেরী করিয়া ফ্রান্সে যাইব। এই, তোমার ভাড়া! জামা ও মাথার টুপি এখানে রাখিয়া তুমি ফিরিয়া যাও!"

আইভ্যান্ অবাক হইয়া গেল। কর্ত্রীর আজ এ কি খেয়াল! পোষাক খুলিয়া, দিয়া সে চলিয়া গেল—চোখে তার জল আসিয়াছিল।

ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। এবার সীমান্ত অতিক্রম করিবে! কাউণ্টেস আইভ্যানের পোষাক, লোকটার নিকট রাখিয়া কহিলেন, "এই নিন, মশায়—এখন আপনি আমার ভৃত্য, আইভ্যান্! কিন্তু একটা কথা আছে,—আপনি আমার সহিত একটিও কথা কহিবেন না—একটিও না—কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের জন্য ধন্যবাদটুকু অবধি না!"

বিদেশী লোকটি বিনাবাক্যে সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

আবার ট্রেণ থামিল। রাজকর্ম্মচারীর দল আসিয়া কামরার সম্মুখে দাঁড়াইল। কাউণ্টেস তাহাদিগের হস্তে কাগজ দিয়া সঙ্গীর প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, "আমার ভৃত্য, আইভ্যান্! এই তার ছাড়-পত্র!"

বাঁশী বাজাইয়া ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। সকালে জর্ম্মানির একটি ষ্টেসনে লোকটা নামিয়া গেল। দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, সে কহিল, "ক্ষমা করিবেন, আমার এই চুক্তিভঙ্গের অপরাধটুকু! আমার জন্য আপনার চাকরটিকে ছাড়িয়া দিলেন। আমি যদি তার কাজ করিতে পারি ত, ধন্য হই! আদেশ করুন!"

"কোন কাজ নাই, মশায়, তবে অনুগ্রহ করিয়া, পাশের কামরা হইতে আমার দাসী এমাকে ডাকিয়া দিলে বাধিত হই!"

বিদেশী চলিয়া গেল। পথে, যখনি কাউণ্টেস ষ্টেশনের ভোজনশালায় বসিতেন, তখনি দেখিতেন, সেই লোকটি প্লাটফর্ম্মের প্রান্ত হইতে তাঁহাকেই লক্ষ্য করিতেছে।

২

একদিন গৃহে রোগী দেখিতেছি, এমন সময় এক দীর্ঘকায় ভদ্রলোক আমার নিকট আসিল। রোগীর দল চলিয়া গেলে, গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "ডাক্তার, কাউণ্টেস বারাণোর খবর জানেন? তিনি কেমন আছেন?"

আমি কহিলাম, "তাঁর জীবনের কোন আশা নাই! এ জন্মে, রুশে, বুঝি, তিনি আর ফিরিবেন না!" লোকটা কাঁদিয়া ফেলিল। তার পর মাতালের মত উঠিয়া, সে চলিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় কাউণ্টেসকে দেখিতে গিয়া তাঁহাকে



কহিলাম, 'একজন বিদেশী অপরিচিত ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছিল!'

কাউণ্টেস তখন এই কাহিনীটি বলিলেন। আরো তিনি বলিলেন, 'এই লোকটি ছায়ার মত তাঁহার অনুসরণ করে। যেখানে যান, সেখানেই তাহাকে দেখিতে পান! পাগলের মত, সে তাঁহার পানে চাহিয়া থাকে; কখনো একটি কথাও বলে না! এর পরিচয়ও তিনি কিছু জানেন না! জানালার ধারে যাইলে, তাহাকে দেখিতে পাইব!'

কাউণ্টেস উঠিয়া ধীরে ধীরে জানালার পর্দ্দা উঠাইলেন। পথের পানে চাহিয়া দেখি, সেই ব্যক্তি! প্রভাতে আমার নিকট এই-ই গিয়াছিল, বটে! লোকটি পথের বেঞ্চে বসিয়াছিল! দৃষ্টিটুকু তার এই জানালার পানেই! কি সে হতাশ, আকুল দৃষ্টি!

অনুগত পশুর মত, বুঝি, সে কাউণ্টেসকে ভালবাসিত! কৃতজ্ঞ হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা কাউণ্টেসের জন্য সে, উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিল। এ কি উন্মাদের মত, পথে পথে কাউণ্টেসের দর্শন-বাসনায় সে ঘুরিতেছে! আহা, বেচারী! কাউণ্টেস বলিলেন, "অদ্ভুত এর চরিত্র! আমরা পরস্পরকে জানিনা—কিন্তু প্রত্যহ দু তিনবার আমি এই জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াই! লোকটির কোন কাজ নাই। ঐখানেই বসিয়াই নির্ব্বাক অচঞ্চল দৃষ্টিতে এই জানালার পানে চাহিয়া থাকে! এ জগতে এ রহস্যের মীমাংসার সম্ভাবনা নাই, ইচ্ছাও নাই!"

আর একদিন তাহাকে দেখিয়াছিলাম! রোগযন্ত্রণায় কাউণ্টেস অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিছুতে শান্তি নাই, আরাম নাই। ভৃত্যেরা সোফাখানি টানিয়া জানালার ধারে রাখিল। কাউণ্টেস বালিশে ভর দিয়া বসিয়া জানালার পর্দ্দা টানিয়া বাহিরের পানে চাহিলেন, দেখিলেন, তেমনি সে জানালার পানে চাহিয়া রহিয়াছে! কি ব্যাকুলতা, তার দৃষ্টিতে। কাউণ্টেসের পাণ্ডু অধরে হাসির ক্ষীণ রেখা ফুটিয়া উঠিল।

লোকটীকে শেষ দেখিয়াছিলাম, সেদিন ভোর ছয়টায়। কাউণ্টেসের জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হইবার পরমুহূর্ত্তে, যেমনি আমি বাড়ীর বাহিরে আসিলাম, সে আমার হাত ধরিয়া কহিল, "ডাক্তার, আমি একবার শেষ দেখা দেখিয়া আসিব, আপনার সম্মুখেই, এক মুহূর্ত্তের জন্য।"

আমি তার হাত ধরিয়া উপরে লইয়া আসিলাম। জীবন-হীনা কাউণ্টেসের হাতখানি সে আপনার হাতের মধ্যে তুলিয়া লইল এবং চুম্বন করিয়া ধীরে ধীরে শয্যার উপর তাহা নামাইয়া রাখিল। পরে, পাগলের মত সে কোথা বাহির হইয়া গেল। সেই অবধি তাহাকে আর কখনো দেখি নাই।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

---

# ভূ-বিদ্যা।

## (পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

## প্রাস্তরিক খনিজ।

—:o:—

১। কোন্ কোন্ গুণ পরীক্ষা দ্বারা খনিজ স্থির করা যাইতে পারে তাহা সংক্ষেপে পূর্ব্ব পাঠে বলা হইয়াছে। খনিজ চিনিবার সহজ উপায় হ'চ্ছে অনবরত খনিজ লইয়া নাড়াচড়া করা। এইরূপ করিলে অতি সহজে খনিজের সহিত পরিচিত হওয়া যায়—কেবল পুস্তক পড়িলে কিছুই হয় না। যাঁহারা কলিকাতায় বাস করেন। তাঁহারা যাদুঘরে এই সমস্ত খনিজ দেখিতে পারেন এবং সকলেই একটু চেষ্টা করিলে প্রধান প্রধান কয়েকটী খনিজের সংগ্রহ করিতে পারেন। পূর্ব্বে প্রাস্তরিক খনিজের উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রাস্তরিক খনিজগুলিকে মুখ্য, গৌণ ও অনুজ—এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। মুখ্য খনিজগুলি সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানা প্রত্যেকেরই আবশ্যক। মুখ্য প্রাস্তরিক খনিজের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। নীম্নে প্রধান প্রধান মুখ্য প্রাস্তরিক খনিজের নাম প্রদত্ত হইল :—

(ক) করতজ, (খ) ফেলস্ফর, (গ) অগিট, (ঘ) হর্ণব্লেণ্ড, (ঙ) অভ্র (চ) পারিডট, (ছ) কালসীট।



২। করতজ ভূপঞ্জরে অতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহার স্ফটিক ষড়কোণিক শ্রেণীর অন্তর্গত ও দার্ঢ্য=৭। ইহার উপাদান সিলিকন্ ও অম্লজান। করতজ নানা বর্ণের পাওয়া যায়। একরকমের করতজ আছে যাহা অত্যন্ত স্বচ্ছ ও বর্ণবিহীন। পাথরের চশমা এই প্রকার করতজ দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। করতজের আপেক্ষিক গুরুত্ব ২-৬ অর্থাৎ ইহা তুল্য পরিমিত জল অপেক্ষা কিঞ্চিদধিক আড়াইগুণ ভারী! ইহার ছায়া কাচনিভ ও সমভঙ্গতা নাই। গ্রানিট, নিছ, বালুপাথর প্রভৃতিতে করতজ বেশ অনেক পরিমাণে থাকে।

৩। ভূপঞ্জরে আধিক্য হিসাবে করতজের পর ফেলস্ফরের নাম উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ফেলস্ফর দুই প্রকারের—সরলভঙ্গ ও বক্রভঙ্গ; সরলভঙ্গ ফেলস্ফর স্ফটিক একনতিক শ্রেণীর অন্তর্গত ও বক্রভঙ্গ ফেলস্ফর ত্রিনতিক শ্রেণীর অন্তর্গত। একনতিক ফেলস্ফর গ্রানিট্, সানিট্, নিছ্ প্রভৃতি প্রস্তরে ও ত্রিনতিক ফেলস্ফর ডারিট্, আণ্ডেসিট্ প্রভৃতি প্রস্তরে প্রচুর পরিমাণে থাকে। ইহাদের দার্ঢ্য ৬ ও ৭ এতদুভয়ের মাঝামাঝি! ইহাদের সমভঙ্গতা উল্লেখযোগ্য। একনতিক ফেলস্ফর অনেক সময়ে পাট্‌কেলের রংয়ের হইয়া থাকে। ফেলস্ফর আরও নানা বর্ণের হইয়া থাকে। এবং ইহাদের মধ্যে শ্বেত বর্ণ প্রধান। আল্‌বিট, আনথিট প্রভৃতি কতিপয় ফেলস্ফর ত্রিনতিক শ্রেণীর অন্তর্গত। ফেলস্ফরের আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রায় করতজের সমান।

৪। অগিট এক নতিক শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহার রং সাধারণতঃ কাল অথবা কিঞ্চিৎ মেটে মেটে কাল। ভাল ছুরি দিয়া ইহার উপর দাগ বসান যায়। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রায় ৩। ইহারও বেশ সমভঙ্গতা আছে, কিন্তু অনুবীক্ষণের সাহায্য ছাড়া সেই সমভঙ্গতা সহজে ধরা কিছু শক্ত ব্যাপার। অগিট অনেক প্রস্তরে দেখিতে পাওয়া যায়।

৫। হর্নব্লেণ্ড দেখিতে প্রায় অগিটের মত ও অগিটের ন্যায় ইহাও একনতিক শ্রেণীর অন্তর্গত। অনুবীক্ষণের সাহায্য ছাড়া অনেক সময়ে অগিটও হর্নব্লেণ্ড ঠিক ধরা যায় না। হর্নব্লেণ্ডের দার্ঢ্য অগিটের মত—তবে হর্নব্লেণ্ড অগিট অপেক্ষা কিঞ্চিৎ পাতলা ও ইহার স্ফটিকগুলি একটু লম্বা ও সরু ধরণের

কিন্তু অগিটের স্ফটিকগুলি কিছু হ্রস্ব ও মোটা ধরণের। সাধারণ প্রাস্তরিক হর্নব্লেণ্ড অগিটের চেয়ে কিছু বেশী কাল। হর্নব্লেণ্ড আবার নানা রকমের আছে এবং তাহাদের রংও নানা রকমের। আসবিষ্টসের নাম অনেকেই জানেন। ইহাতে আগুন লাগিতে পারে না। কলিকাতাতে যখন কোন স্থানে আগুন লাগে, তখন আসবিষ্টসের কোট পরিয়া সরকারী লোক আগুন নিবাইতে যায়। এই আসবিষ্টস এক প্রকার হর্নব্লেণ্ড। আসবিষ্টস দেখিতে পাটের মত সাদা। হর্নব্লেণ্ড নানা প্রকার প্রস্তরে থাকে।

৬। অভ্র একনতিক শ্রেণীর অন্তর্গত। সাধারণতঃ শাদা ও কাল এই দুই প্রকারের অভ্র দেখিতে পাওয়া যায়। শাদা অভ্রের অপর নাম মস্কোভিট। ছোটনাগপুরের হাজারিবাগ প্রভৃতি অঞ্চলে এই মস্কোভিট প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। অভ্র অত্যন্ত নরম এবং প্রস্তরের মধ্যে ইহাকে অতি সহজে ঠিক করা যায়। ইহা অত্যন্ত সমভঙ্গ এবং সমভঙ্গীভূত পাতগুলি অতি সহজে নতশীল কিন্তু স্থিতিস্থাপক। কাল অভ্রের অপর নাম বিয়োটিট। অভ্র প্রচুর পরিমাণে প্রস্তরে থাকে। এবং আলোর সম্মুখে ধরিলে খুব চক্‌চক্ করিতে থাকে।

৭। প্যারিডট রম্বিক শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহার রং অনেক সময়ে সবুজ বর্ণের হইয়া থাকে। ইহার দার্ঢ্য করতজের প্রায় কাছাকাছি কিন্তু ইহা অত্যন্ত ভারী। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রায় ৩·৫। ইহার উপাদানের মধ্যে লৌহ কিছু বেশী পরিমাণে আছে বলিয়া ইহা এত ভারী।

৮। কালসীট দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহার রং সাধারণত শাদা ও ইহা মর্ম্মর প্রস্তরের ও চূর্ণ প্রস্তরের একটী প্রধান উপাদান। ইহাতে চূর্ণবীজ ও অঙ্গারাম্লজান আছে। ছুরি দিয়া অতি সহজেই ইহার উপর দাগ বসান যাইতে পারে, কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ইহার দার্ঢ্য ১৩। ইহা অত্যন্ত অধিক পরিমাণে সমভঙ্গ। একটী কালসীটের স্ফটিক একটু উচ্চস্থান হইতে ফেলিয়া দিলে অতি সহজেই ইহার সমভঙ্গতা দেখিতে পাওয়া যায়। এই খনিজ পদার্থ পুরুলিয়া প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যায়।



## আকর।

১। কয়েকটি প্রধান প্রাস্তরিক খনিজ সম্বন্ধে পূর্ব্ব পাঠে বলা হইয়াছে। আকর কাহাকে বলে তাহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি অনেকগুলি ধাতু, উপধাতু ও অধাতু মানুষের নিত্য ব্যবহারে লাগে। এই সমস্ত দ্রব্যগুলি প্রায়ই স্বাভাবিক ও মৌলিক অবস্থাতে ভূপঞ্জরে পাওয়া যায় না কিন্তু অন্যান্য মৌলিক পদার্থের সহিত একত্রিত হইয়া ইহারা ভূপঞ্জরে থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাম্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমেরিকা সুপিরিয়ার হ্রদের নিকট ও অন্যান্য কতিপয় স্থানে তাম্র স্বাভাবিক ও মৌলিক অবস্থাতে আছে বটে কিন্তু এই তাম্র সাধারণতঃ গন্ধক, অম্লজান, অঙ্গারাম্লজান, গন্ধকাম্লজান প্রভৃতির সঙ্গে মিশ্রিত থাকে। যখন আবশ্যক হয় তখন এই সমস্ত আকর গলাইয়া সেই দ্রবীভূত পদার্থ হইতে নানা প্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে তাম্র বাহির করিতে হয়। আবার এরূপ অনেক ধাতু আছে যাহা স্বাভাবিক ও যৌগিক অবস্থাতে ভূপঞ্জরে কখনও থাকে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ চূর্ণবীজের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই চূর্ণবীজ স্বাভাবিক ও মৌলিক অবস্থাতে পাওয়া যায় না কিন্তু অম্লজান, গন্ধক, প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত ভাবে ইহা প্রচুর পরিমাণে ভূপঞ্জরে থাকে। এই সমস্ত আকর সাধারণতঃ অন্য প্রস্তরের সহিত পাওয়া যায় এবং কোন কোন স্থানে এই সমস্ত আকরিক খনিজ অত্যন্ত অল্প পরিমাণে ও কোন কোন স্থানে ইহা অত্যন্ত অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। যে সমস্ত প্রস্তরের সহিত আকরিক খনিজ থাকে তাহাদিগকে লোকে সাধারণতঃ খারাপ পাথর বলে। এই সমস্ত খারাপ পাথর যেন ঠিক আকরিক খনিজের দেশ ও ইহাকে আধার প্রস্তর বলা যাইতে পারে। আকরিক খনিজগুলি প্রায়ই এই দেশের মধ্যে নাড়ী ও শিরার ন্যায় পংক্তিতে পংক্তিতে পাওয়া যায় এই সমস্ত পংক্তির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা নানা সময়ে নানা রকমের হইয়া থাকে ও এই সমস্ত পংক্তিকে আমরা খনিজের শিরা বলিতে পারি। ইহাদিগকে দেখিয়া বোধ হয় যেন ইহাদের আধার প্রস্তরের ভিতর ফাট হইয়াছিল এবং

সেই সমস্ত ফাটের মধ্যে এই আকরিক খনিজের উৎপন্ন হইয়াছে। এই সমস্ত আকরিক খনিজের মধ্যে কয়েকটী প্রধান খনিজের উল্লেখ এই স্থলে করা যাইতেছে।

২। স্বর্ণ অন্য খনিজের সহিত মিশ্রিত থাকিলেও ইহাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ভূপঞ্জরে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ছোটনাগপুর প্রদেশের বালুকণা সহিত মিশ্রিত স্বর্ণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। মহীশূর প্রদেশে স্বর্ণের খনি আছে। এই স্থানে স্বর্ণ করতজ প্রস্তরের সহিত পাওয়া যায় এবং এই করতজ গলাইয়া তাহা হইতে সোণা বাহির করিতে হয়। স্বর্ণ দেখিতে হরিদ্রাবর্ণ তাহা সকলেই জানেন। ছুরি দ্বারা ইহাকে সহজেই কাটা যায় ও হাতুরি দ্বারা পিটিয়া ইহাকে ইচ্ছানুরূপ আকার দেওয়া যাইতে পারে। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী এবং জল অপেক্ষা ইহা প্রায় উনিশ গুণ ভারি। অন্য যে সমস্ত স্বর্ণ ঘটিত আকরিক খনিজ আছে তাহারা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য।

৩। রৌপ্যও স্বাভাবিক এবং মৌলিক ভাবে ভূপঞ্জরে দেখিতে পাওয়া যায়। নরওয়ে প্রভৃতি স্থানে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে রৌপ্য পাওয়া যায়। স্বর্ণের ন্যায় রৌপ্য ঘটিত খনিজও অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। রৌপ্যের বর্ণ শাদা। ছুরি দ্বারা ইহার উরের অতি সহজে দাগ বসান যাইতে পারে এবং ইহা জল অপেক্ষা প্রায় এগার গুণ ভারি।

৪। তাম্র জল অপেক্ষা প্রায় নয় গুণ ভারি ও যৌগিক অবস্থা ব্যতিরেকে ইহা অন্যান্য পদার্থের সহিত মিশ্রিত ভাবে ভূপঞ্জরে থাকে। এই সমস্ত মিশ্রিত খনিজের মধ্যে গন্ধক মিশ্র ও অম্লজানঘটিত অঙ্গারাম্লজানঘটিত খনিজগুলি বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। তাম্র ও গন্ধক মিশ্রিত খনিজ দুই প্রকারের আছে। ইহাদের মধ্যে একটীতে তাম্র ও গন্ধকের সঙ্গে লৌহ মিশ্রিত থাকে। ইহা দেখিতে ঠিক সোণার মত এবং সেই হেতু ভূবিদ্যাবিদ্‌গণ ইহাকে বেকুবের সোনা এই নাম দিয়াছেন। সিংহভূম জেলার অন্তর্গত মোহলিয়া নামক স্থানে এই তাম্রলৌহ গন্ধকসংযুক্ত খনিজ পাওয়া যায়। অঙ্গারাম্লজান ঘটিত তাম্রও দুই প্রকারের। ইহাদের একটীর বর্ণ সবুজ ও অন্যটীর বর্ণ নীল। ইহাদের নাম যথাক্রমে সম্ভক ও ময়ূরতুম্ব।



৫। লৌহ কদাচিৎ স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায়। ইহা গন্ধক, অম্লজান, অঙ্গারাম্লজান প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত ভাবে থাকে। অম্লজানঘটিত লৌহগুলি কাল, লাল, হরিদ্রা প্রভৃতি নানা বর্ণের হইয়া থাকে। অয়স্কান্ত অম্লজান ও লৌহ সংযুক্ত খনিজগুলির অন্যতম। ইহা অত্যন্ত বিশেষভাবে চুম্বকগুণবিশিষ্ট অর্থাৎ একটী চুম্বক এই অয়স্কান্তের উপরে ধরিলে ইহা অতি সহজে আকৃষ্ট হয়।

৬। আরসিনিক স্বাভাবিক অবস্থাতে পাওয়া যায় ও গন্ধকমিশ্রিতভাবে ইহা ভূপঞ্জরে থাকে। এই গন্ধকমিশ্রিত আরসিনিক দুই প্রকারের,—একটী লাল বর্ণের ও অপরটী হরিদ্রা বর্ণের। লাল বর্ণের খনিজটীর নাম মোমছাল ও হরিদ্রা বর্ণের খনিজটীর নাম হরিতাল।

৭। পারদ স্বাভাবিক অবস্থাতে ভূপঞ্জরে পাওয়া যায় এবং গন্ধকের সহিত মিশ্রিত থাকে। এই খনিজ অত্যন্ত ভারি ও ইহা লাল বর্ণের।

৮। শীষ স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায় না কিন্তু অন্যান্য পদার্থের সহিত মিশ্রিত থাকে। এই সমস্ত খনিজের মধ্যে গেলিনা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহা অত্যন্ত ভারী ও কাল বর্ণের এবং ছুরিদ্বারা অতি সহজে ইহার উপর দাগ বসান যাইতে পারে। এই খনিজের সমভঙ্গতা বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য।

৯। মৌলিক টিন স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায় না। ইহা প্রধানতঃ অম্লজানের সহিত মিশ্রিতভাবে ভূপঞ্জরে থাকে। এই খনিজের রং কাল ও ইহার দার্ঢ্য অত্যন্ত বেশী ও ছুরি দিয়া ইহার উপর দাগ বসান যাইতে পারে না।

১০। রঙ্গও যৌগিক পদার্থরূপে ভূপঞ্জরে পাওয়া যায় না। ইহা প্রধানতঃ গন্ধকের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে ও ছুরিদ্বারা অতি সহজে ইহার উপর দাগ বসান যাইতে পারে।

১১। এলিউমিনিয়াম্ আজকাল সকলের নিকটই পরিচিত, কিন্তু ইহাও মৌলিক অবস্থাতে ভূপঞ্জরে পাওয়া যায় না। ইহা অম্লজানের সহিত মিশ্রিতভাবে ভূপঞ্জরে থাকে এবং সাধারণতঃ যে খনিজ হইতে এলিউমিনিয়ম্ বাহির করা হইয়া থাকে সেই খনিজ অনেকটা শ্বেত বর্ণের। আরও অনেক পদার্থ আছে যাহা আকর হিসাবে উল্লেখ যোগ্য—কিন্তু এই সমস্ত খনিজের মধ্যে যেগুলি অত্যন্ত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে কয়েকটীর বিষয় এইস্থানে বর্ণিত

হইল। যাহারা এবিষয়ে আরও অধিক পরিমাণে জানিতে ইচ্ছা করেন তাহাদিগকে খনিজবিদ্যা সম্বন্ধে কোনও একখানা পুস্তক পড়িবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত।

---

# সিন্দূর।

—:০:—

নহেও সিন্দূর-বিন্দু! স্বামীর সোহাগ
হর্ষে রাঙ্গা ফুটিয়াছে, সীমন্ত উজলি।—
কোথায় অনলে দীপ্ত কনেকের রাগ!
নীরদ অলকে কোথা চপল বিজলী!
কোথায় লালের-উৎস, রঙ্গের ফোয়ারা,
শ্যামকুণ্ড কূলে কূলে দোল-পূর্ণিমায়!
হিঙ্গুলে-শ্যামলে কোথা সৌন্দর্য্যের ধারা,
অস্তগামী দিনেশের সায়াহ্ন শয্যায়!
বরিষার আবেষ্টনে, পুলকে শিহরে
ফুটে যথা শতদল, অলোকে আলোকে
লাবণ্যের দ্বীপপুঞ্জ! চিত্রকূট শিরে
চৈত্রে যথা ফুল হাসে ঝলকে ঝলকে।—
কি সৌন্দর্য্য! দেখ দেখ, স্বর্ণ-ইন্দু ভায়
গিরি শৃঙ্গে—রূপ সিন্ধু হর্ষে উছলায়।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।

---

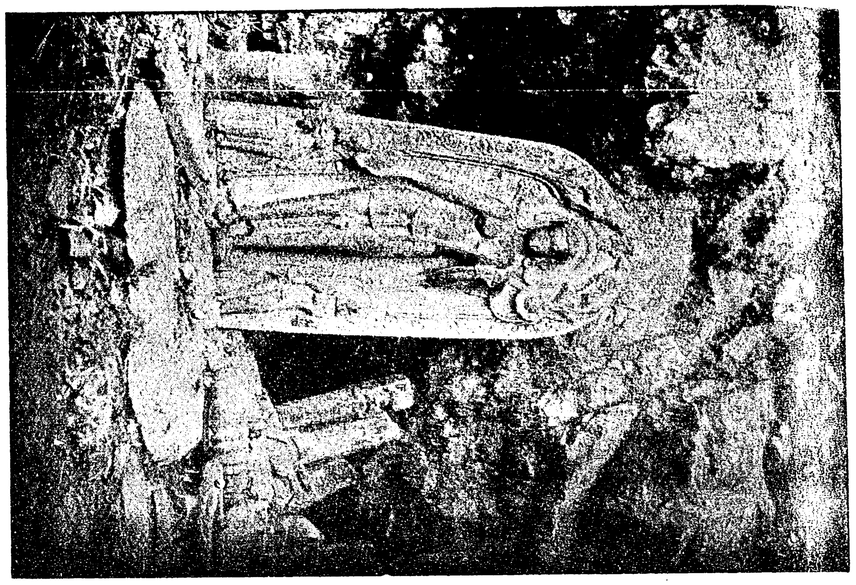

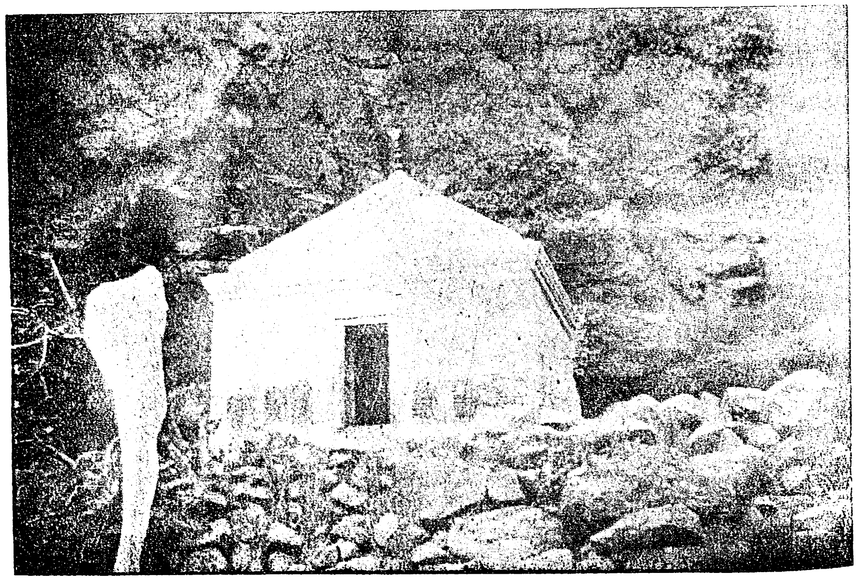

ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম

*Printed by K. V. Seyne & Bros.*



# ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম।

——:o:——

দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে ভগ্ন স্বাস্থ্য হইয়া যখন জামালপুরে অবস্থান করি, তখন মহর্ষি কশ্যপ পুত্র মহাতেজা বিভাণ্ডকাত্মজ রাজর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম দেখিবার জন্য বড়ই ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলাম। যেস্থানে মহাতপা ঋষিবর ঋষ্যশৃঙ্গ বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন নিরত হইয়া নিখিল পাবন অগ্নিদেবের ও দেবাদিদেব মহাদেবের পরিচর্য্যা ও পিতৃশুশ্রূষায় কালাতিপাত করেন—যেখান হইতে ঋষিবর জগৎকে দেখাইয়াছিলেন

"পিতা স্বর্গঃ পিতাঃ ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

সেই পবিত্র আশ্রম দেখিতে কাহার না বাসনা হয়? যাহা হউক্ তৎকালে ঋষিবর ঋষ্যশৃঙ্গের ন্যায় নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ যে বিরল ছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুমাত্র কারণ নাই; কারণ যৎকালে অঙ্গদেশাধিপতি প্রবল পরাক্রান্ত দুর্দ্ধর্ষ নরপতি লোমপাদের দোষে দেশে ঘোরতর অনাবৃষ্টি উপস্থিত, সেই দৈব দুর্বিপাকের দিনে অনাবৃষ্টির হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ও গ্রহগণের প্রীত্যর্থে পূজাদ্বারা শান্তির শীতল বারি আনয়ন করিবার জন্য আমরা স্বয়ং মহারাজকে ব্রাহ্মণদিগের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখি এবং পূতচেতা ব্রাহ্মণদিগকে একবাক্যে বলিতে শুনি—"মহারাজ! এই দুর্ঘটনার শান্তির জন্য মহর্ষি বিভাণ্ডকের পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে যে কোন উপায়ে পারেন রাজ্যমধ্যে আনয়ন করুন। তাঁহাকে যথাযোগ্য সৎকার করিয়া আপনার কন্যা শান্তার সহিত তাঁহার পরিণয় ক্রিয়া সম্পাদন করুন। আপনার রাজ্যে সুবৃষ্টি হইবে।" ইঁহাদের কথামত ঋষ্যশৃঙ্গকে রাজধানী চম্পা নগরীতে কৌশলে আনয়ন করা হইল। তাঁহার পদার্পণে জলদগণ এরূপ বারিবর্ষণ করিতে লাগিলেন যে, সমুদায় সংসার জলপূর্ণ হইয়া উঠিল। এদিকে শান্তার সহিত ঋষিবরের পরিণয় কার্য্যও সম্পাদন হইয়া গেল! রাজ্যের অশান্তি দূর হইল; ধরাধাম হরিদ্বর্ণ শস্যে পূর্ণ হইল—রোগ-জ্বালা দূর হইল, কিন্তু মহারাজের হৃদয়াকাশ হইতে শান্তি বুঝি চিরতরে

বিদায় লইল। কি করিয়া সেই উগ্রতেজা পুত্রগতপ্রাণ বিভাণ্ডক ঋষির কোপ হইতে আপনাকে রক্ষা করিবেন তাহাই তিনি অহোরাত্র ভাবিতে লাগিলেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন, মুনিবরের কোপানল নির্ব্বাণ করিবার জন্য তাঁহার আগমন পথমধ্যে গো, কৃষক পশু ও পশু-পালকগণকে স্থাপন করিয়া তাহাদিগের প্রতি এইরূপ উপদেশ দিলেন যে, 'যখন মহর্ষি বিভাণ্ডক পুত্রান্বেষী হইয়া তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন তোমরা কৃতাঞ্জলিপুটে কহিবে যে, এই সমস্ত পশু ও কৃষক আপনার পুত্রের অধিকৃত। আমরা আপনার অনুগত ভৃত্য, এক্ষণে কিরূপে আপনার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে আজ্ঞা করুন?"

আশ্রমে আসিয়া বিভাণ্ডক মুনি পুত্রের অদর্শনে ক্ষিপ্তের মত হইয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে অতিশয় কোপপরায়ণ হইয়া উঠিলেন। পরে যোগবলে তিনি সকলই জানিতে পারিলেন ও রাজার প্রতি কোপাবিষ্ট হইয়া সরাজা অঙ্গরাজকে ভস্মসাৎ করিবার নিমিত্ত চম্পা নগরাভিমুখে গমন করিলেন। ক্ষুৎপিপাসাতুর ঋষিবর পূর্ব্বোক্ত ঘোষগণের নিকট যথোচিত সৎকার প্রাপ্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কাহার অধিকারে বাস কর?" তাহারাও রাজাদেশমত কহিল, "আমরা আপনার পুত্রের অধিকৃত, আপনার পুত্র এই সমস্ত ধনের অধিকারী।" এবংবিধ বাক্যাবলী শুনিয়া মহর্ষির ক্রোধানল একেবারে নির্ব্বাপিত হইল। চম্পা নগরে প্রবেশ করিবামাত্র মহারাজ স্বয়ং তাঁহাকে পাদ্যার্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক যথোচিত সৎকার করিয়া তাঁহার সন্তোষবিধান করিলেন। পরে পুত্রবৎসল মহর্ষি পুত্র ও পুত্রবধূকে অবলোকন করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দ লাভ করিলেন এবং মহারাজের প্রতি প্রসন্ন হইয়া পুত্রকে তথায় বাস করিতে অনুমতি প্রদান করিয়া বলিলেন, "বৎস! তোমার পুত্র উৎপন্ন হইলে ভূপতির প্রিয়কার্য্য সকল সর্ব্বপ্রযত্নে সম্পাদন করিয়া বনপ্রস্থান করিবে।"

পিতৃভক্ত পুত্র পিতার আজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালনপূর্ব্বক সস্ত্রীক পুনরায় আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। *

* যাঁহারা ঋষ্যশৃঙ্গ সম্বন্ধীয় প্রাচীন কাহিনী ও অন্যান্য বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মহাভারত রামায়ণ এবং Indian Antiquaryর প্রথমখণ্ডে (1872) "Legends of Rishya Sringa" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন।



সেই রাজর্ষির আশ্রম দেখিবার সুযোগ ও সুবিধা সে ক্ষেত্রে আমার হয় নাই। যখন তিনমাস পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসি, তখন সজলনয়নে আমার পিতৃব্য (আদ্যনাথ মিত্র) মহাশয়কে বলিয়াছিলাম, "কাকাবাবু! বিহারে অনেক জিনিষই দেখিলাম—সুলতানগঞ্জে জহ্নু মুনির আশ্রম দেখিয়া নয়ন সার্থক করিয়াছি সত্য, মুঙ্গেরে 'সীতাকুণ্ড,' 'পীরপাহাড়,' 'চণ্ডীস্থান,' 'কষ্টহারিণীর ঘাট' ও 'ড্যাকুরানালা'র ভগ্নাবস্থা প্রভৃতি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানগুলি দেখিয়াছি সত্য, কিন্তু আজ যদি মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম দেখিয়া বাড়ী ফিরিতাম, যদি ঋষিবরের পূত-চরণ-সেবিত আশ্রম—যেখান হইতে নিরন্তর ঋক্ মন্ত্র দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত করিত—যেস্থান পিতৃভক্তির নিদর্শন, বলিলে অত্যুক্তি হয় না, সেই পুণ্যভূমি দেখিয়া যাইতাম, তাহা হইলে প্রাণে একটা অভূতপূর্ব্ব শান্তি পাইতাম।" আমার কথার উত্তরে তিনি সহাস্যবদনে বলিয়াছিলেন,—"বাবা! এস্থলে জরাসন্ধের কারাগার ছিল, এখানে একবার আসলে পুনরায় তাহাকে অন্ততঃ একবারও আসিতেই হইবে। তোমাকেও জীবনে অন্ততঃ একবারও এখানে আসিতে হইবে, তখন তুমি 'ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম' দেখিয়া যাইও।" স্বর্গীয় খুল্লতাতের বাক্য এতদিনে সফল হইল।

ভাগলপুর সাহিত্য সম্মিলন অধিবেশনান্তে আমি ও আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ ও কল্যানভাজন শ্রীমান্ হৃষীকেশ মিত্র, তিনজনে জামালপুর অভিমুখে চলিলাম। যে পবিত্র স্থান দর্শন করিবার বাসনা এই দ্বাদশ বৎসর হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছি, সেই ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম দেখিবার জন্য এবার জামালপুর চলিলাম। পথমধ্যে সুলতানগঞ্জে অবতরণ করিয়া বন্ধুকে জহ্নু মুণির আশ্রম—গৈবীনাথ দেখাইলাম—পরে সেখান হইতে রাত্রি নয়টার সময় আমাদিগের আত্মীয়ের বাড়ীতে গিয়া উঠিলাম এবং সে রাত্রির মত তাঁহাদের গৃহে আহারাদি করিয়া শয়ন করিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে ৮টার গাড়ীতে ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম দেখিতে যাইব স্থির করিলাম। তত্রত্য দু'একজন বৃদ্ধ আমাদিগকে বাধা দিয়া বলিলেন—এ সময়ে সেখানে যাওয়া কোনমতেই উচিত নয়; শিবরাত্রির সময় সেখানে এক মেলা হয়, সেই সময়ে সেখানে অনেক লোকজন গিয়া থাকে, অন্য সময়ে বাঘ-ভালুকের ভয়ে কেহই যাইতে পারে না।

দশ পনের জন লোক একত্র না হইলে যাওয়াই উচিত নয়। আমাদের গৃহস্বামী জয়কৃষ্ণ বাবু বৃদ্ধদিগের আপত্তি শুনিয়া ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, আমি কিন্তু বলিলাম, 'কেহ যান, আর নাই যান, আমি নিশ্চয়ই যাইব।' আমায় দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ দেখিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমৃতবাবু বলিলেন,—"দাদা! আমাদের প্রাণের কি এতই মায়া, চারু ও অমূল্য যখন যাইতেছে, তখন আমিত নিশ্চয়ই যাইব।" এই কথা শুনিয়া বড় বাবুও যাইতে প্রস্তুত হইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে আহারাদি করিয়া আমরা পাঁচ জনে ৮টার গাড়ীতে কাজ্‌রাভিমুখে চলিলাম। বেলা ৯৷৷০টার সময় কাজ্‌রা ষ্টেসনে পৌছাইলাম। ষ্টেসন মাষ্টার মহাশয়কে আমাদের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলাম; তিনি আমাদের সঙ্গে একজন পথ-প্রদর্শক দিলেন। ষ্টেসন মাষ্টার বাবুর নাম শ্রীযুক্ত হরিদাস মুখোপাধ্যায়—খুব অমায়িক ও সদাশয় ব্যক্তি। আমরা ভাগলপুর হইতে আসিতেছি শুনিয়া সাহিত্য-সম্মিলন সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, স্বেচ্ছাসেবকেরা প্রতি-নিধিগণের প্রতি কিরূপ কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন ইত্যাদি নানা কথাবার্ত্তার পর আমরা বেলা ১০টার সময় পথ-প্রদর্শক নথুকে লইয়া গন্তব্য স্থানাভিমুখে চলিলাম।

আমাদিগের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া সূর্য্যদেব আজ তাঁহার রশ্মি কিঞ্চিৎ পরিমাণে সংযত করিয়াছেন। এত পথ এই রৌদ্রে বন্ধুবরকে লইয়া কি করিয়া চলিব, আবার তথা হইতে ফিরিয়া আসিব কি না তাহাই ভাবিতে লাগিলাম; কারণ বন্ধুবর কলিকাতায় এক পদও হাঁটিতে পারেন না কিন্তু তখন তাঁহার উৎসাহ দেখে কে—সকলের উৎসাহ ও আগ্রহ দেখিয়া সে কথা আর মনোমধ্যে স্থান দিলাম না। আশ্রমটী কাজ্‌রা ষ্টেসন হইতে আট মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। যাইবার পথও সুগম নয় এবং কোনরূপ যানেরও বন্দোবস্ত নাই। আমরা আলিপথ ধরিয়া প্রায় তিন চার মাইল চলিবার পর দুর্গম বনমধ্যে উপনীত হইলাম। এই পথ দিয়া চলিবার সময় হরিদ্বর্ণ আফিম গাছের শ্বেতবর্ণ ফুলগুলি আমাদের চক্ষে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। সবুজ গালিচার উপর কে যেন রাশি রাশি খৈ ছড়াইয়া দিয়া গিয়াছে। আমরা দু'একটী ফুল ও ফল ছিঁড়িয়া লইয়াছিলাম। আফিমের ফলকে 'ঢেঁড়ি' বলে। ইহার ভিতর পোস্তদানা



আছে এই ঢেঁড়ির রস হইতে আফিম প্রস্তুত হয়। রস দেখিতে লাল, কিন্তু একদিন থাকিলেই কালো হইয়া যায়। ভগবানের কি সুন্দর সৃষ্টি-কৌশল! একই দ্রব্য হইতে বিষাক্ত ও সুন্দর মুখরোচক খাদ্য দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে। মাঠগুলি ধান্য ও গোধূম প্রভৃতি শস্যশূন্য হইয়া ধূ ধূ করিতেছে। অতিকষ্টে আমরা সেই বনপথ দিয়া চলিতে লাগিলাম। বড় বড় বৃক্ষসকল আমাদিগের নয়নপথের পথিক হইল, কিন্তু তৃষ্ণার্ত্ত আমরা ঐ সকল বৃক্ষে একটী ও ফল দেখিতে পাই-লাম না। খর্জ্জুর, তাল তিন্তিড়ী, 'মহুয়া' শ্যাম প্রভৃতি কত বৃক্ষই দেখিলাম। আসিবার সময় একটী অতি প্রাচীন বর্ত্তমান ও অতীতের সাক্ষীস্বরূপ 'মহুয়া' বৃক্ষ দেখিয়া পথশ্রান্তি অপনোদনের জন্য কিছুক্ষণ তাহার পাদদেশে উপবেশন করিয়াছিলাম। আমরা পাঁচ জনে অতিকষ্টে এই বৃক্ষের কাণ্ডটি হস্তদ্বয় প্রসা-রিত করিয়া বেষ্টন করিতে পারিয়াছিলাম—এইরূপ বৃক্ষ এখানে অনেক আছে। বন্ধুর পথে কাঁটাগাছের অভাব নাই। আদের শরীরের স্থানে স্থানে মধ্যে মধ্যে তাহাদের সস্নেহ স্পর্শ অনুভব করিতেছিলাম। দুই তিন মাইল বনপথ অতিক্রম করিয়া এক পর্ব্বতের সানুদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই পর্ব্বত খরকপুর পর্ব্বতশ্রেণীর অংশবিশেষ বনওয়ারি রাজের অধিকৃত। অতি বৃহৎ বৃক্ষসমূহ ও কাঁটা গাছে পাহাড়টী পরিপূর্ণ। উঠিবার একটী মাত্র সঙ্কীর্ণ পথ আছে। ঐ পথ ধরিয়া আমরা উপরে উঠিয়া কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। পর্ব্বতটা নিতান্ত ছোট নয়। উঠিতে যে আমাদের কোনই কষ্ট হয় নাই এমন কথা বলিতে পারি না, তবে তেমন বিশেষ কষ্টও কিছু বুঝিতে পারি নাই। উপর হইতে নিম্নদেশের দৃশ্য কি সুন্দর! কি মনোরম! কে যেন একখানি ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছে! প্রকৃতির নগ্ন-সৌন্দর্য্য যেন তাহাতে অঙ্কিত রহি-য়াছে। কিয়ৎক্ষণের জন্য তথায় বিশ্রাম করিয়া আমরা পর্ব্বতের অপর পার্শ্ব দিয়া অবতরণ করিলাম। এই স্থানে একটা 'বুনো' 'বোট্‌কা' গন্ধ আমরা সকলেই পাইয়াছিলাম, তাহার কারণ আমরা নির্দ্ধারণ করিতে পারি নাই বা করিবার বিশেষ চেষ্টাও করি নাই। অবতরণ করিয়া আবার চলিতে লাগিলাম। এইখানে আমাদের কলিকাতার ধূলায় পরিপুষ্ট শরীরটাকে উন্মুক্ত হরিৎ-ক্ষেত্রের আরাম-সঞ্চারী সুবিমল পবনহিল্লোলে ছাড়িয়া দিয়া কথাবার্ত্তার নানা

আমোদে বেশ চলিতে লাগিলাম। পথের শেষ নাই। পথ-প্রদর্শক বহুদূর হইতেই আমাদিগকে "আর অধিক দূর নাই" বলিয়া আশ্বস্ত করিতেছিল। এক্ষণে পর্ব্বতের উপর হইতে আশ্রমটী দেখিতে পাইয়া অধিকতর উৎসাহভরে চলিতে লাগিলাম। দূরে অমূল্য বাবু কি একটা জানোয়ার দেখিতে পাইয়া ভয়-চকিত নয়নে আমাদিগকে সেই দিকে দেখিতে বলিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম ওদিকে দেখিতে হইবে না, গন্তব্য পথে অগ্রসর হও—

'আগে চল্ আগে চল্ ভাই,"

অমূল্যবাবু পথ-প্রদর্শক নথুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ পার্ব্বত্য নদীর জল পান করিবার জন্য এখানে প্রায়ই আসিয়া থাকে এবং গরু বাছুর প্রভৃতি লইয়া যায়। সেই পার্ব্বত্য পথ দিয়া চলিতে চলিতে আমরা এক ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম—ধরিত্রীর কটিদেশে মেখলার ন্যায় শোভমান হইয়া এই ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নদী মৃদুমন্থর গতিতে আপনার পথে চলিয়াছে। আমরা সকলে অনায়াসে পদব্রজে পরপারে উত্তীর্ণ হইলাম, কিন্তু শুনিলাম বর্ষাকালে এই ক্ষুদ্রকায় নদীটি বিশালরূপ ধারণ করে এবং খরস্রোতা হইয়া প্রবাহিত হইতে থাকে। তখন ইহাতে পদার্পণ করিতে কেহই সাহসী হয় না। এখনে জনমানবের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না, কেবল কতকগুলি খেচরকে জলপান করিতে দেখিতে পাইলাম। তাহারা আমাদিগকে দেখিয়া উড়িয়া যাইল না। জানিনা আশ্রম-মাহাত্ম্যে বোধ হয় তাহারা এরূপ করিতে সাহসী হইয়াছিল। নথুর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম পার্ব্বত্য কোল ও ভালেরা এই নদা হইতে জল লইয়া যায়। তাহারা পর্ব্বতের অপর পারে বাস করে। কিয়দ্দূরে একটী উচ্চ মঞ্চ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম বনওয়ালিরাজের জনৈক কর্ম্মচারী উহার উপর সমস্ত দিন বসিয়া থাকেন ও পার্ব্বত্য লোকদিগের নিকট হইতে প্রত্যেক মোট কাষ্ঠের মাশুল বাবত এক 'সিক্কা-পয়সা' আদায় করিয়া থাকেন; সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তিনি স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্রকায়া নদী পার হইয়া গমন করিবার পর এক অশ্রুতপূর্ব্ব শব্দ শুনিয়া আমাদের মধ্যে অপর চারিজনের একটা আতঙ্কের ভাব



আসিয়া পড়িল। মুখেও ভয়ের চিহ্ন স্পষ্ট দেখা দিল। আমাকে তাঁহারা হাসিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইলেন, সকলেই সেইখানে "নযযৌ তস্থৌ" হইয়া দাঁড়াইলেন। তখন নিকটে পথপ্রদর্শকও ছিল না, সে আমাদের কিছু পশ্চাতে পড়িয়াছিল—তাহার জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়িল। অমূল্যবাবুকে তদবস্থায় দেখিয়া বলিলাম, 'বন্ধু হে, যে ভয় করিতেছ, ইহা তাহা নয়। নিশ্চয়ই এটী জল-প্রপাতের জল-কল্লোল। গৌহাটীতে যখন বশিষ্ঠ আশ্রম দেখিতে গিয়াছিলাম, তখন দূর হইতে এইরূপ শব্দ শুনিয়াছিলাম।' ইতিমধ্যে নথু তথায় উপস্থিত হইয়া আমার কথার যাথার্থ্যই প্রমান করিল এবং বলিল অদূরে ঐ আশ্রম। আমরাও জলপ্রপাতের জলকল্লোল শুনিতে শুনিতে ও জল প্রবাহ দেখিতে দেখিতে চলিতে লাগিলাম। জলস্তম্ভ ছোট বড় উপলখণ্ডে আহত হইয়া শব্দ করিতে করিতে অপর দিক হইতে আগত জলস্তম্ভের সহিত মিলিত হইয়া বেগে নিম্নাভিমুখে ছুটিতেছে। মনে পড়িল অমর কবি টেনিসনের সেই

"I chatter over stony ways
I babble through the pebbles."

নানাবিধ ক্ষুদ্র বৃহৎ বৃক্ষ-সমন্বিত অরণ্যের মধ্যে পর্ব্বতের গাত্র ভেদ করিয়া জল-কল্লোল নাচিতে নাচিতে ছুটিয়াছে। এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমরা পর্ব্বতের উপর উঠিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই মন্দিরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম। শ্রান্তি দূর করিয়া প্রাণ ভরিয়া সেই ঝর্ণার সুস্বাদু জল পান করিয়া তৃষ্ণা দূর করিলাম।

আহা স্থানটী কি সুন্দর, মনোরম। ধ্যানধারণা করিবার উপযুক্ত স্থান। চিত্তচাঞ্চল্যের কোন কারণই এখানে বিদ্যমান নাই। একটী অত্যুচ্চ পর্ব্বতের পাদদেশে মন্দিরটী অবস্থিত। পর্ব্বতটী এরূপ ভাবে অবস্থিত যে, বোধ হয় প্রতি মুহূর্ত্তেই খসিয়া পড়িতে পারে, কিন্তু হায় কে বলিতে পারে কত যুগ যুগান্তর ধরিয়া এই ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া শৈলমালা কত রাজ্যের উত্থান পতন—কত না রাজার ভাগ্য চক্রের পরিবর্ত্তন দেখিয়াছে—কত না জাতির উত্থান পতন অবলোকন করিয়াছে—কত না মুনি ঋষি যতির পদচিহ্ন মস্তকে ধারণ করিয়াছে।

আমোদে বেশ চলিতে লাগিলাম। পথের শেষ নাই। পথ-প্রদর্শক বহুদূর হইতেই আমাদিগকে "আর অধিক দূর নাই" বলিয়া আশ্বস্ত করিতেছিল। এক্ষণে পর্ব্বতের উপর হইতে আশ্রমটী দেখিতে পাইয়া অধিকতর উৎসাহভরে চলিতে লাগিলাম। দূরে অমূল্য বাবু কি একটা জানোয়ার দেখিতে পাইয়া ভয়-চকিত নয়নে আমাদিগকে সেই দিকে দেখিতে বলিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম ওদিকে দেখিতে হইবে না, গন্তব্য পথে অগ্রসর হও—

'আগে চল্ আগে চল্ ভাই,"

অমূল্যবাবু পথ-প্রদর্শক নথুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ পার্ব্বত্য নদীর জল পান করিবার জন্য এখানে প্রায়ই আসিয়া থাকে এবং গরু বাছুর প্রভৃতি লইয়া যায়। সেই পার্ব্বত্য পথ দিয়া চলিতে চলিতে আমরা এক ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম—ধরিত্রীর কটিদেশে মেখলার ন্যায় শোভমান হইয়া এই ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নদী মৃদুমন্থর গতিতে আপনার পথে চলিয়াছে। আমরা সকলে অনায়াসে পদব্রজে পরপারে উত্তীর্ণ হইলাম, কিন্তু শুনিলাম বর্ষাকালে এই ক্ষুদ্রকায় নদীটি বিশালরূপ ধারণ করে এবং খরস্রোতা হইয়া প্রবাহিত হইতে থাকে। তখন ইহাতে পদার্পণ করিতে কেহই সাহসী হয় না। এখনে জনমানবের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না, কেবল কতকগুলি খেচরকে জলপান করিতে দেখিতে পাইলাম। তাহারা আমাদিগকে দেখিয়া উড়িয়া যাইল না। জানিনা আশ্রম-মাহাত্ম্যে বোধ হয় তাহারা এরূপ করিতে সাহসী হইয়াছিল। নথুর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম পার্ব্বত্য কোল ও ভালেরা এই নদী হইতে জল লইয়া যায়। তাহারা পর্ব্বতের অপর পারে বাস করে। কিয়দ্দূরে একটী উচ্চ মঞ্চ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম বনওয়ালিরাজের জনৈক কর্ম্মচারী উহার উপর সমস্ত দিন বসিয়া থাকেন ও পার্ব্বত্য লোকদিগের নিকট হইতে প্রত্যেক মোট কাষ্ঠের মাশুল বাবত এক 'সিক্কা-পয়সা' আদায় করিয়া থাকেন; সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তিনি স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্রকায়া নদী পার হইয়া গমন করিবার পর এক অশ্রুতপূর্ব্ব শব্দ শুনিয়া আমাদের মধ্যে অপর চারিজনের একটা আতঙ্কের ভাব



আসিয়া পড়িল। মুখেও ভয়ের চিহ্ন স্পষ্ট দেখা দিল। আমাকে তাঁহারা হাসিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইলেন, সকলেই সেইখানে "নযৌ তস্থৌ" হইয়া দাঁড়াইলেন। তখন নিকটে পথপ্রদর্শকও ছিল না, সে আমাদের কিছু পশ্চাতে পড়িয়াছিল—তাহার জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়িল। অমূল্যবাবুকে তদবস্থায় দেখিয়া বলিলাম, 'বন্ধু হে, যে ভয় করিতেছ, ইহা তাহা নয়। নিশ্চয়ই এটী জল-প্রপাতের জল-কল্লোল। গৌহাটীতে যখন বশিষ্ঠ আশ্রম দেখিতে গিয়াছিলাম, তখন দূর হইতে এইরূপ শব্দ শুনিয়াছিলাম।' ইতিমধ্যে নথু তথায় উপস্থিত হইয়া আমার কথার যাথার্থ্যই প্রমান করিল এবং বলিল অদূরে ঐ আশ্রম। আমরাও জলপ্রপাতের জলকল্লোল শুনিতে শুনিতে ও জল প্রবাহ দেখিতে দেখিতে চলিতে লাগিলাম। জলস্তম্ভ ছোট বড় উপলখণ্ডে আহত হইয়া শব্দ করিতে করিতে অপর দিক হইতে আগত জলস্তম্ভের সহিত মিলিত হইয়া বেগে নিম্নাভিমুখে ছুটিতেছে। মনে পড়িল অমর কবি টেনিসনের সেই

"I chatter over stony ways
I babble through the pebbles."

নানাবিধ ক্ষুদ্র বৃহৎ বৃক্ষ-সমন্বিত অরণ্যের মধ্যে পর্ব্বতের গাত্র ভেদ করিয়া জল-কল্লোল নাচিতে নাচিতে ছুটিয়াছে। এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমরা পর্ব্বতের উপর উঠিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই মন্দিরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম। শ্রান্তি দূর করিয়া প্রাণ ভরিয়া সেই ঝর্ণার সুস্বাদু জল পান করিয়া তৃষ্ণা দূর করিলাম।

আহা স্থানটী কি সুন্দর, মনোরম। ধ্যানধারণা করিবার উপযুক্ত স্থান। চিত্তচাঞ্চল্যের কোন কারণই এখানে বিদ্যমান নাই। একটী অত্যুচ্চ পর্ব্বতের পাদদেশে মন্দিরটী অবস্থিত। পর্ব্বতটী এরূপ ভাবে অবস্থিত যে, বোধ হয় প্রতি মুহূর্ত্তেই খসিয়া পড়িতে পারে, কিন্তু হায় কে বলিতে পারে কত যুগ যুগান্তর ধরিয়া এই ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া শৈলমালা কত রাজ্যের উত্থান পতন—কত না রাজার ভাগ্য চক্রের পরিবর্ত্তন দেখিয়াছে—কত না জাতির উত্থান পতন অবলোকন করিয়াছে—কত না মুনি ঋষি যতির পদচিহ্ন মস্তকে ধারণ করিয়াছে।

এই স্থলে অনেকগুলি বানর দেখিতে পাইলাম। মন্দিরটী কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার কোন ধনী শেঠদ্বারা সংস্কৃত হইয়াছে। পর্ব্বতের নাম 'সিঙ্গিরিক', বা 'ঋষ্যশৃঙ্গ' পর্ব্বত। পর্ব্বতের নামানুসারে মন্দিরের নাম হইয়াছে। পর্ব্বতে উঠিয়া একজন 'মৌনীবাবা' ও অপর দুই জন পাণ্ডার সাক্ষাৎ পাইলাম। মানুষের মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া এতক্ষণে একটু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। হিন্দুর দেবদেবীর মূর্ত্তি সকল কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে খোদিত হইয়া প্রাচীর গাত্রে বিরাজ করিতেছে। মন্দিরের দক্ষিণ দিকের প্রাচীর গাত্রে নিম্নলিখিত মূর্ত্তিগুলি খোদিত আছে:—

(১) লক্ষ্মী

(২) লক্ষ্মীর চক্র

(৩) চতুর্ভুজধারী বিষ্ণু ও নিম্নে জনৈক বিষ্ণুভক্তের মূর্ত্তি ও বিষ্ণুর চক্র বিরাজমান।

তৎপরে প্রাচীর গাত্রের অপর একস্থান হইতে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তি উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে দেখিলেই স্পষ্ট বোধ হয়। পাণ্ডাঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম কিছুদিন পূর্ব্বে কয়েকজন যাত্রী আসিয়া চুরি করিয়া খুলিয়া লইয়া গিয়াছে। এই বাক্য কয়টী বলিতে বলিতে তাঁহার নয়নে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা দিল—উত্তেজিত স্বরে ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিল, 'যদি চোরেরা আমার সম্মুখ হইতে ঐ প্রস্তর খানি উঠাইয়া লইতে পারিত, তাহা হইলে তাহাকে বাহাদুর বলিতাম। আমার জীবন থাকিতে কখন তাহাকে লইতে দিতাম না, হয় তাহাকে মারিয়া ফেলিতাম, নয় নিজে মরিতাম। আমাকে মারিয়া না ফেলিলে সেই চোরকে কখনই পাহাড় হইতে নামিতে দিতাম না। তাহাকে 'ক্ষমার সমান ধর্ম্ম নাই'—'ক্রোধ ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে' ইত্যাদি নানা কথায় বুঝাইতে পারিলাম না যে ক্রোধ চণ্ডাল। ব্রাহ্মণের ক্রোধ পরবশ হওয়া কিছুতেই উচিত নয়। যাহা হউক বোধ হয় ভাগলপুর সাহিত্য-সম্মিলনের প্রদর্শনী গৃহে ঋষ্যশৃঙ্গ হইতে আনীত যে প্রস্তর মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম, ঐখানিই পূর্ব্বোক্ত স্থান হইতে গৃহীত। এই স্থানে একটী বৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর মূর্ত্তি পড়িয়া রহিয়াছে দেখিলাম। পণ্ডারা উহাকে পার্ব্বতীর মূর্ত্তি বলিল, কিন্তু আমাদের মতে উহা 'কমলে কামিনীর' মূর্ত্তি। বলিতে পারি না, কোন সাহেব মহাত্মা এই



মূর্ত্তিকে বৌদ্ধ 'তারা'র মূর্ত্তি বলিয়া বসেন। কিন্তু এই দেবী মূর্ত্তির চিত্রটী দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে দুইটী হস্তী শুণ্ডদ্বারা দেবীমূর্ত্তির মস্তকোপরি জল সেচন করিতেছে। এই স্থানে একটী বৃহৎ প্রস্তর নির্ম্মিত গৌরীপট্ট ভগ্নাবস্থায় দেখিলাম। শিবলিঙ্গ দেখিতে পাইলাম না। বোধ হয় বহুপূর্ব্বে এই গৌরীপট্ট মন্দিরের ভিতর ছিল। উত্তর দিকের প্রাচীর গাত্রে সপ্তমুনি, পার্ব্বতী, গৌরী, সন্ধ্যা ও গণেশের খোদিত মূর্ত্তি আছে। এতদ্ব্যতীত লক্ষ্মী-চক্র ও বিষ্ণুচক্র আছে। মন্দিরের পুরোভাগে ঐরূপ খোদিত লক্ষ্মী, জালিপা ও চতুর্ভুজা হরগৌরী মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। মন্দিরের অভ্যন্তরের প্রাচীর গাত্রে কোনরূপ খোদিত মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম না। মন্দিরাভ্যন্তরে নরমেধেশ্বর শিবলিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। ইঁহার গৌরীপট্ট পূর্ব্বোক্ত গৌরীপট্ট অপেক্ষা অনেক ছোট দেখিয়া বোধ হয় বহুপূর্ব্বে শিবলিঙ্গ ভগ্ন হইয়া যাওয়ায়, নূতন শিবলিঙ্গ স্থাপিত হইয়াছে। এই স্থানে আমরা কোনরূপ বৌদ্ধমূর্ত্তি দেখিতে পাই নাই। সপ্তমুনিকে সপ্ত বৌদ্ধশ্রমণ বলিয়া ধরিয়া লইলেও অন্য কোন বৌদ্ধ মূর্ত্তি আমরা দেখিতে পাই নাই। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কেও একথার যাথার্থ্য স্বীকার করিতে হইবে।

মন্দিরের উত্তর দিকের পর্ব্বতের ভিতর হইতে দুইটী স্রোতধারা বহিয়া একটী কুণ্ডের ভিতর পড়িতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় একটী প্রবাহ ঈষদুষ্ণ, অপরটী স্নিগ্ধ শীতল। শুনিলাম, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ ও সর্ব্ব ঋতুতেই প্রাতঃকালে উষ্ণ প্রবাহ এরূপ উষ্ণ থাকে যে তাহার জল হস্তে রাখা সহজ সাধ্য ব্যাপার নয়। ভগবানের কি আশ্চর্য্য মহিমা একাধারে উষ্ণ ও শীতল বারি। আমরাও জলের উষ্ণতা বেশ অনুভব করিলাম। আমাদের বোধ হয় পর্ব্বতের অপর পার্শ্বস্থ কোন উষ্ণ প্রস্রবন হইতে এই জল আসিয়া কুণ্ডে পতিত হইতেছে। এই কুণ্ড হইতেই জলধারা নিম্নাভিমুখে বহিয়া চলিতেছে। প্রতিবৎসর শিবরাত্রির সময় এখানে একটী মেলা বসিয়া থাকে। সেই সময় এইস্থানে প্রায় সহস্রাধিক যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। বহুদূর দূরান্তর হইতে সাধু সন্ন্যাসীরা আসিয়া থাকেন। অধিকাংশ যাত্রীই পদব্রজে আসিয়া থাকে। সুলতানগঞ্জ হইতে তাহারা গঙ্গাজল লইয়া ঠাকুরের মস্তকে ঢালিতে থাকে ও

ব্যোম ব্যোম, হর হর' শব্দে দিগমণ্ডল নিনাদিত করিয়া থাকে। সন্নিকটস্থ ষ্টেসন সমূহ হইতেও যাত্রী সকল আসিয়া থাকে।

এইস্থলে আমরা বহু চেষ্টা করিয়াও কানিংহ্যাম সাহেবের লিখিত ২টী খোদিত লিপি দেখিতে পাই নাই। বোধ হয় সে দুইটী স্থানান্তরিত করা হইয়াছে যাহা হউক আমরা সাহেবের রিপোর্ট হইতে কয়েকছত্র অনুবাদ করিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম ;—

"এইস্থানে উপস্থিত হওয়া কঠিন। এমন কি সহজসাধ্য ব্যাপার নয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বুকানন সাহেব এইস্থানের উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার 'ঋষিকুণ্ড' মুঙ্গেরের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ পর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থিত একটী উষ্ণ প্রস্রবণ ভিন্ন আর কিছুই নয় এবং উহা সীতাকুণ্ড হইতে ৬।৭ মাইল দূরে অবস্থিত। 'সিঙ্গিরিখি' বা 'ঋষ্য শৃঙ্গ' পর্ব্বতস্থ মন্দিরে অনেকগুলি বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দেব-দেবীর মূর্ত্তি আছে এবং এইখানে দুইটী খোদিত লিপি আছে। তাহার মধ্যে একটী যে বৌদ্ধদিগের তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

শিষ্যমণ্ডলী পরিবেষ্টিত বুদ্ধদেব এক উচ্চ বেদীর উপর হইতে মাল্যদান-নিরত দুইজন প্রণত শিষ্যকে উপদেশ দিতেছেন। বুদ্ধদেবের পশ্চাতে তাঁহার দুই শিষ্য বসিয়া আছেন ও তাঁহাদের পশ্চাতে একটী ঘোটক ও হস্তী দণ্ডায়মান। এই চিত্রের পাদদেশে "সবথ দে ধম্মা" অর্থাৎ সবর্থের পুণ্যদান লিখিত আছে। কিন্তু এই সবথের বিষয় আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অক্ষরগুলি বেশ স্পষ্ট আছে। অপরটী এইরূপ ঃ—

১। সংবৎর পঞ্চ ত্রিংসতিমে জ্যেষ্ঠ সুদি ত্রয়োদস্যাম্
২। ইদ ভবতু সুগং স্তপিতে উধয়াছলি পাষিবে
৩। মধু ভুনেকাতম্ জত পুণ্য মাত পিত

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় ৩ঃ সম্বৎ ১৩হ জ্যৈষ্ঠ সুদি এই লিপি খোদিত হইয়াছিল।" *

কানিংহ্যাম সাহেবের মতে আজি হইতে ১৯৩৪ বৎসর পূর্ব্বে এই লিপি খোদিত হইয়াছিল।

* Arch. Surv. of India Reports Vol XV. P 20.



সবথ সম্বন্ধে বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। 'সবথ' একজন শ্রেষ্ঠী ছিলেন, অনাথ পিণ্ডিক প্রভৃতি শ্রেষ্ঠিগণ বিহারাদি নির্ম্মান করিয়া এবং নানাবিধ দান ধর্ম্মের দ্বারা বৌদ্ধ ধর্ম্মের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছিলেন ; সবথও সেইরূপ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া "দেয় ধর্ম্মের" দৃষ্টান্ত রখিয়া গিয়াছেন। ইনি মহাযান পথের পথিক। ইনি "দেয় ধর্ম্ম" পালন করিয়া "মোক্থ মুগ্গে পতিট্ঠাপয় মানো" হন। †

১৩১৬ সালে আষাঢ় মাসের "আর্চ্চনা" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত বিহারী লাল আঢ্য মহাশয় 'অঙ্গের প্রাচীন কীর্ত্তি' নামক প্রবন্ধে ১৪২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—"ঋষ্যশৃঙ্গ পর্ব্বত। মুঙ্গের রেলওয়ে ষ্টেশনের দক্ষিণ দিকে পাঁচ মাইল দূরে অপর একটি প্রত্যন্ত পর্ব্বত আছে। ইহাও উপরোক্ত খরকপুর পর্ব্বতের অংশ। ইহাকে লোকে ঋষ্যশৃঙ্গ পর্ব্বত বলে। প্রবাদ এই যে, এই পর্ব্বতে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম ছিল। কিন্তু এক্ষণে আশ্রমের কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না।" বুকানন সাহেবের ভ্রান্তমত লেখক মহাশয় সমর্থন করিয়াছেন দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। ক্যানিংহাম সাহেবের রিপোর্ট না দেখিলেও তিনি একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া ই, আই, রেল কেম্পানীর টাইমটেবেলে মুঙ্গের বর্ণনা স্থানে দেখিতে পাইতেন "About five miles to the South of the Station (Kajra) there is another hill known as 'Rishya Shringa' and famed as the hermitage of the Rishi after whom the hill has been called." লেখক মহাশয় উক্ত রেল কোম্পানীর প্রকাশিত "Table of Important Melas and Fairs" নামক পুস্তিকার অষ্টম পৃষ্ঠায় দেখিতে পাইবেন তাঁহার উল্লিখিত ঋষ্যশৃঙ্গপর্ব্বত বরিয়ারপুরস্থ 'ঋষিকুণ্ড' ভিন্ন আর কিছুই নয়।

আমরা সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া সাড়ে তিনটার সময় ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিলাম। ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয় ত আশ্চর্য্য হইয়া যাইলেন। ৮.৯ ঘণ্টার পূর্ব্বে কেহ যে ঋষ্যশৃঙ্গ আশ্রম হইতে ফিরিয়া আসিতে পারে, তাহা তাঁহার ধারণাই ছিল না। অবশ্য আমাদিগকে ৪৷৷৹ টার ট্রেণ ধরিতে হইবে বলিয়া দ্রুত আসিতে

† অন্য কথা—দ্বিতীয় খণ্ড।

হইয়াছিল। মাষ্টার মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া ৪॥০ টার ট্রেনে জামালপুর ফিরিলাম। *

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র।

---

# মুগ্ধ।

—:o:—

( Kisfaludy হইতে )

নীল আকাশের বিমল বিভাতে
তোমারেই শুধু দেখি কিশোরী!
গিরি নির্ঝরের রূপালি তুফানে
তুমি দেখা দাও মূরতি ধরি!
স্পন্দনহীন প্রখর রৌদ্রে
রয়েছ দাঁড়ায়ে হে অপ্সরী!
চঞ্চল শিখা তারায় তারায়
হাসিছ আকুল জোছনা ভরি!
যে দিকে চাই
দেখি তোমায়!
আঁখি ফিরাই,—
রয়েছ! হায়!
কভু পিছে কভু হাসিছ সমুখে,
হায় নিষ্ঠুরা! একি চাতুরী!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

---

*এপ্রকাশিত দুইখানি চিত্রের ফটো শ্রীমান হৃষিকেশ মিত্র কর্ত্তৃক গৃহীত



# অর্থনীতি।

—০:*:০—

১৫৮১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রথম অর্থনীতি সম্বন্ধীয় পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের নাম "Brief conceipt of English Policy," প্রণেতা উইলিয়াম ষ্টাফোর্ড। প্রায় এই সময়েই ইটালী দেশে বার্ণার্ডো "The Tuscan cultivation" নামক অর্থনীতি বিষয়ক পুস্তকে টাস্কানি দেশের আর্থিক বিষয় লিপিবদ্ধ করেন। ইটালীতে এই সময়েই অর্থনীতি বিষয়ক আরও দুইখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। প্রথমখানি গ্যাস্‌পার্ স্কারুফিক্ত—Discourse on money and the true proportion of gold and silver. এণ্টনিও সেরা প্রণীত—Brief Treatise on the causes which make gold and silver abundant in kingdoms দ্বিতীয় পুস্তক।

এই সময়ে ইংলণ্ডে Mercantile Policy সম্বন্ধে তুমুল আন্দোলন হয়। এই মতের প্রবর্ত্তকগণ সুবর্ণ রৌপ্য বা মূল্যবান প্রস্তরাদি দেশের বাহিরে যাইতে দেওয়া কোনরূপেই সঙ্গত বোধ করিতেন না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সওদাগরগণ ভারতবর্ষে আসিয়া দ্রব্যাদি বিনিময়ে যখন এ দেশীয় দ্রব্যাদি কিনিতে সক্ষম হইলেন না এবং স্বর্ণ বা রৌপ্য ব্যতিরেকে দ্রব্যাদি খরিদ যখন অসম্ভব হইল তখন নগদ মুদ্রায় ত্রিশ সহস্র পাউণ্ড রপ্তানি করিবার আদেশ ইহাদের দেওয়া হইল।

১৬১৩ খৃষ্টাব্দে সার ডাড্‌লি ডিগেস্ "Defence of Trade" নামক পুস্তকে ইংলণ্ড হইতে বৎসর বৎসর অনেক নগদ টাকা রপ্তানি হইয়া যাওয়া সত্বেও ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য ইংলণ্ডের পক্ষে লাভজনক কেন ইহার কারণ দর্শাইয়া উক্ত বাণিজ্যের সপক্ষে পত্র লেখেন। ১৬২১ খৃষ্টাব্দে সার টমাস্ মান "Discourse on Trade from England into the East Indies" লেখেন। এই পুস্তকে তিনি দেখাইয়া দেন যে দেশের আমদানী দ্বারাই বৈদেশিক বাণিজ্যের লাভালাভ ঠিক করা যায় এবং রপ্তানীর সহিত তুলনায়

আমদানী কোন অংশেই কম প্রয়োজনীয় নহে। ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে মুদ্রাদি রপ্তানি সম্বন্ধে সকল প্রকার প্রতিবন্ধক আইনদ্বারা দূরীভূত করা হয়।

ইংলণ্ড যখন অর্থনীতি বিষয়ক প্রস্তাবাদি লইয়া ব্যগ্র ছিল তখন তাহার প্রতিদ্বন্দী ফ্রান্সও নিশ্চেষ্ট ছিল না। প্রথিতনামা সালী ( Maximilian de Bethune Duke of Sully ) তখন চতুর্থ হেনরীর মন্ত্রী এবং বস্তুতঃ ফ্রান্সের সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। দেশের উন্নতির জন্য তিনি কতকগুলি নিয়ম প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিশেষ উল্লেখযোগ্যঃ—প্রথম—শস্যাদি রপ্তানি হইবার বিরুদ্ধে যে কয়েকটী নিয়ম প্রচলিত ছিল সেগুলি কতকপরিমাণে শিথিল করিয়া দেন। কৃষিদিগের উপর যে সমস্ত কর ধার্য্য ছিল সে সকল করের হার কমাইয়া দেন এবং যাহাতে কৃষির উন্নতি হয় তজ্জন্য শিল্পের অনাদর করিতে থাকেন। পরবর্ত্তী কালে চতুর্দ্দশ লুইর প্রধান মন্ত্রী কোলবার্ট কৃষির অনাদর করিয়া শিল্পের উপরই অধিক যত্ন প্রকাশ করিতে থাকেন। এই উদ্দেশ্য সাধন মানসে তিনি পাঁচটি বিধি প্রণয়ন করেন। শস্যাদির রপ্তানি বন্ধ করিয়া দেওয়াতে অনেক জমি অকর্ষণাবস্থায় পড়িয়া থাকে এবং দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। বৈদেশিক দ্রব্যাদির আমদানী রহিত করাতে হলণ্ড বাসীরাও প্রতিশোধ কামনায় ফরাসী মদ্যের উপর শুল্ক স্থাপন করে। বাধ্য হইয়া ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে নিমিজিউয়েনের সন্ধি দ্বারা ফ্রান্সকে হলণ্ডের সহিত অবাধ-বাণিজ্যে আবদ্ধ হইতে হয়। কোলবার্ট, যাহারা বাণিজ্যার্থ নূতন কোম্পানি স্থাপন করিতে লাগিলেন অথবা সামুদ্রিক বাণিজ্যে রত হইতে লাগিলেন তাহাদের নানাপ্রকারে উৎসাহিত করিলেন এবং অবাধে স্বর্ণ ও রৌপ্যের রপ্তানির অনুমতি দিলেন। এই সমস্ত বিষয় যাহাতে সুকৌশলে সম্পন্ন হয় তজ্জন্য কোলবার্ট ফ্রান্সে এক আইন (Ordnance de la Marine) প্রণয়ন করেন।

এদিকে ইংলণ্ডে ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে সার উইলিয়াম পেটী Treatise on Taxes and Contributions নামক অর্থনীতি বিষয়ক এক পুস্তিকা লেখেন। ইহাতে তিনি স্পষ্টাক্ষরেই বলেন যে "ভূমি এবং পরিশ্রমই অর্থ উপার্জ্জনের মূলমন্ত্র এবং প্রকৃষ্ট উপায়।" ১৬৬৮ খৃঃ অঃ সার জমিল চাইল্ড "Brief observations concerning trade and the interest of money"



নামক পুস্তকে বলেন যে প্রত্যেক দেশের সুদের হার গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলেন যে হলণ্ড সুদের হার কম বলিয়াই হলণ্ড বাণিজ্যে অত্যন্ত উন্নতি লাভ করিয়াছে। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে মনস্বী লক দুখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। মূল্য বিষয়ক মত প্রকাশে লকই অগ্রণী। তিনি বলেন যে পৃথিবীর উৎপন্ন জিনিষের মধ্যে ৯৯ অংশ মনুষ্যের পরিশ্রমেরই ফল। এমন কি যদি আমরা সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখি, তাহা হইলে একশত ভাগের মধ্যে নিরানব্বই ভাগই পরিশ্রমের অংশে পড়ে, মাত্র একভাগ প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। লকের পুস্তিকা দুখানির নাম "Considerations on the lowering of interest and raising the value of money" এবং "Further Considerations." উভয় পুস্তিকাতেই তিনি "বাণিজ্যিক মিথ্যা সিদ্ধান্তের (Mercantile fallacy) পক্ষে মত দেন। "স্বর্ণ বা রৌপ্য যদিও অল্প লোকের কার্য্যে আসে তাহা হইলেও তাহারাই অর্থ। আমাদের প্রতি-বেশী অপেক্ষা আমরা যত স্বর্ণ রৌপ্য জমা রাখিতে পারি আমরা ততই ধনী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারি। লকের মতে "সাধারণে একমত হইয়া যে দর স্থির করে তাহাই মুদ্রার মূল্য।"

কিছু দিন পরে রবিনসন ক্রুসো প্রণেতা দানিয়েল ডিফো "Giving alms no charity" নামক পুস্তিকায় দেখান যে পাত্রাপাত্র নির্ব্বিশেষে দান করিলে দেশের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। এই সময়েই ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে "ইংলণ্ড ব্যাঙ্ক" (Bank of England) স্থাপিত হয়; Chancellor of the Exchequer মনটেগ ১২০০০০০ পাউণ্ড গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের জন্য ধার লইয়া পাওনাদার দিগকে একটী ব্যাঙ্কে পরিণত করিয়া শতকরা আট পাউণ্ড হিসাবে সুদ প্রতিশ্রুত হন এবং রাজকরকে ঐ টাকার সুদের প্রতিভুস্বরূপ রাখেন। হুইগ্‌গণ এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করাতে তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দী টোরীগণ "ল্যাণ্ডব্যাঙ্ক" নামক অন্য একটী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার উদ্যোক্তাগণ—ব্রিস্‌কো ও চেম্বার্‌লেন্—জমি বন্ধক রাখিয়া টাকা কর্জ্জ দিবার ব্যবস্থা করেন। ইহা সফলতা লাভ করিতে পারে নাই।

১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে সার ডাড্‌লি নর্থ তাঁহার "Discourses on Trade"

লিখেন। তিনি ব্যবসায়ের সমতার (Balance of Trade) বিরুদ্ধে মত লিপিবদ্ধ করেন। সার উইলিয়াম্ ডাডেনাণ্ট "Essay on The East India Trade" পুস্তকে অর্থের প্রকৃত অর্থ দেন "স্বর্ণ ও রৌপ্যদ্বারা ব্যবসায়ের পরিমাণ যদিও বোঝা যায় তত্রাপি ভূমি ও পরিশ্রমদ্বারা লব্ধ অর্থই মূল অর্থের কারণ।" ইহার পরে যোগিয়া টাকার "Essay on French and English Trade," "Question on Commerce," "Elements of Commerce and The Theory of Taxes" পুস্তক লেখেন। টাকার অবধি বাণিজ্যের পক্ষপাতী এবং তিনি আমেরিকাকে স্বাধীনতা দিবার প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে ইংলণ্ডবাসী যখন দোকানদার (Shopkeeping nation) ব্যতীত অন্য কিছুই নয় তখন আমেরিকারূপ খরিদ্দারকে জোর করিয়া বাঁধিয়া রাখিলে ইংলণ্ডরূপ দোকানের কোনই লাভ হইবে না।

এই সময়ে ফ্রান্সে অনেকগুলি অর্থনীতিবিৎ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পঞ্চদশ লুইয়ের চিকিৎসক কুইনের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি "Economic Picture," "The General Maxims for the Economical Government of an Agricultural Kingdom" পুস্তক এবং Encyclopaedia বা "বিশ্বকোশে" কয়েকটী প্রবন্ধ লেখেন। তাঁহার শেষোক্ত পুস্তকে কোন এক জাতি অপর কোন বৈদেশিক জাতির সহিত বাণিজ্য করিলে যে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহা অস্বীকার করেন। বাণিজ্য বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতাই তাঁহার অনুমোদিত ছিল। * ষোড়শ লুইয়ের মন্ত্রী টারগট্ "Reflections on the Formation and Distribution of Riches," মিরাবো "The Friend of men or a Treatise on Population, Theory of Taxation, The Economists, Rural Philosophy or the General and Political Economy of Agriculture" নামক পুস্তক লেখেন। প্রথিতনাম ভলটেয়ার্ অবধি বাণিজ্যের পক্ষপাতী ছিলেন।

* "Let entire freedom of commerce be maintained ; for the regulation of commerce, both internal and external, the most sure, the most exact, the most profitable to the nation and to the State, consists in entire freedom of competition."



১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে আদমস্মিথ তাঁহার যুগান্তরকারী "Wealth of Nations" নামক সুবিখ্যাত পুস্তক লেখেন। বারান্তরে আমরা এ বিষয়ের আলোচনা করিব। আদমস্মিথ ব্যতীত বেনথাম, ম্যালথাম, রিকার্ডো প্রভৃতি কয়েকজন অর্থনীতিবিৎও এ বিষয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ম্যালথামের "Essay on Population" Inductive Methodর প্রথম পুস্তক। রিকার্ডো ১৮১৫ সনে (ওয়াটার্লুর যুদ্ধের বৎসর) "Essay on the Influence of a Low Price of Corn on the Profits of Stock," ১৮১৬ সনে "Proposals for an Economical and Secure Currency with observations on the Profits of the Bank of England" এবং ১৮১৭ সনে "Principles of Political Economy and Taxation" প্রণয়ন করেন। 'খাজনা' বিষয়ক প্রস্তাবে আমরা রিকার্ডো সম্বন্ধে আরো কিছু আলোচনা করিব। ১৮২১ সনে জেমস মিল তাঁহার "Elements of Political Economy" প্রকাশ করেন; তিনি রিকার্ডোর মতেরই পদানুসরণ করেন। তদীয় পুত্র জন ষ্টুয়ার্ট মিল ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে "Essays on some unsettled questions of Political Economy" লেখেন এবং ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে "Principles of Political Economy with some of their applications to Social Philosophy" নামক সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক প্রণয়ন করেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে সিজউক তাঁহার Elements of Political Economy প্রকাশ করেন। ইহার পরে কেয়ার্ণ্স্, বাজ্হট্, জেডন্, ফসেট্, মার্শাল্ প্রভৃতি স্ব স্ব পুস্তকাদি প্রকাশিত করিয়াছেন।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার

---

# কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস।

—:০:—

আজ কাল বঙ্গসাহিত্যে কবিতালেখকের অন্ত নাই। পুরমহিলা হইতে বিদ্যালয়ের বালক পর্য্যন্ত সকলেরই কবিতা লেখা একটা রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেক সাময়িক পত্রিকার কলেবরও এই প্রকার দুষ্ট কবিতায় পরিপূর্ণ হইয়া

থাকে। কিন্তু এ সকল কবিতার ভিতর প্রকৃত কবিত্বের কণাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

কবিতা লিখিলেই কবি হওয়া যায় কি? প্রকৃত কবি তিনি, যিনি অনুভূতিকে জাগাইয়া তুলিতে পারেন। আমরা জানি যে, শব্দসম্পদ ও সুগঠিত ছন্দ কবিতার অবয়ব; রস তাহার প্রাণ; ভাব তাহার আত্মা। যাহার কবিতায় এইগুলি আছে তিনিই প্রকৃত কবি। আজ আমরা যাঁহার কথা লিখিতেছি ইঁহাকে এই শ্রেণীর কবি বলা যায়।

সুকবি গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয় একজন উচ্চশ্রেণীর কবি হইয়াও সাধারণ পাঠকমণ্ডলীর নিকট অনেকটা অপরিজ্ঞাত রহিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে আমরা দুঃখিত হইতে পারি না কারণ বঙ্গসাহিত্য সংসারে ৺বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী, ৺ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ৺সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রভৃতির মত উচ্চাসন পাইবার যোগ্য কবিরাও পাঠকমণ্ডলীর অনুকম্পায় অপরিজ্ঞাত রহিয়াছেন। এমত অবস্থায় গোবিন্দ দাস মহাশয়ের মত একজন প্রতিভাবান্ কবিরও সেই দশা ঘটিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য হইবার কি আছে?

ফলে যাহাই হউক, পাঠকমণ্ডলী অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন আর নাই করুন, গোবিন্দ দাস মহাশয়ের কাব্য বঙ্গসাহিত্যে স্থায়িত্ব লাভ করিবার উপযুক্ত, একথা কাব্যামোদী মাত্রেই স্বীকার করিবেন।

যাঁহারা গুণগ্রাহী তাঁহাদের নিকট প্রতিভাবান্ ব্যক্তি চিরদিন আদৃত হইয়া থাকেন। কয়েক বৎসর হইল "বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক" গ্রন্থের লেখক সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয় আমাকে একখানি পত্রোত্তরে লিখিয়াছিলেন "প্রেম ও ফুলের" কবি গোবিন্দ দাসের কাব্য-সুধা পান করিয়া কত দগ্ধ-হৃদয় শান্তি লাভ করিয়াছে! গোবিন্দ দাসকে কে না জানে!"

বাস্তবিক প্রকৃত হৃদয়বান্ ও মর্ম্মগ্রাহী লোকের মুখেই একথা শোভা পায়। যাঁহারা কবিত্বের উপাসক তাঁহাদের নিকট গোবিন্দ দাস মহাশয় সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না বিবেচনায় এই প্রবন্ধের অবতারণা।

গোবিন্দ দাস মহাশয় ঢাকা জেলার অন্তর্গত ভাওয়ালে অনুমান ১২৬৬ বঙ্গাব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার পিতার নাম ৺রামনাথ দাস। গোবিন্দ দাস



মহাশয়ের বিদ্যাশিক্ষা নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক পর্য্যন্ত। ইনি ইংরেজি ভাষায় অনভিজ্ঞ হইয়াও যেরূপ চমৎকার কবিতা লিখিয়াছেন তাহাতে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

অতঃপর ইনি কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া ইনি অসহ্য যন্ত্রনা ভোগ করিয়াছেন।

গোবিন্দ দাস মহাশয় দুইবার বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রথমা পত্নীর নাম সারদা সুন্দরী। এই পত্নীর গর্ভে ইঁহার প্রমদা ও মনিকুন্তলা নামে দুইটী কন্যা জন্মিয়াছিল। কিন্তু অদৃষ্ট দেবতার কঠোর বিধানে শীঘ্রই কবির সুখের সংসার ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। কন্যা প্রমদাকে মহাকাল টানিয়া লইল। ইহার প্রায় ছয় বৎসর পর পত্নী সারদা সুন্দরী বিদায় লইলেন। ইহার এক বৎসর পর সহোদর জগচ্চন্দ্র দাস ও কয়েক বৎসর পর সংসারের শেষ অবলম্বন কন্যা মণিকুন্তলা দাস মহাশয়কে ভাসাইয়া অনন্তধামে চলিয়া গেলেন।

দাস মহাশয়ের জীবনের দুঃখ এইখানেই অবসান হইল না। ইহার পর কবি যে যন্ত্রনা ভোগ করিয়াছেন তাহা হৃদয়োদ্ভেদক। সময়ের অনিবার্য্য কারণে অতঃপর ইহাকে জন্মভূমি ভাওয়াল পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইল।

ইনি দেশত্যাগী হইয়া অবশেষে কলিকাতায় আসেন এবং কতক দিন পর ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ মহারাজা ৺সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের বেগুণবাড়ী এষ্টেটে নায়েব নিযুক্ত হন। প্রথমা পত্নী বিয়োগের কতক বৎসর পর দাস মহাশয় দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন। বিক্রমপুরের অন্তর্গত ব্রাহ্মণ গ্রামে ইনি এই বিবাহ করিয়াছিলেন। এই স্ত্রীর নাম প্রমদা সুন্দরী। এই পত্নীর গর্ভে তিন পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। প্রথম পুত্রের নাম শ্রীমান্ অরবিন্দ দাস।

দাস মহাশয় আজীবন দারুণ কষ্ট সহ্য করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহার কাব্য আলোচনা ও বীণাপাণির সেবায় একটুকুও ত্রুটী ঘটে নাই। কষ্টের ভিতর দিয়া সাহিত্য চর্চ্চা বরং উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

গোবিন্দ দাস মহাশয় বড়ই বন্ধুবৎসল ও তাঁহার হৃদয় অপূর্ব্ব প্রীতি প্রবণ। "নব্যভারত"-সম্পাদক দেবীবাবু, অক্ষয় বড়াল প্রভৃতির সহিত দাস মহাশয়ের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। একদা বিপদে পতিত হইয়া দাস মহাশয় বড়াল কবির নিকট

অযাচিত ভাবে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দাস মহাশয়ের মুখে অনেকবার একথা শুনিয়াছি। হয়ত বড়াল কবির সে কথা মনে জাগিতে পারে। ৺বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর সঙ্গেও কবির ঘনিষ্ঠতা ছিল। বিহারীলাল তাঁহার প্রত্যেক গ্রন্থ কবিকে স্বহস্তে লিখিয়া উপহার দিয়াছিলেন। আমরা সেগুলি দেখিয়াছি।

গোবিন্দ দাস মহাশয় শৈশব হইতে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। ইনি স্বভাব কবি। ইহার রচনা সরল, আবিলতামুক্ত এবং গৈরিক নিস্রবের ন্যায় স্বতঃ প্রবাহিতা। ইহার কবিতা চন্দ্রকরোজ্জ্বল নিশীথে তরুচ্ছায়াবৃত স্বচ্ছ, সুপ্ত তটিনীর ন্যায় মনোরম। কোথাও আবিলতা নাই, উচ্ছৃঙ্খল তরঙ্গ নাই; কেবল নীরব গম্ভীর জলস্রোত জোৎস্নাপ্লাবিত হইয়া চলিয়াছে।

আজ কাল অনেকে দুর্ব্বোধ কবিতা লেখা সার্থক মনে করেন,—ইহা অনেকটা পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল। আমাদের গোবিন্দ দাস মহাশয় এই শ্রেণীর কবি নহেন। ইহার কবিতাগুলি সরল সুস্পষ্ট। কবিকে যেন ছন্দ ও ভাষার জন্য একটুকুও বেগ পাইতে হয় নাই। এই প্রকার সরল হইয়াও কবিতাগুলি ভাবে পরিপূর্ণ,—জীবনযুক্ত।

গোবিন্দ দাসের কবিতা নারী সম্পর্কে লিখিত হইয়া থাকিলেও তাহাতে অশ্লীলতা নাই। কবির কবিতাগুলি এতই মর্ম্মস্পর্শী যে "বাসন্তী", "খোকার দপ্তর" প্রভৃতি প্রণেতা মনোমোহন সেন মহাশয় আমাকে একবার বলিয়াছিলেন;—"গোবিন্দ দাসের কবিতা পড়িতে পড়িতে আমার মদ খাওয়ার ফল হয়—যেন নেশায় বিভোর হইয়া পড়ি।" বাস্তবিক দাস মহাশয়ের কবিতাগুলি মর্ম্মস্পর্শী। বঙ্গ সাহিত্যে ইনি যেন বীণাবাদক। গভীর নিশীথে দূরাগত বীণাধ্বনিবৎ তাঁহার সুমধুর কবিতাবলী প্রাণমন বিভোর করিয়া তুলে।

দাস মহাশয় একদা রাজকৃষ্ণরায়ের "বীণা" পত্রিকায় কবিতা লিখিতেন। "জন্মভূমি" পত্রিকায় ইহার কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। "নব্যভারতে" ইনি এখনও কবিতা লিখিয়া থাকেন। গত বৎসরের "নব্যভারতে" ইহার দেশ-ভক্তিমূলক অনেক কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। বহুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত "প্রকৃতি" নামক পত্রিকায় ইনি "মগেরমুলুক" নামক একটী বিদ্রূপাত্মক কবিতা লিখিয়াছিলেন। "মগেরমুলুক" পরে পুস্তিকাকারেও প্রকাশিত



হইয়াছিল। এখন উহা আর পাওয়া যায় না। এই পুস্তিকার প্রতিপাদ্য বিষয় আমরা লিখিতে পারিতেছি না, কারণ কবির জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত হওয়ার সঙ্গে এই বিদ্রূপাত্মক কাব্যের অনেক যোগ আছে। তৎকালে এই পুস্তিকা যথেষ্ট আদর লাভ করিয়াছিল, এমন কি অনেকে পুস্তকের অভাবে কবিতাটি হাতে লিখিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন।

দাস মহাশয় রচিত গ্রন্থাবলীর তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল;—

(১) প্রেম ও ফুল (২) কুঙ্কুম (৩) কস্তুরী (৪) ফুলরেণু (৫) চন্দন (৬) বৈজয়ন্তী। ইহা ব্যতীত আরো অনেক কবিতা অদ্যাপি অপ্রকাশিত রহিয়াছে। ৺নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত "ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী" গ্রন্থে গোবিন্দ দাস মহাশয়ের কয়েকটী সুরাপান নিবারণী সঙ্গীত প্রকাশিত হইয়াছে।

"প্রেম ও ফুল" কাব্য লিখিয়া দাস মহাশয় তৎকালীন "ভারতী" প্রভৃতি পত্রিকাতে যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনা হইতে কয়েকটি কবিতাংশ পাঠকদিগকে উপহার দিতে ইচ্ছা ছিল কিন্তু স্থানাভাবে তাহা পারিলাম না। এই গ্রন্থের তিনটী সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

জীবনব্যাপী বিপদ সংগ্রামে অভ্যস্ত কবির উপযুক্ত সুর তাঁহার রচনার স্থানে স্থানে জাগিয়া উঠিয়াছে। দাস মহাশয়ের কাব্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে আমাদের নিকট "চন্দন" অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হয়। কেহ কেহ দাস কবির গ্রাম্য শব্দ ব্যবহার ও একঘেয়ে ছন্দের নিন্দা করেন। কিন্তু আমরা মনে করি ভাষায় প্রাদেশিকতা থাকা দরকার। গ্রাম্য শব্দ ব্যবহারেও কুত্রাপি কবিতার লালিত্য নষ্ট হয় নাই। পরিশেষে ঢাকা হইতে প্রকাশিত "ধূমকেতু" পত্রিকায় দাস কবির সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছিল তাহা উল্লেখ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছি;—

"বিরহ-বিধুর মধুর কবি
এনেছেন "চন্দন" "কস্তুরী"
কাঙ্গাল কবি তাই বুঝিগো
নাম পান নাই যুগান্তরী।

শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

# বিশু-দাদা।

—:o:—

( ২ )

নরেশবাবু বাড়ী আসিয়াছেন শুনিয়া পরদিন প্রাতঃকালে প্রতিবেশী সরকার মহাশয় ও অন্যান্য কয়েকজন ভদ্রলোক নরেশবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন নরেশবাবু করতলে কপোল বিন্যাস পূর্ব্বক বসিয়া আছেন, তাঁহার কোলের কাছে ভবেশ বসিয়া আছে। তাঁহাদের ভাব দেখিয়া সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, পূর্ব্ব রাত্রিতে বাড়ী আসিয়া নরেশবাবু বা ভবেশ কিছুই আহার করেন নাই বা একটুও নিদ্রা যান নাই।

আগন্তুকগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধ সরকার মহাশয় পর্য্যন্ত ভাবিয়া পাইতেছেন না যে, কি বলিয়া কথা আরম্ভ করিবেন। তাঁহারা সকলেই ধীরে ধীরে ঘরের দাবায় বসিলেন, কাহারও মুখে একটীও কথা নাই; এই গভীর শোকের সময় কি বলিয়া সান্ত্বনা দেওয়া যাইতে পারে, তাহা কেহই ভাবিয়া পাইলেন না। অবশেষে সরকার মহাশয় বলিলেন "ভবেশ, পরীক্ষায় কেমন লিখিলে?" ভবেশ বলিল "এক রকম লিখিয়াছি; পাশের সম্ভাবনা আছে।" তাহার পর যে কি বলিবেন তাহা আর সরকার মহাশয় খুজিয়া পাইলেন না। এমন সময় বিশ্বনাথ সেখানে উপস্থিত হইল। সরকার মহাশয় তাহাকে বলিলেন "বিশু, কাল রাত্রিতে নরেশ বাড়ী এলে পর আমাকে খবর দিস্ নাই কেন? আহা, ওদের কারো বুঝি রাত্রিতে খাওয়া দাওয়া কিছুই হয় নাই। হায় অদৃষ্ট!" বিশ্বনাথ বলিল "আমি ত খবর দিতে চেয়েছিনু, তা কাকাবাবু বোল্লেন যে এত রাত্রে আর কাউকে বিরক্ত কোরে কাজ নাই; তাই আপনাকে খবর দিই নাই।"

সরকার মহাশয়। কাজটা ভাল কর নাই, বিশু, নরেশ ভবেশ কি আমার পর, তারা বাড়ীতে এসে না খেয়ে রয়েছে শুনে আমার বড় কষ্ট হোচ্ছে। যা আমাদের বাড়ীতে গিয়ে বোলে আয় যে, সকাল সকাল যেন রান্না হয়।

সরকার মহাশয়ের কথা শুনিয়া বিশ্বনাথ চলিয়া গেল। তখন সরকার মহাশয় নরেশবাবুকে বলিলেন "দেখ নরেশ, আর বসিয়া বসিয়া ভাবিয়া কোন লাভ



নাই। তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, তুমি লেখাপড়া জান; তোমাকে আর আমি কি উপদেশ দেবো। যা' হবার তা হোয়ে গেছে, তা'র জন্য আর দুঃখ কোরে কোন লাভই নাই। এখন যা'তে ছেলেটা মানুষ হয়, বোসেদের নাম থাকে—তা'রই চেষ্টা কর।"

রসিক মিত্র বলিলেন "আমার মতে নরেশের একটী বিবাহ করা উচিত, নইলে সংসার চোল্‌বে কি কোরে, দুবেলা দুটো ভাত ত রেঁধে দেওয়া চাই।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন "এ কথা আমি কতবার নরেশকে বোলেছি; বিপদ আপদ ত মানুষের আছে। ঘরে যদি আর দুই একটী স্ত্রীলোক থাকৃতো তা' হলে কি এমন কাজ হয়। আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা যে, নরেশ আবার বিবাহ করে।"

নরেশ বাবু এই সমস্ত কথার কিছুই উত্তর দিলেন না দেখিয়া সরকার মহাশয় বলিলেন "নরেশ, ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে কথা বোল্লেন তাতে তোমার মত কি? আমারও মনে হয় যে, তোমার বিবাহ করা কর্ত্তব্য।"

নরেশবাবু আর নীরব থাকিতে পারিলেন না, তিনি অতি ধীর ভাবে বলিলেন "আপনারা সকলেই যে আমার মঙ্গল কামনা করেন তাহা আমি বেশ জানি; কিন্তু যাহা হইয়া গেল ইহার পরও কি আর আমার সংসার ধর্ম্ম করা চলে? আমি যাহা মনে করিয়াছি শুনুন। যে কয় দিন ভবেশের পরীক্ষার ফল জানিতে না পারা যায়, সে কয় দিন কষ্টেসৃষ্টে আমি এখানেই থাকিব। পরীক্ষার ফল বাহির হইলেই আমি ভবেশকে লইয়া দেশ ত্যাগ করিব। এমন কলঙ্কের বোঝা মাথায় করিয়া দেশে বাস করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। তার পর"—

নরেশবাবুর কথায় বাধা দিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন "নরেশ, দেশময় কলঙ্ক যে রটিয়াছে এ কথা ঠিক, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু এসব বেশী দিন থাকে না, দুইচার ছ মাসেই লোকে একথা ভুলিয়া যাইবে। কয়েকটা দিন একটু সহ্য করিয়া থাকিলেই সব গোল মিটিয়া যাইবে। গ্রাম ত্যাগ করা—তা' কিছুতেই হোতে পারে না। এ তোমার সাত পুরুষের মাটী; এ কি ত্যাগ কোর্‌তে আছে। যে গিয়েছে সে তার অদৃষ্ট নিয়ে গিয়েছে; সে কথা ভেবে তুমি যে গাঁয়ের মায়া ত্যাগ কোর্‌বে, এ কিছুতেই হোতে পারে না; —কি বল সরকার দাদা?"

সরকার মহাশয় বলিলেন "সে ত ঠিক কথা। নরেশ, তুমি কি পাগল হোয়েছ; এরই জন্য দেশ ত্যাগ কোরে যাবে? মনে কর না তোমার মেয়েটী মারা গেছে। তাই মনে কোরে মনকে প্রবোধ দেও। আর আমার কথা শোন; আপাততঃ তোমার মাসীমাকে কিছু দিনের জন্য বাড়ীতে নিয়ে এসো; তোমার এ বিপদের কথা শুন্‌লে তিনি অবশ্যই আস্‌বেন। তারপর আমরা দেখে শুনে একটা সেয়ানা মেয়ের সন্ধান কোরে তোমার বিবাহ দেবো। তবে কলঙ্কের কথা বোল্‌ছো? সেটা কিছুই নয়, মানুষের মুখের কথা কয় দিন। এই ত সে বছর হরিশ চক্রবর্ত্তীর বিধবা ভাদ্রবধূ কুলত্যাগ কোরে গেল; এখন আর সে কথা কি কারো মনে আছে; আর সে জন্য কি হরিশ চক্রবর্ত্তী দেশ ছেড়ে পালিয়ে ছিল। এমন দৃষ্টান্ত অনেক দিতে পারি। সে কথা যাক্, এখন সকাল সকাল ছেলেটি নিয়ে স্নান কোরে এস। যে কয় দিন একটা ব্যবস্থা না হয় সে কয়দিন আমার ওখানেই তোমরা আহারাদি কোরো।"

তখন রসিক মিত্র বলিলেন "সরকার দা,' এ দিকের যা হয় একটা ব্যবস্থা ত হোলো, কিন্তু মেয়েটার একবার অনুসন্ধান করা দরকার, আর কোন্ নরাধম এমন কাজ কোরলে তাও জানা আবশ্যক। একটু শক্ত না হোলে যে দেশে বাস করা অসম্ভব হোয়ে উঠবে।"

নরেশ বাবু বলিলেন "রসিক দা", ও সব বিষয়ে আর আন্দোলন না করাই ভাল। সুমতির অনুসন্ধান কোরে কি লাভ? তা'কে একেবারে ভুলে যাওয়াই ভাল, সে কথা মন থেকে একেবারে মুছে ফেলাই ভাল।' এই বলিয়া নরেশবাবু একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন।

বিশ্বনাথ এতক্ষণ দাওয়ার পার্শ্বে বসিয়াছিল; একটী কথাও না বলিয়া যিনি যাহা বলিতেছিলেন তাহাই শুনিতেছিল; কিন্তু নরেশ বাবু যখন বলিলেন যে মেয়ের কথা একেবারে ভুলিয়া যাওয়াই ভাল, তখন বিশ্বনাথ আর স্থির থাকিতে পারিল না—সে বলিয়া উঠিল "কাকাবাবু, সে কিছুতেই হবে না। আমার এত সাধের দিদিকে আমার কোল থেকে যে কেড়ে নিয়েছে তার সন্ধান আমি কোরবই কোরবো। সুধু কি সন্ধান—তাকে যদি আমি শাস্তি দিতে না পারি তাহোলে আমার নাম বিশ্বনাথই নয়। এ কয় দিনের মধ্যেই আমি গাঁ ওলট পালট



কোরে ফেলতাম, সুধু কাকাবাবুর জন্য অপেক্ষা কোরে বোসেছিলাম। আহা! ছেলে মানুষ—বুদ্ধির দোষে,—কুলোকের কথা শুনে—না ভেবে চিন্তে হঠাৎ একটা কাজ কোরে ফেলেছে; তারপর এখন হয় ত তা'র মনে কত কষ্ট হোচ্চে; বাড়ী ফিরিবার জন্য তা'র প্রাণ কেমন কোরচে, সে হয় ত এখন কোন্ অজানা যায়গায় বোসে খাওয়া নাওয়া ভুলে সুধু কাঁদছে—সুধু ভাবচে, আর কি ফিরে ঘরে আস্‌তে পারে না। আচ্ছা, ভট্টাচার্য্য মহাশয়, দিদি যদি আজ এসে তোমাদের পায়ে কেঁদে পড়ে, তা হোলে কি তোমরা একটা প্রাচিত্তির কোরে তা'কে ঘরে নিতে পার না?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "তাও কি হয় বিশু? যে কুল ত্যাগ কোরে গিয়েছে, যে ব্যভিচারিণী হোয়েছে তা'কে কি আর ঘরে নেওয়া যায়, তা'কে কি আর সমাজে তোলা যায়। সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, ব্যভিচারিণীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।"

"কেন নাই ঠাকুর?" বিশ্বনাথ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "কেন নাই ঠাকুর? তোমরা ব্যাটা ছেলে ঐ রকম কত পাপ কোরচো, তোমাদের বেলায় কোন কথা নেই, আর সেই অবুঝ মেয়েটা একদিন হঠাৎ একটা কাজ কোরে ফেলেছে, আর হয়ত তা'র জন্য এখন কেঁদে কেঁদে মরছে, তা'কে তোমরা ঘরে নেবে না, এ কেমন বিচার? মনে কর যে হতভাগা এমন কাজ কোরেছে, সে যদি তোমার ঘরের একটা ছেলে হয়, তা হোলে তাকে কি ফেলে দিবে, তাকে কি ঘরে আস্‌তে দেবে না? এ কেমন বিচার ঠাকুর, তা' ত আমি মুখু মানুষ বুঝি না।"

নরেশ বাবু বলিলেন, "আর ও সব কথা তুলে কাজ নাই বিশু। মনকে প্রবোধ দেও, আমার সুমতি ম'রে গিয়েছে, তা'কে আমি যমের হাতে দিয়েছি আর ও কথায়——"

নরেশ বাবুর কথায় বাধা দিয়া বিশ্বনাথ বলিল, "কাকাবাবু, আজ কয়দিন চেষ্টা কোরেও মনকে প্রবোধ দিতে পারি নাই। আমি একবার দিদিকে খুঁজে দেখবোই দেখবো। যদি দেখি সে আমাদের ভুলে গেছে, যদি দেখি তা'র মনে একটুও কষ্ট হয় নাই, তা হোলে তা'র নাম মন থেকে একেবারে মুছে ফেল্‌বো

কোন দিন তা'র নামটীও মুখে আন্‌বো না। কিন্তু যদি দেখি যে সে কেঁদে সারা হোচ্চে, তার মুখ শুকিয়ে গেছে, তা হো'লে তা'কে কোলে তুলে নেবো। তোমাদের সংসারে, তোমাদের সমাজে তা'র স্থান না হয়, তা'কে নিয়ে আমি কোন তীর্থ স্থানে যাবো, সেখানে ভিক্ষা কোরে এনে তা'কে খাওয়াবো।" বিশ্বনাথ আর কথা বলিতে পারিল না—কাঁদিয়া ফেলিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীজলধর সেন।

---

# চড়কের চানাচুর।

—:※:—

## 'বইঠি বিকায়'।

অয়ি তরলিকা! অয়ি মধুলিকা!
হে দেবী সুরেশ্বরী!
তোমার প্রসাদে চাট্‌নি এবং
চাটের দোকান করি।
মদিরা-বিন্দু-লোলুপ মক্ষি-
সেবিত তোমার দ্বারে
ঠাঁই দেছ, তাই, পাই গো তোমায়
হাজার খরিদ্দারে।
বাসী কাঁকড়া ও চিংড়ি দোরসা
পড়িতে পায় না কিছু;
মদির নয়ন ক্রেতাগণ মোর
চাহেনা ক আগু পিছু।
বাসী পচা মাল দিয়ে ছুনো ঝাল
টাট্‌কা বলিয়া বেচি,
সন্দেহ কেহ করিলে কথায়
জুড়ে দিই চেঁচামেচি।



মত্ত ক্রেতার মন বুঝিবার
থার্ম্মোমিটার আমি;
নাম না বাড়ুক দাম পাওয়া যায়,
খুসী আছি দিনযামী।
সারাদিনমান উনানের পাশে
বসে বসে আমি ঢুলি,
তুড়ি দিই আর হকিমী ফ্যাসানে
হামেশাই হাই তুলি।
চাট্‌নীর ঝালে কাঁদাইতে পারি,—
এমনো চাট্‌নী রাখি।
পলাণ্ডু রসে চর্চ্চিত করি'
সকল গন্ধ ঢাকি।
ভদ্রলোকেরা তফাতে থকুন,
কাপড়ে ঢাকুন নাক;
মাতাল বেযোর থিয়েটার-খোর
এরা মোর বেঁচে থাক।
লক্ষ্মীর ঘরে ফসল ফলের
কত ঘটে অপচয়,
চাট্‌নি চাটের অপচয় নাই,
হবেই সে বিক্রয়।
গোরস বেচিয়া পথে পথে রোদে
যে খুসী সে হ'ক কালো,
আমি জানি যাহা বইঠি বিকায়
তাহারি ব্যবসা ভালো।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

---

# কথামালার গল্প।

—:*:—

একদা এক বনের মাঝে, অতি প্রাচীন কালে,
( সঠিক তারিখ নাইক লেখা ইতিহাসের ভালে, )
ছিল একটি ব্যাঘ্র শাবক, মেজাজ কিছু রুক্ষ,
কারণ সবিশেষও বটে,—মনে মহাদুঃখ,—
ব্যাঘ্রদলে আসন তারে দিত না কেউ উচ্চে,
কারণ সে শৃগালের মত কাঁকড়া ধর্ত্ত পুচ্ছে !
উদ্ধত সে ভাব্‌লে মনে 'ভারি অপমান ত !'
এবং সটান স্বজন বন্ধু ছেড়ে চলে যান ত।
ক্লান্ত হয়ে, দাঁড়ায় গিয়ে একটা ঝোপের ধারে,—
গাধার আড্ডা—গুলজার সে গাধাদের চীৎকারে।
প্রতি সন্ধ্যা, প্রতি সকাল, প্রতি দুপুর বেলা,
হেসে খেলে কাটায় তারা বক্তৃতা দ্যায় মেলা।
ব্যাঘ্র-শাবক ক্রমে তাদের সভায় উপস্থিত,
গাধার দল ত দেখেই তাঁকে পরম আপ্যায়িত।
ব্যাঘ্র-শিশু অবশেষে দু'চার কথার পরে
তাদের সভার সভ্য হ'লেন উৎসাহেরি ভরে !
অতি অল্পদিনের মধ্যে নিজের ক্ষমতাতে,—
—ব্যাঘ্র ত সে, হোক্ না ছোট ব্যাঘ্রদিগের মতে,—
হয়ে পড়লেন গাধার আড্ডায় সভাপতি প্রধান,
চিরকালের জন্য !—উঃ তার গর্ব্ব সে কি মহান্ !
হ'ক না গাধা তা'য় কি বাধা ? তা'তে কি যায় বয়ে ?
নরকে প্রভুত্ব ভাল স্বর্গে ভৃত্য চেয়ে।
ব্যাঘ্র দলে শক্তিটা তার বুঝল না কেউ ঠিক ;
গাধার তবু বুদ্ধি আছে, ব্যাঘ্রদলকে ধিক।



ক্রমে চলন চালে এবং কথাবার্ত্তার ঢঙে,
গাধার দলও অবাক হ'ল দেখে ব্যাঘ্রের রঙ এ !
ক্ষমতা তার এমনি হ'ল যেন যাদু মন্ত্র,
গাধার দলটা উঠ্‌ত বস্‌ত যেন একটা যন্ত্র !
কৌতুকের ভাব সভাপতির চক্ষে উঠ্‌লে ভেসে,
ব্যক্ত হ'বার পূর্ব্বে সবাই অস্থির হ,ত হেসে !
যদি তিনি বলে উঠতেন "ওহে হোঃ হোঃ ভায়া"—
হোহো হোহো হাস্‌ত সবাই ছেড়ে প্রাণের মায়া।
চুপ্‌টি করে বসে খানিক, হঠাৎ ঘাড়টি তুলে,
বলতেন, "শোন" তারা অমনি চক্ষু মুদে দুলে
মুগ্ধ চিত্তে তারিফ দিত দু'শো খানি গুণে
বাকী টুকু শোনা ? হাঃ হাঃ—কাজ কি বেশী শুনে !
একদিন তিনি অকস্মাৎ ঐ রাসভদেরি সুরে,
জংলা এক রাগিনী গাইলেন কণ্ঠ ও প্রাণ পূরে।
গাধার দলে বল্লে "ধন্য বাঃ বাঃ, বহুৎ আচ্ছা,
একেবারে গাধার স্বর এ, নিরেট এবং সাঁচ্চা !"
আনন্দেতে ব্যাঘ্র শাবক উঠলেন বেজায় ফুলে,
কার্দ্দানি দেখাতে দেশে চল্লেন তল্পী তুলে।
ওস্তাদিটা জাহির করা চাইত, বিরাট শক্তি
দেখিয়ে সেথা দেশের দশের লবেন লুটে ভক্তি !
আপন গৃহে ফিরেই প্রথম, কথা কবার আগে,
এম্‌নি এক সুর ভাঁজলেন যে তায় কানে তালা লাগে
শীকার ভুলে বাঘবাঘিনী দৌড়ে এল ছুটে
ভাব্‌লে বুঝি নূতন জন্তু রাজ্য নিচ্ছে লুটে
ব্যাঘ্রশিশুর দাদা মশায়, খ্যাত বিজ্ঞ বলে,
আগাগোড়া ব্যাপার দেখে রাগে ওঠেন জ্বলে,

তাড়াতাড়ি এসে তার ত কর্ণ দু'টি ধরে,
প্রবল নাড়া দিয়ে বলেন "গণ্ডমূর্খ ওরে!
ব্যাঘ্র-শাবক হ'য়ে কিনা মিশে গাধার দলে,
নাম্‌ছ গাধার অধম ধাপে সঙ্গদোষের ফলে;
এমন রুচি কর্ত্তে জাহির ব্যাঘ্র শাবক পারে;
যাব কোথায় তোর জ্বালাতে? আরে, আরে, আরে!
এই রাগিনী ভাঁজতে সরম হ'চ্ছে না তোর মোটে!
ব্যাঘ্র নামে কলঙ্কটা দিচ্ছ ভাল বটে!"
ব্যাঘ্র-শাবক অবাক! বলে "এই রাগিনী শুনে,
গাধার দলে তারিফ দেছে দু'শোখানি গুণে;
আপনি বলেন, তুচ্ছ এটা!—মুগ্ধ মোটেই নয়!
উল্টে গালি, কর্ণমলা, কি এ মহাশয়!"
ব্যাঘ্র প্রধান বলেন "মূর্খ, বুঝিস্ নাক মানে—
গাধা গুলো গাধার রুচিই সেরা বলে জানে;
গাধার দলে তারিফ করে গাধার ধরণ যেটা,
সিংহ বাঘের ঘৃণার জিনিস নিতান্ত যে সেটা।
গাধা গাধাই, ব্যাঘ্র সে নয়, জেনে রাখ আগে,
গাধার গান সে মিঠে কেবল গাধার কানেই লাগে

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

---

## অকৃতজ্ঞের প্রতি।

সেত বড় বেশী নহে—বর্ষ কত আগে,
—বোধ হয় স্মৃতি তার মনে তব জাগে,—
অখ্যাত অজ্ঞাত-নামা যশের-জগতে,
একপাশে পড়ি তুমি ছিলে কোন মতে,



লয়ে শুধু গোটাকত পাকাঁঠির বাণ,
তখন করুণা মানি' কেসে ম্যা প্রাণ!
তোমার সে ছেলেখেলা বহু অনুরাগে,
যত্নে তুলিলেন ধরি লোক চক্ষু আগে?
তুষিয়া তোমারে স্নিগ্ধ-প্রসন্ন বচনে,
লিখি' দিলা ছাড় পত্র কীর্ত্তির সদনে।
অকৃতজ্ঞ তুমি তাঁরেই নিন্দিছ,
বিষ-পূর্ণ বাক্যবাণে বিঁধিতে চাহিছ!
সর্প সম ধিক্ তব ধিক্ ক্রূর পনা?
পালকে দংশিতে চাহ তুলি' গুপ্তফণা!

শ্রীধীরেন্দ্র নাথ দত্ত।

---

## কুতার্কিক ও কাঠ্‌ঠোকরা।

( রিকার্ড ডেস্মেল হইতে )

কুতার্কিকের নাহিক প্রভেদ
কাঠ ঠোকরার সঙ্গে,
ঠুক্‌রিয়া পোকা বাহির করে সে
বনস্পতির অঙ্গে!
যোজন জুড়িয়া বিতরে যে জন
ফল ছায়া আপনার,—
নীড় বাঁধি' সুখে কত শত পাখী
আশ্রয়ে থাকে যার,—
অটল যে আছে এতকাল সহি'
কাল-বৈশাখী হাওয়া,—
কাঠ ঠোকরার মতে সে অসার,
পোকা যে গিয়েছে পাওয়া!

---

# বিদূষকের গাম্ভীর্য্য।

( পঁসার্দ্দ্যা সিমঁ হইতে )

বিদূষক আজ ভারি গম্ভীর!
দেখ ও গো দেখ চেয়ে,
কালিমায় যেন ললাট গিয়েছে ছেয়ে!
কি ভাবিছ তুমি? অসুখ শরীর?
তাই সুখ নাই চিতে?
উহুঁ! জ্বলে মরে পরের সুখ্যাতিতে।

# গ্রন্থসমালোচনা।

—:o:—

চিত্ররেখা ( ছোট গল্প )—ভূতপূর্ব্ব "সাধনা" সম্পাদক, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত ও শ্রীবগলারঞ্জন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ৪৭, দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটস্থ "বাণী" যন্ত্রে 'এণ্টিক' কাগজে সুন্দররূপে মুদ্রিত। মূল্য ॥০ মাত্র। "মানসী"র পাঠকবর্গ সুধীন্দ্রবাবুর রচনার সহিত বিলক্ষণ পরিচিত আছেন। ইতিপূর্ব্বেই ইঁহার "মঞ্জুষা" "মায়ার বন্ধন" প্রভৃতি গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে।

আলোচ্য গ্রন্থখানির রস গ্রহণ করিয়া আমরা পরিতৃপ্ত হইয়াছি। সৎসাহিত্য-পাঠের নিমিত্ত আমাদের মানস চিরদিনই ক্ষুধিত। চিত্ররেখা আমাদের এই মানস-ক্ষুধা কিয়দংশে মিটাইয়াছে। গল্পগুলির চুম্বকাকর্ষণে আমরা কৌতুহলের সহিত এক নিঃশ্বাসে গ্রন্থখানি পড়িয়া শেষ করিয়াছি।

চিত্ররেখা পাকা হাতের লেখা। কি বর্ণনার শব্দাড়ম্বরশূন্য স্বচ্ছতায়, কি কথোপকথোন-সৃষ্টির বৈচিত্র্য, কি ঘটনা-সামঞ্জস্য-নৈপুণ্যে, কি উপমা-নির্ব্বাচনের পটুতায় সুধীন্দ্রবাবু আদর্শ শিল্পী পুস্তকখানি আমাদের সর্ব্বস্থান স্পর্শ করিয়াছে।

আমাদের ঘরের-কথা, আমাদের দৈনন্দিন সুখ ও দুঃখের, উৎসব ও অশ্রুর তরঙ্গ-লীলা চিত্ররেখার রেখায় রেখায় প্রতিফলিত। পাত্র-পাত্রীগণের চরিত্র-চিত্রণে আলোছায়ার বিকাশ-মাধুরী, বিভিন্নমুখী মনোবৃত্তিসমূহের পরস্পর সংঘাত আমাদের নিকট বাস্তব বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে। গ্রন্থকার প্রাণ-প্রতিষ্ঠার গুপ্ত মন্ত্রে দীক্ষিত। চিত্ররেখা যে রসজ্ঞ সুধীগণের চিত্ত-বিনোদন করিবে, এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিতেছি।

"দাদা" গল্পটিতে লেখকের প্রতিভার পূর্ণ পরিচয়। দাদার আত্মবিসর্জ্জন অতুলনীয়। সাহিত্যের পটভূমিতে এইরূপ উদার চরিত্রের আলেখ্যই সর্ব্বদা প্রার্থনীয়। জীবনের যাহা শ্রেষ্ঠ



অর্জ্জন, যাহার অনুকরণে লোক চরিত্র পবিত্র হয়, ধূর্জ্জটি-জটা-নিঃসৃত গঙ্গোত্রীধারার ন্যায় যাহা আমাদের চিত্ত-ক্ষেত্রকে নিরাময় করিয়া তুলে, তদ্রূপ-উপাদানে-গঠিত আদর্শই সাহিত্যে অমর হইয়া থাকে। ছোট গল্পের স্বল্প-পরিসরে, দুই চারি ছত্রে, উচ্চ আদর্শ ফুটাইয়া তোলা বড়ই কঠিন—চিত্ররেখার গ্রন্থকার এ বিষয়ে সিদ্ধ-হস্ত। "রাজপুতানী" শীর্ষক গল্পটিতে "রাজপুত-বন-কুসুম" পান্নার আত্মসংবরণ পড়িতে পড়িতে আমরা আত্মহারা হইয়া পড়ি। "পিতা ও পুত্র" পড়িয়া আমাদের চোখে, জল ধরে না। "পরিণাম" গল্পে বুড়ীর স্নেহ-পীযুষ-ধারা, "স্নেহের জয়ে" ধন-গর্ব্বী শ্বশুরের আত্মম্ভরিতার অনিবার্য্য শাস্তি বেশ ফুটিয়াছে। আমরা জন-সাধারণে এই গ্রন্থের বহুল প্রচার দেখিতে ইচ্ছা করি।

# মাসিক সাহিত্য-সমালোচনা।

বঙ্গদর্শন, মাঘ। শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার রচিত "কবিবর নবীনচন্দ্র সেন" সুপাঠ্য প্রবন্ধ। "শ্রীমূর্ত্তি-বিবৃতি" শীর্ষক প্রবন্ধে অনেক জানিবার কথা আছে। "আধুনিক বৈজ্ঞানিকযুগ" শ্রীজগদানন্দ রায় লিখিত; প্রবন্ধটিতে লেখক আধুনিক বৈজ্ঞানিকযুগের উন্নতি ও আবিষ্কার লইয়া অনেক আলোচনা করিয়াছেন। "মোহিনী" শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত ছোট গল্প; ইহাকে গল্প বলিব, কি নাটক, উপন্যাস বা সমালোচনা বলিব তাহাই ঠিক করা দায় হইয়া পড়িয়াছে। রায় মহাশয়কে একটা নূতন আসরে পদার্পণ করিতে দেখিয়া বোধ হয় অনেকেই উৎসুক হইয়া থাকিবেন; আমরাও ভাবিয়াছিলাম—আর কিছু হোক্ আর নাই হোক্ "একটা নতুন হবে খুব"; কাজেও তাহাই দেখিতেছি। যাই হোক্ দ্বিজেন বাবুর গল্পটি একবার নানা দিক্ হইতে "পর্য্যবেক্ষণ" করা যাক। গল্পটি এই :—মোহিনী সুশীলচন্দ্রের অনাদৃতা পত্নী। আইন শিক্ষা করিবার জন্য শ্বশুরের পয়সায় বিলাতে গিয়া সুশীলচন্দ্র মারগারেটের রূপে মুগ্ধ হইলেন। তারপর বিবাহ। সুশীলচন্দ্রের পিতা ক্রোধে পুত্রের বিরুদ্ধে Bigamyর জন্য অভিযোগ আনিতে স্থিরসংকল্প হইয়া পত্র লিখিলেন। যখন সুশীলকে উদ্দেশ করিয়া থিয়েটারী ঢঙ্গে ব্যভিচারী, নরাধম, মহাপাপী ইত্যাদি গালিবর্ষণ হইতেছিল সেই সময় সহসা মোহিনী সকলের সম্মুখে ভূলুণ্ঠিত হইয়া কহিলেন "যাই হৌন্, তিনি আমার স্বামী" আর নালিশ রুজু হইল না। পরিত্যক্তা স্ত্রীই সুশীলকে রক্ষা করিল! তারপর একদিন চিন্তা-মগ্না মোহিনী মায়ের মুখে শুনিল "জামাই এসেছে"। এই ত গেল গল্পাংশ, তারপর ইহার ভিতর বর্ণনা আছে, নাটক আছে, আইন আছে,—নাই কি? ইতিহাস আছে, তত্ত্বকথা আছে, Logic আছে। Sociology আছে। হায়! হায়! এত বিদ্যা কিনা অবশেষে এই গল্প-আবর্ত্তে হাবুডুবু খাইতে বসিল। রচনার নমুনা দেখুন :—প্রাণকৃষ্ণ প্রবীণ ব্যক্তি * * যখন তথাকথিত ব্যাপার শুনিলেন, তখন তিনি শিষ দিলেন।" কি সুন্দর! বৃদ্ধ প্রাণকৃষ্ণ, বাঙ্গালী প্রাণকৃষ্ণ হঠাৎ সাহেবী কেতায় একেবারে শিষ দিলেন কেন বুঝিতে পারিলাম না। তবে তাঁহার

বন্ধুর জামাতা বাবাজী তখন বিলাতে—ইহা একটা কারণ নয় ত? হঠাৎ সাহেবের শ্বশুরের বন্ধু হওয়াও দায় সাহেবী কায়দা এমনি সংক্রামক। ইহাও "নব্যযুবকের মাথা বিগড়াইয়া দিয়াছে"; যে সকল গল্প বা রচনা এই প্রকার প্রবৃত্তিতে আহুতি দেয় তাহারও "নির্ব্বান করিতেই হইবে" "উজ্জ্বল আলোকে, নৃত্যে, সঙ্গীতে সেই কক্ষটি ইন্দ্রালয় বলিয়া দর্শকের ভ্রম হইতে পারিত—যদি ইন্দ্রালয় তিনি চক্ষে দেখিতেন"। শেষ অংশটি লেখা হইল কেন? রসিকতার জন্য, না হঠাৎ Psychologyর একটা ছত্র মনে পড়িয়া গেল। সাহিত্য খেয়ালের জিনিস না কি? "সুশীল। * * তুমি যা ভেঙ্গেছো—সর্ব্বনাশ করেছো! ওহো জানো না—তুমি জানোনা,—সুখী তুমি যে, জানোনা যে তুমি আমার কি ভেঙ্গেছো। কারণ তুমি আমার বন্ধু। আমার কি ভেঙ্গেছো তা যদি জান্তে, যদি বুঝিতে পার্ত্তে, যদি ধারণা কর্ত্তে—তা হ'লে—এক কথায় দুঃখিত হতে।" এখানে কি রস আছে জানি না; তবে আমাদের বোধ হয় এখানে হাস্য রসেরই প্রাচুর্য্য আছে। তাহা না হইলে এই অনাবশ্যক পুনরুক্তি ও ফিরিঙ্গী বাঙ্গালার অর্থ কি? ছোট গল্পটি হঠাৎ এখানে দীর্ঘ পঞ্চাঙ্ক নাটকের আকার কেন ধরিল? নাটকেই Acting সাজে। আজ হইতে দ্বিজেন্দ্র বাবুর মতে সমস্ত রচনাই "যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখো দ্রবন্তি" সেইরূপ নাটকের কলেবরে প্রবেশ করিবে না কি? কি সুন্দর ভাষা। "সুখী তুমি যে জানোনা যে তুমি আমার কি ভেঙ্গেছ কারণ তুমি আমার বন্ধু * * * তা'হ'লে—তা'হ'লে তা'হ'লে—তা'হ'লে"—আরো দুই চারিটা "তা হ'লে" লাগাইলেই চলিত, আরো উচ্ছাস ব্যক্ত হইত! কথা বার্ত্তায় দ্বিজেন্দ্র বাবু প্রভাত বাবুর ভাষা অনুকরণ করিতে গিয়াছেন কিন্তু স্থানে স্থানে তাহা এত অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে যে তাহা বুঝিয়া উঠা যে সে পণ্ডিতের কর্ম্ম নয়। বলিতে পারি না পরে কি হইবে। "কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী।" অনেক লোকে অনেক উপমা লিখিয়াছেন, দ্বিজেন বাবুকে কিছু নূতন লিখিতেই হইবে। তাই তিনি লিখিলেন "তাঁহার সেই কাতরোক্তিটি মৃতবৎসা ছাগীর অস্ফুট ক্রন্দনের মত শুনাইল।" "মৃতবৎসা ছাগী" এসব উপমা দিয়া উপমেয়কে দুর্ব্বোধ্য করিবার কোনো আবশ্যকতা দেখি না। "সাহিত্যের" পুরাতন পাতাগুলি উল্টাইলে দু তিন বৎসরের আগেকার দ্বিজেন্দ্রবাবুর পরিচয় ও উপমা সম্বন্ধে তাঁহার মত জানিতে পারা যায়। যাক্ সে কথা। যিনি উন্নতির উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে পদার্পণ করিতেছেন তাঁহার আগেকার মত বদলান অসম্ভব নয়। পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিবার অবসরটুকু লেখক কোথাও ছাড়েন নাই। একজায়গায় শেলি ও বৈষ্ণব কবিদের লইয়া কি যে মাথা মুণ্ড, বকিয়াছেন তাহা কুশাগ্রবুদ্ধি লেখকই বুঝেন। লেখকের বাঙ্গালা উপন্যাসের উপর আক্রোশটি এ রচনাটিতেও প্রকাশ পাইয়াছে। জানি না তিনি কি করিতে চান্, কোন্ দিন হয় ত আলমারি হইতে বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর কৃষ্ণকান্তের উইল প্রভৃতি "কুনীতি মূলক" সোনার উপন্যাসগুলি দগ্ধ করিতে উদ্যত হইবেন। চিত্রাঙ্গদার মাথায়ত বীরের মত গদা মারিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যে দ্বিজেন্দ্র বাবু কি রাখিতে চান্ জানি না—তবে বোধ হয় কেবল দুই চারিটা হাসির গান বা 'মোহিনীর' মত



দুই চারিটা গল্পই বঙ্গসাহিত্য আলোকিত করিয়া রাখিবে এ দুরাশা তিনি করেন নাই। কুলবধু মোহিনীর সকলের সম্মুখে ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়া Dramatic বটে, কিন্তু সমাজসঙ্গত বা স্বাভাবিক নয়। লেখক এ দোষটুকু নিজেই ধরিয়াছেন। না ধরিলেই চলিত; হোক্ না অস্বাভাবিক, তাহাতে ক্ষতি কি? নূতনত্ব চাই ত, অনেকেই যে গল্প লিখিয়াছেন! তারপর লেখকের উচ্ছাস—"নারী! নারী! ঈশ্বর কি দিয়া।" ইত্যাদি, ইত্যাদি। দ্বিজেন বাবুর নারীভক্তিটা ইদানীং কিছু বেশী, দার্শনিক কবি কি না। একটু সুরুচির নমুনা দিই—"সুশীলের বিবাহের পর এক বৎসর গিয়াছে। শ্বেতচর্ম্মের সখ তাঁহার ইতিপূর্ব্বেই মিটিয়াছিল"। কি সুন্দর কথা। বলি বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল ছিঁড়িয়া এই সুরুচিপূর্ণ কথাগুলি কি বাঙ্গলা সাহিত্যে গাঁথিয়া রাখিতে হইবে? "মোহিনী চন্দ্রালোকে ভাবিতেছিলেন, দূরে শানাই বাজিতেছিল।" শানাই কোথা হইতে আসিল? রবিবাবু প্রমুখ অন্যান্য গল্প লেখকগণ সুসময়ে শানাইয়ের অবতারণা করিয়াছেন; শানাইয়ের সুরটা লাগেও ভাল। কাজেই দ্বিজেন বাবু,—কোনো বলাকওয়া নাই,—হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত শানাইয়ের তান শুনাইলেন, সে আবার যে সে তান নয়, "সে তান কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া"—ইহাতেও নিস্তার নাই—"মূর্চ্ছিত হইয়া"—হায়, হায়,—"পড়িয়া গেল"। কি ভাব। কি কৃতিত্ব। ভারি লাগসৈ হে। আরো দুই একটা কথা বলিবার আছে। গল্পটিতে অনেকগুলি চরিত্র ফুটাইতে লেখক চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু একটিতেও তিনি কৃতকার্য্য হন নাই। গল্পের চতুর্থ অংশটি কোথা হইতে লেখকের কতকগুলি "উড়ো" মত লইয়া জীর্ণ চটের কদর্য্য "তালির" মত শোভা পাইতেছে। তালিটুকু না থাকিলে বরং কতকটা ভাল দেখাইত। মোটের উপর প্রভাতবাবুর "দেশী ও বিলাতী" পড়িয়া যে কোন স্কুলের বালক এইরূপ একটা হিজিবিজি লিখিয়া আফিসের সম্পাদকদিগকে জ্বালাতন করিতে পারিত। তফাতের ভিতর তাহার লেখা ছাপা হইত না; কিন্তু ইহাঁর লেখা নামে বিকাইয়াছে। ছোট গল্প উপন্যাস নয়, নাটক নয় বা সমালোচনা নয়। বাঙ্গালা সাহিত্যে ছোট গল্পের আদর্শ রবিবাবু দিয়াছেন। তাহার উপর বা অন্ততঃ তাহার কাছাকাছি কিছু যদি দ্বিজেন বাবুর দেওয়া সাধ্য হয় তাহা তিনি করুন; এরূপ রচনা যেন তিনি আর প্রকাশ না করেন। তিনি ছোট গল্প মস্কো করুন, অনেক সংশোধনের পর যদি সেগুলি কখনো প্রকাশযোগ্য হইয়া দাঁড়ায়, তবে যেন সেগুলি মাসিকপত্রের সম্পাদকগণের নিকট প্রেরিত হয়। আর একটা কথা, প্রসিদ্ধ লেখকের অক্ষম রচনা সম্পাদকেরা গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু সমজদার ও স্থায়ী সাহিত্য তাহাকে দূরে ফেলিয়া দিবে। কালের পরীক্ষায় তাহা কখনই উত্তীর্ণ হইবে না। মনে করিলেই কালিদাস, Shakspere, বঙ্কিমবাবু বা রবিবাবু হওয়া যায় না। যাহার যাহা লিখিবার ক্ষমতা আছে, যাহাতে যিনি পারদর্শী, তিনি তাহাই লিখুন। সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা পৃথিবীতে অল্পই জন্মে। প্রাচীন লেখকেরও সংযম আবশ্যক মনে বিদ্বেষ বা কল্পিত প্রতিদ্বন্দ্বীতার ভাব থাকিলে রচনা নিশ্চয়ই ব্যর্থ হইবে। "বিশ্বের, আকর্ষণী শক্তি" শ্রীচন্দ্রশেখর সরকার রচিত; প্রবন্ধটি উল্লেখ যোগ্য।

উপাসনা, পৌষ ও মাঘ।

"কর্ম্ম ব্রহ্ম বিচার" চলিতেছে। "মুদ্রা" নানা তথ্যে পূর্ণ। "বাহন-তত্ত্ব" শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক বলিতে চান, বাস্তবিক শিবের বাহন বৃষ, ব্রহ্মার বাহন হাঁস প্রভৃতি ছিল না, পূর্ব্বকালে মনুষ্যদিগের মধ্যে বানর, ঋক্ষ, হংস, গো, ময়ূর, মূষিক, প্রভৃতি বলিয়া শ্রেণীগত নাম ছিল, এক একজন দেবতা তাহাদেরই নায়ক ছিলেন। লেখক পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার রচনাটি ব্যর্থ হইয়া গেছে। এত তর্জ্জন গর্জ্জনের পর লেখক যে নিতান্ত কৃপার পাত্র হইয়া পড়িবেন, তাহা আমরা আগে ভাবিতে পারি নাই। রচনায় নিখুঁত যুক্তিতর্কের বড়ই অভাব। "কয়েকটি ভুল" প্রবন্ধটিও পূর্ব্বের মত। সংস্কৃত ব্যাকরণের কৃপায় একটি কথার নানা রকম অর্থ করা যায়। শুধু তাহার ও দুই একটা যত্নসঞ্চিত শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া বহুকাল প্রচলিত একটা ভাব বা কথার উচ্ছেদ করা চলে না; বড়ই দুঃখের বিষয় লেখক তাঁহার মত সমর্থন করিবার জন্য একটাও সঠিক প্রমাণ বা (Direct evidence) দেখাইতে পারেন নাই। পৌরাণিক কথাগুলি যে সমস্তই সত্য তাহা আমরা বিশ্বাস করি না, ইহাতে কল্পিত জিনিষ আছে; প্রত্যেক ব্যাপারের আমাদের মনের মত একটা অর্থ গড়িয়া লওয়া সাহসিকতা ভিন্ন আর কিছুই নয়। "ন্যায়দর্শনে বৌদ্ধমত খণ্ডন" সারগর্ভ, ভাষা সহজ হইলে ভাল হইত। "তপোবন-চিত্র" কবিতাটি প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যাদি হইতে সঙ্কলিত, মৌলিকতার বড়ই অভাব; ভাষা সংস্কৃতবহুল, যাই হোক চিত্রটি ফুটিয়াছে, ইহাকে লেখকের কৃতিত্ব বলিব কি? "সাহিত্য ও সমাজ" শীর্ষক প্রবন্ধটি জটিল, স্থানে স্থানে সংযমেরও অভাব আছে। "শূন্য-গৃহ" কবিতাটি চলন সই। "উপনিষদের প্রতিপাদ্য" সুন্দর হইতেছে, প্রথম অংশটি আরো সরল হইলে ভাল হইত। "বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের আইন" প্রবন্ধটি মন্দ নয়, এরূপ রচনার অভাব বঙ্গসাহিত্যে কলঙ্ক আরোপ করিয়াছে। "ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম" প্রবন্ধটি সুন্দর হইয়াছে; বিষয়টি পুরাতন হইলেও লেখকের আলোচনায় ইহার নূতনত্বও কিয়ৎপরিমাণে ফুটিয়া উঠিয়াছে। "ফিরে যাও হে মরণ" একটি ইংরাজী কবিতার অনুবাদ—চলন সই হইয়াছে। "বাইশ প্রকার পরাজয়ে" মহর্ষি গৌতমের বাইশ প্রকার Logical fallacy র কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রবন্ধটিতে উদাহরণ সংখ্যা আরো বেশী হইলে ভাল হইত। সংস্কৃত দর্শনের "স্বল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং" সূত্রগুলি অপরিণত বাঙ্গালাভাষায় কেবল অনুবাদ করিলে চলিবে না—দেশকালের উপযুক্ত ভাষা লিখিতে হইবে। এস্থলে আমাদের ইংরাজী দর্শনের আদর্শ সম্মুখে রাখা আবশ্যক। প্রাচ্য ভাব প্রতীচ্য আলোকে না ধরিলে চলিবে না। Mill Bain প্রভৃতি দার্শনিকগণ শুধু সূত্র লিখিয়া যান নাই, নানা উদাহরণে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহারা ক্ষতিগ্রস্থ হন নাই; ইহাতে তাঁহাদের পাঠক সংখ্যা বাড়িয়াছে, নীরস বাহখানি সরস হইয়া পড়িয়াছে। আশা করি, বাঙ্গালার দর্শনশাস্ত্র নীরসতা ছাড়িয়া একবার সরসতার দিকে ছুটিবে। "আর্য্যনীতি বিজ্ঞান" বেশ চলিতেছে। উপাসনার প্রবন্ধ বৈচিত্র্য আবশ্যক।

মানসী।

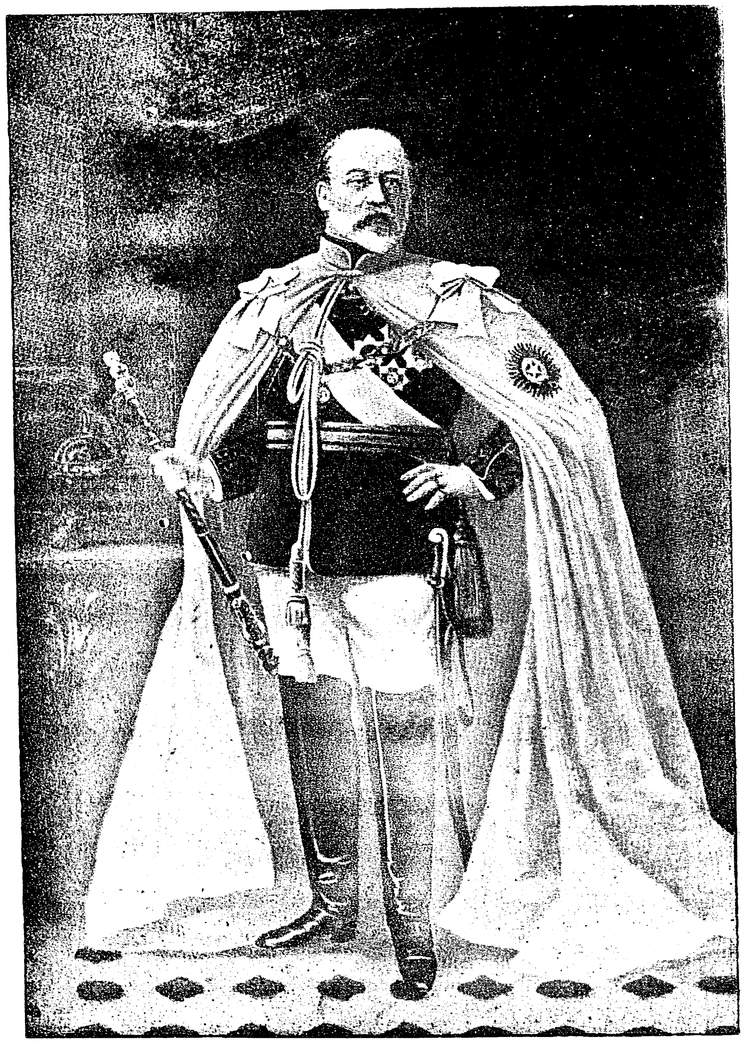

ভূতপূর্ব্ব সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড।

*Printed by K. V. Seyne & Bros.*

# মানসী

দ্বিতীয় ভাগ। বৈশাখ ১৩১৭ সাল ৩য় সংখ্যা।

## রবীন্দ্রনাথের প্রতি।

—:*:—

শ্যামল বঙ্গের কোলে স্বর্গের যে ফুল দোলে,
বঙ্গের আকাশে ফুটে যে তারা উজল,
তোমার কবির প্রাণ শুনিয়া তাদের গান
আনন্দে ফুটিয়া বুঝি হ'য়েছে বিহ্বল!
মন্দাকিনী কুলে কুলে ভ্রমিতে কি মনোভুলে
এনেছ যতনে তুলে কলধ্বনি তার,
যমুনার তীরে যার বাঁশী কাঁদে অনিবার,
সে বুঝি দিয়েছে তোমা বাঁশী উপহার!
নিজের হৃদয় লয়ে নিজে আছ সুখী হ'য়ে,
চলেছ মনের মত পথে আপনার,
মুগ্ধ যারা তব গানে চেয়ে আছে তব পানে
লও কবি! তাদেরি এ দীন উপহার।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ঘোষ।

# জহ্নু-আশ্রম—গৈবীনাথ।

——:*:——

সে আজ দ্বাদশ বৎসরের কথা যখন আমি প্রথম সেই পুরাপ্রসিদ্ধ জহ্নুমুনির পবিত্র আশ্রম গৈবীনাথ দেখিতে যাই। সেই সৌন্দর্য্যময় স্থানের প্রাকৃতিক চিত্রখানি দ্বিতীয়বার দেখিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্তও আমার মানসপটে যেন উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত ছিল। কিন্তু সৌন্দর্য্যের কেমন একটা অসাধারণ শক্তি আছে যে মানব আপনি সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না, প্রিয়জনকে সেই সৌন্দর্য্যের অংশীদার করিবার জন্য তাহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠে। অন্য সর্ব্ববিধ কাম্যবস্তুর উপভোগ ও আকাঙ্ক্ষা স্বার্থসম্ভূত। ধন বল, ঐশ্বর্য্য বল, মান সম্ভ্রম বল, সমুদয়েরই উপভোগ একাই করিতে ইচ্ছা হয়, সুতরাং সমুদয়ই স্বার্থ-প্রণোদিত। কিন্তু কোনও একটী সুন্দর জিনিস দেখিলে বা অন্য কোনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্য্য উপভোগ করিলে প্রিয়জনকে সেই সৌন্দর্য্যের আস্বাদ প্রদান করিতে মানব মাত্রের মন স্বতঃই ধাবিত হয়—এই টুকুই সৌন্দর্য্যের বিশেষত্ব। বোধ হয় সৌন্দর্য্যের মধ্যেই সেই সুন্দরতম, প্রাণারাম ভগবানের শ্রীমূর্ত্তি বিশদভাবে প্রকটিত হয়, তাই মানবপ্রাণ একাকী সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না, অপরকে সেই সৌন্দর্য্য উপভোগের অংশী করিতে চাহে। তাই ভাগলপুর সাহিত্য সম্মিলন-অধিবেশন অবসরে বন্ধুবর অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণকে বলিলাম—'চল, জহ্নুমুনির আশ্রম দেখিয়া আসি।' বন্ধুবর সম্মত হইলেন। আমাদের সহিত শ্রীমান্ হৃষীকেশ মিত্রও চলিলেন। তিনি গৈবানাথ দেখিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু স্থানটীর সৌন্দর্য্যে এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, যে তিনি দ্বিতীয়বার দেখিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না। আহারাদি সমাপন করিয়া ষ্টেশনে যাইবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় বেহারা আসিয়া সংবাদ দিল, এখন গাড়ী বা এক্কা একখানিও পাওয়া যাইবে না। বন্ধুবর প্রমাদ গণিলেন, আমরাও একটু চিন্তিত হইলাম। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের মধ্যাহ্ন খরতেজে ধূলিময় বর্ত্ম দিয়া বন্ধুবরকে হাঁটাইয়া লইয়া কি প্রকারে চলিব। যিনি পদব্রজে ভ্রমণে অনভ্যস্ত, মস্তিষ্কের পীড়ার জন্য একটুও রৌদ্র যাহার সহ্য হয় না, তাঁহাকে এই



প্রখর রৌদ্রে কি করিয়া লইয়া যাইব! যাহা হউক বন্ধুবরকে আশ্বাস দিলাম "বাহির হইয়া পড়া যাক্, রাস্তায় নিশ্চয়ই গাড়ী বা এক্কা পাওয়া যাইবে।" ভগবানের কৃপায় একখানি এক্কা গাড়ী দেখিতে পাইলাম। ভাড়া করিয়া আমরা তিনজনে উঠিয়া বসিলাম। পঁচিশ মিনিটের মধ্যে ট্রেণ ধরাইয়া দিতে পারিলে এক্কাওয়ালাকে বিশেষ ভাবে বক্সিস্ করিব আশ্বাস দেওয়ায় সে অশ্বিনীকুমারকে প্রাণপণে ছুটাইল। প্রবল কষাতাড়নে অশ্বপ্রবর রাজপথের ধূলি উড়াইয়া চলিল। তখন প্রতিমুহূর্ত্তেই আমাদের ভূমিতলে পতনের আশঙ্কা হইতেছিল, আর মনে হইতেছিল "বেঘোরে বেহারে চড়িনু এক্কা—"

যাহা হউক ঢং ঢং করিয়া গাড়ী ছাড়িবার সঙ্কেতসময়ে আমরা অতি কষ্টে তিনখানা টিকিট করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। সুলতানগঞ্জের এসিষ্ট্যাণ্ট ষ্টেশন মাষ্টারের সহিত সাহিত্য-সম্মিলনেই আমাদের আলাপ পরিচয় হইয়াছিল; তিনি আমাদিগকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন ও আমাদিগের সমভিব্যাহারে গৈবীনাথ দর্শনে চলিলেন।

সুলতানগঞ্জ একটি বাণিজ্যপ্রধান বন্দর। এখান হইতে বিহার প্রদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই চাউল, পেঁয়াজ, রসুন প্রভৃতি রপ্তানি হইয়া থাকে; বোম্বাই আম্র ও অন্যান্য সুমিষ্ট ফল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং অন্যান্য স্থান সমূহে নীত হইয়া থাকে।

গৈবীনাথ যাইবার পথ আমার স্মৃতিপথে এরূপ অঙ্কিত ছিল যে আমি পথপ্রদর্শক স্বরূপ গন্তব্যাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়াই রাজপথে পড়িলাম, পথের দুইপার্শ্বে অতীতের সাক্ষ্য বৃহৎ বৃহৎ পাদপরাজী দণ্ডায়মান থাকিয়া পথিকগণকে সুশীতল ছায়া দান করিতেছে। ছোট বড় অনেক তালগাছ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান। অনতিদূরে পথপার্শ্বে কয়েকখানি বিপনি লইয়া গঠিত ক্ষুদ্র স্থানীয় বাজার। এখানে কয়েকখানি এক্কা ও গোযান রহিয়াছে দেখিলাম। গতবারে এখানে প্রায় বার চৌদ্দটী হস্তী ও সাত আটটী উষ্ট্র দেখিয়াছিলাম, এবার তাহাদিগকে দেখিতে পাইলাম না। আমরা রৌদ্রে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর গিয়া রাজপথ ছাড়িয়া মেঠোপথে চলিলাম। কর্ত্তিতশস্য ক্ষেত্রগুলি বিগতশ্রী হইয়া রহিয়াছে। এইস্থানে আমরা একটী উচ্চ স্তূপ

দেখিতে পাইলাম। বারান্তরে এই স্তূপের বিষয় আলোচনা করিবার বাসনা রহিল। এই স্তূপ হইতে বহুতর বৌদ্ধনিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের "Journal of the Asiatic Society" Vol xxxiii ৩৬০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত প্রবন্ধটী পাঠ করিতে পারেন। তাহার পর আমরা এক বিস্তৃত আম্রকাননের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলাম। বৃক্ষপত্রমধ্যে লুক্কায়িত ঘুঘুর উদাস সুর থাকিয়া থাকিয়া শ্রুতিগোচর হইতেছিল। সুশীতল ছায়া সমাবৃত পথ প্রাপ্ত হইয়া আতপতাপ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া কবিবর রবীন্দ্রনাথের সেই "পাখীডাকা ছায়ায় ঢাকা পল্লীবাটের" কথা মনে পড়িতে লাগিল। অর্দ্ধক্রোশ চলিবার পর সুলতানগঞ্জের বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বাজারটী বেশ বড়। সকলরকম দ্রব্য সম্ভার লইয়া দোকান পসারিরা স্ব স্ব বিপনি সাজাইয়া বসিয়া আছে। এই স্থান হইতে গৈবীনাথের অমল ধবল মন্দিরের শীর্ষদেশ নয়নগোচর হয়। বাজার ছাড়িয়া একটী ছোট জীর্ণমন্দির দৃষ্ট হইল। ইহা বহুদিনের পুরাতন নহে। কিয়দ্দূরে যাইয়া আমরা গঙ্গাতীরে আসিয়া উপনীত হইলাম। এখানে গঙ্গা উত্তরবাহিনী। যেখানেই ভাগীরথী আপনার অভ্যস্ত পথ ছাড়িয়া উত্তরাভিমুখে ছুটিতে থাকেন সেই স্থানেই হিন্দুদিগের তীর্থবিশেষ। তাই বারাণসী হিন্দুদিগের পবিত্রতীর্থ; বিহারের ভিতরও মুঙ্গের, সুলতানগঞ্জ এবং কাহালগাঁও তীর্থস্থান। গ্র্যানাইট্ প্রস্তরময় সুদৃশ্য ক্ষুদ্র জঙ্গীরা পাহাড় গৈবীনাথের অমলধবল মন্দির মস্তকে লইয়া দণ্ডায়মান। ভাগীরথী লীলাবিভঙ্গে জঙ্গীরার সানুদেশ চুম্বন করিয়া সাগরে মিশিতে ছুটিয়াছে। চারিদিক নীরব নির্জ্জন। দীপ্ত সূর্য্যকিরণ শুভ্র মন্দিরগাত্রে প্রতিফলিত হইয়া ভাগীরথী বক্ষে ক্রীড়া করিতেছে। প্রকৃতির এই মৌন সৌন্দর্য্য দেখিবার ও উপভোগ করিবার, বুঝাইবার নহে। যেন কোনও বিরাট্পুরুষ, কোনও মহাতাপস সমুন্নত শীর্ষে শ্বেতচন্দনাক্ত পুণ্ডরীক সংস্থাপন করতঃ যোগমগ্ন, বিশ্বপতির ধ্যানে তন্ময়, নিম্নে সংসারের মায়া, মোহ, লোভ, কামনা, অবিদ্যা ও ঐহিক সুখ নবযৌবনা তরুণীর ন্যায় উচ্ছলিত লীলাভঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া যোগীবরকে আপাতমধুর সুখের তরঙ্গে গা ভাসাইতে আহ্বান করিতেছে; যোগীবর অটল, ধীর, গম্ভীর; তরুণীর লীলাভঙ্গিমা তাঁহার চক্ষে পড়িতেছে না, তাহার কলহাস্য তাঁহার কর্ণে



প্রবেশ করিতেছে না। দূরে খরকপুর পর্ব্বতশ্রেণী বিরাজমান। এই নিভৃত নির্জ্জনস্থান ভগবদারাধনার উপযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় অতি প্রাচীন কালে জহ্নু-মুনি এখানে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া দেবাদিদেবের আরাধনায় নিরত থাকিতেন। এই পুণ্য তপোবন তাঁহারই নামানুসারে জহ্নুগৃহ নামে অভিহিত হইত। কালে জহ্নুগৃহ 'জঙ্গীরা'য় পরিণত হইল, যেমন রাজগৃহ এখন 'রাজগিঁরে' দাঁড়াইয়াছে। কেহ কেহ বলেন সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের নামানুসারে এই পাহাড়ের নাম জঙ্গীরা হইয়াছে। পরে আমরা দেখাইব যে এই মত সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক।

সগরবংশীয় ভগীরথ যখন পিতৃকুল উদ্ধারার্থ গঙ্গাদেবীকে আনয়ন করিতেছিলেন তখন তিনি সমুদয়স্থান স্রোত দ্বারা প্লাবিত করিয়া আসিতেছিলেন। বলদৃপ্তা গঙ্গাদেবী মহোল্লাসে মুনিবরের আশ্রম ভাসাইয়া লইয়া চলিবার উদ্যোগ করিলে মুনিবর কুপিত হইয়া গণ্ডুষে গঙ্গাদেবীকে পান করিয়া ফেলিলেন। ভগীরথ দেখিলেন তাঁহার পিতৃকুলের উদ্ধার সুদূরপরাহত—এত পরিশ্রম, এত যত্ন সকলই বিফল হইল। তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া রোষকষায়িত লোচন মুনিবরকে স্তবে তুষ্ট করিলেন এবং ভবিষ্যতে তাঁহার আশ্রমের উপর কোনও রূপ অত্যাচার হইবে না এইরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলে পর, মুনিবর আপনার জানু হইতে গঙ্গাদেবীকে বাহির করিয়া দিলেন, তাই গঙ্গাদেবী জাহ্নবী নামে পরিকীর্ত্তিতা। ইহাই জঙ্গীরার পৌরাণিক কাহিনী।

জনপ্রবাদ হইতে জানিতে পারা যায়, মুসলমানদিগের শাসনকালে হরিনাথ ভারতী নামে জনৈক সন্ন্যাসী এখানে বাস করিতেন। তিনি প্রত্যহ দেবাদিদেবের দ্বাদশলিঙ্গের অন্যতম বৈদ্যনাথদেবকে দর্শন করিতে দেবগৃহে যাইতেন। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভক্তে ক্লেশসন্দর্শনে ব্যথিত হইয়া তাহার পথক্লেশ দূর করিবার জন্য স্বপ্নে প্রত্যাদেশ প্রদান করেন যে, "বৎস, প্রত্যহ তোমাকে এত ক্লেশ স্বীকার করিয়া দেবগৃহ যাইতে হইবে না। তুমি এই স্থানেই আমার দর্শন পাইবে।" সাধু আপনার আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অভীষ্টদেবকে দেখিতে পাইলেন। দেবতার নাম রাখিলেন গৈবীনাথ। "গৈবী"[1]শব্দের প্রচলন সংস্কৃতে বড় দেখিতে পাওয়া যায় না, তবে মহাভারতে "গৈবী সভ্য" নামে জনৈক ঋষির নাম পাওয়া যায়। সংস্কৃতে এই শব্দটী না পাইয়া কোনও কোনও পুরাতত্ত্ববিৎ

বলিয়া থাকেন পার্‌সী "অজগয়ব" হইতে "গৈবী" শব্দ সমুদ্ভূত। (Vide History of Eastern India by Montgomery Martin pp.39-41)। অতএব মন্দিরটী মুসলমানদিগের সময়ের। কিন্তু আমরা কোনরূপেই উক্তমতের সমর্থন করিতে পারি না। "গৈবী" ও "গেবী" শব্দ মহারাষ্ট্র প্রাকৃতে অদ্যাপিও বহুল পরিমাণে প্রচলিত রহিয়াছে। এবং আমরা যে খোদিত লিপিটী প্রাপ্ত হইয়াছি তাহার প্রথম দুইটী অক্ষরের প্রতি একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে দেখিতে পাইবেন "গেবী" শব্দ স্পষ্টই লিখিত রহিয়াছে। এই শিলালিপি পূর্ব্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। স্থানান্তরে ইহা বিশেষভাবে আলোচিত হইবে। ইহার অক্ষরগুলি গুপ্তাক্ষর। এক্ষণে আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে মুসলমান শাসনের বহুপূর্ব্বে হিন্দুদেবতার নাম "গেবীনাথ" বা "গৈবীনাথ" ছিল। অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নামানুসারে পর্ব্বতের নামও গৈবীনাথ হয়। সাধু সন্ন্যাসীর বাসস্থান বলিয়া সাহেবরা এই পাহাড়ের "ফকিরা পাহাড়" নাম দিয়াছেন। এখন আমরা বলিতে পারি জঙ্গীরা পর্ব্বত জাহাঙ্গীরের নামানুসারে কখনই হইতে পারে না। "গৈবী" শব্দের অর্থ 'গুপ্ত।' গেবীনাথ বুঝিতে যে দেবতা গোপনে ছিলেন পরে ভক্তদুঃখ মোচনার্থ আত্মপ্রকাশ করেন, তাই তাঁহার নাম গেবীনাথ। বুকানন্ সাহেব ঐ সাধুর নাম হরিনাথ বলিয়াছেন কিন্তু পুরাতত্ত্ববিৎ ক্যানিংহাম্ সাহেব তাঁহাকে "হরনাথ ভারতী" বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। হাণ্টার সাহেব ইহাকে দিগম্বর নামে অভিহিত করিয়াছেন। (Vide Hunter's Statistical account of Bhagulpur-Sultangunje)। জানিনা প্রবাদকথিত হরিনাথ বা হরনাথ ভারতী কর্ত্তৃক গৈবীনাথ জগতে প্রথম প্রচারিত হইয়াছেন কি না। তবে এটা বোধ হয় সত্য বলিয়া ধরা যাইতে পারে, যে কোনও মহারাষ্ট্র সন্ন্যাসী এই অনাদৃত শিবলিঙ্গকে জন সমাজে প্রচারিত ও নিজভাষায় এই লিঙ্গের "গৈবীনাথ" নামকরণ করেন।

কানিংহাম্ সাহেব লিখিয়াছেন ঃ—"মুসলমান শাসনকালে এস্থানে হরনাথ ভারতী নামক জনৈক হিন্দু সাধু বাস করিতেন। মুসলমানগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া তিনি দিল্লী গমন করেন এবং সম্রাটের অনুগ্রহবলে স্বপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কথিত আছে, সম্রাট্ তাঁহাকে তাম্রফলকে খোদিত একখানি ফার্ম্মাণ্ দিয়াছিলেন। কানিংহাম্ ও তদীয় সহকারী বেগ্‌লার্ সাহেব



ঐ ফার্ম্মাণ্‌খানি দেখিতে পান নাই। তিনি লিখিয়াছেন, পণ্ডিত গদাধর ব্যতীত কেহই এই ফার্ম্মাণ্‌খানি স্বচক্ষে দেখেন নাই। বুকানন্ সাহেব বলেন, এই হরনাথ ভারতী মন্দির-প্রতিষ্ঠাতা হইতে অধস্তন ত্রয়োদশ মহান্ত ; এবং যখন আমরা দেখিতে পাই বয়স্থ না হইলে কেহই এই সম্মানার্হ পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন না তখন আমরা বলিতে পারি এ মন্দির খুব প্রাচীন নহে। "The establishment of the present temple could not have been in a remote period." Buchanan সাহেব কি প্রমাণ পাইয়া এরূপ লিখিয়াছেন তাহা আমরা বলিতে পারি না। আমরা তাঁহার এই ভিত্তিহীন ফাঁকা কথায় আস্থাবান হইতে পারি না। কানিংহাম্ সাহেবও বুকাননের মত ধ্রুবসত্য জ্ঞান করিয়া লিখিলেন—"Twelve predecessors at an average of twenty-five years each would place the settlement of the first just 300 years before 1800, or in A. D. 1500 or a full century before the reign of Jehangir. This date would also agree with the Pathan style of the mosque" (Arch. Survry of India Reports Vol XV. P. p 21-22)। হায় পুরাতত্ত্ব আলোচনা!

কূল হইতে মুগ্ধনেত্রে মন্দিরের প্রতি কতক্ষণ চাহিয়াছিলাম বলিতে পারি না—দূরে শৈলশ্রেণী প্রহরীর ন্যায় দণ্ডায়মান। তাহাদের ভীষণদর্শন বন্ধুর রুক্ষ মূর্ত্তি ও জঙ্গীরাশীর্ষে গৈবীনাথের শান্ত সুবিমল মূর্ত্তির একত্র সমাবেশে মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদ্রেক হইতেছিল। কুলুকুলুনাদিনী ভাগীরথী অব্যক্তমধুর ধ্বনিতে আপনার মর্ম্মগীতি গাহিয়া যেন প্রিয়পতি দেবাদিদেব গৈবীনাথের মনোহরণ করিয়া চলিয়াছেন। উপরে নীল আকাশে কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষী উড়িয়া বেড়াইতেছে। গৈবীনাথ পাহাড়ের অনতিদূরে বাইস্‌করণ পাহাড়ে একটী মুসলমান মসজিদ্ শোভা পাইতেছে। অপরাহ্নে তপনকিরণ মসজিদের উপর পড়িয়া ঝলমল করিতেছে। মন্দির ও মসজিদের প্রতিবিম্ব ভাগীরথীর স্নেহশীতল বক্ষে পড়িয়া কি সুন্দর দেখাইতেছে। এখানে আর যেন হিন্দু মুসলমান ভেদাভেদ নাই ; মাতা সুরধুনীর পবিত্র স্নেহময় বক্ষে হিন্দু মুসলমান দুয়েরই সমান আদর। এহেন নীরব নিথর মনোরম স্থান ধ্যানধারণারই উপযুক্ত। এখানে

আসিলে মানব-প্রাণ পৃথিবীর সুখদুঃখ ভুলিয়া যায়, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইয়া সেই সর্ব্বসৌন্দর্য্যের চির অনন্ত উৎস আনন্দময়ের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে ব্যাকুল হইয়া উঠে। তখন মানব-প্রাণ স্বতঃই বলিয়া উঠে "দেব, তুমিই সর্ব্বভূতের আদিকারণ, তোমার অপার সৌন্দর্য্যের কিরণকণায় প্রকৃতি অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্না।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র।

---

# ধূমকেতু।

—:o:—

কল্পান্তের সহচর, উপপ্লব-হেতু,
বিশ্বত্রাস অমঙ্গল আমি ধূমকেতু।
উড়ায়ে পিঙ্গল-পুচ্ছ নিশীথ আকাশে
অনন্ত-দাহন দেহ সচকিত ভাসে
গ্রহ উপগ্রহ পরে; সুপ্তি-শান্তিহীন
অনন্ত এ শূন্যপথে ছুটি নিশিদিন
গগনে গগনে,—যেথা জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী
আলোক সভায় বসি আনন্দে উছলি'
গাহিতেছে চিরদিন সৃজনের গান—
কবে হবে সেই সৃষ্টি পূর্ণ অবসান
মহা অন্ধকার মাঝে, অন্ধ গতিহারা
কবে এই বিশ্বচক্র মহাকালধারা
স্তম্ভিত হইয়া যাবে ক্রমমন্দ স্রোতে,
উচ্ছৃঙ্খল অনিয়ত ভীম গতি হ'তে
হবে মুক্তিলাভ—অগ্নিস্বপ্ন, তারি লাগি',
বিশ্বের দীপ্তি পরে রহিয়াছি জাগি'।

# মানসী

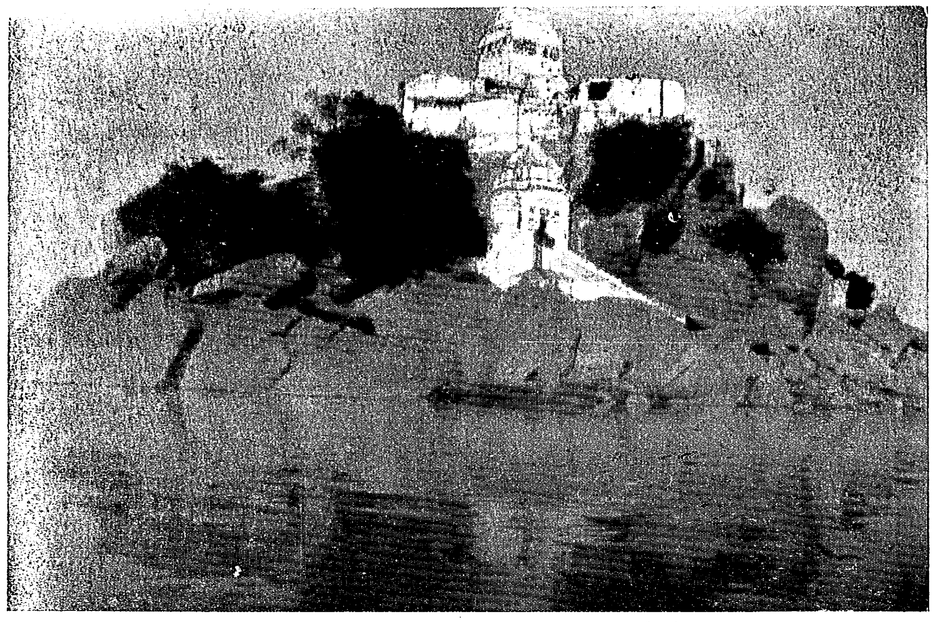

গৈবীনাথ।

গৈবীনাথে প্রাপ্ত খোদিত লিপি।

*Printed by K. V. Seyne & Bros.*

সৃষ্টির বোধনদিনে মহোল্লাসে মাতি',
মঙ্গল জনম লয়ে, দিশে দিশে পাতি'
আপন আসন, ছুটেছিল গ্রহতারা।
যে শক্তি ধরিয়াছিল সর্ব্বস্বার্থহারা
সুবিশাল নীহারিকা-জননী-জঠরে,
তিলে তিলে সংহারিয়া, অতি ক্ষীণ করে'
আপনারে, দিয়েছিল যেই তেজ হায়,
পূর্ণ গ্রহণের লাগি'—অবহেলি তায়
সমাপ্ত না হ'তে তার পূর্ণ-সংহরণ,
না ধরিতে পারি তার উৎকট স্পন্দন,
অন্ধ হয়ে বাহিরিল শিশু-চেতনায়,
বিশ্বব্যোম আন্দোলিয়া সীমা অসীমায়
নিয়ন্ত্রিত মহাঘূর্ণাপথে, সেই ক্ষণে
ব্যর্থ তেজের শেষ, ক্ষুব্ধ আমন্থণে,
টঙ্কারিয়া নিক্ষেপিল অগ্নিশর সম,'
প্রলয়ের ধূমশিখা ভয় মূর্ত্তি মম !
ছন্দে ছন্দে আবর্ত্তিয়া গ্রহ তারাদল
গাহিতেছে চিরদিন আলোক চঞ্চল
বিশ্বের জীবন গীতি, স্বপ্ন-সহচর
ষড়ঋতু ফিরিতেছে ঘুরি' পর পর
মানস উদ্যানে তার, বিচিত্র বিভায়
ফুটিতেছে সকলের দিগন্ত রেখায়
ভুবন মোহন জ্যোতি ; হরিৎ নীলিমা
রঞ্জিয়াছে তার দুকুল অঞ্চল সীমা।
সব আয়োজন পূর্ণ উৎসবের মত ;
(তবু) তারি মাঝে জীবনের উপদ্রব যত

রহিয়াছে অতন্দ্রিত মহাভয়ঙ্কর।
নাহি শান্তি, নাহি প্রেম, নাহি অবসর
মিলনের ; কত শ্রমে কত না যতনে
বয়ন করিছে যেই সুন্দর স্বপনে—
যেমনি সার্থক করি তুলিবে তাহায়,
সুপ্তোত্থিত বিপ্লবের মত্ত ঝটিকায়
ছিন্ন ভিন্ন করি দেয় কুয়াসার সাথে,
—সৃজন করিয়া নাশে আপনার হাতে !
এ দারুণ অভিশাপ, নিয়তির মত,
পাছে পাছে তার ঘুরিতেছে অবিরত ;
আমি তারি ধ্বজা, প্রলয়ের অগ্নিকেতু
সৃষ্টির মঙ্গল মাঝে অমঙ্গল হেতু
জন্ম মোর। চন্দ্রালোকে তুহিনের প্রায়,
রবিকক্ষে রাহু মত, মিলন শয্যায়
আসন্ন বিচ্ছেদ, জীবনের মধ্যদিনে
অকাল মরণ, কোন্ যমুনাপুলিনে
অফুরাণ অশ্রুজল, প্রেমের উৎসবে
প্রাণস্রুত হাসিধারা অধর সীধবে
ফেনোচ্ছল হইবার কালে, প্রতিভার
পূর্ণ পরিণতিচ্ছলে উন্মাদ আকার
চিত্তের বিভ্রম, সত্যপন্থী ধার্ম্মিকের
অহঙ্কার মোহ, নব-পুষ্প-কোরকের
প্রাণহারী দুষ্ট কীট, স্নেহের অন্ধতা,
জ্ঞানবৃক্ষে তিক্ত ফল পাপ নাস্তিকতা !
সৌন্দর্য্যে মোহিনী, বিষ মধু মদিরার,
আলোকের পাশে আমি চির অন্ধকার।



অতিদূর অতীতের ধ্রুব কর্ম্মফল
কর্ম্মীর বিস্মৃতিপরে অচল অটল—
সর্ব্বকাল জয় করি নিগূঢ় বেদনা
পীড়িত করিয়া থাকে সুষুপ্ত চেতনা।
যে প্রবৃত্তি শক্তি লয়ে দানবের মত
খেলিয়াছে উন্মত্ত অধীর, অসংযত
তীব্র বাসনার সেই গুপ্ত ইতিহাস,
অদৃষ্টের মর্ম্মন্তুদ মহা পরিহাস !—
তাই আমি, কাল পত্রে লেখা অগ্নি দিয়া,
কর্ম্মসাথে নাহি যোগ, শুধু প্রতিক্রিয়া।
তারি পথ আঁকিতেছি, জ্বালারেখা টানি
অনন্ত আকাশে। সেই মহাশেষ আনি',
বিভীষিকা জন্ম মোর ঘুচিবে যখন,
দাহ শেষ পুচ্ছ মোর অসিত বরণ
মিশে যাবে প্রলয়ের অন্ধকার সাথে,
কর্ম্মহীন অচেতন মরণের রাতে।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

---

# বিশু-দাদা।

—:০*০:—

( ৩ )

দিন যায়, থাকে না। তবে কাহারও দিন সুখে যায় কাহারও দিন দুঃখে যায়। নরেশ বাবু মনে করিয়াছিলেন—বিধবা কন্যা সুমতি ও পুত্র ভবেশকে লইয়া সুখে দুঃখে এক প্রকারে দিন কাটাইবেন। তাঁহার সে আশাও সফল হইল না। এখন তিনি দেখিলেন জীবনান্ত পর্য্যন্ত তাঁহাকে দুঃখেই দিন কাটাইতে হইবে। এ

আবার এমন দুঃখ যে, কাহারও নিকট বলিবার যো নাই, নির্জ্জনে ক্রন্দন করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। এমন ঘটনা হইয়া গেল কিন্তু কেহ নরেশবাবুর চক্ষুতে একবিন্দু জল দেখিতে পাইলেন না; কাঁদিলে যে বেদনা জুড়ায় এ ত সে বেদনা নহে। নরেশবাবুর হৃদয়ের মধ্যে যে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তাহার তেজে তাঁহার অশ্রুজল শুকাইয়া গিয়াছিল; কেবল একটা কি যেন থাকিয়া থাকিয়া তাহার বুকের ভিতর দিয়া হায় হায় করিয়া যাইতেছিল, এ দুঃখ বর্ণনার অতীত, ভাষা এখানে মর্ম্মবেদনায় কাতর হইয়া নীরব রহে, সান্ত্বনা এ বেদনার দ্বারদেশ হইতে বিমুখ হইয়া চলিয়া যায়। এই ভাবেই সে দিন গেল।

দিন গেল কিন্তু রাত্রি যে আর যায় না। পল্লীগ্রামে সন্ধ্যার পরেই সকলের গৃহে আহারাদি শেষ হইয়া থাকে. নরেশ বাবু ভবেশকে সঙ্গে লইয়া সন্ধ্যার পরেই সরকার মহাশয়ের গৃহে আহারাদি করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। একটু পরে বিশ্বনাথ আহার করিয়া আসিল। তখন নরেশবাবু ভবেশকে শয়ন করিতে বলিলেন কিন্তু নিজে শয়ন করিবার কোন ভাবই প্রকাশ করিলেন না। ভবেশ নিতান্ত বালক নহে; সে বুঝিল যে তাহার পিতার এখন শয়ন করিবার অভিপ্রায় নাই; সে বুঝিল যে এই রাত্রিকালে তাহার পিতা বসিয়া কত কি চিন্তা করিবেন, সেই জন্য ভবেশ বলিল "বাবা, আমার এখন ঘুম পাইতেছে না, আমিও একটু তোমার কাছে বসিয়া থাকি।"

নরেশবাবু পুত্রের মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন। তিনি বলিলেন "পরীক্ষার জন্য কতদিন ধরিয়া পরিশ্রম করিয়াছ, রাত্রিতে ভাল করিয়া ঘুমাও নাই। এখন দিন কয়েক সকাল সকাল ঘুমাও।"

ভবেশ বলিল "বাবা, তুমিও ত আমাকে লইয়া এতদিন রাত্রি জাগিয়াছ, তুমিও এখন দিন কয়েক বিশ্রাম কর না। বাবা, আমি কি ছেলে মানুষ; তুমি কি ভাবছো তা' কি আমি বুঝতে পারছি না, তা বাবা আর সে সকল কথা ভেবে কি হবে। এমনি কোরে ভেবে ভেবে তোমার যদি অসুখ হয়, তখন আমার কি হবে বাবা?"

তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, হৃদয়কে পাষাণের মত কঠিন করিবেন, তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে যে বহ্নি জ্বলিতেছে, তাহার সামান্য একটা কণাকেও বাহিরে প্রকাশ



হইতে দিবেন না। কিন্তু সে সঙ্কল্প আর থাকিল না। ভবেশের কথা শুনিয়া তিনি একেবারে স্ত্রীলোকের মত হা হা করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং ভবেশকে কোলে জড়াইয়া ধরিলেন। ভবেশও কাঁদিয়া ফেলিল; পিতাপুত্রের অশ্রুজলে বুক ভাসিয়া গেল। কাহারও মুখ হইতে একটী কথাও বাহির হইল না।

বিশ্বনাথ আজ সারাদিন নিতান্ত প্রয়োজনীয় দুই এক কথা ব্যতীত সুমতির সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গই নরেশবাবুর নিকট উপস্থিত করে নাই। বিশ্বনাথ লেখা পড়া জানে না বটে, কিন্তু মানুষের হৃদয়ের ভাব সে বেশ বুঝিতে পারিত। তাহার মনে হইয়াছিল, নরেশবাবু যে যন্ত্রণা পাইতেছেন তাহা কমিবার একই উপায় ক্রন্দন, নরেশবাবু যতক্ষণ ক্রন্দন না করিবেন ততক্ষণ তাঁহার হৃদয়ের বেদনা কমিবে না; তাই সে নরেশবাবুর ক্রন্দনের অপেক্ষা করিতেছিল; সে জানিত নয়নের জলে হৃদয়ের ক্ষত আরোগ্য হয়, সেই জন্য বিশ্বনাথ একটী কথাও না বলিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

পিতার কোলে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভবেশ ঘুমাইয়া পড়িল। নরেশ বাবুর মনে হইল এমনই করিয়া আর একদিন সুমতি তাঁহার কোলে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যে দিন সংবাদ আসিল তাঁহার একমাত্র কন্যা, কত আদরের আদরিণী সুমতি বিধবা হইয়াছে, সেই দিনও এমনই করিয়া সুমতিকে তিনি কোলের কাছে টানিয়া লইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। এমনই করিয়া রাত্রির নির্জ্জন অন্ধকারে এই ঘরের বারান্দায় এই স্থানেই অভাগিনী কন্যাকে বুকে করিয়া তিনি বসিয়াছিলেন, এমনই করিয়া সে পিতার কোলে মাথা রাখিয়া নিদ্রিত হইয়াছিল। আজ নরেশবাবুর সেই কথা মনে হইল। তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত জ্বালা আলোড়িত করিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস উঠিল; তিনি কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "ভগবান, এ কি করিলে?"

বিশ্বনাথ দেখিল এই কথা বলিবার সময়। সে তখন একটু অগ্রসর হইয়া বলিল "কাকাবাবু!" বিশ্বনাথ এতকাল নরেশবাবুকে 'কাকাবাবু' বলিয়া ডাকিয়া আসিয়াছে, কিন্তু আজ তার এই ডাকের মধ্যে কত কি যে মিশ্রিত ছিল, তাহা নরেশবাবু ভাবিয়া উঠিতে পারিলেন না। এত স্নেহ, এত মমতা, এত ভালবাসা, এত সমবেদনা ঐ 'কাকাবাবু' ডাকটীর মধ্যে যে থাকিতে পারে, তাহা নরেশবাবু

এতকাল বুঝিতে পারেন নাই। গত রাত্রি হইতে আজ এত রাত্রি পর্য্যন্ত নরেশ-বাবু অনেকের সহিত কথা বলিয়াছেন, অনেকে তাঁহার নিকট আসিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু ঐ এক 'কাকাবাবু' ডাকটীর মধ্যে তিনি যাহা পাইলেন তাহা তিনি কখনও পান নাই, এ জীবনে কখন এমন সুধামাখা ডাক তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই। বাল্যকালে তিনি পিতৃহীন হইয়াছিলেন, বিধবা মাতা তাঁহাকে অনেক কষ্টে লালনপালন করিয়াছিলেন; নরেশবাবুর মনে হইল সেই স্বর্গগতা পূজনীয়া মাতার মুখেও বুঝি এত মমতা পূর্ণ ডাক তিনি কখনও শোনেন নাই। তাঁহার শোকসিন্ধু আবার উথলিয়া উঠিল, এবার তিনি একেবারে বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিলেন—পাষাণ গলিয়া গেল—মুখে কথা বাহির হইল না। বিশ্বনাথ কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার ডাকিল "কাকাবাবু!"

নরেশবাবু তখন অতিকষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন "কি, বিশ্বনাথ!"

বিশ্বনাথ তখন বলিল "কাকাবাবু, তুমি ত কাঁদিতেছ; আমি যে কাঁদিতে পারি না তার কি বল?"

নরেশ। কি বলিব বিশ্বনাথ, আমার বলিবার কিছুই নাই, আমি যে ভাবিয়া কিছুই পাইতেছি না, বিশু, বলিতে পার কি পাপে আমার এই শাস্তি।

বিশ্বনাথ। তা জানিনা কাকাবাবু, কিন্তু আমি এক কথা মনে ঠিক করেছি, তাই আমার চোখে জল নাই। আমি তোমাকে বল্‌ছি কাকাবাবু, আমি কিছুতেই চুপ করিয়া থাকিব না। আমি এই সারা দেশটা খুঁজিয়া দেখিব—দেখিব কোথায় কে আমার দিদিকে চুরী কোরে রেখেছে—দেখ্‌বো আমাদের ছেড়ে সে কেমন আছে। শোন কাকাবাবু, যদি দেখি দিদি আমার পাপে গা ঢেলে দিয়েছে, তা হোলে ঘরে ফিরে আস্‌বো, তার নামও মুখে আন্‌বো না; যে তার নাম কোর্‌বে, তার মুখও দেখ্‌বো না। কিন্তু যদি দেখি দিদি আমার শুকিয়ে গিয়েছে, দিদি আমার কেঁদে সারা হো'চ্চে, দিদি আমার হাহাকার কোর্‌ছে, তা হোলে তা'কে আমি আবার কোলে তুলে নেব, আবার তাকে দিদি বোলে ডাক্‌বো, আবার তাকে নিয়ে সংসার বসাবো। এই দুয়ের একটা যতদিন না কোর্‌তে পার্‌ছি, ততদিন কাকাবাবু, এ বিশুর চোখে তুমি জল দেখ্‌তে পাবে না। তোমরা



যে যা' বল, আমি যা' মনে কোরেছি, তা আমি কোর্‌বোই কোর্‌ব। তাতে তুমি আমাকে যাই কেন বল না। আর দেখ—

বিশ্বনাথের কথায় বাধা দিয়া নরেশ বাবু বলিলেন "দেখ বিশু, তুমি যা' যা' বোল্লে আমি তা' বুঝেছি কিন্তু তা' কি কোরে হবে? দেশে বাস কোর্‌তে হোলে, সমাজে দশজনের মধ্যে থাক্‌তে গেলে তা' কি কোরে হোতে পারে বিশু?"

বিশ্বনাথ বলিল "সে কথার তর্ক এখন নয় কাকাবাবু, সে কথা ভগবান যদি কখন দিন দেন তখন হবে। এখন তুমি আমাকে দিন কয়েকের জন্য ছেড়ে দেও, আমি একবার দিদিকে খুঁজ্‌তে যাবো। হনুমান যেমন সীতাদেবীর খোঁজ কোরেছিলেন আমি তেমনি এই দেশের ঘরে ঘরে আমার দিদির খোঁজ কোর্‌বো।"

নরেশ। তাতে লাভ কি বিশু? আর ওকথা কেন? ভুলে যাও না যে, আমার একটা মেয়ে ছিল, ভুলে যাও না একজনকে এতকাল তুমি কোলে পিঠে কোরে মানুষ কোরেছিলে', মনে কর না সেদিন তুমি তা'কে যমের হাতে দিয়ে এসেছ, গঙ্গার জলে তাকে ভাসিয়ে দিয়ে এসেছ।

বিশ্বনাথ। কাকাবাবু, অমন কথা বোলো না, আজ যদি আমি দিদিকে গঙ্গার ঘাটে রেখে আস্‌তে পারতাম, তা'হোলে ত গলা ছেড়ে কেঁদে প্রাণ জুড়াতেম, কিন্তু তা' ত পারি না কাকাবাবু! না, সে কথা আমি শুন্‌তে চাই না। তুমি ভবেশকে নিয়ে কিছুদিন বাড়ীতে থাক, আমি একবার দেশে দেশে ঘুরে আসি।

নরেশ। বিশু! এ সময় তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে? শোন, আমি কি স্থির কোরেছি, আমি এদেশে আর থাক্‌বো না, এদেশের লোকের কাছে মুখ দেখাবো না। দেশে আমার কি আছে বিশু? সংসারে এক ভবেশ, আর এক তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে বিশু! আমি তোমাদের দুইজনকে সঙ্গে নিয়ে এই দেশ ছেড়ে চোলে যাবো। যেখানে আমাদের কেহ চেনে না সেইখানে গিয়ে জীবনের বাকি কয়টা দিন কাটাবো। এক চিন্তা—ভবেশ,—তা'র অদৃষ্টে যা' থাকে তাই হবে। এই ত বিশু, এতকাল সুমতিকে কোলে কোরে মানুষ কোরলাম, নিজে না খেয়ে তার মুখে খাবার তুলে দিলাম; কিন্তু কি হোল বিশু! সে ত একবারও আমাদের কথা ভাব্‌লো না।

বিশ্বনাথ। সে ভাব্‌ছে কি না, সে কাঁদছে কি না তাই দেখ্‌বার জন্যই ত

আমি একবার যেতে চাই। তুমি আমাকে নিষেধ কোরনা কাকাবাবু, আমি যা' মনে কোরেছি তা' না কোরে ছাড়্‌ব না।

নরেয়। বিশু, আজ আমাকে ভাল কোরে ভাব্‌তে দাও; কাল তোমার কথার উত্তর দেবো। যাও, এখন একটুও বিশ্রাম কর নাই। বিশু, আমরা তোমার কে, যে আমাদের জন্য তুমি প্রাণ দিতে বোসেছ।

বিশ্বনাথ। তোমরা আমার কে তা' জানি না কাকাবাবু, কিন্তু আমার মনে হয় তোমরাই আমার সব। থাক্, সে কথা আর কাজ নাই, তুমি ভবেশকে নিয়ে ঘরে যাও; আমি যে কয় দিন আছি, এই বারান্দাতেই পোড়ে থাক্‌ব। হায় হায়! এত পাহারা দিয়েও ত দিদিকে বেঁধে রাখ্‌তে পারি নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজলধর সেন।

---

# মহানাটক।

—:০:—

( নবম অঙ্কের কিয়দংশ )

মন্দোদরীর প্রবেশ।

মন্দোদরী। লঙ্কানাথ। তবানুজ রাম-বাণে এবে গতপ্রাণ;
সাগর লঙ্ঘিয়া রাম পুরদ্বারে করে অধিষ্ঠান;
দূরে যবে ছিল রাম তখনো সে সীতা রোষান্বিতা
সন্নিহিত এবে রাম—অনুকূল হবে কি সে সীতা?
মন্দোদরী মুখ হতে এইকথা শুনি'
লঙ্কানাথ দশানন হলেন মৌনী॥

( অতঃপর রাবণ, ইন্দ্রবিজয়ী ইন্দ্রজিৎকে সমরে বরণ করিলেন। মেঘনাদ সমরে অবতীর্ণ হইলে, বানরেরা পলায়ন করিতে লাগিল।)



মেঘনাদ।—ক্ষুদ্র বানরগণ! তোমাদের নাহি কোন ভয়,
যে বাণ করিল দীর্ণ ইন্দ্রগজ-মহাকুম্ভদ্বয়
—পড়িলে ও-ক্ষুদ্র দেহে হইবে সে লজ্জিত নিশ্চয়।
সউমিত্রে! থাক তুমি—তুমি নহ রোষের ভাজন;
জেনো আমি মেঘনাদ; যে করিল সাগর বন্ধন
শুধু এক ভুরুর ইঙ্গিতে—সেই রামে করি অন্বেষণ॥
বর্ষার জলদ সম ইন্দ্রজিৎ থাকিয়া গগনে
শত্রুপরে শরজাল বরষিতে লাগিল সঘনে।
সুগ্রীব, অঙ্গদ, হনু, নীল, নল, মিত্র বিভীষণ,
অদৃশ্য সে ইন্দ্রজিতে কোথাও না করে দরশন॥
শত্রুজয়ী মেঘনাদ মায়ারথে করি আরোহণ,
নভস্তলে মেঘসম করি' ঘোর গভীর গর্জ্জন
সুমেরু মন্দর-সম রাম ও লক্ষ্মণ দুজনায়
নাগপাশ-বাণে বাঁধি ভূপতিত করিল হেলায়॥

( ইত্যবসরে, সরমা রাক্ষসী, রাবণের যাদ্ধাক্রমে, রামলক্ষণের এই অবস্থা সীতার নিকট জ্ঞাপন করিল। )

সীতা।—হা আর্য্যপুত্র! হা বৎস লক্ষণ! আমার জন্য তোমাদের এই দশা হল
বলিয়াছিলেন মোরে, বশিষ্ঠ গোতম মুনিগণ
—"সধবা সাবিত্রী হবে"—সেকি তবে অলীক বচন?
নাগপাশে বদ্ধ হ'লে রাম ও লক্ষণ
গরুড়াস্ত্রে করি' নিজ বন্ধন মোচন
করিতে লাগিল দোঁহে ঘোরতর রণ;
খর-শরে মেঘনাদে বধিল লক্ষ্মণ॥

দূত।—জনমুখে রণবার্ত্তা শুনিনু রাক্ষসরাজ,
তব পুত্র বীরবরে বধিল লক্ষ্মণ আজ
রুষ্ট হয়ে দশানন বলে—একি অদভুত!
মশকের গল-রন্ধ্রে প্রবেশিল হস্তিযূথ?

( রাবণ-পুত্র ইন্দ্রজিৎ নিহত হইলে রাবণের প্রতি মন্দোদরী )

মন্দোদরী।—ত্রিশিরার লাঞ্ছনা, সূর্পনখা নাসাচ্ছেদ,
মাতুল মারীচ-বধ, সেই সপ্ততাল ভেদ,
বালির নিধন, আর সুগ্রীবের সখ্য ;
লঙ্ঘন করিলা হনু সাগরের বক্ষ,
উৎপাটন করে আর লঙ্কার উদ্যান,
আরো কত অদভুত করে হনুমান।
এসমস্ত দেখিয়াও হয় নাই চেতনা যাহার
কুলনাশে হবে কি সে কামান্ধের বিবেক সঞ্চার ?

রাবণ।—অগ্নি যথা তৃণরাশি করয়ে দাহন
রাম তথা শত্রুসৈন্য করিছে নিধন ;
এ হেন রামেরে সীতা করিব কি দান
অথবা রাঘব-শরে যাব স্বর্গধাম ?
নীতিজ্ঞে ! বল' গো দেবি ! এ-দুয়ের কোন্ পক্ষ করিব গ্রহণ?
অথবা বাঁচিয়া একা কোনরূপে কুলরক্ষা করিব এখন ?
রে কাল ! অকালে আজি লভিয়া বিভব
পূর্ণকাম হলি তুই—ইহা সমুচিত—
নব নব মুণ্ডমালে নিজ কলেবর
এখন মনের সাধে কর' বিভূষিত।
রামের নিকটে তুমি করিয়া গমন
এই কথা শীঘ্র তাঁরে কর' নিবেদন :—
করবাল-ভীমবাহু লঙ্কার ঈশ্বর
যুঝিতে তোমার সাথে বদ্ধ-পরিকর।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর



# মূক-বধিরতা।

—:০:—

আমাদের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের সহিত যে সকল তৈজস-নাড়ী * সংযুক্ত আছে তাহারাই ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা বহিয়া মস্তিষ্কের এক এক নির্দ্দিষ্ট অংশে পৌঁছাইয়া দিলে, আমাদের ইন্দ্রিয়-জ্ঞান জন্মায়। শ্রবন, দর্শন, ঘ্রান, গ্রহণ প্রভৃতি সকলেরই মূলে ঐ একই ব্যাপার বর্ত্তমান।

কোন কঠিন তরল বা বায়বীয় পদার্থ বারবার কম্পিত হইয়া বায়ুরাশিতে যে তরঙ্গ তোলে, তাহাদিগকে গ্রহণ করিবার-শক্তি আমাদের কর্ণসংলগ্ন শব্দবহা তৈজস্-নাড়ীগুলিতেই আছে। ইহারা শব্দ-তরঙ্গের উত্তেজনা বহন করিয়া মস্তিষ্কে লইয়া গেলেই আমরা শব্দ শুনিতে পাই। চক্ষু নাসিকা বা জিহ্বা প্রভৃতি অপর কোন ইন্দ্রিয়ই শব্দতরঙ্গের ধাক্কায় সাড়া দেয় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে কোন একটা শব্দ শোনা বা না শোনা ব্যাপারটা শব্দবহা তৈজস্-নাড়ীর উপর নির্ভর করে। কোন কারণে বিকল হইয়া পড়িলে, 'এগুলি আর ঠিক মত শব্দ বহন করিতে পারে না। কাজেই আমরা শব্দও ঠিক মত শুনিতে পাই না।

শব্দবহা তৈজস্ নাড়ীর বিকলতাকে শারীরবিদ্‌গণ এক শ্রেণীর মূক-বধিরতার কারণ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। মূক-বধিরের বাগ্‌যন্ত্র, সুস্থ থাকে। নাড়ী শব্দ বহন করিতে পারে না বলিয়াই যত গোলযোগ।

দেহের কোন অংশ কোন কারণে দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, ধীরে ধীরে কাজ করাইয়া লইয়া তাহাকে সবল ও সুস্থ করিয়া তোলা যায়। যে লোক পায়ের দুর্ব্বলতার জন্য চলা ফেরা করিতে পারে না, অল্প অল্প নড়া চড়া সুরু করাইয়া দিলে, প্রায়ই শেষে তাহাকে অনায়াসে চলিতে ফিরিতে দেখা যায়। মূক-বধিরের কর্ণের তৈজস-নাড়ীর অসাড়তাকে আধুনিক শারীরবিদ্‌গণ ঐ প্রকারের

* "Nerve" এই ইংরাজি পারিভাষিক শব্দটিকে অনেকে বাংলায় স্নায়ু করিয়া লইয়াছেন। "স্নায়ু" শব্দটা আমাদের শারীরশাস্ত্রের একটা অতি পুরাতন কথা। ইহার ইংরাজি প্রতিশব্দ বোধ হয় "Muscles"। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় "Nerve" কে তৈজস-নাড়ী বলিয়াছেন।

একটা কিছু বলিতে চাহিতেছেন। ইহাঁরা বলিতেছেন, আমরা সর্ব্বদা যে সকল শব্দ শুনিয়া থাকি, সে গুলিকে যদি কোন উপায়ে নিয়মিত ভাবে ধীরে ধীরে মূক-বধিরের কর্ণে প্রবেশ করানো যায়, তাহা হইলে তৈজস্-নাড়ীর অসাড়তা দূর হইবার খুবই সম্ভাবনা আছে।

শারীরবিদ্‌গণ পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে এতই বিশ্বাসী হইয়াছিলেন যে, মূক-বধির লইয়া কয়েক জন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাও সুরু করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। শব্দের ওজন ( Pitch ) যে প্রকারে বাড়াইয়া কর্ণের অসাড় নাড়ীকে সুস্থ করা যাইতে পারে, মানুষের কণ্ঠ হইতে সে প্রকার নিয়মিত ধ্বনি পাওয়া যায় নাই। ক্রমে ক্রমে ওজন বাড়াইয়া ধ্বনি বহির্গত করার মত যন্ত্রও তখন কেহ নির্ম্মাণ করেন নাই। কাজেই সিদ্ধান্তটির চরম পরীক্ষাও সে সময় হইয়া উঠে নাই।

সঙ্গীতের খাঁটি সুর এবং মানুষের কণ্ঠধ্বনির মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। গলার সুর অত্যন্ত জটিল। আমাদের গলায় শব্দ-উৎপাদক যে যন্ত্র আছে, তাহা কেবল, এ, ই, ও, ইউ, এই কয়েকটি শব্দ উৎপন্ন করিতে পারে। তার পর যখন আমাদের মুখ নাক প্রভৃতি হইতে নানা ধ্বনি উঠিয়া উহাদেরি সহিত মিশিয়া যায়, তখনি আমরা মানব কণ্ঠের এক জমাট ধ্বনি শুনিতে পাই। খাঁটি অর্থাৎ অবিমিশ্র ধ্বনি উৎপন্ন করিবার জন্য বিজ্ঞানাগারে নানা প্রকার যন্ত্র আছে। টিউনিং ফর্ক ( Tuning Fork ) পাঠক, হয় ত দেখিয়া থাকিবেন। এই দ্বি-শূলাকার ধাতুময় জিনিসটাতে আঘাত দিলে, একই প্রকারের খাঁটি সুর বাহির হইতে থাকে। কিন্তু আমাদের কণ্ঠের স্বরযন্ত্রের সুরকে এই যন্ত্র হইতে বাহির করানো যায় না। কাজেই মূকবধিরের অসাড় তৈজস্ নাড়ীকে স্বরবোধে জাগ্রত করার জন্য ঐ সকল যন্ত্র ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া যায় নাই। এই বিফলতায় অনেকেই হতাশ হইয়া পরীক্ষা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ফরাসী বৈজ্ঞানিক ডাক্তার মারেজ ( Marage ) ইহাতে অনুমাত্র নিরুৎসাহ হন নাই। মনুষ্যের কণ্ঠস্থ স্বরোৎপাদক যন্ত্রের ন্যায় কোন এক যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহা হইতে সেই এ, ই, আই, ও, ইত্যাদি ধ্বনিগুলিকে বাহির করিবার জন্য ইনি নানা প্রকার চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি ইহার চেষ্টা সার্থকও হইয়াছে।



বিজ্ঞানজ্ঞ পাঠক সাইরেন্ ( Siren) যন্ত্রের সহিত অবশ্যই পরিচিত আছেন। কতবারের কম্পনে কোন্ সুর উৎপন্ন হইল, এই যন্ত্রের সাহায্যে তাহা স্থির করা যায়। যন্ত্রটি অতি সরল। একটি ধাতুময় চাকৃতির চারিদিকে কতকগুলি সমদূরবর্ত্তী ছিদ্র থাকে। সাধারণ হাফরের (Bellows) দ্বারা ঐ সকল ছিদ্রের প্রত্যেকটির তলায় একে একে বায়ুর ফুৎকার লাগানো হয়। কাজেই প্রত্যেক ছিদ্র হইতে, এক একটা "ফোঁস্" "ফোঁস্" ধ্বনি উঠিতে আরম্ভ করে। চাকৃতি ধীরে ধীরে খুলিলে এই সকল শব্দ দ্বারা কোন সুরই উৎপন্ন হয় না,—একটা গোলমেলে ধ্বনি কানে পৌঁছায় মাত্র। কিন্তু চাকৃতি দ্রুত ঘুরিলে আর কোলাহলের উৎপত্তি হয় না, পূর্ব্বের সেই বিচ্ছিন্ন শব্দগুলা জমাট বাঁধিয়া এক একটা সুর উৎপন্ন করিতে থাকে। চাকৃতিখানি মিনিটে কতবার ঘুরিতেছে, যন্ত্র সংলগ্ন কাঁটা দ্বারা তাহা আপনা হইতেই ধরা পড়ে। সুতরাং কতগুলি বিচ্ছিন্ন "ফোঁস্" "ফাঁস্" ধ্বনি মিলিয়া একটা জমাট সুর উৎপন্ন করিল, এই যন্ত্র দ্বারা তাহা অনায়াসেই স্থির করা যায়।

মারেজের যন্ত্রটিতে ঐ প্রকার পাঁচটি সাইরেন্ যন্ত্র সংযুক্ত আছে এবং এগুলিতে যাহাতে সেই, এ, ই, ইত্যাদি পাঁচটি ধ্বনি উৎপন্ন হইতে পারে তাহারও সুব্যবস্থা আছে। বৈদ্যুতিক কলের সাহায্যে চাকৃতির ছিদ্রে বায়ুর প্রবাহ চালানো হইয়া থাকে। কাজেই ধ্বনিকে মোটা মিহি করার ব্যাপারটা অতি সূক্ষ্মভাবে সুসম্পন্ন করা যায়।

বধির ব্যক্তির শ্রবণশক্তি কতটা দুর্ব্বল, আজকাল এই যন্ত্রের সাহায্যে অনায়াসে স্থির করা হইতেছে। যন্ত্র হইতে এক হাত দূরে লোকটিকে রাখিয়া সাইরেনের শব্দ বাহির করা হয়। ধ্বনি প্রথমে খুব নীচুই থাকে। তার পর ধীরে ধীরে চাকৃতির আবর্ত্তন গতি বাড়াইয়া সেটিকে উঁচু করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় এমন একটা শব্দ এক সময়ে বাহির হয়, যাহা বধির অনায়াসেই শুনিতে পায়। সুস্থ ব্যক্তি যে সকল শব্দ শুনিতে পায় তাহার সীমা নির্দ্ধারণ করা কঠিন নয়। ইহারি সহিত বধিরের শ্রুতিগোচর শব্দের ওজন তুলনা করিয়া, বধিরতার মাত্রা স্থির করা হইতেছে।

মারেজ সাহেব অনেক মূক-বধির লইয়াও পরীক্ষা করিয়াছেন। ইহাদের

মধ্যে তিনি কেবল দুই চারিটিকে প্রকৃতই শ্রবণশক্তি বর্জ্জিত দেখিয়াছিলেন। যন্ত্রের ধ্বনি উঁচু নীচু মোটা মিহি করিতে করিতে প্রায় প্রত্যেক বধিরই এক একটা সুর শুনিতে পাইয়াছিল। মারেজ সাহেব বলেন, আজন্ম মূক-বধিরগণ প্রায়ই অস্ফুট শব্দ শুনিতে পায়, এবং বিশেষ যে সকল ব্যক্তি বধির হইয়াছে তাহাদের শ্রবণেন্দ্রিয় স্ফুটতর শব্দ ব্যতীত অপর কোন ধ্বনিতেই সাড়া দিতে পারে না।

পূর্ব্ববর্ণিত যন্ত্র সাহায্যে কোন মূকবধির সত্যই আরোগ্য লাভ করিয়াছে কি না, আজও তাহা জানা যায় নাই। আমরা শিশুদিগকে প্রথমে বর্ণ-পরিচয় করাইয়া যেমন পরে সংযুক্ত বর্ণ ও শব্দ গঠনের নিয়ম শিক্ষা দিই, মারেজ সাহেব সেই প্রকার তাঁহার যন্ত্রোৎপন্ন খাঁটি ধ্বনিগুলির সহিত মূকবধিরদিগের পরিচয় স্থাপন করাইয়া লইতেছেন। দুই তিন মাস মাত্র কার্য্য সুরু হইয়াছে, কিন্তু ইতিমধ্যেই তিনি যথেষ্ট ফল লাভ করিয়াছেন। *

শ্রীজগদানন্দ রায়।

---

# চশ্‌মা।

—:০:—

বিশ্বনাথ কলু পাড়াগেঁয়ে লোক,
ধারেনাকো লেখাপড়ার ধার ;
দেখে কিন্তু চেয়ে চস্‌মা নাকে দিয়ে
কত লোকে পড়ে চমৎকার।
বুড় যারা বলে চস্‌মা ছেড়ে দিলে
দুদণ্ড তাদের চলেনা আর ;
ভাবে বিশ্বনাথ যত টাকা লাগে
কিনিব চস্‌মা করেও ধার।

* কলিকাতায় একটি মূকবধির বিদ্যালয়প্রতিষ্ঠিত আছে। আমরা এই নূতন চিকিৎসা পদ্ধতির প্রতি বিদ্যালয়ের অধ্যাপকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বিষয়টির বিশেষ বিবরণ গত জানুয়ারি মাসের "Knowledge and Scientific News" নামক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।



মুরুখ্যু হইয়ে মরিলে হয়ত
নিয়ে যাবে যমে নরকে টানি ;
তার চেয়ে কেন চশ্‌মা পরিয়া
পড়ি রামায়ন চড়িয়া ঘানি।

সহরে আসিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া,
দেখে বিশ্বনাথ দৈবের যোগে ;
দোকানে সাজানো চশ্‌মার গাদা,
ঢোকে কত লোক চোখের রোগে।

ভয়ে ভয়ে বিশু দোকানিরে কয়
অসীম সাহস বাঁধিয়া বুকে :—
"পারকি নাকের আয়না বসাতে
পড়া যাতে যায় মনের সুখে ?"

দোকানি বলিল "বসুন ভিতরে,
বয়স বাবুর হয়েছে কত ?"
"তিনকুড়ি সাত" বলে বিশু ভেবে,
"খাঁদা নাকে যেন না হয় ক্ষত।"

চশ্‌মা বিক্রেতা খুলিল দেরাজ
ধরিল সুমুখে খুলিয়া বই ;
বাছিয়া বাছিয়া লাগায় চশ্‌মা,
বলে "লেখাগুলি পড়ুন ওই"।

একধার থেকে পরায় চশ্‌মা
আঠার হইতে চল্লিশোপর ;
উলটি পালটি বিশু দেখে বই,
খুলে ফেলে দেখে আঁধার ঘর।

বিক্রেতা বলিছে "ডাগর অক্ষর
পড় বই ধরে নাকের কাছে" ;

বিশু বলে "বড় ঝাপ্‌সা ঠেকিছে
পিঁপ্‌ড়ার ঠ্যাং জড়ায়ে আছে।"
পঞ্চাশ হইতে নব্বই অবধি,
অথবা বয়সে নজর দোষে,
যা কিছু আছিল শতেক চশ্‌মা,
হেসে পরাইয়া খোলে সে রোষে।
সকল চশ্‌মা হইল বাতিল
বলিল দোকানী না পেয়ে "নাই"
বিশু বলে "মাথা ঘোরে নাক জ্বলে
দেখি যে আঁধার যেদিকে চাই",
জিজ্ঞাসে দোকানী "বল দেখি বাবু
খালি চোকে তুমি কেমন পড়?"
বিশু বলে "খোঁড়া চলিতে কি পারে
"লাঠি ছেড়ে? তুমি মূর্খ যে বড়।"
খোঁড়া যদি চলে কাঠের পায়েতে
আমিও পড়িব চশ্‌মা চোকে;
না যদি তোমার থাকে সে চশ্‌মা
কেন কষ্ট দাঁও ডাকিয়া লোকে?"

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ।

---



# বঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র।

—:*:—

একই নিয়মসূত্রে সমগ্র বিশ্ব পরিরক্ষিত ও পরিপুষ্ট হইতেছে। একই বিধি-ধৃত হইয়া পর্য্যায়ক্রমে ঋতু সকল আসিতেছে যাইতেছে, বৎসরের পর বৎসর শতাব্দীর পর শতাব্দী আসিতেছে ও যাইতেছে; সময়ের এই যাতায়াত সূত্রে, নিত্য কতশত নূতন তত্ত্ব মানবের জ্ঞানগোচর হইতেছে, কত বাত্যার অত্যাচার, কত বর্ষার বিষম প্লাবন, কত শত মন্বন্তর, কত শত রাজ বিপ্লব ও লোকক্ষয় সংবাদ লোকের মুখে বিরাজ করিতেছে। কিন্তু যেমনটি যায়, ঠিক তেমনটি কি আর আসে? যেটি আসে, সেটি যায়, সেটি আর আসে না। তাই ব্যাস বাল্মীকি গিয়াছেন আর আসেন নাই, তাই কালিদাস ভবভূতি গিয়াছেন আসেন নাই, তাই ভারত সম্রাট মহারাজ চক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন চলিয়া গিয়াছেন, আর আসেন নাই, বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার চলিয়া গিয়াছেন, আর আসিবেন না। এই যে আসা যাওয়া ও আর না আসা, ইহারই মধ্যে মানবহৃদয়ের মর্ম্মস্পর্শী হাহাকার ও তৎসহ এক অজ্ঞাত, অদৃষ্ট, অননুভূত দেশের সঙ্গে মানব হৃদয়ের এক দুশ্ছেদ্য প্রীতির বন্ধন নিয়ত বর্ত্তমান থাকিয়া মানুষের পতনোত্থানে সহায়তা করিতেছে।

আমাদের প্রিয় বঙ্গসাহিত্যের সমুজ্জ্বল সিংহাসন শূন্য করিয়া বাঙ্গালীর বঙ্কিম-চন্দ্র আজ ১৫ বৎসর হইল চলিয়া গিয়াছেন, এই বৈশাখ মাস তাঁহার তর্পণ মাস। বৈশাখে জল দান এদেশের নরনারীর চক্ষে মহাপুণ্য কর্ম্ম, বৃক্ষে জলদান, পশু পক্ষীকে জলদান, তৃষ্ণাতুর পথিককে জল দান পরম ধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে। এমন দিনে আমরা কি আমাদের "শ্যামলা সুজলা সুফলা" বঙ্গধরিত্রীর প্রিয় সন্তান বঙ্কিম-চন্দ্রকে ভুলিয়া যাইব?

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর গৌরবের বস্তু। বঙ্কিমচন্দ্রেরও গৌরব করিবার অনেক ছিল। সর্ব্বপ্রথম তাঁহার বিদ্যাগৌরব। তিনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিধারিগণের অগ্রণী। যে বৎসর প্রথম বি, এ, পরীক্ষার সূত্রপাত হয় সেই বৎসর তিনি এবং হরবল্লভ মৈত্র বি, এ, পরীক্ষা দেন।

উভয়েই পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এখনকার মত তখনও যুবকেরা প্রদত্ত পরীক্ষার ফলাফল জানিবার জন্য তখনকার সেনেটের দ্বারে অপেক্ষা করিত। তিনিও অপেক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময়ে ডাক্তার অ্যালেক্‌জাণ্ডার ডফ্‌ যুবক বঙ্কিমচন্দ্রের পৃষ্ঠে সস্নেহে করাঘাত করিয়া বলিয়াছিলেন, "You have done well, better than an oxan" ঠিক এই কয়টি কথা কি না আমার ঠিক স্মরণ নাই, তবে এই কয়টি কথায় যে ভাব প্রকাশ পাইতেছে, তাহার একবিন্দুরও এদিক ওদিক নাই। প্রসঙ্গক্রমে তিনি আমাকে এই কথাটি বলিয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহার স্বদেশ, স্বজাতি ও জাতীয় ভাষার গৌরব। তিনি স্বদেশ ও স্বজাতিকে সর্ব্বান্তকরণে ভাল বাসিতেন, তাই ইংরাজীপ্রবল নব্যইঙ্গবঙ্গ সমাজে তিনি স্বদেশীয় শিক্ষিতগণের উপেক্ষিত মাতৃভাষার পরিচর্য্যায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। কর্ম্মসূত্রে যশোহরে প্রবাস কালে তিনি স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যে সুদীর্ঘ পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহার আদ্যোপান্ত বাঙ্গালাভাষার কল্যাণ কামনায় পূর্ণ। তাঁহার লেখনী গৌরব আমাদের অমূল্য রত্নভাণ্ডারে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার কমলাকান্তের মাতৃ-পূজাই বল, আর কমলমণি ও শ্রীশচন্দ্রের গার্হস্থ্য জীবনই বল, তাঁহার সূর্য্যমুখীর স্বামী-মর্য্যাদা জ্ঞানই বল, আর ভ্রমরের নারীমর্য্যাদা জ্ঞানই বল, তাঁহার বিমলার আত্ম-জয় ও আত্মগোপনই বল, আয়েষার অসীম প্রতিজ্ঞার প্রবল পরাক্রমই বল, আর মঠের আশায় আনন্দ প্রবাহই বল এ সকলের এবং আরও অসংখ্য চরিত্র চিত্রের গভীর সৌন্দর্য্যের উন্মাদিনী শক্তির তুলনা সম্ভবে না। তাঁহার সাহিত্যসেবার এই অপরিশোধ্য ঋণজালে বাঙ্গালীর সমাজ-জীবন জড়িত। তৎপরে তাঁহার কর্ম্মগৌরব। একদিনের জন্য তিনি কাহারও নিকট নত হন নাই। "ঘটীরামের" চিত্রকর আপনার বলে আপনার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া রাজসেবা করিয়া গিয়াছেন। কর্ম্মসূত্রে তাঁহার অর্থাভাব ছিল না, তাই তিনি আধুনিক জঠরানল নির্ব্বাণপ্রিয় সাহিত্যসেবকগণের ন্যায় আত্মমর্য্যাদাচ্যুত হন নাই। তাঁহার সমালোচনায় স্বাধীনতা ছিল। নির্ভীক সমালোচকের ন্যায় যোগ্য ব্যক্তিকে সমাদর ও অযোগ্য ব্যক্তিকে তিরস্কার করিতে ভীত হইতেন না।

আজকাল আর সে স্বাধীনতা দেখা যায় না। তাই আরম্ভেই বলিয়াছি যে,



যেটি যায় সেটি আর আসে না। আজকাল পণ্যপ্রিয় সাহিত্যসেবকগণের নিত্য আম্‌দানিতে সাহিত্যের বাজারে খুব জনতা দেখা যাইতেছে, কিন্তু জাতীয় কল্যাণের উপযোগী স্থায়ী সাহিত্যের তদনুরূপ আম্‌দানি দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহাই আক্ষেপের বিষয়।

ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, সুকুমার শিল্প, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয় সাহিত্যের কিছু কিছু পরিচর্য্যা হইতেছে, সত্য, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের প্রদর্শিত পথে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক সাহিত্যসেবায় আগ্রহ ও শক্তির নিতান্ত অভাব বলিয়া বোধ হইতেছে, কেহ কেহ যদিও সেই পথে পদার্পণের চেষ্টা করেন বটে কিন্তু তাঁহাদের সে শক্তি ও আগ্রহ আছে বলিয়া মনে হয় না। যদি থাকিত, তাহা হইলে শুষ্ক পত্রাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় সে আপন প্রভাব ও জ্যোতি বিকীর্ণ করিত, তাই বলিয়াছি, যেটি যায়, সেটি আর আসে না, বঙ্কিমচন্দ্র তীক্ষ্ণ কুঠার হস্তে নিবিড় বনপথ পরিষ্কার করিয়া সাহিত্য সেবার সহজ সুন্দর রাজপথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সে পথ তাঁহারই, সে পথে চলিতে যে শক্তি ও আয়োজনের প্রয়োজন, তাহা অন্যের নাই।

বঙ্কিম চন্দ্রকে আমি সর্ব্বপ্রথমে বারাশতের বিচারাসনে বিচারকরূপে দর্শন করিয়াছিলাম। তখন আমরা বিদ্যালয়ের বালক। বয়স ১০।১১ বৎসর হইবে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম। আমাদেরই গ্রামের এক ব্রাহ্মণ সন্তানের প্রচুর অর্থ গ্রহণ করিয়া ঘটকে বঞ্চনা পূর্ব্বক এক নবসাখ জাতীয়া কন্যাকে ব্রাহ্মণ কন্যা বলিয়া বিবাহ দিয়াছিল, সেই বিবাহঘটিত মকদ্দমা দেখিতে আমরা আদালতে গিয়াছিলাম। বারাশত এক সময়ে জেলা ছিল, সুতরাং বারাশতের আদালত গৃহ উপবিভাগের অনুরূপ ক্ষুদ্র ও সামান্য নহে, জেলার উপযোগী সুবৃহৎ আদালত গৃহের দ্বিতলের এক সুপ্রশস্ত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া দেখি, সে গৃহ লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। প্রবেশের পথ পাওয়া কঠিন। বালক বলিয়া প্রবেশের অসুবিধা বড় বেশী হয় নাই। বিচারাসনে উপবিষ্ট বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিয়া তখনই আমার তাঁহাকে অসামান্য পুরুষ বলিয়া মনে হইয়াছিল। আমার সেই সময়ের বাল্যবুদ্ধিতে বুঝিয়াছিলাম যে এরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পুরুষ তৎপূর্ব্বে আর দেখি নাই। পরিণত বয়সের হৃষ্টপুষ্ট বঙ্কিমমূর্ত্তির সহিত তাঁহার সে সময়ের সর্ব্বসৌষ্ঠবসম্পন্ন মূর্ত্তির অনেক প্রভেদ, আমি যখন তাঁহার শেষ বয়সে একদা

প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার সেই পূর্ব্বকালের রূপ মাধুরির কথা বলিয়াছিলাম, তিনি হাসিভরা মুখে আমাকে বলিয়াছিলেন—"সেদিন এদিনে অনেক প্রভেদ, কত পরিশ্রম, কত ভাবনা চিন্তা কত অত্যাচার এই শরীরের উপর দিয়া বর্ষার বারিধারার ন্যায় চলিয়া গিয়াছে, এখনও এ শরীর ধারণ করিতেছি, সময়ে সময়ে ইহাই আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়।" এখন মনে হয়, বারাশতের আদালত গৃহে তাঁহাকে ( Bird of Paradise ) নন্দনকানন বিহারী বিচিত্র বর্ণ বিন্যাস সম্পন্ন ও অপরূপ রূপলাবণ্যসম্পন্ন এক দিব্য মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলাম। তিনি সত্য সত্যই দিব্য মূর্ত্তি ধারণ করিতেন। তাঁহার মূর্ত্তিগৌরব জগতের সুপুরুষগণেরও গৌরবের বস্তু। তাঁহার সে লাবণ্যভরা কৃশাঙ্গ দেহ হরিদ্রাভ গৌরবর্ণে পরিস্ফুট হইয়া আদালত গৃহ আলোকিত করিয়াছিল, আর তাহার উপর তৈলবিহীন ঘন কৃষ্ণবর্ণ কেশরাশি স্কন্ধে ও গণ্ডে লম্বমান হইয়া তাঁহার সেই অসামান্যরূপমাধুরীভরা মুখখানিকে ঘন শ্যাম সরোবরে মৃণালধৃত শতদল কমলে পরিণত দেখিয়াছিলাম। আজও যেন সেই জীবন্ত মূর্ত্তি চক্ষুসমক্ষে বর্ত্তমান বলিয়া মনে হইতেছে। আমি এ কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলাম "আপনার সে মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে এরূপ দৃঢ় অঙ্কিত আছে যে, আজ আপনাকে দেখিয়া এবং আপনার সঙ্গে কথা-বার্ত্তা কহিয়াও আপনাকে "বঙ্কিমবাবু" বলিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হইতেছে না। তিনি পুনরায় হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, "অনেকগুলি চোরে মিলিত হইয়া পরামর্শ করিয়া আমার সে চেহারা চুরি করিয়াছে। আর তাহা পাইব না। আপনিও আর তাহা দেখিতে পাইবেন না।"

বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত প্রথম পরিচয়ের দিন উপযুক্ত কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। সে দিন তাঁহার নিকট আমি আমার রচিত মা ও ছেলে ১ম ও ২য় ভাগ নামক গ্রন্থের এক এক খণ্ড উপহার লইয়া গিয়াছিলাম। গ্রন্থের নাম করণ দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন "মা ও ছেলে একত্র পাওয়া লাভের বিষয় বটে", পুস্তক দুইখণ্ড পড়িবেন এবং পড়িয়া নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। পরে সাক্ষাৎকারের চতুর্থ দিবসে পুস্তক পাঠান্তে নিজ অভিপ্রায় একখানি পত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া আমাকে পাঠাইয়া দেন। আমি তখন নবীন গ্রন্থকার, সবেমাত্র সাহিত্যের বাজারে প্রবেশের জন্য সভয়ে পদক্ষেপ করিতে



অগ্রসর হইয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্রের পত্রখানি পাইয়া আমার জনৈক বন্ধুকে দেখাইলাম, তিনি বলিলেন, "বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীপ্রসূত এই মন্তব্যটুকুর মূল্য অনেক। তাঁহার হাতে এরূপ মন্তব্য লাভ দুষ্প্রাপ্য, অল্পলোকের ভাগ্যে এরূপ সুযোগ ঘটে, অধিকাংশ গ্রন্থকারের ভাগ্যে ভূতপূর্ব্ব বঙ্গদর্শন বেত্রদণ্ডেরই ব্যবস্থা করিয়াছেন।"

ইহার পর যখন আমার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ ঘটে, তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে "ঐ শ্রেণীর পুস্তক কি যথেষ্ট বিক্রয় হয়? এখন এ দেশের নরনারী কি পূর্ব্বের ন্যায় গার্হস্থ্য জীবনের দায়িত্ব ও সন্তানগণকে সুশিক্ষার দ্বারা সুপথে লইতে ব্যস্ত? আমি বলিয়াছিলাম "পুস্তক যথেষ্ট বিক্রয় হইয়াছে, আর ইংরাজের সমাগমে ইংরাজী শিক্ষা সূত্রে আমাদের গার্হস্থ্যজীবনে যে পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটন অপরিহার্য্য, আমার গ্রন্থে সেই পরিবর্ত্তনের লাভ লোক্সান, সঙ্কট ও সুবিধা এবং নবীন ও প্রাচীন সংস্কারের মিলন সাধনের ঈঙ্গিত বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন।" তিনি বলিয়াছিলেন "বই দুইখানির বিশেষ প্রশংসা এই যে এরূপ চেষ্টা করিতে গিয়া একটী Incongruity র ( খিচুড়ির ) সৃষ্টি হয় নাই।" তাহার পর তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি জানিতাম এ দেশের স্ত্রীলোক বাজে গল্পের বই পড়ে।" আমি তাঁহার কথায় প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলাম "আপনার গ্রন্থ সকলও দেশের সকলেই পড়িতেছে, পুস্তক বিক্রয় লব্ধ অর্থের পরিমাণ হইতে আপনি কি তাহা অনুভব করেন না?" তিনি বলিয়াছিলেন "আমি চাকরি না করিলে, আর আমার পুস্তক হইতে এখন যে আয় হয়, তাহা হইলে, অবশ্যই অনুভব করিতে বাধ্য হইতাম।" আমি সভয়ে ও সঙ্কোচ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখনকার আয়ের পরিমাণ কত?" তিনি বলিয়াছিলেন "বৎসরের হিসাব দেখিয়া বোধ হয় ছয় সাত হাজার টাকা হইবে।" ইহার পরেই আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; "কেবল সাহিত্যসেবার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ হয়, আমাদের দেশে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বাদ দিলে, আর কেহ আছেন কি?" আমি বলিয়াছিলাম "বিদ্যালয় পাঠ্য গ্রন্থ না থাকিলে, তাঁহার এবং রজনী বাবুর ন্যায় আর কাহারও চলা অসম্ভব হইত।" তিনি বলিয়াছিলেন "তাই ঠিক কথা। এ দেশে এখনও সাহিত্যের এতটুকু আসর হয় নাই যে সাহিত্য-

সেবার অনুরাগে সাহিত্য-চর্চ্চা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে। এ দেশের সে অবস্থা হইতে এখনও বিলম্ব আছে।"

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

---

# বাঙ্গালা-নাটক-সমালোচনা।

—:০:—

## (১) নুর-জাহান।

সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এখন নাট্য-জগতেও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকগুলি বিশেষ আদরের সহিত অভিনীত ও পঠিত হইতেছে। বাঙ্গালা-নাট্য-সাহিত্য আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বাপেক্ষা আবর্জ্জনাপূর্ণ হইয়া আছে। শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও শ্রীযুক্ত অতুল-কৃষ্ণ মিত্র এই পঞ্চরথীই এখন নাট্যক্ষেত্রে অতুল-বিক্রমে বিচরণ করিতেছেন।—আর সকলে ইঁহাদের প্রভাবের নিকট ম্রিয়মান হইয়া আছেন। শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসুর লেখনী বহুকাল থামিয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখনী সংস্কৃত সাহিত্যের নাট্যরত্নগুলি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া দিয়া বিশ্রামের অবসর খুঁজিতেছে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখনী উপন্যাসের মধ্য দিয়া নাটকীয় ব্যাপার অভিব্যক্ত করিতে নিযুক্ত আছে এবং অবসর-ক্রমে বোলপুর-ব্রহ্মবিদ্যালয়ের বালকগণের জন্য "মুকুল"-"শারদোৎসব" আদি ক্ষুদ্র নাটিকা লিখিয়া আনন্দ করিতেছে; সুতরাং বাঙ্গালা-সাহিত্যের মধ্যে নাটকের গতি পর্য্যবেক্ষণ আবশ্যক হইলে, উপরোক্ত পঞ্চনাট্যরথীরই গ্রন্থের আলোচনা করিতে হয়। আজ আমরা শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের 'নুর-জাহান' নামক সুপরিচিত নাটকখানির আলোচনা করিব। আমরা বলিয়াছি, আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আবর্জ্জনাপরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সমালোচনার সাহায্যে এই সকল আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিবার প্রয়াস পাওয়া সাহিত্যের হিতকামী সকলেরই উচিত। মাসিক পত্রাদিই এরূপ সমালোচনার উপযুক্ত ক্ষেত্র। "বঙ্গদর্শনের" দিন হইতে এ ক্ষেত্র এই সকল কার্য্যেরই উপযুক্ত করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে।



আমরা যে উদ্দেশ্যে "নুর-জাহানের" সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহা সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় হইবার নহে। দ্বিজেন্দ্রবাবুর ন্যায় শিক্ষিত ব্যক্তি, অভিজ্ঞ ব্যক্তি, বিবেচক ব্যক্তির নিকট আমরা যেরূপ বিষয় আশা করি, তাহা পাইতেছি কি না, বা তিনি তাঁহার গ্রন্থগুলির ভূমিকায় যাহা দিবেন বলিয়া আশা দিয়াছেন, তাহা দিতেছেন কি না, তাহাই দেখা আমাদের উদ্দেশ্য, অনর্থক দোষোদ্ঘোষণ করা সমালোচকের পক্ষে বিড়ম্বনা নহে।

দ্বিজেন্দ্রবাবু এই নাটকখানিতে একটি দীর্ঘ ভূমিকা লিখিয়াছেন। তিনি ঐতিহাসিক নাটক লিখিতে বসিয়া, প্রধানতঃ ডো সাহেবের ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতেই ইতিবৃত্ত ভাগ লইয়াছেন এবং জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী হইতেও কতক সাহায্য পাইয়াছেন; তবে "মানুষের আত্মদোষ গোপন ও আত্মগুণ অতিরঞ্জনের প্রবৃত্তি এতাদৃশ প্রবল ও সার্ব্বজনীন যে, তাহার আত্মসমালোচনার কথা দূরে থাকুক, স্ববিবৃত ঘটনাগুলি পর্য্যন্ত অতথ্য দোষে দূষিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা বলিয়া "তাহার উপর অধিক নির্ভর করিতে" পারেন নাই। ইহা ভাল করিয়াছেন কি মন্দ করিয়াছেন, তাহা আমরা বলিব না, কারণ, বিচারক তিনি, সাক্ষীর সাক্ষ্যে বিশ্বাস করিতে বা না করিতে তাঁহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে; তবে ইহাও জানি, অনেক স্থলে সাক্ষীকে বিশ্বাস না করার জন্য অনেক বিচারকের রায় আপীলে উল্টাইয়া গিয়া থাকে। তা যাক্, তার পর দ্বিজেন্দ্রবাবু ভূমিকায় আমাদিগকে আরও বলিয়া দিতেছেন—"মৎপ্রণীত অন্যান্য ঐতিহাসিক * নাটক হইতে নুরজাহান নাটকের অনেক বিষয়ে প্রভেদ লক্ষিত হইবে। প্রথম প্রভেদ এই যে, আমি এই নাটকে দেবচরিত্র সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করি নাই। আমি এই নাটকে দোষগুণসমন্বিত মনুষ্যচরিত্র অঙ্কিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছি।" কেন এরূপ করিয়াছেন, যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, তিনি উত্তর স্বরূপ দেখিবেন যে তাঁহার "একজন সুধী ও প্রাজ্ঞ বন্ধু"র অনুরোধ ব্যতীত আর কিছু নহে।—আজকাল অনেক বাঙ্গালা কাব্য, নাটক, উপন্যাস গ্রন্থকারদিগের কোন

* পাষাণী, তারাবাই, রাণাপ্রতাপ প্রভৃতি।

বিশেষ বন্ধু বা কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে প্রকাশিত হয়, ইহা আমরা অধিকাংশ গ্রন্থের ভূমিকা পড়িলেই জানিতে পারি। গ্রন্থকার-মহলে ইহা একটি সংক্রামক ফ্যাসানে দাঁড়াইয়াছে। সে কালের কবিরা স্বপ্নে দেবাদেশ কাব্য রচনা করিতেন,—সে দিনের ভারতচন্দ্র ও "বিদ্যাসুন্দর" লিখিবার নিমিত্ত মা কালীর আদেশ পাইয়াছিলেন! আর একালে দেবদেবীর স্থানে "বিশেষ বন্ধুরা" আদেশ দিয়া গ্রন্থ প্রকাশ করাইয়া থাকেন! ভাল কথা,—বন্ধুদিগের কৃপায় আমরা দুই চারিখানা সদ্‌গ্রন্থ পড়িয়া তৃপ্তিলাভ করি। তার পর, দ্বিজেন্দ্রবাবু দ্বিতীয় প্রভেদ সম্বন্ধে বলিতেছেন,—"এই নাটকে বাহিরের যুদ্ধ অপেক্ষা ভিতরের যুদ্ধ দেখাইতেই আমি আপনাকে সমধিক ব্যাপৃত রাখিয়াছি, পূর্ব্বে যে তাহা দেখাইতে প্রয়াস পাই নাই, তাহা নহে। অহল্যায়, সূর্য্যমলে, শক্তসিংহে, মেহেরুন্নিসায় ও ঔরংজীবে সে অন্তর্বিরোধ বোধ হয় কতক পরিমাণে দেখাইয়াছি; কিন্তু নুরজাহানে সেটি দেখাইবার যতখানি প্রয়াস পাইয়াছি, ততখানি প্রয়াস ইতিপূর্ব্বে কখন পাই নাই। নুরজাহানের উপর দিয়া প্রবৃত্তির ঢেউ চলিয়া যাইতেছে, পাঁচ ছয় প্রকার ভাব আসিয়া উপর্য্যুপরি তাহাকে অধিকার করিতেছে। সেই জন্য চরিত্রটি বিশেষ জটিল হইয়াছে।" ইহার পর আমাদিগের অর্থাৎ সমালোচকদিগের (সকলের নহে,—কাহারও কাহারও) উপর একটু মৃদুশ্লেষগর্ভ উপদেশ দিয়াছেন,—সেটুকু আমরা গ্রন্থকারের নিকট অপ্রত্যাশিত, অযাচিত দান বোধে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতেছি। তিনি বলিতেছেন, "জন-সাধারণের কাছে, বিশেষতঃ কোন কোন সমালোচকের কাছে ও চরিত্রটি (নুরজাহান) বোধ হয় একবারে দুর্ব্বোধ্য বা অস্বাভাবিক ঠেকিবে, কিন্তু সেই জন্য যে সব চরিত্র সেই সমালোচক বুঝিতে পারেন, কেবল যে সেই চরিত্রই অঙ্কিত করিতে হইবে, উহার কোনও কারণ নাই। তাঁহাদের চিত্তবিনোদনার্থ অন্যান্য অনেক নাটক আছে; তাঁহারা তাহাই পড়ুন।"—ভাল কথা, আমরা নাটক-সমালোচনায় একেবারে এই নূতন ব্রতী নহি। তথাপি জানি না আমরা দ্বিজেন্দ্রবাবুর নিকট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইব কি না? আত্মক্ষমতায় সকলেরই বিশ্বাস থাকে, নতুবা কেহ কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেই পারে না। দ্বিজেন্দ্রবাবু যদি নিজে না বিশ্বাস করিতেন যে, তিনি তাঁহার কল্পিত জটিল-চরিত্র নুরজাহানকে লইয়া নাটক লিখিতে



পারিবেন, এতটা ক্ষমতা তাঁহার আছে, তাহা হইলে, তিনি কখনই একার্য্যে হাত দিতেন না। ইহা যেমন সত্য,—তেমনি আমরাও যদি বিশ্বাস না করি যে, দ্বিজেন্দ্রবাবুর এই জটিল নাটকখানি বুঝিবার স্পর্দ্ধা আমরা রাখি, তাহা হইলে, এ সমালোচনায় হাত দেওয়া আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতামাত্র হইবে। এই বুঝিয়া আমরা প্রমাণের পূর্ব্বে দ্বিজেন্দ্রবাবুর কথিত অবোধ-সমালোচকের দলে আমাদিগকে গণ্য করিয়া লইতে আদৌ প্রস্তুত নহি। তৎপরে তিনি তাঁহার তৃতীয় প্রভেদের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—"আমি এই নাটকে দ্বিতীয় ব্যক্তির সমক্ষে কাহারও স্বগতোক্তি একেবারে বর্জ্জন করিয়াছি। আমার পূর্ব্বতন নাটকেও তাহা ব্যবহার করিয়াছিলাম। কিন্তু এ নাটকে তাহা দূষিত প্রথা বলিয়া সম্পূর্ণ পরিহার করিয়াছি। একজনের এরূপ চীৎকার করিয়া স্বগতোক্তি যাহা সমস্ত শ্রোতৃগণ শুনিতে পাইতেছেন, কেবল তাহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান নট বা নটীই শুনিতে পাইতেছে না—এ অনিবার্য্য ব্যাপার আমার কাছে একটু হাস্যকর ঠেকে।" অতি উত্তম,—তাঁহার এই নূতন প্রণালীই আমরা অনুসরণ করিব। ইহার পর তিনি ভূমিকার শেষাংশে একস্থলে বলিয়াছেন বা অনুরোধ করিয়াছেন, "আমার উদ্দেশ্য প্রধানতঃ (১) প্রকৃত মনুষ্যচরিত্র অঙ্কিত করা, (২) অন্তর্বিরোধ দেখানো ও (৩) প্রকাশ্যে স্বগতোক্তির সাহায্য না লইয়া প্রত্যেক চরিত্রের ভাব ও কার্য্যাবলী সম্যক্ পরিস্ফুট করা। উদ্দেশ্য সাধনে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা সহৃদয় সুধীগণের বিচার্য্য।" ভালই হইল, আমরা 'নুরজাহান' সমালোচনায় বসিয়া হয় ত অনেক কথাই হাত্‌ড়াইয়া বেড়াইতাম আর অন্ধকারে পথ অন্বেষণের ন্যায় কাব্যরস খুঁজিয়াই পাইতাম না! দ্বিজেন্দ্রবাবু দয়া করিয়া তাঁহার কাব্যের রসভাণ্ডারের চাবিটি আমাদের হাতে তুলিয়া দেওয়াতে আমরাও কৃতার্থ হইলাম। তাঁহার কাব্যের সৌন্দর্য্য সম্যক্ বুঝিতে হইলে, তিনি স্বয়ং আলোক ধরিয়া যে পথে লইয়া যাইতেছেন, সে পথে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। অতঃপর আমরা দ্বিজেন্দ্রবাবুর অনুরোধে তাঁহার কাব্যে তাঁহার তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য সম্যক্ ফলবান্ হইয়াছে কি না, তাহা দেখিবার চেষ্টা করিব। তবে একটা কথা, তিনি সেরূপে দেখিবার ভার কেবল "সহৃদয়-সুধীগণ"কে দিয়াছেন,—আমরা মানুষ হইলেও এক্ষেত্রে আমরা আত্মদোষ গোপন ও আত্মগুণ অতিরঞ্জনের লোভ সংবরণ

করিয়া বলিতেছি, "আমরা দ্বিজেন্দ্রবাবুর কল্পনামত "সহৃদয়-সুধী" কিনা—আমরা নিজেরাই তাহা বুঝিতে পারিতেছি না, কারণ তিনি তাঁহার মনোমত "সহৃদয় সুধীর" লক্ষণ ভূমিকায় কোথাও লিখিয়া দেন নাই। যাহা হউক,—যখন তাঁহার কাব্যরসভাণ্ডারের চাবিটি আমরা তাঁহারই নিকট পাইয়াছি,—তখন একবার খাঁটিয়া-ঘুঁটিয়া দেখিব--যদি সুধাপানে বিভোর হইতে পারি। অলমতি বিস্তরেণ!

নুরজাহান নাটকের কথাবস্তু আজকাল অক্ষরজ্ঞান-বিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রই বোধ হয় মোটামুটিরকম জানেন, সুতরাং তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না, তবে দ্বিজেন্দ্রবাবুর নাটকের আরম্ভ কোথায়, তাহা একটু বলিয়া দেওয়া ভাল।—নুরজাহান যখন 'নুরজাহান' হন নাই,—নুরজাহান যখন 'মেহেরুন্নিসা' আছেন, শের আফগানের পত্নী হইয়া একটি কন্যার জননী হইয়াছেন এবং বর্দ্ধমানে সুখে বাস করিতেছেন, সেই সময় দিল্লীর বাদশাহ্ আকবরের মৃত্যু হয়। তাহার পর সেলিম বাদশাহ্ হইয়া জাহাঙ্গীর নাম গ্রহণ করেন। সেই সময়ে তিনি মেহেরুন্নিসাকে হস্তগত করিবার জন্য শেরখাঁকে পাঁচ হাজারী মনসব্‌দারের পদ দিয়া আগ্রায় ডাকিয়া পাঠান। এই নিমন্ত্রণ যখন বর্দ্ধমানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তখন একদিন সন্ধ্যাকালে দামোদর-তটে শের খাঁ ও মেহেরুন্নিসা নিজ গৃহ-প্রাঙ্গণে বসিয়া স্বভাবের শোভা দেখিতেছিলেন, নিকটে তাঁহাদের কন্যা লয়লা তাহার মাতুলের কন্যা খাদিজার সহিত গান গাহিতেছিল,—আর তাঁহারা শুনিতেছিলেন। সেইদিন সেই সময়ে সেইখানেই দ্বিজেন্দ্রবাবু তাঁহার নাটকের আরম্ভ করিয়াছেন। বালিকারা গাহিল,—

অতুল চির বিমোহন তুমি সুন্দর সুরধাম।
শতস্মিত পরীবিহরিত কুসুমিত, সুশ্যাম।
শত শীতল ঘন নিকুঞ্জ, শতবিহঙ্গ মুখরিতরে,
শত নির্ঝর ঝর্ঝরঝঙ্কারিত অবিরাম।
মলয়ানিল সেবিত অমর রূপরাশি রে,—
বন উপবনময় শিহরিত গীতিগন্ধ হাসিরে,
হা অনাথা অমরাবতী! কি সুখে হতভাগিনী
হাস হাস হাস তবু সুভূষিত অভিরাম।



নাটক খুলিয়াই আমরা পাত্রপাত্রীর মুখে নাটকের অন্য কোন কথা শুনিবার আগেই এই গানটি পাইলাম!—গানটিতে অমরাবতীর সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্যের বর্ণনা করিয়া তাহাকে 'অনাথা' ও 'হতভাগিনী' বলিয়া সম্বোধন করিয়া কি সুখে সে হাসিতেছে এই প্রশ্ন করা হইয়াছে।—শের খাঁ এ গান শুনিয়া বলিলেন—"সুন্দর! যাও তোমরা খেলা করগে।" বলিতে পারি না কবির উদ্দেশ্য কি, কিন্তু আমরা গানের প্রশ্নটির কোন অর্থ পাইলাম না।—যাহার এত সমৃদ্ধি, এত ঐশ্বর্য্য সে হাসিবে নাতো কি? তাহার ঐশ্বর্য্যমালার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য কবিই দেখাইয়া দিলেন—"বন উপবনময় শিহরিত গীতিগন্ধ হাসি" তা' যদি হয়, তাহাকে "কি সুখে হাসিতেছ" বলিয়া প্রশ্ন করা হইল কেন? "মলয়ানিল সেবিত অমর রূপরাশি" দ্বারা যে সুভূষিত,—সে অনাথা, সে হতভাগিনী কিসে হইল, তাহা ত আমরা বুঝিতে পারিলাম না। অমরনিসেবিত পুরীই অমরাবতী,—অমরগণের বর্ত্তমানতায় অমরাবতীকে অনাথা এবং ঐরূপ অনন্যসাধারণ-সমৃদ্ধি-সম্পন্ন পুরীকে হতভাগিনী বলার উদ্দেশ্য কি, তাহা ত গানটিতে আমরা খুঁজিয়া পাইলাম না। নাটকীয় পাত্রী মুসলমান-বালিকা মুসলমান বেহেস্তের "শতস্মিত পরীবিহরিত" শোভার সহিত,—হিন্দু-গ্রন্থকারের মানসপটে চিরবিরাজিত হিন্দু-অমরাবতীর শোভা-সমৃদ্ধি মিলাইয়া যে অপূর্ব্ব স্বর্গের কল্পনা করিল,—তাহাকে কবি হঠাৎ অনাথা, হতভাগিনী বলিয়া সম্বোধন করিয়া, তাহার হাসির জন্য তাহাকে তিরস্কার করিলেন কেন,—ইহা আমাদিগকে কে বলিয়া দিবে? স্বর্গে মলয়ানিলের প্রবাহ পৌঁছায় কি?—মলয় পর্ব্বত পৃথিবীতে আছে, তাহার স্বর্গলাভ কবে হইল জানি না। দশ জনের সম্মুখে স্বগতোক্তি ব্যবহার করিবেন না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন বলিয়াই কি এই অস্ফুট ভাবটুকু কবির স্বগত হইয়াই রহিয়া গেল? শের খাঁ গানটি শুনিয়া 'সুন্দর' বলিয়া যে প্রশংসা করিলেন—সেটা শুধু গায়িকাদের 'তারিফ্' করা মাত্র,—তাঁহার উত্তর হইতেও আমরা গানের কোন অর্থ-প্রকাশের সাহায্য পাইলাম না,—সুতরাং অনাথা অমরাবতীর দুঃখে আমরা কোন সমবেদনা জানাইতে না পারিয়া কাতর হইতেছি। আমাদের মনে হয়, শুধু শব্দালঙ্কারে, শুধু ছন্দে গান হয় না। ছন্দ-অলঙ্কারের মধ্যে ভাষার একটা সুসঙ্গত অর্থ থাকিলেই গান হয়, নতুবা ওস্তাদী রাগ-রাগিণী আলাপের—

"তুমতানা না না" বা যন্ত্রের আলাপের "ডারা ডারা ডাড্রে ডারা" ইত্যাদি বোল গুলিতে সুরকে মূর্ত্তিমান করা যায় বটে, কিন্তু তাহাকে গান বলা যায় না। দ্বিজেন্দ্র বাবুর এ গানটিতে শব্দ, অলঙ্কার, ছন্দ সব আছে, নাই—কেবল—সুসঙ্গত অর্থ।

তারপর বালিকারা দূরে চলিয়া গেল, নুরজাহান্ (দ্বিজেন্দ্র বাবু এই দৃশ্যের গোড়ায় বলিয়া দিয়াছেন তখনও তাঁহার নাম মেহেরুন্নিসা) কথা কহিলেন, তাহাতে বঙ্গদেশের প্রকৃত শোভা-সমৃদ্ধির কথা তুলিয়া বিস্ময় ও তৃপ্তি প্রকাশ করিলেন। শের খাঁ (এই আফগান বীর এই দৃশ্যের পরে রিক্ত হস্তে শের অর্থাৎ ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়া জাহাঙ্গীরের নিকট "শের খাঁ" এই সম্মান-সূচক নাম পাইয়াছিল, ইহা দ্বিজেন্দ্র বাবুও পরবর্ত্তী দৃশ্যে লিখিয়াছেন, অথচ তিনি এখানে এই ব্যক্তির আসল নামটা কেন বলিয়া দিলেন না?) বলিলেন,—"ঈশ্বর এর অধিবাসিদের এমন দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু তা রক্ষা করবার শক্তি দেন নাই।" পাঠক যদি বাতাসের পিছনে দড়ি দিয়া পূর্ব্বোক্ত গানটির কোন অর্থ করিতে চান তবে, তাহা এইখানে হইতে পারে। নুরজাহান বঙ্গ-দেশের শোভার যে বর্ণনা করিলেন, তাহার সহিত মিলাইয়া গানের অমরাবতীকে বঙ্গদেশের রূপক উল্লেখ বলা চলে আর শের খাঁর উত্তর হইতে বঙ্গের পরাধীন-তাকে গানের অমরাবতীর অনাথত্বের এবং হতভাগ্যত্বের রূপক উল্লেখ বলিয়া ধরিয়া লইলে, অর্থটা এইরূপ দাঁড় করানো যাইতে পারে যে,—হে পরাধীন বঙ্গদেশ, যখন তুমি স্বদেশী রাজা হারাইয়াছ, তখন হতভাগিনী, তুমি আর কোন্ সুখে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা হইয়া হাসিতেছ?—কিন্তু এতটা টানিয়া-বুনিয়া, অর্থ করায় আমাদের ন্যায় সুধীগণের হয়ত কতকটা 'সহৃদয়তা' প্রকাশ পাইতে পারে, কিন্তু কবির পক্ষে শব্দাড়ম্বর ব্যতীত আর কিছুই হয় নাই, কেন-না তিনি তাঁহার গানের ভাষার মধ্যে এত বড় রূপকের দ্যোতকতা করিতে পারে, এমন একটা শব্দ ভুল করিয়াও রাখেন নাই।

তাহার পর নুরজাহান বলিলেন,—"না প্রিয়তম, আমার বোধ হয় এত সুখ এদের সৈল না। এত সুখ বুঝি কারো সয় না। ইহার পর অন্য পাঁচটা কথার পরে শের খাঁ বলিলেন,—"কি সুখী আমরা মেহের!"—নুরজাহান "অবিচলিত অন্যমনস্ক ভাবে" বলিলেন,—"কিন্তু এত সুখ বুঝি সৈবে না,"—পাঠক! নুর-



জাহান দৃঢ় অন্যমনস্কতার সহিত যাহা বলিলেন,—তাহার প্রতি এখন হইতে একটু মনোযোগ রাখিয়া যাইবেন, কারণ কবি ভূমিকায় আমাদের সাবধান করিয়া দিয়াছেন,—"নুরজাহান চরিত্রটি বিশেষ জটিল হইয়াছে।" জটিলতায় পড়িয়া পাঠকেরা ভবিষ্যতে না পথ হারান, আমরা তাই এখন হইতে এত সতর্ক করি-তেছি। ইহার পর নুরজাহাঁনের ভাই আসফ উপস্থিত হইয়া আকবরের মৃত্যু ও জাহাঙ্গীরের রাজ্যলাভের কথা বলিলেন। শের খাঁ তাহাতে বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া বলিলেন,—"আমরা সে সংবাদ শুনি নাই, * * আমরা আদার ব্যাপারী, —জাহাজের খবরে কাজ কি?"—ইহার পর কথা কহিতে কহিতে শের খাঁ ও আসফ গৃহের মধ্যে চলিয়া গেল। নুরজাহান একাকিনী নদী তীরে দাঁড়াইয়া স্বগত-বাক্যে যাহা বলিলেন, তাহাই নুরজাহানের ন্যায় "জটিল" চিত্র বুঝিবার প্রথম সোপান হইবে বলিয়া, আমরা তাহা এখানে উদ্ধৃত করিলাম। নুরজাহান বলিলেন,—

"সেলিম সম্রাট! আবার সে কথা কেন মনে আসে?—না, সে চিন্তাকে আমি মনে আস্‌তে দেব না।—না, না, না! সে প্রথম যৌবনের একটা খেয়ালমাত্র। এখন আবার সে চিন্তা কেন? সেলিম সম্রাট, তাতে আমার কি? আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে কাজ কি?

পাঠক! বুঝিলেন, নুরজাহানের ব্যথা কোথা?—কেন তিনি প্রথম কথারম্ভেই অভাগা বঙ্গবাসীর সহিত নিজের ভাগ্য মিলাইয়া বলিয়াছিলেন,—"কিন্তু এত সুখ বুঝি সৈবে না।"

এই স্থানে আমাদের একটা কথা বলিবার আছে। সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিম-চন্দ্র 'কপালকুণ্ডলায়'—এই মেহেরুন্নিসার চরিত্র আঁকিয়াছেন। তাঁহার মেহের সহিত বর্দ্ধমানে লুৎফ-উন্নিসার কথোপকথন কালে প্রথমে যেমন দক্ষতার সঙ্গে আত্মগোপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, দ্বিজেন্দ্রবাবুর মেহের তাহা পারেন নাই। তিনি স্বামীর নিকটে ভাবে ভঙ্গীতে নিজের মনের অস্থিরতা মাঝে মাঝে প্রকাশ করিয়া ফেলিতেন, আর শের খাঁ তাহা বুঝিতেন। ইহার প্রমাণ আমরা শের খাঁর কথা হইতে এখনি দিব, কিন্তু বঙ্কিমের মেহেরের নিকট চতুরা লুৎফউন্নিসা যে ভাবে তাঁহার মনোভাব বাহির করিয়া লইয়াছিলেন, এখানে সেরূপ কোন প্রয়োজন না থাকিলেও দ্বিজেন্দ্রবাবুর মেহের বিনা-প্রয়োজনে আপনাকে ধরা

দিলেন।—বঙ্কিমবাবুর মেহের সেলিমের রাজ্যলাভ বিবরণ শুনিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন—"সেলিম ভারতের সিংহাসনে, আমি কোথায়?"—এই একটিমাত্র বাক্যে বঙ্কিমবাবু মেহেরুন্নিসাকে যেমন পূর্ণভাবে ফুটাইতে পারিয়াছেন, দ্বিজেন্দ্রবাবু—সেই কথা কয়টাই ঘুরাইয়া বলিতে গিয়া তেমন সম্পূর্ণ করিয়া ফুটাইতে পারেন নাই। দ্বিজেন্দ্রবাবু এখানে মেহেরুন্নিসাকে দিয়া তিন চারিবার 'না' বলাইয়া যেন জোর করিয়া তাঁহাকে আপনা-আপনি মাথা নাড়াইয়া আত্মগোপন করিবার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা করাইতেছেন!—এটুকু চেষ্টা আমরা ভালই বলি—যদি শেষ রক্ষা হয়!—দেখা যাক্।

এই সময়ে শের খাঁ পুনরায় বাগানে আসিয়া নুরজাহানকে বলিলেন,—

"মেহের—বড় সুসংবাদ।"

নুর। কি নাথ?

অবশ্য নুরজাহান এটুকু বলিবার সময়ে আপনাকে সংযত করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন।

শের খাঁ। সম্রাট্ জাহাঙ্গীর আমাকে পাঁচ হাজারীর পদ দিয়ে আগ্রায় ডেকে পাঠিয়েছেন। নুরজাহান ইহা শুনিয়াই চম্‌কাইয়া বলিলেন "সর্ব্বনাশ!

শের। সে কি?—এ আমার মহৎ সম্মান!

নুর। যাবে?

শের। যাবো বৈ কি।

নুর। যেওনা বল্‌ছি,—খবর্দ্দার!

শের। অত উত্তেজিত হচ্ছ কেন?—এত পরম আনন্দের কথা।

নুর। শোনো কথা—যেওনা বল্‌ছি—সাবধান! এই বলিয়া নুরজাহান দ্রুত চলিয়া গেলেন।

শের। আশ্চর্য্য? মেহের হঠাৎ উত্তেজিত হ'ল কেন? মেহের মাঝে মাঝে বিচলিত হয় বটে, কিন্তু এত বিচলিত হ'তে তাকে সম্প্রতি কখনও দেখিনি।"

এইখানে প্রথম দৃশ্য শেষ। পাঠক! মনে আছে, দ্বিজেন্দ্রবাবু ভূমিকায় আমাদের বলিয়া দিয়াছেন, "নুরজাহানের মনের উপর দিয়া প্রবৃত্তির উপর প্রবৃত্তির ঢেউ চলিয়া যাইতেছে; পাঁচ ছয় প্রকার ভাব আসিয়া উপর্য্যুপরি তাহাকে অধিকার করিতেছে।"—শের খাঁর কথায় এখানে তাহার একটু গন্ধ পাইতেছেন কি? নুরজাহান তাহার হৃদয়-নিহিত কোন একটা ভাব লুকাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াও



যে মাঝে মাঝে বিচলিত হইয়া পড়েন, তাহা শের খাঁর লক্ষ্য এড়ায় নাই,—আর তাহা যে সেলিমের প্রতি পূর্ব্ব প্রণয়েরঅভাব জনিত কাতরতার ভাব, তাহা আর পাঠকদিগকে বলিয়া বুঝাইতে হইবে না, কারণ সে কথা মেহেরুন্নিসা নিজের স্বগত-বাক্যে একটু পূর্ব্বেই জানাইয়া দিয়া গিয়াছেন।

এই খানে আর একটা কথা বলিব,—সেটা নাটক-সমালোচনার কথা নহে। দ্বিজেন্দ্রবাবু এই নাটকে পাত্রপাত্রীর কার্য্যাবলীর অর্থাৎ ভাবাভিনয়ের জন্য তাহাদের অঙ্গভঙ্গী বা ভাবভঙ্গীর যেরূপ পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইবে,—তাহার বিশদ উপদেশ দিয়াছেন। এরূপ উপদেশ তাঁহার দৃশ্য-বর্ণনার মধ্যস্থানেও দেখা যায়। দৃশ্য-শেষে অধিকাংশ স্থলে তিনি সে বিষয়ে একবারে নির্ব্বাক্। এই প্রথম দৃশ্য তিনি শের খাঁর "কিন্তু এত বিচলিত হতে তাকে সম্প্রতি কখন দেখিনি"—এই কথাটির উপর শেষ করিয়াছেন। ইহার পর একটি কসি টানিয়া দিয়া দৃশ্য-সমাপ্তি বুঝাইয়াছেন, কিন্তু অভিনেতা বা নাট্য-মঞ্চাধ্যক্ষের সুবিধার্থ কোন উপদেশ নাই। ঐ কথা কয়টি বলিয়া শের খাঁ মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে বসিলেন, না, মেহেরুন্নিসার পশ্চাতে ছুটিলেন, না নৌকা করিয়া দামোদর-বক্ষে সন্ধ্যার চন্দ্রালোক উপভোগ করিতে গেলেন, তাহা আমরা ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, এমন কি, শের খাঁর অভিনেতাও যে কি করিবেন তাহাও অজ্ঞাত রহিল। এরূপ স্থলে গ্রন্থকারকে Personally Consult করা ব্যতীত আর কোন উপায় আছে বলিয়া মনে হয় না। মিনার্ভা থিয়াটারে এ দৃশ্যের পর শের খাঁর অভিনেতা চলিয়া যান—সে নিয়োগ শিক্ষক অর্দ্ধেন্দুবাবুর কল্পনাপ্রসূত, * না, স্বয়ং গ্রন্থকারের সরেজমিনে তদ্বিরের ফল, তাহা আমরা জানি না। অন্যান্য নাটকের ন্যায় এখানে একটা "প্রস্থান" কথা ছাপিয়া দিলে গ্রন্থ-সৌষ্ঠবের কি হানি হইত, তাহা আমরা বুঝিলাম না।

আরও একটা বলিবার আছে।—যখন শের খাঁ জাহাঙ্গীরের রাজ্যলাভ বিবরণ শুনিয়া বলিলেন,—"না আসফ, আমরা তাহা শুনি নাই।—তাতে আমাদের কি যায় আসে?—আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরের কাজ কি" তখন আসফ বলিল—"খুব যে যায় আসে, তা আমি এক্ষণেই দেখাবো"—

* 'নুরজাহান' নাটকের শিক্ষাদান স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী মহাশয়দ্বারা হইয়াছিল বলিয়াই আমরা জানি।—সং।

শের। আপাততঃ ভিতরে চল। অন্ধকার হয়ে এলো। চল মেহের—

নুর। চল যাচ্ছি।

আসফ ও সের খাঁ গৃহাভিমুখী হইলেন।

আসফ। খাদিজা কোথায় ?

শের। ঐ দেখ্‌ছ না, লয়লার সঙ্গে গলা ধরাধরি করে বেড়াচ্ছে।

আসফ। সুখে আছে দেখ্‌ছি।

উভয়ে চলিয়া গেলেন।

ইহার পরই নুরজাহানের স্বগত বাক্য।—"সেলিম সম্রাট!" ইত্যাদি তাহা ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে।

পাঠক, এ কৌশলটা বুঝিলেন কি ? কবির ভূমিকার কথাটা স্মরণ করুন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছেন, এ পুস্তকে সহচর নটনটীর সম্মুখে কাহাকেও স্বগত-বাক্য বলাইবেন না, কাজেই এ দৃশ্যের বর্ণনীয় বিষয়টী বর্ণিত হইতে অবশিষ্ট থাকিলেও মেহেরুন্নিসার ঐ তিন চারি পংক্তি স্বগত বাক্যের জন্য অন্ধকারের অছিলায় শের খাঁ ও আসফকে কবি একবার সরাইয়া দিলেন। এই তিন চারি পংক্তি স্বগত বাক্যের আবৃত্তিতে যে কয়েক নিমেষমাত্র সময় লাগিতে পারে, সেই টুকু সময়ের মধ্যে শের খাঁ ও আসফ ঘরে গেলেন, বসিলেন, সেলিমের রাজ্যারোহণ, শের খাঁর পাঁচহাজারী পদে নিয়োগ, তাঁহার আগ্রায় নিমন্ত্রণ ইত্যাদি কথাবার্ত্তা কহিলেন এবং নুরজাহানের কথার শেষ-বাক্যের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শের খাঁ পুনরায় সেই ঘর হইতে নদীতীরে নুরজাহানের পার্শ্বে আসিয়া হাজির হইলেন।—বলি, ঐটুকু সময়ের মধ্যে এতটা কি হয় ? দৃশ্যদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী কালে যুগযুগান্তর কল্পনা অসঙ্গত হয়ত নাও হইতে পারে, কিন্তু একই দৃশ্যে কয়েকটা নিমেষ বা নিশ্বাস ব্যবহিত কালের মধ্যে এতটা কি হয় ? কবি যদি বলেন 'পথে যাইতে যাইতে কথা হইল। আর শের খাঁ আনন্দে ছুটিয়া আসিয়া পত্নীকে 'সুসংবাদ' দিলেন'—আমরা তাহা স্বীকার করিব না। শের খাঁ বালক নহেন,—তাঁহার পক্ষে এ বিচলতা কোন ক্রমেই শোভনীয় নহে, বা কবির উদ্দেশ্যও সেরূপ নহে বা সেরূপ উল্লেখও কোথাও করেন নাই। ইহা দেশকাল-পাত্রের প্রতি নাটককারের অমনোযোগিতার ফল। এরূপস্থলে আসফকে লইয়া ঘরে যাওয়াটা শের খাঁর পক্ষে একান্ত অস্বাভাবিক। কথোপকথনের



যে অংশ বিশেষ কৌতুহলজনক সেই অংশে কথাবার্ত্তা বন্ধ করিয়া উঠিয়া যাইতে সামর্থ্য কাহারও নাই। এতদ্ভিন্ন আসফ ও শের খাঁর কথোপকথনের মধ্যস্থলে নিজভাবে বিভোরা—কবির কথায় বলিতে গেলে—'অবিচলিত অন্যমনস্কা' মেহেরুন্নিসার মনে মনে সেলিম সম্বন্ধে ঐ ভাবটুকু উদ্রিক্ত হওয়াই ঠিক সত্যসঙ্গত হইত, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রবাবু প্রতিজ্ঞার দায়ে, সেই সত্য ভাবটুকু সরাইয়া দিয়া, এই অনৈসর্গিক অভিনয়টুকুর অবতারণা করিয়াছেন। "একটা নূতন কিছু" করিবার লোভ করা বড় মন্দ নহে, কিন্তু সর্ব্বত্র নূতন কিছু করিয়া খাপাইয়া তোলা বড় শক্ত কথা! যদি এতটাই করিয়াছিলেন—তাহা হইলে নুরজাহানের ঐ স্বগতোক্তি-টুকুর পর দৃশ্য সমাপ্ত করিলে, পাকা নাটককারের হাত দেখাইতে পারিতেন। "নুরজাহানের মনের উপর পাঁচ ছয় প্রকার প্রবৃত্তির খেলা" দেখাইবার লোভে শের খাঁকে আবার বাগানে টানিয়া আনা ভাল হয় নাই। (ক্রমশঃ)

---

# বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের

## তৃতীয় অধিবেশন।

## সভাপতির অভিভাষণ

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর। )

—:*:—

বর্ত্তমান হিন্দী অনেক পরিমাণেই সমাজের রাষ্ট্র ভাষার অভাব পূরণ করিতে পারে; হিন্দী সহজে শিক্ষা করা যায়, সুতরাং সহজেই আর্য্যাবর্ত্তের রাষ্ট্র ভাষা হইতে পারে; কিন্তু রাষ্ট্র ভাষা যথাসময়ে কি অবয়ব ধারণ করিবে, তাহা এখন বলা যায় না। শব্দোচ্চারণের নৈসর্গিক ভেদবশতঃ (Phonetic decay), ভাষার ও শব্দের স্বভাবসিদ্ধ পুনর্গঠনকালে (Dialectic regeneration) অন্যান্য দেশীয় বৈজ্ঞানিক, কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প বিষয়ক শব্দ ও সংস্কৃত শব্দের অধিক পরিমাণে ব্যবহার দ্বারা রাষ্ট্র ভাষা এক নূতন আকার ধারণ করিতে পারে। বাঙ্গালা ও হিন্দীর ভিত্তিমূলে সমস্ত ভারতবর্ষের বিদ্বজ্জন-ব্যবহার-যোগ্য নূতন আকারের রাষ্ট্রভাষা সর্ব্বজন সমাদৃত হইতে পারে।

ভারতবর্ষের উত্তর বিভাগের ও পশ্চিম বোম্বাই ও গুজরাটের ভাষাসমূহ এক প্রকৃতির, এক ছাঁচের। প্রভেদ সামান্য। সকলগুলিই এক বলিলেও হয়। পার্থক্য যৎসামান্য। ইংলণ্ডের যুবরাজ প্রিন্স অফ ওয়েলসের ভারতবর্ষে আগমনে গুজরাটের জনৈক কবি লিখিয়াছিলেন,—

"আও আও ভারতরাজ জোবানে,
দই দর্শন সুখ এঁনু জন্ম জন্মনো খোবানে।
জেম চন্দ্রোদয় জোই চকোর জিয় রাজেরে,
জেম নবঘন আবতাঁ লখী মোরে বন নাচেরে।
তেম ভারতবাসী জনোত বাগম চাহে জী,
লখি মুখশশী রাজকুমার মুদিত মনমাহে জী।"

( এস, এস, ভারতের যুবরাজ! দর্শন সুখ দান করিয়া জন্ম জন্ম দুঃখ হইতে মুক্ত কর। যেরূপ চন্দ্রোদয়ে চকোর আনন্দিত হয়, যেরূপ নবঘনপ্রকাশে ময়ূর বনে নৃত্য করে, সেইরূপ ভারতবাসী আপনার আগমন প্রার্থনা করে। হে রাজকুমার! আপনার মুখশশী দেখিয়া মন বিকশিত হইবে।

গুজরাটী ভাষা কি আমাদের বঙ্গভাষা হইতে বেশী পৃথক? ইংলণ্ডের ও স্কটলণ্ডের ভাষায় ইহা অপেক্ষা অধিক পার্থক্য। কি জন্য আমরা গুজরাটী ও মহারাষ্ট্রীয় কাব্যসমূহকে আমাদের সাহিত্যের অঙ্গ বলিতে কুণ্ঠিত হইব? প্রভেদ কোথায়? কেবল লিপির প্রভেদ।

আমরা সহজেই, ভারতবর্ষীয় অন্ততঃ আর্য্য ভারতবর্ষীয় ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ও ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারি। গুরু নানকের অতি সুন্দর পঞ্জাবী ভাষায় বর্ণনা—

"গগনময় থাল রবি চন্দ্র দীপক বনে
তারকামণ্ডল জনক মোতি।
ধূপ মলয়ানিল পবন চৌরি করে
সকল বনরাই ফুলন্ত জ্যোতি।"

( গগন আরতির থালস্বরূপ, রবি ও চন্দ্র উহার দীপক; তারকামণ্ডল



মুক্তাস্বরূপ; সুগন্ধ মলয়ানিল ধূপস্বরূপ; পবন চামরস্বরূপ, এবং বনরাজি ও পুষ্পসমূহ জ্যোতিস্বরূপ।) বঙ্গভাষার বর্ণনা হইতে বড় বিভিন্ন নহে।

মহারাষ্ট্রীয় ভাষাও ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলের ভাষাসমূহ হইতে অধিক বিভিন্ন নহে। নিম্নলিখিত পদেই বুঝা যাইবে,—

"চমৎকৃতিনিধান হীকৃতি তুঝী জগাচ্যাপতে,
তুঝেঁ চ জগদণ্ড, জেঁ অখিল চিত্ত আকর্ষতেঁ।
সুরম্য ইতুকী জরী কৃতি তুঝী তরীতুঁ কিতী
সুরম্য অসসী প্রভো খুটতসে মতিচী গতী॥"

( হে জগৎপতে! তোমার ব্রহ্মাণ্ডরূপ কার্য্য অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়। সেই ব্রহ্মাণ্ড অখিলচিত্ত আকর্ষণ করে। হে প্রভো, যদি তোমার কার্য্য এত সুরম্য, তবে তুমি কত সুরম্য, ইহা স্থির করিতে মানসিক প্রবৃত্তি কুণ্ঠিত হয়। )

সাহিত্যের সম্যক্ উন্নতির জন্য ভারতবর্ষের প্রত্যেক বিভাগের সাহিত্যের সম্যক্‌জ্ঞান আবশ্যক। আমরা অনেকে ইংরাজী, ফরাসী, জার্ম্মাণী প্রভৃতি বিদেশী সাহিত্যের অভ্যুদয়ের ইতিহাস জানি; তাহাদের প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদিগের রচনা মূলে অথবা অনুবাদে পাঠ করিয়া কৃতার্থমণ্য হইতেছি। কিন্তু কয়জন মহারাষ্ট্রীয় ও গুজরাটী সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন? কয়জন মহারাষ্ট্রী বা পঞ্জাবী বঙ্গের সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন? রাজপুতানার অদ্বিতীয় কবি চাঁদের মধুচক্রে প্রবেশ করিবার জন্য কয়জন চেষ্টা করিয়া থাকেন? তুকারাম বা দলপৎ রায়ের কাব্যলহরীর সুমধুর ঝঙ্কার আমাদের কয়জনের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে? এমন কি, তুলসীদাসের সুপ্রসিদ্ধ রামায়ণ বা কবীরের ভক্তিপূর্ণ পদ আমরা কয়জন পড়িয়াছি? সাহিত্য সম্বন্ধে আমরা পরস্পরকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন মনে করি; এক ব্রিটিশ শাসনান্তর্গত বলিয়া রাজনৈতিক সম্বন্ধ দেখিতে পাই। আমাদের পরস্পরের লিপির পার্থক্য আছে, কিন্তু ভাষার বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পাই না।

গত কার্ত্তিক মাসে বরদা রাজ্যে যে সাহিত্য সম্মিলন হইয়াছিল, তাহাতে সর্ব্ব সম্মতিমতে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, ভারতবর্ষে এক লিপি নিতান্ত আবশ্যক, আমার ক্ষুদ্রচিত্তে কেবল লিপি কেন, ভারতবর্ষের সাহিত্যের উন্নতির জন্য এক রাষ্ট্রভাষাও

আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমানকালের ন্যায় ভারতবর্ষীয় প্রদেশ সমূহের সাহিত্যিক বিভিন্নতা ছিল না ভিন্ন ভিন্ন রাজা থাকিলেও সাহিত্যের বিভিন্নতা ছিল না, সংস্কৃত তখনকার রাষ্ট্র ভাষা ছিল। সুষুপ্তপ্রায় কোমলহৃদয় বঙ্গবাসীদিগের মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্যের নির্ব্বাণকালে নিশীথ সময়ের বীনাধ্বনিবৎ মধুর কোমলকান্ত পদাবলী জয়দেবস্বরস্বতী অজয় নদীর কুলে ক্ষুদ্র কেন্দুবিল্ব গ্রামে গীত হইল অনতিপরেই চিতোরের রাজ সভায় সমসি রাজের সমক্ষে কবিচাঁদ কেন্দুবিল্ব কবির কাব্যের গুণ ঘোষণা করিলেন। আমাদের হেমচন্দ্র, মধুসূদন, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ বা বঙ্কিমচন্দ্রের নামের এখন মহারাষ্ট্র,গুজরাট, রাজপুতানা বা পঞ্জাবে ঘোষণা নাই। এখন সেক্সপেয়ার (Shakespeare), মিল্‌টন্ (Milton), ওয়ার্ডসওয়ার্থ (Wordsworth), টেনীসন্ (Tennyson), হিউগো (Hugo), ও গেঠের (Geothe) আমরা অধিকতর পক্ষপাতী; মিস্ করেলী (Miss Correli) একখানি উপন্যাস লিখিলে আমরা তাহা পাঠ করিবার জন্য ব্যস্ত হই; ভারতবর্ষের অন্য দেশে কি গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে তাহার আমরা কিছুমাত্র খোঁজ রাখি না।

সাহিত্য, শিল্প ও কল্পাবিদ্যার অনুশীলনের তারতম্য অনুসারে মানব জাতির সভ্যতার পরিমাণ পরিজ্ঞেয়। যুদ্ধবিগ্রহে পারদর্শিতা অনুসারে মানব জাতির তেজস্বিতা পরিমিত হইতে পারে; দেশলুণ্ঠন, অপর জাতির স্বাধীনতা-অপহরণ প্রভৃতি কার্য্যকলাপ দ্বারা কোনও কোনও সভ্য জাতির সভ্যজাতিসমূহের মধ্যে পদোন্নতি হইতে পারে; কিন্তু ব্যাস, বাল্মীকি প্রভৃতি কবিগণ যেরূপ স্ব স্ব দেশের গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছেন, অন্য কোনও উপায়ে সেরূপ হইতে পারিত না।

ভারতবর্ষীয় সাহিত্যের সম্যক্ পরিপুষ্টির উপায় কি? একটী উপায়, এমন কি বিশিষ্ট উপায়,—পাঠকসংখ্যাবৃদ্ধি। বৃটিশ সাম্রাজ্যের যে পরিমাণে আয়তনবৃদ্ধি হইতেছে, ইংরাজী পড়িবার লোকসংখ্যা ততই বর্দ্ধিত হইতেছে, ইংলণ্ডের সাহিত্যের ততই পরিপুষ্টি হইতেছে।

আমার জাগ্রতাবস্থার চিন্তা ও সুষুপ্তাবস্থার স্বপ্ন—বঙ্গসাহিত্য, হিন্দী সাহিত্য, মহারাষ্ট্রীয়, তেলিগু, তামিল প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় বহু সাহিত্যের পরিবর্ত্তে, প্রাতঃসূর্য্যরশ্মিসমুজ্জ্বল সুতপ্তচামীকররাগরঞ্জিত অভ্রভেদী হিমাচলশৃঙ্গমালার পাদদেশ



হইতে তমালতালীবনরাজিনীলা লবণাম্বুরাশির বেলাভূমি পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতবর্ষে, অতীতকালের বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষৎ, দর্শন, মহাকাব্য, পুরাণ ও নাটকাদি সমন্বিত সংস্কৃত সাহিত্যের ন্যায় নবাভারতের এক অদ্বিতীয় আর্য্যসাহিত্যের প্রতিভায় সমস্ত জগৎ আলোকিত হউক। ভারতবর্ষের খণ্ডে খণ্ডে খণ্ড খণ্ড সাহিত্য যতই গৌরবান্বিত হউক না, সমবেত সাহিত্য যে পৃথিবীতে অদ্বিতীয় হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বিজ্ঞান ও কাব্যাদির উন্নতির জন্য আমাদিগকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে। সে কালে কেবল কাব্য, নাটক, দর্শন, পুরাণ ও স্মৃতি প্রভৃতি ছিল; ইতিহাস ছিল না। এ কালে সাহিত্যের সীমাবৃদ্ধি হইয়াছে। ইতিহাস ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্র ক্রমশঃ সুবিস্তীর্ণ হইতেছে; বিজ্ঞানে আমরা বেশী মনোযোগ দিতে পারিতেছি না, সময় কম, অর্থ কম। ভাষার উন্নতি, কাব্যাদির উন্নতির জন্য যতটা মনোযোগ আবশ্যক, ততটাও ঘটিয়া উঠিতেছে না। প্যারিসের একাডেমী অফ্ লিটারেচার (Academy of Literature) যেরূপ কাজ করিয়া আসিতেছে, আমরা তাহার শতাংশও করিতে সময় পাই না। নেপোলিয়ান (Napoleon) তাঁহার রাজত্বকালে একাডেমী অফ লিটারেচার (Academy of Literature) সংস্থাপনের ব্যবস্থা করিয়া ফরাসী ভাষার অসীম উপকার করেন। সেই সভার ছায়ায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গঠিত। যাহাতে বঙ্গভাষার শুদ্ধি ও প্রসার হয়, যাহাতে লেখার প্রণালীর উন্নতি হয়, যাহাতে কুরুচির উচ্ছেদ ও সুরুচির সম্যক্ বিস্তার হয়, যাহাতে সত্বর আমাদের সাহিত্য সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন, ইংরাজী, ফরাসী, জর্ম্মান প্রভৃতি সাহিত্যের ন্যায় উন্নতপদবী প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য আমাদের বিশেষ চেষ্টা ও উদ্যোগ আবশ্যক। ছাই পাঁশ পুস্তকের আদর না হয়, প্রকৃত রসাত্মক কাব্যের আদর হয়, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞানের আলোচনা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়, ইহার জন্য আমাদের সমধিক যত্ন ও প্রয়াস কর্ত্তব্য; বঙ্গদেশের এসিয়াটিক সোসাইটীর ছায়া অবলম্বন করিয়া কেবল পুরাতত্ত্বের উদ্ধার করিবার চেষ্টা-পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। অনেক সময়ে পরিষদকে কষ্ট হইতে হইবে, অনেক সময় বিরাগভাজন হইতে হইবে। "সত্যং ব্রূয়াৎ, প্রিয়ং ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্" এ কথা সাহিত্যসমালোচনায় প্রয়োজ্য নহে। সুরুচি ও

কুরুচির ভেদ করিতেই হইবে, এবং ভেদ দেখাইয়া প্রকাশ্য আদর বা অনাদর করিতেই হইবে। মহিমা ও সৌন্দর্য্যের আদর আছেই। বঙ্গীয় সমাজের সাহিত্য-বিষয়ক রুচির উন্নতিবিধানের জন্য আমাদের ব্যক্তিগত প্রীতি বা অপ্রীতির উপর লক্ষ্য রাখিলে চলিবে না। যাহাতে সমস্ত ভারতবর্ষে, এমন কি, সমগ্র ভূমণ্ডলে বঙ্গীয় সাহিত্যের আদর হয়, যাহাতে বঙ্গভাষার লালিত্য ও গৌরব জগদ্বিখ্যাত হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। বঙ্গে জ্যোতির্ম্ময় কাব্যরচয়িতার অভাব নাই; কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি কবিগণ যে জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়াছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ এখনও করিতেছেন, তাহা ভারতব্যাপী হয় নাই। বাইরন্ বা ওয়ার্ডস্‌য়ার্থের ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে শিক্ষিত সমাজে যেরূপ আদর আছে, আমাদিগের অদ্বিতীয় কবিদিগের সেরূপ আদর নাই। কি উপায়ে এই সকল মহাত্মাদিগের গ্রন্থ সমগ্র ভারতবর্ষের গৃহে গৃহে প্রবেশ করিবে, তাহা চিন্তার বিষয়। কি উপায় অবলম্বন করিলে তুলসীদাস, কবীর, হরিশ্চন্দ্র, চাঁদ, দেলপৎরাও, তুকারাম প্রভৃতি আর্য্য ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কবি ও সুলেখকগণের গ্রন্থনিচয় আমাদের প্রত্যেক শিক্ষিত গৃহস্থের আদরের জিনিস হইবে, তাহা সাহিত্য সম্মিলনে স্থির করা আবশ্যক।

সে দিন কলিকাতার চিৎপুর রোড্ দিয়া যাইতে যাইতে দেখি, অনেক স্থলে বৃহৎ অক্ষরে লেখা ‘,কুন্তলবিরাজিনী তৈল,” “সুকেশিনী তৈল।” দেখিয়া মনে হইল যে, মহর্ষি পাণিনির এ সকল দেখিলে হৃৎকম্প হইত। “Quintilian that would have made stare and gasp,” এখনকার অনেক লেখকের ভাষার জ্ঞান নাই, রসজ্ঞান নাই, এরূপ লোকের রচিত কত শত গ্রন্থে বঙ্গসাহিত্য আবর্জ্জনাপূর্ণ হইতেছে; রুচির কদর্য্যতা অনুসারে পাঠক-সংখ্যার বৃদ্ধিও দেখিতেছি; বিশ্ববিদ্যালয়ও সেরূপ অনেক লেখককে আদর করিতেছে। এ সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্যতার অবধারণ আবশ্যক। বঙ্কিমচন্দ্র বটতলাকে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন; এখন ভাল কাগজে, ভাল ছাপায়, কত অপাঠ্য পুস্তক মুদ্রাযন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইতেছে। আমি এ কথা বলি না যে, আমি নিজেই নির্দ্দোষ; আমিই হয় ত কত ভুল করিয়াছি। কিন্তু ভাষার ও রুচির সংশোধন নিতান্ত আবশ্যক।



বটতলা বঙ্গভাষার অনেক উপকার করিয়াছে, শেষাশেষি অপকারও করিয়াছে; কিন্তু এখন অবটতলার উপর লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। মেথিউ আর্ণল্ডের সদৃশ নিরপেক্ষ নির্ভীক সমালোচক আমাদের দেশে নাই। জেফ্রিজ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের White Doe of Rylstone পাঠ করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন “This will not do”। সময়ে সময়ে আমাদেরও সেই কথা বলিতে হইবে। অনেক সময়েই দেখিতে পাওয়া যায়, লঘু দ্রব্য নদীস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, এবং হয় ত তাহা চিরকাল মহাসাগরের তরঙ্গে ক্রীড়া করিবে; কিন্তু গুরু মূল্যবান্ দ্রব্য গুরুত্ব-নিবন্ধনই নদীগর্ভে নিপতিত হইয়া অনন্তকাল মানবের অদৃশ্য হইয়া থাকে। এরূপ যাহাতে না হয়, তাহাও দেখিতে হইবে।

ভারতবর্ষে ইতিহাস ছিল না; তৎপরিবর্ত্তে পুরাণাদি ছিল। ইতিহাস-পাঠ আবশ্যক কি না, তাহা আর বিচার্য্য নহে। আমরা স্থির করিয়াছি, ইতিহাস, ভূগোল, প্রত্নতত্ত্ব, এ সকলই সভ্য সমাজের সাহিত্যের বিশেষ প্রয়োজনীয় উপাদান। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ইতিহাস লিখিত হইতেছে। যদুনাথ, নিখিলনাথ, কালীপ্রসন্ন ও অক্ষয়কুমারের ন্যায় লেখকের সংখ্যা যতই বর্দ্ধিত হয়, ততই মঙ্গল।

গণিত ওবিজ্ঞান আমাদের বড়ই আদরের বস্তু। ডাক্তার শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও ডাক্তার শ্রীযুত জগদীশচন্দ্র বসু ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। স্বর্গীয় বাপুদেব শাস্ত্রী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্‌সেলার্ ডাক্তার শ্রীযুত জষ্টিস্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় গণিত শাস্ত্রে ভারতবর্ষের মুখ রাখিয়াছেন। বিজ্ঞানের আদর যতই বর্দ্ধিত হয়, ততই ভাল; আমার সম্পূর্ণ আশা আছে যে, অনতিদূরবর্ত্তী কালেই প্রফুল্লচন্দ্র ও জগদীশচন্দ্রের উপযুক্ত শিষ্যসমূহ আর্য্যজগতের গৌরববৃদ্ধি করিবেন। প্রত্নতত্ত্বে রাজেন্দ্রলাল জগদ্বিখ্যাত ছিলেন। শরচ্চন্দ্র এখানেই উপস্থিত আছেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবার লোক অনতিদূরবর্ত্তী কালে উদ্ভূত হইবেন, সন্দেহ নাই; ইউরোপ যাহা লিখিয়াছে, তাহারই প্রতিধ্বনি করিব না; স্বয়ং চিন্তা করিবার ব্যক্তি আরও আবশ্যক।

সমবেত ভ্রাতৃগণ, কি বঙ্গবাসী, কি উড়িষ্যাবাসী, কি আর্য্যভূমির অন্যপ্রদেশবাসী আসুন, আমরা প্রীতিপূর্ণ ও উৎসাহবিস্ফারিত হৃদয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন

করিয়া এই সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্য আরম্ভ করি, পরস্পরের সখ্য-বর্দ্ধন ও সাহিত্যের অভ্যুদয়ই আমাদের উদ্দেশ্য।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র।

---

# মাসিক সাহিত্য-সমালোচনা।

—:*:—

বিজ্ঞানদর্পণ, সম্পাদক শ্রীহারাধন রায় এম, এ, এফ, সি, এস, ২১০ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট প্রাপ্তব্য, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দুই টাকা।

বঙ্গভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ নানা মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত বোধ হয় একটিও এমন মাসিক পত্র প্রকাশিত হয় নাই যাহাতে কেবল বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধই আছে। বিলাত ও অন্যান্য দেশে এরূপ বিশিষ্ট পত্র অনেক দেখিতে পাওয়া যায়; ইহাদের প্রকাশ বিশিষ্ট বিষয়ের উন্নতির পরিচায়ক। আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে এই মাসিক পত্রটিতে কেবল বিজ্ঞানেরই আলোচনা আছে। আমরা ইহার উন্নতি ও দীর্ঘজীবন কামনা করি।

আলোচ্য সংখ্যাটিতে ( বৈশাখ ১৩১৭ ) ফাদার লাফোঁর ছবি ও কতকগুলি সারগর্ভ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ আছে। বিজ্ঞান ইংরাজী Science এর প্রতিশব্দ নয়। "বিজ্ঞান" কথাটির প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিলে অনেক বিষয় পত্রখানির অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পরে। আমাদের মতে শব্দটি Science এর প্রতিশব্দ স্বরূপ বুঝিয়া একটু সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করাই ভাল। তাহা না হইলে পত্রটির বিশেষত্বে আঘাত লাগিতে পারে।

আরো একটি কথা—কেবল পাশ্চাত্য বিজ্ঞান লইয়া থাকিলে চলিবে না, প্রাচ্য বিজ্ঞানও যথেষ্ট আছে। "বিজ্ঞান-দর্পণ" যদি দেশীয় লুপ্ত বিজ্ঞানের উন্নতিসাধন করিতে পারে, যদি তাহার দ্বারা দেশের লুপ্ত গৌরবের কণাটুকুরও পুনরুদ্ধার হয় তাহা হইলে আমরা, শুধু আমরা কেন, সমস্ত ভারতবাসী তাহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিবে।

মৃণ্ময়ী, ফাল্গুন।

পত্রিকাখানি আমরা অনেক দিন হইতে নিয়মিত পাইতেছি। সুযোগ্য সম্পাদকের হাতে পড়িয়া ইহা যে বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি বিধান করিতে সমর্থ হইবে তদ্বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই।



এই সংখ্যাখানির উপর দুই একটি কথা বলিবার সুযোগ আমরা পাইয়াছি। "অগাধ প্রেম" শ্রীযতেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত, কবিতাটি চলন-সই। "চৈতন্য" শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক বুঝাইয়াছেন—পাপ মানুষকে জড়ের দিকে আকর্ষণ করে, পুণ্য চৈতন্যের দিকে লইয়া যায়। বিষয়টির ব্যাখ্যা আরো বিস্তারিত হইলে ভাল হইত। "রাজা মজলিস রায়" শ্রীনিখিলনাথ রায় রচিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। "আয়েষা" বহুকালের একঘেয়ে সমালোচনা; পুরাতন কথা অনবরত নূতন করিয়া তুলিবার আবশ্যকতা দেখি না। সম্পাদক রচিত "আই" ও "প্রব্রজ্যাসূত্র" সুন্দর হইয়াছে। "সঙ্কল্প" কবিতাটি মন্দ নয়। "বেদ ও আমরা "প্রবন্ধের সহিত স্থানে স্থানে আমাদের মত না মিলিলেও ইহার উদ্দেশ্যকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সম্পাদক মহাশয় যদি এইরকমের অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ না করেন তাহা হইলে আমরা বাধিত হইব।

সুপ্রভাত, ফাল্গুন। শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র চরিত "নানক-রচিত" প্রকাশিত হইতেছে। "মানবের কি কি অভাব" শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক রচিত। লেখক এই প্রবন্ধে ভারতের লোক সংখ্যা হ্রাসের দুই একটি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যে সকল অভাবের জন্য আমাদের দেশের এরূপ অবস্থা হইয়াছে তাহা দূরীভূত করিতে উপযুক্ত শিক্ষারও ব্যবস্থা দিয়াছেন। প্রবন্ধটির মূল্য এ সময়ে নেহাৎ কম হইবে বলিয়া বোধ হয় না। "বিক্রমপুরে সৌর প্রভাব" শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখিত। লেখক প্রবন্ধের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছেন; এত অপ্রাসঙ্গিক কথা লেখা কখনই উচিত নয়। আমরা ইহার প্রশংসা করিতে পারিলাম না। "বোপদেব প্রণীত গ্রন্থাবলী" শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর লিখিত। লেখক বৈয়াকরণ বোপদেবের লিখিত গ্রন্থগুলির নাম করিয়াছেন। এরূপ বিষয় একটু বিস্তৃতভাবে লিখা উচিত।

সুপ্রভাত, চৈত্র। "পদ্মিনী উপাখ্যান" শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার রচিত। লেখক সম্রাট আওরংজীবের চিকিৎসক ভিনিস প্রদেশবাসী মানোচির বর্ণনা হইতে এই উপাখ্যান সংকলন করিয়াছেন। বিষয়টি নূতন ও চিত্রাকর্ষক। "পিপাসা" শীর্ষক কবিতাটি ভাল লাগিল না, যাহা ইচ্ছা তাহাই লিখিলে কবিতা হয় কি? "গৈবীনাথ" শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত রচিত; কথিত আছে গৈবীনাথের উপর পূর্ব্বে জহ্নু মুনির আশ্রম ছিল। লেখক প্রবন্ধটিতে এই গিরি সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন। ভাষার দিকে লেখকের একটু বিশেষ করিয়া দৃষ্টি রাখা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। "সরমার প্রতি সীতা" শ্রীমানকুমারী বসু রচিত কবিতা মন্দ লাগিল না।

বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন। "কবিবর নবীনচন্দ্র সেন" শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকারের রচনা উল্লেখযোগ্য "রঘুনাথে মহারাষ্ট্র অধিকার" শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর রচিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধ; অনেক নূতন কথা আছে। "ভাষা তত্ত্ব" অপূর্ব্ব সুন্দর। এরূপ প্রবন্ধে ললিতবাবুর যথেষ্ট মৌলিকতা আছে। শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রের রচিত "শ্রীমূর্ত্তিবিবৃতি" ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

সাহিত্য, পৌষ। শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়ালের "যশোর যুদ্ধ" একটী গাথা; স্থানে স্থানে সৌন্দর্য্য আছে, কিন্তু যাহাকে কবিত্বের স্ফুরণ বলে তাহা উহাতে হয় নাই। শ্রীধরনীকান্ত লাহিড়ীর

"কোয়েটা" উপভোগ্য। "প্রায়শ্চিত্ত" শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদ-গল্প; সৌরেন্দ্রবাবু নির্ব্বাচন সম্বন্ধে একটু সাবধান হইলে আমরা সুখী হইব। তাঁহার রচনায় অনুবাদের দোষও ঘটিয়াছে;—"প্রত্যেক নেকড়ের মাথার উপর রীতিমত পুরস্কার ঘোষণা হইয়াছে;" লেখক ইংরাজী ও বাংলা দুই ভাষাই জানেন, তাঁহার পক্ষে "মাথা-পিছু" কথাটা জোগান্ দিতে পারা উচিত ছিল। শ্রীযোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের "সুখের ভ্রমণ" সরস, মধুর; কিন্তু এক সংখ্যায় দুইটী ভ্রমণ কাহিনীর প্রকাশ কি কাগজের দৈন্য ব্যাপক নয়? "সহযোগী সাহিত্যে" "বরোদা রাজ্যে গ্রাম্য স্বায়ত্ত শাসন" উল্লেখযোগ্য। শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "শেষের সে দিন" একটী অপদার্থ রচনা। রায় মহাশয় "ঘুঘু" দেখাইতে চাহিয়াছেন; এখন যদি কেহ তাঁহার প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া বাংলার সাহিত্য ক্ষেত্রে "ঘুঘু" চরাইতে আরম্ভ করে তাহা হইলে আমরা নাচার। শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর "বাবা" প্রবন্ধে বলিয়াছেন "বাবা" শব্দ "ভষ" শব্দ হইতে উদ্ভূত। শব্দতত্ত্ববিদ্‌গণ এ আবিষ্কারে একমত হইলে আমরা সুখী হইব।

---

# মানসী

দ্বিতীয় ভাগ। জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ সাল ৪র্থ সংখ্যা।

## মানবের অভাব ও তাহা নিবারণের চেষ্টা।

—:*:—

আমাদের অভাব অসংখ্য; অভিলাষের ও ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। মানুষের ক্রমোন্নতির ইতিহাসে এই অভাব অনুভব করিবার শক্তি এবং অনুভূত অভাব দূরীকরণের চেষ্টা চিরদিনই বিশেষ প্রভাব প্রকাশ করিয়া আসিতেছে। মানব-সমাজের উন্নতিস্রোত যে চিরদিনই উজান বহিতেছে, তাহা এই কলিযুগের মানুষের নিকট আর প্রচ্ছন্ন নাই, সত্যত্রেতাদ্বাপরের সোনার মোহ বিজ্ঞানের রশ্মিপাতে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। যে শক্তি এই উন্নতির চির প্রবাহকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে, তাহা এই নিত্য নূতন অভাব বোধ এবং তদ্দূরীকরণের চেষ্টা।

অসভ্য অবস্থায় মানুষের ও মনুষ্যেতর প্রাণীগণের অভাবের যে খুব বেশী ইতর-বিশেষ ছিল এমন মনে হয়। পশুর মতন যেমন তেমন করিয়া উদর-পূর্ত্তি, যেখানে সেখানে শয়ন প্রভৃতি নৈসর্গিক অভাব দূর হইলেই আদিম মানব বোধ হয় বেশ সন্তুষ্ট হইতে পারিত। কিন্তু ক্রমশঃ মানুষের অভাব

বিচিত্র ও তাহা নিবারণের উপায়ও নানাবিধ হইয়া উঠিল। মানুষ যে কেবল উপকরণের সংখ্যা বা পরিমানের আধিক্যের উপর আপনার সন্তোষকে স্থাপিত করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিল এমন নহে, তাহার উপকরণের উৎকর্ষবোধও তাহাদের নিকট উদ্বোধিতহইয়া উঠিল। নূতন অনুভূত অভাব নূতন উপকরণের দ্বারা দূর করিবার জন্য চেষ্টা অপূর্ব্বভাবে বিকশিত হইয়া উঠিতে লাগিল। সেই পশুপ্রায় অবস্থা হইতে সভ্যতার সুদীর্ঘ পথে মানব-যাত্রী যে অবিরাম চলিতেছে, প্রতিপদক্ষেপে নূতন হইতে নূতনতর দৈহিক মানসিক ও নৈতিক অভাবের কঠোর কশাঘাতের তীব্র তাড়না তাহার মূলে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। উন্নতির প্রতি অঙ্গেই মানুষ অভাবের সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত সেই সকল নবানুভূত অভাব মোচনের জন্য আপনার সর্ব্ব-শক্তির প্রয়োগ করিয়া আসিতেছে। এই চির সজীব চেষ্টাই সভ্যতার মূল মন্ত্র।

অসভ্য মানুষ বা পশুগণ যে উৎকৃষ্ট ভোজ্য দ্রব্যের উপর আসক্তি প্রকাশ করে না এমন নহে, কিন্তু আহারে বৈচিত্র্যবোধ তাহাদের নাই। নানাবিধ উত্তম আহারায়ের দ্বারা রসনা তৃপ্তির চেষ্টা তাহাদের মধ্যে দেখা যায় না। তাহার কারণও আছে। আহার্য্য দ্রব্যের মূল যে জগতের নানা নৈসর্গিক ভাণ্ডারে নিহিত রহিয়াছে, এই জ্ঞান অপেক্ষাকৃত সভ্যতর অবস্থায় আমাদের গোচরে আসিয়াছে। সেই জন্যই জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে মানবের খাদ্যদ্রব্য বিচিত্র হইয়া উঠিতেছে। মানুষ যতই উন্নতিলাভ করিতেছে, তাহার মানসিক শক্তিসমূহ যত পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছে, তাহার অভাব সকল ততই বিচিত্র ও সূক্ষ্মতর হইয়া উঠিতেছে। পরিবর্ত্তন উন্নতিশীলের লক্ষণ। প্রথার প্রস্তর চাপ সরাইয়া দিয়া এই পরিবর্ত্তনশীলতা মানবসমাজকে সজীব রাখিতেছে। উন্নতি-শীল জীবনের সকল অংশেই এই শক্তির প্রভাব দেখা যায়।

মানসিক শক্তির বিকাশের ফলে মানুষ মনে মনে পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী হইয়া উঠিতেছে এবং সকল দিক হইতে সকল প্রকার চিরাগত প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের রক্তপতাকা তুলিয়া ধরিতেছে। যে দিন হইতে মানুষ আগুন জ্বালাইতে শিখিয়াছে, আহারের বিষয়ে সেই দিন হইতেই সে নূতনত্বের পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছে।

মানব-সমাজের এমন একটা অবস্থা বর্ত্তমান ছিল (এখনও কোন কোন



সমাজ এমন অবস্থায় আছে) যখন অগ্নি উৎপাদন করার কৌশল সমাজের ক্ষুদ্র জ্ঞানরাজ্যের চতুঃসীমানাবদ্ধ ছিল না। সেই কালের সমাজ আম মাংস বা সহজ ফল মূল ভক্ষণ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিত। কিন্তু যখন মানুষ অগ্নি উৎপন্ন করিতে শিখিল, সেই সময় হইতে তাহার সাহায্যে নানাবিধ আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া তাহারা আপনাদিগের দেহের পুষ্টি ও জিহ্বার তৃপ্তি সাধন করিতে লাগিল। অর্থের বৃদ্ধির সঙ্গে আহার্য্য ও পানীয় বিচিত্র ও মূল্যবান হইয়া উঠিল। কিন্তু অর্থ-বৃদ্ধির অনুপাতে ক্ষুধা ত বাড়িতে পারে না, মানুষের ক্ষুধার একটি ক্ষুদ্র পরিমাণদণ্ড আছে। অপরিমিত আহার্য্য ধ্বংস করা তাহার সাধ্যাতীত। কিন্তু মানুষ বড় জটিল ও রহস্যময় জীব। নিজের তৃপ্তি যদিও পরিমিত, তবু অপরকে তৃপ্ত করিয়া যে সুখ, তাহা মানব তীক্ষ্ণ ভাবে, আপনার তৃপ্তির মতই অনুভব করিতে পারে। তাই অপরকে ভোজন করাইবার সুখ লাভ সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিল। সভ্যতার বৃদ্ধির ফলে আতিথেয়তা ও আড়ম্বর প্রিয়তা উৎপত্তি লাভ করিল। বৃহৎভাবে দেখিতে গেলে, এমনও বলা যাইতে পারে, যে নিজের ক্ষুধা-নিবৃত্তি, যাহা আহারের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহা আড়ম্বর অতিথি-সৎকারের সমপর্য্যায়ভুক্ত হইয়া গেল। বিচিত্র বস্তু হইতে বিচিত্ররূপ আনন্দ উপভোগ করিবার বাসনা মানবমনের এক অংশ অধিকার করিয়া রহিয়াছে, আবার এই বৈচিত্র্যে তৃপ্তি বোধ করিবার বাসনা খ্যাতি-অর্জ্জনের বাসনার সহিত মানবমনের অপর আর একদিক দখল করিয়া আছে। আমরা যে আড়ম্বর সহকারে বিচিত্র উপকরণ দ্বারা অতিথি সৎকার করিয়া থাকি, বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে তাহার অভ্যন্তরে এই মানসপ্রবৃত্তির ক্রিয়া লক্ষিত হইয়া থাকে। খ্যাতি-অর্জ্জন-প্রবৃত্তি ও বৈচিত্র্যবোধ আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রকে বিভিন্ন দিকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছে। আমরা দেখিতেছি যে, খ্যাতি-অর্জ্জন-প্রবৃত্তি আতিথেয়তার মূলে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। ক্ষুধাবোধ সমাজের আদিম অবস্থায় আহার্য্যসংগ্রহের প্রধান কারণ ছিল; কিন্তু উন্নত সমাজের বিচিত্র আহার্য্য সংগ্রহের মূল অন্যত্র অনুসন্ধেয়; এই যে বিচিত্র ভোজ্যদ্রব্য নিত্য ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা নানাবিধ উপকরণ উপভোগের যে বাসনা, ও অতিথি সেবা দ্বারা খ্যাতিলাভের বাসনা, এই উভয়ের ফলস্বরূপ। ইহার মধ্যে আবার

খ্যাতিলাভের চেষ্টা নানারূপে মানব সমাজে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহা সর্ব্বকালে সর্ব্বমানবকে অভিভূত করে। এই দুর্ব্বলতা মহাপণ্ডিত, মহাজ্ঞানীর হৃদয়েও আধিপত্য করিয়া থাকে।

পরিচ্ছদের প্রয়োজন, স্বাভাবিক কারণ সমূহের প্রভাব হইতে দেহ রক্ষার জন্য। পরিচ্ছদের প্রকৃতি স্বাভাবিক নিয়মে দেশের জল বায়ু ও ঋতুর পরিবর্ত্তন অনুসারে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। পুনশ্চ, মানবের অবলম্বিত ব্যবসায় বা কার্য্যের প্রকৃতির বিভিন্নতানুসারে পরিচ্ছদ কতকটা ভিন্ন রকমের হইতে বাধ্য। কিন্তু পরিচ্ছদের বেলায়, সমাজের দাবী স্বভাবের দাবীকে অতিক্রম করিয়াছে। সমাজের নিয়মের বাধ্য হইয়া আমাদের এ বিষয়ে চলিতেই হইবে। প্রাচীন সমাজে রাজা বা ধর্ম্মযাজকগণের নির্দ্দিষ্টবিধানে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকদিগের পরিচ্ছদ নির্দ্দিষ্ট হইত; প্রাচীন দেশে sumptuary lawsএর অধীনতা স্বীকার করিয়া সকলেই চলিত; সেই আইনেরই বিধানে বর্ণসমূহের উচ্চতা ও নীচতা অনুযায়ী পরিচ্ছদের মূল্যেরও তারতম্য বিহিত হইত। রোমে ও মধ্যযুগের ইউরোপখণ্ডে ও সাধারণ শ্রেণীর ও আভিজাত্য শ্রেণীর পোষাকের প্রকৃতি ও মূল্য আইনের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইত। এ অবস্থা কিন্তু অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। বৈচিত্র্যের বাসনা মানুষের একটি স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা। তাই রাজবিধান বা পুরোহিতের বিধানও সমাজের পথে অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। এবং সমাজ নিজেই নিজের পরিচ্ছদের প্রকৃতি (fashion) স্থির করিবার ভার লইল। তাহার ফলে প্রথাকে বজায় রাখিয়া, পোষাকের উপর ব্যক্তিত্বের ছাপ পড়িতে লাগিল। মানুষের কার্য্যকারিকা শক্তি আর একটি ক্ষেত্র আবিষ্কার করিয়া লইল। কত নূতন নূতন টুপি, মোজা, জামা, জুতা প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইতে লাগিল তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে কিছুকাল পূর্ব্বে যে শ্রেণীর লোক জুতা পায়ে না দিয়া সর্ব্বত্র সম্মানের সহিত যাইত, কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করিত না, এক্ষণে তাহাদের সমশ্রেণীর লোক জুতা ও মোজায় মণ্ডিতচরণে বাহির না হইলে লজ্জায় মলিন বদন হইয়া থাকে। কিন্তু এতদূরে অনুসন্ধানের কি প্রয়োজন? ঘরেই এই বিষয়ের উদাহরণ অনেক আছে। ব্যবসায় বা



চাকরীর খাতিরে আমরা নানবিধ নূতন পরিচ্ছদ পরিধান করিতেছি, যাহা আমাদের দেশের ঋতুর প্রকৃতি বিচার করিলে কখনই আমাদের ব্যবহার্য্য হইতে পারে না। এই নিদারুণ গ্রীষ্মে আপাদমস্তকমণ্ডিত হইয়া বিচার কার্য্য বা ব্যবহারজীবীর কার্য্য ইত্যাদি করা আমাদের এই দেশে স্বভাবসঙ্গত হইতে পারে না। কিন্তু এ না হয় বাধ্য হইয়া; এ ছাড়া যেখানে আমাদের স্বাধীনতা আছে, আমাদের পরিচ্ছদ যেখানে আমাদের দশজনের ইচ্ছার ফল, সেখানেও ত এই অস্বাভাবিক পোষাক পরার মোহ প্রবেশলাভ করিয়াছে। পূর্ব্বে আমাদের সমাজের দাবী সামান্য বসন ও একখানি উত্তরীয়ের দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল; এই গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে স্বভাবের দাবীও তাহার অধিক কিছুই নহে।

এই পরিচ্ছদপ্রিয়তার কারণ আমাদের স্বভাবের মধ্যে গুপ্তভাবে অবস্থিতি করিতেছে। মূল্যবান পরিচ্ছদ পরিয়া সমাজে খ্যাতি বা প্রসিদ্ধি লাভের বাসনাই ইহার কারণ।

এই জন্য সর্ব্বদেশের নিম্নশ্রেণীর বা লোকদিগের মধ্যে নানাবিধ মূল্যবান ও বিচিত্র পোষাক পরিবার প্রবৃত্তি বাড়িয়া উঠিতেছে। ইংরেজদিগের সমাজের নিম্নশ্রেণীতে এই প্রবৃত্তি একটা রোগের মত দাঁড়াইয়াছে। আমাদের দেশের অনুকারীর দল ও এক শ্রেণীর তথা-কথিত শিক্ষিতগণ এই ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অহরহ দরজির বিলে ব্যতিব্যস্ত হইতেছে। আমাদের এই দরিদ্র দেশের নিঃস্ব শ্রেণীতেও এই রোগের প্রবেশ দেখা যাইতেছে। আজ কাল মাসিক তিন টাকা বেতনের ভৃত্যও জুতা, মোজা, গেঞ্জির দ্বারা আপনাকে শোভিত করিতে না পারিলে দুঃখিত হইয়া থাকে। এই সকল লোকে ভাবিয়া থাকে, যে পরিচ্ছদের মূল্যই সামাজিক খ্যাতিপ্রতিপত্তির পরিমাপক। কিন্তু একটু উচ্চস্তরের মানুষ আপনার মানসিক শক্তির উপর নিজের খাতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত—এই ধারণা দ্বারা অনুপ্রাণিত; তাই, উচ্চস্তরে বিচিত্রবর্ণ মূল্যবান পরিচ্ছদের আদর দিন দিন লোপ পাইতেছে। কিন্তু যাহাদের মানসিক শক্তি শারীরিক সৌন্দর্য্যের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সম্পূর্ণতর হইয়া উঠে, সেই স্ত্রী-সমাজে ওকথা খাটিবেনা। সুন্দর পরিচ্ছদ স্বাভাবিক সৌকু-

মার্য্যকে প্রস্ফুটিত করিয়া তুলে। মূল্যবান পরিচ্ছদ শুধু অর্থগৌরব প্রকাশ করে,—কিন্তু শোভন পরিচ্ছদ পরিধানকারিণী রমণীর যে একটি মানসিক চিত্র প্রভাসিত করে তাহা তাহার শিক্ষারই পরিচায়ক। যে কল্পনা চিত্র-কলায় পূর্ণতর ভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, সুন্দর পরিচ্ছদ প্রস্তুত করাইবার শক্তি সেই মহীয়সী কল্পনার নিম্নস্তরেই এক অপূর্ব্ব বিকাশ। তাই apparel oft proclaims the man." পরিচ্ছদ ক্ষেত্রবিশেষে মানসিক শক্তির পরিচায়ক।

তারপর গৃহ। আত্মরক্ষার জন্যই ইহা প্রয়োজনীয়। এই ক্ষুদ্র অভাব ত সামান্য গৃহ হইতেই দূর হইতে পারিত; কিন্তু সুবৃহৎ, সুন্দর অট্টালিকাও আমাদের খ্যাতি প্রচার করিবার উপায়। এই ধারণা অনেককে বড় বড় আবাস-স্থল নির্ম্মাণের পক্ষপাতী করিয়াছে। কিন্তু কেবল তাহাই নহে। ক্ষুদ্র গৃহের নিঃশ্বাসরোধকারী অভ্যন্তর; তাহার অপরিচ্ছন্নতা, তাহার প্রয়োজনীয় আবরুর অভাবের জন্য ক্ষুদ্র-গৃহ-বাস আমাদের পক্ষে বড় কষ্টকর। শরীরের স্বাস্থ্য—অস্বাস্থ্যকর না হইলে—ক্ষুদ্র গৃহে বাস করিয়া ত রক্ষা করা যাইতে পারে। কিন্তু নৈতিক ও মানসিক শক্তির বিকাশের দিক দিয়া দেখিতে গেলে, ইহা বলিতেই হইবে যে এইরূপ গৃহ সে মানসিক শক্তির বিকাশের মূলে আঘাত করিয়া উচ্চচিন্তা করিবার ক্ষমতার বিনাশ সাধন করে। সুস্থ জীবন, শিল্পী বা শ্রমজীবিগণের পথে সুন্দর; স্বাস্থ্য-নীতির অনুমোদিত নিয়মে নির্ম্মিত বাসস্থানে বাস একান্ত আবশ্যক। তাহাতে শিল্প-নৈপুণ্য, শ্রম-কুশলতা প্রভৃতি অত্যাবশ্যক গুণসমূহ বিকশিত হইয়া থাকে। আতিথেয়তা ইত্যাদি সামাজিক গুণ সুবৃহৎ বাসস্থানের অপেক্ষা রাখে।

বিজ্ঞান, সাহিত্য বা কলাবিদ্যার আলোচনা আমাদের কোন প্রাথমিক (Primary) অভাব দূরীকরণের চেষ্টা নহে। সৌন্দর্য্য-বোধ-শক্তি আমাদের মনে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। সেই শক্তির উদ্বোধন বাসনাই সাহিত্য, চিত্র প্রভৃতি ললিত কলার আলোচনার মূলে বর্ত্তমান আছে। মানুষের চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার উপায় নাই, তাহাকে আত্মরক্ষা বা শরীর ধারণ বা সঞ্চিত অর্থের ব্যয় বা অপব্যয়ের জন্য পরিশ্রম করিতেই হইবে। যাহার অর্থ-উপার্জ্জনের নিমিত্ত



আপন শক্তি নিয়োগ করিবার আবশ্যকতা নাই;—সুশাসিত দেশে সঞ্চিত অর্থের স্তূপের উপর বসিয়া যাহার দিন অবাধে চলিতে পারে, মনে হয়, তাহারও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবার যো নাই—জীবন রক্ষার জন্যও ত শারীরিক পরিশ্রম আবশ্যক, সামাজিক কর্ত্তব্য পালনের জন্যও ত পরিশ্রম প্রয়োজনীয়। সুতরাং কেবল বাঁচিয়া থাকিবার জন্যও আমাদের স্বাভাবিক শক্তি বিকশিত হইয়া উঠিতে পারে। আজকাল Sandowর প্রচারিত ব্যায়াম-বিধি দেশে বিদেশে প্রখ্যাত হইয়া উঠিয়াছে। এই স্যাণ্ডো শারীরিক স্বাস্থ্যের অভাব অনুভব করিয়া তাহার প্রতিকারের জন্য এই ব্যায়ামবিধি উদ্ভাবিত করিয়াছিল। সাণ্ডোর অভাব এখন দূর হইয়াছে, সাণ্ডো এখন সুস্থ, কিন্তু তাহার শক্তি বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, সে এখন খ্যাতিলাভ ও শক্তিবিকাশের আশায় নূতন নূতন ব্যায়ামবিধির প্রবর্ত্তন করিতেছে সাণ্ডোর পক্ষে ব্যায়াম আর এখন শারীরিক স্বাস্থ্যলাভেচ্ছা-প্রণোদিত নহে, ইহা শক্তিবিকাশ বা খ্যাতি-অর্জ্জন ইচ্ছার পরিণাম মাত্র। সুতরাং দেখা যাইতেছে, শক্তির বিকাশ উন্নত সমাজে নূতন কর্ম্মক্ষেত্রের সৃষ্টি করিতেছে—যাহা প্রথমে শরীর রক্ষার জন্য অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহাই এখন শক্তিবিকাশের হেতু এবং নূতন কর্ম্মক্ষেত্রের প্রদর্শক হইয়া উঠিল।

কিন্তু, যাহাদগের Culture বা শিক্ষার অভাব তাহাদেরই অবসর ও অর্থ কেবলমাত্র শারীরিক শক্তির উন্নতি-বিধানে পর্য্যবসিত হইতে পারে; কিন্তু মানুষের মন যাহার শক্তি অনন্ত, যাহার গতি অপরাঙ্মুখ, যাহার কল্পনা বহুল যাহার চেষ্টা অক্লান্ত—সেই মনের শক্তির নিত্য নব নব বিকাশের চেষ্টা অপেক্ষাকৃত উন্নত সমাজে অনুক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। এই চির-রহস্যময়ী প্রকৃতির রহস্যালয়ে প্রবেশ করিয়া তাহার সমুদয় তত্ত্বগুলি একে একে সমাধান করিবার অদম্য আকাঙ্ক্ষাই অভাবের মত অনুভব করিয়া, মানব আপনার কার্য্যক্ষেত্র সহস্রদিকে প্রসারিত করিতেছে।

এই বৃহৎজগতের সমস্ত জীব, সমস্ত সভ্যাসভ্য সমাজ, গ্রহ তারা নক্ষত্রময় জ্যোতিমণ্ডল, তরুলতা, সমুদ্রপর্ব্বত, নদনদী, ইহাদের সহিত ঘনিষ্টতা স্থাপন, তাহাদের জীবনের ইতিহাস জানিবার জন্য চেষ্টা, ইহাতেই আমাদের মনের

ক্ষমতা অপরূপ রূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে। মানসিক ক্ষমতার বিকাশ কর্ম্ম-ক্ষেত্রের বিস্তীর্ণতা আনয়ন করিতেছে। সমাজের সকল স্তরেই পূর্ব্বগামী মনীষি-গণের আবিস্কৃত বা সঞ্চিত জ্ঞান, বিজ্ঞান প্রভৃতির আলোচনা করিবার প্রবৃত্তি জাগরিত হইয়া উঠিয়াছে। তাই, অনেক দেশে কোন কোন গ্রন্থের লক্ষাধিক পুস্তক মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বেই বিকাইয়া যায়।

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, যে আনন্দ ও ক্ষমতার অনুশীলনের জন্য কবিতা, চিত্র-কলা, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের চর্চ্চা সমাজের অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। আমরা যখন আরব্ধ কার্য্য আদর্শানুযায়ী গঠন করিয়া তুলিতে পারি তখন আনন্দ লাভ করি। Desire for Excellence আনন্দ আনয়ন করে। এই ইচ্ছা মনীষিগণের মনের ন্যায় সামান্য শিল্পী বা শ্রমজীবির অন্তঃকরণেও আপনার প্রভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। মানবজাতির উন্নতির ইতিহাসে আমাদের এই প্রবৃত্তি একটি বৃহৎ শক্তি; যাহা কিছু শোভন, মঙ্গলময়, চিত্তাকর্ষক চিন্তা-উদ্রেককর, বা আনন্দদায়ক সাহিত্য দর্শন বা ললিত কলাবিদ্যায় সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার মূলে স্রষ্টার অন্তর্নিহিত এই ইচ্ছার প্রবল কার্য্য বর্ত্তমান আছে। অর্থের হিসাবে বা সমাজে পদপ্রতিপত্তি আনয়ন করিবার সামর্থ্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে, প্রতিভার অনেক অমর-কীর্ত্তির ভাস্বর শোভা মলিন হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু শিল্পীর অন্তরের আনন্দই তাহার একমাত্র পুরস্কার। এই উচ্চ আদর্শ বা আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া সমাজের অবজ্ঞা অম্লানঅন্তরে সহ্য করিয়া কত কবি, কত শিল্পী চির-কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। সেক্সপিয়ার সম-সাময়িক ইংলণ্ডে তেমন সমাদর প্রাপ্ত হয়েন নাই এইরূপ শুনা যায়, কিন্তু তাই বলিয়া তদীয় হ্যামলেট, লিয়র বা ম্যাক্‌বেথ্‌ কি আরও ভাল হইতে পারিত। (ক্রমশঃ)

শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ বাগচী

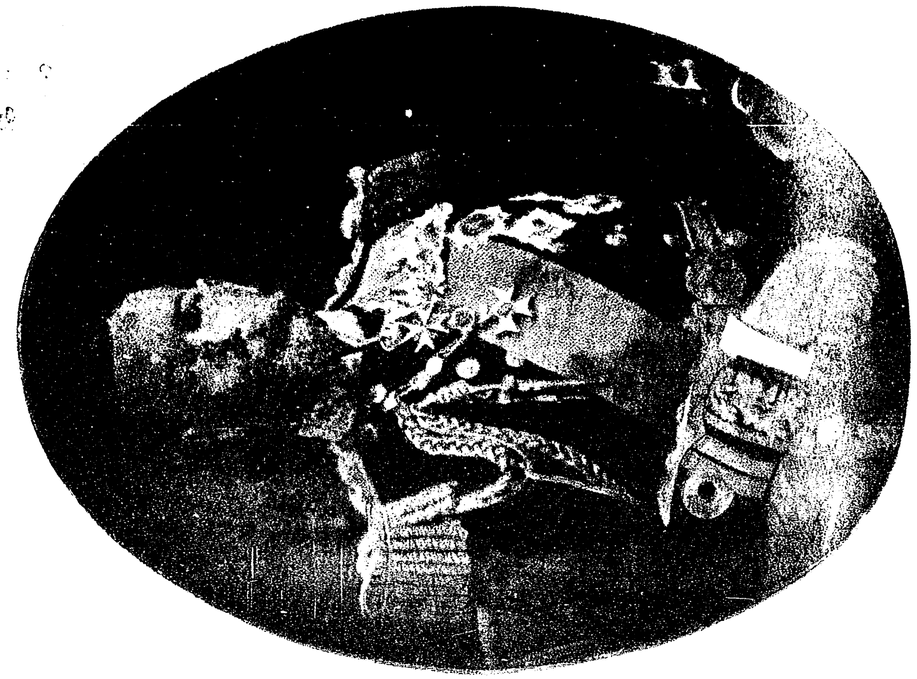

মানসী।



# বনপথে।

—:০:—

( আজি ) নাগকেশরের গন্ধে পাগল
সান্ধ্য ফাগুন হাওয়া
( কেন ) কুণ্ঠিত সুধা-কণ্ঠ তুহার ?
কোন সুরে যায় গাওয়া ?
বন-পথে আজ ফুল দোল-লীলা,
কুঙ্কুম ভাঙে রঙ্গণ ;
'জলতরঙ্গ'—ঝঙ্কার তুলি'
বাজাও শঙ্খে কঙ্কণ।
ছুটাও উধাও মনোরথ অয়ি
নন্দন-বন-বল্লি,
প্রেম-সৌরভে গৌরবময়ি,
ফুল্ল চন্দ্রমল্লি।
চাহ খঞ্জন-চঞ্চল চারু
নয়ন-ভঙ্গী সঙ্গে ;
লুটাও লীলায় মস্‌লিন্ ওড়্‌না
ফাল্গুন মধু রঙ্গে।
( আজি ) বর্ষণ-শেষে 'শোণের' মতন
ভরা যৌবন তুহার,
( ছোটে ) কাণে কাণ ওই রূপের তুফান
পদ্মরাগের জুয়ার—
মানায় কি আজ অবগুণ্ঠন
বদন-ইন্দীবরে ?
লোলুপ আজ্‌কে অধর-ভৃঙ্গ
গন্ধ মধুর তরে।

( হের ) দীপ্তপ্রবাল পলাশবনটি
মাঠের প্রান্তে আঁকা ;
আবির-বর্ণ রবির বিম্ব
মেঘ-চুম্বন-মাখা।
এমন মঞ্জু বসন্ত সাঁঝ,
ঝিল্লীর কলগুঞ্জন—
মিছে আজ এই মৌখিক লাজ,—
লজ্জার অনুরঞ্জন।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

# বাঙ্গালা-নাটক-সমালোচনা।

—:০:—

দ্বিতীয় দৃশ্যে জাহাঙ্গীর স্বীয় মহিষী রেবার সহিত কথা কহিতেছেন। রাজপুত কন্যা মানসিংহভগিনী রেবা তখন স্নান করিয়া পূজাপাত্রহস্তে পূজার জন্য যাইতেছিলেন। এই অবস্থায় এক কক্ষে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইয়াছে। সুযোগ পাইয়া স্বামীকে দুটা নরম গরম উপদেশ দিবার জন্য রেবা দাঁড়াইয়া গিয়াছেন। শের খাঁকে বাদ্‌শাহ কেন আগ্রায় আনাইয়াছেন,—ইহাতে কোন গূঢ় অভিসন্ধি আছে কি না, তাহা জানিবার জন্য, অর্থাৎ রোগীর মুখ দিয়া রোগ ব্যক্ত করাইবার জন্য রেবা জেরা করিতেছেন—"সত্য বল।"

জাহাঙ্গীর। আমি সত্য বল্‌ছি রেবা—শের খাঁ আমার দক্ষ ধনাধ্যক্ষ আয়াসের জামাতা। আর শের খাঁ স্বয়ং একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁকে তাঁর উপযুক্ত পদ দেবার জন্য আগ্রায় ডেকে পাঠিয়েছিলাম"।

রেবা। তাঁর স্ত্রীর প্রতি তোমার এতটুকু আসক্তি নাই ?—ভেবে দেখ ?

"মহাপাপ! তাই চিন্তিত হই। চিন্তিত হই আমার জন্য নয় নাথ। চিন্তিত হই তোমারই জন্য!"—স্বামীর ভবিষ্যৎ অশুভ আশঙ্কায় সতী স্ত্রী আকুলিত স্বামীকে সতর্ক করিতে ব্যস্ত!—এ বেশ কথা!—



জাহাঙ্গীর রেবার এই চাপান গানের উত্তরে যাহা বলিলেন, তাহা চাপানের উপর গেল!—"রেবা, তুমি আমার জন্য যেমন সদাসর্ব্বদা চিন্তিত, সেই রকম আগ্রহে যদি আমায় ভালবাস্‌তে পার্ত্তে।"

স্বামী নিজের কৈফিয়তের অছিলায় পত্নীর উপর যে 'চার্জ্জ' দিলেন, পত্নী তাহা মানিয়া লইয়াই যেন বলিলেন,—"স্বামী! এখনও সেই কথা" ?

রেবার এই উত্তরে বুঝা গেল, রেবা দোষ স্বীকার করিতেছেন, কিন্তু জবাবটা সরল হইল না দেখিয়া স্বামী সোণায় সোহাগা লাগাইয়া গলাইবার আয়োজন করিলেন,—পত্নীর প্রতি সোহাগ জানাইয়া বলিলেন, "কেন নয় রেবা ? সে দিন আমি যেমন তোমার প্রণয়-ভিক্ষু ছিলাম, আজও সেই রকম তোমার প্রণয় ভিক্ষু আছি। সেই জীবনের রহস্যময় প্রভাতে আমি তোমার হৃদয়তীর্থের উদ্দেশে যাত্রা করেছিলাম, কাছেও এসেছিলাম। কিন্তু তার মধ্যে প্রবেশের অধিকার পাই নাই।"—

দারোগা সাহেব চোরের নাভিতে ঘুর্‌ঘুরে পোকা বাঁধিয়া দিলে সে যেমন দোষ স্বীকার করিতে পথ পায় না—প্রণয়-প্রত্যাখ্যাত নিরাশ স্বামীর চির আক্ষেপের কথা শুনিয়া চির-অভিমানিনী পত্নী সেইরূপে আপনার দোষ মানিয়া লইয়াই উত্তর দিলেন,—"প্রভু কতবার বলেছি, আবার বল্‌তে হবে ?—আমাদের এ কি বিবাহ ? না, একটা রাজনৈতিক বন্ধন মাত্র ? হিন্দু আর মুসলমান মেশাবার জন্য আপনার পিতার একটি জাতীয় উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র। সে উদ্দেশ্য মহৎ, তার জন্য আমরা দুজনেই নিজের সুখ বিসর্জ্জন দিতে বসেছি। রাজার কর্ত্তব্য বড় কঠোর। সে কর্ত্তব্য সাধন কর্ত্তে যদি না পার নাথ, তা হলে এ সাম্রাজ্য একখানি মেঘের প্রাসাদের মত আকাশে বিলীন হয়ে যাবে, না প্রভু, আমাদের এ জন্ম দুঃখের! তবে সেই দুঃখ পরের জন্য বহন কর্চ্ছি, সেই আমাদের সুখ!"—দ্বিজেন্দ্র বাবুকে এইখানে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাস্য আছে ? তিনি কি দেখাইতে চাহেন ? রেবা হিন্দু রমণী—পিতৃদত্তা কন্যা ; যাহাকে স্বামী বলিয়া পিতা দিয়াছেন,—তাহাকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ মাত্র করিয়াছেন তিনি তাঁহাকে মুসলমান বলিয়া, বিধর্ম্মী বলিয়া ভালবাসিতে পারেন না।—এই কি ? তা' যদি হয়, তবে হিন্দুপত্নীর আদর্শ কোথা ? প্রণয় কি জাতিভেদের অপেক্ষা

রাখে? হিন্দুরমণীর হিন্দু-আচারের প্রতি মমতা থাকিতে পারে আর তাহা থাকিত বলিয়াই হিন্দু মহিষীরা মুসলমানের অন্তঃপুরে থাকিয়া, ফুল জল নৈবেদ্য দিয়া মূর্ত্তি পূজার অধিকার পাইতেন। এ পক্ষে মুসলমান বাদ্‌শার উদারতা অক্ষুণ্ণ ছিল, কিন্তু তাই বলিয়া কোনও হিন্দু মহিষী যে অপ্রণয়ী ছিলেন, মনে মনে বিধর্ম্মী বলিয়া স্বামীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিতেন, তাহাত কোন ইতিহাসে লেখে না। স্বামীকে বিবাহিত পুরুষমাত্র ভাবিব, কিন্তু তাহার প্রণয় উপেক্ষা করিব, হিন্দু স্ত্রীর এরূপ চিত্র কেহ কখন আঁকেন নাই। তারপর জাহাঙ্গীরের কথা যদি সত্য হয় যে,—তিনি আকুল প্রাণে প্রণয়পূর্ণ হৃদয়ে রেবাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু রেবা সে অতুল প্রণয় উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে হৃদয়ে প্রবেশ করিতে দেয় নাই, তাহা হইলে, রেবার দোষেই আজ জাহাঙ্গীর নিরাশ-হৃদয়ে অন্যত্র প্রণয়ের প্রতিদান পাইবার আশায় ছুটিয়া চলিয়াছেন! রেবার প্রত্যাখ্যানেই জাহাঙ্গীর আজ লম্পট, পরস্ত্রীলোলুপ, কামুক হইয়া পড়িয়াছেন বলিতে হইবে। হায় দ্বিজেন্দ্র বাবু, অভাগিনী রেবার উপর—সমাজ পরিত্যক্তা ভগবান দাসের কন্যার উপর তোমার এতটা আক্রোশ কেন? রেবা আকবরের এত বড় 'policy' বুঝিয়া ছিলেন, তাহা অতি মহৎ বলিয়া মানিয়া স্বার্থত্যাগ করিয়া গৃহসন্ন্যাস আরম্ভ করিয়াছিলেন, আর হায়! শুদ্ধ হিন্দু আভিজাত্যের গরিমায় স্বামীর প্রাণভরা প্রেম তুচ্ছ ভাবিয়া ফেলিয়া দিলেন—তাহার ভবিষ্যৎ কুফলটুকু বুঝিলেন না কেন? আর যদি বুঝিয়াই থাকেন, তবে আজ স্বামীকে যে জন্য সাবধান করিতে আসিয়াছেন, তাহার সার্থকতা থাকে কোথায়? যাহা হউক, এ সকল অসামঞ্জস্য থাকিলেও আমরা এ দৃশ্যটি পড়িয়া তৃপ্ত হইয়াছি। কারণ মোটের উপর দৃশ্যটি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। গ্রন্থকার যে ভাব ফুটাইতে চাহিয়াছেন, তাহা ভুল হইলেও, ফুটিয়াছে ভাল, সুতরাং দৃশ্যটি বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। ইহার পর এই দৃশ্যে খসরুকে জাহাঙ্গীর ও রেবা পিতা ও মাতা উভয়ে ভবিষ্যতে বিদ্রোহাচরণ না করিতে উপদেশ দিয়া নিরস্ত করিলেন। রেবা পুত্রকে শপথ করাইয়া লইলেন—হিন্দু হিসাবে—স্বপদ স্পর্শ করাইয়া,—শপথ করাইলেন; কিন্তু মুসলমান পুত্র রাজ্যলোভে অন্ধ হইয়া সে শপথ রক্ষা করিতে পারে নাই তাই কি গ্রন্থকার তাহাকে ঘাতকের



হস্তে অপঘাতে সন্দেহাকুলিত অবস্থায় মারিয়াছেন? যাক্, পুত্র শপথ করিয়া চলিয়া গেলে, রেবা বলিলেন—অবশ্য ইহা স্বগত বাক্য এবং কোন সহচর নটনটীর সমক্ষে উচ্চারিত হয় নাই,—"মায়ের এত সুখ! সন্তানের শুভ কামনা করেই মায়ের এত সুখ!" এইখানে দৃশ্য শেষ। তাই কি?—না, পুত্রকে বলিবা মাত্র সে বশ্যতা স্বীকার করিয়া শপথ করিয়া পাপ আশা পরিত্যাগ করিল—তাই মাতা তৃপ্ত, নিশ্চিন্ত এবং তজ্জন্য সুখী! কোনটা সুখের কারণ? সন্তানের মঙ্গলকামনা মাতৃহৃদয়ের সহজাতবৃত্তি সেটা সুখের কারণ নহে। সেই বৃত্তির অনুকূল কার্য্যজনিত তৃপ্তিই সুখ। দয়াই সুখ নহে—দয়া করিয়া যে আত্মপ্রসাদ লাভ হয়—তাহাই সুখ। এখানেও সেইরূপ—রেবার সুখ পুত্রের মঙ্গলকামনায় নহে—পুত্রের বাধ্যতায়। তারপর এ দৃশ্যের শেষেও গ্রন্থকার কর্ত্তৃক কোন নিয়োগের উল্লেখ নাই। রেবার অভিনেত্রী ঐ কথাগুলি বলিয়া চলিয়া যাইবে, কি পূজা করিতে সেই গৃহে বসিয়া পড়িবে, তাহার কোন নির্দ্দেশ নাই। আর এক কথা, রেবা এ দৃশ্যে স্নান করিয়া পূজাপাত্রহস্তে আসিয়া কি সুবিধা করিল? পূজার সজ্জায় ক্ষৌমবস্ত্রপরিহিতা আলুলায়িতকেশা কোন সুন্দরী অভিনেত্রীর সৌন্দর্য্য প্রদর্শন ব্যতীত প্রাতঃকালে এরূপ দৃশ্য সংযোজনার উদ্দেশ্য কি? পাত্র পাত্রীর মুখে তাহার কোন আভাস পাই না। নিয়োগপটু কবিও কোথাও এরূপ বেশভূষার নিয়োগচাতুর্য্য বর্ণনা করেন নাই। তবে এরূপ অনর্থক আড়ম্বরের প্রয়োজন কি? দৃশ্যে যে বিষয়ের কথোপকথন হইয়াছে, তাহা বরং 'প্রাক্কের' ঘটনাই হইতে পারে না কারণ, প্রাতঃকালে নমাজের পর মুসলমান বাদ্‌শারা দরবারে বসিতেন,—তখন পত্নীর সহিত পুরাতন প্রেমের দুটা কথা কহিয়া সময় নষ্ট করিবার 'ফুরসৎ' তাঁহাদের থাকিত না। খসরুকে দমন করাটা একটা অনর্থক আড়ম্বরমাত্র, উহাদ্বারা নাটকের কোন ভবিষ্যৎ কার্য্যেরই সুবিধা হয় নাই। এই সকল কারণে এ আড়ম্বরটা ভাল লাগিল না।

তাহার পর তৃতীয় দৃশ্য—একটা মাঠে বসিয়া কতকগুলি নাগরিক গল্প করিতেছিল, আর রৌদ্র পোহাইতে ছিল। ইহাদের আলোচনার বিষয়—ব্যাঘ্রের সঙ্গে শের খাঁর রিক্ত হস্তে যুদ্ধ ও তাহাতে জয়লাভ। এই দৃশ্যটি রচনা করিয়া

নাটককার শের খাঁর আগরা আগমন ও তাহার আনুসঙ্গিক কয়টি ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন। একটি নাগরিকের নাম তিনি 'আবুহোসেন' দিয়াছেন, ইহা ভুল,—গিরীশ বাবু তাঁহার সুবিখ্যাত প্রহসনের নায়কের নাম 'আবুহোসেন' দিয়া ইচ্ছা করিয়া যে ভুল করিয়াছেন। *

দ্বিজেন্দ্র বাবু সুপ্রসিদ্ধ 'হাসির গানের' কবি। রসিকতা তাঁহার একচেটে বলিয়া অনেকের ধারণা। তাঁহার নিজেরও সে বিষয়ে কতটা দৃঢ় বিশ্বাস আছে তাহা জানি না; কিন্তু এই তিনি আগরার এই কয়টা সামান্য সহরেলোকের মজ্‌লিসে যে ইয়ারকি ঢুকাইয়া পাঠকও দর্শককে হাসাইতে চাহিয়াছেন, সে ইয়ারকিতে হাসি, রস, কি পরিমাণ আছে, তাহা যদি আমরা একটু ওজন করিয়া দেখি, তাহাতে হয়ত কাহারও আপত্তি হইবে না।

যখন ইহারা কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, তখন 'বন্দররাজ,' আখ্যায় অভিহিত এক ব্যক্তি সেই দিকে আসিতেছিলেন। এই বন্দররাজটি যে কি পদার্থ তাহা সমগ্র 'নূরজাহান' নাটকখানির কোথাও কবি আমাদিগকে বলিয়া দেন নাই। 'বন্দর রাজ' শব্দটি যে ব্যক্তির নাম নহে, তাহা সর্ব্বত্রই বুঝা যায়, 'বন্দর' নামক স্থানের অধিপতি অথবা কোন বন্দরের প্রধান রাজ কর্ম্মচারী ( Harbour-Master, Port-Commissioner ) তাহা বুঝা যায় না। দিল্লীর বাদ্‌শাগণের খাস-দখলে কোন বন্দর ছিল না বলিয়াই জানি। বঙ্গদেশ গুজরাট ও উড়িষ্যার বন্দরগুলি নবাবসুবাদারদিগের অধীন ছিল, সুতরাং কোন বন্দরের প্রধান কর্ম্মচারীকে দরবারে উপস্থিত করাটা ঐতিহাসিক নাটকের কবির পক্ষে একটা দুষনীয় ব্যাপার হইয়াছে। তারপর যে পাঁচজন লোক বসিয়া গল্প করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে কেরামৎ নামক একব্যক্তি বন্দররাজকে আসিতে দেখিয়া বলিল,—"ঐ বাঁদরের রাজা আস্‌ছে, পালা পালা সব",—'বন্দর' হইতে 'বাঁদর' অপভ্রংশ কল্পনা করিয়া হাস্যরসের প্রসিদ্ধ কবি ইয়ার'কির আসর বন্দনা করিয়া লইলেন, এবং আশা করি

* ইচ্ছা করিয়াই বটে, কারণ আরব্যোপন্যাসের যে 'নিদ্রোত্থিতের কথা' হইতে ঐ প্রহসনের গল্প ভাগ তিনি লইয়াছেন, তাহার নাম, কি ইংরাজী অনুবাদে, কি বাঙ্‌লা অনুবাদে 'আবু হোসেন' আছে, কোথাও 'আবুহোসেন' নাই, কাজেই দ্বিজেন্দ্র বাবু ইচ্ছা করিয়া সেই ভুল নকল করিয়াছেন।



লন, দর্শক পাঠকেরা এই পাতনামা শুনিয়াই হাসিতে আরম্ভ করুন। তাঁহারা হাসিবেন নিশ্চয়, তবে তাহা ইয়ারকির পাকা বোলের চোটে, না, কবির বলিহারী উদ্ভাবনী শক্তির প্রভাবে, তাহা আমরা বলিতে পারি না—ইহাতে মজা আরও একটু বেশী এই যে, এই রহস্যকারী ব্যক্তিগণই বন্দররাজের বিশ্বস্তচর—বেতন বা পুরস্কারভোগী ভৃত্য!—একটা জলজীয়ন্ত মানুষকে তাহার প্রিয়, বিশ্বাসী অনুচরেরা 'বাঁদরের রাজা' বলিলে হাসি ফুটে কি না, তা আমরা বুঝিতে পারি না,—কবি তাহার আকৃতিগত কোন বিকৃতির পরিচয়ও কোথায় দেন নাই। প্রকৃতিগত বিকৃতির জন্য ঘৃণা হয়, হাসি পায় না,—আর কবি তাহাও তখনও প্রকাশ করেন নাই। তৃতীয় পুরবাসী একবার গম্ভীরভাবে বলিল—"কতকটা বানরের মত দেখ্‌তে বটে"—কৌতুকের কথা কৌতুক করিয়া—কৌতূহল জাগাইয়া না বলিতে পারিলে যে তাহাতে কেহ হাসে, এমন আমরা দেখি নাই। কোন কোন সরস বাক্য স্থানকাল পাত্র বিশেষে গম্ভীরভাবে উচ্চারিত হইলে, মহা কৌতুককর হয় বটে, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রবাবু এস্থলে এই বাক্যটি সেভাবে প্রয়োগ করেন নাই, কারণ ইহার উত্তরে পঞ্চম পুরবাসী ( সেহ চর ) বলিল,—"কিন্তু মানুষ খায়"—এউত্তরে এ অসম্ভব কথায় কাহারও মনে হাসি বা কৌতুক তো উঠিতেই পারে না,—ভয়ও আসে না ( কারণ কেহই কাঁচছেলে নয়; ) আসে কেবল অসম্ভব প্রস্তাবের জন্য একটা নিকৃষ্ট শ্রেণীর বিস্ময় যুক্ত বিরক্তি মাত্র। তারপর পঞ্চম পুরবাসী বলিল,—"কিষ্কিন্ধ্যা থেকে এসেছে" একজন সন্দেহ করিয়া বলিল, "সত্যিনাকি"? পঞ্চম পুরবাসী তাহার বিশ্বাসের জন্য বলিল,—"কুম্ভকর্ণের নাতি"। দ্বিতীয় পুরবাসী ভয় পাইয়া বলিল "ওরে বাবা"। পঞ্চম পুরবাসী তাহার ভয়ের মাত্রা বাড়াইবার জন্য বলিল,—'গোঁফ দেখ্‌ছ না"। তৃতীয় পুরবাসী বলিল,—"তাওতো বটে"। পঞ্চম পুরবাসী তখন ভয় বাড়াইয়া ও জীবনের আসন্ন বিপদ বুঝাইবার জন্যই বলিল—"পালা পালা"। তখন সকলে "পালা পালা" বলিয়া পলায়ন করিল!—বেশ-তা বলুক্—কিন্তু বলি—রহস্য রসিক, হাসির গানের কবি, সুকৌশলী নাট্যকর এই কথোপকথনে কি রস, কি রহস্য, কি কৌশল রচনা করিয়াছেন তা আমরা খুঁজিয়া পাইলাম না।

নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানের মধ্যে রামায়ণের রাক্ষস বানরের কথা অবতারণা

করিলে ৺দীনবন্ধু মিত্রের কথিত 'অদ্ভুত রস' ব্যতীত আর কোন রসের উদ্দীপন হয় কি,—হইতে পারে কি? তার পর কিষ্কিন্ধ্যা থেকে কুম্ভকর্ণের নাতি এলে যে 'বাঁদরের রাজা' হয় না রাক্ষসের বোনাই হয়—তা আগ্রাবাসী সামান্য ইতর মুসলমানেরা কি বুঝিবে? আর গোঁফের দীর্ঘত্ব স্থূলত্ব প্রভৃতি শিশুর নিকট ভয়ের বিষয় হইতে পারে; কিন্তু শিশুর পিতৃ পিতামহেরা তাহাতে ভয় পাইবে কেন? কিষ্কিন্ধ্যা থেকে কুম্ভকর্ণের নাতির আগমনের কল্পনা—রামায়ণের সুপ্রসিদ্ধ কবিতা

"দ্রৌপদী কাঁদিয়া কহে বাছা হনুমান,
কহ কহ কৃষ্ণ কথা অমৃত সমান ॥
পরীক্ষিৎ কীচকেরে করিয়া সংহার।
সিংহাসন অধিকার করিল লঙ্কার ॥

প্রভৃতি কবিতার অনুকরণে যদি করা হইয়া থাকে তবে এত বড় নিষ্ফল অনুকরণের দ্বিতীয় উদাহরণ আর দেখা যায় না। রসিককবি দ্বিজেন্দ্রনাথ রসোদ্ভাবনের নিমিত্ত এখানে যে কয়টি শব্দ লইয়া চেষ্টা করিয়াছেন, আমরা দেখিতেছি, মুসলমানের দন্তে পিষ্ট করিয়া তাহাদের নিঙ্‌ড়াইয়াও একবিন্দু রস বা হাসি বাহির করিতে পারেন নাই।

ইহার পর বন্দররাজ কেরামৎকে হাতীর চাপনে কি করিয়া শের খাঁর পায়ে ভাঙ্গিয়া তাঁহাকে হত্যা করিতে হইবে, তাহার উপদেশ দিয়া বিদায় দিল।—এ কার্য্যের উদ্দেশ্য বন্দররাজ নিজেই প্রকাশ করিল—

"সম্রাট কি খুসীই হবেন, যখন জানবেন যে আমি নিজে থেকে শের খাঁকে তাঁর পথ থেকে সরিয়েছি। সে দিন রাত্রে সম্রাট আমাদের সম্মুখে যখন বল্লেন যে "শের খাঁ বাঘের সঙ্গে লড়ায়ে জিতেছে, তাতে আমি খুসী হয়েছি বটে, কিন্তু যদি বাঘ জিত্‌তো তাতে আরো খুসী হতাম"—তখন তার মানে বুঝতে আর আর আমার বাকী রইল না।—বাদশাহ আমার উপর কি খুসীই হবেন। উঃ কি খুসীই হবেন।"

দ্বিজেন্দ্রবাবু নাটকের মধ্যে এই রকম কয়েকটি কার্য্য নির্ব্বাহের জন্যই এই কর্ম্মচারীটি নিযুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু লোকটা যে কে তাহার পরিচয় কোথাও দেন নাই।

ইহার পর চতুর্থ দৃশ্য। এই দৃশ্যে আগ্রার বাসায় বসিয়া মেহেরউন্নিসার



দিনের স্ত্রীর সহিত কথা কহিতেছিলেন। এই রমণী মেহেরের বিশ্বাস পাত্রী, হের সেদিনকার হস্তিপদতলে শের খাঁর দলিত হবার বিবরণ বলিতেছিলেন। দিন যখন তিনি গবাক্ষ দিয়ে মৃগয়া হইতে সম্রাটের প্রত্যাবর্ত্তন দেখিতেছিলেন, ই সময়ে বন্দররাজের দুষ্টামীতে ঐ কাণ্ড ঘটে, কিন্তু শের খাঁ কৌশলে ক্ষত-ক্ষত দেহে হস্তিপদতল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বাসায় ফিরিয়া আসেন। এই টনা বর্ণনা করিতে করিতে মেহের বলিলেন,—গবাক্ষে "গিয়ে দেখ্‌লেম কটা মহাসমারোহ। সম্রাট্ তার মধ্যে ঘোড়ায় চড়ে'। তিনি হঠাৎ উপরদিকে াইলেন। আমাদের চোখোচোখী হ'ল। বোধ হল, সম্রাটের মুখ উজ্জ্বল হাল। আমার ধমনীতে উষ্ণ রক্তস্রোত বৈল। আমি রোষে ক্ষোভে লজ্জায় রে এলাম। তার পরেই স্বামী আমার ঘরের মধ্যে ক্ষতবিক্ষত দেহে এলেন। ামায় দেখে জিজ্ঞাসা কল্লেন "কি হয়েছে মেহের?"—তাঁর দুস্বর ভৎর্সনার চেয়ে কর্কশ বোধ হল।

কবি মেহেরউন্নিসার এই রোষ ক্ষোভ ও লজ্জার কারণ কোথাও ব্যাখ্যা করেন াই, কাজেই বুঝিতে পারিলাম না মেহেরের এ সকল ভাব পরিবর্ত্তনের কারণ ক?—আর একটি কথা,—শের খাঁর "দুস্বর ভৎর্সনার চেয়েও কর্কশ"—ইহার র্থও বুঝা গেলনা। মহীউদ্দীনের স্ত্রী ইহার উত্তরে বলিলেন,—"তুমি যখন ম্রাট্‌কে আগে থেকে ভালোবাস্‌তে, তখন শের খাঁর স্ত্রী হতে তোমার স্বীকার ওয়াই অন্যায় হয়েছিল।"—এই উত্তর হইতে মহীউদ্দীনের স্ত্রীর ন্যায় আমরাও দি সন্দেহ করি যে, সম্রাটের সঙ্গে চারি চক্ষুর মিলন হওয়াতে মেহেরের জ্জা এবং মেহেরকে এতদিন সম্রাজ্ঞী না করার জন্য ক্ষোভ ও তজ্জনিত রোষ ইয়াছিল,—তাহা হইলে অন্যায় হয় কি?—কিন্তু মেহের ইহার উত্তরে যখন লিলেন,—"না আমি সম্রাট্‌কে ভাল বাসি নাই।"—তখন আর ইহার উপর রূপ কথা বলা চলে না। "স্বীকার হওয়া"—মেহেরের পক্ষেও যেমন অন্যায় —দ্বিজেন্দ্র বাবুর পক্ষেও তেমনি অন্যায় বলিয়া আমরা বুঝি;—ইহার পরি-র্ত্তে "স্বীকৃত হইলে" বা "স্বীকার করিলে" বড় ভাল হইত—ব্যাকরণটাও চিয়া যাইত। *

* দ্বিজেন্দ্র বাবুর বাক্য বিন্যাস ও ব্যাকরণ গত দোষ অনেক আছে, সেগুলি আমরা এখন রিয়া দেখাইতেছি না।

তারপর মেহের সখীর নিকট সেলিমের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ কিরূপে হয়, কি কৌশলে তিনি নাচিয়া গাহিয়া, রূপ যৌবন দেখাইয়া, মুখের ঘোম্‌টা খুলিয়া সেলিমকে বিত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা করিলেন। মহীউদ্দীনের স্ত্রী সব শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তবে তোমার এখনও তাঁর প্রতি আসক্তি আছে?" মেহের উত্তর করিল—"না, তাকে আসক্তি বলে না।—সে একটা উদ্দাম প্রবৃত্তি। হয়ত উচ্চাশা—হয়ত অহঙ্কার। কিন্তু আসক্তি নয়।"—সখীর কাছে মান রাখিতে গিয়া মেহের যে বাক্‌চাতুরীই করুন না কেন, সেটা যে তাঁহার আবাল্যসঞ্চিত আসক্তি ভিন্ন আর কিছুই নয়, পাঠকগণ তাহার আভাস, এ নাটকের প্রথম দৃশ্যে তাঁহার নিজের স্বগতোক্তির মধ্যেই পাইয়া আসিয়াছিলেন। এই দৃশ্যেও তিনি যে সে কথা না স্বীকার করিয়াছেন, এমন নহে। মেহের সখীর নিকট এত কথা ভাঙিতে বসিলেন কেন?—এক স্থানে মেহেরই সে কথা বলিয়াছেন—"তবে তোমাকে আজ বলি শোনো। কারণ তোমার কাছে আমি আজ উপদেশ চাই।"—কিসের উপদেশ?—প্রবৃত্তি দমন করিয়া স্বামীর ঘর করিবেন না, আকর্ষণী দ্বারা দিল্লীশ্বরের প্রেম আকর্ষণ করিয়া রঙ্‌মহলে গিয়া বেগম হইবেন?—দ্বিজেন্দ্র বাবু কি ইহাকেই "প্রবৃত্তির খেলা" বলিতে চাহেন।—বলেন, বলুন,—আমাদের আপত্তি নাই, কিন্তু এরূপ খেলায় মেহের উন্নিসার হাতের পাঁচ অর্থাৎ শেরখাঁর প্রতি প্রীতির অভিনয়টা বড় ভালরূপ বজায় থাকিতেছে না, বা এরূপ বিষয়ে অপরের পরামর্শ লইতে গিয়া মেহের নিজের বুদ্ধিরও খুব ভাল পরিচয় দিতে পারিতেছেন না। যে মেহের ইতঃপর পিতা ও ভ্রাতার কাছে নিজের সাম্রাজ্যলালসা চাপিয়া রাখিয়া, জাহাঁগীরকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, সে মেহের একটা স্ত্রীবন্ধুর কাছে এমন আল্‌গা হইয়া পেটের কথা ভাঙিবেন, ইহা একবারে অসম্ভব। দ্বিজেন্দ্র বাবু মেহেরের এ বন্ধু প্রীতি না আঁকিলেই পারিতেন, এই দৃশ্যটার নাটকীয় আবশ্যকতাও কিছু নাই, কারণ এ দৃশ্যে যাহা যাহা ঘটিল, তাহার বিস্তৃতি বা পরিণতি এ নাটকের কোথাও বর্ণিত হয় নাই। আমাদের মনে হয়, দ্বিজেন্দ্র বাবু মেহেরকে দিয়া—"না তাকে আসক্তি বলে না। সে একটা উদ্দাম প্রবৃত্তি। হয়ত উচ্চাশা হয়ত অহঙ্কার, কিন্তু আসক্তি নয়"—এই



কৈফিয়ৎ টুকু দেওয়াইবার জন্যই এই দৃশ্যটির অবতারণা করিয়াছেন, কিন্তু ইহার সহিত ঘটনাচক্রের আগাগোড়া বেশ সঙ্গতি রাখিতে পারেন নাই।

মহীউদ্দীনের স্ত্রী ঐ কৈফিয়ৎ শুনিয়াও উপদেশ দিল—"আমি বলি তুমি বর্দ্ধমানে ফিরে যাও। নৈলে তোমার ভবিষ্যতে শান্তি নাই। দূরে চলে গেলে আবার পুরাতনে মন বস্‌বে।"—মেহের এ কথা শুনিয়া "অর্দ্ধ স্বগত" ভাবে বলিল—"অথচ শের খাঁর মত স্বামী কার? বীর্য্যে ঔদার্য্যে পবিত্র চরিত্রে তাঁর মত কয় জন সংসারে আছে।"—মেহেরের এ কথা শুনিয়া এখনও কি দ্বিজেন্দ্র বাবু আমাদের বুঝাইতে চাহিবেন যে ইহা "আসক্তি" নহে,—"হয় ত উচ্চাশা হয়ত অহঙ্কার" আমাদের তো মনে হয় মেহেরের সম্পূর্ণ আসক্তি সেলিমের প্রতি ছিল, কেবল শেরখাঁ-রূপ বাধার জন্য সে ইতস্ততঃ মাত্র করিতেছিল। মহীউদ্দীনের স্ত্রীকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবার উদ্দেশ্যও আমাদের মনে হয়,—তাহার প্রাণের ইচ্ছার অনুকূল উত্তর লাভ;—কিন্তু তাহা যখন পাইল না—কারণ কোন ভদ্রলোক তাহা দিতে পারে না,—তখন সে মহা ভাবনায় পড়িয়া গেল, আর সে ভাবনা তাহার উত্তরে "অথচ" শব্দ দ্বারাই সম্পূর্ণ সূচিত হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্র বাবুও "অর্দ্ধ স্বগত" শব্দ দ্বারা অভিনেত্রীকেও সেই চিন্তাকুলতা অভিনয় করিতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, নতুবা বর্দ্ধমান যাইবার উপদেশ শুনিয়া ওরূপ উত্তর কাহারও মুখে আসে না।

এই দৃশ্যের পর শেরমেহের বর্দ্ধমানে চলিয়া গেলেন।

পঞ্চম দৃশ্যে জাহাঁগীর নিজের মনোভাব প্রকাশ করিয়া শেরখাঁর হত্যার জন্য বঙ্গদেশের সুবাদারকে উত্তেজিত করিতে বন্দর রাজকে পাঠাইয়া দিলেন। জাহাঁগীর এ দৃশ্যে বেশ ভাল চিত্রিত হইয়াছে। জাহাঁগীরকে রেবার নিকটে আমরা যে ভাবে সুচিত্রিত দেখিয়াছিলাম, এখানেও তেমনি সুচিত্রিত দেখিলাম। মনোবৃত্তির জটিলতা অপেক্ষা উদ্দেশ্যের স্থিরতা আঁকিতে দ্বিজেন্দ্র বাবু ভালই পারেন দেখা যাইতেছে।

ষষ্ঠ দৃশ্যে পাণ্ডুয়ার বাড়ীতে শের খাঁ ও মেহেরুন্নিসা বসিয়া আছেন,—তাঁহাদের কন্যা লয়লা একটা গান গাহিতেছিল।—গানটা শুনিয়া মেহের চটিয়া গেল। অপরাধ—গানটার ভাবের সঙ্গে মেহেরের বর্ত্তমান মনোভাবের মিল

আছে। তাই মেহের রাগিয়া কন্যাকে নিষেধ করিয়া দিলেন, "খবর্দ্দার আর এ গান আমার কাছে গেয়ো না। বুঝ্‌লে বালিকা?"—বালিকা স্বীকার করিল। নিষেধের অর্থ—মেহের তাঁহার মনের উপদ্রুত অবস্থার ছবি বাহ্যে ভাবে, ভাষায় বা গানে প্রকাশ হইতে দিতে চাহেন না,—তাই এ সাবধানতা। ইহাই বোধ হয় তাহার সৃষ্টিকর্ত্তার তথাকথিত "অন্তর্বিদ্রোহের" একটি দৃশ্য। তারপর মাতৃমুখে "বুঝ্‌লে বালিকা" সম্বোধনটা আমাদের কেমন লাগিল?—ইহা না নাটকীয় মুসলমান পাত্রপাত্রীর ব্যবহারসঙ্গত, না হিন্দু গ্রন্থকারের সমাজসঙ্গত, না বাঙালী কবির দেশপ্রথাসঙ্গত,—ইহা খাঁটি ইংরাজী সম্বোধন, এরূপ সম্বোধন পড়িলেই ইংরাজী নভেলের "Understand me, you naughty girl মনে পড়ে, তাহার পর যে আশঙ্কার অন্তর্বিদ্রোহ বাহ্যে চাপিয়ে গিয়া মেহের এখানে যে চেষ্টা করিলেন সে চেষ্টা যে ব্যর্থ হইয়াছিল, তাহা শেরখাঁর কথায় আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি।

মেহের কন্যাকে শাসন করিয়া উপদ্রুত মনোভাব স্বামীর সমক্ষে লুকাইবার জন্য জানালার ধারে উঠিয়া গেলেন। কিয়ৎপরে শের খাঁ ডাকিলেন "মেহের!" মেহের আসিয়া যে ভাবে স্বামীর কাছে বিনয় জানাইলেন, তাহা সম্পূর্ণ ইংরাজী। মেহের বলিলেন,—"নাথ, রুক্ষ হয়েছিলাম ক্ষমা কর।" হায়! এমনটা হয় কেন? এরূপ অবস্থায় কি এদেশের উপযোগী মুসলমান্ সমাজের উপযোগী কথা পাওয়া যায় না?

তাহার পর দুই চারিটা কথা কহিয়া শের খাঁ বলিলেন,—"মেহের, নিশ্চয় কিছু হয়েছে। নিশ্চয়ই একটা কোন চিন্তা কীটের মত তোমার অন্তরে প্রবেশ করেছে। সে কি চিন্তা প্রিয়তমে! আমায় বল। আমি তোমার স্বামী।—আমায় বল্‌বে না?" মেহের উত্তরে বলিল—"নাথ, আমার বল্‌বার কিছুই নেই। ঘুমাও নাথ অনেক রাত্রি হয়েছে। আমিও যাই, লয়লা একলা আছে।"—এই বলিয়া যেন ছেলে ভুলাইয়া মেহের চলিয়া গেল। মেহের চলিয়া গেলে শের খাঁ আপনা আপনি বলিলেন,—"আগ্রা থেকে পাণ্ডুয়া আসা অবধি মেহের আরও অধীর হয়েছে। কথায় কথায় হঠাৎ বিচলিত হয়, আবার পরে অনুনয় করে। কি হয়েছে আমার মেহেরের?—জিজ্ঞাসা কর্‌লে



বিশেষ কোন উত্তর দেয় না।—আমার সুখের সংসার একি হয়ে গেল?"—শের খাঁকে একলা রাখিয়া তাহার মুখ দিয়া এখানে এই ন্যাকামিটুকু করানো কবির পক্ষে একান্ত ধৃষ্টতা, কারণ শের খাঁ এ অধীরতার কারণ সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ। তাহা আমরা পরে দেখাইব। বৈষ্ণব কবিরা রাধার এইরূপ উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা বর্ণনা করিয়া অনেক পদ রচনা করিয়াছেন কিন্তু তাহার সকল গুলিই সখীর উক্তি—একটিও নায়কের উক্তি নহে, কাজেই সেগুলি বিসদৃশ হয় নাই। তাহার পর সেগুলি দ্বারা পরস্পরের নিকট অবস্থা গোপনের চেষ্টা বুঝা যায়, কিন্তু এখানে একা নায়কের মুখে—অবস্থাভিজ্ঞ, সুপরিজ্ঞাত রহস্য, নায়কের স্বগত এরূপ জল্পনা—অতি বিসদৃশ হইয়াছে। সম্রাট্ যে তাঁহার পত্নীর প্রতি লোলুপ, আর তাঁহার লালসা চরিতার্থতার জন্যই যে আগ্রায় তাঁহার অত বিপদ গিয়াছে,—তাহা আসিবার সময় আসফ খাঁ তাঁহাকে বিশেষ করিয়া এই নাটকের মধ্যেই বলিয়া দিয়াছেন। মেহেরের এ ভাবের অধীরতা যে আগ্রা যাইবার পূর্ব্বেও ছিল, শেরখাঁও যে তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহা প্রথম দৃশ্যেই আমরা দেখাইয়া আসিয়াছি; আর তাহা যে হিষ্টিরিয়া নহে শের খাঁ তাহাও বুঝিতেন।

সপ্তম দৃশ্যটী খসরুর বিদ্রোহের ষড়যন্ত্রের একটা অনাবশ্যক দৃশ্য মাত্র। ইহাতে খসরুর দলস্থ লোকদিগকে প্রথম ষড়যন্ত্রকারী, দ্বিতীয় ষড়যন্ত্রকারী, তৃতীয় ষড়যন্ত্রকারী ইত্যাদি রূপে পরিচিত করা হইয়াছে। নাটকে এ কিরূপ ব্যবস্থা? জাহাঁগীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভারতের সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করিতেছেন, অথচ তাঁহার দলে একজনও নাম করিবার মত পদস্থ, ক্ষমতাশালী ব্যক্তি নাই, যেন কোন বনমধ্যে ভাঙামন্দিরে দস্যুদলের পরামর্শসভা! ছি!—এই কি ঐতিহাসিক নাটকের উপযুক্ত দৃশ্য! ইতিহাস খুঁজিলে দ্বিজেন্দ্র বাবু অনেক নাম পাইতেন।

অষ্টম দৃশ্যে বর্দ্ধমানের বাড়ীতে গবাক্ষে নুরজাহান দাঁড়াইয়া আছেন। এই জানালায় দাঁড়াইয়া তিনি স্বগত বাক্যে তাঁহার সৃষ্টিকর্ত্তার সমস্ত কৌশল ব্যর্থ করিয়া, আমাদের আর্‌জীর অনুকূলে মোকর্দ্দমার ডিক্রী দিতেছিলেন; তিনি বলিতেছেন—

"তখন বুঝিনি যে সে প্রবৃত্তি চাপা ছিল মাত্র, মরে নি। স্ফুলিঙ্গ ছাই ঢাকা ছিল, নিভে যায় নি। সেই স্ফুলিঙ্গ নূতন ইন্ধন-সংযোগে আবার ধোঁয়াচ্ছে; ভগবান্, নারীর হৃদয়কে এতটা দুর্ব্বল করেছিলে! এই প্রবৃত্তিটাকে দমন কর্ত্তে পারছি না।"—

পাঠক! প্রথম হইতে আমরা যে সন্দেহ করিয়া আসিতেছিলাম, তাহা কড়ায় গণ্ডায় সত্য, তাহা এখন মিলাইয়া পাইলেন,—আর মেহের আগ্রায় মহীউদ্দীনের স্ত্রীর নিকট "না তাকে আসক্তি বলে না" বলে যে খেলাপ এজেহার দিয়াছিলেন, তার কবুল জবাব হাতে হাতে বুঝিতে পারিয়াছেন বোধ হয়! দ্বিজেন্দ্র বাবুও যে অন্তর্বিদ্রোহের ছবি দেখাইবার জন্য মহা আড়ম্বর করিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলেন তাহা যে কিছুই হয় নাই, মেহের যে একই লক্ষ্যে জীবন তরী ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে, আর শের খাঁ রূপ বাধাটার জন্য মাঝে মাঝে কাতর ও অধীর হইয়া পড়িতেছে, ইহা আর কি অস্বীকার করিবার উপায় আছে? "প্রবৃত্তিটাকে দমন কত্তে পাচ্ছিনা" বলিলেই চেষ্টার পরিচয় দেওয়া হয় না।—ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন দৃশ্যে আমরা সে চেষ্টার কোন নিদর্শন পাই নাই, কেবল যতবার শের খাঁ তাঁহার অধীরতার কথা পাড়িয়াছেন, ততবারই তিনি আসল ব্যাপার লুকাইবার জন্য, প্রবৃত্তি দমনের জন্য নহে, স্বামীর সম্মুখ হইতে সরিয়া গিয়াছেন মাত্র।

শের খাঁ যে মেহেরের হৃদয়ের অতি নিভৃত স্থলে লুক্কাইত, এই বাদ্‌শাহ্ প্রেমের কথা স্পষ্টই জানিতেন,—তাহাও তিনিও এই দৃশ্যেই স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,—

"মরি যদি মর্ব্ব—সেও তোমার জন্য। (গদ্গদস্বরে) তোমার জন্য মরেও সুখ আছে। আর এক কথা বল্‌ব মেহের—না, বলেই ফেলি। আমি মর্ত্তেই চাই।"

মেহের। কেন নাথ?

শের। শুন্‌বে কেন? আমি বুঝেছি, আমি জেনেছি; আমি সেটা মর্ম্মে অনুভব করেছি যে—তুমি আমায় আর ভালবাসো না।

মেহের। বাসি না?

শের। না। আমি সেটা তোমার চাহনিতে, ক্ষীণহাস্যে, ভগ্নস্বরে, তোমার ঐ "বাসি না" প্রশ্নে টের পাই। আমার বিশ্বাস যে আমার সঙ্গে বিবাহে তুমি সুখী হও নি।

নুরজাঁহা (নীরব)



শের। কোথায় তোমার জাহাঁগীরের বেগম হবার কথা, কোথায় তুমি সম্রাটের দাসের দাস শের খাঁর দাসী হয়েছ * * *।

মেহের। আমি কখনও কি সে কথা বলেছি।

শের। না, বলনি। তবু আমি বুঝি। * * * মেহের প্রেম শুদ্ধ বিশ্বাস আর সেবা চায় না। এ বিশ্বাস অন্তরের।"—ইত্যাদি।

এইরূপ আরও অনেক কথা আছে।—পাঠক বর্গের আর বোধ হয় সন্দেহ হইবে না যে শের খাঁ সারাজীবন মেহেরের এই প্রেমহীন ভাব লক্ষ করিয়া আসিয়াছেন, এবং তাহার কারণও অনুধাবণ করিয়াছেন, এই জন্যই আমরা পূর্ব্বদৃশ্যে যেখানে শের খাঁকে "কি হয়েছে আমার মেহেরের" "আমার সুখের সংসার এ কি হয়ে গেল"—বলিয়া যখন আক্ষেপ করিতে দেখি, তখন তাহা তাঁহার ন্যাকামি বলিয়াই বর্ণনা করিয়া আসিয়াছি, দ্বিজেন্দ্র বাবু এরূপ না করিলেই শের খাঁর ছবি বড় উজ্জ্বল থাকিয়া যাইত। পূর্ণ-দুগ্ধ কলসে গোমূত্র বিন্দু প্রক্ষেপের ন্যায় শের খাঁর সুন্দর চরিত্রে এই স্বগত বাক্যটুকু সর্ব্বনাশ করিয়াছে। এই দৃশ্যের শেষে শের খাঁ মেহেরের নিকট শেষ বিদায় লইয়া সুবাদারের সঙ্গে দেখা করিতে চলিয়া গেলেন,—মেহের দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া যাহা বলিলেন, তাহাতে আমাদের এবং পাঠক দর্শকের সকল সন্দেহ মিটাইয়া দিলেন—"স্বামী! যদি ভক্তি প্রেমের শূন্যতা পূর্ণ কর্ত্তে পার্ত্তো, তো, সে ভক্তি তোমার পায়ে ঢেলে দিতাম।"—আর কি? তবেই বলিতে হয়, মেহের প্রেমতো দেয়ই নাই, ভক্তিও করিত না,—কেবল বিবাহিত স্বামী বলিয়া সেবা করিয়া, বিশ্বাস রাখিয়া ঘর করিত মাত্র। হায়রে কবির তুলিকা? এই নিষ্ফল চিত্রের জন্য এত বড়াই! তারপর নবম দৃশ্যে কুতুবখাঁ ও শের খাঁর সাক্ষাৎ বর্ণনা। কুতুবের প্ররোচনায় এই দৃশ্যে উভয়ের মৃত্যু। প্রথম অঙ্ক এই খানে শেষ। (ক্রমশঃ)।

—:o:—

# জহ্নু-আশ্রম—গৈবীনাথ।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর। )

—:o:—

তীর হইতে প্রায় দুই শত গজ দূরে মন্দির। গ্র্যানাইট্ প্রস্তরের পাহাড়টী প্রায় একশত ফিট্ উচ্চ। নৌকাযোগে পাহাড়ের নিম্নে দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত অবতরণস্থলে উপনীত হওয়া গেল। এখানে অবতরণ করিবার এই একটী মাত্র স্থান আছে। তথা হইতে অসমতল, পাহাড়গাত্রে খোদিত প্রস্তরসোপানাবলী দ্বারা মন্দিরোপরি আরোহণ করিতে হয়। মন্দিরের পাদদেশে উপস্থিত হইয়াই আমি বন্ধুদের বলিলাম, "এখানে কোন বৌদ্ধ আছে কি না, তাহা আমাদের বিশেষ করিয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে।" এখানে প্রতি শিলাখণ্ডের গাত্রে পৌরাণিক হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি সন্দর্শন করিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় বৌদ্ধমূর্ত্তি কোথাও দেখিতে পাইলাম না। বর্ষাকালে এখানে আসা সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। সে সময়ে ভাগীরথী জলোচ্ছ্বাস এতদূর বর্দ্ধিত হয় যে মন্দিরের অনেক দূর পর্য্যন্ত জলমগ্ন হইয়া থাকে। সে সময়ে মহান্তকে বহুদিন পর্য্যন্ত মন্দিরে আবদ্ধ থাকিতে হয়। এখানে যে দিকে নয়ন ফিরান যায় সেই দিকেই পর্ব্বত গাত্রে খোদিতমূর্ত্তি ও শিলাখণ্ডে দেবদেবীর মূর্ত্তি পরিলক্ষিত হয়। মন্দিরটী পাষাণনির্ম্মিত, তদুপরি চূণকাম করা। হিন্দুমন্দিরের উপর যেরূপ ধ্বজা থাকে এখানেও সেইরূপ আছে। মন্দিরের কারুকার্য্যের বিশেষ প্রশংসা করা যায় না।

গঙ্গার প্রবল স্রোতে শিলাখণ্ডের কতকগুলি স্থানান্তরিত হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে, তাহাদের প্রকৃত স্থান কোথায় ছিল নির্দ্দেশ করা কঠিন। আবার শিলাগাত্রে অঙ্কিত মূর্ত্তি প্রখর রৌদ্রে ও প্রবল বর্ষায় এরূপ বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে, যে তাহাদের স্বরূপ নির্ণয় সহজসাধ্য নহে।

জঙ্গীরার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ পাশ্চাত্যভ্রমণকারীগণ অনেকেই নিজ নিজ রচিত ভ্রমণপুস্তকে ইহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অনেকে আবার

গৈবীনাথ— নারায়ণের অনন্ত শয্যা।

গৈবীনাথে সূর্য্যমূর্ত্তি।

*Printed by K. V. Seyne & Bros.*

মনোরম চিত্রও প্রকাশিত করিতেছেন। তাঁহাদের লিখিত বিবরণ হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করা গেল :—

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে লেফটেনাণ্ট্ কর্ণেল ফরেষ্ট্ সাহেব তাঁহার "A picturesque tour along the Ganges and the Jumna" পুস্তকে ১৪৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "A variety of sculpture comprising the principal Hindu deities, men and animals is seen covering the whole face of the cliff. The same may be observed on the opposite shore of Sultangunge. Some of the figures are to be ably executed, but the greater part are rudely and grotesquely designed and point out their origin to have been very remote."—পর্ব্বতগাত্রের সমুদায় স্থানেই নানা হিন্দুদেবদেবী, মনুষ্য ও অন্যান্য প্রাণীর মূর্ত্তি খোদিত আছে। সুলতানগঞ্জের অপরকূলেও সেইরূপ খোদিত মূর্ত্তি পরিলক্ষিত হয়। কতিপয় মূর্ত্তি সুন্দর ভাবে খোদিত কিন্তু অধিকাংশই শিল্পীর দক্ষতাপরিচায়ক নহে। তাহাদের পরিকল্পনাও উদ্ভট। এই মূর্ত্তিগুলির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই।

১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ১৫ই আগষ্ট তারিখে প্রকাশিত Grieves সাহেব "View of an Insulated Rock in the Ganges at Jangeerah" পুস্তকে যাহা লিখিয়াছেন তাহার সার মর্ম্ম এই—"ইহা হিন্দুদিগের একটী তীর্থস্থান। এখানে একটী ক্ষুদ্র হিন্দুমন্দির আছে। এই পর্ব্বতের উপর কোনও এক হিন্দু ফকিরের আশ্রম ছিল। এই মনোরম স্থানটীকে আশ্রমে পরিণত করায় সন্ন্যাসীর সৌন্দর্য্যজ্ঞান ও বিচার শক্তির ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। কারণ, পর্ব্বতের উপর হইতে চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামগুলি স্পষ্ট চিত্রাঙ্কিতের ন্যায় পরিলক্ষিত হয় এবং দারুণ গ্রীষ্মের সময়ও এখানে শৈত্যসুখানুভব করিতে পারা যায়। গ্রীভ্স সাহেবও পর্ব্বত গাত্রে অঙ্কিত চিত্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "And on many parts of the rock are imperfect representations in sculpture of some of the Hindu deities."

১৮১৬ খৃষ্টাব্দের ১লা মে প্রকাশিত ড্যানিয়েল্ সাহেবের "Oriental Scenery" পুস্তকেও ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে Bishop Heber ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত তাঁহার Narative of a journey though the upper provinces of India" Vol I ২১৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "এই পর্ব্বত চতুষ্পার্শ্বস্থ সমতল ভূমির উপর দণ্ডায়মান থাকিয়া নয়নাভিরাম হইয়াছে। এখানে গঙ্গা সমুদ্রপ্রশাখাবৎ প্রতীয়মান হয়। এখানকার দৃশ্য অতীব সুন্দর।" জঙ্গীরার যতগুলি চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে হিবার্ ও ওয়াইট্ সাহেবের চিত্র বড়ই সুন্দর।

পাশ্চাত্য শিক্ষার সহিত যাঁহার নাম বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট, সেই হিন্দু কলেজের প্রথিতনামা শিক্ষক সুকবি Henry Derozio যিনি Byron of the East বলিয়া খ্যাত ছিলেন, এই স্থানের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে The Fakeer of Jungheera" প্রকাশ করেন। প্রেমের সেই করুণ কাহিনীটী পাঠ করিতে আমরা সকল শিক্ষিত পাঠককেই অনুরোধ করি। তৎপরে লেফ্‌টেনাণ্ট্ হোয়াইট্ সাহেব ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার "Views in India" চিত্র পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের ১৩১ পৃষ্ঠায় মন্দিরের অবস্থা সৌন্দর্য্য সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন—"The situation of the temple has been compared by Captain Mundy to that of the Chatean de Chillon; and the width of the Ganges which spreads around it, to that of the Lac Leuon between Chillan and the Meilleric mountains. Hunter সাহেব তাঁহার Imperial Gazetteer পুস্তকে লিখিয়াছেন—"এখানে জলদেবীগণের সহিত দেবাদিদেব মহাদেবের অনেক প্রেমাভিনয় সংসাধিত হইয়াছিল।"

মূর্ত্তিগুলি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মনীষীগণ সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন যে এগুলি হিন্দুমূর্ত্তি। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বলকারী প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখিয়াছেন, But there are a few which are decidedly of Buddhist and Jain origin. The Buddhist figures, mostly Buddha in the meditative posture, occupy more centri-



cal positions than the Hindu ones and appear to be more worn away then the latter; both circumstances affording conclusive evidence of the place having been originally a Buddhist sanctuary which the Brahmins have appropriated to themselves since the downfall of Buddhism. A Jain temple still exists on one side of the rock, to which a few pilgrims occasionally come to offer their adoration to Parswa-Nath, the 23rd. teacher of the sect." (B. A. S. J. vol 33, p. 360).

অধিকাংশ দেবদেবীর মূর্ত্তি হিন্দুদিগের,—গণেশ, হনুমান, কৃষ্ণ, রাধা, বামন, অনন্তশয্যায় শায়িত নারায়ণ, গঙ্গা, নৃসিংহ, পরশুরাম, লক্ষ্মী, সূর্য্য ও অন্যান্য মূর্ত্তি পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈনমূর্ত্তি সকলও এখানে বিরাজ করিতেছে। ধ্যানী বুদ্ধের মূর্ত্তিসমূহ মধ্যস্থলে দৃষ্ট হয়। এগুলি হিন্দুমূর্ত্তি অপেক্ষা অধিকতর পুরাতন, কারণ রৌদ্র ও বৃষ্টির প্রভাবে ইহাদের অধিকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহা হইতে আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি ইহা এককালে বৌদ্ধমঠ ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের তিরোধানের সহিত ব্রাহ্মণেরা আসিয়া এখানে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন।" পণ্ডিত রাজেন্দ্রলালের মুখে এ কথা শোভন হয় না। দুই একটী "ধ্যানী বুদ্ধ" মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন, এখানে পূর্ব্বে নিশ্চয়ই বৌদ্ধমঠ ছিল। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী পরিদর্শক ও পুরাতত্ত্ববিৎগণ কেহই বৌদ্ধমূর্ত্তির কথা লেখেন নাই। কানিংহাম্ সাহেবও দুইটী বই বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিতে পান নাই, তিনি লিখিয়াছেন—" Only two figures of Buddha were observed, one small sitting and one large standing. But one of these may have been the Brahminical Avatar of Buddha, judging from the company in which it was found." বাস্তবিক বুদ্ধদেব হিন্দুদের দশাবতারের অন্যতম। তাঁহার দুই একটী মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেই যে আমাদিগকে বৌদ্ধমঠের কল্পনা করিতে হইবে, ইহার বিশিষ্ট কারণ কোথায়? পূর্ব্বে যে স্তূপের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে

অনেক বৌদ্ধ নিদর্শন পাওয়া যায় দেখিয়া বোধ হয় ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র অনুমান করেন, এই স্থান বৌদ্ধ মঠ ছিল এবং সম্ভবতঃ সেই অনুমানকেই সত্য বলিয়া জগতে প্রচার করিয়াছেন।

হিন্দুর দেব মন্দিরে জিনেশ্বর মূর্ত্তির অবস্থান আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া ডাঃ বুকানন্ মত প্রকাশ করিয়াছেন, কারণ হিন্দুর অন্য কোন দেবমন্দিরে এই রূপ জৈনদিগের দেবমূর্ত্তি পাওয়া যায় না। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস অতি প্রাচীন কালে জৈনেরা আসিয়া এখানে ঐ মূর্ত্তি খোদিত করিয়া গিয়াছেন। মন্দিরের একাংশে এক ভগ্ন গৃহ আছে; অনেকের মতে ইহা একটী জৈন মন্দির। মন্দিরস্থ মূর্ত্তিটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এক্ষণে দেখিয়া ঠিক বলিতে পারা যায় না, ইহা বুদ্ধদেব বা কোন বৌদ্ধ শ্রমণ বা পার্শ্বনাথ অথবা কোন হিন্দু সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি ছিল।

এখানে বিষ্ণুর দশ অবতার ও অন্যান্য মূর্ত্তি দেখিলাম। সূর্য্যদেবের অনেক গুলি মূর্ত্তি এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। সূর্য্যদেবের সুবৃহৎ মূলমূর্ত্তিটী দেখিতে আমরা সেই খানে রক্ষিত স্তূপাকার বিচালির উপর দিয়া সরলভাবে দণ্ডায়মান পর্ব্বতের উপর অতিকষ্টে উঠিলাম। দ্বাদশ আদিত্য দ্বাদশটী অশ্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। মধ্যস্থলে সূর্য্যদেবের মূল মূর্ত্তি। অন্যান্য স্থানের সূর্য্যমূর্ত্তির সহিত এই মূর্ত্তির প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। এতগুলি সূর্য্য মূর্ত্তি দেখিয়া অনুমান করিতে পারা যায়, যে অতি প্রাচীন কালে সূর্য্যোপাসনার ইহা একটি কেন্দ্রস্থল ছিল। এই মূর্ত্তির নিম্নদেশে আদি গুপ্ত রাজাদের সময়ের অক্ষরে খোদিত একটি লিপি আছে। কানিংহাম সাহেব উহার নিম্নলিখিত পাঠোদ্ধার করিয়াছেন :—

ওঁ দেব ধর্ম্মায় সিদ্ধান্তস্য
পুণ্যম্ তদ্ ভবতু মাতা পিতরাবস্মাকঞ্চ।

এই মন্দিরে শৈব ও বিষ্ণুমূর্ত্তির সমাবেশ দেখিয়া প্রাণে বড় আনন্দ লাভ করিলাম। ভারতের কুত্রাপি হরি-হরের অপূর্ব্ব সম্মিলন দেখিতে পাওয়া যায় না, বোধ হয় স্থান মাহাত্ম্যে ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইয়াছে—সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণ গণ্ডী ছাড়িয়া ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব বোধ হয় বহু পূর্ব্বে এখানে প্রচারিত হইয়াছিল।



ক্ষুদ্র সোপানাবলী বাহিয়া আমরা পর্ব্বতের শিখরদেশে উঠিতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর উঠিয়াই বামপার্শ্বস্থ একটী কক্ষের ভিতর কয়েকটী সুন্দর সুন্দর খোদিত মূর্ত্তি রহিয়াছে দেখিলাম, তাহাদের মধ্যে জহ্নুমুনি ও গঙ্গাদেবীর মূর্ত্তি অন্যতম; পতিতপাবনী ভাগীরথীর হস্তদ্বয়ে পদ্মকোরক, কর্ণে কুণ্ডল। এই স্থানে অনন্ত শয্যায় শায়িত নারায়ণ মূর্ত্তিটী বড় সুন্দর। চিত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখিতে পাইবেন, মাথার উপরে সর্প ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, অনন্তদেব শঙ্খ ও মাল্য দুই হস্তে ধারণ করিয়া শায়িত, তাঁহার নাভিকমল হইতে হইতে ব্রহ্মা উদ্ভূত হইতেছেন। অন্যান্য মূর্ত্তি সকল দেখিয়া মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিলাম।

এখানে গৈবীনাথ বা গেবীনাথ শিবলিঙ্গ আছেন। কেহ কেহ ইঁহাকে অনাদিনাথ বলিয়া থাকেন। অনেকেই মনে করেন ইহা 'স্বয়ম্ভূ' লিঙ্গ ও জহ্নুমুনি কর্ত্তৃক স্থাপিত। গৈবীনাথ ভিন্ন গুপীনাথ ও চন্দ্রনাথ নামে আরো দুইটী শিবলিঙ্গ আছেন। মন্দিরের দ্বারদেশে একটী ঘণ্টা দোদুল্যমান। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ একবাক্যে বলিয়াছেন মন্দিরের ভিতর কোন খোদিত লিপি নাই। কিন্তু আমরা গৈবীনাথের পূজাদি সমাপন করিয়া—মন্দিরের অংশ বিশেষ দেখিতে দেখিতে এক নিভৃত স্থানে ক্ষুদ্র কাল পাথরের নির্ম্মিত ভগ্ন দেবীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। মূর্ত্তিটীর কটিদেশ হইতে পাদ পর্য্যন্ত বেশ স্পষ্টই আছে। ইহারই তলদেশে একটী খোদিত লিপি আছে। ইহারও আমরা একটী চিত্র দিলাম। এই খোদিত লিপিটী ইতিপূর্ব্বে কি দেশীয় কি পাশ্চাত্য কোন প্রত্নতত্ত্ববিদের চক্ষে পড়ে নাই, অন্ততঃ ইহার উল্লেখ আমরা কোথাও দেখিতে পাই না। ইহাতে সমুদ্রগুপ্তের সময়ের অক্ষরে স্পষ্টই লিখিত আছে :—"গেবী সিংহস্য"—শেষের অক্ষর 'স্য'টীর কিয়দংশ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। অপর পর্ব্বতগাত্রস্থ 'দে ধর্ম্ম বাহকস্য' এর 'স্য' অপেক্ষা কিছু বেশী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তথাপি অক্ষরটী স্পষ্ট আছে। এক্ষণে আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি অন্ততঃ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে 'গেবী'নাথ প্রচলিত ছিল। ভাগীরথীর নামানুসারে যে পর্ব্বতের জঙ্গীরা নাম হয় নাই ইহা হইতে তাহাও প্রমাণিত হইতেছে। আর পূর্ব্বে যে ইহা হিন্দুদের অধিকারভুক্ত ছিল তাহার প্রমাণ পর্ব্বতগাত্রে খোদিত অসংখ্য দেবদেবীর মূর্ত্তি। দুই একটী বৌদ্ধ বা জৈন

মূর্ত্তি দেখিয়া আমরা ইহাকে বৌদ্ধমঠ বা জৈনমন্দির বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রকাশিত প্রবন্ধের পর হইতে সুর একটু ফিরিয়া যাইল—এই হিন্দুর মন্দির প্রত্নতত্ত্ববিদ্, ঐতিহাসিক ও পর্য্যটকদিগের ভ্রমনকাহিনীতে বৌদ্ধমঠ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইতে লাগিল। ১৮৭৯-৮০ খৃঃ অব্দে কানিংহ্যাম্ সাহেব এই মতের অসারতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ভোলানাথ চন্দ্র মহাশয় তাঁহার 'Travels of a Hindu' পুস্তকে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতই সমর্থন করিয়াছেন, অধিকন্তু তাঁহার মতে 'The temple bears no inscription and from its make and appearance does not seem to be more than two or three century old." ডাক্তার সি, আর উইলসন, ও হাণ্টার প্রভৃতি মনীষিগণ ডাঃ মিত্রের মতাবলম্বী। শ্রীযুত বিহারীলাল আঢ্য মহাশয় একস্থানে লিখিয়াছেন—"এই মন্দিরের নিকট বৌদ্ধদেবের অসংখ্য দেবমূর্ত্তি আছে, কিন্তু কালসহকারে উহা বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, এই প্রদেশ পূর্ব্বকালে বৌদ্ধদের অধিকৃত ছিল, পরে হিন্দুগণ আসিয়া এখানে আপনার আধিপত্য স্থাপন করেন।" ইহা পাঠ করিয়া বোধ হয়, লেখক মহাশয় কখন গৈবীনাথ স্বচক্ষে দর্শন করেন নাই। কানিংহাম্ সাহেব দুইটী বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিয়াছেন, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পূর্ব্বে অপর কেহত দেখেন নাই, আর লেখক মহাশয় অসংখ্য বৌদ্ধমূর্ত্তি দেখিলেন। আবার সুধু তাহাই নহে একেবারে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন 'এই প্রদেশ পূর্ব্বকালে বৌদ্ধের অধিকৃত ছিল।' ডাক্তার মিত্র মহাশয় মন্দির পূর্ব্বে বৌদ্ধদের অধিকৃত ছিল বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন, আঢ্য মহাশয় আরও অগ্রসর হইয়াছেন।

এই স্থানে প্রধানতঃ তিনটী মেলা হইয়া থাকে। মাঘী পূর্ণিমায় দুই দিন, ভাদ্র পূর্ণিমায় পাঁচ দিন ও শিবরাত্রি উপলক্ষে এক দিন ব্যাপী মেলা হয়। এই সকল মেলায় যাত্রীসমাগম পাঁচশত হইতে পাঁচ হাজার পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।* কানিংহাম্ সাহেব ভুলক্রমে বৈশাখ ও কার্ত্তিক পূর্ণিমায় মেলা হইয়া থাকে লিখিয়াছেন। ১৮৭৯ খৃঃ অব্দের মাঘী পূর্ণিমার মেলায় তিনি স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন।

* Table of Important melas and fairs. E. I. Railway.



তিনি লিখিয়াছেন, তিন দিন ধরিয়া অনবরত যাত্রী সকল আসিয়াছিল। মেলার সময় ক্ষুদ্র সুলতানগঞ্জ জনকোলাহলে মুখরিত হইয়া থাকে। তিনি আন্দাজ করেন, সে বৎসর লোকসংখ্যা চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার হইয়াছিল। অধিকাংশ যাত্রীই গৈবীনাথকে দর্শন করিয়া বৈদ্যনাথদর্শনে গমন করেন।† মার্টিন সাহেব ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মেলায় বিশ ত্রিশ হাজার লোক দেখিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে যাত্রীর সংখ্যা হ্রাস হইবার কারণ কি তাহা ঠিক করিয়া বুঝিতে পারা যায় না। এখানে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মেলায় বিশ ত্রিশ হাজার দেখিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে যাত্রীর সংখ্যা হ্রাস হইবার কারণ কি, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। প্রতি চন্দ্রগ্রহণেও ছোটখাট মেলা বসিয়া থাকে।

গৈবীনাথ দর্শন করিয়া 'বাইশকরণ' পর্ব্বত দেখিতে চলিলাম। গৈবীনাথের ঠিক সম্মুখেই ইহা দণ্ডায়মান। গৈবীনাথটী যেরূপ একটী ক্ষুদ্র দ্বীপের উপর অবস্থিত, ইহা সেরূপ নহে। এটী একটী ক্ষুদ্র অন্তরীপ। এই পাহাড়ের উপর নূতন চুণকাম করা মসজিদ রহিয়াছে। এই পাহাড়টীও শতাধিক ফিটের উচ্চ নয়। ইহার সম্বন্ধে জনপ্রবাদ এইরূপ:—হিন্দুধর্ম্মবিদ্বেষী, হিন্দু দেবদেবীর বিনাশক কালাপাহাড় এই পাহাড়ের উপরিস্থ মন্দির ভগ্ন করিয়া দেবদেবী গঙ্গা-সলিলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক মসজিদে পরিণত করেন। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু প্রাণ দিয়াও মন্দিরকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। গৈবীনাথের মন্দির তাহার কঠোর হস্ত হইতে বহুক্লেশে আপনাকে রক্ষা করিয়াছি। দশদিন অবরোধ করা সত্ত্বেও পাণ্ডারা যখন তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিল না, তখন তিনি চিন্তিত হইলেন—কি করিয়া এই মন্দির করায়ত্ত করিবেন। এই সময়ে তাহার প্রভু সলিমান্ কোন বিশেষ রাজকীয় কার্য্য ব্যপদেশে তাহাকে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য আদেশ করিলেন, তিনিও রাজধানী অভিমুখে চলিলেন। গৈবীনাথ রক্ষা পাইলেন—কিন্তু হিন্দু যাহা হারাইল, তাহা আর ফিরিয়া পাইবার নয়। মসজিদে তিনটী গম্বুজ আছে। ইহার গঠন প্রণালী বঙ্গীয় পাঠানদিগের রীতি অনুযায়ী। ইহা হইতে অনুমান করিতে পারা যায় যে পূর্ব্বোক্ত জনপ্রবাদের মূলে কতকটা সত্য নিহিত আছে। পূর্ব্বে যে ইহা হিন্দুর অধিকারে ছিল, পর্ব্বত

† Arch. Report P24.

গাত্রস্থ হিন্দুমূর্ত্তি ও খোদিত লিপি তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আমরা নৌকার উপর হইতে এই গুলি বিশেষ করিয়া দেখিলাম, একটী মূর্ত্তি এইরূপ :—জনৈক রমণী বামহস্তে মস্তক রাখিয়া ও দক্ষিণ হস্তে পুষ্পগুচ্ছ ধারণ করিয়া আছেন। একটী বানর উহা কাড়িবার চেষ্টা করিতেছে। মূর্ত্তিটী দেখিয়া আমরা ত হাসিয়াই অস্থির। এই মূর্ত্তিটীর বামদিকে কতকগুলি মূর্ত্তি ও খোদিত বৃহদাকার মস্তক রহিয়াছে। একটীর নিম্নে গুপ্তাক্ষরে স্পষ্ট লিখিত আছে 'কুমারস্য'। ইহার কিয়দ্দূরেই দুইটী পুরুষের মধ্যবর্ত্তী একটী কালসার দেখিলাম। ইহাদের এক জনের চারি হস্ত। অনতিদূরেই দুইখানি শ্রীচরণ খোদিত রহিয়াছে দেখিলাম। তাহার নিম্নে সুস্পষ্ট গুপ্তাক্ষরে খোদিত রহিয়াছে 'রুদ্রমহালা'। কানিংহাম সাহেব 'রুদ্রমহালা', রুদ্রমহালয়া শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া বিবেচনা করেন এবং উহার অর্থ প্রলয়কর্ত্তা মহাদেব বুঝিয়াছেন। অপর একটী মূর্ত্তির তলদেশে গুপ্তাক্ষরে 'দে ধর্ম্মা বাহকস্য' লেখা আছে।

কানিংহাম সাহেব লিখিয়াছেন জঙ্গিরা ও বাইশকরণের খোদিত লিপি হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ইহা কোন দিনই বৌদ্ধাধিকারভুক্ত ছিল না। এবং এই স্থানের সমৃদ্ধি আদিগুপ্তরাজাদিগের উন্নতির সময় তৃতীয় শতাব্দীতে সম্পাদিত হইয়াছিল। *

সমুদয় দেখিয়া শুনিয়া আমরা নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া মসজিদ দেখিতে পর্ব্বতের উপর উঠিলাম। মসজিদের ভিতর দর্শনীয় কিছুই নাই।

ফিরিবার সময় দেখিলাম, সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িতেছেন। সায়ং রবিকর গৈবীনাথের উপর পড়িয়া ঝলমল করিতেছে। সেই সুন্দর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে ও 'সা—কাঁহার' অব্যক্ত মধুর স্বর শুনিতে শুনিতে গৈবীনাথের নিকট বিদায় লইয়া ধূলিধূসরিত পথ দিয়া ষ্টেসনাভিমুখে চলিলাম।

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র।

*. Arch Report P. 24.



# চিরনির্ভর।

—:o:—

বুকের ভিতর পোষণ তুমি
কর আমার নব,
সেই আরামে আছি আমি
থামিয়ে আমার রব।
সেই আরামে সেই বিরামে
আমার সকল বোঝা,
হ'য়ে গেছে অনায়াসে
সকল দিকেই সোজা।
যাক্ না কেন তরী আমার
অগাধ জলে ভেসে,
যেম্‌নি করে বাই না কেন
লাগবে কুলে এসে।
তোমার বুকে অগাধ সুখে
আছি শুয়ে আমি,
তোমার বুকে সকল আবেগ
গেছে আমার থামি।
পড়ুক যতই ঝড় তুফানে
বাজুক যত ব্যথা,
থাকবে আমার জীবনতরী
তোমার বুকে বাঁধা।

শ্রীহেমলতা দেবী।

# বিশু-দাদা।

—:•••:—

( ৪ )

নরেশ বাবু অনেক দিন কল্যাণপুরের স্কুলের শিক্ষকতা করিতেছেন; অনেক ছাত্র তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়াছে; তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ এখন বড় বড় কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে, কেহ কেহ বা উকীল, কলেজের অধ্যাপক হইয়াছে। আজ এই দুর্দ্দিনে, এই বড় কষ্টের সময় সেই সকল প্রিয়তম ছাত্রের কথা নরেশবাবুর মনে হইল। এই সকল ছাত্রের মধ্যে কয়েকজন এখনও তাহাদের পল্লীশিক্ষকের কথা বিস্মৃত হয় নাই; ইহাদের মধ্যে সতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একটী ছাত্র সত্য সত্যই নরেশ বাবুকে বিশেষ ভক্তি করিয়া থাকে, এখনও প্রতি সপ্তাহে ঐ ছাত্রটী তাঁহাকে পত্র লেখে, যখন তখন নানা দ্রব্য পাঠাইয়া দেয়।

সে আজ পনর বৎসরের কথা। পনর বৎসর পূর্ব্বে এক আষাঢ় মাসে একটী দরিদ্র বালক কল্যাণপুর স্কুলে আসিয়া উপস্থিত হইল; বালকের বয়স তখন বারো কি তেরো বৎসর। বালকটীর পরিধানে একখানি মলিন ছিন্ন বস্ত্র, গায়ে জামা নাই, স্কন্ধের উপর একখানি মলিন চাদর, গলদেশে যজ্ঞোপবীত। নরেশবাবু তখনও কল্যাণপুর স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক। বালকটী স্কুল ঘরের বারান্দায় সভয়ে দণ্ডায়মান ছিল, ভিতরে প্রবেশ করিতে তাহার সাহসে কুলায় নাই। এমন সময় কি এক প্রয়োজনে নরেশ বাবু বারান্দায় আসিয়াছিলেন; তিনি বালকটীকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া তাহাকে নিকটে ডাকিলেন এবং সে কেন দাঁড়াইয়া আছে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বালক বলিল, তাহার নাম শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তাহার বাড়ী কল্যাণপুর হইতে আট ক্রোশ দূরে মনোহর নগর; সে গ্রামের স্কুল হইতে দ্বিতীয় বিভাগে ছাত্রবৃত্তি পাশ হইয়াছে। তাহার পিতা আছেন, মাতা নাই; পিতা দ্বিতীয় বার বিবাহ করিয়াছেন। বিমাতার তিন চারিটী ছেলে মেয়ে হইয়াছে। পিতা



ও বিমাতা তাহাকে ভাল বাসেন না। এত দিন বাড়ীতে সে কি কষ্ট পাইয়াছে তাহা বলিতে বলিতে তাহার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে ছাত্রবৃত্তি পাশ করিবার পর ইংরাজী পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করায় পিতা ও বিমাতা তাহাকে তিরস্কার করেন; এমন কি বিমাতা তাহাকে গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বলেন। সেই দুঃখে সে বাড়ী ছাড়িয়া আসিয়াছে। যেমন করিয়া হউক সে ইংরাজী লেখা পড়া শিখিবে ইহাই তাহার সঙ্কল্প।

নরেশ বাবু বালকের এই সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া এবং তাহার দুরবস্থার কথা জানিয়া তাহাকে সেই দিন স্কুলের ছুটীর পর বাড়ীতে লইয়া আসিলেন এবং সযত্নে আহারাদি করাইলেন। নরেশ বাবু কায়স্থ, সতীশ ব্রাহ্মণের ছেলে। তাঁহার বাড়ীতে ছেলেটীর আহারাদির ব্যবস্থা করা বিশেষ অসুবিধা বোধ করিয়া তিনি তাঁহার প্রতিবেশী ভট্টাচার্য্যদিগের বাড়ীতে সতীশের আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, স্কুলে ফ্রি করিয়া দিলেন, সতীশ ভট্টাচার্য্য বাড়ীতে দুই বেলা আহার করিত মাত্র; তাহার থাকিবার স্থান নরেশ বাবুর বাড়ীতেই হইয়াছিল। নরেশ বাবু সতীশের অন্যান্য সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন; বলিতে গেলে দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তান সতীশ নরেশবাবুরই পরিবার ভুক্ত হইল। তিনি যে দিন সতীশকে বাড়ীতে লইয়া আসিলেন, ঠিক সেই দিনই তাঁহার পুত্র ভবেশ জন্ম গ্রহণ করিল, সুমতির বয়স তখন তিন বৎসর।

সতীশের পিতা তাহার অনুসন্ধান করিল না; সে কল্যাণপুরে নরেশ বাবুকে কাকাবাবু বলিয়া ডাকিত, এ ডাক সে বিশ্বনাথের নিকট শিখিয়াছিল; নরেশ বাবুর স্ত্রীকে সে কাকীমা বলিত। বিশ্বনাথ এই অসহায় বালকটীকে যে কত যত্ন করিত, তাহা আর বলা যায় না। তাহার সংসার ক্রমে বাড়িয়া গেল, প্রথমে আসিলেন সুমতি—বিশ্বনাথের আনন্দ দেখে কে? তাহার তিন বৎসর পরে ভবেশ আসিলেন—আবার ঘটনাক্রমে সেই দিনই ব্রাহ্মণ বালক সতীশ তাহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিল। সতীশের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই ভবেশ জন্ম গ্রহণ করিল, সেই জন্য সতীশের উপর বিশ্বনাথের বড়ই স্নেহ জন্মিল; সে সকলের কাছেই বলিয়া বেড়াইত যে, "অতি শুভক্ষণে রামুণের ছেলেকে বাড়ীতে আনিয়াছিলাম, সেই দিন খোকা আসিল।"

সতীশ এই স্থানে ছয় বৎসর ছিল; এই ছয় বৎসরের মধ্যে এক বারও সে বাড়ী যায় নাই; বাড়ীর কথা সে মুখেও আনিত না—সুমতি ও ভবেশই তাহার ভাইভগিনী হইয়াছিল। আর বিশ্বনাথ তাহার সুখদুঃখের সাথী, তাহার একমাত্র অবলম্বন।

ছয় বৎসর পরে কল্যাণপুর স্কুল হইতে সতীশ প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক পনেরো টাকা বৃত্তি পাইল। নরেশ বাবু তাহাকে হুগলী কলেজে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন। সতীশ তখন প্রতি শনিবারে কল্যাণপুর আসিত। দুই বৎসর পরে এল, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সতীশ কুড়ি টাকা বৃত্তি পাইল। তখন নরেশ বাবুর পরামর্শ মত সে হুগলী ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় গেল এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলেজে বি, এ পড়িতে আরম্ভ করিল। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন সতীশ এম, এ, বি, এল উকীল। কলিকাতার ছোট আদালতে সে ওকালতী করে, পসার মন্দ হয় নাই। এখন তাহার পিতা বিমাতা, ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ভগিনীগণ তাহার সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিয়াছে। সতীশও তাহাদিগের ভার গ্রহণ করিয়াছে। সে এখন বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছে, পরিবার লইয়া কলিকাতায় বাসা করিয়া থাকে, বাড়ীতে পিতা মাতাকে প্রতিমাসে খরচ পাঠাইয়া থাকে এবং মধ্যে মধ্যে তাহার প্রতিপালক নরেশ বাবুকে নানা দ্রব্য পাঠাইয়া দেয়। বিশ্বনাথকে কখনও ভালকাপড়, কখনও জুতা, কখনও জামা পাঠাইয়া দেয়। এখন আর সে কল্যাণপুরে আসিবার বড় সময় পায় না; দীর্ঘ অবকাশ সময়ে কখনও কখনও নরেশ বাবু ও সুমতি ভবেশকে দেখিতে আসিয়া থাকে।

আজ এই দুর্দ্দিনে সর্ব্বাগ্রে সতীশের কথাই নরেশ বাবুর মনে পড়িল। ভবেশের পরীক্ষার অনেক পূর্ব্বেই সতীশ নরেশ বাবুর সহিত ব্যবস্থা করিয়া দিল যে, ভবেশ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাহাকে কলিকাতায় নিজের বাসায় রাখিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াইবে। আজ সে কথাও নরেশ বাবুর মনে হইল।

নরেশ বাবু তখন ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন যে তিনি দেশত্যাগ



করিয়া যাইবার সঙ্কল্প যখন করিয়াছেন, তখন অন্য কোথাও না গিয়া জীবনের অবশিষ্ট কয়টা দিন কলিকাতাতেই বাস করিবেন। ভগবানের আশীর্ব্বাদে যদি ভবেশ পরীক্ষায় পাশ হয়, তাহা হইলে তাহাকে কলিকাতায় পড়াইবেন, নিজেও উপার্জ্জনের যাহা হয় একটা সুবিধা করিয়া পরিচিত জনের অগোচরে বাস করিবেন। তিনি স্থির করিলেন বিশ্বনাথকে বাড়ীতে রাখিয়া যাইবেন, মাসে মাসে কিছু কিছু খরচ পাঠাইয়া দিবেন; বিশ্বনাথ ঘর দুয়ারগুলি দেখিবে। এই ব্যবস্থা স্থির করিয়া তিনি সমস্ত কথা সতীশকে জানান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিলেন; কিন্তু সতীশকে পত্র লিখিবার পূর্ব্বে আর একবার বিশ্বনাথের সহিত পরামর্শ করা বিশেষ কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইল।

সন্ধ্যার পর ভবেশ নিদ্রিত হইলে নরেশ বাবু বিশ্বনাথকে ডাকিলেন; প্রথম অন্যান্য কথার পর বলিলেন "বিশ্বনাথ, এ স্থান ত্যাগ করাই স্থির করিলাম। কিন্তু একটা কথা ভাবিতেছি, বাড়ী খানির কি করিব? আমি বলি তুমি বাড়ীতে থাক, আমি ভবেশকে লইয়া কলিকাতায় যাই, সেখানে সতীশের সাহায্যে কাজ কর্ম্মের একটা সুবিধা হইতে পারে। আমি মাসে মাসে কিছু কিছু খরচ পাঠাইয়া দিব। আর কলিকাতাও ত বেশী দূর নয়, তুমি মধ্যে মধ্যে যাইয়া আমাদিগকে দেখিয়া আসিও। অনেক ভাবিয়া দেখিলাম পৈত্রিক বাড়ীটা একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে; তবে একথা ঠিক যে, আমি আর এ জীবনে কল্যাণপুরে মুখ দেখাইব না।"

বিশ্বনাথ একটী কথাও না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল দেখিয়া নরেশ বাবু বলিলেন "বিশ্বনাথ, বিশু, কথা বলিতেছ না কেন?"

বিশ্বনাথ একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "কাকা বাবু, আজ দুই দিন ধ'রে তোমাকে কি বলিলাম। আমার কথাটা কি তুমি মন দিয়া শোন নাই। আমি তোমাকে বারবার বোল্‌ছি, এখনও বল্‌ছি, আমি আমার দিদির খোঁজ না ক'রে কিছুতেই ছাড়্‌ব না। নিশ্চয়ই তাকে কোলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমি ঠিক বোলতে পারি, আমি কোলকাতায় গিয়ে তাকে খুঁজে বা'র কোরতে পারবো। তারপর তার অবস্থা দেখে পরে যা হয়

নরেশবাবু দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "তবে তাই হবে বিশু। আমি কালই সতীশকে পত্র লিখিব।" (ক্রমশঃ)

শ্রীজলধর সেন।

---

# প্রার্থনা।

—:o:—

এবার মোরে প্রেমের ভরে
লুটাতে দাও ধূলাতে,
—তোমার চরণ ধূলাতে।
সুখের খেলা, বিলাস মেলা,
ভাঙিয়া দাও আঘাতে
—তোমার চরণ আঘাতে॥
অনেক দুখ বেদন বহি',
অনেক জ্বালা, পীড়ন সহি',
হতাশে,
দিনের শেষে মলিন বেশে
এসেছি তব সকাশে;
দয়াল তুমি দয়ার বশে,
মাতাও মোরে অমৃত রসে,
যাহাতে
সকল ভুলি' হৃদয় খুলি',
মিশায়ে যাই ধূলাতে
—তোমার চরণ ধূলাতে॥

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মিত্র।

---



# লেখকের স্ত্রী।

—:*:—

১

তখনো দু একটী নক্ষত্র আকাশে মিট্ মিট্ করিতেছিল। ভোরের পাখীগুলা তখনো জাগিয়া উঠে নাই। বিনোদিনীর মাতা শ্রীকৃষ্ণের শত নাম বলিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা কমল নিদ্রার ঘোরে "পায়ে রেখ, পায়ে রেখ" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। মাতা তাড়াতাড়ি "ওকিরে কমল?" বলিয়া তাহার গায়ে ঠেলা দিলেন। কমল নিস্পন্দ; গা দিয়া ঘাম ঝরিতেছিল। "বিনু, বিনু, একবার শীগ্‌গির এদিকে আয় ত মা" বলিয়া মাতা চিৎকার করিলেন।

বিনোদিনী পাশের ঘরে ছিল; শশব্যস্তে উঠিয়া আসিল। সঙ্গে তাহার স্বামী রঘুনাথও আসিল। চোখে-মুখে জলের ঝাপ্‌টা ও পাখার বাতাস দেওয়ায় কমলের সংজ্ঞা হইল। কিছুক্ষণ পরে সে আবার ঘুমাইয়া পড়িল।

রঘুনাথ কহিল "ব্যাপার কি? এমন হ'ল কেন?" মাতা কহিলেন "কি জানি, বাছা! এবার যেন কমলকে কেমন দেখছি, সময়ে খাওয়া নেই, দাওয়া নেই, দিনরাত যেন ও কি ভাবে!"

বিনোদিনীর ইঙ্গিতে রঘুনাথ সরিয়া পড়িল। বিনোদিনী বলিল, "ব্যাপার কিছু হয়েছে মা, নাহ'লে এ কদিন সুধাংশু একবারও এল না। নিশ্চয় ওদের মধ্যে কিছু মনান্তর ঘটেছে। যাই হোক, এখন কমলকে আর জাগিয়ো না, ও একটু ঘুমোক্। আমি এখানে আছি। তুমি তোমার কাজে যাও।"

রঘুনাথ স্ত্রীর নিকট সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া আফিস যাইবার সময় গঙ্গা পার হইয়া সুধাংশুর নিকট গেল। তাহাকে শ্বশুর বাড়ী আসিতে বলায় সে কহিল, একখানি উপন্যাস লইয়া আপাততঃ সে ব্যস্ত আছে, সেখানি শেষ না হইলে যাওয়া অসম্ভব। সুধাংশু লেখক। রঘুনাথ তাহার সঙ্কল্প টলাইতে পারিল না, তবু প্রতিশ্রুত করাইয়া লইল, যে উপন্যাসের হাঙ্গামা মিটিলেই সুধাংশু শ্বশুর বাড়ীতে দর্শন দিয়া সকলকে আপ্যায়িত ও চরিতার্থ করিবে।

২

সে দিন দুপর বেলায় দুই ভগিনী দক্ষিণের বারাণ্ডায় বসিয়া বুনিতেছিল। বিনোদিনী ক্রুস কাঁটায় লেশ তুলিতেছিল। লেসের কার্য্যে বিনোদিনীর নৈপুণ্যের খ্যাতি ছিল। ঘরের পর ঘরগুলি এত তাড়াতাড়ি উঠাইতেছিল যে, দেখিলে মনে হয়, যেন কল চলিতেছে। মাঝে মাঝে কমলের প্রতি সে লক্ষ করিতেছিল। কমল এক জোড়া ভেলভেটের জুতা বুনিতেছিল। রঘুনাথ সুধাংশুকে নিমন্ত্রণ করিয়া আফিসে যাইবে, সুতরাং সুধাংশু যে সন্ধ্যার সময় আসিবে, সে বিষয়ে কাহারো সন্দেহ ছিল না। কমলের কেশবিন্যাসে সে দিন বিনোদিনা তাই অনেকখানি সময় ও অবসর নষ্ট করিয়াছিল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তবু সুধাংশুর দেখা নাই। এতক্ষণ কোন্ কালে তার আসিবার কথা। বিনোদিনী ডাকিল, "কমল!" কমল কহিল, "কেন, দিদিমণি?"

"সুধাংশু কি আজ আসবে না? তোর কি মনে হয়?" "বোধ হয়—আসবে না"—কমলের মুখখানা আরক্তিম হইয়া উঠিল।

বিনোদিনী লেশটা রাখিয়া কমলের প্রতি চাহিয়া কহিল, "সে আজকাল আর বড় একটা আসে না যে! এমন ত কখনো করেনি সে! কেন, বল দেখি?"

"এখন সে বড় ব্যস্ত, হাতে তার অনেক কাজ, প্রেসের প্রুফ দেখা, কাপি পাঠান, আবার তা ছাড়া মাসিক পত্রিকায় গল্প পাঠান,—তবে, সমালোচনা এ সবের জন্য অবসর পায় না।"

কমলের কথাগুলির মধ্যে ঈষৎ গর্ব্ব মিশ্রিত ছিল! তাহার স্বামীর উপর বাঙলার মাসিক সাহিত্য কতখানি নির্ভর করিতেছে। সুধাংশু উপস্থিত থাকিলে, এ গর্ব্বটুকু উপলব্ধি করিত। বিনোদিনী কহিল, "তবু তোর জন্যও, মনে করলে, একটু সময় সে করে নিতে পারে।"

কমল কহিল, "না ভাই, আমার জন্য তার কাজের ক্ষতি করতে বারণ করিছি; আমার জন্য তার সুনামের কেন ব্যাঘাত করবে সে? আমার তা ইচ্ছাও নয়।"

বিনোদিনী বুঝিল, কমল কথাটা ভাঙিবে না! কমল রেশমের পাতা বুনিতে লাগিল।



বিনোদিনী ধীরস্বরে কহিল, "আচ্ছা, তোদের ঝগড়াঝাটি কিছু হয়নি ত?"

"ঝগড়া? কার সঙ্গে?"

"কার সঙ্গে, আবার! সুধাংশুর সঙ্গে!"

"তার সঙ্গে ঝগড়া! কি যে বল দিদি, তুমি! কিন্তু ঝগড়ার কথা হঠাৎ আজ কেন? তোমাদের বুঝি এমন প্রায়ই হয়?"

বিনোদিনী অস্থির হইয়া পড়িল—কমল কেন তাহাকে সব কথা খুলিয়া বলিতেছে না। ধীরে ধীরে কমলের কাছে ঘেঁসিয়া বিনোদিনী কহিল, "তা আমাদের ঝগড়া হ'লে এতদূর হয় না। ধন্নি তোরা। আচ্ছা তোদের যদি ঝগড়া-ঝাঁটি না হবে তবে তুই আজকাল এত অন্যমনস্ক কেন বল্ দেখি! সে দিন আবার অমন করে চেঁচিয়ে উঠ্‌লি; বলি আমি ত আর কানা নই, তুই মনে করিস্ যে এ ক'দিন তোর হাবভাব আমি কিছুই লক্ষ করিনে? যাই বলিস্, এবার যেন তুই কেমনতর হয়েছিস্! আগে তোকে কত হাসি ঠাট্টা করতে দেখেছি, এখানে এলে চিঠি লেখবার ধুম পড়ে যেত আর দু এক দিন অন্তর সুধাংশুর চিঠি আস্‌ত, তার দর্শন ও পাওয়া যেত, এখন ত তার কিছুই দেখছি না। সুধাংশু আর মোটেই আসে না—নিমন্ত্রণ করা হ'ল তবু তার আসবার কোন লক্ষণ দেখ্‌ছি না। কি হয়েছে, বল্! সুধাংশু কি রাগ করেছে?"

"শুধু শুধু রাগ করবে কেন? মিছে তোমরা এত বাড়াবাড়ি কচ্ছ। সে ত কখনো রাগ করে না! কখনো রাগ করতে দেখেছ তাকে?"

"যাই হোক, কমল, আমি যা বলি শোন্—" কমল আর লুকাইতে পারিল না। তার স্বর কাঁপিয়া উঠিল। সে কহিল, "কি, বল!" অলক্ষিতে তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিতেছিল, অভিমানের একটা বেদনা তার বক্ষটাকে চাপিয়া ধরিয়াছিল। সে মুখ নত করিয়া বসিয়া রহিল।

বিনোদিনী কহিল "বল্ তোর মনে কি হচ্ছে বল্ আমাকে, লক্ষ্মীটি। সুধাংশু কি তোকে কিছু বলেছে? আমার কাছে লুকোস্‌নে, বল্, তা'তে মনটাও হালকা হবে?"

কমল দিদির বস্ত্রাঞ্চলে মুখ লুকাইল। চোখের জলও চাপিয়া রাখা গেল না।

৩

স্বামী স্ত্রীতে মধ্যে মধ্যে মান-অভিমান হইত। গল্প-উপন্যাসের উপাখ্যান কল্পনার পক্ষে রাত্রিটুকুই ছিল সুধাংশুর পক্ষে প্রশস্ত সময়। টেবিলের সম্মুখে চেয়ারে বসিয়া সুধাংশু আপনার কল্পনাকে নৈশ আকাশে উড়াইয়া দিত! সম্মুখে খোলা জানালা দিয়া নক্ষত্রখচিত অনন্ত আকাশপটে সে কত নব রহস্যের সন্ধানে ফিরিত—বিচিত্র মায়ালোকে কত অস্ফুট কাহিনী তাহার মনে ভাসিয়া আসিত। সুধাংশু ভক্তের মত সাধনায় রত থাকিত। কমলের তাহা ভাল লাগিত না, সে তাহাতে বাধা দিত। সে ক্ষুদ্র বালিকা, তাহার এই উন্মুখ কিশোর হৃদয় আজ স্বামীর প্রেম, স্বামীর আদরটুকুর জন্য একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিত। যাচাইবার বয়সে সে বেচারী যাচিয়া আদর লইতে আসিত, কখনো তার আশা মিটিত, কখনো বা মিটিত না। ম্লান নয়নে সুধাংশুর পায়ের কাছে সে বসিয়া পড়িত। সুধাংশুর সে দিকে চাহিবার অবসর থাকিত না। অবশেষে কমল সুধাংশুর পায়ের উপর সুন্দর হাত দুখানি রাখিয়া ঘুমে ঢলিয়া পড়িত।

সে দিন আকাশে বাতাসে আনন্দ ঠিকরাইয়া পড়িতে ছিল! পূর্ণিমার রাত্রে ছোট ঠাকুরঝি' ভালো করিয়া সাজাইয়া তাহাকে স্বামী সম্ভাষণে পাঠাইয়াছিল। নীলাম্বরীখানি পরিয়া ধীরে ধীরে সে কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখে, সুধাংশু তাহার মোটা খাতা লইয়া অনর্গল লিখিয়া যাইতেছে। কমল আসিয়া স্বামীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া তাহার অধরে চুম্বন করিল। সুধাংশু তীব্রস্বরে কহিল "আঃ—কি কর!"

বেদনাহত প্রেম অভিমান জাগাইতে বিলম্ব করে না। কমলের চোখ ছল ছল করিয়া আসিল—তবু সে ছাড়িল না। চারিধার যেন কি এক আবেশে ভরিয়া উঠিয়াছিল!

কমল কহিল, "একটু লেখা রাখ—আমার সঙ্গে গল্প করবে না?"

"না, ও সবের সময় নাই আমার!"



"তবে কি খালি লেখা নিয়েই থাকবে? রোজ রোজ রাত জেগে লেখা কি ভাল? একটা দিন কি আমার অনুরোধ রাখতে নেই?" "না, দেখ, তুমি এসে অবধি আমার লেখার বড় ব্যাঘাত হচ্ছে—কাগজওলারা ক্রমাগত তাগাদা করছে, দিতে পারছি না। স্ত্রী স্বামীর কাজে এমনি ভাবে ব্যাঘাত করবে!"

ক্ষোভে, দুঃখে কমল বসিয়া পড়িল; কোন কথা কহিল না। কমল ভাবিল, তাহার প্রাণে যে ব্যথা লাগিয়াছে, তাহার জন্য স্বামী আজ একটু সান্ত্বনাও দিলেন না—কি দুর্ভাগিনী, সে! সত্যই ত তাহার দোষ! স্বামী যশের পথে চলিয়াছেন, সে তাহাতে কণ্টক হইতেছে, কি আস্পর্দ্ধা তাহার! এমন স্বামীর সহধর্ম্মিণী হইবার যোগ্যতা তার কোথা! সে কত অপরাধিনী।

পরদিন সে পিত্রালয়ে পত্র লিখিয়া জানাইল, 'মাকে দিদিকে অনেকদিন দেখে নাই, বড় দেখিতে ইচ্ছা করে।'

তিন চারি দিন পরে পিত্রালয়ে যাইবার অনুমতি পাইয়া কমল স্বামীকে কহিল, "এখন ত, আমি বাপের বাড়ী যাচ্ছি, তোমার লেখার, বোধ হয়, আর কোন ব্যাঘাত হবে না।" "তুমি যাচ্ছ, কমল, তাই ত—"বলিয়া সুধাংশু চুপ করিল। পরে কহিল, "আচ্ছা, দেখো, এর মধ্যে আমি কতখানি লিখে ফেলি।" সুধাংশু চলিয়া গেল।

আজ কমল পিত্রালয়ে যাইতেছে, তবু তাহার এতটুকু আনন্দ নাই! আজ হৃদয়ে কি বহ্নি লইয়া সে জ্বলিতে চলিয়াছে, সে-ই তাহা জানে! সুধাংশু বুঝিল না, লেখা চলিবে, তাহাতে বাধা পাইবে না ইহাতেই সে মুগ্ধ! কমলের হৃদয় ক্ষুদ্র বলিয়া কি সুধাংশুর চক্ষু তাহাতে পড়িবে না। হায়, পাষাণ! মূর্খ বলিয়া কি আশ্রিতা দুর্ব্বলা নারীকে এতটাই অবজ্ঞা করিতে হয়!

৪

বন্ধু যোগেশ সুধাংশুর নূতন উপন্যাসের খবর লইতে আসিল।

সুধাংশু কহিল, "তুমি এসেছ, নেহাৎ ভুল্‌তে পারনি! আমি মনে কর্‌ছিলুম, একবার ডাকিয়ে পাঠাই"—

"না হে, তোমার বইখানা তোমার মুখে শোনবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু যদি

আবার তোমার সেবারের গল্পের মত হয়ে পড়ে, তাই ব্যাঘাত করতে আসি নে। এখন শুনলুম, বই প্রেসে গিয়াছে, তবে তুমি সে দিন শ্বশুরালয়ে গেলে না যে? যাই বল, এটা তোমার ভাল হয়নি কিন্তু, আর inspiration আসবে কোত্থেকে! স্ত্রীকে দূরে পাঠিয়ে কি লেখা যায়?"

"কি জান, মনে করলুম, এতদিনই যখন গেল, তখন আর এ ক'টা দিন মাঝে কাটিয়ে দিয়ে যদি একেবারে বইখানা হাতে করে উপস্থিত হতে পারি,—তাই যাইনি. আজ যাব মনে করছি।"

"বই তা হলে বেরিয়েছে?"

"হাঁ, একটু বসো, আমি আসছি" বলিয়া সুধাংশু উঠিল।

"বেশী দেরী হবে না ত? বলি, টয়লেট্ টয়লেট্—"

"না, সে সব সেরে নিয়েছি," বলিয়া, সুধাংশু উপরে চলিয়া গেল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সুধাংশু বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া দুই খানি বই লইয়া আসিল। একখানি সে যোগেশকে দিল, অপর খানি ভাল করিয়া কাগজে মুড়িয়া কহিল, "চল না, ওপারে বেড়িয়ে আসবে! এ ক'দিন বাড়ীতে বসে বিরক্তি ধরে গেছে।"

"তা চল, আমি তোমাকে ওপারে রেখে আসি। আর আসিই বা কেন, আমিও আজ নবাবগঞ্জে থাকব।"

"বেশ, বেশ, তোমারো আজ তা হলে শ্রীমন্দিরে বাস! তবে আর দেরি কেন? চল, বিষ্ণু মাঝি ঘাটে নৌকা এনেছে এতক্ষণে!"

দুই বন্ধু বাটী হইতে বাহির হইয়া বরাবর ঘাটের দিকে অগ্রসর হইল।

নৌকায় বসিয়া যোগেশ উপন্যাসে মন দিল। সুধাংশু গঙ্গার দিকে চাহিয়াছিল। সূর্য্যের কিরণে জলের ঢেউগুলা ঝিক্ মিক্ করিতেছিল! পাল তুলিয়া নৌকা ছুটিয়া চলিয়াছে! সুধাংশুর মনে পড়িল, "ভরা পালে চলে যায়, ঢেউগুলি নিরুপায়, ভাঙে দুধারে!"

যোগেশ এক একবার তাহার বন্ধুর প্রতি লক্ষ করিতেছিল। উপন্যাসের মাঝামাঝি পড়িয়া সে সোৎসাহে কহিল, "দেখ, সুধাংশু, তোমার আশ্চর্য্য ক্ষমতা। এমন লেখ তুমি, যেন ঘটনাগুলো চোখের সামনে ঘটে যাচ্ছে। কিন্তু



ভাই, এই স্বামী স্ত্রীর কথাটা যা লিখেছ, এ পড়লে ত আমার গৃহিণী বলবেন যে, আমাদের প্রতিই বা তুমি লক্ষ করেছ!"

"তুমি পাগল হলে যে, দেখছি—"

"না তুমি যাই বল, তোমাকে আর আমাদের কথা কিচ্ছু বলা হবে না দেখছি। আবার কোন দিন বইয়ে কি লিখে ফেলবে, শেষে আমাদের একটা গৃহবিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেবে! দোহাই তোমার, এমন ভাবে আর আক্রমণ করো না! এ বয়সে স্ত্রীর মান ভাঙানো মোটেই ভালো লাগবে না। most dull and unpoetic."

নৌকা আসিয়া ঘাটে লাগিল। দুই বন্ধু লাফাইয়া তীরে উঠিল।

পথিমধ্যে সুধাংশু বিদায় চাহিলে যোগেশ তাহাকে তাহার শ্বশুরবাড়ী না পৌঁছাইয়া ছাড়িল না।

বিনোদ জানিত যে, সুধাংশু, তাহার বন্ধু যোগেশের কথা ঠেলিতে পারিবে না। তাই সে তাহার বাল্যসখী নির্ম্মলাকে পত্রদ্বারা জানাইয়াছিল। স্ত্রীর অনুরোধে, যোগেশ আজ সুধাংশুকে তাহার শ্বশুরবাড়ী পৌঁছাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল।

৫

বাড়ীর সম্মুখে কাহাকেও না দেখিয়া সুধাংশু একেবারে অন্দরে চলিয়া আসিল। সে ভাবিয়াছিল, হয়ত সে আজ কমলকে বিশ্রম্ভালাপরতা মুক্তকেশা দেখিতে পাইবে। এ পর্য্যন্ত নানা আয়াস-অনুরোধসত্ত্বেও তাহার এ সাধটুকু মিটে নাই; কিন্তু কমলের পরিবর্ত্তে সুধাংশু সম্মুখে দেখিল, বিনোদিনী তরকারী কুটিতেছে। তার বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল! কেমন একটা লজ্জায় তার গতি-রোধ হইল।

রঘুনাথ স্ত্রীর নিকট বসিয়া, আফিসের সাহেব অন্যান্য কর্ম্মচারী অপেক্ষা তাহাকে কতখানি কাজের লোক ভাবিয়া থাকেন, তাহারি বিচিত্র কাহিনী-বর্ণনে ব্যস্ত ছিল। স্ত্রীর সম্মুখে আপনাকে জাহির করিবার প্রবৃত্তিটা আজ পর্য্যন্ত সে ছাড়িতে পারে নাই!

বিনোদিনী তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। মাথার কাপড় আর একটু টানিয়া কহিল। "বঁধুয়া, অসময়ে কেন হে প্রকাশ!"

সম্প্রতি সে পাড়ায় সখের থিয়েটার দেখিয়া আসিয়াছিল। অভিনয়ের দুই একটী গৎ মনে ছিল! বিনোদিনী কহিল, "বেশ, কপিবর, নিমন্ত্রণটী রক্ষা করবারও অবসর সেদিন ঘটে উঠ্‌ল না? গাছের কোটর ছেড়ে কি মানুষের সঙ্গে একটুও মিশ্‌তে সাধ যায় না!"

সম্পর্কানুরোধে বিনোদিনীর হত্যা অপরাধ অবধি মার্জ্জনীয়! সুধাংশু কিন্তু বলিল না।

রঘুনাথ কহিল "ভায়ার যে মান হয়েছে, সেটা তোমরা ভুলে যাচ্ছ! তোমার ভগ্না সেটী ভঞ্জন করবার জন্য ত কাতরভাব ধারণ করেন নি।"

বিনোদিনী কহিল, "তা বেশ, ভাই, এখন বরাবর উপরে কুঞ্জে যাও; শ্রীরাধার দর্শন সেখানেই পাবে, বোধ হয়, আমি একটু পরেই যাচ্ছি।"

এত সহজে মুক্তি পাইবে, সুধাংশু তাহা মোটেই ভাবে নাই। সে আর মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা না করিয়া চঞ্চল হৃদয়ে উপরে উঠিল। ঘরে ঢুকিয়াই দেখে, কমল বালিশে ওয়ার পরাইতেছে, মাথায় ঘোমটা নাই, মুক্ত কেশের গুচ্ছ ঝুঁটি বাঁধা সুধাংশুকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া সে সঙ্কুচিতভাবে ঘরের কোণে আসিয়া দাঁড়াইল। আনন্দে ও লজ্জায় তার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিয়াছিল।

সুধাংশু চারিধারে চাহিয়া কমলের নিকট আসিয়া একেবারে তার হাত ধরিয়া মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, "কমল"

"ছাড়, ছাড়, এখনি কে এসে পড়বে"

"আজ আর ছাড়্‌ছি না, কমল, বড় সুন্দর তোমাকে দেখাচ্ছিল।—মাথায় ঘোমটা ছিল না—রাখাল-বালকের মত মাথায় ঝোঁটন বাধা—আহা, কি সুন্দর! এমন সৌন্দর্য্য ঘোমটার আড়ালে লুকিয়ে রাখা, নিষ্ঠুরতা নয় কি।"

"থাম, তোমার কবিত্বের বুঝি আর সময় পেলে না"

সুধাংশু কমলের হাত ছাড়িয়া দিল।

কমল বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেছিল, সুধাংশু পথ রোধ করিয়া কহিল,



"কমল, আমার হাতে পড়ে তুমি একটুও সুখী হ'লে না। যদি সেই ডেপুটীর সঙ্গে তোমার বিয়ে হত, তা হলে"—

কমল সুধাংশুর মুখ চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "আবার ও কথা! যাও, ভারী অন্যায়. তোমার পায়ে জায়গা পেলে"—

কথাটা শেষ হইল না, বাধিয়া গেল!

"পায়ে কি, কমল! এ'ত পায়ের জিনিস নয় যে, পায়ে রাখব! এযে বুকে রাখবার"—সুধাংশু কমলকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইল।

আনন্দের আতিশয্যে কমল অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। সে কি বলিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না! স্বামীর এত আদর, এত যত্ন, কোন্ স্ত্রী পাইয়াছে! তার মত ভাগ্যবতী কে আছে! এই স্বামীর প্রতি সে অভিমান করিয়াছিল! তার সে পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে!

কমল কহিল, "আমাকে ক্ষমা কর, তুমি—আমি অতি নির্ব্বোধ, অতি হীন। সে দিনকার কথায় আমার কত অভিমান হয়েছিল, কত কষ্ট হয়েছিল। নিজের মনে ক'দিন কেবলি যন্ত্রণা পেয়েছি এখানে এসে কিছু ভালো লাগছিল না। তার উপর তুমি একখানাও চিঠি লিখলে না আমার মরতে সাধ হয়েছিল। সেদিন আবার স্বপ্নে চেঁচিয়ে কি কেলেঙ্কারিই করেছি।"

"ছি, কমল, ওঠ" বলিয়া তাহাকে উঠাইয়া, সুধাংশু কহিল, "আমি ত তোমার উপর কখনো রাগ করি না, তোমার কোন দোষ নাই। আমি নিষ্ঠুরতা করেছি,—আমার জন্য তুমি কত কষ্ট সহ্য করেছ। তুমি আমার কথাটা সেদিন ঠিক বুঝিতে পারনি। একটা কথা কি জান,—লেখবার সময় আমি যেন কেমন হয়ে যাই,—কোন দিকে মন থাকে না, নহিলে কি তোমার সঙ্গে অমন ব্যবহার করি। কিন্তু তুমি লেখকের স্ত্রী, এ কষ্টটুকু তোমাকে সহ্য করতেই হবে যে, কমল! এখন যে জন্য তোমার সঙ্গে নিষ্ঠুরতা করেছি, তা এই দেখ"। সুধাংশু কাগজের মোড়ক হইতে চক্‌চকে বাঁধানো উপন্যাসখানি বাহির করিল। উৎসর্গ-পত্র খুলিয়া কমলের সম্মুখে ধরিল।

কমল দেখিল—তাহারি উদ্দেশে লেখা আছে—

"তোমারি লক্ষ্যে গাহি গান আমি,
কণ্ঠে ফুটাই ভাষ:—
তোমারি করেতে তুলে দিনু তাই
যত সাধ, যত আশা!"

কমল কহিল, "আমাকে ক্ষমা কর, তুমি, আমি তোমার একটুও যোগ্য নহি। আমাকে পায়ে রাখবে, বল।"

"আবার ও কথা, ছিঃ"

বিনোদিনী ও রঘুনাথ যে অন্তরালে দাঁড়াইয়াছিল, সুধাংশু বা কমল তাহা লক্ষ করে নাই।

বিনোদিনী কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিল, "ভারি খোসামুদে মেয়ে; কপিবরকে দিয়ে মানভঞ্জন না করিয়ে, নিজেই পায়ে লুটিয়ে পড়ল"—

রঘুনাথ কহিল, "আহা, ভুলে যাচ্ছ, তুমি! এ'ত আর চাকুরের স্ত্রীর নয়, এ যে লেখকের স্ত্রী! সুতরাং মানভঞ্জনের পালাটা এ তরফের!"

শ্রীনরেন্দ্রমোহন চৌধুরী।

---

# 'দেবালয়ে' উপদ্রব।

—:o:—

বিগত বৈশাখের দেবালয়ে 'দশপদী' কবিতা শীর্ষক একটি কিম্ভূৎকিমাকার রচনা "উপপ্লবায় লোকানাং ধূমকেতুরিব" উদিত হইয়াছে। রচনাটি কোন্ জাতীয়, আমরা বহু চেষ্টা করিয়াও তাহা নির্ণয় করিতে পারিলাম না। শিরোনামা অনুসারে যদি মানিয়া লওয়া যায় যে, উহা কবিতা, তবে কবিতার যত প্রকার দোষ থাকিতে পারে, উল্লিখিত রচনাটি হয়ত তাহার উদাহরণ, কিম্বা হয়ত উহা কোন যাত্রার গানের অনুকৃতি (parody) কারণ এই প্রকার কয়েকটি গান ইতিপূর্ব্বে যাত্রার গানে শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয়। তন্মধ্যে একটির প্রথম কিয়দংশ এক্ষণে মনে আসিতেছে। যথা; 'ওরে ভীম কিজন্যে বসে' রাজাসনে? তুই কি বসিবার যোগ্য রাজা সনে! তোর গেছে গোমর, ওরে পামর, উঠে যা মোর কথা শুনে'! তা ছাড়া 'ওরে ক্ষুদ্রাদপি



ক্ষুদ্র, ওরে হতভাগ্য, পদাঘাত প্রভৃতির যাত্রা ভিন্ন কোন শিষ্ট সাহিত্যে স্থান পাইবার সম্ভাবনা অল্পই। যদি কবিতা না হইয়া উহা ধাঁধা বা উদ্ভট্ হয়, তবে তাহারও মীমাংসা আবশ্যক। বাঁধা হইলে, যাঁহারা উহার উত্তর দিতে পারিবেন, তাঁহাদের নাম আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিব। বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও রচনাটির কোন তত্ত্ব নিরূপণ করিতে না পারায় অবশেষে আমাকে কয়েকটি বিশিষ্ট সাহিত্যিক বন্ধুর শরণ লইতে হইয়াছিল। তাঁহাদের সাক্ষ্য বৈঠকে রচনাটি সম্বন্ধে যেরূপ আলোচনা হইয়াছিল, নিম্নে তাহার অনুবৃত্তি দিলাম।

প্রথম বন্ধুটি ( নাম করিবনা—ইনি একজন এম, এ ) বহুক্ষণ ধরিয়া রচনাটি পাঠান্তে বলিলেন, আপনি যে তিন প্রকার সমস্যার কথা বলিতেছেন, ইহা তিন প্রকারই হইতে পারে। তবে কবিতা হইবার সম্ভাবনাই অধিক; তাহার পক্ষে প্রধান যুক্তি হইতেছে এই যে, ইহার শিরোদেশে 'কবিতা' বলিয়া স্পষ্টই উল্লেখ আছে।

দ্বিতীয় বন্ধু কহিলেন, আমার ত তাহা মনে হয় না। সম্ভবতঃ উহা উদ্ভট। তবে উহার অর্থ তত পরিষ্কার হইতেছে না। বাহ্যত যে অর্থ বোধ হইতেছে তাহা উহার প্রকৃত অর্থ হইলে, উহা প্রকাশ করিবার কোন তেমন সার্থকতাই থাকে না।

তৃতীয় বন্ধু ( ইনি উকীল ) একটু হাসিয়া বলিলেন উহা কবিতাই বটে তবে কদর্য্য কবিতা। দাশরথীর ছন্দে যে ভাবটি প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে তাহা বহু পুরাতন হইলেও নিতান্ত মন্দ নহে। তবে ভাষার একান্ত দৈন্যের জন্য ভাবটি আদৌ ফুটিতে পায় নাই। প্রকাশ করিবার ভঙ্গীটিও অদ্ভুত!—বিশ্ববিধাতার বিধানের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মনুষ্যের দম্ভপূর্ণ দর্প প্রকাশ নিতান্তই হাস্যজনক। তাহার জন্য সে পদাঘাত যোগ্য! প্রবল ঝটিকার পতঙ্গের ন্যায় তাহার উড়িবার চেষ্টা, সে কেবল ব্যর্থ। সে নিতান্ত হতভাগ্য! ইত্যাদি। কিন্তু হায়, বিধাতার বিধানের মহত্ত্ব এবং দাম্ভিক মানবের ক্ষুদ্রত্ব প্রমাণ করিবার কি এই ভাষা না এই ভঙ্গী! ইহাতে বিধাতার উপরেও ভক্তি প্রদর্শন হয় না, মানবের উপরেও শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়

না। পরের দন্ত দূর করিতে গিয়া ইহাতে কেবল নিজের দন্তই প্রকাশ পায় এবং আচ্ছাদন ভেদ করিয়া স্বীয় অন্তঃসারশূন্যতাই বাহির হইয়া পড়ে! বিপথগামী ভ্রাতাকে পদাঘাত পূর্ব্বক সুপথে আনিবার চেষ্টায় নিজেকে যে পথে গিয়া পড়িতে হয়, সে পথ হইতে ফিরিয়া আসিবার কি কোন সম্ভাবনা থাকে? স্বয়ং বিধাতাও তাঁহাকে ফিরাইতে পারেন কিনা সন্দেহ। এ সকল লেখা যদি লিখিতেই হয় এবং তাহা ছাপাইবারও আবশ্যক ঘটে, তবে এ বিষয়ে রবিবাবুর আদর্শ কবিতাগুলি লেখক কিছু কাল অভ্যাস করেন না কেন? নির্ম্মল পবিত্র ভাব 'নৈবেদ্যে'র পাতায় পাতায় যে উজ্জ্বল সুন্দর ছাপ রাখিয়া গিয়াছে, তাহা কবিযশঃপ্রার্থীর আদর্শ হওয়া উচিত নয় কি?

আমি প্রায় convinced হইয়া আসিতেছিলাম যে উহা কবিতাই বটে, এমন সময় আর এক জন বন্ধু উচ্চ হাস্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন আপনারা যে অত্যন্ত serious হইয়া উঠিলেন দেখিতেছি। আমার বিশ্বাস, উহা কবিতা হওয়া অসম্ভব, উহা নিশ্চয়ই ধাঁধা এবং তাহার উত্তরও আমি ভাবিয়া স্থির করিয়াছি। শুনুন, 'দশছত্রে সংক্ষিপ্ত (পদ্যে) দ্বিতীয়ভাগ বর্ণপরিচয় ইহার উত্তর। যথা;—যোগ্য, উপভোগ্য, হতভাগ্য বাধ্য।

ইচ্ছা।
শুদ্ধ।
অতিক্রমণ।
দ্বিজেন্দ্র।
দর্প, সূর্য্য।
ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রাদপি,
শৃঙ্গ, সৃষ্টি
ভ্রূক্ষেপ, পাদক্ষেপ, উৎক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত, যতক্ষণ।
পতঙ্গ, ইঙ্গিত।
আস্পর্দ্ধা।
উড্ডীন।
ব্রহ্মাণ্ড।



আমরা ত একেবারে অবাক, মুগ্ধ—এমন সময়ে অপর একটি বন্ধু কহিলেন, ধাঁধা হওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু আমার মনে হয়, উহা হাসির কবিতা! আমরা সকলেই সন্দেহ প্রকাশ করাতে তিনি বলিলেন—সে হাঁস নয়, উপহাঁস অর্থাৎ ইহাতে কাহাকেও বোধ হয়, উপহাস করা হইয়া থাকিবে; অবশ্য উপহাস করা অপেক্ষা উহাতে উপহসিত হওয়ার উপাদান অধিক আছে সে কথা বলাই বাহুল্য। আমরা এ মন্তব্য মানিয়া লইতে ইতস্ততঃ করিতেছি, এমন সময় আমাদের প্রধান সমালোচক-বন্ধু গম্ভীর স্বরে বলিলেন—আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইহা কাব্যদোষের নমুনা। আমরা সকলেই সোৎসুক ভাবে তাঁহার বক্তব্য বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি দেখিয়া তিনি আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলিলেন 'অর্থাৎ কবিতায় যত প্রকার দোষ থাকিতে পারে, ইহা তাহার উদাহরণ।'

'নতুবা, এই দশটি মাত্র ছত্রে দশাপেক্ষা বেশী দোষ কি প্রকারে সম্ভব? এই দেখুন—বলিয়া বন্ধুবর গণিয়া দেখাইলেন। বাস্তবিক দেখিলাম, উহার দোষ বিস্তর।

১ম ছত্র। 'ওরে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, দাঁড়িয়ে আছো'। 'ওরে' বলিয়া সম্বোধন করিলে 'আছো' না হইয়া 'আছিস্ হওয়া উচিত ছিল। 'ওহে' বা 'ওগো' হইলে 'আছো' হইতে পারিত। যথা,

'ওরে দুষ্ট দেশাচার, কি করিলি আভাগার।'

কিন্তু, 'ওহে মহাকায় বলিষ্ঠ বারণ, হায়!
কঠিন নিগড় কেন ধরিয়াছ পায়?'

—ইহা ভাষার দোষ।

২য় ছত্র। 'কর এই' ইহাতে একটি চরণ হয় না। শেষার্দ্ধ চরণটি ছাড়া প্রত্যেক ছত্রে চারিটি করিয়া চরণ। সেই প্রত্যেক চরণের চারিটি করিয়া অক্ষর বা syllable 'কর এই' তে তাহা অসম্ভব। 'অতিক্রমণ' প্রভৃতি আড়ম্বরপূর্ণ সাধুভাষা প্রয়োগেও সে দোষ দূর করিতে পারে না।

৩য় ছত্র। যতির দোষ। চরণ ভাগ করিতে গেলে অদ্ভুৎ রূপে যতি পড়ে। যথা—'হারে হত' 'ভাগ্য উড্ডীন'। ভাগ্য কি ঘুড়ি না ঘুঘু?

৪র্থ। 'সৃষ্টির মহা' কে সংস্কৃত করিয়া লইয়া 'সৃষ্টির্মহা' পড়িতে হয়!

৬ষ্ঠ ছত্র। 'শুদ্ধ তার' এ একটি সম্পূর্ণ চরণ হয়না, 'শুদ্ধ তাহার' হইলে হইতে পারিত। পদাঘাতে ও তাহাই। 'পদাঘাতের' হইলে হয়ত সম্ভব ছিল।

৭ম ছত্র। 'জড় জীব' ও উক্ত দোষে দুষ্ট! অবশ্য উড়ে'র মত জড় (অ। জীব(ন) 'করিয়া পড়িলে' কতক সারে! মিশে যাও'এও তাহাই। 'মিশিয়া' করিলে ভাল হইত।

৮ম ছত্র। 'তব উপ'তে শ্রুতিকটু দোষ। 'তোমার' করিলেই চলিত। অবশ্য এই শ্রুতিকটু দোষ রচনাটির সর্ব্বাঙ্গে।

১০ম ছত্র। এই শেষ ছত্র অর্থহীন। Finishing touch কি না! বোধ হয় লেখকের অভিপ্রায় যে, 'তোমার সুখ দুঃখে কি ব্রহ্মাণ্ডের এতটুকুও বাধে! কিন্তু তাহা প্রকাশ করিতে হইলে দয়া করিয়া 'দুঃখে' অন্ততঃ একটা একার দিতে হইবে। নতুবা ব্যাকরণের দোষ ঘটিতে বাধ্য।

মিলের দোষও অপ্রতুল নয়। যথা, 'ভরে' ও 'পড়ে' মিলিয়াছে; 'গড়ায় ও 'ধরায়' মিলিত হইবার শুভচেষ্টা করিয়াছে! কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে third class rhyme বা 'বদমিল' হইয়া পড়িয়াছে।

ভাবের কথা না তোলাই ভাল। ভাব যদি থাকে তবে তাহা অভাবে। যার এও যদি কবিতা হয়, তবে প্রতি মিনিটে এমন এক একটি কবিতা লিখিয়া "হাতে পার্ত্তাম নিশ্চয় আমি মস্ত একটা কবি"! বন্ধুবর এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ মুখে মুখে একটা কবিতা বানাইয়া দিলেন এবং বলিলেন আলোচ্যটি কবিতা হইলে, ইহা কেন কবিতা হইবে না? নিম্নে তাঁহার কবিতাটি উদ্ধৃত করিলাম, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন কোন্‌টি ভাল।

---

## ন'পদী কবিতা ও একপদ ফাউ।

—:০*০:—

আরে ওগো মস্ত বড়, বসে আছ এমনি ভঙ্গীভরে—
মনের ভাবটা, সবাই এসে তুড়ি দিয়ে আড্ডা তোমার জমায়,
মনের ভাবটা, দেশটা তোমায় কোনমতে বড় মনে করে,
মনের ভাবটা, গলার জোরে প্রকৃত যে বড় তারে কমাই!



ওগো কীর্ত্তিমন্ত সেবা ধরেছ যে আটপহরে-ভাষার,
অনিবার্য্য পরিণাম তার ক্রমাগত নীচের দিকেই পতন ;—
যতক্ষণ না শেষ আশা ও শেষ উপায়টি ফুরায় ফিরে আসার
কিন্তু সে দুরাশা !—সেটা পিপীলিকার পাখা ওঠার মতন,
ওগো বড় নিজের কাছে, ওগো নকল বারোয়ারীর রাজা !
অর্থাৎ কিনা—মুখোস্ পরে' পোষাক এঁটে সঙের রাজা সাজা !

পরিশেষে বক্তব্য এই 'দেবালয়ে' যে এই সকল আবর্জ্জনা স্থান পায়, ইহা বড়ই আক্ষেপের কথা। যাহার কোথাও স্থান হয় না তাহাই কি দেবালয়ে স্থান পায়! আশ্চর্য্য!

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

---

# দুরাশা।

—:o:—

( বাউলের সুর )

(ও তুই) ভাবিস্ কি সে তোরি মতন পাত্‌লারে।
দর কি তার কাণাকড়ি, বড় জোর আধ্‌লারে !
অমনি যেমন তেমন ক'রে, "আয়" ব'লে ডাক দিলে পরে,
তখনি হাজির হবে, মান্‌বেনা ঝড় বাদ্‌লারে !
পাপের রাস্তা পেয়ে সোজা, পাপ ক'রেছিস্ বোঝা বোঝা,
তোর একাদশী রোজা, চুলোয় যাবে পাগলারে !
তার জাল জগৎ বেড়া, ফাঁক নাই তার সবই ঘেরা,
কৈ পুঁঠি আদি ক'রে পড়ে রুই কাত্‌লারে ! *

শ্রীরজনীকান্ত সেন।

* রজনী কবির রচিত 'অভয়া' (যন্ত্রস্থ) নামক কাব্য হইতে গৃহীত।

# মাসিক সাহিত্য-সমালোচন।

—:*:—

আর্য্যাবর্ত্ত, বৈশাখ, ১৩১৭, শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত।

বর্ত্তমান সংখ্যায় একটি গল্প, একটি উপন্যাসের অংশ, কতকগুলি কবিতা ও অন্যান্য রচনা আছে। "চিত্রকর" শীর্ষক গল্পটি সম্পাদকের রচনা। সমস্ত গল্পটির মধ্যে এমন কিছু নাই যাহা পাঠকের মনে একটা রেখাপাত করিতে পারে। চিত্রকর নিজেই সুচিত্রিত হন নাই! বিষয়টি কেমন খাপ্‌ছাড়া হইয়া গেছে। শেষের Pathos টুকু ভাল ফুটিয়া উঠে নাই। একটু ভাষার নমুনা দিই;—"সেই শুভ্র জ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনী, সেই আম্রমুকুলগন্ধামোদিত—জাহ্নবীতরঙ্গ সঙ্গ শীতল সমীরণ বুঝি এই সব বন্ধুর কবিতারোগের মাত্রা বাড়াইয়া তুলিয়াছিল।" এতগুলি Words of learned length and thundering sound না দিয়া, সোজা কথায় ভাবটা ব্যক্ত করা উচিত ছিল। সংস্কৃত ভাষার সুগঠিত সমাসগুলি বাংলায় ব্যবহার করা নিন্দনীয় নয়, তবে সেগুলিকে এমন করিয়া ব্যবহার করা উচিত যাহাতে ভাষাটা মোলায়েম হয়—কানে খট্ করিয়া না লাগে। বিশেষতঃ গল্পের ভাষায় "কার্লাইলি" চাল অমার্জ্জনীয়, কারণ ভাষা অন্ততঃ ভাবের উপযোগী হওয়া উচিত। "রাজী রাও ও মস্তানী"—শ্রীসখারাম গনেশ দেউস্কর রচিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। বুন্দেল খণ্ডের বিপন্নরাজা ছত্রসাল বাজী রাওয়ের সাহায্য পাইয়া আপনার রাজ্য উদ্ধারের প্রয়াস পান। মোগলদের হাত হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া তিনি মস্তানী নাম্নি এক মুসলমান রক্ষিতার গর্ভজাত কন্যা বাজী রাওকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই মস্তানী হইতেই বাজীরাওয়ের অনেক কলঙ্ককাহিনী শুনা যায়। কিংকেড সাহেব কতকগুলি মারাঠি পত্র অনুবাদ করিয়া এই সকল কলঙ্ক একটা দৃঢ় ভিত্তির উপর রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। লেখক কিংকেড সাহেবের অনুবাদগুলির ভ্রম দেখাইয়া সুযুক্তির সহিত এই সকল মিথ্যা কলঙ্ক মোচনে রত হইয়াছেন। ইহার জন্য লেখককে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। "চিতোর" ও "বঙ্গীয় নদনদীর জীবন সংগ্রাম" উল্লেখযোগ্য। "সংগ্রহ" ও "বিবিধে" অনেক জানিবার কথা আছে।

আর্য্যাবর্ত্তের বাহ্য সৌন্দর্য্য আছে, ছাপা কাগজ ভাল, নিঃসঙ্কোচে দশজনের হাতে উপহার



দেওয়া যায়: প্রবন্ধ গৌরবেও ইহা বাঙ্গালার অনেক কাগজের চেয়ে ভাল। নূতন সহযোগীকে আমরা সাদরে আহ্বান করিতেছি।

বাণী, বৈশাখ।

'বাণী' দুই বৎসর প্রকাশিত হইয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সম্পাদক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের চেষ্টায় ইহার অস্তিত্ব আবার ফিরিয়া আসিয়াছে দেখিয়া সুখী হইলাম।

আলোচ্য সংখ্যায় "বিদেশীর মুখে বাংলার কথা" পড়িয়া আশান্বিত হইয়াছি, দেখা যাক্, পরে কি হয়। "তারার কাহিনী" শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক তারাগুলির পৌরাণিক বৃত্তান্তের সহিত বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু সর্ব্বত্রই এ চেষ্টা সফল হইবে এমন আশা করা যায় না। এবারে লেখক অগস্ত তারার কথা কহিয়াছেন। একটা প্রবন্ধকে নানা কোটেশনে ভূষিত করিয়া অস্পষ্ট করা আজকালকার একটা রোগ। মিশকোটেশনের মতন কেলেঙ্কারী আর নাই বলিয়া সকলেরই এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। সংস্কৃত কোটেশন সংস্কৃতজ্ঞের জন্য, তাহা আবার সন্ধি বিচ্ছেদ করিয়া লিখিবার কোনো আবশ্যকতা আছে বলিয়া বোধ হয় না। "প্রাচীন বিষ্ণুপুর ও বর্গীর হাঙ্গামা" উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। গায়ে পড়িয়া নিজের মত বিচার মৎলব করিলে বড়ই বিরক্তি বোধ হয়। আবার সেই মতের যদি কোনো ভিত্তি না থাকে, তাহা হইলে লেখকের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া পড়ে।

বাণীকে দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি—এখন মাসে মাসে ইহার উন্নতি দেখিলে আরো সুখী হইব।

ভারতী, বৈশাখ। "মহাকবি কালিদাসের চিতাভূমি ও তাঁহার অন্তিম কবিতা—শ্রীসতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ রচিত একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। লঙ্কাদ্বীপে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে ভারতের মহাকবি কালিদাস লঙ্কার দক্ষিণ বিভাগে মাতর নগরে দেহত্যাগ করেন। নানা মত সংগ্রহ করিয়া লেখক দেখাইয়াছেন—এই প্রবাদটি সত্যও হইতে পারে, কিন্তু ইহাই যে এক মাত্র সত্য তাহা দেখান নাই। "প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য" অধ্যাপক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার রচিত; ইহাতে লেখক ভারতের প্রাচীন বাণিজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বিষয়টি সুচিন্তিত ও সুব্যক্ত হইয়াছে। "রসের ধর্ম্ম"—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত। ধর্ম্ম সাধনায় কঠিনতাকে প্রবল হইতে দেওয়া উচিত নয়, ইহার একটা রসের দিক আছে, এই খানেই ইহার সমস্ত কমনীয়তাটুকু পুঞ্জিত; ধর্ম্ম সাধনার যেখানে উৎকর্ষ সেখানে গভীর বাধাহীনতা, ভাবের বৈচিত্র্য এবং অক্ষুণ্ণ মাধুর্য্যের নিত্য বিকাশ! এই রস বা আনন্দ আপনাকে অন্যের মধ্যে প্রসারিত করিতে চায়, কিন্তু কাঠিন্য বা ঔদ্ধত্য আপনাকে অন্যের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখে। শুধু ভোগই প্রেমের একমাত্র লক্ষণ নয়—দুঃখকে স্বীকার করিয়া লওয়াও তাহার স্বভাব, আমাদের এমন শক্তি চাই যাহা দ্বারা দুঃখকে আপনার করিয়া

লইতে পারি। এই কথা কয়টি এমন সুললিত ভাষায় ও ভক্তের উচ্ছ্বাসের সহিত লিপিবদ্ধ হইয়াছে, যে ইহা আমাদের মর্ম্ম স্থান স্পর্শ না করিয়া থাকিতে পারে না। বর্ত্তমান হিন্দু সমাজ ধর্ম্মের দ্বারা নিজেকে পৃথিবীর সকল মানুষের সঙ্গেই পৃথক করিয়া রাখিয়াছে, ও ধর্ম্ম আচার, নিয়ম, শাসনকে আশ্রয় করিয়া কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্মে যখন রসের বর্ষা নামিয়া আসে, তখন তাহা সকলকে যেমন এক করিয়া দেয়, স্বাজাত্য বুদ্ধি ও তেমন পারে না। কথাগুলি সত্য। "চসারের পরিণয়" শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য রচিত। কিলিপার অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন টুকু আরো ভাল করিয়া ফুটানো যায়। "অপর জগতের কথা"য় মহান্ ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। ইংরাজী হইতে গৃহীত হইলেও এরূপ রচনা যে বাংলা সাহিত্যের পুষ্টি বিধান করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

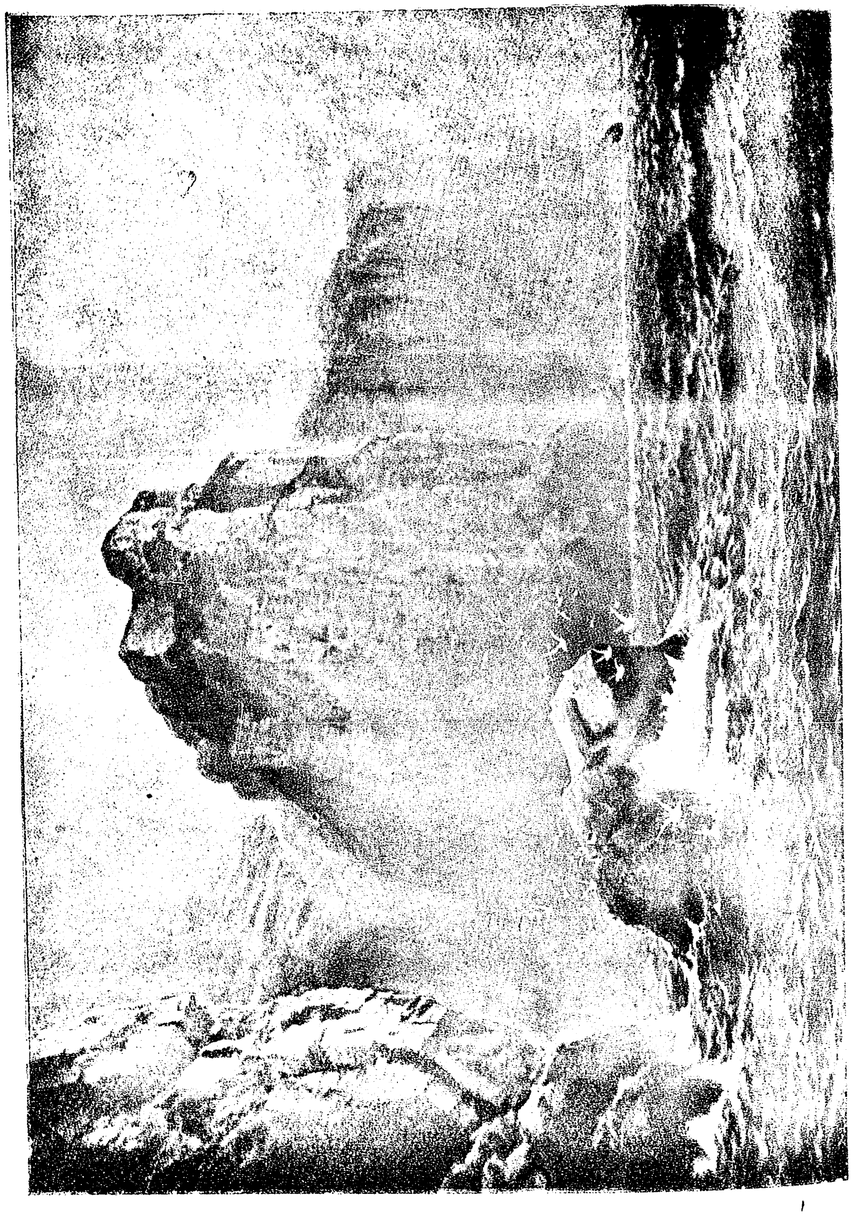



# মানসী

দ্বিতীয় ভাগ। আষাঢ় ১৩১৭ সাল ৫ম সংখ্যা।

## বিরহ কাব্য।

—:*:—

মেঘদূত কাব্য কবে রচিত হইয়াছিল তাহা ঠিক জানিনা কিন্তু আমাদের নিকট উহা আর কোনও বিশেষ কবিরচিত নির্দ্দিষ্টসংখ্যক শ্লোকে পর্য্যবসিত কাব্যমাত্র নহে; উহা চিরপুরাতন অথচ বর্ষে বর্ষে চিরনবীন স্নিগ্ধশ্যাম বিরাট আষাঢ় প্রকৃতিরই অঙ্গীভূত। কাব্য আর কোনও প্রকৃতির সহিত এমন নিবিড় ভাবে মিশিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কাব্যের স্রোত মন্দগামিনী নদীর মত মেঘের ছায়া বুকে ধরিয়া যেন কোন এক অনির্দ্দেশ্য আকাঙ্ক্ষার সমুদ্র অভিমুখে ছুটিয়াছে এবং তাহার ছন্দে তালে তালে মেঘের মন্দ্র ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। আবার আষাঢ় মেঘের যে অকূল নীলিমা কেবল মাত্র চোখ দিয়া নহে—সমস্ত হৃদয় প্রসারিত করিয়া অনুভব করিতে হয়, তাহা কবিহৃদয়ের স্নিগ্ধ সজীব শ্যাম-রসেতেই সরসীকৃত, এমন করিয়া কবির প্রাণের সহিত বিরাট প্রকৃতির প্রাণের আদানপ্রদান চলিয়াছে।

সে যাহাই হৌক, মেঘদূত কাব্য শতশত বর্ষ ধরিয়া লক্ষ লক্ষ নরনারীর প্রাণ রসে পরিপূর্ণ ও আনন্দে প্রসারিত করিয়া দিয়া আসিয়াছে এবং কেবল মাত্র বিরহে নহে মিলনের মধ্যেও এক অপূর্ব্বতা সঞ্চার করিয়া দিয়াছে। এই রসের উৎস কোথায়? এ আনন্দ কোথা হইতে উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিতেছে? দুটী মাত্র প্রাণীর অন্ধ প্রবল আদিম সংস্কার বিশেষই কি তাহার আশ্রয়? তাহা হইলে এই উদারতা কোথা হইতে আসিল? এই যে গভীরতা, ইহা কিসের গভীরতা? সুতরাং একটু তলাইয়া দেখিবার প্রয়োজন আছে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু "বঙ্গদর্শন" ও "প্রবাসী" পত্রে প্রকাশিত দুটী প্রবন্ধে সেই চেষ্টাই করিয়াছেন। কাব্যের মর্ম্ম-নিহিত রস পাঠকের হৃদয়ের গভীরতর উপলব্ধির মধ্যে সচেতন ভাবে সঞ্চার করিয়া দেওয়া এবং কাব্যের মধ্যে নব নব মাধুর্য্য আবিষ্কার করা যদি কাব্য সমালোচনার মানদণ্ড হয়, তাহা হইলে রবীন্দ্রবাবুর চেষ্টা যে সম্যক সফল হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

কিন্তু রবীন্দ্রবাবুর রচনা যাঁহাদের হৃদয়ে এমন রস উদ্বোধিত করিয়া তুলে যাহাকে ঠিক আনন্দের রস বলিতে পারা যায় না, তাঁহারা তো আর ওরূপ স্বীকার করিতে পারেন না কাজেই প্রতিবাদ বাহির হওয়া স্বাভাবিক হইয়া উঠে। সুতরাং শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় "আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা" নাম দিয়া যে প্রতিবাদ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ স্বভাবসঙ্গতই হইয়াছে। ইহাতে বিস্ময় বা ক্ষোভের কারণ অণুমাত্র নাই। বরঞ্চ এ নিমিত্ত বঙ্গ সাহিত্যের অনুরাগী বিশেষতঃ রবীন্দ্রবাবুর ভক্তমাত্রেরই আনন্দিত হওয়াই কর্ত্তব্য। বাঙ্গালা সাহিত্যের একটী পরম দুর্ভাগ্য এই যে, ভালো-মন্দ-মাঝারি যিনি যাহাই রচনা করুন না কেন সকলেরই চরমগতি এক প্রাণহীন উষর উপেক্ষার মধ্যে। সুতরাং এই সনাতন রীতির ব্যতিক্রম দেখিলে আনন্দ হওয়ারই কথা। রবীন্দ্রবাবুর লেখা আবার বিশেষ সাবধানতার সহিত আলোচনা করিয়া দেখার যোগ্য। জগতের শ্রেষ্ঠ লেখকদিগের এই এক পরম দুর্ভাগ্য যে, কিছুদিন পরে তাঁহাদের রচনা সম্বন্ধে পাঠকদিগের বিচার শক্তি আর তেমন সচেতন থাকে না; ভালো মন্দ, সত্য মিথ্যা প্রায় সমান দরেই বিকাইয়া যায়। ইহাতে লেখক ও পাঠক উভয়েরই যে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিবার অপেক্ষা রাখে না। রবীন্দ্রবাবু সম্বন্ধেও এই জাগতিক নিয়মের যে ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে তাহা মনে হয় না। তাঁহার আলোক সাধারণ প্রতিভার জ্যোতি কাব্য উপন্যাস গান গল্প সমাজনীতি রাজনীতি ধর্ম্মনীতি কৌতুক হাস্য সমালোচনা—নানাদিকে বিচ্ছুরিত হইয়া উঠিয়া বঙ্গ-সাহিত্যকে যে অপূর্ব্ব মহিমায় মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে, তাহাতে মুগ্ধ বিস্মিত পাঠকের হৃদয় হইতে কেবলি ধ্বনি উঠিতেছে "আরো—আরো"। বিচার কে করে? সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মভাবে ওজন করিয়া দেখিবার ধৈর্য্য কাহার থাকে? তথাপি তাহার প্রয়োজন আছে। আরো প্রয়োজন আছে এই জন্য যে, তাঁহার ভাষা ও রচনাভঙ্গীর অপূর্ব্ব ইন্দ্রজালে যে সৌন্দর্য্যের মায়ালোক সৃজন করে, তাহার মধ্যে সত্য মিথ্যা নির্দ্ধারণ করা বড়ই কঠিন কাজ। আর এরূপ বিচার করিয়া দেখিবার অধিকার সকলেরই আছে—নিতান্ত নগণ্য ব্যক্তির পর্য্যন্ত। সুতরাং দ্বিজেন্দ্রবাবু যে সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। রবীন্দ্রবাবুকে বঙ্গ সাহিত্যের সম্রাট বলা হয় বলিয়া তাঁহার প্রচারিত সত্য মিথ্যা সকল বাণী নির্ব্বিচারে অবনত শিরে গ্রহণ না করিলে যে ১২৪ (ক) ধারায় পড়িতে হইবে আশা করি রবীন্দ্রবাবুর অতি বড় ভক্তও এরূপ প্রত্যাশা করেন না।

কিন্তু দ্বিজেন্দ্র বাবুর প্রতিবাদটী পড়িয়া ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হইতে হইয়াছে—নিরাশ হইয়াছি একথা বলিতে পারিলে সুখী হইতাম; কিন্তু দ্বিজেন্দ্রবাবু আমাদিগকে নিরাশ হইবার অবসর দিবেননা বলিয়া যেন কৃতসংকল্প হইয়া বসিয়াছেন—একবারও নহে; তাঁহার রচনায় যে যে ত্রুটি, দোষ ও কলঙ্ক দেখিতে হইবে বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই আশঙ্কা জন্মিয়া থাকে কার্য্যতও দেখা যায় তাহার কোনটিই বাদ পড়ে নাই। সমালোচক যদি ঘটক হইতেন তাহা হইলে দেবীবরের মতন তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে দোষানুসারে অনায়াসে 'মেল' বন্ধন করিয়া দিতে পারিতেন।

আমি কেবল মাত্র তাঁহার রচনার অক্ষমতাকে লক্ষ্য করিয়া একথা বলিতেছি না। সাহিত্যে অক্ষমতা—দোষ এবং গুরুতর দোষ বটে কিন্তু তাহাকে ঠিক অপরাধ বলিতে পারা যায় না। কিন্তু যাহা অপরাধ শ্রেণীতে গণ্য হইতে পারে—যাহাতে সাহিত্যের নীতি, সৌজন্য ও সংযমের আদর্শ খিন্ন হয় তাঁহার রচনায় তাহার বাহুল্য প্রাচুর্য্য দেখিয়া সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই ক্ষুব্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন না।

কেবলমাত্র অক্ষমতা হইলে অবস্থাবিশেষে কতকটা কৌতুক ও আমোদ যে জন্মিতে পারে না এমন নহে। ময়ূরের নৃত্য দর্শনের আনন্দ অবশ্য কেহ ভালুকের নাচ হইতে প্রত্যাশা করিতে পারে না; কিন্তু তথাপি বেচারা যখন প্রাণপণ চেষ্টায় অঙ্গভঙ্গী সহকারে নাচে, তাহাতে কৌতুক জন্মিতে পারে—যদি নখদন্তের তীক্ষ্ণতার লক্ষণ লক্ষিত না হয়। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রবাবুর লেখার অন্তস্থল হইতে সেই আদিম থরনখর যে উঁকি মারিতেছে ইহাই নিতান্ত দুঃখের বিষয়। আমার কথা ক্রমশঃ বিশদ হইবে।

দ্বিজেন্দ্রবাবুর আপত্তিগুলি সম্বন্ধে আলোচনা পরে করা যাইবে। প্রথমে আনুসঙ্গিক দু একটী কথা শেষ করিয়া লই।

ভদ্রসমাজে বাস করিতে হইলে যেমন আচারে ব্যবহারে কথাবার্ত্তায় ভদ্রতার একটী উন্নত আদর্শ অনুসারে সংযত হইয়া চলিতে হয়, ভদ্র সাহিত্যে স্থান পাইবার উচ্চ আশা রাখিলে উন্নত সাহিত্যের উপযোগী সংযম অভ্যাস করা তেমনই অত্যাবশ্যক। বাড়ীর শাসনের শৈথিল্যে আদরে ছেলের যেমন সহবৎ শিক্ষার অবসর ঘটেনা, বাঙ্গালী পাঠক ও সমালোচকদিগের শিথিল আচরণে অনেক বাঙ্গালী লেখকেরও সেইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে—দিদিমা পিশিমার কোল, জোর বৈঠকখানা বা আড্ডার সীমানা—তাঁহারা কোনকালেই ছাড়াইতে পারেন না। বাঙ্গালার সাহিত্যকে পৃথিবীর সাহিত্যের সামিল করিতে হইলে ইহার প্রতিবিধান অত্যাবশ্যক। দ্বিজেন্দ্রবাবু যে সাহিত্যের উন্নত আদর্শ জানেননা বা মানেননা বা ভুলিয়া যান ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। Mathew Arnold যাহাকে Provincialism বা গ্রাম্যতা দোষ বলেন দ্বিজেন্দ্র বাবুর লেখায় তাহার একান্ত প্রাচুর্য্য। বাঙ্গালা সাহিত্যে Mathew Arnold কথিত ubanity গুণ বিশিষ্ট সংযত লেখার যদি একান্ত অসদ্ভাব থাকিত তাহা হইলেও তাঁহার ত্রুটির কতক মার্জ্জনা ছিল কিন্তু রবীন্দ্রবাবুর রচনার উন্নত আদর্শ চোখের সম্মুখে দেদীপ্যমান থাকিতে সে ওজর করা তো চলে না।

দ্বিজেন্দ্রবাবু তাঁহার প্রবন্ধের পত্তন করিয়াছেন এইরূপ একটী গ্রাম্যতা দোষের উপর। "রবীন্দ্রবাবু একদিন শ্রীচন্দ্রনাথবসুকে ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন হিং টিং ছট্।" রবীন্দ্রবাবু হিং টিং ছট্ নামক ব্যঙ্গরসাত্মক কবিতা লিখিয়াছিলেন এবং তাহাতে



অতিরিক্ত আধ্যাত্মিকব্যাখ্যাপ্রবণতাকে লক্ষ্য করা হইয়াছিল ইহা ধ্রুব নিশ্চয়; কিন্তু রবীন্দ্রবাবু যে চন্দ্রনাথ বসু নামক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকেই ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন, একথা বলিবার দ্বিজেন্দ্রবাবুর কোনই অধিকার নাই; বিশেষতঃ রবীন্দ্রবাবু যখন সেসময়ে স্পষ্টই উহা অস্বীকার করিয়াছিলেন। আর যাহাই হৌক উহা যে মার্জ্জিত রুচির পরিচায়ক নহে তাহাতে সন্দেহ নাই। আসল কথা আমাদের জাতীয় চরিত্রের দুর্গতির এই একটী বিশেষ লক্ষণ যে, আমরা বিশ্বাসই করিতে পারি না যে, কেহ কোনও দোষ বা কুপ্রথাকে আন্তরিকভাবে ঘৃণা বা তাহার নিন্দা করিতে পারে—কোনও ব্যঙ্গরসাত্মক লেখা বা প্রহসন পড়িলেই কোন্ ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলা বা পরিবারকে তাহাতে কটাক্ষ করা হইয়াছে তাহা নির্ণয় করিবার জন্য আমাদের রীতিমত ছটফটানি ধরিয়া থাকে। তাহার উপর রচনপ্রণালী ও ভঙ্গীও তেমন বিশুদ্ধ রুচিসম্মত নহে। "অথ সমস্ত কাব্য গাধরসাত্মক (অর্থাৎ যদি পরব্রহ্মরূপ আধ্যাত্মিক অর্থ তাহা হইতে টানিয়া বাহির করা না যায় —Shakspeare গেলেন।" "রবীন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিতেছেন—" নহিলে আমাদের চিত্তকে·····" বল। জবাব দাও " ইত্যাদিরূপ বিকৃত ভঙ্গী কোন্ সমাজের ও কোন্ অবস্থার উপযোগী তাহা স্পষ্ট খুলিয়া বলা সুরুচিসঙ্গত না হইতে পারে কিন্তু মিথ্যা হইবে না।

এছাড়া বাঙ্গালা রচনার মধ্যে ইংরাজী শব্দের এরূপ অকারণ বহুল প্রয়োগ অল্পলোকের লেখাতে দৃষ্ট হয়। ইহাতে ইংরাজী বিদ্যার গভীরতা সূচনা করে কিনা ঠিক বলিতে পারি না কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার অভাব প্রকাশ করে ইহা নিশ্চয়। সাহিত্য ছেলেখেলা বা আর কিছুর জিনিষ নহে—তাহা শ্রদ্ধা সহকারে সাধনার সামগ্রী।

এ সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও তাঁহার রচনায় যদি কোনও শৃঙ্খলা বা পরিপাটী পদ্ধতি থাকিত, তাহা হইলেও পড়িয়া কতকটা তৃপ্তি হইত কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহার কিছুই নাই। উপস্থিত মত যে কথাটা বা ভাবটা মনে আসিয়াছে সেইটাই তৎক্ষণাৎ যোজনা করিয়া দিয়াছেন। যুক্তির শৃঙ্খলা নাই অথচ প্রথম Logic শিক্ষার্থী বালকের মত Logic এর গোটাকতক terms তুলিয়া প্রবন্ধটীকে শূন্যগর্ভ পাণ্ডিত্যে মণ্ডিত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

এইবার দ্বিজেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধের আলোচনা করা যাক্। রবীন্দ্রবাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহার স্থূল মর্ম্ম এইরূপ :—কাব্য ভালো অর্থাৎ গভীর রসাত্মক হইলে প্রকৃতি শিক্ষা দীক্ষা ও অবস্থার বিভিন্নতা অনুসারে নানা লোকের হৃদয়ে নানারূপ ভাবের উদ্রেক করিয়া থাকে ; তদনুসারে তাহার ব্যাখ্যাও নানারূপ হইতে পারে ; এবং তাহার সকল গুলিকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় যদি রসোদ্রেক ও রসের গভীর অনুভূতি সম্বন্ধে তাহাদের উপযোগিতা থাকে। কারণ, রসের বিষয়ে সত্য মিথ্যা নির্ণয়ের তাহাই একমাত্র মানদণ্ড। রসের ধর্ম্মই এই যে, তাহার অনুভূতি অত্যন্ত গভীর হইলে কোন না কোনও তত্ত্বের মধ্যে উপনীত করে ( পরিশেষে সেই চরম তত্ত্বের মধ্যে লইয়া যায়—সত্য শিব সুন্দর যাহার ত্রিবিধ প্রকাশ মাত্র। ) মেঘদূত কাব্যে বিরহের রস যেমন গভীর পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে এমন আর কোথাও নহে ; কাজেই রসের ধর্ম্মানুসারে তাহা বিরলের যাহা তত্ত্ব তাহাকে গিয়া স্পর্শ করিয়াছে। কালিদাস ইচ্ছা করিয়া সে তত্ত্ব প্রচার করিতে গিয়াছেন এমন না হইতে পারে এবং সম্ভবতঃ তাহা নহেও। কিন্তু তিনি বিরহের রস অত্যন্ত গভীরভাবে অনুভব করিয়াছেন বলিয়াই, যক্ষের বেদনায় তাঁহার বীণার যে তার কাঁপিয়া উঠিয়াছে তাহা হইতেই সেই পরম বিরহের ব্যথা ধ্বনিত হইতেছে সকল খণ্ড বিরহই যাহার রসে পরিপূর্ণ এবং সকল মিলন ও সকল সৌন্দর্য্যাভোগের মধ্যে যে বিরহের ব্যথা মানুষকে নীড়বিরহিত কপোতের মত কেবলই অস্থির করিয়া তুলিতেছে এবং "লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ন না গেল" বলিয়া যে ক্রন্দন উঠিতেছে তাহা আর কিছুতেই থামিতে চাহিতেছে না। সেই পরম ও একমাত্র ঈপ্সিতকে না পাইলে তাহার আর কিছুতেই তৃপ্তি নাই। যক্ষ ও যক্ষপত্নীর পরস্পর অবস্থান এইরূপ ভাবে মেঘদূত হইতে রস গ্রহণ করিবার পক্ষে অনুকূল। নির্ব্বাসিত, সকল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একমাত্র বিরহের বেদনায় দেহে মনে প্রাণে একান্ত পরিপূর্ণ হইয়া বিলাপ করিতেছে এবং বাঞ্ছিত ও অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে রুক্ষ শিথিল কেশে গীতহীন বীণা কোলে তাহারই জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

এই তো গেল রবীন্দ্রবাবুর ব্যাখ্যা। তত্ত্বটি নূতন নহে। কাব্যের ভাষায় যাহা বাঞ্ছিতের জন্য চিরাকাঙ্ক্ষা, ভক্তের কথায় তাহা ভগবানের জন্য জীবের ক্রন্দন



এবং বৈষ্ণব শাস্ত্রে তাহাই ব্রজগোপীর ভাব। তবে মেঘদূত কাব্য এতত্ত্বে লইয়া যায় কিনা সে স্বতন্ত্র কথা।

দ্বিজেন্দ্রবাবুর এ ব্যাখ্যা মনঃপূত হয় নাই। এ সম্বন্ধে তিনি নানারূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার লেখার ভাবে বোধ হয় যেটি তাঁহার আসল ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান আপত্তি, সেটীকে উহ্য রাখিয়া গিয়াছেন। বোধ হয়, "আধ্যাত্মিক" শুনিলেই তাঁহার গায়ে জ্বর আসে এবং সে আপত্তিটী কতক পরিমাণে "আধ্যাত্মিক" এই নিমিত্ত। প্রবন্ধটী রবীন্দ্রবাবুর রচিত এবং অতি সুন্দর। কিন্তু মনুষ্য সমাজের বর্ত্তমান অধঃপতিত অবস্থায় এ আপত্তি তো স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করা চলে না। সুতরাং—যাহাই হৌক।

দ্বিজেন্দ্রবাবু রবীন্দ্রবাবুর ব্যাখ্যাটি চুম্বকে সারিয়া লইয়া তাঁহার রসিকচূড়ামণি খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার অভিপ্রায়ে পরম রসিকতার সহিত লিখিতেছেন—"পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার মিলিবার জন্য ব্যাকুলতা পরম আধ্যাত্মিক ব্যাপার ও শুনিতে বেশ। কিন্তু মেঘদূতে সে কথা নাই। এই বিষয়ে রবীন্দ্রবাবুর মীমাংসা a priori।"

দ্বিজেন্দ্রবাবু যে a priori কথাটা নিন্দাসূচক ভাবে ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। কিন্তু Logic শাস্ত্র অন্যরূপ বলে। Gevons বলেন "By a priori reasoning we mean arguments based on truths previously known. Knowledge may originally be of an a posteriori origin and yet having been long in possession and having acquired a greater certainty it may be ground of deductions and may then be said to give a priori knowledge. .....But the same differance ( a priori ও aposteriori কিম্বা synthetic ও Analytic method এর মধ্যে ) is really expressed in the words deductive and iuductive ; দ্বিজেন্দ্রবাবু Deductive method টাকে কি একেবারে নস্যাৎ করিয়া দিতে চান ? তাহা হইলে Three Primary laws of thought, প্রায় সমস্ত গণিত শাস্ত্র এবং বিজ্ঞান জগতের অনেক সিদ্ধান্ত যে সঙ্গে সঙ্গে একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া যায় সে কথা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি ?

তা ছাড়া রবীন্দ্রবাবুর মীমাংসা সম্পূর্ণ a priori ও নহে। কিন্তু সে কথার এখানে আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই।

ইহার পর দ্বিজেন্দ্রবাবু ভালোকাব্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রবাবুর অভিমতটী লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রবাবু বলেন "ভালো কাব্য মাত্রেরই একটী গুণ আছে, তাহার মধ্য হইতে লোকে নানা ভাব গ্রহণ করিতে পারে।" দ্বিজেন্দ্রবাবু একথা একেবারেই স্বীকার করেন না। তিনি Logic শাস্ত্রের Immediate inference নামক উপপত্তির নিয়মানুসারে রবীন্দ্রবাবুর প্রতিজ্ঞা হইতে 'যাহা হইতে লোকে নানা ভাব গ্রহণ করিতে পারে না তাহা ভালো কাব্য নহে" এই সিদ্ধান্ত উপপন্ন করিয়াছেন এবং কতকগুলি (তাঁহার মতে) একার্থক ভালো কাব্যের নাম করিয়া উক্ত সিদ্ধান্ত ও সঙ্গেসঙ্গে রবীন্দ্রবাবুর মূল প্রতিজ্ঞাটীর ভ্রান্তি প্রতিপাদনে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার উপপত্তি প্রকরণে কোনও ভুল নাই; তবে Euler এর পদ্ধতি অনুযায়ী গোটাকতক বৃত্ত আঁকিয়া দিতে পারিলে সম্পূর্ণ নির্ভুল হইত, এবং "অর্চ্চনা"র পাঠকবর্গের বিস্ময় অধিকতর পরিমাণে উৎপাদন করিতে পারিতেন। যাহা হউক হইয়াছে সবই ঠিক—চক্ষুরোগের চিকিৎসায় 'কর্ণ ছিত্বা কোটিং দহেৎ' এর যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা শাস্ত্রসম্মতই হইয়াছে কিন্তু উহা গোচিকিৎসা প্রকরণে; পাতা উল্টাইয়া তাহা দেখিবার সামান্য একটু মাত্র ভুল হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রবাবুর আশ্রয়ীভূত Logic এর ভাষায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি রবীন্দ্রবাবুর অভিমতটীতে "ভালো" শব্দটী যে ব্যবহার হইয়াছে তাহার কোনও Definite connotation আছে কিনা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? সাধারণ কথাবার্ত্তায় ও লেখায় উৎকর্ষের মাত্রার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া "ভালো" শব্দটীর ব্যবহার হইয়া থাকে। সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া চলনসইএর একটু উপর পর্য্যন্ত মাত্রা নির্ব্বিশেষে 'ভালো' শব্দের দ্বারা সূচিত হয়। রবীন্দ্রবাবুও 'ভালো কাব্য' কথাটী দুই প্রকার অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন—প্রথম সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্য; দ্বিতীয় চলনসই 'ভালো' কাব্য। সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্যগুলিতে তাঁহার উল্লিখিত লক্ষণটী থাকিবেই; কিন্তু তাহা না থাকিলেও চলনসই গোছ ভালো কাব্য হইবার আটক নাই। রবীন্দ্রবাবুর লেখার ধরণে ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়। তিনি লিখিয়াছেন 'ভালো কাব্য মাত্রেরই "একটি" গুণ আছে



ইত্যাদি।' সুতরাং ঐ একটি ছাড়া ভালো কাব্যের আরো অনেক গুণ আছে সে কথা তিনি তো অস্বীকার করেন নাই; তবে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্যশ্রেণীতে গণ্য হইতে হইলে ওগুণটী থাকা চাই-ই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, 'ভালো' শব্দটীর Definite connotation এর অভাবে দ্বিজেন্দ্রবাবুর Logic এর এমন বিপুল আয়োজনও পণ্ড হইয়া গেল।

এখন কথা হইতেছে, রবীন্দ্র বাবুর "সাধারণ প্রতিজ্ঞাটী" সত্য কি না? এ বিষয়ের রীতিমত আলোচনা এ প্রবন্ধের আয়তনের মধ্যে হওয়া সম্ভবপর নহে সুতরাং সংক্ষেপে সারিয়া লইতে হইবে।

সত্য নির্ণয়ের দুই পন্থা। এক জ্ঞাত সত্য হইতে তথ্যান্তরের উপপত্তি অর্থাৎ a priori বা Deductive method; দ্বিতীয় ভূয়োদর্শনের পন্থা অর্থাৎ a posteriori বা Inductive method

প্রথমতঃ a priori দেখা যাক্। কাব্যের বিষয় কি? না ভাব ও রসের অনুভূতিসমূহ—ইংরাজীতে যাহাদিগকে Feelings, Emotions, Sentiments বলা হয়। মনস্তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন সমস্ত মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের মধ্যে ঐটীই সর্ব্বাপেক্ষা অনালোকিত প্রদেশ। কি নিয়মে সুখ দুঃখ অনুরাগ বিরাগ ঈর্ষা দ্বেষ ক্রোধ অভিমান প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত হয় তাহার অধিকাংশই অজ্ঞাত এবং (সম্ভবতঃ) অজ্ঞেয়। তাহা হইবারই কথা। কারণ, সুখ দুঃখ প্রভৃতির গভীর ও প্রবল অনুভূতির সময় তাহাই চেতনার সমস্ত ক্ষেত্র ব্যাপিয়া বিরাজ করে; বিচার শক্তির কোন স্থান থাকে না। কাজেই ওসম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হয়, তাহা পরে স্মৃতির সাহায্য লইয়া। আর অপর ব্যক্তির মনোভাবের বিষয়ে যাহা সিদ্ধান্ত করা যায় তাহাও বাহ্য লক্ষণ দেখিয়া অনুমান মাত্র। ফলে, অধিকাংশই অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। আবার উষার অরুণরাগরঞ্জিত লঘু মেঘপুঞ্জের মত যে সকল অনুভূতির প্রকৃতিও অতি বিচিত্র। পরস্পরের সীমা নির্দ্দেশ করা যায় না যে কে কখন কোনরূপ ধরে তাহারও কিছু স্থিরতা নাই। সুখ দুঃখে পরিণত হয়; অনুরাগ বিরাগ স্থান বিনিময় করে; প্রেম ক্রোধের ছদ্মবেশে দেখা দেয়; হাসির মধ্যে শান্তিলাভ করে। আবার এই সকল অনুভূতি যখন অত্যন্ত গভীর বা তাহাদের মধ্যে প্রচণ্ড আন্দোলন উপস্থিত হয় তখন তো কথাই নাই।

অথচ ভালো কাব্যের বিষয়ই তাহাই। কাজেই ভবভূতির 'স্বপ্ন জাগরণের' নির্দে
থাকে না, 'মায়া মতিভ্রমের' বিভ্রম উপস্থিত হয়, 'সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা' বলিয়া
ব্যাকুলতা জাগে। মিলনের মাঝখানেও চণ্ডীদাসের হৃদয় যে বেদনায় কাঁদিয়া
উঠে তাহা সুখের ব্যথা কি দুঃখের ব্যথা বুঝিয়া উঠা কঠিন হইয়া উঠে। শেলি
গাহিয়া উঠেন "Under the lightnings of the soul too deep for the
brief fathom-line of thought or sense. বৈষ্ণব শাস্ত্রেও ঠিক এরূপ
দেখিতে পাই। মধুর রসে বাৎসল্যাদি সকল রসই ওতপ্রোত ভাবে মিশিয়া
থাকে—স্বরূপ নির্ণয়ের উপায় থাকে না। সুতরাং নানা লোকে যে নানাভাবে
গ্রহণ করিবে তাহাতে বিস্ময়ের কোনই কারণ নাই।

আবার ভাবের ভাষার প্রকৃতিও স্বতন্ত্র। তাহা জ্ঞানের ভাষার মত নিশ্চি
বিধিবদ্ধ নহে। গভীর ও প্রবল ভাবের আঘাতে সে ভাষা কখনও অর্দ্ধস্ফু
কাকলীতে ফুটিয়া উঠে—কখনও বা প্রচণ্ড বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের তরঙ্গের মত
এ উহার গায়ে ভাঙ্গিয়া পড়ে—কখনও বা জ্যোৎস্নাসুপ্ত স্তব্ধ মহাসাগরের মত
শান্ত নীরব হইয়া বিরাজ করে—আবার অধিকাংশ সময়ই তাহা গভীর ব
প্রবল হৃদয়াবেগের পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথের "মরম বেদনা মরমে
থাকে ভাষা থেকে যায় বাহিরে"; শেলির বুকে হাহাকার উঠে:—

Woe is me!
The winged words on which my soul would pierce
Into the height of love's rare universe,
Are chains of lead around its flight of fire
I pant, I sink, I tremble, I expire.

কাজেই ভাব ও ভাবের ভাষার প্রকৃতি আলোচনা করিলে রবীন্দ্রবাবুর উক্তি
যে যথার্থ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না।

A posteriori ও তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণ মহাভারত হইতে
আরম্ভ করিয়া (গ্রীক ভাষায় অনভিজ্ঞ কাজেই ইলিয়াডের কথা ঠিক বলিতে পারি
না—তর্জ্জমায় কাব্যের "দেহ শুধু হাতে ঠেকে") Browning রবীন্দ্রনাথ
পর্য্যন্ত যিনি যেখানে যে ভালো কাব্য লিখিয়াছেন সকলেরই দেখি ঐ ধর্ম্ম, ঐ



স্পেনসারের Faerie Queene বা Dante এর Divine Comedy ই লও
শেক্সপীয়রের ভালো নাটকগুলি কিম্বা Goethe র Faust এর কথাই বল
বা চণ্ডীদাসের গানগুলির বিষয়ই ভাবো। কিন্তু দ্বিজেন্দ্র বাবুও তো বিজয়
র্দ্ধে একবার চারিদিকে ঈষদ্দৃষ্টিপাত করিয়া লইয়া এই সকল সাক্ষীরই তো
দিকাংশের নাম করিয়াছেন দেখিতেছি! কিন্তু তিনি যতই তালিম করুন
হাদের এমনই নষ্টস্বভাব যে ধর্ম্মাধিকরণে সত্যকথাই বলিয়া ফেলে। দুঃখের
ষয় সন্দেহ নাই। সকলের জবানবন্দী লওয়ার অবকাশ নাই এবং তাহার
য়োজনও দেখি না। দুএকটী বড় বড় সাক্ষীকে নাড়িয়া দেখিলেই বুঝিতে
রা যাইবে!

১ নং Shakespeare:—Lamb's Tales বা হারাণরক্ষিত মহাশয়ের
র্জ্জমা পড়িয়া যাহাই হউক আসল Shakspeareএর শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি পড়িলে
বীন্দ্র বাবুর উক্তি যে বর্ণে বর্ণে সত্য সে বিষয়ে কোনও প্রকৃতিস্থ পাঠকেরই
ন্দেহ থাকিতে পারে না। তাঁহার রচিত ভাল নাটকগুলির কোনও একটী
শেষ শব্দ, বিশেষ পদ, বিশেষ অংশ, বিশেষ চরিত্র এবং সমস্ত নাটকখানির
নিহিত ভাব লইয়া দেশী বিদেশী কবি দার্শনিক কত ভিন্ন সমালোচকের কত
ভিন্ন প্রকার মত। একই অংশের অভিনয় সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা-
র কত বিভিন্ন প্রকার হাবভাব অঙ্গভঙ্গী স্বরবৈচিত্র্য। এ সকলের কি
কোনই ভিত্তি নাই? সকলেই কি দ্বিজেন্দ্র বাবুর সহিত শত্রুতা সাধিবার
ন্য ধর্ম্মঘট করিয়া বসিয়াছেন? এরূপ বিভিন্নতা হওয়া যে অবশ্যম্ভাবী।
শেক্সপিয়রের নাটকগুলি তো আর বাঙ্গলা থিয়েটারের রাতারাতি শেক্স-
রের-লাভ-প্রয়াসী অনুকরণ-সর্ব্বস্ব বামনদিগের বেতালা বাগাড়ম্বর-সমষ্টি
য়। উহা যে জীবনের বিচিত্র লীলায় লীলায়িত—হৃদয়ের অনন্ত স্পন্দনে
ন্দিত। কাজেই বৈচিত্র্য আপনি জাগিয়া উঠে; রহস্য যে আপনি
ইয়া আসে। যাহারা নিকটতম ঘনিষ্ঠতম, যাহাদের প্রতি কথা প্রতি
চরণের সহিত বাল্যকাল হইতে পরিচিত, তাহাদেরও কথা ও আচরণের
ভ্যন্তরীণ মানুষটির স্বরূপ বুঝিতে কত ভুল হয়! আর, এ যে দুটী একটী
দুএকটী ব্যবহার, দুটী একটী ঘটনার বন্ধনের মধ্যে, যাহা বিচিত্র, যাহা

রহস্যময়, যাহা নিত্যচঞ্চল, যাহা বন্ধনের অতীত সেই সমগ্র জীবনটীকে বাঁধিবার চেষ্টা; নানা লোকের মনে নানা ভাব জাগিবেই, ব্যাখ্যা তো নানারূপ হইবেই।

দুটী একটী উদাহরণ না দেখিলে দ্বিজেন্দ্রবাবু যে সন্তুষ্ট হইবেন তাহা বোধ হয় না। কাজেই, অনাবশ্যক জানিয়াও তাহা দিতে হইল।

প্রথমতঃ রোমিও জুলিয়েটের বিষয় দেখা যাক্। এ নাটকখানিতে চরিত্র রহস্য ও হৃদয়াবেগের গভীরতা ও আন্দোলন অপেক্ষাকৃত অনেক কম। তথাপি, ইহার চরিত্রগুলি ও সমস্ত নাটকের মর্ম্ম সম্বন্ধে কত বিভিন্ন প্রকার মতবাদ। একটী অপেক্ষাকৃত কম জটিল চরিত্র লইয়া দেখিলে কথাটা বেশ পরিষ্কার হইবে। Mercutioর চরিত্র দেখুন। Arthur Brookeএর মূল কবিতায় এ চরিত্র আছে। তাহার বর্ণনা এইরূপ। Bold among bashful maidens, a lion among lambs and he had an "ice-cold hand." Dowden বলেন, "Putting together these two suggestions, discovering a significance in them and animating them with the breath of his own life Shakspeare created the *brilliant* figure which lights up the first half of Romeo and Juliet and disappears when the colours become all too grave and sombre." অথচ Gervinus এই ব্যক্তি সম্বন্ধেই বলেন "A man without culture and rude ugly, a scornful ridiculer of all sensibility and love. অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি!

তাহার পর Julietএর অন্তিম Soliloquy দেখুন। Coleridge তাহার মধ্যে কেবল ভীত সন্ত্রস্ত ভাব দেখিয়াছেন। তিনি বলেন "Shakespeare provides for the finest decencies. It would have been too bold a thing for a girl of fifteen but she swallows the draught in a fit of fright." কিন্তু Dowden বলেন "This deprives Juliet of all that is most characterstic in the act" জুলিয়েটের উত্তপ্ত কল্পনায় বোধ হইল Tybaltএর প্রেতমূর্ত্তি রোমিওর অনুসরণ করিতেছে।



অমনি All fear deserts her. With a confused sense that this draught will somehow place her close to the murderous Tybalt and close to Romeo whom she would save calling aloud to Tybalt to delay one moment "Stay Tybalt, stay" she drinks the phial not "in a fit of fright" but with the words "Romeo! I come; this do I drink to thee." George Fletcher আবার অন্যরূপ বলেন এবং সে সম্বন্ধে Dowden বলেন "I will not assert that he may not be right."

তাহার পর সমস্ত নাটকের মর্ম্মগত ভাব সম্বন্ধে কিরূপ ভিন্ন মত তাহার কিছু নমুনা দিই:—Dowden বলেন "The play of Romeo and Juliet exhibits to us the deliverance of a man from dream to reality". Gervinus এ গ্রন্থের তাৎপর্য্য নির্ণয় করেন "A lesson in moderation" Romeo and Juliet সম্বন্ধেই যখন এইরূপ তখন Hamlet, Macbeth, Othello, King Lear, Antony and Cleopatraর কথা তুলা বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু, যখন দ্বিজেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ লইয়া আলোচনা করিতে বসিয়াছি তখন সে বিড়ম্বনা ভোগ তো ললাটলিপি।

এবার হ্যাম্‌লেটের বিষয় আলোচনা করা যাক্। সমগ্র হ্যাম্‌লেট নাটকের ও হ্যাম্‌লেট চরিত্রের ভিন্ন ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা করিয়া যত গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে আর কোনও নাটক বা চরিত্র সম্বন্ধে সেরূপ হয় নাই; এবং আমার বিশ্বাস এই বিপুল গ্রন্থরাজি আজ যদি ধ্বংস হইয়া যায় পঁচিশ বৎসরের মধ্যে গ্রন্থ ও মতের সংখ্যা এইরূপ হইয়াই দাঁড়াইবে। এ নাটকের বিশেষতঃ হ্যাম্‌লেট চরিত্রের রহস্য ও আকর্ষণ এত অধিক! এ নাটক সম্বন্ধে Dowdenএর মত কি দেখা যাক্। "The *mystery*, the *baffling* vital *obscurity* of the play and in particular the character of its chief person make it evident that Shakespeare had left far behind him that early stage of devolpment when an artist obtrudes his intentions and distrusting his own ability to keep sight of

one uniform design, deliberately and with effort holds the design persistently before him.....Hamlet might so easily have been manufactured into an enigma or puzzle and then the puzzle, if sufficient pains were bestowed could be completely taken to pieces and explained. But Shakespeare created it a *mystery* and therefore it is for ever *suggestive*—for ever suggestive and never *wholly* explicable. দ্বিজেন্দ্র বাবুর আপত্তির উত্তর ও রবীন্দ্র বাবুর মতের সমর্থন ইহা অপেক্ষা সুস্পষ্টতর হইতে পারে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। দ্বিজেন্দ্র বাবু স্থানান্তরে লিখিয়াছেন "আধ্যাত্মিক অর্থ যেখানে সত্যই আছে সেখানে সেই আধ্যাত্মিক অর্থই কবির অভিপ্রেত। সেখানে কবিতার একই অর্থ এবং সে অর্থ সহজেই বুঝা যায়।" Dowden হইতে উদ্ধৃত অংশ হইতে পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন যেখানে কবির ক্ষমতা অল্প সেইখানেই এইরূপ হইয়া থাকে।

তারপর দেখুন। Werner describes it (Hamlet) as Shakespeare's artistic presentation of a phenomenon recurrent in the world with the regularity of a law of nature, the phenomenon of revolutions. আরো চাই? Goethe বলেন "To me it is clear that Shakspeare meant to represent the effects of a great action laid upon a soul unfit for its performance. On this view the whole piece seems to be composed. Schlegel বলেন "The whole is intended to show that a calculating consideration which exhausts all the relations and possible consequences of a deed must cripple the power of acting" Coleridge বলেন "In Hamlet we see a great, an almost enormous intellectual activity and proportionate aversion to real action consequent upon it." ইহার উত্তরে Dowden বলেন "To represent Hamlet as a man of preponderating power of reflection and



to disregard his craving sensitive heart is to make the whole play incoherent and unintelligible."

এরূপ ভাবে সমালোচকদিগের মত তুলিতে গেলে কোথায় গিয়া যে শেষ করিতে পারিব তাহার কিছুই স্থিরতা নাই সুতরাং আর একটী মাত্র মত তুলিয়াই Shakespeare সম্বন্ধে আলোচনায় ক্ষান্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ মনে হয়। যাহারা বুঝিতে চাহেন তাঁহাদের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট আর যাঁহারা বুঝিতে চাহেন না তাঁহারা যে একটী মাত্র প্রমাণ বুঝেন তাহার কার্য্যকারিতা জানিয়াও তাহা প্রয়োগ করিতে স্বভাবতই দ্বিধা বোধ করে এমন প্রকৃতিও সংসারে একেবারে দুর্লভ নহে।

Hamletএর অন্তিম বাণী অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে :—

Had I but time ; as this fell sergeant death
Is strict in his arrest—O, I could tell you.

এ সম্বন্ধে Dowden বলেন "But he has not told. Let us not too readily assume that we know the stops of Hamlet, that, we can pluck out the heart of his mystery.

দ্বিজেন্দ্র বাবুর প্রদত্ত ফর্দ্দের সকল কবি সম্বন্ধে এরূপ বিস্তৃত আলোচনা করিতে গেলে পুঁথি অনর্থক বাড়িয়া যায়। অথচ দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় একেবারে নীরব থাকাও সুবিবেচনার কার্য্য নহে। সম্পূর্ণ অসম্মতি সত্ত্বেও কে বল সাধ করিয়া কেবল মাত্র মৌনী থাকার জন্য সম্মতির দায়ে পড়িতে চায়?

(২) রামায়ণ—ধর্ম্মের জয় অধর্ম্মের ক্ষয়, ধর্ম্মাধর্ম্ম সুখ দুঃখের নিয়ামক নহে, নিয়তি কেন বাধ্যতে, প্রাচীন আর্য্য সভ্যতার আদর্শ ফুটাইয়া তুলা, কষ্ট দ্বারা ধর্ম্মের পরীক্ষা রামায়ণের ইত্যাদিরূপ নানা প্রকার ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। আর রাম সীতা লক্ষণ প্রভৃতির চরিত্র প্রকৃতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন লোকের মনে ভিন্ন ভাব জাগাইয়া থাকে। 'সমগ্রা রূপিণী লক্ষ্মীঃ কমেকং সংশ্রিতাং নরং' বাল্মীকির এই প্রশ্নে নারদ যাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন 'দেবেষ্বপি ন পশ্যামি কশ্চিদেভির্গুণৈর্যুতং। শ্রূয়তাং তু গুণৈরেভি র্যো যুক্তো নর

চন্দ্রমা॥ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই বাঙ্গালার একজন শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়াছিলেন 'I despise Rama and his rabble' আর বেশী দূর যাইবারই বা প্রয়োজন কি? স্বয়ং দ্বিজেন্দ্র বাবুই যে তাহার সাক্ষী। সমস্ত ভারতবর্ষ রামের যে সীতা নির্ব্বাসনের সহস্র বর্ষ ধরিয়া অর্থ করিয়া আসিয়াছে কর্ত্তব্য নিষ্ঠা, রামরাজ্য প্রবাদ এবং দেবতার পূজা, দ্বিজেন্দ্র বাবু তাঁহার 'সীতা' নামক "মহাকাব্যে"(!) তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন 'কুলগৌরব নামক সঙ্কীর্ণ ভাবের নিকট ন্যায় ও ধর্ম্মের বলিদান'! "অধ্যাত্ম রামায়ণের" কথা আর তুলিলাম না।

(৩) Byronএর সমস্ত কাব্য; Shelleyর অধিকাংশ কবিতা Wordsworth এবং হেমবাবুর সমস্ত কবিতা।

Byron;—ফল হিসাবে বিচার করিলে Byronএর অদ্বিতীয় প্রতিভা যে অনেকটা ব্যর্থ হইয়াছে, প্রায় সকল রসজ্ঞ সমালোচকই এই কথা বলেন। ইহার কারণ এই, তাঁহার কাব্যে চিরন্তন সত্যের তেমন সমাবেশ নাই। অর্থাৎ ভাব ও রসের অনুভূতি যেমন গভীর হইলে চিরন্তন সত্যকে স্পর্শ করে, তাহা তেমন গভীরতা লাভ করে নাই। কাজেই, যে রহস্য বুঝিবার ব্যাকুলতায় নানাবিধ ব্যাখ্যার সৃষ্টি হইয়া থাকে তাহারই একান্ত অসদ্ভাব। আলোচ্য প্রবন্ধের স্থানান্তরে দ্বিজেন্দ্র বাবু নিজেই তো Byronএর কল্পনাকে "ব্যাধি গ্রস্ত হৃদয়ের কল্পনা" বলিয়াছেন এবং স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি অতখানি শক্তিসত্ত্বেও কবিত্বের 'সর্ব্বোচ্চ' শিখরে উঠিতে পারেন নাই অর্থাৎ রবীন্দ্র বাবু যাহাকে "ভালো কাব্য বলিয়াছেন সেরূপ কাব্য রচনা করিতে পারেন নাই। সুতরাং Byronএর কথা তুলিবার কোনও কারণই তো নাই। Shelleyর অধিকাংশ খণ্ড কবিতা:—আমি স্পষ্ট স্বীকার করিতেছি শেলির কবিতা নানাভাবে গ্রহণ করিতে পারা যায় কিনা সে বিষয়ের আলোচনা সম্প্রতি অবস্থায় আমার দ্বারা হওয়া সম্ভবপর নহে। আমি তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। এই প্রসঙ্গে কেবল একটী মাত্র কথা বলা আবশ্যক বিবেচনা করি। Epipsychidionএর "আধ্যাত্মিক" অর্থের প্রসঙ্গ মাত্রে দ্বিজেন্দ্র বাবু ক্রোধে দিশাহারা হইয়া "খবর্দ্দার" বলিয়া তাড়া করিয়া আসেন দেখিলাম। "আধ্যাত্মিক" অর্থ কাহাকে বলে ঠিক জানিনা তবে উহা যে লোকে নানা



ভাবে গ্রহণ করিতে পারে (রবীন্দ্র বাবুর মতের পক্ষে যাহা যথেষ্ট) তাহা শেলি স্বয়ং একরূপ স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া গিয়াছেন। উক্ত কবিতার মুখবন্ধে তিনি লিখিতেছেন "The present poem, like the "Vita Nuova" of Dante, is *sfficiently intelligbile to a certain* class of readers *without a matter of fact history* of the circumstances to which it relates; and to a certain other class it must ever remain *incomprehensible* from a defect of a common organ of perception for the ideas of which it treats." ঘটনার বিষয় কিছু না জানিয়া যাহা কেবল আভাসে ইঙ্গিতে বুঝিতে হয় এবং অনেকের নিকট যাহা একেবারে অবোধগম্য, তাহার যদি নানা ব্যাখ্যা হইবেনা তো কিসের হইবে?

Words worthএর অধিকাংশ কবিতা:—Wordsworthএর কবিতার বিষয় অতি সাধারণ, ভাষা যথাসম্ভব সরল ও অন্বয় সহজ বলিয়া স্থূলদর্শী পাঠকের এইরূপ ভ্রম জন্মিতে পারে। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে প্রকৃত ভাব লইয়া মনের মধ্যে বিতর্ক ও আন্দোলনের অবধি থাকে না। একটী দৃষ্টান্ত দেখুন:—

To me the meanest flower that blows can give
Thoughts that do often lie too deep for tears.

ইহার একটী শব্দের ও অর্থের জন্য অভিধান খুলিতে হয় না, অক্ষর বুঝিবার জন্য ব্যাকরণের সাহায্য আবশ্যক করে না। তথাপি, ভাবের দিক দিয়া দেখিলে ইহার মধ্যে কত গভীরতা, কত অনির্দ্দেশ্যতা কি রহস্য! সামান্য ফুল দেখিয়া মনে এমন কি ভাব জন্মিতে পারে যাহাতে চোখ্ আপনি জলে ভরিয়া উঠে, অথচ যাহার গভীরতা চোখের জলেও প্রকাশ হয় না? উহা কি সৌন্দর্য্য অনুভূতির অনির্দ্দেশ্য সুখের বেদনা? উহা কি বিস্ময়? না উহা-প্রেম? ঠিক নির্দ্দেশ করিয়া কে বলিতে পারে?

সমালোচকেরাও এইরূপ বলিয়া থাকেন। কবি বা দার্শনিক সমালোচক দিগের কথা ছাড়িয়া দিয়া একজন সাদাসিধে সাধারণ সমালোচকের মত দেখা

যাক্। Hales বলিতেছেন "He loved to look on the face of nature, but to him this face was precious as the index of the soul. It was the meaning of things he cared for, not the things themselves ; like Spenser he was eminently a *spiritual* poet, everywhere he heard her (Nature's) deep mysterious voice. Wordsworth স্বয়ং Excursionএর ভূমিকায় স্বীয় কাব্যের লক্ষ নির্দ্দেশ করিয়াছেনঃ—

"For I must tread on shadowy ground, must sink
Deep—and aloft ascending breathe in worlds
To which the heaven of heavens is but a veil.

হেমবাবুর সমস্ত কবিতা :—দশমহাবিদ্যা কাব্য খানি হেমবাবুর রচিত বলিয়া এ যাবৎকাল সকলের বিশ্বাস ছিল ; স্বয়ং হেমবাবুও তাহাই বিশ্বাস করিতেন বোধ হয়। কিন্তু দ্বিজেন্দ্র বাবুর মত সাবধান লেখক যখন এত জোর করিয়া বলিতেছেন তখন হেম বাবুরও ও সম্বন্ধে ভ্রম ছিল বোধ হইতেছে। দ্বিজেন্দ্রবাবু উক্ত কাব্যের প্রকৃত রচয়িতার নাম নির্দ্দেশ করিয়া একটা বদ্ধমূল ভ্রম হইতে সাহিত্যের উদ্ধার সাধন করিলে সুখী হইব।

(৪) Marseilles প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত গান।

গান জগদ্বিখ্যাত হইলেই যে তাহা কাব্যাংশে ভালো হইবে এমন কোনও কথা নাই। অনেক সময় মানুষের সংকীর্ণতা ও কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দিয়া জিঘাংসা, বিজিগীষা প্রভৃতির উত্তেজনা করিয়া গান বিখ্যাত হইয়া পড়ে। যদি আইনে না মানায় তবে Englandএর National anthem "God save the king" কাব্যাংশে খুব শ্রেষ্ঠ একথা কে মানিবে ?

এই তো গেল প্রথম ও প্রধান আপত্তি। তাহার পর যক্ষ ও যক্ষ পত্নীর পরস্পর অবস্থান যে এইরূপ ব্যাপারের অনুকূল দ্বিজেন্দ্র বাবু তাহা স্বীকার করেন না। রবীন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন "একজন আছে মর্ত্ত্যের জনশূন্য পর্ব্বত শিখরে আর একজন আছে স্বর্গের ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত সৌন্দর্য্য লোকে।" এইরূপ অবস্থান যে রবীন্দ্র বাবুর স্বকপোল-কল্পিত তাহা প্রমাণ করিবার জন্য দ্বিজেন্দ্রবাবু



বহু বাগ্বিতণ্ডা করিয়াছেন। বিশ্বের বিধান যে অসম্পূর্ণ তাহার একটী প্রমাণ, রসবোধ কিছুমাত্র না থাকিলেও বর্ণবোধ থাকিতে পারে এবং মানুষের বুদ্ধিকৌশলও সেই অসম্পূর্ণতা দোষ দুষ্ট নতুবা মুদ্রাযন্ত্রে যাহা ফেলিবে তাহাই ছাপা হইয়া বাহির হইবে কেন ? "অভ্রভেদী-শিখরে" দ্বিজেন্দ্র বাবুর ঘোরতর আপত্তি দেখিতেছি। তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন যে যক্ষ "রামগিরিশ্রমেষু" বসতি করিত। কিন্তু বেচারা যে বিরহে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া রামগিরিশ্রমের কোনো এক প্রান্তে পড়িয়া থাকিত কালিদাস তো সে কথার উল্লেখ করেন নাই। বরঞ্চ নবমেঘ দর্শনে ব্যাকুল হৃদয়ে তাহাকে নিবিড়তর ভাবে পাইবার জন্য শিখরাধিরোহণই তো স্বাভাবিক। যদি বলেন মেঘতো তাঁহার পদতলে তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি দ্বিজেন্দ্র বাবু কি যক্ষের অধিষ্ঠিত গিরিশৃঙ্গের উচ্চতা কত ফুট কত ইঞ্চি তাহা মাপিয়া দেখিয়াছেন ? এবং Metreology বা Physical Geography শাস্ত্রের নিয়মানুসারে মেঘের উর্দ্ধতম অবস্থান নির্ণয় করিয়া তাহা যে যক্ষের পদতল দিয়াই যাইবে ইহা কষিয়া দেখিয়াছেন ? যদি বলেন "রবীন্দ্র বাবু "অভ্রভেদী" বিশেষণ ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু "অভ্রভেদী" তো উন্নত প্রাসাদ ও উচ্চ বৃক্ষ সম্বন্ধেও ব্যবহৃত হয়। আর গিরিশিখর বলিলেই যে ঠিক পর্ব্বতের উন্নততম বিন্দুটীকে বুঝিতে হইবে এমন কি কথা ? "সামীপ্য" অর্থে সপ্তমী বিভক্তি ও অধিকরণ কারক হইয়া থাকে। সুতরাং শিখর সমীপে অর্থ করিলেও তো চলিতে পারিত। দ্বিজেন্দ্র বাবুর কোনও আত্মীয় যদি তাঁহাকে গঙ্গাবাসের সংবাদ দেন এবং দ্বিজেন্দ্র বাবু যদি তাঁহাকে দেখিতে যান তাহা হইলে তিনি কি একেবারে গঙ্গায় গিয়া ঝাঁপ দিবেন ? আসল কথা অধিত্যকাই হৌক বা শিখরেই হৌক পার্শ্ববর্ত্তী ভূতল হইতে উচ্চ ও বিচ্ছিন্ন হইলেই রবীন্দ্র বাবুর উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত হইবে না। তাহার পর তিনি "জনশূন্য" কথাটায় আপত্তি করেন ; বলেন কালিদাস ও কথা বলেন নাই। কালিদাস কি এমন কথা কোথাও বলিয়াছেন যে যক্ষ রামগিরিতে একলাস করিয়া হাকিমী করিত কিম্বা ভুট্টার চাষ বা পাটের ব্যবসা জমাইয়া তুলিয়াছিল ? সে যে বিজনে নির্ব্বাসন বেদনা বহন করিতেছিল, এ যে ব্যক্তি বুঝিতে পারেন না তাঁহার পক্ষে দোকানের ক্যাটালগই একমাত্র উপযুক্ত সাহিত্য।

তাহার পর বলিতেছেন "যক্ষের স্ত্রী স্বর্গে নাই, অলকায় আছেন অলকা মর্ত্তেই, হিমালয় পর্ব্বতে অলকানন্দা তীরে অবস্থিত"। অক্ষ ও দ্রাঘিমা রেখা এবং তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়াটা সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দিলে ভাল করিতেন, আগামী পূজার ছুটীতে একটা Trip দিয়া আসা যাইত। স্বর্গও যে হিমালয় পর্ব্বতে অবস্থিত নহে তাহা কি করিয়া জানিলেন? প্রাচীন শাস্ত্র ও সাহিত্যের নির্দ্দেশ তো ঐরূপই বোধ হয়। কৈলাশ পর্ব্বত, মানস সরোবর এ সবতো স্বর্গেরই অন্তর্গত মনে হয়। উমার জন্ম, মহাদেবের তপস্যা, মদনভস্ম প্রভৃতির স্থান তো নরলোক বলিয়া মনে হয় না। আর স্বর্গ যেখানেই অবস্থিত হৌক তাহাতে বড় যায় আসে না, যাহা চিরাকাঙ্ক্ষার রাজ্য তাহাই স্বর্গ, সুতরাং যক্ষের একমাত্র স্বর্গ অলকাতেই অবস্থিত। স্বর্গ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থও ঐরূপ। (সু-সুখ ঋজ পাওয়া অধি ঘঞ্) যেখানে সুখ পাওয়া যায়। তাহার পর বলিতেছেন 'কুবের পুরীর' সমস্ত সম্পদ "তাহার" নহে। এ আপত্তির বাহার ও বাহাদুরী আছে বটে। In re goods of Kuvera puriর কোনও মামলার সম্পত্তির Schedule দেখিয়াছেন নাকি? রবীন্দ্র বাবু যে কেবল মাত্র যক্ষ ও যক্ষ পত্নীর মধ্যে ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধীয় পার্থক্যের দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চান এ সহজ কথাটাও কি বুঝিতে পারেন নাই? "কুবের পুরীর সমস্ত সম্পদ" বলিলে সে ভাবটা কি আরো বিশদতর ভাবে প্রকাশ হয় না? বাল্মীকি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সকল সংস্কৃত কবি প্রবল প্রতাপ রাজার সম্বন্ধে "সসাগরা ধরার অধীশ্বর" বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া আসিয়াছেন এবং লোকেও তাহার মর্ম্মার্থ ঠিকই বুঝিয়া আসিয়াছে; মানচিত্র খুলিয়া কোন্ দেশ্ বা কোন সাগর তাঁহার অধিকার বহির্ভূত তাহা লইয়া তর্ক উপস্থিত করে নাই।

সুতরাং রবীন্দ্র বাবু যে ভিত্তির উপর তাঁহার ব্যাখ্যা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহা জীর্ণ ও দুর্ব্বল হওয়া দূরে থাক অটল কঠিন গ্রানাইট্ পাথরে যে গঠিত সে বিষয়ে সংশয় মাত্র জন্মিতে পারে না। তবে "হোক্ না মুন্সেফ মাহিনা পাইবে না" বলিয়া (অ)-ন্যায় শাস্ত্রের একটী চরম যুক্তি আছে। কিন্তু সে যে নাগলোকের অস্ত্র! তাহার নিকট পরাভূত হইলে নরলোকের কাহারও কিছু মাত্র লজ্জার কারণ নাই।



দ্বিজেন্দ্র বাবুর প্রধান আপত্তিগুলি খণ্ডন করা গেল, এখন তাঁহার আনুষঙ্গিক ও অবান্তর আপত্তিগুলির একটু বিচার করা যাক্।

১ম "চিরন্তন তত্ত্ব"—রবীন্দ্র বাবু তাঁহার প্রবন্ধে এই কথাটী প্রয়োগ করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্র বাবুর মতে শব্দদুটী পরস্পর বিরোধী। তিনি বলেন "প্রত্যেক তত্ত্বই চিরন্তন,.....কিন্তু কোনও তত্ত্ব সাময়িক হয় না। আমার বিশ্বাস রবীন্দ্র বাবু Eternal truthএর তর্জ্জমা করিয়াছেন "চিরন্তন তত্ত্ব"। "সাময়িক" তত্ত্ব হইতে পারে না শুনিয়া পরম নিশ্চিন্ত হইলাম। সম্প্রতি কন্যার বিবাহ দিয়াছি; সম্মুখে রথের "সময়ে" তত্ত্ব, তার পর পূজার "সময়ে" তত্ত্ব, তার পর শীতের সময়ে তত্ত্ব করিতে হইবে ভাবিয়া অস্থির হইয়াছিলাম। আপদ গেল—দ্বিজেন্দ্র বাবুর স্বাক্ষরিত ব্যবস্থাপত্র বৈবাহিক বাড়ীতে পাঠাইয়া দিব স্থির করিয়াছি। তারপর দেখুন "প্রত্নতত্ত্ব"। কেন জানিনা বরাবর ঐ বিদ্যাটাকে আমি দুচক্ষে দেখিতে পারিতাম না। এত দিন পরে কারণ বুঝিলাম। বেটা "হইতেই পারে না" অথচ ফাঁকি দিয়া এত দিন "হইয়া" বসিয়াছিল। দ্বিজেন্দ্র বাবু এবার তাহার ভুর ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। রহস্য যাক্। দ্বিজেন্দ্র বাবুর কথা এক হিসাবে যে খুব সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু অত গভীর ভাবে তলাইয়া দেখিলে ব্রহ্মই তো একমাত্র অদ্বিতীয় তত্ত্ব সুতরাং সে হিসাবে "প্রত্যেক" তত্ত্বও তো বলা যায় না; তত্ত্বের মধ্যে "নিগূঢ় বা সহজ" এ ভেদও তো থাকিতে পারে না। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা কৌতুকের বিষয় এই যে দ্বিজেন্দ্র বাবু ধুতি চাদর পরা "চিরন্তন তত্ত্বকে" আসন দিতে নিতান্ত নারাজ কিন্তু হ্যাট-কোটধারী Eternal truthকে Shakehand সহকারে সাদর আহ্বান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছেন। যে হিসাবে প্রত্যেক তত্ত্বই চিরন্তন সেই একই হিসাবে প্রত্যেক Truth ও তো Eternal। তাহা হইলে Eternal truthই বা হয় কি করিয়া? রবীন্দ্র বাবু Eternal truthএর তর্জ্জমা করিয়া থাকিলেও তাহাতে অগৌরবের বিষয় কিছু নাই কিন্তু তাঁহার নিজের অবস্থাটি কেমন সঙ্গীনরূপে হাস্যজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে হাসির গানের রচয়িতা সেটা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? তা ছাড়া দ্বিজেন্দ্র বাবু পারমার্থিক সত্য, ব্যবহারিক সত্য, আংশিক সত্য, খণ্ড সত্য, Half truths এ সকল কি কখনও

শুনেন নাই? রবীন্দ্র বাবুর জন্মের বহুপূর্ব্ব হইতেই তো ওগুলি প্রচলিত আছে সুতরাং তাঁহার সৃষ্ট বলিয়া তো মনে হয় না।

দ্বিজেন্দ্র বাবু অনুমান করিতেছেন রবীন্দ্র বাবু "পারমাত্মিক তত্ত্ব" (অর্থাৎ পরব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া যে সকল সত্য আছে) অর্থে "চিরন্তন" তত্ত্ব কথাটী ব্যবহার করিয়াছেন। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিতেছেন "তবে মানুষের মহৎ প্রবৃত্তিগুলি সে তত্ত্বের অন্তর্গত কি না?" এবং নিজেই মীমাংসা করিয়া বলিতেছেন "যদি তাহা না হয় তাহা হইলে গভীর-রসাত্মক কাব্যের মধ্যে Paradise Lost এবং ভগবদ্গীতা"। মানুষের মহৎ প্রবৃত্তিগুলি যে সে তত্ত্বের অন্তর্ভূত নহে, ইহা তাঁহাকে কে বলিল? ঐ গুলিই তো আরো বিশেষরূপে অন্তর্ভূত—এমন নিবিড় ভাবে যে Kant তাঁহার Critique of Pure Reason এ ব্রহ্মকে একেবারে অজ্ঞেয় বলিয়া স্বীকার করিয়া Critique of Practical Reasonএ ঐ গুলির উপরই তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

২য়। সমগ্র ও মানুষ:—রবীন্দ্র বাবু বলেন "এই যে সুবিশাল সমগ্রের জন্য মানুষের বিরহ বেদনা তাহাই যক্ষের বিলাপের ভিতর দিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া পৃথিবীর নদীগিরি অরণ্যের উপর দিয়া সুদূর কল্পলোকে বহিয়া গেছে।" দ্বিজেন্দ্র বাবু টিপ্পনী করিতেছেন "স্ত্রী হইলেন "সমগ্র" আর স্বামী হইলেন "মানুষ" এরূপ কল্পনা মহাকবি কালিদাস দ্বারা সম্ভবপর নহে। পুরুষও প্রকৃতি বলিলে এ সম্বন্ধে যায় আসিত না। কিন্তু স্বামী "মানুষ" (বোধ হয় আত্মা) ও স্ত্রী "সমগ্র" (বোধ হয় পরমাত্মা) হাস্য কর"। অভিজ্ঞ পাঠক মাত্রেই জানেন যে দ্বিজেন্দ্র বাবুর বর্ত্তমান রোগের উৎপত্তি হাসি হইতেই এবং দেখিতেছি হাস্যই তাহার একটা প্রধান লক্ষণ। দ্বিজেন্দ্র বাবুর বন্ধুরা সুচিকিৎসকের পরামর্শ লইলে ভাল হয়। অকারণ হাসি দেখিলে একটা আশঙ্কা জন্মে বলিয়া একথা বলিতেছি। জীব ও ভগবানের মধ্যে (রবীন্দ্র বাবুর মানুষ ও সমগ্র) একটা দাম্পত্য ভাবের কল্পনা পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই ভক্তি শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণব শাস্ত্রের তো কথাই নাই। এই সকল শাস্ত্রের রচয়িতাদের মধ্যে অনেকেই মহাকবি না হইলেও সুকবি বটেন, উপরন্তু মহা মনীষা সম্পন্ন। যেমন ভাগবতকার। সুতরাং কালিদাসের পক্ষে এরূপ কল্প-



সম্ভবপর নহে ঐ কথা বলিবার কোনই কারণ নাই। তবে, রবীন্দ্র বাবুর মতের যেটুকু নূতনত্ব দেখিতেছি যে, তিনি ভগবানকে স্ত্রী ও মানুষকে স্বামী কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু যখন তাঁহাকে চেলি পরাইয়া, শানাই বাজাইয়া ঘরে আনিবার প্রস্তাব হইতেছে না কিম্বা তাঁহার সহায়তায় পিতৃপুরুষের পিণ্ডলোপা-শঙ্কা নিবারণেরও প্রত্যাশা করা যাইতেছে না তখন এরূপ বিপর্য্যয়ে কিছুই যায় আসে না। আসল কথা হইতেছে দাম্পত্য সম্বন্ধের মর্ম্মগত ভাবটুকু লইয়া, সেটুকু লইয়া। এই প্রসঙ্গে প্রকৃতিপুরুষের কথা উত্থাপন, ভক্তি ও দর্শনশাস্ত্র সম্যকরূপ না জানিয়া পাণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টা মাত্র। উহা বস্তুতই হাস্যকর।

৩য়। পূর্ব্ব মেঘ ও উত্তর মেঘ:—মেঘদূত কাব্যকে এই দুই ভাগে ভাগ করার মধ্যে রবীন্দ্র বাবু একটী গভীর তাৎপর্য্য দেখেন। পূর্ব্ব মেঘে সৌন্দর্য্য রাশির মধ্যে দিয়া হৃদয়ের যাত্রা তাহাতে পরমের পরিচয় আছে বটে কিন্তু চরমতা নাই; উত্তর মেঘে চিরসুন্দরের সহিত—বাঞ্ছিতের সঙ্গে পরম মিলন—খণ্ডের মধ্য দিয়া গিয়া অখণ্ডে পরিসমাপ্তি। রবীন্দ্র বাবুর এই গভীর অর্থকে দ্বিজেন্দ্র বাবু "অত্যন্ত গভীর" বলিয়া উপহাস করিয়াছেন, কিন্তু ব্যক্তি বিশেষ সম্বন্ধে তাহা পরিহাস ভাবে না নিলেও চলিতে পারে। পূর্ব্ব মেঘে রবীন্দ্রবাবু "পরমের পরিচয় মাত্র" দেখিতেছেন, 'চরমতা' দেখেন না। দ্বিজেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করিতেছেন "কেন"? একমাত্র উত্তর "তাহা নাই বলিয়া।" তাঁহার প্রশ্নের কারণ এই, যখন মেঘের যাত্রাপথে অনেক স্থলই অতি সুন্দর এবং উজ্জয়িনীর নাগরারা অলকা রমণীদিগের অপেক্ষা সৌন্দর্য্যে হীন নহে তখন অলকা পর্য্যন্ত দৌড়াইবার কি হেতু ছিল? উজ্জয়িনীর প্রথম দৃষ্ট সুন্দরীকেই চরম করিয়া লইলেই তো চলিত। ইহার উত্তর দিবার চেষ্টা মাত্র করিলে আমার অতিবড় ধৃষ্টতা যদি আমাকে ক্ষমা করেন তাহা হইলে তাঁহার ধৈর্য্যগুণ যে অলৌকিক তাহা নিশ্চয়। এই প্রসঙ্গে একটী পরম কৌতুকাবহ কথার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। "আছি ভালো, যা কিছু ক্লেশ অন্ন বস্ত্রের" এইরূপ একটা পরিহাস বাক্য চিরদিন প্রচলিত আছে, কিন্তু সত্যই যে কেহ সেই ভাবের বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে এইবার তাহা দেখিলাম। এই দেখুন। প্রশ্ন—

"উজ্জয়িনীর বিদ্যুদ্দাম স্ফুরিত চকিত লোলাপাঙ্গী পৌরাঙ্গনাগণ লীলাকমলহস্তা বালকুন্দানুবিদ্ধকেশা অলকারমণীদের চেয়ে হীন কিসে?" উত্তর—"তফাৎ এই যে অলকারমণীগণ সমধিক সজ্জিতা, বিলাসিনী, কামরতা, চিরযৌবনা"। হুঁ, চির যৌবনা কথাটার মানে বোধ হয় চিরযৌবনা নহে আর কিছু; নয়, যৌবন জিনিষটার সহিত সৌন্দর্য্যের কোনই সম্পর্ক নাই। সংস্কৃত সমাসের জটার অরণ্যে দিশাহারা হইয়া এরূপ অসম্বন্ধ কথা বলিয়া ফেলেন নাই তো?

৪র্থ। মেঘদূতের বিরহের বিশেষত্ব:—দ্বিজেন্দ্র বাবু কোনও বিশেষত্ব স্বীকার করেন না! বলেন—"এ বিরহকে যদি বিশ্ব বিরহ বলিয়া ধরা যায় তাহা হইলে সব বিরহই তাই। Shelley'র বিরহ, বিল্বমঙ্গলের বিরহ..... বিশ্ব বিরহ নহে কেন?" রামবসুর বিরহের মত শেলির বিরহ বলিয়া কিছু আছে নাকি? এই প্রথম শুনিলাম। মেঘদূত বর্ণিত বিরহের যে বিশেষত্ব আছে তাহার প্রধান প্রমান বিরহের কাব্য বলিলেই সর্ব্বাগ্রে মেঘদূতকেই বুঝায়। অন্য সমস্ত কাব্যে বা নাটকে নায়ক নায়িকার চিত্তকে নানা দিকে বিক্ষিপ্ত করিবার মত নানাবিধ ব্যাপার আছে। মেঘদূতের যক্ষের মত কেবল মাত্র বিরহের ভাবে তাহাদের হৃদয় এমন আকণ্ঠ পরিপূর্ণ নহে। তা ছাড়া সকল বিরহের মধ্যেই বিশ্ববিরহের ব্যথা অল্লাধিক পরিমাণে নাই হহা কে বলিল?

এই প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্র বাবু লিখিতেছেন "তাহার উপর যক্ষের স্ত্রীর অবস্থাটিও তাহার নিজের উন্মাদকল্পনা—প্রকৃত নহে"। "প্রোষিতে মলিনা কৃশা" এ তো চিরপ্রসিদ্ধ এবং স্বাভাবিকও বটে সুতরাং অলক্ষ্যে গিয়া চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ব্যতীত এত জোর তো সাজেনা। এও তাঁহার

'বিরহেতে দিন দিন ওজনেতে ভারী হই
.....সন্ধে বেলা হুইস্কি ভিন্ন চলে কই'

না কি একটা হাসির গান আছে সেই জাতীয় বিরহ না কি?

৫ম। অভিশাপ:—রবীন্দ্র বাবু লিখিতেছেন "ইহা হইতেই মনে আসে যেন আমরা নির্ব্বাসিত।.....মানুষ একটী দূর স্বর্গ হইতে প্রভু শাপে নির্ব্বাসিত একথাটা অনেক দেশে অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে



এই কথার সমালোচনায় দ্বিজেন্দ্র বাবু লিখিতেছেন "অভিশাপে যে মানুষ মর্ত্ত্যে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে এরূপ প্রবাদ আমি শুনি নাই। থাকিতে পারে। কোন হইতে হিন্দুর ধারণা অন্যরূপ অর্থাৎ মানুষ স্বীয় কর্ম্মফলে বারবার মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ করে। গীতায়ও এই কথা আছে। কালিদাসের শকুন্তলায় এই জন্মান্তরবাদ আছে। তাহার পর আমরা যে fallen angels, এ ধারণা শয়তানের পতনের অনুরূপ বটে, কিন্তু খৃষ্ট ধর্ম্মেরও অনুযায়ী নহে। রবীন্দ্র বাবু বিশ্ব মানুষকে—সে হাজারই খারাপ হোক—শয়তানের বংশ বিবেচনা করেন না। আমার মনে হইতেছে এই অভিশাপ ব্যাপারটও তাঁহার নিজের সৃষ্টি। তিনি কোথায় ইহা পাইলেন জানিতে ইচ্ছা করি।"

এক নিশ্বাসে জন্মান্তরবাদ, গীতা, অভিজ্ঞান-শকুন্তলা, fallen angels, শয়তানের পতন, খৃষ্টধর্ম্ম এতগুলি (অপ্রাসঙ্গিক) বড় কথা বলিয়া ফেলা কি সাধারণ ক্ষমতার কাজ? কাজেই পিশিমার মত বলিতে ইচ্ছা করে 'মোটে সাত বছরের ছেলে, রাত্তিরে ঘুমের ঘোরে বলে ক—খ, পাঠশালা হ'তে বাড়ী ফিরে আসে, আর আমি যে আবাগী পিশি তাইবা কেমন করে জান্‌ল, বলে দিছি, পিছিমা, এ ছেলে কি বাঁচবে?" দ্বিজেন্দ্র বাবুর কথাগুলির সম্যক্ আলোচনার স্থান ও অবকাশ দুইএরই অভাব, সুতরাং অতি সংক্ষেপে সারিয়া লইতে হইবে।

তিনি ওকথা শুনেন নাই শুনিয়া বিশেষ উপকৃত ও আশ্বস্ত হইলাম। না হলে একজন ভদ্রলোক সম্বন্ধে অন্যায় ধারণাকে মনে স্থান দিবার জন্য পাতকগ্রস্ত হইতে হইত। তাঁহার কবুল জবাবের জন্য আমি তাঁহার নিকটে বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ। কিন্তু তিনি নাই শুনুন, অথবা প্রয়োজনের খাতিরে ভুলিয়া যাইতে বাধ্যই হউন, সমস্ত খ্রীষ্টান দেশে (সম্ভবতঃ মুসলমান দেশেও) ঐ প্রবাদ প্রচলিত। Eden, Adam, Eve, জ্ঞানবৃক্ষের ফল, Original sin, Eden হইতে নির্ব্বাসন ক্লেশ ও মৃত্যুর সৃষ্টি ইত্যাদি সম্বন্ধে যে কোনও খ্রীষ্টানকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন।

Of man's first disobedience and the fruit of that forbidden tree whose mortal taste ইত্যাদি যদি কখনও পড়িয়া থাকেন একবার

স্মরণ করিবার চেষ্টা করুন। হিন্দুর ধারণাও ইহার প্রতিকূল নহে, স্বর্গ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া মর্ত্ত্যধামে জন্মগ্রহণ পুরাণেতিহাসের একটা চিরপরিচিত ব্যাপার—হিরণ্যকশিপু রাবণ, কংশ, শিশুপালের কথা মনে করুন। ব্রজধামে সমস্ত গোপ গোপী যে গোলোক হইতে বৃন্দাবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বৈষ্ণবদিগের মধ্যে একথা বিশেষরূপে প্রচলিত। সুতরাং মানুষ স্বর্গ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া পৃথিবীতে আসুক আর নাই আসুক, হিন্দুধর্ম্মের সহিত ওমতের কোন বিরোধ নাই। কর্ম্মফলবাদের সহিতই বা এ মতের এমন কি বিরোধ অভিশাপ তো কর্ম্মের ফলেই ঘটিয়া থাকে। সেই কর্ম্মের ফলজনিত শা একজন সগুণ ঈশ্বর (Personal God) বিধান করিলে তাহার নাম অভিশা আর ঈশ্বরপ্রবর্ত্তিত নিয়মে ঘটিলে তাহাকে বলে কর্ম্মফল। প্রভেদ এই যে, স্বতন্ত্র ভাবে প্রত্যেককে অভিশাপ না দিয়া একটা চিরস্থায়ী অভিশা বিধান করিয়া রাখা হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বজ্ঞের নিকট এ দুএর কোনও প্র থাকিতে পারে না। আর জন্মান্তরবাদের সহিতই বা ইহার এমন বি কিসের? অভিশাপ এক জন্মে মোচন হইতে পারে, দশ জন্মেও পারে শত জন্ম লাগাও সম্ভব। তা ছাড়া হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যে এত বিরোধা সমাবেশ আছে যে, কোন্‌টা হিন্দুর ধারণা আর কোন্‌টা বা তাহা নহে, নির্ণয় করা একরূপ অসম্ভব। আর হিন্দুর ধারণার কিছু বিরোধা হইলেও এমন কি যায় আসে? কাব্য যে প্রচলিত ধর্ম্মের কড়ায় ক্রান্তিতে ধ করিবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নাই। অনেক দেশের অনেক বড় তাহা করেন নাই। তার সাক্ষী দেখুন Paradise Lost. উহাতে Anglican Churchএর বিরোধী অনেক ভাব আছে। Adamএর Paradise নির্ব্বাসন সম্পূর্ণ খ্রীষ্টধর্ম্মানুযায়ী। যখন মানুষকে Adamএর সন্তান বলিলে অভিশাপ, নির্ব্বাসন সমস্তই বজায় থাকে, তখন আবার শয়তানের কথা কেন? ভূত সম্বন্ধে যেমন একটা প্রবাদ আছে যে ভূতের আবির্ভাব কখা ডঠে না, শয়তান সম্বন্ধেও তেমন কোনও নিয়ম আছে কি না জানি

"পৃথিবীর সম্বন্ধে মানুষের সম্বন্ধে এত খারাপ ধারণা কবিজনোচিত বলিতে পারি না"। দ্বিধা করার কিছু প্রয়োজন নাই, নিশ্চয়ই নহে।



ইহা তুলাই অপ্রাসঙ্গিক, কারণ রবীন্দ্র বাবুর কাব্য যাঁহারা কিছু পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন পৃথিবী ও মানুষ সম্বন্ধে রবীন্দ্র বাবুর ধারণা উহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এমন কি, পৃথিবী ও মানুষের প্রতি গভীর প্রেমকেই তাঁহার কাব্যের মূলীভূত ভাব বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়। কিছু দিন পূর্ব্বে 'প্রবাসী' পত্রে জনৈক সমালোচক ও এই ভাবেই দেখিয়াছিলেন। "কড়ি ও কোমলে"র "মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে" হইতে আরম্ভ করিয়া গত মাঘোৎসবের "আমার লাগি তুমি আসছো কবে থেকে" পর্য্যন্ত এত কবিতায় ও গানে এভাব প্রকাশ লাভ করিয়াছে যে তাহাদের নামের তালিকা দিতে গেলেই 'মানসী'র অন্য স্থানের অকুলান পড়িবে। তবে সামান্য একটু দেখুনঃ—

(১) কেন না তোমারে কেহ চাহেনা জানাতে
মানবের উচ্চ কুলশীল?
. . . . . .
কেন কেহ দেখায় না চারিদিকে তব
ঈশ্বরের বাহুর বিস্তার? ইত্যাদি।

(২) চেয়ে দেখ পবিত্র এ মানব জীবন
কে ইহারে অকাতরে করে অবহেলা।

(৩) প্রাণ পেয়ে প্রাণ দিই সে কি শুধু মরণের'পায়
এ প্রাণ প্রাণের আশা টুটে কি অসীম শূন্যতায়'?

(৪) যত ফুল দেয় ধরা তত ফল পায় প্রতিদিন—
যত প্রাণ ফুটাইছে ততই বাড়িয়া উঠে প্রাণ;
যাহা আছে তাই দিয়ে ধনী হয়ে উঠে দীনহীন
অসীমে জগতে একি পিরীতির আদান প্রদান!

কড়ি ও কোমল।

(৫) প্রশান্ত গভীর এই প্রকৃতির মাঝে
আমার জীবন হয় হারা,
মিশে যায় মহাপ্রাণ সাগরের বুকে
ধূলিম্লান পাপতাপ ধারা।

শুধু জেগে উঠে প্রেম মঙ্গল মধুর
বেড়ে যায় জীবনের গতি ;
ধূলিধৌত দুঃখ শোক শুভ্র শান্তবেশে
ধরে যেন আনন্দ মূরতি।

(৬) হোথা মানবের জয় উঠিছে জগৎময়
ওইখানে মিলিয়াছে নরনারায়ণ। মানসী

(৭) শ্যামলা বিপুলা এ ধরার পানে
চেয়ে দেখি আমি মুগ্ধ নয়ানে
সমস্ত প্রাণে কেন যে কে জানে
ভ'রে আসে আঁখিজল।

বহুমানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা
বহু দিবসের সুখে দুখে আঁকা
লক্ষ যুগের সঙ্গীতে মাখা
সুন্দর ধরাতল।

(৮) সমস্ত "বসুন্ধরা" কবিতা।

(৯) বিনয়ে বিশ্বাসে প্রেমে হাতে লও তুলি
বর্ণ গন্ধ গীতময় যে মহা খেলেনা
তোমারে দিয়াছে মাতা ; হয় যদি ধূলি
হোক্ ধূলি সে ধূলির তুলনা কোথায়।

(১০) যেখানে এসেছি আমি, আমি সেথাকার
দরিদ্র সন্তান আমি দীন ধরণীর।
জন্মাবধি যা পেয়েছি সুখ দুঃখ ভার
বহু ভাগ্য ব'লে তাই করিয়াছি স্থির।

(১১) দরিদ্রা বলিয়া তোরে বেশী ভালবাসি
হে ধরিত্রী!



(১২) চেয়ে তোর স্নিগ্ধশ্যাম মাতৃমুখ পানে
ভাল বাসিয়াছি আমি ধূলি মাটী তোর। সোনার তরী।

(১৩) "স্বর্গ হইতে বিদায়" কবিতা

(১৪) নূতনকে নির্ব্বিচারে কোলে লও তুলি
পুরাতনে বক্ষে ধর হে জননী ধূলি। চিত্রা।

আর অধিক দৃষ্টান্ত তুলিয়া প্রবন্ধকে ভারাক্রান্ত করিতে ইচ্ছা করি না। রবীন্দ্র বাবুর কাব্যের পাঠক মাত্রেই জানেন, এই ভাব ক্রমশঃ অধিকতর ব্যাপ্তি ও গভীরতা লাভ করিয়া "খেয়া'তে গিয়া নরনারায়ণের অপূর্ব্ব মিলনে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। আর অধিক দূর যাইবারই বা প্রয়োজন কি—এই মেঘদূতের ব্যাখ্যাতেই দেখুন না। "সেই তোমার সর্ব্ব কামনার পরম পরিতৃপ্তি—সেও তোমার জন্যই তাহার গীতহীন বীণা লইয়া অপেক্ষা করিয়া আছে।" এই কোটি ব্রহ্মাণ্ডের পরম ঈশ্বর বিরহিণী পত্নীর মত মানুষের সহিত মিলনের জন্যই প্রতীক্ষা করিয়া আছে—মানুষের এই মহা গৌরবান্বিত পরিণামের কথা রবীন্দ্র বাবুর মত এমন উপলব্ধির অকুণ্ঠিত ভাষায় আর কোনও কবি বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

"Wordsworth, Browning প্রভৃতি কবিগণ মানুষের উজ্জ্বল ছবিই আঁকিয়াছেন" উজ্জ্বল ছবিই আঁকিতে হইবে এমন কোনও কথা নাই, সত্য ছবি আঁকিতেই কবি বাধ্য। তবে সত্যশিবসুন্দর অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত বলিয়া সকল রূপ মলিনতার মধ্য হইতে উজ্জ্বল আপনি ফুটিয়া উঠে। সংসারে দুঃখ দৈন্য বেদনার অন্ত নাই, কিন্তু তাহার মধ্যেও গভীর আনন্দের নির্ঝর উৎসারিত হইয়া উঠিতেছে—Paradise সত্যই Lost হইয়াছে, কিন্তু তাহাই শেষ কথা নহে, Edenএ যে ইতিহাসের আরম্ভ Calvaryতে মহত্তর পরিণামের মধ্যে তাহার শেষ। এ তত্ত্ব রবীন্দ্র বাবু যেরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন খুব অল্প স্থানেই তাহা দেখিয়াছি। "Wordsworth এমন কি বলিতেছেন "But trailing clouds of glory do we come from God who is our home" হায়রে লেখনীকণ্ডুয়ন! হায়রে পাণ্ডিত্য প্রকাশ! বাল্যকালে Wordsworth পড়িয়া থাকিবেন বোধ হয়, যদি পুস্তক খানি আবিষ্কার করিতে

কৃতকার্য্য হয়েন (নূতন বই কিনিয়া পড়িবেন বাঙ্গালার লেখকদিগের নিকট এরূপ অসম্ভব প্রত্যাশা অবশ্যই করিনা) এবং কীটে যদি ওঅংশ জীর্ণ করিয়া না থাকে, তাহা হইলে ধূলা ঝাড়িয়া আর একবার কবিতাটী পড়িয়া লইবেন। দেখিতে পাইবেন তিনি যাহা বলিতেছেন ঠিক তাহার উল্টা এবং রবীন্দ্র বাবু যে স্বর্গ হইতে নির্ব্বাসনের কথা বলিয়াছেন, অবিকল সেই কথাই কবি বলিয়াছেন। এমন কি, তাঁহার উদ্ধৃত ছত্রটিও প্রণিধান করিয়া পড়িলেও ও কথা বুঝিতে পারা যায়। মানুষ কোথা হইতে আসিয়াছে—God যেখানে তাহার Home, সুতরাং স্বর্গ হইতে নির্ব্বাসন হইল। Glory কোথাকার—না সেই স্বর্গের—আসিবার সময় সেই অনন্ত glory'র কতকটা গায়ে লাগিয়া আসিয়াছে—Trailing কথাটার ইঙ্গিতও সেইরূপ। একথায় বিশ্বাস না হইলেও তাঁহার উদ্ধৃত ছত্রের ঠিক পরের লাইন গুলিই দেখুন :—

Heaven lies about us in our infancy !
Shades of the *prison house* begin to close
Upon the growing boy.
The youth, who daily farther from the east
Must travel, still is Nature's priest,
And by the vision splendid
Is on his way attended
At length the *man* perceives it *die away*.
And fade into the light of common day.

ব্যাখ্যা বা টিপ্পনীর কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। তিনি স্থানান্তরে Ode on the Immortality of the Soul', বলিয়া কবিতাটীর উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার বুঝা উচিত ছিল·Wordsworth—Thesis লিখেন নাই, কবিতা লিখিয়াছিলেন—নাম দিয়াছিলেন Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood" দ্বিজেন্দ্র বাবুর প্রদত্ত নামটী যে তাঁহার নিজের কানেই বাজে নাই, তাহার কারণ নির্ণয় করিতে গেলে



অপ্রিয় সত্যের অবতারণা করিতে হয়। স্থানান্তরে দেখিলাম "Wood-cutter" নামক একটি কবিতার উল্লেখ করিয়াছেন। Wordsworthএর কাব্যগ্রন্থে তাহা খুঁজিয়া পাইলাম না, মনে হইতেছে Simon Lee the Old Huntsman কবিতাটীর ঐরূপ নূতন নামকরণ করিয়াছেন। পিতৃপ্রদত্ত নামের সম্বন্ধে এরূপ যথেচ্ছ ব্যবহারের নজীর নিরাপদ বলিয়া মনে হয় না।

"আমতো মনে করি মর্ত্ত্যের মানুষ একটা মহামহিমায় মহিমান্বিত সৃষ্টি"—কবে হইতে এরূপ মনে করিতে শিখিয়াছেন? রবীন্দ্র বাবুর প্রবন্ধটি প্রকাশ হইবার পর হইতেই নয় তো? নতুবা বহু পূর্ব্বে জানিতাম তাঁহার "মনুষ্যত্বে আর ভক্তি নাই এক বিন্দু"। এই বৈশাখ মাসেও তাঁহাকে যাত্রার দলের বীর রথীর ভাবে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে শুনিয়াছি—

"ওরে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ! * * *
হারে হতভাগ্য ! উড্ডীন রে পতঙ্গ সৃষ্টির মহাঝড়ে
উপেক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত সদা শুদ্ধ তার পদাঘাত যোগ্য।
ভাবো যে বিধাতা বাধ্য তোমায় শুদ্ধ দিতে হেথা সুখ !"

ইহার পর তিনি মানুষের মহিমা সম্বন্ধে একটা আকস্মিক উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে লেক্‌চার দিয়াছেন। প্রাণপণ জোরে বাজাইতেছেন বটে কিন্তু তবুও একটু কাঁসালি গোছের ঝুন ভিতর হইতে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে—সুতরাং তাহা চলিবে বলিয়া বোধ হয় না।

"আধ্যাত্মিক বললেই আমার গায়ে জ্বর আসে"—অবস্থা সঙ্গীন দেখিতেছি সুতরাং যাঁহারা কুইনাইন গুলক প্রভৃতি তিক্ত পদার্থ সেবনের নিয়মিত ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার বন্ধুর কাজই করিতেছেন দেখিতেছি।

প্রবন্ধের মধ্যে ব্রহ্ম-সঙ্গীতের প্রসঙ্গে তিনি বার বার চিরঞ্জীব শর্ম্মার গানের উল্লেখ করিয়াছেন। চিরঞ্জীব শর্ম্মার গান ভাবপূর্ণ সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার এরূপ উল্লেখের যে একটা নিগূঢ় কারণ আছে, সেটা বুঝিতে বেশী বুদ্ধি বা পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু শতংবদ মা লিখ।

প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি শাসাইয়া রাখিয়াছেন যে, কুমারসম্ভব সম্বন্ধে পরান্তরে আলোচনা করিবেন। আমরা বঙ্গসাহিত্যের পক্ষ হইতে করজোড়ে

নিবেদন করিতেছি "ক্ষান্ত হউন; ক্ষান্ত হউন।" সম্প্রতি কিছুদিন হইতে তিনি সাহিত্যকে যেরূপ ঋণী করিতেছেন, তাহাতে দেনার দায়ে বেচারাকে অল্প দিনেই দেউলিয়া হইতে হইবে বোধ হইতেছে। সুতরাং দয়া করুন। কলের প্লেগ প্রভৃতির প্রকোপ নিবারণের জন্য লোকে যেমন রক্ষাকালীর পূজা করে, তেমনি কি বাঙ্গালা সাহিত্যের সমস্ত শ্রেষ্ঠ পদার্থ বলি দিয়া তাঁহার প্রতিভা-রক্ষাকালীর পূজা না করিলে এ প্লেগের প্রশমন হইবে না?

দ্বিজেন্দ্র বাবুর এই অপূর্ব্ব সমালোচনা পড়িয়া বাল্যকালে শ্রুত দুই ছত্র পদ্য বারবার মনে পড়িতেছে:—

"যেই স্তনে শিশু সুখে পান করে ক্ষীর
সেই স্তনে পান করে জলৌকা রুধির"।

তা' সে বেচারাও তো কৃষ্ণের জীব—সুখে থাক্।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী।

---

# সমুদ্র-ফেনার প্রতি।

সমুদ্দুরের শাদা ফেনা পরাণ পাগল করা—
ঘর ছেড়ে আজ তোরি হাতে দিলাম আমি ধরা;
তোরি সাথে ভেসে ভেসে যাবরে সেই অচিন্ দেশে,
যেথা আছে অখিল শেষে সকল শ্রান্তি-হরা।

শঙ্খধবল শ্বেত শতদল—নীল সাগরের ফুল,
আজনমের সকল জানা করিয়ে দে মোর ভুল;
কেটে দিয়ে বাঁধন যত করে' নে আজ তোরি মত,
সৃষ্টিছাড়া মুক্তিব্রত—নাইক শাখা-মুল!

আমি হব যাত্রী তোমার, তুমি হবে তরি—
ভাব্‌ব না আর নিজের তরে—বাঁচি কিম্বা মরি;
কর্‌ব না আর আগে-পিছে চাইব নাক উপর-নীচে,
নিখিল ত্যজে আজকে তোমায় লব বরণ করি।



রাত্রি-দিবা দুল্‌ব দুজন তরঙ্গদোলাতে—
ঊর্ম্মিশিরে ঘূর্ণিনাচন ঘূর্ণাপাকের সাথে;
ঝঞ্ঝা যখন গর্জ্জি' আসি' মারবে ঠেলা অট্ট হাসি',
চূর্ণ হয়ে পড়্‌ব খসি' সহস্র কণাতে!

সিন্ধু-শকুন পাখার হাওয়া দিবে মোদের গায়ে,
উড়ো-মাছের অভ্রপালক পড়্‌বে খসে' পায়ে;
সূর্য্যালোকের স্বর্ণরেণু রচ্‌বে আসি' ইন্দ্রধনু,
নিশ্বসিবে অন্ধ নিশি লবণ-বহা বায়ে!

নীলাম্বুরির অন্তবিহীন শয্যা পাতা নীচে,
ঊর্দ্ধে অসীম শূন্য আকাশ নিঃশব্দে কাঁপিছে;
কোথাও মাঝে শৈল-রেখা, কূলের কোনো নাইক দেখা—
লক্ষযোজন পুরোভাগে লক্ষযোজন পিছে!

মুক্তামাণিক সঙ্গী শুধু বিজন প্রতিবাসী,
শঙ্খ শামুক ভৃত্য সেবার, ঝিনুক কড়ি দাসী;
পাতাল তলে যে নাগবালা ঘুমায় গলায় পলা'র মালা—
সুপ্ত তাহার শান্ত মুখে তোরি শুভ্র হাসি!

মৃত্যু যেদিন বল্‌বে ডেকে—'কে ঘুমাবি আয়,'
পুরু ঝুজের মঞ্চপরে 'স্পঞ্জ' বিছানায়'—
সেদিন সকল যাত্রা শেষে হাতটি দিব বাড়িয়ে হেসে,
আন্‌বে মুদে' আঁখির পাতা সহজ সান্ত্বনায়!

সমুদ্দুরের শাদা ফেনা শীতল শান্তি ভরা—
ঘর ছেড়ে আজ তোরি হাতে দিলাম আমি ধরা;
তোরি সাথে ভেসে ভেসে যাবরে সেই অচিন্ দেশে,
যেথা আছে নিখিল শেষে সকল শ্রান্তি-হরা!

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

---

# অর্থ-নীতি।

## ( দ্বিতীয় প্রস্তাব )

## উৎপাদন।

—:*:—

( অর্থনীতি বিষয়ক প্রথম প্রস্তাবে আমরা অর্থনীতির উৎপত্তি ও উদ্দেশ্য বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। অর্থের উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময় লইয়া অর্থনীতির কার্য্য। অদ্য আমরা এই দ্বিতীয় প্রস্তাবে উৎপাদন সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিবার প্রয়াস পাইব )।

অর্থ উৎপাদন করিতে হইলে তিনটী শক্তি বা উপাদান আবশ্যক। প্রথম, ভূমি। ভূমি অর্থে আমরা কেবল মাত্র জমি বলিতেছি না—প্রকৃতি দেবী আমাদের যাহা কিছু প্রদান করিয়াছেন তাহাদের সকলকেই ঐ সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়া থাকে। ভূগর্ভ-প্রোথিত মণি মুক্তা কয়লা, নদ নদ তড়াগস্থ মৎস্যাদি সকলই ভূমির অন্তর্গত।* এই ভূমি ব্যতীত অন্য দুইটী উপাদান হইতেছে—পরিশ্রম ও মূলধন।

ভূগর্ভে যথেষ্ট কয়লা আছে কিন্তু মনুষ্য শক্তিদ্বারা সেগুলি পৃথিবী গর্ভ হইতে খুঁড়িয়া না আনিলে উহা কোন কার্য্যেই আসে না। যে শক্তিদ্বারা ভবিষ্য কার্য্যের জন্য ভূগর্ভস্থিত কয়লাকে খনন করিয়া আনা হয় তাহাকে পরিশ্রম বলে। কিন্তু কেবল পরিশ্রম দ্বারাই কোন কার্য্য সাধিত হয় না। অন্যান্য শক্তির উপাদানেরও আবশ্যকতা যথেষ্ট। প্রকৃতি এই উপাদান সরবরাহ করেন। এঞ্জিন প্রস্তুতোপযোগী ধাতব দ্রব্যগুলি প্রকৃতি দেবী সত্যই আমাদের দিয়াছেন কিন্তু পরিশ্রম দ্বারা এই দ্রব্যগুলি অন্য দ্রব্যে রূপান্তরিত না হইলে এঞ্জিন প্রস্তুত হয় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কোন দ্রব্য ব্যবহারোপযোগী করিতে

* "By land is meant not merely land in the strict sense of the word, but the whole of the material and the forces which Nature gives freely for man's aid, in land and water, in air and light and heat."



হইলে অন্ততঃ দুইটী শক্তি আবশ্যক—প্রথম প্রকৃতিদত্ত সকল প্রকার উপাদান (যাহাকে আমরা পূর্ব্বে 'ভূমি' এই সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছি) এবং দ্বিতীয় পরিশ্রম।

কিন্তু, কেবল মাত্র এই দুইটী শক্তিতেই আমাদের কার্য্য সিদ্ধি হয় না। কার্য্যে সফলতা লাভ অর্থাৎ অর্থোৎপাদন করিতে হইলে এই দুইটী ব্যতীত আরও একটী অতীব প্রয়োজনীয় শক্তি আবশ্যক—তাহাকে মূলধন বলা হয়। আমরা প্রকৃতি-দত্ত ধাতুদ্রব্যগুলি পাইয়াছি—পরিশ্রমোপযোগী লোকও পাইয়াছি, কিন্তু যে লোক পরিশ্রম করিবে, তাহার নিজ শরীর রক্ষণ বা পরিবারবর্গের ভরণপোষণার্থ খাদ্যাদি আবশ্যক এবং এই খাদ্যাদি ক্রয়ের জন্য অর্থ আবশ্যক। এই অর্থ (যাহাকে আমরা মূলধন বলিব) ব্যতীত ভবিষ্যৎ অর্থোৎপাদনের জন্য কার্য্য পরিচালন অসম্ভব। অর্থাৎ ভবিষ্যৎ অর্থাগমের জন্য আমাদের অর্থ সঞ্চিত করিয়া রাখিতে হইবে এবং যে অর্থ এই উদ্দেশ্যে সঞ্চিত করিয়া রাখা হয় তাহাকে মূলধন বলা হয়।* সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রকৃতিদত্ত কোন বস্তুকে পরিশ্রমদ্বারা আমাদের আবশ্যকোপযোগী কোন বস্তুতে পরিণত করিতে হইলে মূলধন আবশ্যক। আমরা ক্রমান্বয়ে এই তিনটীর বিষয়ই পর্য্যালোচনা করিব।

### ভূমি।

প্রথম, ভূমির বিষয়ই বিবেচনা করা যাউক। অনেকেরই ধারণা কেবল উর্ব্বরতার উপরই ভূমির উৎপাদিকা শক্তি নির্ভর করে। বস্তুতঃ তাহা নহে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ভূমি হইতে উৎপন্ন দ্রব্য ব্যবহৃত হইবার উপযুক্ত হইবার পূর্ব্বে পরিশ্রম ও মূলধন আবশ্যক। সুন্দরবনের প্রায় সকল জমিই যথেষ্ট উর্ব্বরা, কিন্তু শুধু ভূমি উর্ব্বরা হইলেই কি চলে? এই ভূমি হইতে ফসল উৎপন্ন করিতে হইলে পরিশ্রম ও মূলধনের আবশ্যক। ছোটনাগপুর অঞ্চলের অনেক জমি কঙ্কর-পরিপূর্ণ এবং এক প্রকার অনুর্ব্বরা বলিলেও হয় কিন্তু সেখানেও মূলধন ও পরিশ্রমপ্রয়োগে ফসল উৎপাদিত হইয়া থাকে। আবার, সুন্দর বনে উৎপন্ন ধান্য চাউল কলিকাতায় রপ্তানি করিতে হয়, কেন-

* "A fund for consumption and devoted to sustain those engaged in future production."

না সুন্দরবনে এত লোক নাই, যাহারা সে স্থানে উৎপাদিত সমস্ত চাউল ভক্ষণ করিতে পারে। এই চাউল কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চলে পাঠাইতে যে খরচ পড়ে, বস্তুতঃ উহা ভূমির উৎপাদিত দ্রব্যের মূল হইতে বাদ যায়। এরূপ ক্ষেত্রে, যদি সুন্দরবনে কোনদিন লোকসংখ্যা এরূপ বৃদ্ধি পায় যে উৎপাদিত সমস্ত ফসলই ওখানে খরচ হইতে পারে, তাহা হইলে জমীর উর্ব্বরতা স্বল্প পরিমাণে হ্রাস পাইলেও ঐ জমীর অর্থ উৎপাদনের ক্ষমতা বেশী হইল, ইহাই বলিতে হইবে। চাউল রপ্তানির ব্যয় এক্ষেত্রে থাকে না এবং সেই জন্য ইহার একটী কার্য্যকারী শক্তি ( Utility ) বৃদ্ধি পায়, এবং এই অভাব পূরণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে উহার মূল্যও বাড়িয়া যায়। এই জন্য যাহাতে পণ্যদ্রব্য একস্থান হইতে ( অর্থাৎ যে স্থানে উহার অভাব নাই ) অন্যস্থানে ( যে স্থানে উহার অভাব আছে ) সহজে রপ্তানি হইতে পারে, তাহা করিলে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়িয়া যায়। ছোটনাগপুর অঞ্চলে কাঠ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং গ্রাচুর বলিয়া ইহার মূল্যও কম। এই কাঠ, যদি কোন দিন কলিকাতায় স্বল্প ব্যয়ে লইবার সুব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে এই কাঠের মূল্য বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং সেক্ষেত্রে তথাকার ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বেশী ইহাই বলিতে হইবে।*

লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে অনেক সময় অনেক দ্রব্য অধিক পরিমাণ আবশ্যক হয়, এবং যে জমিতে ঐ দ্রব্য উৎপন্ন হয়, ঐ জমীর উৎপাদিকা শক্তি অধিক হয়। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা সহজে প্রতীয়মান হইবে। অষ্ট্রেলিয়ায় যখন পশুচারণের ভূমি ছিল; এবং সে স্থলে পশুর পশমের দামই বেশী ছিল—কিন্তু পশুর মাংসের মূল্য তত বেশী ছিল না। ইহার কারণ এই যে, পশু

* দেওয়ান বাহাদুর আম্বালাল সকরলাল সুরাট শিল্প সমিতিতে যথার্থই বলিয়াছিলেন "The question of a cheap and quick transport of our goods from one part of the country to another has not received the attention it deserves. It is however of vital importance to the growth of our industries * * It is as new blood to a living organism. It is by quick and cheap transport that America has achieved her industrial pre-eminence. Indian goods need very cheap freights and rapid transport."



অনায়াসে এবং অল্প ব্যয়ে ইংলণ্ডে রপ্তানি করা যাইত, কিন্তু মাংস দেশেই নষ্ট হইয়া যাইত। অধিবাসীরা যাহা খাইতে না পারিত, তাহা কোন কার্য্যেই আসিত না এবং উহা রপ্তানি করিবারও সম্ভাবনা ছিল না। কিছু দিন পরে, যখন অষ্ট্রেলিয়ায় সুবর্ণখনি আবিষ্কৃত হইল তখন এই অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটিল। অর্থলোভে দলে দলে লোক অষ্ট্রেলিয়ায় বাস করিতে লাগিল—এবং লোক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাংসের মূল্যও বেশী হইয়া গেল। পশুচারণের ভূমির উর্ব্বরতা পূর্ব্বের ন্যায়ই থাকিয়া গেল, কিন্তু উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য এবং লোক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভূমির মূল্য অধিক হইয়া যাওয়াতে ভূমির অর্থোৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পাইল।

অধ্যাপক মার্শাল এই প্রসঙ্গে একটি নিয়মের কথা লিখিয়াছেন। তিনি বলেন ভূমিকর্ষণে মূলধন ও পরিশ্রম বৃদ্ধি করিয়া উৎপন্ন দ্রব্যগুলিকে অধিক মূল্যবান করিতে হইলে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ দিন দিন কম হইয়া যায়। অধ্যাপক মহাশয় এই নিয়ম ব্যাখ্যা করিবার সময় বলিয়াছেন যে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বিবেচনা করিবার সময় যদি কোন বিশেষ কারণে উহার মূল্য বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে এই প্রসঙ্গে সেই কারণগুলি পৃথক করিয়া এই নিয়মের বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। অনেক সময় নূতন রেল হওয়ার দরুণ নিকটবর্ত্তী পল্লীর পণ্য দ্রব্যের মূল্যের যথেষ্ট তারতম্য হয়। সেই জন্য মর্শাল বলিয়াছেন যে এই নিয়ম কেবল মাত্র উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণের বিষয়ই বিবেচনা করে—মূল্যের বিষয়ে নহে। এই নিয়ম বা বিধিকে তিনি "ক্রমিক আয় হ্রাসের নিয়ম" এই আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এই নিয়ম পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে কৃষির উন্নতি হইলে কোন কোন ভূমির উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে পারে। এমনও হইতে পারে যে পূর্ব্বে যে পরিমাণ মূলধন ও পরিশ্রম প্রয়োগ করা হইত, তদপেক্ষা অধিক মূলধন ও পরিশ্রম প্রয়োগ করিলে কৃষিতত্ত্বের উন্নতি না হইলেও সেই জমির উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়। কিন্তু অধিক পরিশ্রম ও মূলধন যে হারে প্রয়োগ করা হইবে, সে হারে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, কৃষিতত্ত্বের যতই উন্নতি হউক না কেন, অধিক ফসল পাইবার জন্য ক্রমাগত অতিরিক্ত মূলধন ও শ্রম প্রয়োগ করিলেও মূলধন ও

পরিশ্রমের অনুপাতে উৎপন্ন দ্রব্য পাওয়া যাইবে না; অর্থাৎ উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ কম হইবে।

প্রত্যেক জমিতে মূলধন ও পরিশ্রম প্রয়োগের একটী সীমা বা মাত্রা আছে। এই সীমা অতিক্রম করিবার পূর্ব্বে যে মূলধন ও পরিশ্রম প্রয়োগ করা হয় সেই মূলধন ও পরিশ্রম নিয়োগের পরিমাণকে মাত্রা ( dose ) বলা হয়। যে "মাত্রা" কৃষককে তাহার ভূমি, পরিশ্রম এবং মূলধনের ঠিক প্রতিদান করে, তাহাকে "শেষ মাত্রা" এবং ঐ প্রতিদানকে "শেষ প্রতিদান" বলা যায়। মনে করুন কোন জমীর উৎপন্ন দ্রব্য দ্বারা কেবলমাত্র ব্যয় নির্ব্বাহ হয় কিন্তু কিছুই উদ্বৃত্ত থাকে না, সেক্ষেত্রে ঐ জমিতে শেষ মাত্রা প্রয়োগ করা হইয়াছে ইহা বোঝা যায়। এই শেষ মাত্রা অতিক্রম করিয়া যদি এ প্রকার জমীতে অধিক পরিশ্রম এবং অধিক মূলধন ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে কৃষককে লোকসান করিয়া জমি চাষ করিতে হইবে। *

---

# বুড়ী।

—:o:—

তখন আমি স্মৃতিকণ্ঠ মহাশয়ের টোলে মুগ্ধবোধ পড়ি। গ্রামের গুরু-মহাশয়ের নিকট শিশুবোধকের পাঠ শেষ হইতে না হইতেই, একদিন পিসিমা কতকগুলা খইচুর ও নারিকেল সন্দেশ দিয়া, আমাকে স্মৃতিকণ্ঠ মহাশয়ের টোলে রাখিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বাড়ী ফিরিলেন।

* "It is not necessary for the argument to suppose that there is any such land; what we want to fix our minds on is the return to the marginal dose; whether it happens to be applied to poor land or to rich does not matter: all that is necessary is that it should be the last dose which can *profitably* be applied to that law." Marshall. ভারতবর্ষের ন্যায় কৃষিপ্রধান দেশে এই নিয়ম যথার্থ বর্ত্তে। মহামতি গোখলে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষে কৃষকগণের অজ্ঞতা ও ধনের জন্য ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি দিন দিন অত্যন্ত হ্রাস হইতেছে এবং শস্যও দিন দিন কম হইয়া যাইতেছে। অধ্যাপক মার্শাল বলেন যে জমির ক্রমিক আয় হ্রাসের নিয়ম অবশ্যম্ভাবী।



স্মৃতিকণ্ঠ মহাশয়ের টোল সহরে; প্রথম প্রথম দুই একদিন সহর ভাল লাগিয়াছিল, কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল ততই পল্লীগ্রামের খেলাগুলি মনে পড়িয়া আমায় চঞ্চল করিয়া তুলিল। কত আনন্দে গ্রীষ্মের দিনে সমস্ত দুপুরবেলা আমগাছে জামগাছে কাটাইতাম—ছিপ হাতে করিয়া, পুকুর পাড়ে কচুবনের মধ্যে সমস্ত দিন বসিয়া থাকিতাম—সন্ধ্যায় নদীতীরে সমবয়স্কদের সঙ্গে গলা ছাড়িয়া মতিরায়ের যাত্রার সুর ধরিতাম; তখন স্বাধীনতা ছিল, মনে আনন্দ ছিল; এখন আমার নিকট, সহরের জনসংঘের কোলাহল, নিতান্তই অপ্রীতিকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পিসিমার স্নেহ ও নির্জ্জনতার মধ্যে আমার যে বৃত্তিগুলি স্ফুটনোন্মুখ হইয়াছিল সেগুলি পরিপূর্ণতা লাভ করিবার পূর্ব্বেই নষ্ট হইয়া গেল।

তারপর ব্যাকরণ;—কোথায় পল্লীগ্রামের স্বাধীন বালক, আর কোথায় বোপদেবের বিষম কচকচি! কিছুতেই সামঞ্জস্য রাখিতে পারিলাম না; যাহাহউক, রোগীর ঔষধ খাওয়ার মত মুগ্ধবোধ গিলিতে আরম্ভ করিলাম।

আজ লক্ষ্মীপূজা, কাল সত্যনারায়ণ, পরশ্ব সুবচনীব্রত প্রভৃতি যজমান-দিগের নানারূপ বারব্রতে, স্মৃতিকণ্ঠ মহাশয় নিজে না গিয়া তাঁহার ছাত্র-দিগকে পাঠাইতেন, সুতরাং উপবাস করিয়া, অসময়ে আহার করিয়া আমার হাত দুইটী সরু হইয়া গেল, উদর নীলশিরাযুক্ত ও বৃহৎ হইল। দিনের বেলা কোনো কায ছিলনা,—কেবল একবার করিয়া অপরাহ্নে, স্মৃতিকণ্ঠ মহাশয়ের মনস্তুষ্টির জন্য, ঘরের ভিতর গুণ্ গুণ্ করিয়া পড়িতাম, আর বাকী সমস্ত বেলাটী টোলের অকালকুষ্মাণ্ড ছাত্রদের সহিত মিশিয়া তাস পিটিতাম; তামাক খাইয়া খাইয়া চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সেই ঠোঁট দু'খানি কালো ঝুল হইয়া গেল।

শিক্ষার তো কথাই নাই; কি করিয়া যজমানকে ফাঁকি দিতে হয়—কেমন করিয়া শালগ্রাম শিলার পরিবর্ত্তে, গঙ্গাতীরের উপলখণ্ড লাল সালু দিয়া মুড়িয়া লইতে হয়,—গঙ্গামৃত্তিকার অভাবে মাটীতে হুঁকার জল দিয়া তিলক কাটিতে হয়;—দধি চিঁড়া ও শর্করার রীতিমত ফলাহার করিয়া যজ-মানকে আদ্য শ্রাদ্ধের বা অভ্যুদয়িকের মন্ত্র পড়াইতে হয়—দিবসে রুই মৎ-স্যের ঝোল দিয়া অন্নাহার করিয়া, জন্মাষ্টমীর দিন রাত্রে উপবাসী গৃহস্থের

বাটী হইতে কেমন করিয়া নৈবেদ্য দক্ষিণা ও বস্ত্রাদি আনিতে হয়, তাহা বেশ ভাল করিয়া বুঝিলাম।

এ সকল বিষয়ে অন্যান্য ছাত্রেরা অধ্যাপক মহাশয়েরই অনুকরণ করিত;—দুঃখের বিষয় আমি ও সকল কিছুই করিতে পারি নাই। অত্যধিক পরিশ্রমে ও আহারের অনিয়মে আমার অম্লশূল ধরিয়া গেল।

কি করি,—এতগুলা বারব্রত ও উপবাস, ব্যবসার খাতিরে মানিয়া চলাও দায়, এবং গৃহস্থের ও বিশেষতঃ বঙ্গমহিলার নিষ্ঠা ভক্তি দেখিয়া, তাহাদের সহিত কপটতা করিতেও বুক কাঁপিয়া উঠে। একবার স্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম যে একজন যজমান নিজের বসতবাটী বিক্রয় করিয়া তাহার পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছিল। দক্ষিণার সময় সে অধ্যাপক মহাশয়কে দুইটী টাকা দিয়াছিল বলিয়া তিনি যজমানকে "নিপাত" "নির্ব্বংশ" প্রভৃতি শব্দের দ্বারা আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। প্রভু যজমানের হিতাকাঙ্ক্ষী কি না!

আপনারা মহাকবি কালিদাসের চিত্রে এই পুরোহিতকে পরিত্যক্তা শকুন্তলার ভারগ্রহণ করিতে উদ্যত দেখিয়াছেন। বাঙ্গালার একজন কবির চিত্রে দেবদত্ত রূপে পুরোহিতের দেবচরিত্র দেখিয়াছেন, আর আমাদের এই অধ্যাপক বা পুরোহিত 'কুলীনকুলসর্ব্বস্বের' পুরোহিতের প্রতিকৃতি। গুরু নিন্দা মহাপাপ; কিন্তু সে পাপ আমাকে স্পর্শে নাই, কারণ একদিন ও তিনি আমাকে ব্যাকরণের পড়া বলিয়া দেন নাই।

যাহা হউক, এ দিকে তো চূড়ান্ত শিক্ষা হইতে লাগিল, অপর দিকে আর এক শিক্ষার, কথা শুনুন;—

আমাদের চতুষ্পাঠীর পাশেই এক বুড়ী বাস করিত; তাহার তিন কুলে কেহই ছিলনা। বুড়ীর কিছু নগদ টাকা ছিল, তাহা সুদে খাটাইয়া হিন্দুর অধিকাংশ বারব্রতগুলি সে করিত। পিপীতকী দ্বাদশী, দুর্ব্বাষ্টমী, তালনবমী শ্রীপঞ্চমী, জল সংক্রান্তি, বৈশাখী চাঁপা, পদ্মপূর্ণিমা কিছুই তাহার বাদ যাইত না। মাঝে মাঝে আমাদের ডাকিয়া লইয়া সে 'কলাটা মুলাটা' খাইতে দিত—পাড়ায় কাহারো বাটীতে অসুখ বিসুখ হইলে সে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া রোগীর সেবা করিত। দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতি ক্রিয়াকর্ম্মে বুড়ী গৃহস্থের



বুড়ী সমস্ত দিন রাত পরিশ্রম করিত। আমরা টোলের ছাত্র, সর্ব্বত্রই আমাদের অবারিত দ্বার; আমরা যাইয়া দেখিতাম,—চতুর্দ্দিকে অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে, মাঝখানে বুড়ী হাতা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, যেন তাহার অগ্নিপরীক্ষা হইতেছে। কি করিয়াই যে তিন খানা হাড়ে এত পরিশ্রম সহ্য হইত তাহা বলিতে পারি না।

বুড়ীর অনেকগুলি গুণ ছিল, কিন্তু এক বিষম দোষ ছিল বলিয়া তাহার সমস্ত গুণ চাপা পড়িয়াছিল;—সে অত্যন্ত কলহ-প্রিয়া, মাঝে মাঝে তাহার গালাগালি ও চীৎকারের জ্বালায় বাটীতে কাকচিল বসিতে পারিত না—রাস্তা দিয়া লোক চলিতে পারিত না।

বুড়ী এত রোগীর সেবা করিত—এত পাড়ার লোকের উপকার করিত—এত বারব্রত উপবাস করিত, কিন্তু কেহ তাহাকে দেখিতে পারিত না। আমাদের তো কথাই নাই, আমরা তাহার প্রাচীরের গায়ে বাস করি, আমাদের প্রায় প্রত্যহই 'অষ্ট কুষ্ঠীর নন্দন' 'অল্পায়ু' প্রভৃতি মিষ্ট বচন গুলি শুনিতে হইত। সেজন্য আমরা বুড়ীকে ভয় ও ঘৃণা দুইই করিতাম এবং সময়ে সময়ে অত্যন্ত কাপুরুষের মত না পলাইয়া সুপুরুষের মত দুই একটা ইট পাট্‌কেল ছুঁড়িতাম। ঝমাঝম্ কুরুক্ষেত্রের সংগ্রাম চলিত। বিবাদ মিটাইবার ভয়ে অধ্যাপক মহাশয় দূর হইতে সরিয়া পড়িতেন।

আর পারা যায় না;—একটু বাতাসে যদি বুড়ীর জানালা নড়িল তো বুড়ী অমনি রাক্ষসীর মত তাড়া করিয়া আসিয়া আমাদের দোষী করিল—বাছুরে যদি মায়ের দুধ খাইয়া ফেলিত, বুড়ী অমনি বলিত যে চতুষ্পাঠীর ছেলেরা বাছুর ছাড়িয়া দিয়াছে; একদিন কালীপূজার সময় কোথা হইতে একটা 'হাওয়াই' পড়িয়া বুড়ীর রান্না ঘরের কতকটা মট্‌কা পোড়াইয়া দিয়াছিল—বুড়ী ঠিক ভাবিয়াছিল যে টোলের ছেলেরাই এই কাণ্ড করিয়াছে। সে সময়ে তাহার গালাগালির জন্য আমাদের তিনদিন আহার নিদ্রা হয় নাই। নানা প্রকারে অস্থির হইয়া শেষে আমরা স্থির করিলাম, যে বুড়ীকে একদিন জব্দ করিতে হইবে। শুধু গালাগালি দিয়া হইবে না—তাহাকে এমন কথা বলা চাই, যাহার অর্থ সে বুঝিতে না পারিয়া আপনা আপনি রাগিয়া খুন হইবে।

যখনকার কথা বলিতেছি তখন যদিও কিণ্ডারগার্টেনের শিক্ষাপ্রণালী গঠিত হয় নাই, তথাপি আমাদিগকে অধ্যাপক মহাশয়ের অনুমতিতে মাটী কোপাইতে হইত, শাক বুনিতে হইত, গরুবাছুর দেখিতে হইত। একদিন আমরা গরু বাঁধিয়া ছিলাম, কিন্তু গরুটা দড়ি ছিঁড়িয়া বুড়ীর উঠানের সমস্ত শাক খাইয়া ফেলে। আর রক্ষা নাই—বুড়ী একেবারে চামুণ্ডা! তাহার তর্জ্জনগর্জ্জনে প্রথমটা আমরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ি, পরে বস্ত্রসম্বরণ করিয়া আমরা চারি পাঁচজনে বুড়ীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলাম; একটু দূরে দূরে—নিকটে যাইতে সাহস হয় নাই।

একজন বলিল—"দেখিতেছ না বেটী যেন "সর্ব্বনাম," নিকষার পরিবারে আসিয়াছে। চাল নাই—চুলা নাই,—কোনো পরিচয়ই পাওয়া যায় না। আর একজন বলিল "বেটী নিশ্চয়ই "তৎপুরুষ"; দেখিতেছ না যেন গোঁফ কামাইয়া আসিয়াছে—কোনো রকমেই স্ত্রীলোক বলিয়া জানা যায় না।

আমি বলিলাম "নাহে, বেটী একেবারে "অব্যয়ীভাব"; দেখিতেছ না—দিব্য কুল খাইয়াও বুড়া মারতে চায় না; যেমন তেম্‌নিটাই আছে—কোনো পারবর্ত্তন নাই—অক্ষয়, অব্যয়।

বুড়ী ইট হাতে করিয়া তাড়া করিয়া আসিল।

বুড়াকে তাড়া করিয়া আসিতে দেখিয়া একজন ছাত্র বলিল—"আরে বুড়ী তোর নাকে এমন এক মুষ্ট্যাঘাত করিব, যে এখান "বাবগোদ্দাস্তে" বলিয়া "লুপ্ত অকার" হইয়া যাইবি।"

আরেকটী ছাত্র বলিল "তুই ব্রাহ্মণের ছেলেকে মারিতে চাহিতেছিস্? তোর হাতে মহাব্যাধি হইবে; "পচাদ্যচ্" হইয়া যাইবি—সর্ব্বাঙ্গে পোকা বিল্‌বিল্ করিবে।

অপর একজন বলিল "বেটীকে মারিয়া "তিঙন্ত প্রকরণ" করিয়া ফেল।"

আমি বলিলাম "ঐ আঁসবটী দিয়া বুড়ীর মুণ্ডটা "ক্যচ্ প্রত্যয়" করিয়া দাও।"

বুড়ী দেখিয়া শুনিয়া অবাক হইয়া শেষে দরজা বন্ধ করিয়া সাপের মন্ত্র গর্জ্জাইতে লাগিল। আমরাও চলিয়া আসিলাম। ইহার পর বুড়ী আমাদের



খিলে আস্তে আস্তে সাপের মন্ত্রের মত কি বিড় বিড় করিয়া বকিত; অভিশাপ দিত—কি গালাগালি দিত—তাহা সেই জানে।

যাহাহউক ঝগড়ার পর হইতে সে আমাদের সঙ্গে বড় কথা কহিত না, কিন্তু অধ্যাপক মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সে মাঝে মাঝে আমাদের টোলে আসিত। 'কবে একাদশী হইবে—পূর্ণিমা আজ কতক্ষণ আছে' ইত্যাদি প্রশ্ন করিত। বারব্রতের জন্য বুড়ীর কাছে অধ্যাপক মহাশয় আমাদের পাঠাইতেন, আমরাও নবমীর উৎসর্গীকৃত ছাগশিশুর মত কাঁপিতে কাঁপিতে, তাহাকে ভয়ে ভয়ে মন্ত্র পাঠ করাইতাম। বুড়ী আমাদের জন্য উত্তমরূপ জলযোগের আয়োজন করিত। তখন আমাদের উপর বুড়ীর কখনো রাগ ছিল বা আছে, এরূপ বোধ হইত না।

একদিন শিবরাত্রি; সমস্ত দিন মুখে জলগণ্ডুষ দিই নাই; রাত্রে বুড়ীর বাটীতে শিবপূজা করিতে হইবে। সেবারে আমার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিল; সমস্ত দিন উপবাস করিয়া সন্ধ্যার সময় যেন চোখে শরিষার ফুল দেখিতে আরম্ভ করিলাম,—কাণে তালা ধরিয়া গেল। যখন বুড়ীর বাড়ীতে পূজা করিতে বসিলাম, তখন ধুনার গন্ধে আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল; চারিদিক হইতে অন্ধকার মিশিয়া ধুনার ধোঁয়ার সঙ্গে মিশিয়া গেল,—আমি জ্ঞান হারাইলাম।

যখন জ্ঞান হইল তখন দেখিলাম বুড়ী আমায় কোলে করিয়া মাথায় জল দিয়া বাতাস করিতেছে এবং বলিতেছে "আ—মরণ পোড়ামুখ, যদি উপোষ করতে পারবিনে, তবে একটু জল খেলেই তো হ'ত!", বুড়ী আমাকে ছানা মাখন ডাবের জল প্রভৃতি খাওয়াইল। একটু বল পাইতেই সে আমাকে ধরিয়া ঘরে বিছানা পাতিয়া শোয়াইয়া গেল। সেদিন একবার আমার মনে হইয়াছিল—গালাগালি দেওয়া কি বুড়ীর দোষ?

পৌষ মাসের একদিন অমাবস্যা;—আমাদের চতুষ্পাঠীর পাঠ বন্ধ; এমন দিনে কোন কুষ্ঠরোগী আসিয়া আমাদের নিকট কিছু খাদ্য প্রার্থনা করিল; আমরা তাহার কথায় কর্ণপাত করিলাম না। সে চলিয়া গেল; যাইবার সময় হঠাৎ তাহার পদস্খলন হইয়া সে একটা নর্দ্দমায় পড়িয়া গেল। একে কুষ্ঠরোগী, বিকৃত, তাহাতে সে অতি কুস্থানে পতিত হইয়াছে; তাহাকে স্পর্শ করিতে আমা-

দের সকলেরই ঘৃণা হইতেছিল। আমরা দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলাম, সে কোনো প্রকারেই উঠিতে পারিতেছিল না।

"সর্ব্বনেশে কালামুখো গুলো এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর মানুষটা মায় গেল গা? ওঠো ত বাপ আমার"—বলিয়া বুড়ী তাহার হাত ধরিয়া উঠা ইল, তাহাকে নাওয়াইয়া ধোয়াইয়া কিছু খাইতে দিল এবং যাইবার সময় তাহাকে দুইটী পয়সা দিয়া বিদায় করিল। বুড়ী যে আমাদের উপর কতটা জয়লাভ করিল তাহা তখন আমরা বুঝিতে পারি নাই। সে অমাবস্যার ব্রতোপ বাস করিয়াছিল। বিকলাঙ্গকে বিদায় করিয়া সে বিষম শীতের দিনে আ একবার স্নান করিয়া আসিল।

পরদিন প্রতিপদ; বেলা দুপুরের সময় স্মৃতিকণ্ঠ মহাশয় বলিলেন যে "আমা একটা কুমড়া পাড়িয়া দাও।" আমার উপরেই ভার পড়িল। ইচ্ছা হইল অধ্যাপককে একবার বলি যে প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ নিষেধ,—কিন্তু সাহসে কুলাইল না। আমি কুষ্মাণ্ড পাড়িতে গেলাম।

একটী ছাঁচি কুমড়ার গাছ বড় হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া গাছটাকে আমরা বুড়ীর চিলের ছাতের উপর তুলিয়া দিয়াছিলাম; বুড়ী তাহাতে কোনো আপত্তি করে নাই। বুড়ীর ছাত ভাঙ্গা;—অনেক বরগা খসিয়া গিয়াছে—কার্ণিশ ভাঙ্গিয়াছে—উঠিতে ভয় করে। যাহাহউক, আমি খড়া বাহিয়া উঠিতে লাগি লাম। বুড়ী ভাত খাইয়া ঘাটে বাসন মাজিতে যাইতেছিল: ঘাট নিকটেই,— সেখান হইতে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ হাত দূরে। আমাকে উঠিতে দেখিয়া বুড়ী বলিল—"আ—মরণ,—আ—মরণ, ঠিকদুপুরবেলা ভাঙ্গা ছাতে উঠ্‌ছে গা! মরবার ভয় নেই?" আমি গম্ভীর ভাবে উঠিতেই লাগিলাম; একখানা বরগা বাহিরে ঝুঁকিয়াছিল। আমি সেটা ধরিতে চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় বুড়ী চীৎকার করিয়া উঠিল—"ওরে নির্ব্বংশের বেটা, এখনি মর্‌বি যে।" বুড়ীর দিকে আমি চাহিয়া দেখি যে সে তাহার ক্ষীণ অস্থিপঞ্জর লইয়া আলুলায়িত কেশে ডাকিনীর মত ছুটিয়া আসিতেছে। আমি পুনরায় বরগা খানিকে ধরিতে চেষ্টা করিলাম,—এবারে ধরিলাম—সমস্ত দেহের ভার দিলাম—অমনি সশব্দে পতন।

যখন পড়ি তখন আমার জ্ঞান ছিল না; জ্ঞান হইলে বসিয়া দেখিলাম যে



আমার কোথাও লাগে নাই—নিকটেই বুড়ীর রক্তাক্ত দেহ পড়িয়া রহিয়াছে—চতুর্দ্দিকে লোকে লোকারণ্য! বুড়ীর মাথায় ভয়ানক আঘাত লাগিয়াছে—তাহার বক্ষের ক্ষীণ অস্থিগুলি চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, মুখ দিয়া ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠিতেছে। মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলাম যে বুড়ী তাহার নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া আজ আমায় বাঁচাইয়াছে।

বুড়ীর দেহে প্রাণ ছিল; ডাক্তার আসিল, কিন্তু কোনো ফল হইল না। তিনি বলিয়া গেলেন "আজ রাত্রি কাটে কিনা সন্দেহ"। শেষ রাত্রে বুড়ীর একটু জ্ঞান হইল। সে বলিল "আমি অভাগীর ছেলেকে উঠ্‌তে বারণ করলুম কিন্তু সে শুন্‌লে না" বুড়ী চক্ষু মুদিয়া জল চাহিল। আমি বলিলাম "একবার চোখ চাহিয়া দেখ, অভাগীর ছেলে তোমার জন্য এখনো বাঁছিয়া আছে।"

আমি বুড়ীর মুখে জল দিলাম; বুড়ী আমার দিকে একবার চাহিয়া "আঃ" বলিয়া একটা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। তাহার মুখ হইতে আর কথা শুনা গেল না। উষাকালে বুড়ী প্রাণত্যাগ করিল। আমরা কাঁদিতে কাঁদিতে বুড়ীর সৎকার করিয়া আসিলাম। হায়, দেবি! এমন করিয়াই কি কঠোরতার মধ্যে মাতৃস্নেহ লুকাইয়া রাখিতে হয়!

দুই একদিন পরে আমার কাপড় ও পুস্তকাদি লইয়া, অধ্যাপকের নিকটে গিয়া বলিলাম "আমায় বিদায় দিন, আমার চতুর্ব্বেদ শিক্ষার ফললাভ হইয়াছে।

শ্রীনফরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

# আজ!

—:*:—

আষাঢ় রাতের বৃষ্টিধারায়
হাওয়ার হুহু শ্বাসে,
বুকের ভিতর তুফান ওঠে,
চোখে জোয়ার আসে।

নতুন দু'দিন কাছেই ছিলে
দেখ্‌তো কেবা চেয়ে—
পুঁতির মালা, পুঁতুল নিয়েই
ছিলাম লাজুক মেয়ে।

পড়্‌লে তখন তোমার চোখে
চম্‌কে কেঁপে উঠে'
কি সঙ্কোচে আতঙ্কে সেই
পালিয়ে যেতাম ছুটে।

দখিন হাওয়ার দিনে যখন
ঘোম্‌টা দিতে খুলে,
আধ্‌-ফুটন্ত চামেলি-হার
পরিয়ে দিতে চুলে,

এলিয়ে দিতে 'টেক্কা' খোঁপা
রঙ্গভরা হাতে,
পণ করিতাম আস্‌ব না আর
তোমার ত্রিসীমাতে।

ইঙ্গিতে কেউ তখন যদি
জানিয়ে দিত মোরে,
দুরন্ত দিন আস্‌বে এমন
কাঁদ্‌ব ঘুমের ঘোরে।

রইবে তুমি পান্থ সম
আঁখির অন্তরাল,
বদ্‌লে দেবে জীবনটি মোর
যৌবন-ইন্দ্রজাল।

বুঝ্‌বে কি এই কেঁদে কেঁদে
আঁধার-রাত্রি-জাগা ?



জান্‌তো কেবা আপন হ'য়ে
দেবে এমন 'দাগা' !

একটি বার আজ সাম্‌নে এনে
দাঁড়াও হৃদয়-সাথী,
সূর্য্য সমান হওগো উদয়—
পোহায় না যে রাতি ?

পারি নি নাথ জান্‌তে কিছুই
ফুট্‌লো মুকুল কখন,
হ'লাম তোমার ব্যথার ব্যথী
আপন চেয়েও আপন।

ধূলাখেলা চুকিয়েছি আজ
এই জনমের মত,
সাঙ্গ হে নাথ 'পুণ্যপুকুর'
পুষ্পমালার ব্রত।

আজ্‌কে সখা তেম্‌নি আবার
পিছন থেকে এসে,
চোখ দু'টি মোর দাও গো টিপে
মৃদু মধুর হেসে।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

# বিশু-দাদা।

——:o:——

পরদিন প্রাতঃকালে নরেশ বাবু সতীশকে এই পত্র লিখিলেন—

"প্রিয়তম সতীশ,

হুগলী হইতে ফিরিয়া আসিয়াই তোমাকে পত্র লেখা উচিত ছিল; কিন্তু আমি তোমাকে এ কয়দিন পত্র লিখিতে পারি নাই, কি লিখিব ভাবিয়া উঠিতে এ কয়দিন কাটিয়া গিয়াছে।

শ্রীমান ভবেশের পরীক্ষা ভালই হইয়াছে; ইংরাজী সাহিত্য, সংস্কৃত ও ইতিহাসভূগোলের অনেকগুলি প্রশ্নেরই সে সন্তোষজনক উত্তর দিয়াছে; গণিতের সমস্ত প্রশ্নেরই উত্তর দিয়াছে এবং আমার যতদূর জ্ঞান আছে, তাহাতে বলিতে পারি গণিতে সে খুব বেশী নম্বরই পাইবে। তাহার প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, এখন ভগবান যাহা করেন। আমি তাহার জন্য চেষ্টা ও যত্নের ত্রুটী করি নাই; সেও যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়াছে।

ভবেশ তোমার কাছে থাকিয়া কলেজে পড়িবে, এ প্রস্তাব তুমি পূর্ব্বেই করিয়া রাখিয়াছ। পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইবার পর যখন কলেজাদি খুলিবে তখন তাহাকে তোমার নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল; কিন্তু পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা যাইতেছে না; সপ্তাহের মধ্যেই আমরা কলিকাতায় যাইব।

কোন বিশেষ কারণে আমি কল্যাণপুর ত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছি। তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইলে সে কথা বলিব ইহাই ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি হয়ত উৎকণ্ঠিত হইবে, সেই জন্য এই পত্রেই সমস্ত কথা তোমাকে জানাইতেছি।

সতীশ, একটী বিশেষ ঘটনায় আমার জীবন বিষময় হইয়াছে। আমি আজ কয়দিন যে কষ্ট পাইতেছি, আমার হৃদয়ে যে আঘাত লাগিয়াছে তাহা আর তোমাকে কি বলিব। তুমি যাহা চিন্তাও করিতে পার না, আমি যাহা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই তাহাই আমার অদৃষ্টে ঘটিয়াছে। সুমতি কোথায়



চলিয়া গিয়াছে। আমি ভবেশকে লইয়া হুগলী যাওয়ার পর এক রাত্রিতে সে নিরুদ্দেশ হইয়াছে। আমার একমাত্র কন্যা—যাহাকে আমি হৃদয়ের রক্ত দিয়া মানুষ করিয়াছি, যাহার মুখের দিকে চাহিয়া আমি কত শোক, কত জ্বালা ভুলিয়াছি, সেই সুমতি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। আজ যদি তাহার মৃত্যু হইত তাহা হইলে ত আমি এত কষ্ট অনুভব করিতাম না। কিন্তু সে কুলত্যাগিণী হইয়াছে, দেশের মধ্যে কি আমার আর মুখ দেখাইবার যো আছে! এ কলঙ্ক শিরে বহন করিয়া দেশে বাস করা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব।

সেই জন্য আমি স্থির করিয়াছি যে, কল্যাণপুরের সহিত আমি আর কোন সংশ্রব রাখিব না, এ দেশে আর থাকিব না। জীবনের অবশিষ্ট কয়টা দিন নির্ব্বাসিত জীবন যাপন করা আমার অদৃষ্টলিপি। মনে করিয়াছিলাম যে কয়দিন বাঁচিয়া থাকিব, যতদিন শক্তি থাকিবে কল্যাণপুর স্কুলের থার্ড মাষ্টারী করিয়াই কাটাইব। আমি ধন, মান, যশের প্রার্থনা করি নাই, সে আকাঙ্ক্ষা আমার ছিল না; আমি দরিদ্রের মত আমার এই জন্মভূমিতে নীরবে জীবন কাটাইব বলিয়াই স্থির করিয়াছিলাম। কে জানিত যে আমার অদৃষ্টে এত দুঃখ আছে, কে জানিত যে এই প্রৌঢ় বয়সে এমন কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া আমাকে আমার এত সাধের পৈতৃক বাসগৃহ ত্যাগ করিতে হইবে?

সতীশ, আমি দেশ ত্যাগ করিব। ভবেশ ও বিশ্বনাথকে সঙ্গে লইয়া আমি কলিকাতায় যাইব। সেখানেই জীবনের অবশিষ্ট কয়টা দিন অতিবাহিত করিব। সুতরাং তুমি যে ভবেশকে তোমার বাসায় রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলে, তাহা আর সম্ভব পর নহে।

তুমি আমার জন্য অনেক করিয়াছ এবং এখনও করিতেছ। ভগবান তোমাকে বিদ্বান ও উন্নত করিয়াছেন; তুমি তোমার বিদ্যা ও ধনের সদ্ব্যবহার করিতেছ। আমার জন্য এখন তোমাকে একটু অধিক পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইতেছে। তোমার আর্থিক অবস্থা যদি তেমন স্বচ্ছল হইত তাহা হইলে আমি যে প্রস্তাব করিতে যাইতেছি তাহা করিতাম না, যখন তোমার অবস্থা অধিকতর উন্নত হইবে, তখন আমি তোমার উপার্জ্জনের উপর সম্পূর্ণ

নির্ভর করিতে অণুমাত্রও কুণ্ঠিত হইব না; কিন্তু এখন তুমি যাহা উপার্জ্জন কর তাহাতে কলিকাতায় তোমার ব্যয় এবং দেশে বৃদ্ধ পিতা, বিমাতা ও ভাই ভগিণীদিগের খরচ সম্পূর্ণ কুলায় কি না সন্দেহ। এ অবস্থায় আমরা তোমার উপর এমন ভাবে চাপিতে চাহিতেছি না। বিশেষ আমি এখনও কর্ম্মক্ষম আছি, আমি এখনও উপার্জ্জন করিতে পারি। যখন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িব, যখন জীবনোপায় থাকিবে না, তখন তুমি ব্যতীত আর আমার সহায় কে হইবে?

আমার প্রস্তাব এই যে তুমি কলিকাতার কোন স্কুলে আমার জন্য একটা শিক্ষকতা জোগাড় করিয়া দেও। ২৫।৩০ টাকার অধিক আমি আশা করি না; পল্লীগ্রামের স্কুলের একজন মাষ্টারের পক্ষে সহরের বিদ্যালয়ে ২৫।৩০ টাকা পাওয়াই আমি যথেষ্ট মনে করি। তাহার পর তুমি যদি একটা ছাত্র পড়াইবার ব্যবস্থা করিয়া দেও তাহা হইলে আরও ভাল হয়; এই উপায়ে যদি আমি মাসিক ৪০।৪৫ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারি তাহা হইলেই আমাদের তিন জনের ব্যয় চলিয়া যাইবে। তাহার পর ভগবানের আশীর্ব্বাদে ভবেশ যদি বৃত্তি পায় তাহা হইলে ত কথাই নাই। অতএব তুমি আমাদের জন্য মাসিক পাঁচ সাত টাকার মধ্যে একটা ঘর ভাড়ার ব্যবস্থা করিও। আমরা চিরদরিদ্র, খোলার ঘরে বাস করিতে আমাদের কোনই কষ্ট হইবে না। তবে পল্লীটা যেন ভাল হয়। আর কোন ব্যবস্থাই করিতে হইবে না। তোমার পত্র যে দিন পাইব সেই দিনই আমরা কল্যাণপুর ত্যাগ করিব। আজ সোমবার, বৃহস্পতিবারে যেন তোমার পত্র পাই।

আর এক কথা, আমরা যে কলিকাতায় যাইতেছি একথা তুমি কখনও কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। আমি বড় দুঃখে এই নির্ব্বাসনদণ্ড গ্রহণ করিলাম। শীঘ্র পত্রের উত্তর দিও। ইতি

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীনরেশচন্দ্র বসু।

পত্রখানি সেই দিনই ডাকে দেওয়া হইল। নরেশ বাবু কলিকাতে যাওয়ার কথা আর ভবেশকে বলিলেন না, সতীশ কি উত্তর দেয় তাহা দেখিয়া



পরে ভবেশকে বলিবেন, ইহাই মনে করিলেন।

সোমবার, মঙ্গলবার চলিয়া গেল। নরেশ বাবু জানিতেন বৃহস্পতিবারের পূর্ব্বে সতীশের পত্র পাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই, হয় ত আরও দুই এক-দিন বিলম্বও হইতে পারে। সতীশের পত্র পাইলে সমস্ত ব্যবস্থা করিবেন ইহাই তিনি মনে করিয়াছিলেন।

বুধবার অপরাহ্ণকালে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল; সন্ধ্যার সময় হইতেই ঝড় আরম্ভ হইল। নরেশ বাবু ও ভবেশ আর এই বৃষ্টির মধ্যে সরকার মহাশয়দিগের বাড়ীতে আহার করিতে গেলেন না; বিশ্বনাথ সে দিন যে জলখাবার আনিয়াছিল, তাহাই আহার করিয়া তাঁহারা সকাল সকালই শয়ন করিলেন।

রাত্রি যখন প্রায় এগারটা, তখনও মূষলধারে বৃষ্টি হইতেছিল, চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। কল্যাণপুর গ্রামের একটী লোকও জাগিয়া নাই। এমন সময়ে কে যেন নরেশ বাবুর বাহিরের দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল; যে বৃষ্টির শব্দ তাহাতে সে আঘাতের শব্দ কাহারও কর্ণগোচর হইবার সম্ভাবনা ছিল না। বাড়ীর সকলেই নিদ্রিত। হঠাৎ বিশ্বনাথের নিদ্রাভঙ্গ হইল; সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া নরেশ বাবুকে ডাকিল, বলিল "কাকাবাবু, বাহিরের দরজার নিকট যেন কি শব্দ শুনিলাম; একবার দেখিব কি?"

নরেশ বাবু বলিলেন "বিশু, এই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে কে আসিবে? বোধ হয় বাতাসে দুয়ার নড়িতেছে।"

এমন সময়ে আবার শব্দ হইল, এবার কে যেন ডাকিতেছে বলিয়া বোধ হইল; বিশ্বনাথ যেন শুনিতে পাইল কে "বিশুদাদা" বলিয়া ডাকিতেছে।

বিশ্বনাথ তখন একলম্ফে বিছানা হইতে উঠিল, বলিল "না, কাকাবাবু, কে যেন ডাকিতেছে। আমি বেশ শুনিতে পেলাম কে যেন 'বিশুদাদা' বলিয়া ডাকিতেছে। কাকাবাবু, দিদি আমার বুঝি এসেছে।"

নরেশ বাবুর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল; তিনিও আর বিছানায় থাকিতে পারিলেন না; উঠিয়া বলিলেন "বিশু, আমি এই দাবায় দাঁড়াই, তুমি লণ্ঠনটা ধরিয়ে ছাতাটা মাথায় দিয়ে একবার না হয় দেখেই এস।"

কার কথা কে শোনে। বিশ্বনাথের আর প্রদীপ জ্বালা বা লণ্ঠন লওয়া হইল না, ছাতাও সে লইল না। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল সুমতিই আসিয়াছে। একা ভয়ানক দুর্য্যোগের মধ্যে সে ছাড়া আর কে আসিবে? সে ছাড়া আর কে তাহাকে 'বিশুদাদা' বলিয়া ডাকিবে। বিশ্বনাথ তখন তাড়াতাড়ি সেই ঝড় বৃষ্টির মধ্যেই উচ্চৈঃস্বরে "যাই দিদি!" বলিয়া দ্বারের দিকে দৌড়াইল। উঠানে জল হইয়াছে, মাথার উপর বৃষ্টি পড়িতেছে, ঝড় ঠেলিয়া লইতে চায়। কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সে ঠিক পথে বাহিরের দ্বারের কাছে গেল। কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিয়াই দ্বার খুলিয়া দিল।

তখন শব্দ হইল "বিশুদাদা, আমি সতীশ"। সতীশ! বিশুদাদা আর কথা কহিতে পারিল না, সে যে বড় আশা করিয়া দ্বার খুলিতে আসিয়াছিল, সে যে তার হারানিধিকে পাইবে বলিয়া আসিয়াছিল। তাহার বুক ভাঙ্গিয়া গেল; হতভাগ্য বিশ্বনাথ বসিয়া পড়িল।

সতীশ তখন তাড়াতাড়ি তাহার হাত ধরিয়া তুলিল। সতীশের সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে, বস্ত্রাদি কর্দ্দমাক্ত। পাগলের মত অবস্থায় বিশ্বনাথের হাত ধরিয়া সতীশ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। বারান্দায় উঠিয়াই দেখে সম্মুখে নরেশ বাবু দাঁড়াইয়া আছেন।

তখন তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল; সে "কাকাবাবু বলিয়া নরেশ বাবুর পদতলে পড়িয়া গেল। নরেশ বাবু সেই ২৬ বৎসরের যুবককে বালকের মত কোলের কাছে লইয়া বসিলেন। উভয়ে নীরব! তাহাদের কথা বলিবার শক্তি অপহৃত হইয়াছিল।

শোকের বেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে নরেশ বাবুর মনে হইল যে সতীশ এই ঝড় বৃষ্টিতে রেল ষ্টেশন হইতে সাত মাইল পথ হাঁটিয়া আসিয়াছে, তাহার কাপড় চোপড় ভিজিয়া গিয়াছে, সর্ব্বাঙ্গে কাদা মাখা। তিনি তখন ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "সতীশ, ওঠো কাপড় ছাড়। তুমি যে একেবারে মরার মত হইয়াছ। বিশু, শীঘ্র কাপড় দাও, আগুন কর, সতীশ যে শীতে কাঁপিতেছে। সতীশ, সতীশ, কথা বল।"

নরেশ বাবুর মনে হইল সতীশ বুঝি মূর্চ্ছিত হইয়াছে। এই অন্ধ-



কার রাত্রিতে—এই ভয়ানক ঝড় বৃষ্টির মধ্যে—এই জল কর্দ্দমপূর্ণ পল্লীপথে সাত মাইল পথ আসা কি সহজ কথা।

বিশ্বনাথ তখন তাড়াতাড়ি আগুণ জ্বালিল, ঘরের মধ্য হইতে কাপড় আনিয়া দিল, জল দিয়া সতীশের গায়ের কাদা ধোয়াইয়া দিল। সতীশ ধীরে ধীরে আগুণের নিকট যাইয়া বসিল। শরীর একটু উত্তপ্ত হইল; তখন যেন তাহার বাক্‌শক্তি পুনরায় ফিরিয়া আসিল। সে তখন নরেশবাবুর দিকে ফিরিয়া বসিল।

নরেশবাবু এতক্ষণ নির্ব্বাক অবস্থায় বসিয়াছিলেন। এখন সতীশকে একটু প্রকৃতিস্থ দেখিয়া বলিলেন "সতীশ, এই ঝড় বৃষ্টিতে কেন আসিলে? ষ্টেসনে অপেক্ষা করাই ত ভাল ছিল। এত তাড়াতাড়ি করিলে কেন? এমন করিয়া কি জীবন বিপন্ন করিতে হয়? এই ঝড় বৃষ্টিতে কি মানুষে ঘরের বাহির হইতে পারে; আজ তুমি সাত মাইল পথ চোলে এলে।"

বাহিরে কথাবার্ত্তা শুনিয়া ভবেশ জাগিয়া উঠিয়াছিল। সে বাহিরে আসিয়া দেখে আগুনের সম্মুখে সতীশ বসিয়া আছে। ভবেশ ত একেবারে অবাক্ হইয়া গেল; একটু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিল; তাহার পর বলিল "সতীশ দা! তুমি এই ঝড় বৃষ্টিতে কেমন কোরে এলে?

সতীশ এতক্ষণে কথা বলিল, বলিল "ভবেশ, বুকের মধ্যে যে ঝড় উঠিয়াছে তার কাছে এ বাইরের ঝড় কি ভাই!" আর তাহার মুখ দিয়া কথা সরিল না, সতীশ কাঁদিয়া ফেলিল; বালক যেমন কাঁদে—তেমনই করিয়া সতীশ কাঁদিতে লাগিল। ( ক্রমশঃ )

শ্রীজলধর সেন।

# স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

## ( রবিন্দ্রবাবুর পত্র )

ওঁ

বোলপুর।

প্রিয়বরেষু,

স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবনী সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু জানি বলিয়া ত গর্ব্ব করিতে পারি না। অবশ্য তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল এবং তিনি আমাকে কিছু স্নেহও করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে বরোদার সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপন উপলক্ষে তিনি আমাকে দুই তিন খানি পত্রে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন, যাইতে পারি নাই বলিয়া অদ্য আমার হৃদয় অত্যন্ত অনুতপ্ত আছে। তাঁহার চরিত্রে প্রাণের বেগের সঙ্গে অপ্রমত্ততার যে সম্মিলন ছিল তাহা এখনকার কালে দুর্লভ। তাঁহার সেই প্রচুর প্রাণশক্তি তাঁহাকে দেশহিতকর বিচিত্র কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়াছে, অথচ সে শক্তি কোথাও আপনার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে নাই। কি সাহিত্যে, কি রাজকার্য্যে, কি দেশহিতে সর্ব্বত্রই তাঁহার উদ্যম পূর্ণবেগে ধাবিত হইয়াছে, কিন্তু সর্ব্বত্রই আপনাকে সংযত রাখিয়াছে—বস্তুত ইহাই বলশালিতার লক্ষণ। এই কারণে সর্ব্বদাই তাঁহার মুখে প্রসন্নতা দেখিয়াছি—এই প্রসন্নতা তাঁহার জীবনের গভীরতা হইতে বিকীর্ণ। স্বাস্থ্য তাঁহার দেহে ও মনে পরিপূর্ণ হইয়াছিল—তাঁহার কর্ম্মে এবং মানুষের সঙ্গে তাঁহার ব্যবহারে এই তাঁহার নিরাময় স্বাস্থ্য একটী প্রবল প্রভাব বিস্তার করিত। তাঁহার জীবনের সেই সদাপ্রসন্ন অরুগ্ন নির্ম্মলতা আমার স্মৃতি অধিকার করিয়া আছে। আমাদের দেশে তাঁহার আসনটী গ্রহণ করিবার আর দ্বিতীয় কেহ নাই। ইতি ১৬ই পৌষ, ১৩১৬।

ভবদীয়

( স্বাক্ষর ) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

* চৈতন্য লাইব্রেরীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন মহাশয়কে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছেন, গৌরহরি বাবুর অনুমতি অনুসারে তাহা প্রকাশিত হইল। মাঃ সঃ

# মানসী।

যৌবনে রমেশচন্দ্র।

*Printed by K. V. Seyne & Bros.*

# বাঙ্গালা নাটক সমালোচনা।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

[ ৩ ]

দ্বিতীয় অঙ্কে—প্রথম দৃশ্য—আগ্রার সম্রাটের কোষাধ্যক্ষ আয়াসের ( অর্থাৎ নুরজাহানের পিতার ) বাড়ী, কাল—প্রাহ্ন। এখানে বন্দররাজ ও সম্রাটের সভাসদ্‌গণ মিলিত হইয়া কথোপকথন করিতেছিলেন।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল এই দৃশ্যে কোন বিশেষ কথার আলোচনা করেন নাই। মেহেরুন্নিসাকে আনিয়া সম্রাট্ প্রাসাদে রাখিয়াছেন, অথচ তাহার সহিত দেখা করেন না—ইহা লইয়াই সভাসদ্বর্গ রসিকতা করিতেছেন। মোগল দরবারের দরবারী ব্যক্তিবর্গ যে সুরে এই রসিকতার অবতারণা করিতেছেন,—পাঠকবর্গকে তাহার একটু নমুনা দিতেছি,—

প্রথম সভাসদ্ এইরূপে কথার সূত্রপাত করিলেন,—"বিধবাটির স্বামীকে হত্যা করিয়ে তার পরে তাকে আগ্রার প্রাসাদে এনে রাখাটা, অন্ততঃ আমাদের হলে সকলেই অত্যন্ত নির্লজ্জ বল্‌তো"।

রাজা। বিধবাটি নিরাশ্রয়, কোথায় যায়—হেঁ হেঁ—তাই বাদশাহ দয়া করে—

২য় সভা। তাকে ধরে নিজের বাড়ীতে এনে চাবি বন্ধ করে রেখে দিয়েছেন। হাঁ, তাঁর উপরে সম্রাটের বিশেষ অনুগ্রহ তা দেখাই যাচ্চে।

*　　*　　*　　*　　*　　*　　*

২য় সভা। বিধবাটি শুনেছি অপূর্ব্ব সুন্দরী।

৩য় সভা। বিধবাটি কেন?—বিধবামাত্রেই অপূর্ব্ব সুন্দরী।"

আমরাও প্রথম সভাসদের কথার অনুসরণে বলিতে পারি,—আমাদের বন্ধু-বান্ধবেরা যদি আমাদের বৈঠকখানায় বসিয়া এরূপ ভাবে পুরমহিলাগণের সম্বন্ধে আলোচনা করেন,—আর আমরা যদি তাহা চলিতে দিই, তাহা হইলে লোকে আমাদিগকে কেবল নির্লজ্জ বলিয়াই ক্ষান্ত হইবে না—'ইতর' বলিয়া সম্মানিত করিবে। মোগল বাদশাহের কার্য্য সমালোচনা করিবার এতটা স্বাধীনতা সে কালে ছিল কি?—বিশেষতঃ তাঁহার নিজের দরবারীদিগের দ্বারা? যে দরবারে

চরচর্চ্চায় প্রতিমুহূর্ত্তে অপ্রিয়ভাষী ও অপ্রিয়কারীদিগের মস্তক স্কন্ধ হইতে চ্যু হইত, সেখানে এরূপ শ্লেষ প্রয়োগে সুস্বাধীনতা কল্পনা করাও ধৃষ্টতা নহে কি? আর এক কথা—গৃহ-স্বামীর বাড়ীতে বসিয়া তাঁহারই কন্যা সম্বন্ধে এইরূপ কুৎসিত ইয়ারকি দিবার প্রবৃত্তি কোন ভদ্রলোকের হইতে পারে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই; কিন্তু 'কাব্যে দুর্নীতির' দমনকারী কবি মহাশয় কেন যে এমন অদ্ভুত নীতিপরায়ন সভাসদ্ চিত্র অঙ্কিত করিয়া নিজ নাটকখানিই কলঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না।

তাহার পর আসক খাঁ বেগে আসিয়া কুমার খসরুর বিদ্রোহবার্ত্তা ও তাঁহার বন্দী হইবার সংবাদ দিলেন। সকলে কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া "কবে", "কোথায়", "কে কল্লে" ইত্যাদি প্রশ্ন করিতে করিতে "আসককে দস্তুরমত বেষ্টন করিলেন।" কবির কথায় বুঝিলাম—লোকগুলা বসিয়াছিল—উঠিয়া আসককে ঘেরিয়া দাঁড়াইল—এ কিরূপ সভ্যতা? ইহার পরই আয়াস ধীরে প্রবেশ করিলেন। প্রথম সভাসদ্ তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—"এই যে আসকের পিতা!" এরূপ সম্বোধনের অর্থ কি? শ্বশুর ভাশুর, স্বামী ও গুরুজনের নাম স্ত্রীলোকেই ধরে না। সখীজনের মধ্যে পরস্পরের স্বামীর উল্লেখ করিতে হইলে, স্ত্রীলোকেই "খোকার বাপ" বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। পুরুষের মুখে এরূপ আমরা কোথাও শুনি নাই। নবদ্বীপরাজ ও কাশিমবাজার-রাজের দেওয়ান বংশধর কবি দ্বিজেন্দ্রলাল কোন ভদ্রবংশে ভদ্র মজলিসে, কোন সম্মানার্হ ব্যক্তির মুখের উপর তাঁহাকে এরূপভাবে অভ্যর্থনা করিতে কখনও কোথাও শুনিয়াছেন কি না আমরা খবর পাই নাই।

থাক্, তার পর আয়াস ভদ্রতার সকল প্রকার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বঙ্গরাজকে স্বীয় গৃহ হইতে তাড়াইলেন। তার পর রাজার গমন ভঙ্গী দেখিয়া এক ব্যক্তি বলিলেন—"কি রকম কেন্নুইয়ের মত পাক খেলে দেখেছো?"—পাঠক! এমন সরস বাক্যটা ভুলিবেন না—ইহা এই নাটকে বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছে। কেন্নুয়ের মত পাক খাওয়াতেই কবি যে সব রসটুকু নিঃশোষিত করিয়া ফেলিলেন, আপনারা কবিকে এতটা কৃপণ ভাবিবেন না। ইহার পর আর একজন বলিল,—"দেখ্‌ছি ও শীঘ্র মহারাজ হবে।"—"কেন?"—"ঐ যারা কেন্নুয়ের মত পাক খায়,



দের এক দিন না এক দিন মহারাজা হতেই হবে।"—"শাস্ত্রে লেখে নাকি?"—স্তাব কর্ত্তা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইলেন। পাঠক! শব্দালঙ্কারে যে কতটা ভীর রস জমিতে পারে,—এই রসভাষ হইতে যে কেবল আপনারাই বুঝিতে ারিয়াছেন, তাহা নহে,—কবির সুচিত্রিত সভাসদ্‌গণও বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং এই রসের উদ্গার তুলিতে তুলিতে হঠাৎ বিনা প্রয়োজনে বলিয়া ফেলিলেন—"চল আমরাও যাই, বেলা হল।"—তার পর প্রস্থান।—পাঠক! শুন দেখি,—এখানে এ দৃশ্যে কোন্ কথাটার আবশ্যকতা আছে? কবি অনর্থক পাঠক ও দর্শকের ধৈর্য্যকে পীড়িত করিবার জন্য কেন এ দৃশ্যটা চাপাইলেন?

তার পর এই দৃশ্যে পিতা পুত্রে—আয়াস ও আসকে যে কথাবার্ত্তা হইল,—তাহার মধ্যে আয়াস সংবাদ দিলেন যে সম্রাট্ তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিয়াছেন;—"তোমার কন্যাকে যদি তুমি সম্মত কর্ত্তে পার তো তোমায় মন্ত্রিত্ব পদ দিব"—তার তিনি উত্তরে বলিয়াছেন—"জাঁহাপনা, অনুমতি হয় ত, কোষাধ্যক্ষের পদ পরিত্যাগ করি।"—এইটুকুমাত্র প্রয়োজনীয় সংবাদ পাওয়া গেল।

দ্বিতীয় দৃশ্যে—দরবার কক্ষে বাদশাহ জাঁহাগীর, কোষাধ্যক্ষ আয়াস ও সম্রাটের তিন পুত্র দণ্ডায়মান। খসরুকে বন্দী করিয়া আনা হইল। খসরুর বিচারে জাহাঁগীর তাহার প্রতি যে দণ্ড দিলেন তাহা ন্যায়-সাপেক্ষ হইলে, মহব্বৎ খাঁ ও আয়াস খাঁ বন্দীর পদমর্য্যাদার প্রতি লক্ষ্য করিয়া দণ্ড হ্রাস করিতে অনুরোধ করিলেন। আয়াস খসরুর ষড়যন্ত্রকারী সঙ্গীদিগের নাম সংগ্রহ করিয়া দিবেন স্বীকার করায় জাহাঁগীর অন্য দণ্ড না দিয়া কেবল বন্দী করিয়া রাখিতে বলিলেন। এই দৃশ্যে জাহাঁগীর, খসরু, মহব্বৎ, আয়াস এই চারিটি চরিত্রই বেশ ফুটিয়াছে, সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে। মহব্বতের স্পষ্টবাদিতা, জাহাঁগীরের বিচারনিষ্ঠতা, খসরুর মহত্ত্ব বেশ খুলিয়াছে, তবে ব্যাপারটা একটা কক্ষের ভিতরে গোপনে না হইয়া পূর্ণ দরবারে হইলে আরও উজ্জ্বল হইত। তাহার পর সম্রাজত্রয়ের চিত্র কবি ইচ্ছা করিয়াই মলিন করিয়া আঁকিয়াছেন। মলিনতাও ফুটিয়াছে ভাল। তবে শাহজাহান প্লেটোর কল্পিত রাজত্ব হইতে কবিদের নির্ব্বাসন ব্যাপারের উল্লেখ করিয়া রুগ্ন ভ্রাতার প্রতি যে শ্লেষ করিয়াছেন তাহাতে কবির

ইউরোপীয় প্রাচীন সাহিত্যের জ্ঞান প্রকাশ পাইয়াছে আর শাহজাহানকে ...র করিয়া তুলিয়াছে। তৃতীয় দৃশ্যে আগ্রার প্রাসাদের এক কক্ষে আয়না নুরজাহানকে পাঠে নিযুক্ত দেখিতে পাই। পড়িতে ভাল লাগিতেছে না বলিয়া বহি ফেলিয়া তিনি আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কেশগুচ্ছ গুছাইতে গুছাইতে নিজের অতীত ও ভবিষ্যৎ মিলাইয়া কত ছবি ভাবিতেছিলেন। পাঠক! এ উক্তিগুলির মধ্যে নিম্নে কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি,—

"এই চেহারার জন্য এত! হায় উদার স্বামী!—এই রূপই তোমার মৃত্যু সাধন করেছে! এই রূপ? না অকৃতজ্ঞ কঠিন হৃদয়! * * * * তবু তোমায় ভালবাস্‌তে পারি নাই। ঈশ্বর জানেন তোমায় ভালবাসবার জন্য নিজের সঙ্গে কি যুদ্ধ করেছি। তবু পার্লাম না। তাই তুমি অসীম বৈরাগ্যে মৃত্যুকে ডেকে নিলে। আমার উচ্চাশাই তোমার সর্ব্বনাশ করেছে।"—এখন কবিকে গিরীশচন্দ্রের কথায় জিজ্ঞাসা করি,—"আর কি লুকাতে পার?"—বলি নুরজাহান! মহীউদ্দীনের স্ত্রীর নিকট "আসক্তি নয়" বলিয়া যে চালাকি করিয়াছিলে—সেটা তবে তাহা মিথ্যা কথা! আর শের আফগানের প্রশ্নের উত্তরে—"ঘুমাও নাথ" বলিয়া আসল কথাটাই চাপা দিবার যে চেষ্টা করিয়াছিলে, তাহাতে আর এখন তোমারও প্রতিবাদ করিবার ক্ষমতা নাই, কারণ তোমার জন্মদাতা দ্বিজেন্দ্রলাল তোমাকে এইরূপ দোষগুণ বিজড়িত মানব চরিত্রের উদাহরণ করিয়াই আঁকিয়াছেন। তবে তিনি তোমার প্রতি বড় নিষ্ঠুর—তোমায় সর্ব্বত্র কেবল মিথ্যাবাদিনী করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন।

তাহার পর কবি নুরজাহান চরিত্রটিকে স্বীয় প্রতিজ্ঞামত জটীল করিবার জন্য এই স্বগতোক্তির মধ্যেই বলাইয়াছেন—"স্বামী! তুমি মরেছিলে আমার জন্য—আমিও মর্ব্ব তোমার জন্য! তুমি মরেছিলে পরের সঙ্গে যুদ্ধ করে, আমি মর্ব্ব নিজের সঙ্গে যুদ্ধে। তুমি মরেছিলে এক মুহূর্ত্তে—আমি মর্ব্ব তিলে তিলে। তুমি গিয়েছো—আর আমার জন্য রেখে গিয়েছো—এক জীবন্ত কবর।"—পাঠক এই প্রতিজ্ঞাটা মনে করিয়া রাখিবেন।

তাহার পর কন্যা লয়লাকে ডাকিলেন। মাতা কন্যায় কথা হইল,—কন্যার আক্রোশ—স্বামীহন্তার গৃহে আসিবার পূর্ব্বে বিষ খাইয়া মা মরিল না কেন



কন্যা মাতাকে দুর্গত্যাগের উপায় করিতে বলিল, কতকটা নিজেও করিবে বলিয়া ...লিয়া গেল। নুরজাহান কন্যার মৃদু তিরস্কারে লজ্জা অনুভব করিয়া যেন পলা-...ত কৃতসংকল্প হইল।—এদৃশ্যে এই কথোপকথন বেশ কৌশল সহকারে গ্রথিত ...য়া উভয়কে বেশ ফুটাইয়াছে। এই দৃশ্যটিতে কবির কৃতিত্ব বেশ ফলিয়াছে। ...বে ভাষাটায় প্রতিজ্ঞাটুকুর দৃঢ়তা ফুটে নাই, না ফুটাই উচিত—কবির এ ...শল টুকুও বেশ, কারণ যে প্রতিজ্ঞা পরে টিকিবে না তাহা দৃঢ় করিয়া ...ধিতে নাই।

চতুর্থ দৃশ্যে রেবা নুরজাহানকে মুক্তি দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। রেবার ...কট জাহাঁগীর এবার ধরা দিয়াছেন,—স্পষ্টই কথা বলিয়া ধরা দিয়াছেন। ...রজাহানকে ধরিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যও বলিয়াছেন। রেবা ও জাহাঁগীর উভয়েই ...দৃশ্যে সুচিত্রিত হইয়াছে।

এই কক্ষে লয়লার হঠাৎ আবির্ভাব এবং সম্রাটের সম্মুখে উদ্ধত বাক্য ...য়োগ একেবারে অপ্রাসঙ্গিক, বিসদৃশ এবং অসম্ভব। বাদশাহী রঙমহালের নিয়ম ...ল, সুলতান পাঞ্জা ব্যতীত বন্দিনারা যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতে পারিবে না। বাদ-...হ কোন বেগমের মহলে থাকিলে বিনা এত্তেলায় সেখানে কেহ যাইতে পারিত ...। সম্রাটের সম্মুখে সকলকেই মায় সুলতানা বেগমকে পর্য্যন্ত প্রতি হাত ...র্ণিস করিয়া সসম্মানে কথা কহিতে হইত। দ্বিজেন্দ্রবাবু, লয়লাকে পিতৃ-...ধের প্রতিহিংসা পরায়ণা বিষধরী করিয়া আঁকিতে গিয়া স্থান ও কালের ব্যবস্থা ...লটাইয়াছেন? বাদ্‌শাহের হারেম তোমার আমার অন্তঃপুর নহে, যে একজন ...পরের কথোপকথনের মধ্যে উপরপড়া হইয়া আসিয়া যথেচ্ছ ভাষা ব্যবহার ...রিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাইবে।

---

## মাসিক সাহিত্যসমালোচনা।

বঙ্গদর্শন, চৈত্র। 'শিক্ষা ও তাহার সংস্কার" শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র রচিত। লেখক বলিতে ...ন—সভ্যতার মূলে শিক্ষা। ইয়োরোপ ও এসিয়াখণ্ডে সময়ে সময়ে এক একজন মহাপুরুষ ...ব শিক্ষা প্রচার করিয়াছিলেন; কালে সে গুলির কি ফল হইয়াছিল তাহা দেখাইয়া লেখক ...ন্ধের শেষ বক্তব্য আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি বলেন—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্যে ...কোটাই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নয় এই দুয়েরই আদর্শ মিলাইয়া আমাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষাপ্রণালীর আদর্শ ...ন করিতে হইবে। "শ্রীমন্তের সিংহল যাত্রা" শীর্ষক প্রবন্ধে কালীবর বেদান্ত বাগীশ লঙ্কা ও ...হল লইয়া গোলযোগ করিয়াছেন, একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে পারেন নাই। "রাজা ...মোহন রায়" শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু রচিত প্রবন্ধটি সারগর্ভ হইয়াছে। "লক্ষণ সেন ও ...তেয়ারের বাঙ্গলা জয়" শ্রীরাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধ—নানা তথ্যে ...র্ণ।

ভারত মহিলা, বৈশাখ। এই মহিলা পরিচালিত পত্রিকাখানির উন্নতি দেখিয়া আমরা প্রী
হইয়াছি। মাঝে মাঝে এক একটি প্রবন্ধ এত উপদেশপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়, যে আমরা তাহা সম
মহিলার পাঠ্যস্বরূপ নির্দ্দেশ না করিয়া থাকিতে পারি না। এ সংখ্যায় শ্রীআমোদিনী ঘোষ র
"শিশু শিক্ষায় বঙ্গনারী" উল্লেখযোগ্য। ইদানীন্তন অধঃপতিত রমনীসমাজকে লক্ষ করিয়া লেখি
যে কয়টি কথা বলিয়াছেন, তাহার সহিত আমরাও মত দিতে চাই, কিন্তু হায় "চোরা ন
শুনে ধর্ম্মের কাহিনী"। "জ্যোতির্ব্বিদের ভুল" সুনির্ব্বাচিত বলিয়া বোধ হইল না। ব
কয়টি মন্দ হয় নাই।

দেবালয়, জ্যৈষ্ঠ। "একখানি শিলালিপি" শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত প্রবন্ধটি চিত্তাকর্ষ
লেখক শিলালিপি ও তাহার অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। কোন্ যুগে গ্রীকরাজ এণ্টিয়া
সাইডসের (Antialcidas) রাজত্বকালে তক্ষশীলা হইতে আগত দীয়নের পুত্র হিলিয়োডোরা
শিলাখণ্ডটি ভগবান্ বাসুদেবের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহা জানিতে কে না উৎসু
হয়? "দশপদী (কিন্তু কবিতা নহে) শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত; বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশি
শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত "দশপদীর" উত্তরস্বরূপ লেখা হইয়াছে। কবিতা হিসাবে হ
না হইলেও ইহাতে মানুষ সম্বন্ধে নীচ ধারণাটুকু নাই! এ সম্বন্ধে অধিক বলিতে চাই ন
সাধারণে দুইটি কবিতা পাশাপাশি রাখিয়া পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। শ্রীসখারা
গণেশ দেউস্কর রচিত "বৈদিক আলোচনায়" অনেক জানিবার কথা আছে। "আমাদের চালাকী
ও গীতায় শ্রীকৃষ্ণ" উল্লেখ যোগ্য।

বিদ্যোদয়:, সংস্কৃত মাসিক পত্রম্, শ্রীহৃষীকেশ শাস্ত্রিণা সম্পাদিত:।

সংস্কৃত ভাষার যুগ কাটিয়া গিয়াছে। এখন আমরা সংস্কৃত ভাষার কাব্য সাহিত্য প্রভৃতি
পড়িয়াই নিশ্চিন্ত হই। মৃত ভাষার প্রাণ আনিতে চেষ্টা করি না। চেষ্টা করিলে আম
সংস্কৃতের উন্নতি করিতে পারি না এমন নয়; আমাদের দেশে একসময়ে জয়দেব জন্মিয়াছিলেন,
ইদানীন্তন সময়ে চন্দ্রকান্ত প্রমুখ লেখকগণও সংস্কতের উন্নতি করিয়াছেন। এই পত্রখানি দেখিয়া
আমরা আশা করিতেছি সুযোগ্য সম্পাদকের চেষ্টায় সংস্কতপ্রিয়ের ইচ্ছা ফলবতী হইবে।

আলোচ্য সংখ্যায় "শ্রীপার্শ্বনাথ চরিতম্" শীর্ষক প্রবন্ধে জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের জী
সঙ্কলিত হইয়াছে। "চট্টলবিলাপম্"—কবি নবীনচন্দ্রের জন্মভূমির অধিষ্ঠাত্রী চট্টলাদে
সম্মুখে শ্রীরজনীকান্ত কাব্যতীর্থ যে ক্ষুদ্রকাব্য খানি পড়িয়াছিলেন, তাহারই কিয়দংশ এই নিব
উদ্ধৃত। কবি বিলাপের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা অস্বাভাবিক। "পাস্থাষ্টকম্"—প্রবী
কবির সুললিত রচনা। "Duties of a King" সংস্কৃত পত্রে না থাকিলেই ভাল হইত
কতকগুলি ইংরাজী নীতির সংস্কৃত অনুবাদ দেখিলেও সুখী হইতাম।

বাল্যাশ্রম, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত।' 'বাল্যাশ্রমের'
উদ্দেশ্য কি তাহা প্রথমেই ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল। এই অংশটি এত অস্পষ্ট
অনেক চেষ্টা করিয়াও ইহার ভাবার্থ টুকু গ্রহণ করিতে পারিলাম না, একটু টীকা টীপ্পনী থাকিলে
ভাল হইত। এই অংশটুকু পড়িয়াই আমরা বুঝিয়াছি—"বাল্যাশ্রম" বালকদের জন্য নয়, যুবক
বা বৃদ্ধেরও নয়। যাঁহারা এইরূপ হেঁয়ালী বুঝিতে পারেন, তাঁহাদেরই জন্য।

শিশু সাহিত্যের উন্নতি বিধান করিতে হইলে চেষ্টা চাই। যাহা ছেলেরা সহজে বুঝিতে
পারে, তাহাই প্রকাশিত করা উচিত। শুধু পুরাতন লইয়া থাকিলে চলিবে না, নূতনকেও
সাদরে আহ্বান করিতে হইবে। প্রবন্ধ সুনির্ব্বাচিত হইলে আমরা সুখী হইব।

আলোচ্য সংখ্যায় "মহর্ষি উতঙ্ক" ও "বাপ্পা রাও' মন্দ হয় নাই।

# মানসী

২য় বর্ষ। ] শ্রাবণ ১৩১৭ সাল। [ ৭ম সংখ্যা। ৬ষ্ঠ

## ফুলের ফসল।

ফুলের ফসল লুটিয়ে যায়,
অপ্সরীরা আয় গো আয়—
মৌমাছিরে বাহন করে
হাওয়ার আগে ছুটিয়ে আয়!
পাতার আগায় শিশির-জলে
হেথায় কত মুক্তা ফলে,
লুতার সূতায় দুলিয়ে দোলা
ঝুলন-খেলা খেলবি আয়!
বাসন্তিকা তন্দ্রাভরে
লুটায় বাসর-শয্যা 'পরে,
মূর্ত্তি ধরে' চন্দ্র এসে
মুখখানি তার চুমায় ছায়!
ফুলের তুরী ফুলের ভেরী
বাজিয়ে দে, আর কিসের দেরী,
ভরে'দে এই মিহিন্ হাওয়া
মোহন সুরের সুষমায়!
ঝুম্‌কো ফুলের ছত্রতলে
জোনাক্ পোকার চুম্‌কি জ্বলে,
সেথায় গোপন রাজ্য পেতে'
স্বপ্ন-শাসন মেলবি আয়!

অঞ্চলে আর অঞ্জলিতে
মঞ্জরী নিস্ মন ছলিতে,
ফুলের পরাগ কুঁড়ির সোহাগ
নিস্ রে যত পরাণ চায় ;
আকাশ ভরে' বাতাস ভরে'
গন্ধ রাখিস্ স্তরে স্তরে,
অমল কোমল নিছনি তার
রাখিস্ নিথর জোছনায় !
ক্লান্ত নয়ন পড়্‌লে ঢুলে,
ঘুমাস্ কোমল শিরীষ ফুলে,
শুক তারাটি ডুব্‌লে, জেগে,
দেখ্‌বি—তোদের অমরায় !

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

---

# মধুয়া।

## ( চিত্র )

সে আজ অনেক দিনের কথা, আমি একবার মধুয়াকে দেখিয়াছিলাম। সে আমার কাছে মাঝে মাঝে আসিয়া বসিত, কিন্তু কখনো তাহার সহিত কথা কহিতে পারি নাই।

জঙ্গলের ভিতর "শালবনী" বলিয়া একটি গ্রাম ; শালগাছের সংখ্যা অধিক বলিয়াই হয়ত স্থানটির ঐরূপ নাম হইয়াছে। এইখানেই মধুয়ার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ।

সহরের কোলাহল যখন অসহ্য হইয়া পড়িত, তখন মাঝে মাঝে এই ক্ষুদ্র পল্লীতে আপনার আশ্রয় খুঁজিয়া লইতাম। এখানকার তরুশ্রেণীর বিচ্ছিন্ন ছায়াগুলির উপর কেমন একটা মায়া পড়িয়াছিল।

মধুয়াকে দেখিয়াছিলাম—একটি নবীন ঈষৎ চঞ্চল প্রভাতে। তখন



তাহার বয়স বোধ হয় দশ বৎসর। সূর্য্যের নূতন শুভ্র কিরণ বালকের শান্ত সরল মুখখানির উপর পড়িয়াছিল। সেদিন হইতেই তাহাকে দেখিবার জন্য প্রাণ সর্ব্বদাই আকুল হইয়া উঠিত।

মধুয়ার কেহ ছিল না। শুনিয়াছি—জন্মের পূর্ব্বেই সে পিতৃহীন হইয়াছিল। মা ছেলেকে দুটিদিন স্তন্যপান করাইয়া কাছের বড় পুকুরটিতে কাপড় কাচিতে গিয়াছিল, আর ফিরিয়া আসে নাই। মধুয়া একা জগতের বিশাল বুকের উপর যখন নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়াছিল, তখন হইতে কে তাহার উপর মাতৃস্নেহ ঢালিয়া দিয়াছিল ঠিক বলিতে পারি না। ছেলেটিকে দেখিলে আমার স্পষ্ট বোধ হইত—সে যেন এ পৃথিবীর লোক নয়, সে যেন কোনো অনির্দ্দিষ্ট জগত হইতে উড়িয়া আসিয়া পথহারার মত আকুল হইয়া পড়িয়াছে, অনেক চেষ্টা করিয়াও এই অপরিচিত জগতের সঙ্গে কোনো একটা সম্বন্ধ পাতাইতে পারিতেছে না।

আমি ছাড়া আরো দুই চারিজন মধুয়াকে দেখিয়াছে। তাহারা বলে—ছেলেটা কিন্তুতকিমাকার, কাহারো সঙ্গে কথা কয় না,—সদাই আপনার ভাবে বিভোর—বাপ নাই, মা নাই, তবুও অজর অমর হইয়া আছে।

কেহ কেহ বলিত—জন্মের পরেই একটা গাভী আসিয়া তাহার দুগ্ধভরা স্তন ছেলেটির মুখের কাছে ধরিত, দিনের বেলা পাখীগুলি নানারকমের ফল তাহার কাছে আনিয়া দিত, রাত্রে দুইটা বড় বড় ভালুক আসিয়া তাহার প্রহরী হইত।

এ সব শোনা কথা,—কেমন করিয়া এই "বাপ-মা-খেগো" ছেলেটি এত বড় হইল তাহা ঠিক বলিতে পারি না। কোন্ অদৃশ্য মায়ের কোমল অঙ্গুলি স্পর্শে তাহার শিরায় শিরায় পুলকের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা লইয়া তর্ক করা বৃথা। এই প্রকৃতির কোলে লালিত শিশুটির কখনো কোনো অভাব দেখি নাই।

মনুষ্যজগতের সহিত সে বড় একটা সম্পর্ক রাখিতে পারে নাই। যদি কখনো হঠাৎ সে সম্পর্ক ঘটিয়া উঠিত, তাহা খুব অল্প সময়েরই জন্য। আমি কত চেষ্টা করিয়াও তাহার সহিত মিশিতে পারি নাই।

মনুষ্যজগতের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাইতে না পারিয়া সে তাহার অন্তরালে

আপনার মত একটা জগত খুঁজিয়া লইয়াছিল। এখানে কোনো মানুষ-বন্ধু ছিল না। একটি হৃষ্টপুষ্ট মেষশাবক তাহার একমাত্র খেলার সাথী হইয়াছিল। ঘনপল্লব বৃক্ষচ্ছায়ায়, শালনির্য্যাসগন্ধি বনভূমিতে, তরঙ্গিত পুষ্করিণীর তটে তাহারা সারাদিন খেলিয়া বেড়াইত। বনের পাখী তাহাদের কাছে উড়িয়া বসিতে দ্বিধা করিত না। সামান্য সাঁওতাল বালক সেই বিজনে যে মাধুর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাতে মুগ্ধ না হইয়া আমি থাকিতে পারিতাম না।

প্রকৃতি তাহার জন্য সকল সৌন্দর্য্যের দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়াছিল। প্রকৃতিতে সে মাতৃত্বের অপরূপ ছবি দেখিত। প্রকাণ্ড শালবন শব্দ-বর্ণ-গন্ধে তাহার চিত্ত হরণ করিয়াছিল। চারিদিক হইতে সময়ে সময়ে যখন দীপ্তি, প্রাচুর্য্য ও কমনীয়তা মিলিত হইয়া তন্দ্রার মত ঘনাইয়া আসিত, সুদূর দিগন্ত অবধি কি এক যাদুমন্ত্রের মোহিনীশক্তি ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত, তখন সেই আবেশের মধ্যে মধুয়া আপনার জন্য এমন একটা আশ্রয় পাইত, যাহা মায়ের কোমল কোলের অপেক্ষা কোনো অংশে কম নয়। পুকুরটির পাড়ে বসিয়া যখন সে আকাশের পানে চাহিয়া থাকিত, সূর্য্যের আলো জলেস্থলে বৃক্ষশিখরে ঠিকরাইয়া পড়িত, তখন তাহার মুগ্ধ অচঞ্চল নয়নের ভঙ্গী দেখিয়া বোধ হইত, যেন তাহাতে কাহারো স্নেহদৃষ্টি পড়িয়াছে; মুক্ত বাতাস যখন তাহার গায়ের উপর বহিয়া আসিত, তখন স্পষ্ট বুঝিতাম যেন কাহারো কোমল হাতের স্পর্শে তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিতেছে। সন্ধ্যার ছায়ায় মাঝে মাঝে এদিকে সেদিকে চাহিয়া, কাছছাড়া শিশুটির মত সে যে কাহার অনুসন্ধান করিত, ঊষার অস্পষ্ট আলোকে সে কাহার অঞ্চল ধরিবার জন্য ছুটিয়া যাইত, তাহা আজও বুঝিতে পারি নাই।

আমি 'শালবনী'তে আরো দুই তিনবার গিয়াছিলাম। এবারেও মধুয়াকে দেখিলাম। তখন বেলা হইয়াছে, সূর্য্যের রশ্মি ক্রমশঃ প্রখর হইয়া উঠিতেছে। দেখিলাম—সেই মধুয়া, সেই মেষশাবক, সেই চুপটি করিয়া বসিয়া থাকা—কিছুরই পরিবর্ত্তন হয় নাই।

এক দিন বড় পুকুরে স্নান করিতে চলিয়াছি, হঠাৎ দেখিতে পাইলাম—একটি ছোট মেয়ে মধুয়ার ভেড়াটিকে কোলে করিয়া বসিয়া আছে।



পুকুরের উপরেই একাণ্ড একটা বটগাছের ছায়া অনেকটা পথ জুড়িয়া আছে। এইখানে মেয়েটি নানা ফুল দিয়া ভেড়াটিকে মনের মত করিয়া সাজাইয়াছে ও কোমল হাত পাগুলি ঈষৎ নাড়াইয়া ছোট ছেলের মত তাহাকে ঘুম পাড়াইতেছে। ভেড়াটি এই অযাচিত আদরে উৎফুল্ল হইয়া কখনো কখনো মেয়েটির মুখের কাছে মুখ আনিয়া একটা অস্পষ্ট শব্দ করিতেছে; কাছেই মধুয়া; পাখীগুলির কলতান মাঝে মাঝে স্থানটিকে সজীব করিয়া তুলিতেছে।

মেয়েটির সঙ্গে দুই একটি কথা কহিবার সাধ ছিল, কিন্তু যখন তাহার কাছে গিয়া দেখিলাম—সেও একটি মধুয়া—তখন ধীরে ধীরে আপনার বাসার দিকে অগ্রসর হওয়াই স্থির করিলাম।

মধুয়া মেয়েটিকে ভাল করিয়া চিনিত না। ভেড়াটি যখন বালিকার কোলে শুইয়া থাকিত, তখন সে তাহাদের পানে চাহিয়া দেখিত। মনে দুঃখের লেশও আসিত না। তাহার আদরের জিনিষ অন্যের আদর পাইতেছে দেখিয়া মধুয়া আনন্দ উপভোগ করিত।

এইরূপে মধুয়ার দিন কাটিতে লাগিল। তারপর আমি নগরে চলিয়া যাই—আসিয়া শুনিলাম মধুয়ার ভেড়াটি মরিয়া গিয়াছে।

মনটা কেমন হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা কৌতূহল অন্তরে জাগিয়া উঠিল। আমি মধুয়াকে দেখিতে চলিলাম।

তখন মধ্যাহ্ন। রৌদ্রতপ্ত পুষ্করিণীর শৈবাল-আচ্ছন্ন তট হইতে বাষ্প নির্গত হইতেছিল। উদ্দাম বায়ুর শব্দ, বিহঙ্গের কাকলী ও সূর্য্যকরচ্ছটার মধ্য দিয়া মধ্যাহ্নের অস্পষ্ট সুর বিশ্বযন্ত্রে ধ্বনিত হইতেছিল। দেখিলাম—মধুয়া আর সেই বালিকাটি একসঙ্গে মুখোমুখি হইয়া বসিয়া আছে—কথা নাই, নড়ন চড়ন নাই, দুজনে দুখানি প্রতিমার মত নিশ্চল।

বুঝিতে বাকি রহিল না—তাহাদের ভাব দেখিয়া বেশ বুঝিলাম—ছোট ভেড়াটি এতকাল দুজনের মধ্যবর্ত্তী ছিল বলিয়া পরস্পরের প্রেম ভাল করিয়া প্রকাশ পায় নাই; ভেড়ার শোক যখন দুজনকে সমভাবে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল তখন হইতে ব্যবধানবিহীন দুটি জীবন পরস্পর মিশিতে চাহিয়াছিল; আজ সে চাওয়ার ফল ফলিয়াছে।

তারপর কত দিন তাহাদের দেখিয়াছি, কিন্তু একটিও কথা কহিতে শুনি নাই। প্রকৃতির সীমাহীন লীলাক্ষেত্রে সীমাহীনতায় নিজেদের উৎসর্গ করিয়াই বুঝি দুজনে ঔদাস্যকে প্রশ্রয় দিয়াছিল।

পুকুরের জল কালো করিয়া যখন বাতাস বালিকার কপোলের কেশ-গুলিতে ঈষৎ চাঞ্চল্য আনিয়া দিত, তখন মধুয়া তাহার পানে চাহিয়া চাহিয়া তন্দ্রাবিষ্ট হইত। তন্দ্রার ঘোরে সমস্ত জগতের ভিতর সেই বালিকাটির কমনীয় মূর্ত্তিখানি চোখের উপর সর্ব্বদাই ভাসিয়া বেড়াইত। এক একটা গাছ ভরিয়া ফুল ফুটিত; বাতাসে সেই গাছটি দুলিয়া উঠিলেই মধুয়া ভাবিত—বুঝি কার উদ্বিগ্ন-চঞ্চল দেহখানি হেলিয়া পড়িতেছে। মধুয়ার নিমেষহীন চোখের কাছে মেয়েটির রূপ সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ফুটিয়া উঠিত। শালগাছের মাথায়, বল্মীকস্তূপের উপর, আকাশের উচ্ছল নীলিমায় তাহার গলিত-লাবণ্যের তরঙ্গ রহিয়া রহিয়া বহিয়া যাইত। মেয়েটিও মুগ্ধহরিণীর মত মাঝে মাঝে মধুয়ার মুখপানে চাহিয়া কি একটা গানের মোহিনী শক্তিতে ঢুলিয়া পড়িত। এইরূপে দুটি মনুষ্যজীবন ক্রমে ক্রমে মূক প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িল।

এমন সময় কোথা হইতে পহরু আসিয়া তাহাদের মধ্যবর্ত্তী হইল।

একটি পুষ্পগন্ধমোদিত নীরব অপরাহ্ণে সে বালিকাকে দেখিল। পৃথিবীর উজ্জলশ্রী যখন একটু একটু করিয়া মলিন হইতেছিল, সমস্ত বিশ্বের উপর সেই সময়কার বাতাস যখন আলস্যের জড়তা ঢালিয়া দিতেছিল, তখন পহরু বালিকার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, ফুলের মালাখানি তাহার গলায় পরাইয়া দিল। মধুয়া কোনো কথা কহিল না। এত দিন দুজনে এক সঙ্গে থাকিত, আজ আর একজন আসিয়াছে দেখিয়া মধুয়া আনন্দিত হইল, হিংসার কনাটুকুও তাহাকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিল না।

পরদিন পহরু আবার সেখানে আসিল। যখন সে নানা গাছের পাতা ফুল ছিঁড়িয়া খেলা করিতেছিল, তখন বালিকা আসিয়া তাহার সহিত যোগদান করিল; মধুয়া কোনো কথা কহিল না।

পহরু বালিকাকে সঙ্গে করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল; যখন দুইদিন কাহারো দেখা পাওয়া গেল না, তখন মধুয়া বালিকার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল।



বালিকা যখন ফিরিয়া আসিল, তখন মধুয়া মনে মনে ভাবিল আর কখন সে তাহাকে চোখের আড়ালে রাখিবে না।

কিন্তু পহরুর তাহা ভাল লাগিল না; এক দিন সে মধুয়ার অসাক্ষাতে বালিকাকে লইয়া একটু দূরে একটা গাছের তলায় আসিয়া বসিল। এক দিন কাটিল, বালিকা মধুয়ার কাছে যাইতে চাহিল, কিন্তু সে তাহাকে যাইতে দিল না।

দুই দিন পরে মধুয়া বালিকার সন্ধান পাইয়া তাহার কাছে আসিল, জিজ্ঞাসা করিল "তুমি আমার কাছে থাক না কেন?" বালিকা উত্তর করিল পহরু যাইতে দেয় না।"

মধুয়ার মনে দুঃখ হইল। স্বভাবশিশু দুঃখের প্রকৃতিটা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না; তাহার মনের উপর দিয়া কি যে একটা কাল ছায়ার মত চলিয়া গেল, তাহা সে কোনো মতেই নির্ণয় করিতে পারিল না, নির্ণয় করিবার ক্ষমতাও তাহার নাই।

মধুয়া বালিকাকে কাছে রাখিতে চায়, পহরু তাহাকে আসিতে দেয় না কেন? এ কথা মধুয়া যত ভাবিল, তত একটা যন্ত্রণা ক্রমশঃ তাহার অন্তর ছাইয়া ফেলিল।

পর দিন পহরু আসিয়া যখন বালিকার হাত ধরিয়া চলিতে লাগিল,তখন মধুয়ার ইচ্ছা হইল,সে গিয়া বাধা দেয়,কিন্তু বহুকালের অভ্যস্ত ধীরতা তাহাকে বাধা দিল। সে বালিকাকে ডাকিল। পহরু দেখিল পশ্চাতে মধুয়া আসিতেছে। কোনো কথা না কহিয়া বালিকাকে ছাড়িয়া দিয়া সে চলিয়া গেল।

মধুয়া বালিকাকে লইয়া ফিরিল। তখন একটা দারুণ পরিবর্ত্তনের সূচনা করিয়া সন্ধ্যার ম্লান ছায়া পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িতেছিল। সেই শান্ত প্রকৃতির ঘুমঘোরের মত প্রসারিত মলিনতা চারিদিক হইতে তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল; মর্ত্ত-আকাশ অভিভূত হইল, গাছপালার ছায়াটী পর্য্যন্ত তাহার চোখের সম্মুখ হইতে উধাও হইয়া গেল। উন্মুক্ত প্রান্তরের মাঝখানে মধুয়া অন্ধের মত স্খলিতপদে চলিতে চলিতে শুনিতে পাইল—বাতাসের ভিতর দিয়া, প্রতিশিরা রক্ত নাচাইয়া কে যেন নীরবগম্ভীর সুরে বলিতেছে —পহরুকে তাড়াইয়া দাও।

পহরুকে তাড়াইতেই হইবে! কিন্তু কেন, তাহা ভাল করিয়া মধুয়া বুঝিল না। কে যেন তাহার সকল আনন্দ ভাঙ্গিয়া দিয়াছে!

মধুয়ার যত অশান্তি বাড়িয়া উঠিল, আপনার উপর ক্ষমতা ততই একটু একটু করিয়া কমিতে লাগিল। আর যেন সে আপনার মতে চলিতে পারে না। জীবনটা আগে যেমন অতি সহজে কাটিয়া যাইত, তেমনটি আর হয় না। একটা শক্তি তাহার উপর ক্রমশঃ প্রবল হইতে লাগিল—হতভাগা তাহা বুঝিয়াছিল কিনা বলিতে পারি না। মধুয়ার মনের ভিতর দারুণ বেদনা ঘনীভূত হইয়া আসিল। উন্মত্তের মত সে এদিকে সেদিকে ফিরিল, কিন্তু কোথাও শান্তি খুঁজিয়া পাইল না। চারিদিকে জ্বালা—এ জ্বালা কেমনে নিভিতে পারে, তাহা সে একবারও ভাবিল না; জ্বালাতেই আপনাকে সমর্পণ করিয়া বসিল। এই উন্মত্ততা সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে নিবিড় হইয়া আসিত। তাহার মনে হইত ঝাপ্‌সা আলোর পরদা তুলিয়া ইহা তাহাকে কোনো সুদূর দেশে টানিয়া লইবে, যেখানে অনন্ত অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া তাহার সমস্ত যন্ত্রণা ঘুমাইতে পারে। কিন্তু সকাল বেলা যখন দশদিক আলোয় ভরিয়া উঠিত—তখন সে দেখিত,—সম্মুখে অনন্ত প্রসারিত জ্বালার মরুভূমি ধু ধু করিতেছে।

উপায় কি—উপায় কি, মধুয়া কোনো উপায় ঠিক করিতে পারিল না। হঠাৎ একদিন উন্মত্তের মত সে পহরুকে আক্রমণ করিল। পহরু আর সেখানে তিষ্ঠিতে পারিল না।

আবার পূর্ব্বজীবন ফিরিয়া আসিল—আবার দুজনে পাশাপাশি হইয়া অবাধে বৃক্ষতলে বসিল—কিন্তু পূর্ব্বের শান্তি আর ফিরিয়া আসিল না। প্রকৃতির কোলের উপর তাহারা যে আশ্রয়খানি খুঁজিয়া লইয়াছিল, তাহা হিংসার বহ্নিকনায় পুড়িয়া ছাই হইয়াছে; মধুয়ার আনন্দের অন্তঃসারটুকু চিরকালের জন্য শুকাইয়া গিয়াছে।

একটি বিল্লীমন্দ্রমুখরিত প্রদোষে যখন ফুলগুলি একটা তীব্র মাদকতায় ঢলিয়া পড়িতেছিল, তখন বালিকা মধুয়ার কাছে চিরবিদায় মাগিয়া লইল। দুই হাতের উপর গণ্ডদেশ স্থাপিত করিয়া মধুয়া শোকবেগ প্রশমিত করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না।



বালিকার সঙ্গে সঙ্গে মধুয়ার জীবনের এক অংশ কাটিয়া গেল।

দিনকতক কাটিল—বড় দুঃখে—গভীর মর্ম্মবেদনায়। আর একবার মধুয়া পূর্ব্বের মত শূন্যদৃষ্টি হইয়া একা শালবনের ভিতর বসিল। কিন্তু কিছুতেই মন সংযত করিতে পারিল না। জগতের সমস্ত লাবণ্য হইতে কে যেন তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। চারিদিকে একটা প্রচণ্ড বিদ্রোহের ছায়া ঘনীভূত; বাতাস যেন আর তেমন ঠাণ্ডা নয়; কুসুমের গন্ধে যেন পূর্ব্বের মিষ্টতা নাই। যে দীপশিখা তাহার এই নির্জ্জন আবাস এতকাল আলোকিত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা যেন সহসা চিরান্ধকারে মিলাইয়া গিয়াছে।

রজনীর কালিমা পৃথিবীর আলোর উপর যখন একটু একটু করিয়া ঘনাইয়া আসিত, যখন দিগ্‌দিগন্ত হইতে বাতাস ফুল্ল কুটজ কুসুমের মৃদু সৌরভ বহন করিয়া শালবনের ভিতর হু হু করিয়া প্রবেশ করিত, তখন মধুয়ার চোখের উপর সমস্ত জগতখানি জমাট বাঁধিয়া একটা অন্ধপিঞ্জরের মত গমগম্ করিয়া উঠিত; তখন সে স্থির থাকিতে পারিত না; সহসা উন্মত্তের মত গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিত। হতভাগ্য সাঁওতাল বালক প্রাণপণে যত তাহা চাপিতে চেষ্টা করিত, ততই তাহার তীব্রতা বাড়িয়া উঠিত।

এবারে শালবনীতে আসিয়া শুনিলাম মধুয়াকে দারুণ ক্ষয়রোগে ধরিয়াছে। মনে দুঃখ হইল; তাহাকে দেখিতে চলিলাম, ইচ্ছা ছিল তাহাকে একটা ঘরে আনিয়া রাখিব; কিন্তু যখন তাহাকে আমার অভিপ্রায় জানাইলাম সে কাঁদিয়া উঠিল; আমি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম।

একদিন হেমন্ত-নিশা কুয়াসায় ভরিয়া উঠিয়াছে। মধুয়া একখানি কাপড়ে গা ঢাকিয়া তাহার জীর্ণ কুটীরে পড়িয়া আছে। আর সে পূর্ব্বের মত প্রকৃতিতে তন্ময় হইয়া থাকিতে পারে না। সেই দৃপ্ত তন্ময়তার পরিবর্ত্তে ভয় তাহার অন্তর পূর্ণ করিয়া দিয়াছে, এখন সে নিজের শব্দে নিজে চমকিত হয়। যখনি সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে তখন মাঝে মাঝে একটা তীব্র হিংসার ছবি ঝল্‌মল্ করিয়া পাহাড় হইতে পাহাড়ে, শালবন হইতে শালবনে বাতাসে, ফুলফলে ঠিকরিয়া পড়ে। মধুয়া এখন শীর্ণ; পূর্ব্বের কান্তি, পূর্ব্বের উদাস আনন্দ একেবারে মিলাইয়া গিয়াছে।

ক্রমে কুয়াসা কাটিল। চাঁদের বিমলশুভ্র কিরণ তারার ক্ষীণ কান্তি অভিভূত করিয়া শালগাছের তলায় আলোছায়ায় বিচিত্র খেলার সূত্রপাত করিল। আকাশের সীমা হইতে একটা সুদূর আনন্দের প্রবুদ্ধ তরঙ্গ ঝলকে ঝলকে বিশ্ব ভরিয়া দিল। মধুয়ার সহিত কাহারো কোনো সম্পর্ক নাই। সে যেদিকে চাহিল সেদিকেই একটা দারুণ উদ্বেগের কঠোর অভিসম্পাত ছাড়া আর কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিল না। এত আলো, তবুও যেন চারিদিক আঁধার। দুই একটা নিশাচর পাখী এখনো উড়িতেছে, তরুশিরে এখনো পাখার ঝাপট শুনা যাইতেছে। মধুয়ার কাছে আজ সকলি গরল। বিশ্বের আনন্দ ভাণ্ডারের তোরণদ্বার হইতে কে যেন অভাগাকে চিরকালের জন্য তাড়াইয়া দিয়াছে।

রাত্রি গভীর হইল। মধুয়া ধীরে ধীরে উঠিল। চাঁদের দীপ্ত আলোতে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া সে অগ্রসর হইতে লাগিল, অর্দ্ধদগ্ধ পক্ষিশাবকের মত টলিতে টলিতে পুকুরের ঘাটে আসিয়া বসিল।

মধুয়া দেখিল আকাশের লাবণ্যপুঞ্জ পুকুরের জলে কাঁপিতে কাঁপিতে যেন একটা অস্পষ্টতার মধ্যে বিলীন হইয়া যাইতেছে, চোখের উপর যেন একটা শুভ্র উচ্ছল হাস্য ক্রমশঃ মিলাইয়া আসিতেছে। মধুয়া ঘাটের উপর শুইয়া পড়িল।

পরদিন ঘাটে আসিয়া দেখি,—শিশিরসিক্ত মধুয়া দুই হাতে মাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছে।

শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

---



# অর্থনীতি।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

## পরিশ্রম।

এইক্ষণে পরিশ্রমের কথা ধরুন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে প্রকৃতি দেবী আমাদের অনেক উপাদান সদা সর্ব্বদাই সরবরাহ করিতেছেন এবং পরিশ্রম ও ধনধন আমাদের এই স্বাভাবিক উপাদানগুলি ব্যবহারোপযোগী করিয়া দেয়। প্রায় সকল দ্রব্যই কার্য্যোপযোগী করিয়া লইবার পূর্ব্বে আমাদের অনেক প্রকার প্রক্রিয়ার আশ্রয় লইতে হয়। এই সকল প্রক্রিয়ায় পরিশ্রম আবশ্যক। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের নিত্যব্যবহার্য্য বস্ত্রের কথা ধরুন। বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বঙ্গে কয়েকটী মিল স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে কার্য্যের অনেক সুবিধা এবং পরিশ্রমও লাঘব হইতেছে। কিন্তু, তত্রাপি একখানি বস্ত্র বয়ন করিতে হইলে কতগুলি প্রক্রিয়ার আবশ্যক! তুলা হইতে সূত্র প্রস্তুত হইতেছে। এই সূত্র হইতে বস্ত্র প্রস্তুত হইলে পাইকারগণ খুচরা দোকানদারগণকে দিতেছে, পল্লিগ্রামে ঐ বস্ত্র পরিধান করিয়া আমরা সকলে লজ্জা নিবারণ করিতেছি। ইহার প্রত্যেকটী প্রক্রিয়ায় অনেক পরিশ্রম করিতে হইতেছে। বীজ বপন হইতে বস্ত্র পরিধান অর্থাৎ আমেরিকা হইতে বীজ আনয়ন, বীজ বপন ও রক্ষণ, সূত্রে প্রস্তুত করণ, বস্ত্র বয়ন এইগুলি ব্যতীত আরও অনেক প্রক্রিয়ার আবশ্যক হয়। বীজ আমেরিকা হইতে জাহাজে করিয়া আনিতে হয়। এই জাহাজ নির্ম্মাণে কত শত শত লোককে পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। তৎপরে জাহাজ পরিচালনে নাবিক আবশ্যক, তৎপর ডকে বীজ বোঝাই, খালাস, রেল, কুলি ইত্যাদি কত শত সহস্র লোকের পরিশ্রমের উপর এই সামান্য নিত্য-ব্যবহার্য্য বস্ত্র নির্ভর করে। ছোট বেলায় আমরা পড়িতাম যে একটি ভদ্রলোক তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে "দশ সহস্র লোকের প্রস্তুত পিষ্টক" ভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। পরে সেই পিষ্টক আনীত হইল তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণ বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তখন তিনি তাহাদের শ্লেট পেন্সিল লইয়া ধান্য বপন

হইতে পিষ্টক প্রস্তুতের জন্য লোকের হিসাব করিতে বসিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে অর্থ উৎপাদনে পরিশ্রম একটী প্রধান অঙ্গ বা শক্তি।

পরিশ্রম ব্যতীত কোন অর্থই উৎপাদিত হয় না; কিন্তু সকল পরিশ্রমই অর্থোৎপাদনে আনুকূল্য করে না। এই জন্য পরিশ্রমকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়,—ফলোৎপাদক পরিশ্রম ও অফলোৎপাদক পরিশ্রম।—অর্থাৎ যে পরিশ্রমে অর্থ উৎপাদিত হয়, যে পরিশ্রমে হয় না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রকৃতিদেবী উপাদান সরবরাহ করেন। আমরা নিজেরা ঐ প্রকার মৌলিক উপাদান প্রস্তুত করিতে পারি না। আমরা কেবলমাত্র প্রকৃতিদত্ত উপাদান লইয়া একত্র করিয়া বা বিশ্লেষণ করিয়া নিজেদের মনোমত দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারি। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, প্রকৃতিদেবী যেমন নিজ অনায়াসলব্ধ উপাদান দ্বারা নিজে কিছুই করিতে পারেন না, আমরাও সেইরূপ উপাদান-বিহীন হইয়া শুধু পরিশ্রম দ্বারা কিছুই করিতে পারি না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যে পরিশ্রম উপাদান সমূহে ফল অর্পণ করে (অর্থাৎ যাহাতে অর্থোৎপাদন হয়) তাহাই ধনোৎপাদক বা ফলোৎপাদক পরিশ্রম। কৃষক শিল্পী কারিকর প্রভৃতির কর্ম্ম এই হিসাবে ফলোৎপাদক। যাহারা পণ্যদ্রব্য একস্থল হইতে অন্য স্থলে বহন করিয়া লইয়া যায়, তাহারাও এইরূপ পরিশ্রমই করে। শান্তিরক্ষক কর্ম্মচারিগণের পরিশ্রমও ফলোৎপাদক, কেন না দ্রব্যাদি উপযুক্ত ভাবে রক্ষা না করিলে তাহা হইতে ফল উৎপন্ন হয় না।

অনেক সময় কিন্তু এরূপ হয় যে, ফলোৎপাদক পরিশ্রম দ্বারা ফল (অর্থ) উৎপন্ন হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে অনেক সময় কোন রেলের রাস্তা প্রস্তুত আরম্ভ করিয়া কিছুদিন পরে পরিত্যক্ত হয়। এ ক্ষেত্রে অনেক পরিশ্রম বৃথা হইয়া যায়, এবং রেল নির্ম্মাণে যে পরিশ্রম ব্যয় হইয়াছিল তাহাতে কোনরূপ অর্থ উৎপাদিত হয় না।

অন্য এক প্রকার পরিশ্রম আছে যাহাতে প্রত্যক্ষ কোন অর্থ উৎপাদিত হয় না—এইরূপ বোধ হয়; কিন্তু তাহা পরোক্ষে যথেষ্ট ফল উৎপাদন করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ শিক্ষার বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। শিক্ষার



সঙ্গে সঙ্গে মানসিক বৃত্তি সকল পরিমার্জ্জিত হয় এবং সেইজন্য শিক্ষিত ও অশিক্ষিত কারিকরের কার্য্যের যথেষ্ট প্রভেদ। পূর্ব্বোল্লিখিত শান্তিরক্ষকদিগের কার্য্য এই পরোক্ষ আখ্যার অন্তর্ভূত * এবং একথা পরিষ্কাররূপেই বলা যাইতে পারে যে, যিনি যে কোন প্রকারেই শ্রমজীবিদিগের শারীরিক বা মানসিক উন্নতি করেন, জাতীয় উন্নতিতে তাঁহার স্থান অনেক উচ্চে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এইজন্য অনেক পরিশ্রম যাহা প্রথমতঃ ফলোৎপাদক নয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে জানা যায় উহা প্রকৃত ফলোৎপাদক। শিক্ষকের পরিশ্রম এই শ্রেণীর অন্তর্ভূত।

* "Ten years of National Growth নামক প্রবন্ধে প্রথিতনামা মুলহাল সাহেব যাহা লিখিয়াছেন এবং যাহার সারাংশ ফসেট্ সাহেব তাহার পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে ইহা সুস্পষ্ট হইবে। "A comparison of the years 1875 and 1885 shows that the number of children at school, in the united kingdom, increased from 2,565,400 to 4,329,450. During the same period there was a very satisfactory decrease of crime and pauperism, amounting to 33 and 36 per cent. respectively; there was a diminution in the consumption of alcohol per head from 2·33 gallons to 1·79 gallons, while at the same time there was an increase in the consumption per head of all the principal necessaries of life, such as meat, sugar, tea &c.; the money in the Savings Banks in the same ten years increased from 67 to 94 millions, and the money in mutual benefit societies from 20 to 62 millions" অর্থাৎ শিক্ষার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডে চৌর্য্যবৃত্তি, মাদকতা প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। সেভিংস ব্যাঙ্কে যথেষ্ট টাকা মজুদ হইতেছে এবং শ্রমজীবিগণের সন্তানগণ শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়াতে তাহাদের অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হইতেছে। রেভারেণ্ড হর্সাল তাঁহার "Jottings from Jail" নামক পুস্তকে বলিয়াছেন" "I wish the schoolnet were more diligently and successfully cast. Of 78,416 persons apprehended in London there were 8426 males and 4677 females who could neither read nor write, while 45021 males and 4677 females are described as being able to read only or read and write imperfectly. i. e. out of 78,416 persons apprehended 75789 were altogether uneducated or imperfectly educated." জেলে ৭৮৪১৬ জন কয়েদির মধ্যে ৮৪২৬ জন পুরুষ এবং ৪৬৭৭ জন স্ত্রীলোক একেবারেই লেখা পড়া জানিত না।

পূর্ব্বোক্ত সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমরা ফলোৎপাদক পরিশ্রমকে নিম্নলিখিত প্রকারে ব্যাখ্যা করিতে পারি—যে পরিশ্রম প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে উপাদান সমূহে ফল অর্পণ করিয়া অর্থোৎপাদন করে, তাহাই ফলোৎপাদক পরিশ্রম।" পক্ষান্তরে, যে পরিশ্রমে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে দেশের অর্থবৃদ্ধির সহায়তা হয় না তাহাকে অফলোৎপাদক পরিশ্রম বলে। এইজন্য গায়ক, অভিনেতা, নৃত্যকর প্রভৃতিদের পরিশ্রম আমাদের অর্থবৃদ্ধির সাহায্য করে না। ইহাদের পরিশ্রমের ফল কোন বস্তুবিশেষে নিহিত থাকে না, বা ভবিষ্যতের জন্যও কোন উপকার উৎপাদন করে না। অনেকের মতে রাজনৈতিকদিগের পরিশ্রম অফলোৎপাদক। এ বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। কিন্তু তত্রাপি আমাদের মতে রাজনৈতিকগণের পরিশ্রম পরোক্ষে ফলোৎপাদন করে।

পরিশ্রমের অর্থোৎপাদিকা শক্তি নানা কারণে বৃদ্ধি পায়। প্রথমতঃ ভূমির উর্ব্বরতা এবং মূলধনের আধিক্যের জন্য ঐ শক্তির হ্রাসবৃদ্ধি হয়। তৎপরে প্রৈতি ( Energy ) এবং মানসিক শক্তি এই দুইটী ক্ষমতা থাকিলে শ্রমজীবিগণ কার্য্যে উন্নতিলাভ করিতে পারে। এই দুইটী শক্তির আধিক্য ও অভাবের জন্য ইংরাজ ও আইরিশ শ্রমিকগণের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ দেখা যায়। আমাদের দেশে পশ্চিম দেশীয় মজুরগণ অধিক পরিশ্রমী বটে, কিন্তু তাহাদের বুদ্ধিমত্তা কম। পক্ষান্তরে, বঙ্গদেশীয় শ্রমজীবিগণ কম পরিশ্রমী হইলেও বুদ্ধিমত্তায় অপর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শান্তিপুরের রাজমিস্ত্রীর বেতন মাসিক ২০৲ কুড়ি টাকা; হাজারিবাগে রাজমিস্ত্রীর বেতন ৭৷৷০ সাড়ে সাত টাকা মাত্র। শেষোক্ত স্থলে মিস্ত্রীগণ প্রাতে ৭টা হইতে ১২টা ও বৈকালে ১টা হইতে ৫টা একুনে ৯ ঘণ্টা করিয়া পরিশ্রম করে। শান্তিপুরে রাজেরা ১১টা হইতে ৫টা অর্থাৎ মাত্র ছয় ঘণ্টা পরিশ্রম করে; কিন্তু তত্রাপি ইহাদের বেতন বেশী। কিন্তু হাজারীবাগের মিস্ত্রীরা তিনদিনে যে কার্য্য করে, শান্তিপুরের রাজেরা একদিনেই প্রায় সেই কার্য্য করিয়া থাকে। সুতরাং কার্য্যের অনুপাতানুসারে শান্তিপুরের মিস্ত্রীরাই ভাল অর্থাৎ অধিক অর্থোৎপাদনে সহায়তা করে।

শিক্ষার উপর যথেষ্ট নির্ভর করে। শিক্ষাদ্বারা শুধু যে বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত



হয় তাহা নহে, মানসিক বৃত্তির সহিত নৈতিক বৃত্তিরও উন্নতি হয় এবং সেই সঙ্গে পরিশ্রমোৎপন্ন ফলের হ্রাস ও বৃদ্ধি পায়। অসৎ শ্রমজীবী থাকিলে, তাহাদের উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য অধিক কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হয় এবং সেইজন্য উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যেরও তারতম্য হয়। মনে করুন, বিশজন শ্রমজীবির কার্য্য পরিদর্শনের জন্য একজন পরিদর্শক আবশ্যক। পরিদর্শকের বেতন সাধারণতঃ সাধারণ শ্রমজীবিগণের অপেক্ষা বেশী হয়, কিন্তু যদি কর্ম্মকর্ত্তা তাহাদিগের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন এবং নিজের একার পরিদর্শনই যথেষ্ট বিবেচনা করেন, তাহা হইলে এই পরিদর্শকের বেতন তাঁহাকে দিতে হয় না। কর্ম্মকর্ত্তা অনায়াসে এই পরিদর্শকের বেতনের কিছু অংশ শ্রমিকদিগকেও দিতে পারেন অথবা ইচ্ছা করিলে, তিনি উৎপন্ন দ্রব্যেরও মূল্য হ্রাস করিতে পারেন। প্রথমোক্ত উপায় অবলম্বন করিলে শ্রমিকদিগের লাভ হয় এবং দ্বিতীয় উপায়ে সর্ব্বসাধারণের লাভ হয়।

আমাদের দেশে ঘরে ঘরে শিক্ষা প্রচলিত হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ১৯০২ সনের মহামান্য গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের সভায় আয় ব্যয় হিসাবে যে তর্ক বিতর্ক হয়, তাহাতে মান্যবর গোখলে মহোদয় বলিয়াছিলেন যে, আমাদের অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে আমাদের মধ্যে দশ জন বালকের মধ্যে নয়জন অশিক্ষিত থাকে। ইহা গভীর পরিতাপের বিষয় যে পাঁচটী গ্রামের মধ্যে চারিটী গ্রামে পাঠশালাও নাই; অথচ শিক্ষার জন্য যে ব্যয় হইতেছে তাহার হার কয়েক বৎসর হইতে একই রহিয়া যাইতেছে। তৎপর তিনি ইংলণ্ডের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, যে তথায় পাঠশালা বা স্কুলে সকল বালককেই যাইতে হয় এবং পঞ্চদশ বৎসরে শিক্ষার জন্য ব্যয় সাড়ে-চার কোটী হইতে প্রায় বারো কোটীতে পরিণত হইয়াছে কিন্তু তত্রাপি তথাকার জনসাধারণের নেতাগণ ইহাতেও সন্তুষ্ট হইতেছেন না। বড়লাট সভার অন্যতম সদস্য এবং ভারতবর্ষীয় শিল্প বৈঠকের সম্পাদক মাধোলকার মহাশয়ও ঠিক একই কথা অন্যত্র বলিয়াছেন।* ইংলণ্ড এখনও ধনশালী দেশের মধ্যে

* "England still occupies a pre-eminent position among the progressive nations of the world as a manufacturing and exporting country. But because her supremacy is threatened and other nations who only a

শ্রেষ্ঠ কিন্তু তত্রাপি অন্যান্য জাতির উন্নতি দেখিয়া তথাকার নেতাগণ যাহাতে অন্যান্য দেশাপেক্ষা ইংলণ্ড বরাবরই উন্নতির শীর্ষস্থানে থাকিতে পারে, তজ্জন্য অনবরত চেষ্টা করিতেছেন। ইংলণ্ডের পক্ষে যদি ইহা প্রযুজ্য হইতে পারে, তবে ভারতবর্ষের পক্ষে ইহা কতদূর প্রযুজ্য, তাহা সকলেই বিচার করিতে পারেন। বস্তুতঃ আমাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য হইতেছে শিক্ষাবিস্তার। অন্যান্য দেশের সহিত সংক্ষেপে আমরা আমাদের দেশের তুলনা করিয়া এই বিষয়টী আরও একটু হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিব।

প্রথমতঃ ইংলণ্ডের কথা ধরুন। গত ১৯০০ সনের আদম সুমারিতে দেখা গিয়াছে যে সাড়ে একত্রিশ কোটি লোকের মধ্যে ৪৬৬৬,০০০ বালক প্রাথমিক বিদ্যালয়েই অধ্যয়ন করে—উচ্চবিদ্যালয়ে বা কলেজের ত কথাই নাই। গত বিশ বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি শিল্প-বিদ্যালয় ( Technical ) স্থাপিত হইয়াছে। ম্যাঞ্চেষ্টার নগরীতে একটী টেকনিকাল বিদ্যালয়ের জন্য ৪৫ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে। লীড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত অন্য একটী টেকনিকাল বিদ্যালয়ের জন্যও প্রায় ঐরূপ ব্যয় করা হইয়াছে। লণ্ডনে শিল্প শিক্ষা দিবার জন্য অনেকগুলি বিদ্যালয় আছে, এতদ্ব্যতীত ম্যাঞ্চেষ্টার, বর্ম্মিংহাম, লিভর্‌পুল প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ নগরীতে যথেষ্ট শিল্প বিদ্যালয় আছে। অনেকগুলির ব্যয় গবর্ণমেণ্ট নির্ব্বাহ করেন, কয়েকটীর ব্যয় সদাশয় ভদ্রমহোদয়গণ করিয়া থাকেন।

আমেরিকার যুক্তরাজ্যে, প্রত্যেক রাজ্যে এই সকল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং সে গুলিতে বিনা বেতনে অধ্যয়ন করিতে দেওয়া হয়। এই

generation ago were far behind her, her leaders are urging her to quicken her pace and to strengthen and qualify herself for effecting their object. If such admonition, if this waking up, is found necessary for England how much more imperative is it in the case of India." And again "Secondary education is necessary even for workmen and artisans and that our industrial devolopment cannot be said to be established on a solid foundation unless the mass of operatives on whose labours it would depend are better fitted physically, intellectually and morally for this work." Rao Bahadur R. N. Mudholkar in. "Education and Industrial Development."



সমস্ত ষ্টেট-কলেজ ব্যতীত ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের অন্যান্য বিদ্যালয়ও আছে। সুপ্রসিদ্ধ মাসিকপত্র Modern Reviewতে সন্ত নিহাল সিংহ এই প্রকার অনেকগুলি স্কুলের বৃত্তান্ত দিয়াছেন। যদি আমেরিকার দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমাদিগের ধনকুবেরগণ ঐরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা হইলে দেশের প্রভূত উপকার হইবে। জর্ম্মণীও শিল্পবিদ্যায় বিশেষ অগ্রণী। বার্লিনের King's Technical High Schoolএ পনের শতেরও অধিক ছাত্র অধ্যয়ন করে। ফ্রান্স্ শনৈঃশনৈঃ এ বিষয়ে অগ্রসর হইতেছে। পেরী নগরীর Music des Arts Metirs বিদ্যালয়ে অনেক ছাত্র অধ্যয়ন করে। বস্তুতঃ মিষ্টকোয়ার মহোদয় কলিকাতা শিল্পসমিতির অধিবেশনে সত্যই বলিয়াছিলেন "Education has undergone a complete revolution in the West within the present generation. The great armaments of the western nations, their vast armies and their navies, do not receive greater attention and greater solicitude in the present day than that education in industrial pursuits which befits them for the keener struggle, which is continually going on among nations for industrial and manufacturing supremacy" অর্থাৎ পাশ্চাত্য দেশে সৈন্য বৃদ্ধির দিকে যেরূপ লক্ষ্য থাকে তদপেক্ষা শিল্প শিক্ষা বিস্তারের প্রতি অধিক লক্ষ্য থাকে। "আমরা কি শুধু পড়ে রব পিছে ?"

জাপানে প্রত্যেক বালক বালিকা ছয় বৎসরে পড়িলেই বিদ্যালয়ে যাইতে বাধ্য। নতুবা আইনানুসারে তাহাদের দণ্ডনীয় হইতে হয়। শতকরা নব্বই জন লোকে এইক্ষণ জাপানে লেখাপড়া শিক্ষা করে। সাধারণতঃ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কোন বেতন লওয়া হয় না। প্রাথমিক এবং উচ্চ বিদ্যালয়ে নৈতিক শিক্ষাও দেওয়া হয়। কলেজে বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদিগকে নৈতিক ও মানসিক শিক্ষা দেওয়া হয়। বৈজ্ঞানিক এবং শিল্পশিক্ষার যথেষ্ট প্রচলন আছে।

নিম্নলিখিত তালিকা দৃষ্টে এ বিষয় স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

| দেশের নাম। | নিম্ন শিক্ষা। লোক সংখ্যা। (in millions) | প্রতি দশলক্ষে কত লক্ষ ভর্ত্তি। | লোকসংখ্যার অনুপাতে ভর্ত্তি (লক্ষ) | মোট ব্যয় (পাউণ্ড হিঃ) ১পা=১৫৲ | লোক প্রতি ব্যয় | মন্তব্য। | উচ্চ শিক্ষা। দেশের নাম। | লোক সংখ্যার অনুপাতে ব্যয়। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| অষ্ট্রীয়া | ৪১.৪ | ৬.২ | ১৫ | ৫.৩৫ | সি পে ২ ৬ | | অষ্ট্রীয়া | পেন্স ৬ |
| বেলজিয়াম | ৬.৭ | .৮ | ১৪.৫ | ১.১৫ | ৪ ৬ | | বেলজিয়াম | ঐ |
| দেনমার্ক | ২.২ | .৩ | ১৪ | ... | ... | | দেনমার্ক | ৮ |
| ফ্রান্স | ৩৮.৫ | ৫.৫ | ১৪.৪ | ৮.৯ | ৪ ১১ | | ফ্রান্স | ১ |
| প্রুসিয়া | ৩৪.৫ | ৬.৩ | ২০ | ৯.২ | ৫ ৪ | | জর্ম্মানি | ৭ |
| ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌স | ৩১.৭ | ৫ ৭ | ১৭.৭ | ১২.১ | ৫ | | গ্রেটব্রিটেন আয়র্লণ্ড | ১১ |
| স্কটল্যাণ্ড | ৪.৩ | .৭ | ১৭ | ১.৬ | ৭ ৮ | | গ্রীস | ২ |
| আয়র্লণ্ড | ৪.৫ | .৮ | ১৭.৬ | ১.২ | ৫ ৫ | | ইতালি | ৩ |
| গ্রীস | ২,৫ | .১৬ | ৬.৭ | ... | ... | | নরওয়ে | ৪ |
| ইতালি | ৩.২ | ২.৪ | ৭.৩ | ২.৫ | ১ ৭ | | রুসিয়া | ২ |
| নরওয়ে | ২ | .৩ | ১৬.৪ | ৪.৫ | ৪ ৬ | | স্পেন | ১১ |
| পর্ত্তুগাল | ৫ | .২৪ | ৪.৭ | ... | ... | | সুইডেন | ৪ |
| রুসিয়া | ১২৬.৫ | ৩.৮ | ৩ | ৪ | ৮ | | সুইজারলণ্ড | ১১ |
| স্পেন | ১৮.২ | ১.৪ | ৭.৪ | ... | ... | | যুক্তরাজ্য | ১১ |
| সুইডেন | ৫.১ | .৭৪ | ১৪.৫ | ১.১ | ৪ ২ | | কানাডা | ১৮ |
| সুইজরলণ্ড | ৩ ১ | .৬৫ | ২০.৭ | ১.৩ | ৮ ৫ | | অষ্ট্রেলেসিয়া | ৮ |
| ভারতবর্ষ | ২২১.২ | ৩.১৬ | ১.৪ | .৭৬ | ৮ ৩ | | ভারতবর্ষ | ১৫ |



| দেশের নাম। | নিম্ন শিক্ষা। লোক সংখ্যা। (in millions) | প্রতি দশলক্ষে কত লক্ষ ভর্ত্তি | লোক সংখ্যার অনুপাতে ভর্ত্তি (লক্ষ) | মোট ব্যয় (পাউণ্ড হিঃ) ১পা=১৫৲ | লোক প্রতি ব্যয় | মন্তব্য। | উচ্চ শিক্ষা। দেশের নাম। | লোক সংখ্যার অনুপাতে ব্যয়। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| জাপান | ৪২.৭ | ৩.৩ | ৭.৮ | ২ | ১১ | | | |
| কেপ কলোনি | ১.৫ | .১৫ | ৯.৬৫ | .২৭ | ৩ ৬ | | | |
| নেটাল | .৫৪ | .০২ | ৪.৫০ | .০৬ | ২ ২ | | | |
| মিশর | ৯.৭ | .২১ | ২.১৭ | ... | ... | | | |
| যুক্তরাজ্য | ৭৫.৩ | ১৫.৩ | ২০.৯ | ৪৪.৫ | ৯ ১০ | | | |
| কানাডা | ৫.২ | .৯৫ | ১৮ | ২ | ৭.৯ | | | |
| অষ্ট্রেলেসিয়া | ৪ ৩ | .৭৯ | ১৮ | ২.৫ | ১১ ৭ | | | |

এই প্রসঙ্গে ১৯০৩ সনের আয় ব্যয়ের হিসাবের বক্তৃতায় গোখলে বলিয়াছিলেন "These figures tell a most melancholy tale and show how hopelessly behind every other civilized nation on the face of the earth we are in the matter of public education." এই মন্তব্যের উপরে কোন কথা বলিবার স্পর্দ্ধা আমরা রাখি না—আমরা কেবলমাত্র আমাদের দেশবাসীর দৃষ্টি প্রার্থনা করিয়া এই প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিলাম। ( ক্রমশঃ )

শ্রীযোগীন্দ্র নাথ সমাদ্দার।

# রুগ্ন কবি রজনীকান্ত সেনের প্রতি *

থামো, থামো—দেখে'নিই পিপাসিত দুটি আঁখি ভরে'.
থামো কবি,—এঁকে নিই হৃদি-পটে আরো ভাল করে'
ওই সাধনার মূর্ত্তি—নির্ভরের চিত্র মনোহর ;
কলঙ্কী দর্পণ মোর, মাজি' লব—দাও অবসর।
হে সাধক, হে তাপস, আশীর্ব্বাদ—কর আশীর্ব্বাদ,
একবার এজীবনে লভি তবু সাধনার স্বাদ !
আজিকে তোমায় হেরে' চক্ষে মোর ভরে' আসে জল,
বাণীর পূজার লাগি বিকশিয়া উঠে চিত্তদল
শুভ্র শতদল সম—ভুর ভুর গন্ধে ভরপূর ;
হৃদয় মাতিয়া উঠে ভক্তিরসে বেদনা-বিধুর।
'বাণী' যার সহচরী, 'কল্যাণী' সে কল্পদূতি যার,
উন্মুক্ত যাহার প্রাণে অমরার 'অমৃত' ভাণ্ডার
তৃষার্ত্ত ভক্তের লাগি'—আজি পড়ি' এ রোগ-শয্যায়,
দুঃসহ যন্ত্রণা মাঝে মগ্ন তবু মায়ের সেবায়
নিষ্ঠার অম্লান পুষ্পে ! হেরি' এই শান্ত সুবিমল
ধ্যান-মূর্ত্তি—মনে হয়, নীলকণ্ঠ পিইছে গরল
সমুদ্র-মন্থন দিনে—বাঁটি লয় অমৃতের কণা
কাব্যের অমর লোকে—এ চিত্রের কোথায় তুলনা !

—কে বলিবে মন্দভাগ্য ? অসহ্য এ বেদনার সুখ
সেই জানে, একনিষ্ঠ সাধনায় যেজন উন্মুখ
ঊর্দ্ধ হ'তে ঊর্দ্ধলোকে—কি বুঝিব মোরা সাধ্যহীন,
মোরা শুধু কাঁদি হাসি, ভালবাসি—কেটে যায় দিন !

* সুকবি শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সেন মহাশয় দারুণ cancer রোগে আক্রান্ত হইয়া করিকাতা মেডিকেল কলেজ Cottage Ward এ অবস্থিতি করিতেছেন। এই রোগশয্যার নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যেও তাঁহার একমাত্র অবলম্বন—সরস্বতীর সেবা। এই অবস্থায় তিনি পর-পর তিনখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার একনিষ্ঠ মাতৃসেবা ও সাধনা নিরবচ্ছিন্ন বিস্ময় ও শ্রদ্ধা উৎপাদন না করিয়া থাকিতে পারে না।



মধুর কোমল কান্ত ! হাসি, অশ্রু, করুণার কবি,
ফুটাও মলিন চিত্তে আজি তব সাধনার ছবি।
এ সাধনা আরাধনা ধন্য হোক্—আজি ধন্য হোক্,
ফুটুক্ এ শীর্ণ কুঞ্জে নন্দনের অম্লান অশোক !

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

---

# ৺প্রমদাচরণ সেন।

খুলনা জেলার অন্তর্গত সেনহাটি গ্রাম বঙ্গদেশের অনেক রত্নের জন্মস্থান। সেই সেনহাটি নিবাসী তারিণীচরণ সেন মহাশয় ১২৬৬ বঙ্গাব্দের ৫ই জ্যৈষ্ঠ এক পুত্ররত্ন লাভ করেন, তাঁহার নাম প্রমদা চরণ সেন। কলিকাতায় ইটালী নামক স্থানে প্রমদাচরণের জন্ম হয়। তারিণীচরণ সেন তখন পুলিশ বিভাগে কাজ করিতেন।

সময়ে সময়ে দেখা যায় যে, পৃথিবীর কোন কোন লোক একটু বিশেষত্ব লইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। প্রমদাচরণের শৈশব হইতেই কিছু বিশেষত্ব দেখা গিয়াছিল। প্রতিজ্ঞার বল, শ্রমশীলতা ও ধৈর্য্যগুণে তিনি বিভূষিত ছিলেন। কি শৈশবে, কি যৌবনে তাঁহাকে কেহ কর্ম্মক্লান্ত বা কর্ম্মবিমুখ দেখে নাই।

প্রমদাচরণ শৈশবে অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত ছিলেন। তাঁহার জ্বালায় গ্রামের সকলে অস্থির হইত। প্রমদাচরণের সাহায্য ব্যতীত কোন কুকার্য্যই সম্পন্ন হইত না। যখন তিনি সাত বৎসরের তখন তাঁহার জননীর মৃত্যু হয়। প্রমদাচরণ তাহাতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইলেন না।

সেনহাটিতে বাংলা লেখাপড়া সাঙ্গ করিয়া তিনি কলিকাতায় পড়িতে আসেন। তখন কলিকাতার ছাত্র-সমাজ নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল ও দুর্নীতি পরায়ণ ছিল। কলিকাতায় আসিয়া তিনি মন্দ সঙ্গী পাইলেন। অধঃপাতে যাইবার সকল আয়োজন সম্পূর্ণ হয়, এমন সময়ে তাঁহার অগ্রজ অম্বিকাচরণ সেন একদিন তাঁহাকে খুব স্নেহপূর্ণ তিরস্কার করিলেন। এই স্নেহের শাসন তাঁহাকে সৎপথে ফিরাইল। প্রমদাচরণ ভাল হইলেন।

যখন প্রমদাচরণ হেয়ার স্কুলের ছাত্র—সেই সময়ে সুবিখ্যাত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। প্রমদাচরণ নিজ গুণে শাস্ত্রীমহাশয়ের স্নেহ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই সময়ে মান্দ্রাজ প্রদেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, শাস্ত্রী মহাশয় ছাত্রদের আহ্বান করিয়া চাঁদা তুলিতে বলিলেন। কর্ম্মী প্রমদাচরণ সেই আদেশ মাথায় বহন করিয়া সপ্তাহান্তে কিঞ্চিদূর্দ্ধ চারিশত টাকা সংগ্রহ করিয়া শিক্ষক সদনে উপস্থিত হইলেন। এই একটি ঘটনা হইতেই প্রমদাচরণের ভাবী জীবনের মহত্ত্বের বেশ স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

১৮৭৬ সালে প্রমদাচরণ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হন। তদনন্তর তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে এফ্ এ, পড়িতে আরম্ভ করেন। হেয়ার স্কুলে পাঠ কালেই তিনি ইংলণ্ডে যাইবার কল্পনা করিতেন। এজন্য তিনি গিলক্রাইষ্ট পরীক্ষা দিতে সঙ্কল্প করিলেন। উদ্দেশ্য ছিল বৃত্তি পাইয়া ইংলণ্ডে যাইবেন। দুঃখের বিষয় ১৮৭৮ সালে এফ্ এ, পরীক্ষার সময়ে একদিন তাঁহার কাগজ দিতে সামান্য বিলম্ব হইয়াছিল বলিয়া পরীক্ষাগারের তত্ত্বাবধায়ক তাঁহার কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলেন। এই ঘটনায় প্রমদাচরণ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছিলেন। ইহার পর স্বাবলম্বন-প্রিয় প্রমদাচরণ গিলক্রাইষ্ট পরীক্ষায় উপস্থিত হন। তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তৃতীয় স্থান অধিকার করিলেন। দুঃখের বিষয় দুইটীর বেশী বৃত্তি দিবার নিয়ম ছিল না, কাজেই প্রমদাচরণের আশা পূর্ণ হইল না, কিন্তু তিনি ইংলণ্ডে যাইবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন না।

প্রমদাচরণ ছাত্রাবস্থায় ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা এ জন্য ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহাকে অর্থ প্রেরণ বন্ধ করেন। অর্থাভাব সত্ত্বেও তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্য পরমুখাপেক্ষী হন নাই। তাঁহার তীক্ষ্ণ আত্মসম্মান বোধ ছিল। এত সংগ্রামের মধ্যেও যে তিনি গিল্ ক্রাইষ্ট পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়।

প্রমদাচরণ যখন কলেজে অধ্যয়ন করেন তখন তাঁহার নাটক অভিনয় করিবার বাসনা বড় প্রবল ছিল। একবার অবকাশ উপলক্ষে তিনি সেনহাটিতে গিয়া খুব আমোদ প্রমোদ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। যহসা



কোনো এক প্রতিবেশী-কন্যার রূপে তিনি মুগ্ধ হইয়া গেলেন। এই বালিকাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত তিনি উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রথম যৌবনের চপলতায় তিনি সেই রূপসী বালিকার উদ্দেশে কত কবিতাই রচনা করিয়াছিলেন। যাহা হউক নানাবিধ প্রতিবন্ধকবশতঃ এই বিবাহ ঘটিতে পারে নাই।

গিল্‌ক্রাইষ্ট পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত প্রমদাচরণ ল্যাটিন্ ও ফরাসী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। যখন তিনি বৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন না, তখন চব্বিস পরগণার অন্তর্গত নকীপুর এণ্ট্রেন্স স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিলেন। ইহার পর ১৮৮২ সালে তিনি কলিকাতা সিটি কলিজিয়েট্ স্কুলে শিক্ষক নিযুক্ত হন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি কলেজের অধ্যক্ষ স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের স্নেহ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

যাহার জন্য প্রমদাচরণ বাঙ্গালীর নিকট চিরস্মরণীয় থাকিবেন ও যাহার জন্য তাঁহার জীবন আমাদের নিকট অমূল্য বস্তু, আমরা এতক্ষণ সে কথা বলি নাই। আমাদের দেশে শিশুসাহিত্য বলিয়া একটা জিনিস ছিলনা। প্রমদাচরণ সেই শিশুসাহিত্যের জন্মদাতা। তাঁহার আগে যোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবার হইতে এবং আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক এ বিষয়ে কিছু কিছু চেষ্টা হইয়াছিল একথা সত্য, কিন্তু শিশু-সাহিত্যের আদর্শ ও মর্য্যাদা সম্যক্ রূপে উপলব্ধি করিয়া সেই বিষয়ে সাধনার পথে অগ্রসর হইতে আমরা সর্ব্বপ্রথমে প্রমদাচরণকে দেখিতে পাই। আজ যে আমরা শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ও যোগীন্দ্রনাথ সরকারের ন্যায় শিশু-সেবক দেখিতে পাইতেছি এ শুধু প্রমদাচরণের তপস্যার ফল। যে "সখা'র স্মৃতি এখনো বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে জাগরূক রহিয়াছে, প্রমদাচরণ সেই "সখা'র জন্মদাতা। ১৮৮৩ সালের জানুয়ারী মাসে "সখা" প্রকাশিত হইয়াছিল। উহা পাঠ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, "সখা" প্রধানতঃ বালক বালিকাদিগের সহায় বটে, কিন্তু এ 'সখার' সাহায্য অনেক পলিত বেশ বৃদ্ধের পক্ষেও অনবলম্বনীয় নহে। বালক বালিকার এমন সদ্বন্ধু দুর্লভ।"

প্রমদাচরণের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে বাগ্মীবর শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ও

বিদ্যাসাগর-চরিতাখ্যায়ক শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের উভয় হইতেই প্রমদাচরণ বয়ঃ কনিষ্ঠ ছিলেন।

ধর্ম্মজীবন গঠন, ব্রাহ্মসমাজের কাজ, "সখা" সম্পাদন, বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা, দেশের কল্যাণকর কার্য্যে সহায়তা করা এসকল কাজ করিতে করিতে প্রমদাচরণ ইংলণ্ডে যাইবার আয়োজন করিতেছিলেন। তাঁহার অগ্রজ অম্বিকাচরণ সেন উপার্জ্জনশীল ব্যবহারজীবি ছিলেন। তিনি প্রমদাচরণকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। এদিকে 'সখা'র উন্নতিকল্পে তাঁহার আহার নিদ্রা এক প্রকার বন্ধ হইয়াছিল। ইংলণ্ডে যাইবার আয়োজন যখন অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে, সেই সময়ে প্রমদাচরণের যক্ষ্মারোগ প্রকাশ পাইল। প্রমদাচরণ যখন বুঝিলেন তাঁহার আসন্নকাল উপস্থিত, তখন স্বদেশে যাইবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইলেন। ১৮৮৫ সালের ২১শে জুন খুলনা নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার শৈশব-গুরু পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন।

প্রমদাচরণের 'সখা'র পরিচয় অনাবশ্যক। তিনি তিনখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ১। "মহৎ জীবনের আখ্যায়িকাবলী।" ২। "সাথী"। ৩। চিন্তা শতক। প্রথম পুস্তকখানি এত সুন্দর যে উহা বালবালিকা-দিগের নিমিত্ত লিখিত হইলেও সকলের নিকটেই সমান আদরের বস্তু হইয়া পড়িয়াছে। প্রমদাচরণ কর্ম্মময় জীবনের ঊষাকালেই এ জগৎ হইতে বিদায় লইয়াছেন। বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহার দ্বারা অনেক মহৎ কাজ সাধিত হইতে পারিত তাহাতে সন্দেহ নাই! তাঁহার 'সখা'র অনুকরণে বালক বালিকা-দিগের পাঠ্য দুই একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের কোনখানিই 'সখা'র সমকক্ষ হইতে পারে নাই বলিলে অন্যায় বলা হইবে না।

শিশু-সাহিত্যের আদর্শ ঠিক ধরিতে পারিয়াছেন এমন লোক আমাদের দেশে অতি বিরল। শুধু ইংরাজীর অনুবাদ বা 'সখা'র অনুকরণ করিলে সফলতার আশা সুদূরপরাহত। প্রমদাচরণের ন্যায় উদ্ভাবনী-শক্তি ও প্রতিভা সকলের থাকে না—আর তাঁহার ন্যায় কর্ম্মনিষ্ঠ লোকও সাহিত্য-ক্ষেত্রে নিতান্ত দুর্লভ।

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

---



# জীবন ও মৃত্যু।

১

বহিছে সাঁঝের বায়!
জননীর কোলে বসিয়া বালিকা,
আকাশের পানে চায়!
ছোট তারাগুলি রয়েছে ফুটিয়া
নীল গগনের গায়!
সুদূরের অই সাদা ফুলগুলি
দেখি, উঠে বালা হরষে আকুলি,
ডাকে, 'আয়, আয়'—ছোট হাত তুলি,—
যদি সে সেগুলি পায়,
ভাবে বালা, তবে জগতের মাঝে
সব সাধ মিটে যায়!
জীবন নীরবে হেসে কহে "হায়
দিতে পারিব না তায়!"

২

দূরে রবি নিভে যায়!
নিরালা কাননে বসিয়া কিশোরী—,
উদাস নয়নে চায়!
যেন কি আবেগে আঁখিতারা দুটি
আজি খুঁজে মরে কায়!
কোমল দৃষ্টি-পরশে যাহার
জাগিল এ হিয়া, শোভার আগার,
নিশি দিনমান হৃদয় তাহার—
থাকে সে—প্রণয় ছায়!
অভাবের লেশ থাকেনাক তবে
আর কিছু না সে চায়!

জীবন নীরবে হেসে কহে "হায়
দিতে পারিব না তায়!"

৩

নিশা না ফুরাতে চায়!
রুদ্ধ কক্ষে ভূতল শয়নে—
মরে শিশু যাতনায়!
সুখের দুখের স্মৃতিকণাটুকু
বুঝি রে মিলায়ে যায়!
বিধবা নারীর অশ্রু সজল
সারা হিয়া, তার মাগিছে কুশল,
"কর গো ঠাকুর, সুস্থ সবল,
ধরি দুটি রাঙা পায়!"
শেষ সম্বল সব তো নিয়েছ—
নিয়োনা, নিয়োনা, তায়;
জীবন নীরবে হেসে কহে, "হায়,
দিতে পারিব না তায়!"

৪

একা—আজ অসহায়,
আপনা বলিতে নিখিল জগতে
কেহ তার নাহি হায়!
দীর্ঘ জীবন যাত্রার শেষ—
আজো নাহি দেখা যায়!
দেবতার মুখ হৃদয়ে লখিতে,
পুরানো স্মৃতি সে জাগে যে চকিতে
দেবতা, মন্ত্র—পশেনাক চিতে,
সারা হিয়া কাঁপে তায়!
মাগিছে শান্তি, বিস্মৃতি শুধু,
সকাতর বেদনায়!



জীবন নীরবে হেসে কহে, "হায়
দিতে পারিব না তায়!"

* * * *

মৃত্যু সে ছিল দীনের বন্ধু,
করুণায় ডাকে "আয়!
জীবন যে সাধ মিটাল না তোর
আমি মিটাইব তায়!"

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

---

# বাঙ্গলা নাটক সমালোচনা।

( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর )

পঞ্চম দৃশ্যে—আবার নুরজাহান। সম্রাট তাঁহাকে বর্দ্ধমানে ফিরিয়া যাইতে আদেশ দিয়াছেন। তিনিও যাইব বলিয়া স্থির করিয়াছেন এমন সময় বাঁদী আসিয়া সংবাদ দিল—"সম্রাজ্ঞী আস্‌ছেন জনাব।"—"জনাব" সম্বোধন স্ত্রীলোকের প্রতি হয় না, উহা পুংলিঙ্গ শব্দ। পরে রেবা আসিলেন।

রেবা প্রেমলোলুপ স্বামীর প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি সম্রাজ্ঞী হতে চাও।"

নুরজাহান এবার আর কোন কৌশল না করিয়া সাফ বলিলেন—"বেগম সাহেব! মাপ কর্ব্বেন, আমি কিছু হ'তে চাই না। আমি শুদ্ধ বর্দ্ধমানে ফিরে যেতে চাই।"

এত স্পষ্ট কথা শুনিয়াও রেবা স্বামীর জন্যই বেশ প্রলোভন দেখাইয়া বলিলেন, "শোন মেহের!—তুমি ইচ্ছা করিলেই সম্রাজ্ঞী হ'তে পার—যে সে সম্রাজ্ঞী নয়—প্রধানা বেগম—ভারতের অধীশ্বরী। * * তিনি ( সম্রাট ) আর এই সাম্রাজ্য তোমার মুঠোর মধ্যে।"—মেহের তবু টলিল না। রেবাও বেশ দক্ষতার সহিত আর্ত্তের প্রতি কৃপা এবং স্বামী সুখের জন্য স্বার্থনাশ করিয়াও হিন্দু-ললনার মহানুভবতা দেখাইয়া চলিয়া গেলেন। এই দৃশ্যে

মেহের ও রেবা নির্দ্দোষভাবে চিত্রিত হইয়াছে। রেবার চিত্র এ দৃশ্যে কবির গুণে পরমোজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে। মেহেরও এ দৃশ্যে যে সংযত হৃদয়ভাব দেখাইয়া রেবাকে নিশ্চিন্ত করিয়া দিলেন, তাহা চমৎকার হইয়াছে। নুরজাহানের চিত্র কবি এত সুন্দর আর কোন দৃশ্যে আঁকেন নাই।

রেবা চলিয়া গেলে নুরজাহানের মনে সুমতি কুমতির দ্বন্দ্ব দেখা দিল। ভারতেশ্বরী হইবার প্রলোভন আর কন্যার মৃদু তিরস্কারের তীব্রজ্বালা তাঁহার মনকে তোলাপাড়া করিতে লাগিল। তিনি স্থির করিলেন,—"এ বিষয়ে আমার একটা সম্মানের ঋণ আছে—আমার নিজের কাছে, আমার কন্যার কাছে, আমার নিহত স্বামীর কাছে।"—বেশ কথাটি, এই সম্মানের ঋণ পরিশোধে উচ্চাঙ্গের আত্ম-সম্মান লাভ করা যায়—মেহের ভারতের অধিশ্বরী হওয়া অপেক্ষা তাহা বেশী মূল্যবান বলিয়া বুঝিয়াছেন।—কবির চিত্র এ দৃশ্যে সফল হইয়াছে।

এমন সময় বাঁদী আবার আসিয়া আসফের আগমন সংবাদ দিল। ইতি-মধ্যে বাদসাহ জাহাঁগীর এক কৌশল খেলিয়াছেন। তিনি রেবার দ্বারা মেহেরুন্নিসাকে নিজে বশীভূত করিতে না পারিয়া আয়াসকে ভবিষ্যৎ উন্নতির লোভ দেখাইয়াছিলেন। বৃদ্ধ স্বার্থের জন্য কন্যাকে তাহার স্বামীহন্তার হাতে তুলিয়া দিতে সম্মত হন নাই। বাদশাহ তখন স্বার্থপর নবীন যুবক আসফকে বহু প্রলোভন দেখাইয়া ভগিনীকে সম্মত করিতে নিযুক্ত করিলেন। লোভী আসফ সেই কার্য্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইতিহাস এ বিষয়ে বেশী কিছু ইঙ্গিত করে না, কাজেই নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের এই কৌশল রচনা গুলি অতি সুন্দর, অতি উপযোগী এবং মনোরম হইয়াছে।

আসফ নানা যুক্তি-তর্কে যখন মেহেরকে সম্মত করিতে পারিলেন না, তখন ভবিষ্যতের অনুতাপের ছবি আঁকিয়া যাহা বলিলেন—তাহা ভদ্রঘরের ভ্রাতাভগিনীর অনুপযুক্ত। "মেহের, তুমি আজ এই মহৎ সম্মান ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছ। কিন্তু পরে যখন লোলবার্দ্ধক্য তোমার উচ্চ ললাটে এসে বস্‌বে, তখন তোমার মনে একটা নিষ্ফল অনুতাপ হবে যে যৌবনের বি সুযোগই তুমি হারিয়েছ।" ভগিনীর রূপ-যৌবন বেচিয়া ভ্রাতা উচ্চপদ



র্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা করিতেছে—ইহা কি বিসদৃশ ঘৃণ্যভাব। কবি কি যৌবনের কথা না তুলিয়া অন্যভাবে এই প্রস্তাব করাইতে পারিতেন না?

মেহের এই কথায় কিন্তু টলিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু মুখে দৃঢ়তা রাখিয়া ভ্রাতার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। আসফ তখন স্পষ্টতঃ নিজ পিতার পদ-বৃদ্ধির কথা পাড়িলেন। তাহার উত্তরে মেহের তিরস্কার ছলে যাহা বলিলেন,—তাহা চমৎকার!—একটী মহীয়সী মহিলার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। আসফ তাহাতে লজ্জিত না হইয়া—পাপীয়সীর উপযুক্ত কূট ষড়যন্ত্রে স্বামী-হন্তার প্রতি প্রতিশোধ লইবার সুযোগ দেখাইয়া দিল!—মেহেরের মনের শয়তান প্রবৃত্তি এইবার জাগিল—সে বলিল—"নৈলে পিতা, তুমি, স্বয়ং রুয়াবতী সম্রাজ্ঞী আমার বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করবে কেন?—আমার মধ্যে যে শয়তানী আছে, তাকে আমি জয় করে এনেছিলাম। এখন তোমরা সবাই তার সঙ্গে যোগ দিলে। আমি হঠেছি।" তার পর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা সকলে তাই চাও?"

—"কি?"

—"যে আমি সম্রাজ্ঞী হই।"—

"হাঁ চাই।"

"নুরজাহান। তবে তাই হোক। কিন্তু সাবধান আসফ! এর পর —হবে তার জন্য আমি দায়ী নই।"

"যাও, সম্রাটকে বলগে আমি তাঁকে বিবাহ করতে প্রস্তুত।"

আসফ চলিয়া গেলেন।

নুরজাহান।—তবে সাম্রাজ্য খানি এবার একটা প্রকাণ্ড ভূমিকম্পে কাঁপুক।"

শেষ কথাটা কবি যে ভবিষ্যদ্দৃষ্টিতে বলিয়াছিলেন,—নুরজাহানের কিন্তু তখনও ততটা দূর ভবিষ্যৎ ভাবিবার সুযোগ হয় নাই, কারণ তখনও জয়লার সহিত শাহ্‌রিয়ারের বিবাহ হয় নাই—কাজেই ভাবী জামাতার জন্য সিংহাসনের পথ নিষ্কণ্টক করিবার চিন্তা তখনও আসে নাই।—এটা অতীব বিসদৃশ উক্তি!

ষষ্ঠ দৃশ্যে কতকগুলি রাজ-পারিষদ ও কতকগুলা নর্ত্তকীর একটা নাচ

গান মাত্র। দৃশ্যটা—অর্থহীন, সম্পর্কহীন, প্রয়োজনহীন, বোঝামাত্র। দৃ যোজনার জন্যও ইহার কোন প্রয়োজন নাই। গানের মোহাড়াটা ৺রাজকৃ রায়ের প্রহ্লাদ-চরিত্রের "রতন আসনে, রতন ভূষণে, যুগল রতন রাজে"- ইত্যাদির ন্যায়, কিন্তু শেষাংশটুকুতে নূতনত্ব আছে।

সপ্তম দৃশ্যে লয়লা ও শাহ্‌রিয়ার কথা কহিতেছেন,—তখনও তাঁহারা অবিবাহিত।

শাহ্‌রিয়ার বলিলেন—"তুমি দীন লয়লা! তুমি সাম্রাজ্ঞীর কন্যা—তুমি সম্রাটের—" বাধা দিয়া লয়লা বলিলেন—"স্তব্ধ হোন কুমার! সম্রাটের সঙ্গে এক নিশ্বাসে আমার নাম উচ্চারণ ক'রে আমায় কলুষিত কর্ব্বেন না হাঁ আমি সম্রাজ্ঞীর কন্যা বটে—হায় তা অস্বীকার কর্ব্বার যো নেই।" এ কি ভাষা! "স্তব্ধ হোন্" মানে কি চুপ করুন? নূতন অর্থ বটে। এক নিশ্বাসে উচ্চারণের ভাব আদৌ বাঙ্‌লা নহে। বাঙ্‌লা লিখিতে বাক্য গঠনে, ভাব সংগ্রহে শব্দ প্রয়োগে—এই ইংরাজী ধার করিলে চলে কি?

লয়লাটি কবির চমৎকার সৃষ্টি। পিতৃ-হত্যার প্রতিহিংসা হইল না—য পতি-হন্তাকে বিবাহ করিল—এই ক্ষোভে রোষে সে সর্ব্বদা জ্বালাময়ী হইয় আছে। কবি তাহাকে পরুষ, কঠোর, উদ্ধত, অবাধ্য করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার ফলে সে মাতার সঙ্গে যে ভাবে কথাবার্ত্তা কহে, তাহাতে তাহাকে একবারে চক্ষুঃশূল করিয়া তুলিয়াছে। এই দৃশ্যে মাতা কন্যার যে উদ্ধত বাক্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা শুনিলে মোগল বাদশাহের অন্তঃপুরিকা দিগের কথা দূরে থাক, কোন সামান্য গৃহস্থের ঘরের মহিলাদের ঝগড়াতেও সে সকল শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় বলিয়া বোধ হয় না। কয়েকটা বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি,—"যখন সেই জল্লাদ এসে তোমার হাত ধরে, তোমায় প্রেয়সী বলে ডাকে, * * * নিত্য নিত্য দেখ্‌ছি যে পাপের কারখানায় তৈরি হচ্ছে, নূতন নূতন অবিচার—অত্যাচার—ব্যভিচার! * * * হায় হতভাগিনী নারী তোমার উপর রাগ কর্ব্ব কি? * * * যেই দেবতার সিংহাসনে বসিয়েছ এক কামুককে! * * * লজ্জা করে না যে নারীর যা কিছু মহৎ * * * সব বিসর্জ্জন দিয়ে * * * আপনাকে বিক্রয় করেছ?" এই এতগুলা তীব্র গালিরবদলে যেন মনে



য় লয়লা অনুগ্রহ করিয়া "তবেরে খানকী" বলিলেই বোধ হয় দ্বিজেন্দ্র বাবুকে এতগুলা সংস্কৃত শব্দ গুছাইয়া মরিতে হইত না।

আরও আছে,—

"নুরজাহান। স্তব্ধ হও বালিকা।

লয়লা। কি জন্য নারী।

* * * * *

নুর। (উচ্চৈঃস্বরে) লয়লা।

লয়লা। (তদ্রূপ উচ্চৈঃস্বরে) নুরজাহান।

এইস্থানে কবি দ্বিজেন্দ্র বাবু অভিনেত্রীদিগকে ভাব বিকাশের যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাও চমৎকার। দ্বিজেন্দ্র বলিতেছেন—"দুজনে পরস্পর সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইয়া দুই ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রীর মত পরস্পরের দিকে জ্বালাময় দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।" উপদেশটায় যেন অঙ্গহানি হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে—এতটাই যদি করিতে তবে মায় ঝিয়ে দুগাছা ঝাঁটা হাতে করিয়া বাগাইয়া ধরিলেই ঠিক উপযুক্ত হয় না কি?

তারপর লয়লা সম্রাটের সম্মুখেও যথেষ্ট বাচালতা—যথেষ্ট ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিলেন। সেগুলাও অতি বিসদৃশ। জাহাঙ্গীর কিন্তু এখানেও সংযত ও বেশ বুদ্ধিমানের মত ব্যবহার করিয়াছেন, কেবল কবির বুঝিবার দোষে এবং নিজের অবস্থা ও অভিজ্ঞতার ওজনে সম্রাটের অবস্থা ও অভিজ্ঞতার ছবি আঁকিতে গিয়া একটা মস্ত ভুল করিয়াছেন। জাঁহাগীর যুবতী লয়লাকে ধরিয়া একটা ঝাঁকা দিয়া বলিলেন—"এই শেষবার বুঝ্‌লে বালিকা। মনে থাকে যেন।"—হায় হায়! এমন করিয়াও এসকল চরিত্রের আদবকায়দার অমর্য্যাদা কেহ করে না?

সম্রাট্ চলিয়া গেলে—লয়লা মাতাকে একটা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিল,—"এই পরিবারকে নরকে নিক্ষেপ কর, দস্তুর মত পিশাচী হও। * * * এ পরিবার ধ্বংস কর। * * * তুমি আর আমি, আর মা আর মেয়ে নই। আমরা দুই বোন—দুই শয়তানী—এক গতি—এক লক্ষ্য—এক পরিণাম।" হায় মাতঃ বঙ্গভাষা! তোমার ভাণ্ডার কি এতই খালি যে এই ইংরাজী ভাবগুলা ব্যবহারগুলা তোমার গাত্রে কণ্টকবৎ বিঁধিয়া থাকিলেও এইগুলা

দিয়াই তোমায় সাজাইতে কবির এত আনন্দ!—তারপর লয়লার প্রতিহিংসা অতি স্বাভাবিক, সেজন্য জাঁহাগীর বংশ ধ্বংসের কল্পনাও স্বাভাবিক; কিন্তু মুসলমান রমণী দস্তুরমত উভয় পক্ষের রাজীরগবতে কাজীর সম্মুখে শাস্ত্রমতে যে বিবাহ হইয়াছে, তাহা না মানিয়া তাহাকে পাপিনী পিশাচী বলে কেন! গালি দেয় কেন? মায়েঝিয়ে প্রতিহিংসা সাধনে ভগিনী সম্পর্ক না করিয়া লইলে কি অসুবিধা হয়, কবি তাহা কোথাও ব্যাখ্যা করিয়া দিলেন না কেন? বিবাহ বিভ্রাট পড়িয়া এন সরকার গৃহের স্ত্রীকে সমাজে ভগিনী বলিতে প্রস্তুত হইয়াছিল; এটা কোন বিভ্রাট অনুসারে হইল? এই দৃশ্যের পর দ্বিতীয়াঙ্ক শেষ হইল। (দ্বিতীয়াঙ্ক নাটক হিসাবে এমন কিছু ঘটিল না, যাহার জন্য এই সাতটা দৃশ্য আবশ্যক হইতে পারে। এই সাতটা দৃশ্যের মধ্যে আসফের প্ররোচনায় মেহেরউন্নিসার বিবাহে সম্মতি প্রদান ব্যাপার আর সেই ঘটনায় লয়লার ক্ষোভ, রোষ ও প্রতিহিংসার চেষ্টা এই দুইটামাত্র ঘটনা আবশ্যক—এতদ্ভিন্ন আর কোন দৃশ্যের কোন ঘটনা এই নাটকের প্রতিপাদ্য স্থাপনে বিন্দুমাত্র সাহায্য করে নাই। পতাকাস্থান স্থির না করিয়া যে নাট্যকার নাটকের অঙ্কচ্ছেদ ও দৃশ্যযোজনা করেন—তাঁহার নাটকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বহুত্রুটী ও দৃশ্যবাহুল্য থাকিয়া যায়।)

(ক্রমশঃ)

---

# কালকা পথে।

সে আজ দুই বৎসরের কথা হইলেও, বেশ স্মরণ আছে। একদিন ভোর হয় হয়, টুণ্ডুলার বাসায় শয্যায় পড়িয়া এপাশ ওপাশ করিতেছি; শীতের ঠাণ্ডা বাতাস জানালার ফাঁক দিয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতেছে। আলস্য বশতঃ অন্ধকারকে আরো খানিকক্ষণ থাকিবার নিমিত্ত অনুনয় অনুরোধ করিতেছি; এমন সময় আমাদের বাসার নীচে হইতে কে যেন বিকট চীৎকার করিয়া কাহাকে ডাকিতেছিল। হিমনিষিক্ত বাতাসে বোঝা যাইতেছিল না যে, স্বরটি বাঙ্গালী কি হিন্দুস্থানীর কণ্ঠ নিঃসৃত। কাণ খাড়া



করিয়া রহিলাম, বিশেষ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমাদের সিড়ীর দরজায় যষ্টির আঘাত সুরু হইল। কোথায় হ'তে আপদ আসিল, মনে করিয়া তাড়াতাড়ি গিয়া দ্বার খুলিয়া দিলাম। তার পর যাহা দেখিলাম তাহাতে অঙ্গ শীতল! মাথায় প্রকাণ্ড পাকড়ী বাঁধা, সমস্ত শরীরটা কম্বলে আচ্ছাদিত, নাগরা পায়ে, দুইজন স্থূলকায় হিন্দুস্থানী! তাজ্জব ব্যাপার! তাহারাও আমার মত একজন সুপ্তোত্থিত দুর্ব্বল বাঙ্গালীকে নিরীক্ষণ করিয়া নির্ব্বাক! পরস্পর পরস্পরের মুখের প্রতি একবার নিরাশের শূন্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

৺পূজার সময় পশ্চিম বেড়াইতে গিয়া টুণ্ডুলায় আমার একটী বন্ধুর বাসায় অবস্থান করিতেছিলাম। বন্ধুবর চোখ উঠার জন্য বড় কষ্ট পাইতেছিলেন। তিনি পরিবার লইয়া ভিতর বাড়ীতে থাকেন। আমি বহির্বাটীতে থাকি। সুতরাং এই হাঙ্গামা তাঁহাকে পোহাইতে হইল না। চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমারা কাহার অনুসন্ধান করিতেছ? আমার বন্ধু যে আপিসে কর্ম্ম করেন, সেই আপিসের জয়শঙ্কর বাবুর আত্মীয় বলিয়া তাহারা পরিচয় প্রদান করিল। জয়শঙ্কর বাবুর সহিত আমার ইতি পূর্ব্বেই বিশেষ আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। তিনি বিশেষ ভদ্রলোক। আমি তাহাদের সঙ্গে করিয়া তাঁহার বাসা চিনাইয়া দিয়া আসিলাম।

ইতিপূর্ব্বেই আমার তাজ, সিকান্দ্রা প্রভৃতি দেখা হইয়া গিয়াছিল। সেদিন আর কোনখানে যাইবার কথা ছিল না। মধ্যাহ্নে প্লাটফরমে গিয়া বসিয়া রহিলাম। বাঙ্গালী যাত্রী দেখিলেই ছুটিয়া গাড়ীর নিকট গিয়া উপস্থিত হই। নানাপ্রকার প্রশ্নাদিতে যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করি।

পরদিন সকালে বিছানায় পড়িয়া আছি—রাত্রে ভাল নিদ্রা হয় নাই। গৃহে অল্প অল্প আলো আসিয়াছে। এমন সময় শুনিলাম—"ও মহাশয়, আপনি কৈ? বলি বিদেশে বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে আসিয়া কি এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাইতে হয়? উঠুন! উঠুন!" কণ্ঠস্বর বেশ পরিচিত বলিয়া মনে হইল। এত ভোরে কে আসিল! দৌড়াইয়া গিয়া দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া

দিতে না দিতে, ভদ্রলোক বাহির হইতে বলিলেন, "এযে দেখছি এখনো আপনার চোখে ঘুম জড়িয়ে রয়েছে।"

আমি বলিলাম, "উপেন সাহেব যে, এত ভোরে কেমন করে এলে?" আমরা তাহাকে সাহেব বলিয়া ডাকিতাম; কারণ তিনি প্রায় সাহেবী ধরণের পোষাক পরিধান করিতেন; তিনি উত্তর করিলেন "কলের গাড়ী করে।"

"এখনতো কোন up train নাই, আসিলেন কেমন করিয়া।"

"up না থাকতে পারে, down ত আছে।"

"up এই বা গেলেন কবে?"

inquisitive হওয়া চাই! পড়ে পড়ে ঘুমলে হয় না। চলুন ধড়া চূড়া ছেড়ে একবার খাঁটি স্বদেশী হই। তার পর সব কথা হবে।

তখন উভয় গৃহের মধ্যে আসিয়া বসিলাম। তিনি বলিলেন "তোমার আলিগড় যাবার খবর পথে পাই। সেজন্য বরাবর আলিগড় গিয়া অবতরণ করি। সেখানে শুনিলাম তুমি সেখান হ'তে আজ চার পাঁচ দিন টুণ্ডুলায় চলিয়া আসিয়াছ। অমনি পরবর্ত্তী ট্রেণের অনুসন্ধানে বাহির হইয়া জানিলাম ডাউন মেল ছাড়া আর গাড়ী নাই। তাতেই চড়ে বসলাম। এখানে অন্ধকার থাকতে থাকতে গাড়ী পৌঁছিয়াছিল। যা কেবল পথে জিজ্ঞাসা করে আসতে বিলম্ব হয়েছে! অক্ষয় বাবু কেমন আছে বল?" এমন সময় অক্ষয় বাবু সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেদিন বড় আনন্দে কাটিল। মধ্যাহ্নে পরামর্শ হইল, কালকা দেখিয়া আসা যাক। উপেন বাবু বলিলেন, "কেবল উইয়ের ঢিপি দেখিয়া রাখিয়াছেন চলুন পাহাড় কাকে বলে একবার দেখে আসবেন।"

সেদিন রাত্রে আহারাদির পর টুণ্ডুলা হইতে কালকার জন্য রওনা হওয়া গেল। কথা রহিল, আমরা ফিরিয়া পুনরায় টুণ্ডুলা আসিব। কারণ অক্ষয় বাবু তাঁর চোখের জন্য আমাদের সঙ্গী হইতে পারিলেন না। গাড়ী উদ্দাম গতিতে ছুটিয়া চলিল।

সারা রাত্রি বাষ্পযান ছুটিয়া চলিল, বন্ধুপ্রবর নিদ্রাদেবীর বড় ভক্ত ও অনুরক্ত সেবক। আমরা যে কম্পার্টমেণ্টে উঠিয়াছিলাম তাহাতে অন্য



কোন আরোহী ছিল না। সুতরাং তিনি কম্বল মুড়ি দিয়া বিকট নাসিকার গর্জ্জনে ক্ষুদ্র গাড়ীখানিকে শব্দান্দোলিত করিয়া তুলিলেন। গাড়ী যতই কালকা অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে, ততই হিমকণা সমস্ত জানালা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও কোথায় কোন ক্ষুদ্র রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিয়া স্নেহালিঙ্গন আবেশে শরীর অসাড় করিবার উপক্রম করিতেছে। উঃ সে কি ভয়ানক ঠাণ্ডা! গরম কোট ও কম্বলে অনেকটা নিরাপদ থাকিব মনে ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু এখন বেশ হৃদয়ঙ্গম হইল তুষার-কিরিটী হিমাদ্রির দূতটী বড় উপেক্ষার লোক নন। তখন রাত্রি প্রায় ২টা বাজিয়াছে। গাড়ী অনেকক্ষণ অন্তর মাঝে মাঝে বিশ্রাম লইতেছে। এবার যেখানে তাহার উদ্দাম গতি সহসা নিস্তেজ ও নীরব হইয়া আসিল, জানালার কাঁচের ভিতর দিয়া দেখিলাম, সেস্থানের নাম ষ্টেশনের উপর পাথরের গাত্রে বড় বড় অক্ষরে ক্ষোদিত রহিয়াছে "দিল্লী"। আমি কখনো পূর্ব্বে দিল্লী আসি নাই, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের সময় ও ভাড়া নিরূপণ পুস্তক লইয়া বহুবার তার দূরত্ব ও ভাড়া লইয়া অঙ্কপাত করিয়াছি মাত্র। আজ দিল্লীর ষ্টেশনে গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলে অনেক পুরাতন কথা মনে পড়িল। গাড়ী এখানে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে। এক একবার মনে হইল, এইস্থানে অবতরণ করি, যে দিল্লী হিন্দুস্থানে হিন্দুর অতীত কাহিনী বক্ষে করিয়া কত যুগযুগান্তর হইতে, তার ঐশ্বর্য্য—তার সৌন্দর্য্যের গৌরবদীপ্তি লইয়া দাঁড়াইয়া আছে,—তাহার সহিত, তাহার সুখৈশ্বর্য্যের সহিত তাহার অতুলনীয় হর্ম্ম্য অট্টালিকার ভগ্নাবশেষের সহিত তাহার ধুলিকণার সহিত একবার প্রাণ মিলাইয়া দিই! এ নর জন্ম সার্থক করি!

কিন্তু সে গভীর রাত্রিতে নামিয়া কোথায় যাই? বন্ধুপ্রবরকে উঠাইতে বৃথা প্রয়াস পাইলাম। তিনি তখন ঘুমের ঘোরে মধুর স্বপ্নে অজ্ঞান। তখন মনে পড়িল বিচিত্রময়ী হস্তিনার কথা, সঙ্গে সঙ্গে আরো মনে পড়িল হিন্দুর জ্ঞান বুদ্ধি বিদ্যার একাধিপত্য। একদিন ছিল, যখন সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হইলে কি হয়, সেও লোলুপ দৃষ্টিতে এই শোভাময়ী বীরপ্রসবিনী বীরভোগ্যা হস্তিনার প্রতি চাহিয়া থাকিত। ইহারই কোলে কত রাজন্যবর্গ কত খেলাই না খেলিয়াছে? কত ভীষণ সংগ্রামের দুর্দ্ধর্ষ সংঘাতে কত

রাজবংশ চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কোথায় আজ সে হস্তিনার সুখৈশ্বর্য্য? কোথায় বা তার বীরপুত্রগণ।

গাড়ী পুনরায় ছুটিতে আরম্ভ করিল। গতি তেমনি উদ্দাম, তেমনি দ্রুত। এবার আর শুইলাম না, জানালার কাঁচের উপর মুখ রাখিয়া দেখিতে লাগিলাম। কাঁচের উপর মুক্তার ন্যায় শিশিরকণা জমিয়া থাকায় বাহিরের দৃশ্য বড়ই অস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছিল। চন্দ্রদেব পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। আকাশ, মেঘ, মুক্ত-প্রান্তর যেন নিশীথে নীরবে মধুর মিলনে মিলিয়াছে। যেন প্রকৃতি সতী ধরণীর বক্ষে বিরাম নিদ্রায় অভিভূতা, প্রেমিকের প্রীতি অশ্রুর স্বরূপ নিহারবিন্দুগুলি তাহার বক্ষে কণ্ঠে জড়াইয়া রহিয়াছে। শান্ত নীরব নিশা। দূরে বহুদূরে অস্পষ্ট আবছায়ার মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরগুলি দৃশ্যপথে এক একবার পড়িয়া তখনি বায়স্কোপের চিত্রের মত মিলাইয়া যাইতেছিল। এরূপ মনোরম দৃশ্য বুঝি কখন দেখিব না।

যখন সেই শীতের ভোর রাত্রে ঊষার প্রথম বাতাস অল্প অল্প বহিতে সুরু করিয়াছে, তখন গাড়ী পানিপথ ষ্টেসনে আসিয়া পৌঁছিল। তাড়াতাড়ি জানালার কাঁচখানি নামাইয়া মুখ বাড়াইয়া দেখি দিগন্তব্যাপী মুক্ত প্রান্তর। মাঝে মাঝে শাল, মৌ ও বাবলা প্রভৃতি বৃক্ষরাজি শিশিরমণ্ডিত; যেন অতীত গৌরব-কাহিনী স্মরিয়া নয়নজলে ভাসিতেছে। মনে হইল এই সেই রণক্ষেত্র, এই সেই স্থান—যেখানে ভারতের ধর্ম্মযুদ্ধ হইয়াছিল,—যে পবিত্র স্থানে অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্য এক দিন এক সময়ে সমবেত হইয়াছিল। যে যজ্ঞে ভারত তার সমগ্র বীরশক্তি, ঐশ্বর্য্য বিসর্জ্জন করিয়াছিল,—এই সেই মহাভারত কথিত "কুরুক্ষেত্র"। "কুরুক্ষেত্র" এই কথা স্মরণ হইতে হৃদয় দুঃখে, হর্ষে কেমন হইয়া গেল। মনে হইল, যেন কোন অজানা দেশে স্বপ্নাবেশে ভাসিয়া চলিয়াছি—আমাকে যেন দুর্ব্বল বঙ্গবাসী বলিয়া আর মনে করিতে বাসনা হইল না। মনে হইল আমিও যেন জন্ম জন্মান্তরে ঐ যুদ্ধে এক জন কেহ ছিলাম। আমিও যেন উভয় সৈন্যের মধ্যস্থিত রথে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে, অর্জ্জুনের সারথ্য করিতে অবলোকন করিয়াছি,—আমিও যেন তাঁর পলাশপুষ্পবৎ রাঙা আরক্তিম চরণকমলে অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ করিতে বিমুখ হই নাই!



কল্পনা! ধন্য তোমায়! যাক্ এত বেশী কথা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। এইবার কাল্‌কার কথা বলিয়া প্রবন্ধের নামের সার্থকতা করিতে প্রয়াস পাইব।

এইবার মেল কার্‌নালে আসিয়া থামিল। বলিতে ভুলিয়াছি, দিল্লীর নিকট হইতে মেলের উদ্দাম গতি কিছু মন্থর হইয়া আসিতেছিল, কারণ এবার পাহাড়ীকে ক্রমে ক্রমে উঁচুতে উঠিতে হইতেছে। এখন হইতে মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র খণ্ড মেঘের ন্যায় দূরে ছোট বড় পর্ব্বতশ্রেণী নয়নগোচর হইতেছিল। কার্‌নাল একটী অতি প্রাচীন নগর। কথিত আছে, "মহাবীর কর্ণ ইন্দ্রপ্রস্থের নিকট বলিয়া এই স্থানে তাঁর রাজধানী সংস্থাপন করেন। সে আজ কত যুগযুগান্তরের কথা। তবুও কি আশ্চর্য্য! যখন গাড়ী কার্‌নালে আসিয়া দাঁড়াইল, তখনি যেন অজ্ঞাতভাবে অতীত ঘটনাগুলি নিদ্রোত্থিত শিশুর ন্যায় কল্পনার কোলে নাচিয়া উঠিল। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, কৃষ্ণ, ব্যাস, ভৃগুরাম যেন সব সেদিনকার লোক, যেন অনতিকালপূর্ব্বেই এই সকল ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, যেন পাঞ্চজন্য শংঙ্খধ্বনি বাতাসে এখনও ধ্বনিত হইতেছে, যেন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখনিঃসৃত গীতার শ্লোকগুলির শেষ উচ্চারণ এখনও পরিসমাপ্ত হয় নাই।

পাঁচটার সময় আমাদের গাড়ী থানেশ্বর পার হইয়া গেল। ইহার পর পথের কোন কথা আর তেমন উল্লেখযোগ্য বলিয়া স্মরণ হয় না। এই সময় বন্ধুবর নিদ্রা হইতে উঠিলেন ও বলিলেন, "উঃ বড় শীত! এত শীত কখন আসিল? আপনার শীত কর্‌ছে না?" আমি বলিলাম, আর একটু নিদ্রা দিন, আর কেন, সামান্যের জন্য জাগিয়া থাকিবেন?" তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আপনার মত ত আর আমার বাতিক প্রবল হয় নাই, যে বরফছাপা পাহাড় দেখিয়া এই দারুণ শীতে উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিব।"

সকাল সাতটার সময় পাঞ্জাব মেল বহু সাধ্যসাধনার পর আকাঙ্খিত কালকায় আসিয়া হাঁপ ছাড়িল। কাল্‌কা কলিকাতা হইতে ১০৬৫ মাইল দূরে অবস্থিত। সমতলভূমি হইতে ২০০০ ফুট উচ্চ। এই খানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রেল শেষ হইয়াছে। এখান হইতে কালকা-সীমলা রেলে চড়িয়া সীমলা যাইতে হয়। গাড়িগুলি বড় ছোটো। চারিজন আরোহী

একত্রে বসিলে বড় ঘ্যাঁসাঘেঁসি হয়। গাড়ী হইতে নামিয়া দেখি, আমাদের পরিচিত নগেন বাবু ষ্টেসনে বেড়াইতেছেন, পূর্ব্ব হইতে জানিতাম, তিনি কালকায় কর্ম্ম করেন। তিনি আমাদের পাইয়া বিশেষরূপ আহ্লাদিত হইলেন। নানাপ্রকার কুশলাদি প্রশ্নে আপ্যায়িত করিতে করিতে তাঁহার বাসায় গিয়া উঠিলাম। তিনি ও তাঁর স্ত্রী দুইজনে এখানে থাকেন। নগেন বাবুর বাসা সমতল-ভূমি হইতে কিছু উঁচুতে ও পাহাড়ের কোলে। চারিদিকে অভ্রভেদী পর্ব্বতশ্রেণী। কাল্‌কা, আকাশ ও পাহাড়ের যেন মহা সম্মিলন ক্ষেত্র, আমরা আমাদের জিনিষপত্র রাখিয়া বেড়াইবার জন্য বাহির হইতে উদ্যত হইলাম। তিনি অনুরোধ করিলেন "আহারাদির পর যাইবেন।" আমি বলিলাম "তাহাই হবে—তবে কি না, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চলিয়া পা একপ্রকার অসাড় হইয়া গিয়াছে, একটু ছাড়াইয়া আনি।" এক এক পেয়ালা চা খাইয়া, বাসা হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। নগেনবাবু বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন, যেন বেশী বিলম্ব না হয়।

পথে বাহির হইতেই কি এক অজানা আনন্দে প্রাণ পুলকিত হইয়া উঠিল। ষ্টেসনের সম্মুখ হইতে ধূলি সমাচ্ছন্ন কাল পাথরে মোড়া মল-রোড বাহির হইয়া পর্ব্বতগৃহের অন্দরে প্রবেশ করিয়াছে। রাস্তাটি যেন জাহাজে উঠিবার জেটির মত ক্রমে ক্রমে উঁচু হইয়া গিয়াছে। এই খানে অনেকগুলি ছোট ছোট ঘোড়া লইয়া পাহাড়ীরা যাত্রীর অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকে। যদিও এখন কাল্‌কা হইতে ছোট লাইন পাহাড়ের গাত্র বেষ্টন করিয়া উঠিয়া ইঞ্জিনিয়ারের অপূর্ব্ব বুদ্ধি ও কৌশলের পরিচয় প্রদান করিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া কখন উপরে উঠিয়া কখন বা নীচে নামিয়া পাহাড়ের বক্ষের উপর দিয়া সিমলা পর্য্যন্ত গিয়াছে, তথাপি পূর্ব্ব সময়ের ব্যবহৃত "টঙ্গা" এখন অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। টঙ্গার ভাড়া রেলের অপেক্ষা নিতান্ত কম। এখনো অনেকে রেল অপেক্ষা টঙ্গা পছন্দ করেন। অল্প দূর অগ্রসর হইয়া দেখি সারি সারি দোকান পসার, বেশ ক্ষুদ্র সহর। এখানেও নানা জাতীয় লোক ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে বাস করে। এখানকার লোক প্রায় সকলেই পাহাড়ী, হিন্দু ও মুসলমান। কাল্‌কা হইতে কিছু দূরে একটি সুন্দর উদ্যান আছে। উহা একজন করদ রাজার নির্ম্মিত। উপবনের



গৌরব বড়ই মনোরম ও প্রীতিপ্রদ। পূর্ব্বে যখন সিমলা পর্য্যন্ত রেল হয় নাই, তখন এই বাগানে বড় বড় লোকেরা বিশ্রাম লাভ করিয়া টঙ্গায় বা অশ্ব পৃষ্ঠে সিমলায় যাত্রা করিতেন।

একটী দোকানে জলযোগ করিয়া, মল-রোড ধরিয়া চলিলাম। কোথায় ব, বা কোথায় যাইতেছি বা কখন বাসায় ফিরিব এরূপ কোন চিন্তাই স্থান পাইল না। কেবলই চলিয়াছি। বড় আনন্দ, বিপুল উৎসাহ। একটী গিরিশ্রেণী যেন আমাদের সঙ্গে পথ চলিতে অপারক হইয়া তে লুকাইয়া পড়িতেছে, তাহাদেরই পার্শ্ব হইতে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর তমালার বিস্তারের পর বিস্তার, শ্রেণীর পর শ্রেণী পরিলক্ষিত হইতে াল। কখন দ্রুত পদবিক্ষেপ, কখন মন্থর গতিতে কখন বা ছুটিয়া, লি উঁচুতে উঠিতে সুরু করিলাম। মাঝে মাঝে নির্ঝরিণীর কল কল —নিস্তব্ধ পাহাড়ের কোলে বড়ই মনোহর। চতুর্দ্দিকে গগনস্পর্শী তশ্রেণী, মেঘের কোলে মস্তক হেলাইয়া যেন ঘুমাইয়া রহিয়াছে। নিম্নে সঙ্কীর্ণ অসরল পথ। আমার তখন পিপাসা পাইয়াছিল—মনে হইল ম যেখানে জল দেখিব, তাহা আবিল হইলেও পান করিব। কিয়দ্দূর সর হইতে না হইতে দেখিলাম একটী স্থানে ঝরণার জল সঞ্চিত হইয়া য়াছে। দেখি অল্প দূরে পর্ব্বত গাত্র ভেদ করিয়া ঝরণার জল ঝর ঝর করিয়া পড়িতেছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

---

# চিত্র ও চিত্রকর।

## ( প্রথম প্রস্তাব )

চিত্রে চিত্রকরের দুইটী শক্তির পরিচয় পাই। একটী তাঁহার মানসিক , অপরটী তাঁহার কায়িক ক্রিয়া শক্তি। একটী তাঁহার মনের কল্পনা, টী তাঁহার হাতের কার্য্য। একটী ধ্যানে চিত্রের আত্মা বা প্রাণকে য়া দেয়, অপরটী কায়িক ক্রিয়াশক্তি প্রয়োগে আত্মার চারিদিকে ব গড়িয়া তোলে। এই দুইটী শক্তি চিত্রকরের চিত্র সৃষ্টির সহায়।

উভয় শক্তির সম্পূর্ণতা লাভ করা প্রায় কোন চিত্রকরের অদৃষ্টে ঘটে না। যাঁহার মানসিক শক্তি তীক্ষ্ণ, তিনি ধ্যান বা কল্পনা বলে নিত্য নূতন ভাব মাধুরী ধরিতে পারেন, কিন্তু সেই মাধুরী দেবীর প্রতিষ্ঠার জন্য যে মনোহর মন্দির প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহাতে যে ক্রিয়াশক্তির প্রয়োজন, তাহা হয়ত পূর্ণ মাত্রায় লাভ করা তাঁহার অদৃষ্টে ঘটে নাই। তাই তাঁহার মন্দিরের গঠন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সুঠাম হইয়া উঠে না, তাই তাঁহার মন্দির গাত্রের প্রস্তরখণ্ড গুলি রুক্ষ ও কর্কশ থাকিয়া যায়, সকল দিকেই একটা ক্রিয়া শক্তির দুর্ব্বলতা পরিলক্ষিত হয়। অপর দিকে যিনি মসৃণ মর্ম্মর প্রস্তরে মনোজ্ঞ মন্দির প্রস্তুত করিতে পটু, হয় ত তাঁহার মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তত জাগ্রত নহেন।

একাধারে সকল গুণের সম্পূর্ণতা জগতে বিরল। এক গুণের আধিক্যের সহিত অপর গুণের অল্পতা স্বাভাবিক। যে নদী প্রচণ্ড প্রবাহ লইয়া জন্ম ছুটিয়াছে, স্বভাবতঃ তাহার গভীরতা অল্প। কিন্তু যে নদী স্থির গম্ভীর আড়ম্বর বিরহিত, তাহারই গভীরতা অধিক। কার্য্য ও কলা জগতেও এই স্বাভাবিক নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। যে কবি ভাষার স্রোতে ছুটিতে চাহেন, মধুর বচন চয়ন ও ললিত ছন্দ রচনাই যাঁহার লক্ষ্য, তাঁহার রচনায় ভাবের গভীরতা প্রায়ই বিরল। আবার যিনি কেবল ভাবের গম্ভীর সাগরে ডুবিয়া পড়েন, তাঁহার ভাষায় চাকচিক্যের ও আড়ম্বরের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

এই ভাবের গভীরতা এবং ভাষার চাকচিক্য ও আড়ম্বরের মধ্যে কোনটীকে আমরা অধিক সমাদর করিব। মধুর বয়ন ও ললিত ছন্দে রচিত ভাবহীন কাব্য ও ভাবপূর্ণ আড়ম্বরবিরহিত ভাষায় রচিত কবিতার মধ্যে কাহাকে অধিক মূল্যবান বলিব! দেবীশূন্য অভ্রচুম্বি মর্ম্মর মন্দির ও তরুতলে অনুচ্চ মৃত্তিকা বেদির উপর অনাড়ম্বরে প্রতিষ্ঠিত দেবী উভয়ের মধ্যে কাহাকে অধিক মর্য্যাদা করিব। প্রাণহীন দেহের মূল্য কি? তাহা যতই সুন্দর ও সুঠাম হউক, সজীব দেহের সমাদর কখনই লাভ করিতে পারে না। ভাবই প্রাণ, ভাষা তাহার দেহ। প্রাণের মূল্য যে দেহের অপেক্ষা অনেক অধিক, তাহা কাহাকেও বুঝাইবার প্রয়োজন নাই।



হের অঙ্গহীনতা বা বিফলতা সহা যায়। কিন্তু প্রাণের বিফলতা মৃত্যু। ণকেই আমরা অধিক সমাদর করিব। কবির ন্যায় চিত্রকর যে শক্তিতে জ রচনায় প্রাণ সন্নিবেশ করেন, সেই শক্তিই তাঁহার শ্রেষ্ঠ শক্তি; যে ক্তিতে দেহ গড়িয়া তোলেন, তাহা তাঁহার শ্রেষ্ঠ শক্তি নহে। তবে দেহ নার শক্তিরও মূল্য আছে, তাহাকেও একবারে উপেক্ষা করা চলে না। হ না থাকিলে প্রাণ দাঁড়াইবে কোথায়!

যে দিক দিয়াই দেখি ভাব ভাষা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াই প্রমাণিত হয়। ব অসীম—অনন্ত; ভাষা সীমাবদ্ধ—সান্ত। ভাষা সীমাকেই দেখাইয়া য়, ভাব অসীম—অনন্তের দিকে লইয়া চলে। কার্য্যের ন্যায় চিত্রে যতক্ষণ মরা ভাষাকেই প্রাধান্য দেই, ততক্ষণই বন্ধনের ভয়ে ব্যাকুল থাকিতে হয়, দ পদে সীমা আসিয়া অগ্রসরের পথে বাধা দিতে থাকে, কিন্তু যখনই মরা ভাবকে সিংহাসন দান করি, তখনই আমরা মুক্ত—তখনই সকল মার প্রাচীর অন্তর্হিত হয়, আমরা অবলীলাক্রমে অসীম অনন্তের পথে ছুটাইয়া দিতে সক্ষম হই। মুক্তিতেই জীবন, বন্ধনে কেবল মৃত্যু। যে ত্রকর ভাবকেই প্রধান স্থান দেন, তিনিই কেবল সজীব চিত্র সৃষ্টি করিতে ম। যাঁহার ভাবকে প্রাধান্য দিবার শক্তি নাই, তাঁহার চিত্র নির্জ্জীব—ণহীন। প্রাণ দেওয়া দেবতার কাজ, প্রাণহীন পুতুল মানুষেই গড়িয়া কে। তাই প্রাণ দিতে হইলেই ধ্যানস্থ হইয়া অন্তরাত্মাকে জাগ্রত করিয়া হার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। যখন তাঁহাকে জাগ্রত করিবার ক্ষমতা মাদের থাকে না, তখনই মানসিক শক্তি লইয়া হাতের সাহায্যে নির্জ্জীব ড়পদার্থ রচনা করি। ভাবে দৈবশক্তির বিকাশ, ভাষা মানবিক শক্তিরই রিচয় দেয়। ভাব স্বর্গীয়, ভাষা পার্থিব।

আমরা ভাষার ত্রুটি দেখিয়াই চিত্রকে অবজ্ঞা করিব না। অবয়বের টি সত্ত্বেও যে প্রাণ থাকিতে পারে, তাহা বিস্মৃত না হইয়া, সেই প্রাণের নুসন্ধান করিব। বাহির হইতে মন্দিরের মলিনতা দেখিয়া হতাশ হইবার ন কারণ নাই। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিতে হইবে, দেবী আছেন না। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া হয়ত আমরা দেখিব যে, অভ্যন্তরে দেবী হার পূর্ণ বিভায় বিরাজ করিতেছেন ও তাঁহার স্বর্গীয় জ্যোতিতে মন্দিরের

সকল তুচ্ছ ত্রুটি অন্তর্হিত হইয়াছে; পূর্ব্বে যাহাকে লতা-গুল্মাবৃত ধ্বংসস্তূপ বলিয়া বোধ হইতেছিল, তাহা স্বর্গীয় জ্যোতিতে বিমণ্ডিত হইয়া স্বর্ণ মন্দির বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে।

ভাষার ত্রুটি ভাবের জ্যোতিতে ঢাকা পড়িয়া যায়। ছন্দ ভঙ্গ হইলে কবিতা শ্রুতিকটু দোষে দুষ্ট হইয়া পড়ে; কিন্তু, যদি তাহাতে আমরা ভাবের গভীরতা দেখিতে পাই, সে যদি তাহার ভাবের স্রোতে আমাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে, তবে ছন্দের তুচ্ছ ত্রুটি আর আমাদের কাণে বাজে না, তখন এমন কি, ছন্দবিহীন পদ্যকেও আমরা কাব্য নামে অভিহিত করিতে পারি। চিত্রেও ঠিক তাই। তাহার ছন্দে, তাহার রেখা পাতের ছন্দে, তাহার রঞ্জনের ছন্দে যদি কোন ত্রুটি থাকে তবে চিত্রটী তত নয়ন-তৃপ্তিকর না হইতে পারে, কিন্তু যদি তাহাতে ভাবের অস্তিত্ব দেখিতে পাই—ভাব যদি তাহার বিস্তৃত পাখার উপর বহন করিয়া আমাদিগকে ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধে লইয়া চলে—তখন জড় জগতের কথা আর আমাদের মনে থাকে না, তখন অবয়বের তুচ্ছ ত্রুটি আমাদের দৃষ্টি হইতে অদৃশ্য হইয়া যায়।

একটী উদাহরণ দেই; ওই সম্মুখে আপনার একটী চিত্র। চিত্রের এক ধারে একটী কুটীর, তাহার সম্মুখে দুইটী ঘনপল্লবাচ্ছাদিত সতেজ তরু। ওই তরুদুটীর তলে বসিয়া কে এক জন বাঁশী বাজাইতেছে। অপর দিকে বিস্তৃত প্রান্তরের মাঝ খানে কেবল এক মাত্র জরাজীর্ণ বৃক্ষ কঙ্কালবৎ বিশুষ্ক শাখা লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; দূরে—বহুদূরে ওই বিস্তৃত প্রান্তরের শেষ সীমায় আকাশের সাথে মিশিয়া অস্পষ্ট ভাবে নীল গিরিশ্রেণী দেখা দিতেছে। চিত্রটীতে রঙ্গের বড় চমক নাই। আকাশে ওই বৈচিত্র্য-বিহীন ঈষৎ নীলাভ বর্ণ; কেবল জরাজীর্ণ বৃদ্ধ তরুটীর মাথার উপর এক খানি কাল মেঘ কিছু ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছে। কোন বিচিত্র বর্ণ ওই আকাশমণ্ডলকে উজ্জ্বল ও মনোহারী করিয়া তোলে নাই। সূর্য্যাস্তের গলিত স্বর্ণে তাহা বিমণ্ডিত নহে। চাঁদিনী যামিনীর রজতরাগে তাহা রঞ্জিত হয় নাই। ঘনপল্লবাচ্ছাদিত তরু দুটীকেও এক গাঢ় হরিৎবর্ণ ছাইয়া রহিয়াছে। বিচিত্র বর্ণে তাহাও চিত্রিত নহে। মাঠে মরুর উদাস রঙ্গ লিপ্ত। স্বর্ণ শস্যের বর্ণ সেথায় ফুটিয়া নাই। শ্যামল মখমলে ছড়ান নীহার মুক্তার বিচিত্র চমক তথায় বিকাশ



পাইতেছে না। চিত্রটীতে চিত্রকর নিজ রঙ্গ ফলাইবার বাহাদুরীর কোন পরিচয় দেন নাই। অঙ্কন-কুশলতারও বিশেষ পরিচয় চিত্রে দেখি না। গাছের শাখা, কাণ্ড, পল্লব কিছুই স্বাভাবিক ভাবে আঁকা হয় নাই। রেখা সবই অস্পষ্ট। গাছদুটী শিরীষ কি বকুল বোঝা দায়। প্রতি প্রেক্ষিতের নানারূপ দোষ ঘটিয়াছে। মোটের উপর চিত্রটীর অবয়বের এমন কিছু রূপ নাই যাহাতে আমাদের নয়নকে তৃপ্তি দান করিতে পারে। কিন্তু আমরা কি ওই অবয়বের ত্রুটি দেখিয়াই মুখ ফিরাইব! আঁখিকে যে তৃপ্তি দান করিতে পারে নাই, সে কি হৃদয়কে তৃপ্তি দান করিতে পারে না?

দেখিতেছি চিত্রের একদিকে যৌবনের উৎসব-বাঁশরী বাজিতেছে; অপর দিকে বৃদ্ধত্বের জরাজীর্ণের করুণ মৌনতা। যৌবন ও জরার মধ্যে যে প্রভেদ, যৌবন ও জরার প্রভেদের মধ্যে যে শিক্ষা, তাহাই ফুটাইয়া তুলিবার উদ্দেশ্য লইয়া - সেইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, চিত্রকর ঐ চিত্রটী আঁকিয়াছেন। তাই ওই ঘনপল্লবাচ্ছাদিত তরু দুইটীর অবয়বের যথাযথ আলেখ্য আঁকিতে তিনি প্রয়াস পান নাই। তিনি তাহাদের হৃদয়ে যে যৌবনের উৎসব-বাঁশরী বাজিতেছে, তাহাই ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যুগলরূপে তাই তাহাদিগকে কুটীর রূপ সংসার-প্রাঙ্গনে রোপণ করিয়াছেন ও তাহাদের তলদেশে বসিয়া যে বাঁশী বাজাইতেছে, তাহাকে তাহাদের আত্মার প্রতিমূর্ত্তি রূপেই প্রকাশ করিয়াছেন। অপর দিকে ওই বৃদ্ধ তরুটীর ত্বকের রেখা ও রঙ্গের পরিচয় এমন কিছুই দিতে প্রয়াস পান নাই, যাহাতে আমরা বুঝিতে পারি যে বৃক্ষটী অশ্বত্থ বা পর্কটী, কিন্তু তাহার হৃদয়ের উদাস করুণ ভাবটী তাহার বিশুষ্ক শাখার, তাহার প্রতি অঙ্গে, তাহার চারিভিতে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই জরা ও বার্দ্ধক্যের দিনে সংসারের শ্যামলতা—আনন্দ উৎসব তাহাকে আর ঘেরিয়া নাই। তাহার চারিদিকে আজ সীমা-শূন্য মরুময় প্রান্তর। আজ সে নিঃসঙ্গ—একা। মাথার উপর কালমেঘরূপী মৃত্যু যেন তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। এই দুর্দ্দিনে সে যেন কাহারও কোন সহায়ের অন্বেষণে চারিদিকে কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। চারিদিক শূন্য, কোন সহায়ই দেখা যায় না। কেবল ওই বিস্তৃত মরুময় প্রান্তরের শেষে, ধরা ও স্বর্গের সম্মিলনস্থানে ওই দাঁড়াইয়া কে! বড়ই

অস্পষ্ট—ভালরূপ চেনা যায় না, কিন্তু যেন বোধ হয় অতি মহান্। সেই অস্পষ্ট—যাঁহার যথার্থ স্বরূপ আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু যাঁহার মহত্ত্ব সেই অস্পষ্টতার মধ্যেই আমরা দেখিতে পাই—তাঁহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া—তাঁহাকে এক মাত্র সহায় জানিয়া যেন ওই জরাজীর্ণ বৃদ্ধ তরুটী তাহার কাল অপেক্ষা করিতেছে।

যৌবনে অসীমের, অনন্তের দিকে আমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারি না। সীমাবদ্ধ সংসারের উচ্চ প্রাচীর আমাদিগের দৃষ্টি রুদ্ধ করিয়া দেয়। আমরা ওই চিত্রের কুটীররূপ সংসার প্রাঙ্গনে আবদ্ধ থাকি ও যুগল-যৌন-জীবনের উৎসব বাঁশরী, যাহা আমাদের হৃদয়ে বাজিতে থাকে, তাহারই সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া রই। কিন্তু যখনই জরা আসিয়া দেখা দেয়, যখন অঙ্গের ঘন পল্লবগুলি একে একে খসিয়া পড়ে, যখন হৃদয়ে যৌবনের উৎসব বাঁশরী থামিয়া যায়, যখন নিঃসঙ্গ হইয়া ওই বৃদ্ধ বৃক্ষের ন্যায় বিশুষ্ক শাখা লইয়া দাঁড়াই, তখন দেখিতে পাই সংসারের সকল প্রাচীর একে একে খসিয়া পড়িতেছে, কুটীর ধূলিসাৎ হইয়া কোথায় মিশিয়া গিয়াছে, সীমাবদ্ধ শ্যামল কুটীরপ্রাঙ্গন সীমাশূন্য মরুময় প্রান্তরে পরিণত হইয়াছে। তখন সেই সীমাশূন্য বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে একা দাঁড়াইয়া সকল অবরোধের প্রাচীর হইতে অব্যাহতি পাইয়া আমরা অসীমের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে সক্ষম হই। তখনই আমরা সেই অসীমের সীমায়, অসীমের সীমা-নির্দ্দেশ কর্ত্তাকে, চিত্রের দূর বিস্তৃত সীমাশূন্য প্রান্তরের শেষ ভাগে অবস্থিত অস্পষ্ট গিরির মত অস্পষ্ট কিন্তু অতি মহানকে দেখিতে পাই।

চিত্রটীর ভাবের স্রোতে ভাসিয়া আমরা বহুদূরে চলিয়া আসিয়াছি। জড়দেহের তুচ্ছ ত্রুটি আমাদের চক্ষে পড়ে নাই। যতক্ষণ মন্দির অভ্যন্তরে প্রবেশ করি নাই, ততক্ষণই আমরা তাহাকে বিকলাঙ্গ লতাগুল্মাবৃত দেখিয়া অনাদর করিতেছিলাম, যখনই ভিতরে প্রবেশ করিলাম, তখনই দেখিলাম দেবী তাঁহার পূর্ণ বিভায় বিরাজ করিতেছেন ও নিজ স্বর্গীয় জ্যোতিতে মন্দিরের সকল মলিনতাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছেন।

শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ।

---



# দুটী কথা।

দ্বিজেন্দ্রলাল সুপণ্ডিত, সুগায়ক, সুকবি, কিন্তু তাঁহার প্রধান শত্রু তিনি নিজে, আর তাঁহার টীকাকার, ভাষ্যকার মল্লিনাথ। দিনান্তে একটিবারও যদি একাকী নির্জ্জনে বসিয়া তিনি নিজের বিষয় সম্যক্‌রূপে পর্য্যালোচনা করিবার অবসর পাইতেন, তাহা হইলে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন "হে ভগবন্, আমাকে আমার নিজের হাত হইতে ও আমার বন্ধুটীর হাত হইতে রক্ষা কর!"

যদি আমাদের বিশেষ ক্ষতির আশঙ্কা না থাকিত, তাহা হইলে এই প্রবন্ধ লিখিয়া তাঁহাদের বিরাগভাজন হইবার জন্য অগ্রসর হইতাম না। কিন্তু দ্বিজেন্দ্র বাবুর সহিত বঙ্গ-সাহিত্যের ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে। তাই দিন থাকিতে দুটা কথা বলিতে চাই। "প্রবাসী"র সমালোচকের মত "এখনো সাবধান!" বলিয়া তর্জ্জনী উত্তোলন করিতেছি না।

"আষাঢ়ে" ও "হাসির গানে"র কবি দ্বিজেন্দ্রলাল বঙ্গ-সাহিত্যে নূতন রসের সঞ্চার করিয়াছিলেন। গোঁড়া হিঁদুয়ানির রসিক কবি ঈশ্বরগুপ্তের সাহিত্যিক প্রপৌত্র বলিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিয়াছিল; তাহারা ভুল বুঝিয়াছিল। যখন গোঁড়ামির সহিত একাকী রবীন্দ্রনাথ যুঝিতেছিলেন, তিনি তাঁহার সহিত যোগ দিলেন, গোঁড়া হিঁদুয়ানির উপর বিদ্রূপবান বর্ষণ করিলেন; "queer amalgam of শশধর, Huxley and goose,"—তাঁহার বর্ণনায় মৌলিকত্ব আছে বৈ কি?

তিনি গান গাহিবেন, আমরা শুনিব ও হাসিব, তাঁহার সঙ্গে আমাদের এইরূপ সম্বন্ধই যেন পাকাপাকি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মুক্ত আকাশপথে স্বাধীন গগনবিহারী পাখীর স্বরলহরী যেমন আপনা-আপনি উচ্ছ্বসিত হইয়া কুঞ্জে কুঞ্জে মাঠে ঘাটে অমৃত বর্ষণ করে, আমাদের সাহিত্যাকাশে তিনিও তেমনি স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিবেন এই রূপ আশা করিয়াছিলাম।

তিনি parody লিখিতে আরম্ভ করিলেন; রবীন্দ্রনাথের ছায়ার মত তাঁহার অনুগমন করিলেন,—সাধারণ লোকের ন্যায় তাঁহাকে অনুকরণ করিবার জন্য নহে। রবি বাবু "তোমরা ও আমরা" লিখিলেন; তিনি

পাল্‌টা "তোমরা ও আমরা" লিখিলেন। যে Eternal feminine রবীন্দ্রনাথের চক্ষে অত্যন্ত রহস্যময় বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তিনি তাহাকে আমাদের বিশেষ পরিচিত সাধারণ গৃহস্থের সাধারণ গৃহিণীরূপে দেখাইলেন। তাঁহার সহজনৈপুণ্য আমাদিগকে মুগ্ধ করিল। আমাদের যেন বোধ হইল যে, কবিতাটি লিখিবার সময় তিনি নিজে হাসি সম্বরণ করিতে পারেন নাই; তাঁহার সরল কলহাস্যের স্রোতে আমরাও গা ঢালিয়া দিলাম। "সাধনা"য় যখন তাঁহার কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হইল, সম্পাদক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কি তাঁহার কবিতার এমন চমৎকার parody পাইয়া মুগ্ধ হন নাই?

রবীন্দ্রনাথ রামায়ণ মহাভারতের ঘটনাবিশেষ অবলম্বন করিয়া কয়েকটি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। বৃহস্পতিপুত্র কচ সহস্র বৎসর ধরিয়া শুক্রাচার্য্যের আশ্রমে থাকিয়া দৈত্যগুরুর নিকট হইতে সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ করিয়া সুরপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন; তাঁহার প্রবাসসহচরী দেবযানির নিকটে বিদায় লইতে গিয়া অভিশাপগ্রস্ত হইলেন। তথাপি—

আমি বর দিনু দেবি তুমি সুখী হবে,
ভুলে যাবে সর্ব্ব গ্লানি বিপুল গৌরবে।"

এই ক'টি কথা বলিয়া বৃহস্পতিপুত্র চলিয়া গেলেন। পুরাণের কচ রবীন্দ্রনাথের কাব্যে মলিন ও খর্ব্ব হয় নাই। "গান্ধারীর আবেদনে" জ্যোতির্ম্ময়ী নারীপ্রকৃতি চরম উৎকর্ষে পঁহুছিয়াছে। আর পুণ্য জাহ্নবীর তীরে সন্ধ্যা সবিতার বন্দনায় রত কর্ণবীর কি এক নূতন মহিমায় মণ্ডিত হইয়াছেন। আবার স্বর্গবাস যখন সমাপ্ত হইয়া আসিল, রাজার কণ্ঠের মন্দার মালিকা ম্লান হ'য়ে এল, রাজা চারি দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার আসন্নবিদায় কালেও দেবদেবীর চক্ষে অশ্রুর লেশমাত্র নাই, বিরহের ব্যথা কিছুমাত্র নাই; সেই দুঃখহীন, শোকহীন, ব্যথাহীন, অশ্রুহীন স্বর্গরাজ্য অত্যন্ত কঠিন, কঠোর, নির্ম্মম বলিয়া বোধ হইল, যেন সে স্থান পরিত্যাগ করিতে পারিলে একটু নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচা যায়;—মানবিকতার এমন করুণ চিত্র আমাদের সাহিত্যে বিরল। ঋষ্যশৃঙ্গের যোগভঙ্গের ভার যাহার উপর অর্পণ করা হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের সেই "পতিতা"র তুলনা আর



কোনও সাহিত্যে সহজে বাহির করা যায় না। কত দীর্ঘকাল ধরিয়া অহল্যা পাষাণরূপে ধরাতলে মিশিয়া নির্ব্বাপিতহোমাগ্নি তাপসবিহীন তপোবনচ্ছায়ে বৃহৎ পৃথ্বীর সঙ্গে এক হইয়া তাহাতে বিলীন হইয়াছিল; আজ শাপবিমুক্তা পাষাণী কুমারীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নির্নিমেষনয়নে চারি দিক নিরীক্ষণ করিতেছে; এইরূপ রসগন্ধস্পর্শশব্দময়ী ছায়ালোকবৈচিত্র্যময়ী ধরণী কি তাঁহার মনে কোনও স্মৃতি জাগাইয়া তুলিতেছে? কবি যেন এক বিপুল রহস্যান্ধকারে এই সদ্যপ্রবুদ্ধা নারীমূর্ত্তির সহিত বিশ্রব্ধালাপ করিতেছেন; হে অহল্যা, এই দীর্ঘ দিবস-যামিনী তুমি কি স্বপ্নে কাটাইয়াছিলে? যখন জননীর ক্রোড়ে লীন ছিলে তখন তাঁহার নিত্য-নিদ্রাহীন ব্যথা অনুভব করিতে পারিয়াছিলে কি? কবি সেই মূক অচঞ্চল নারীমূর্ত্তির নিকট হইতে তাঁহার প্রশ্নের কোনও উত্তর পান নাই; কেবল ধ্যানচক্ষে কল্পনালোকে যে সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই বঙ্গ-সাহিত্যের অঙ্গীভূত করিয়া আপনি ধন্য হইয়াছেন ও আমাদের দীন বঙ্গ-সাহিত্যকেও ধন্য করিয়াছেন। আর চিত্রাঙ্গদা? পৌরুষভাবাপন্না, পুরুষবেশপরিহিতা চিত্রাঙ্গদা? তাহার সুপ্তা নারীপ্রকৃতি পুরুষসিংহের সমক্ষে জাগিয়া উঠিল!

"এই পার্থ? কুরুবংশধর? আজন্মের
বিস্ময় আমার? কত দিন করিয়াছি
মনে, পার্থকীর্ত্তি করিব নিষ্প্রভ আমি
নিজ ভুজবলে! এই সেই পার্থবীর?"

দেবতার সহায়তায় এই পুরুষ সিংহকে জয় করিতে হইবে, কিন্তু পুরুষের ছদ্মবেশে নয়। তাঁহাকে পূজা করিতে হইবে,

'পূজার তরে হিয়া, উঠে যে ব্যাকুলিয়া,
পূজিব তারে গিয়া কি দিয়ে?'

দেবতার সহায়তায় রাজকুমার জয়ী হইল, কিন্তু ক্ষোভের সীমা রহিল না, —"অন্তরে বাহিরে মোর হয়েছে সতীন।" এই যে নিজের নারীত্ব উপলব্ধি করা, এই খানেই ত কবির রচনাচাতুর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে। Tennyson এর Princessএর মনে সমস্ত পুরুষজাতির উপর কি এক বিষম অবজ্ঞার ভাব বর্ত্তমান ছিল; ঘটনাচক্রে রাজকন্যা একটি পরের মেয়ে ক্রোড়ে

করিয়া, নিগূঢ় মাতৃস্নেহ ধাত্রীস্নেহ অনুভব করিল; আপনাকে সম্পূর্ণ-ভাবে উপলব্ধি করিবার যেটুকু বাকি ছিল, তাহা কয়েকটি সম্মুখযুদ্ধে আহত যুবকের সেবায় সম্পূর্ণ ভাবে বিকাশ পাইল। এই সেবাপরায়ণা নারীমূর্ত্তি, এই ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল্ ভাব, নবীনচন্দ্রের সুভদ্রায় দেখিতে পাই। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা এবং টেনিসনের রাজকন্যা উভয়েই মানব সমাজে পুরুষের পার্শ্বে নারীর স্থান এই কথা প্রচার করিল।

দ্বিজেন্দ্রলালও রবীন্দ্রনাথের ন্যায় বাল্মীকির মহাকাব্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। বাল্মীকির অহল্যা, রবীন্দ্রনাথের অহল্যা, তাঁহার হাতে পড়িয়া মাটি হইয়া গেল; দেবরাজ ইন্দ্র আমাদের এই পঙ্কিল মর্ত্ত্যলোকের বিলাসী জমিদারের চেয়েও বীভৎস চিত্রে অঙ্কিত হইল; অহল্যা জড়ভরত হইয়া গেল। লেখকের দোষ নাই। তাঁহার কবিপ্রতিভা আর রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান, তাহা তিনি নিঃসঙ্কোচে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া পাঠকপাঠিকাকে দেখাইয়া দিলেন। Oliver Wendel Holmes বলেন যে দুই শ্রেণীর লোক আছে, এক দলের কল্পনাশক্তি অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব; ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির বাহিরে যে কিছু আছে তা তাহারা ধারণা করিতে পারে না; একটি formula য় যদি কোনও মানুষকে প্রকাশ করিতে পারা যায়, তা হ'লে এই শ্রেণীর লোককে ২+২=৪ বলিলে বোধ হয়, ইঁহাদের শক্তির সম্যক্ পরিচয় দেওয়া হয়; তদ্রূপ আর এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহাদিগকে ক+খ=গ formula য় প্রকাশ করিতে পারা যায়। দ্বিজেন্দ্রবাবু বিশ্লেষণ করিয়া পাষাণীর জড়ভরত-তত্ত্ব বাহির করিয়া আমাদের সমক্ষে জাহির করিলেন; তিনি কোন্ শ্রেণীর লেখক তাহা আমাদের বুঝিতে আর বাকি রহিল না!

ব্যাপারটি যদি এই খানেই শেষ হইত, তাহা হইলে আমাদের আর কিছু বলিবার ছিল না। কিন্তু ভাষ্যকার মল্লিনাথটি হঠাৎ দ্বিজেন্দ্রবাবুর জয়ডঙ্কা বাজাইয়া আমাদের কর্ণপটহ ব্যথিত করিলেন, পাষাণীর ন্যায় কাব্য কোনও দেশে কোনও সাহিত্যে রচিত হয় নাই! ইহার আর টীকা করিব কি? পুস্তক খানির বিস্তৃত আলোচনা করিতে হইলে—"মানসী"র স্তম্ভ কলঙ্কিত করিতে হয়।



রামায়ণ হইতে তিনি "সীতা" নামক কাব্য প্রণয়ন করিলেন। সত্য কথা বলিতে কি, কাব্যখানি আমি পড়ি নাই, কিন্তু "প্রবাসী" পত্রিকায় তাহার ভাষ্য পড়িয়া আর মূল কাব্যখানি পাঠ করিবার বাসনা একেবারেই নাই। রামচন্দ্র অত্যন্ত অপরাধীর মত বসিয়া আছেন আর লব লম্বা লম্বা লেক্‌চার ঝাড়িতেছেন, "কি বোল্‌ব তুমি বাবা, তায় বয়সে বড়, তাই তোমাকে মাফ্ ক'র্ত্তে হ'চ্চে, নহিলে তুমি যে অন্যায় কাজ করেছ তার জন্যে দেখ লজ্জায় আমার মুখ লাল হ'য়ে উঠেছে, তোমার ছেলে ব'লে পরিচয় দিতে লজ্জা করে।" রামও সমস্ত দোষ কবুল্ ক'রে বসে আছেন, "বাবা লব, আমার দোষ হয়েছে, ঘাট হ'য়েছে।" তাঁহার ভাষ্যকার খুব জোর গলায় প্রচার করিলেন যে তিনি বাল্মীকিকে টেক্কা দিয়াছেন। অলমতিবিস্তরেণ।

* * * * *

এই বার আর একটি কথা তুলিতে চাই। এত দিন পরে হঠাৎ দ্বিজেন্দ্র বাবুর ভাব পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তিনি এক নূতন বুলি ধরিয়াছেন; সুনীতির দোহাই দিয়া আধুনিক গীতিকাব্যের, তথা রবীন্দ্রনাথের, অপবাদ ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। গত পূজার সময় পত্রিকাবিশেষে একটি ছবি বাহির হইয়াছিল, তিনি বাজপাখীর মত পক্ষ বিস্তার করিয়া রবীন্দ্রহংসের উপর ছোঁ মারিতেছেন, আর বলিতেছেন "সাহিত্যে দুর্নীতি!" এখন, একটি কথার উত্তর আমাকে কেহ দেবে কি? "ত্র্যহস্পর্শ" ও পাষাণী"র রচয়িতা হঠাৎ সাহিত্যে সুনীতির প্রচারক হইলেন কি করিয়া? লেখক যে স্বয়ং তৎসদৃশ সামান্য সাহিত্যসেবীর কথার জবাব দিবার জন্য আসরে অবতরণ করিবেন এমন আশা করি না; কিন্তু তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ (মাফ করিবেন, আমি তাঁহারই কথা চুরি করিয়া তাঁহার অনুচরদিগের প্রতি প্রয়োগ করিতেছি) যাঁহারা আছেন তাঁহারা এ রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে পারিবেন কি?

আরও একটি কথা। সাহিত্যে সুনীতির পরিমাপ কে করিবে? সুনীতির দিক দিয়া দেখিলে, তিনি যে "বঙ্গদর্শনে" সম্প্রতি "মোহিনী" নামক একটি ছোট গল্প লিখিয়াছেন, বঙ্কিমবাবুর ভাষায় বলিতে গেলে,

ওটির অগ্নি-পরীক্ষা হওয়া উচিত নয় কি? দুর্নীতির কথা ছাড়িয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করি, ঐ গল্পটিতে artএর সপিণ্ডকরণ হয় নাই কি? Drama লিখিয়া লিখিয়া ইদানীং বোধ হয় লেখকের হাতে কড়া পড়িয়া গিয়াছে, তাই একটি ছোট গল্প লিখিতে গিয়া একটি melodrama রচনা করিয়া বসিয়াছেন!

কিন্তু তিনি সুপণ্ডিত, প্রতিভাবান্ লেখক, কে তাহা অস্বীকার করিবে? তাঁহার এ অবস্থা দেখিলে, "হাসির গানে"র দ্বিজেন্দ্রলালকে হারাইয়া ফেলি ও তজ্জন্য কষ্ট অনুভব করি।

তিনি সুকবি, তিনি artist; artএর মাপকাটী আর সুনীতির মাপকাটি এক নয়, তা' তিনি জানেন। সেই জন্য শুধু artএর পক্ষ হইতে অনেক বিষয় আমাদিগের সমর্থন করা সম্ভব হয় না। পঞ্চবিংশতি বর্ষব্যাপী পরিশ্রম করিয়া মনীষী ফরাসি লেখক Rougon-Macquart পরিবার দুটিকে অবলম্বন করিয়া যে পুস্তকাবলী রচনা করিলেন, সুনীতির পক্ষ হইতে তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে সে গুলি দূষণীয় বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু অখণ্ডভাবে তাঁহার সমগ্র পুস্তকাবলী আলোচনা করিলে লেখকের লিপিনৈপুণ্য ও কল্পনার বিরাটত্ব অনুভব করিতে পারি। তিনি বলিতেন, নীতির দোহাই দিয়া art কে খর্ব্ব করিও না; কারণ সুনীতি দুর্নীতির পরিমাপ করিবার লোক পাওয়া সুকঠিন। ইতিহাস এই উক্তির সাক্ষ্য দিতেছে। সক্রেটিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ—যে তিনি এথেন্সের যুবকদিগকে দুর্নীতি শিক্ষা দিতেছেন; আজ্ঞা হইল—যে লোক দেশের ছেলেদিগকে অসৎশিক্ষা দেয় তাহার বিষপানে মৃত্যু হওয়া উচিত। য়িহুদি সমাজ যীশু খ্রীষ্টের ধর্ম্মপ্রচার বিষম দুর্নীতিপূর্ণ মনে করিয়া ক্রুশের ব্যবস্থা করিয়াছিল পুরাতন কথা ছাড়িয়া দি। উপরে যে ফরাসি লেখকের কথা বলিলাম তিনি যদি সাহিত্যের মধ্যে দুর্নীতির প্রস্রবন বহাইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি কাণ্ডজ্ঞানহীন, ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য, পাপী; তাঁহার নিকট হইতে চরিত্রবল আশা করা যায় না; কিন্তু যখন য়িহুদিবিদ্বেষী ক্যাথলিক্ সেনানায়কগণ য়িহুদি কাপ্তেন্ ড্রেফুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাকে পদচ্যুত ও দ্বীপান্তরিত করাইল, তখন সেই চার কোটি ক্ষিপ্ত ফরাসি নরনারীর মধ্যে একাকী



নির্ভীকভাবে দণ্ডায়মান হইয়া, সমাজ ভুলিয়া, সংসার ভুলিয়া, আত্মপক্ষ জয় পরাজয় ভুলিয়া, বজ্রনির্ঘোষে J'accusé বলিয়া অসত্যের বিরুদ্ধে, অধর্ম্মের বিরুদ্ধে কোন্ পুরুষসিংহ অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন? আর একজনের কথা বলিব। গ্রীক্‌চর্চ্চের পাদ্‌রিপুঙ্গব Pobiedonotzeff রুষিয়ার জারের সিংহাসনের পশ্চাৎ হইতে শব্দভেদি বাণ নিক্ষেপ করিলেন, আর কাউণ্ট্ টল্‌ষ্টি রুষ-সাম্রাজ্যের সীমান্তভাগে তাড়িত হইলেন; কোটি কোটি নর-নারী ভক্তিভরে অবনতমস্তকে টল্‌ষ্টির নিকটে দীক্ষাগ্রহণ করিতেছে; পাদ্‌রি ও সম্রাট কিন্তু বৃদ্ধের পুস্তকগুলিকে দুর্নীতিপুর্ণ বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন।

এখন, সত্য করিয়া বলুন দেখি আমাদের সাহিত্যে কোথায় দুর্নীতির লক্ষণ দেখা দিয়াছে, যাহাতে দ্বিজেন্দ্রবাবু ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিতে পারেন? অনেক কথা বলিবার রহিল, বারান্তরে বলিব।

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।

---

# বিশু দাদা।

( ৬ )

সতীশকে এমনভাবে সমাগত দেখিয়া নরেশ বাবুর কন্যা-শোক উথলিয়া উঠিল। যে সুমতিকে তিনি প্রাণের অধিক ভাল বাসিতেন, এখনও বাসেন, যাহার জন্য তিনি কি না করিয়াছেন, জীবনের অবশিষ্ট কটা দিন তিনি যে সুমতিকে লইয়া কাটাইতে চাহিয়াছিলেন, যাহার মুখের দিকে চাহিয়া তিনি সংসারের সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণা ভুলিয়া যাইতেন, সেই সুমতি তাঁহার স্নেহের বন্ধন অনায়াসে ছিন্ন করিয়া কোথায় চলিয়া গেল, একবার ভাবিল না তাহার এই ব্যবহারে তাহার স্নেহময় পিতা হৃদয়ে কি দারুণ আঘাত পাইবেন, সমাজে তাঁহার মুখ দেখাইবার পথ থাকিবে না, তাঁহার জীবন ঘোর অন্ধকারে চিরদিনের মত ডুবিয়া যাইবে। আর সতীশ;—সতীশ তাঁহার কেহ নহে। দরিদ্র ব্রাহ্মণের ছেলে লেখাপড়া শিখিবার জন্য তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, সামান্য কয়েক বৎসর তাঁহার স্নেহে প্রতিপালিত হইয়াছিল;

যে সতীশের সহিত তাঁহার রক্তের সম্বন্ধ নাই, সেই সতীশ কাজ কর্ম্ম ফেলিয়া নিজের কষ্ট উপেক্ষা করিয়া এই দুর্দ্দিনে, এই ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে ঝড় বৃষ্টির মধ্যে তাঁহার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিবার জন্য,—তাঁহার শোকে সান্ত্বনা দিবার জন্য আসিয়াছে। এ কথা চিন্তা করিয়া তাঁহার বুক ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল। হায় সংসার! হায় স্নেহ মমতা! এ সংসারে এমনই করিয়া আপনার জন পর হইয়া যায়, পর আপনার হয়!

নরেশ বাবু সতীশকে কোলের কাছে টানিয়া লইলেন। নিতান্ত বালকের মত সতীশ আজ তাঁহার বুকে মাথা দিয়া কাঁদিতে লাগিল। নরেশ বাবু সতীশকে কোলের মধ্যে করিয়া পরম শান্তি অনুভব করিতে লাগিলেন, তাঁহার হৃদয় ক্ষণেকের জন্য শীতল হইল।

বিশ্বনাথ এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল, কিন্তু যখন সে দেখিল সতীশের আহারাদির কথা নরেশ বাবু একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছেন, তখন সে ঘরের মধ্যে যাইয়া একটা লণ্ঠন জ্বালাইয়া রান্না ঘরের দিকে যাইবার উদ্যোগ করিল। তাহাকে বাহির হইতে দেখিয়াই সতীশ বলিল "বিশু দাদা, কোথায় যাও?"

বিশু। দেখি, তোমার আহারের ত একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে?

সতীশ। না বিশু দাদা, আমার মোটেই ক্ষুধা নাই, আমার খাইবার ইচ্ছাও নাই; তুমি বোসো, অনেক কথা আছে।

বিশু। কথা অনেক আছে তা জানি; কিন্তু তা বলে রাত্রিতে কি না খাইয়া থাকিতে আছে। সেই কখন কলিকাতা হইতে বাহির হইয়াছ; দুটো ভাতে ভাত চড়াইয়া দিই, তুমি নামাইয়া লইও।

সতীশ। না বিশু দাদা, তোমাকে কিছুই করিতে হবে না। রাত্রিতে আমি কিছুই খাবো না, কা'ল সকালে যা হয় দেখা যাবে। তুমি যেওনা, অনেক কথা আছে।

বিশ্বনাথ কি করিবে; সে তখন লণ্ঠনটা নিবাইয়া দিয়া আবার বারান্দায় আসিয়া বসিল।

সতীশ দেখিল নরেশ বাবু কিছুই বলিতে পারিতেছেন না, বুঝিলেন এ অবস্থায় কোন কথা বলা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। তাই সে নিজেই কথা



আরম্ভ করিল; বলিল "কাকাবাবু, কলিকাতায় যাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া ভালই করিয়াছেন। তা আমাকে আবার পত্র লিখিবার কি প্রয়োজন ছিল? বাড়ী আসিয়াই অমনি ভবেশকে লইয়া সেই রাত্রিতেই কলিকাতায় চলিয়া গেলেই পারিতেন। আমার পত্রের অপেক্ষা করা, আমাকে পত্র লেখা, এসব কিছুই ত আমি আবশ্যক মনে করি নাই। আর আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করাই বা কেন? আমি কি আপনার অপেক্ষা অধিক বুঝি? আপনি আমাকে যাহা আদেশ করিবেন তাহাই আমাকে পালন করিতে হইবে? আরও এক কথা,—"

নরেশ বাবু সতীশের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন "সতীশ, তোমাকে যে পর মনে করি তাহা ভাবিও না। এ সংসারে আমার বা ভবেশের যদি কেহ আপনার জন থাকে, আমাদের দুঃখ যদি বুঝিবার কেহ থাকে, তাহা হইলে সে এক তুমি। তুমি ছাড়া আমাদের সহায় আর কেহ নাই।

সতীশ। ও সকল কথা কেন কাকাবাবু? ও কথা থাক্; কা'ল সকালেই আপনাদিগকে লইয়া আমি কলিকাতায় যাইব। ঘরের জিনিস পত্র যাহা সঙ্গে লইতে হইবে তাহা আজই গোছাইয়া ফেলিতে হয়। একটি কথা কাকাবাবু, আমার মনে হয় বাড়ীখানা একেবারে ছাড়িয়া যাওয়া ভাল নয়। আপনাকে আমি আর দেশে আসিতে বলিতেছি না; কিন্তু ভবেশ যদি বাঁচিয়া থাকে, যদি সে কোন দিন মানুষ হয়, তা'হলে কি তার একবার পৈতৃক ভিটাটা দেখিবার জন্য ইচ্ছা হইবে না। আমি বলি কি, আপনি ও ভবেশ কা'ল আমার সঙ্গে কলিকাতায় চলুন। সেখানে বাসা করিবার কোন আবশ্যক দেখি না। আমার বাসা যদিও ছোট, কিন্তু তাতে আপনাদের কোন কষ্ট হইবে না; আপনারা গেলে না হয় আর একটা বড় বাসাই দেখিয়া লইব। বিশু দাদা বাড়ীতে থাকুক; মাসে মাসে খরচ পাঠাইয়া দিলে তাহার কোন কষ্টও হইবে না, বাড়ী ঘরও ঠিক থাকিবে। কি বল, বিশু দাদা?

বিশ্বনাথ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "তাইত মনে করেছিলাম ভাই! এই উঠানে দাদা দিদির সম্মুখে হরিনাম কর্‌তে কর্‌তে চোলে যাব তাইত মনে ছিল; কিন্তু তা আর হোলো কৈ। সকলে চোলে গেলে আর

আমি এখানে থেকে কি কোরবো, কার জন্য থাকবো। আর এক কথা; কাকাবাবু বুঝি তোমাকে কিছু লেখেন নাই। দেখ, আমি স্থির কোরেছি, আমি একবার দিদিকে খুঁজে দেখবো; দেশের মধ্যে যত গাঁ আছে সব জায়গা আমি খুঁজে দেখবো। একবার আমার দেখবার ইচ্ছা, আমাদের মায়া সে কাটিয়েছে কি না। যদি দেখি সে গা-ভাসিয়ে দিয়েছে তা হোলে তোমরা আমাকে যা কোরতে বোলবে যেখানে থাকতে বোলবে সেইখানেই আমি যাবো। আর যদি দেখি দিদি আমার শুকিয়ে গিয়েছে, কেঁদে আকুল হয়েছে তা'হলে তাকে আমি কোলে তুলে নেবো। ভাই সতীশ, সেই জন্যই তোমাদের সঙ্গে কয়েক দিনের মত কলিকাতায় যেতে চাই। দিদি কলিকাতাতেই আছে; আমি সকলের আগে কলিকাতাতেই যাবো। তুমি এতে অমত কোরো না, কাকাবাবু সম্মত হোয়েছেন।

সতীশ। কাকাবাবু সম্মত হোয়ে থাকেন তবে আমার আর আপত্তি কি। আচ্ছা, তাই হবে। কিন্তু বিশু দাদা, তুমি কি সব দিক ভেবে দেখেছ। মনের আবেগে যে কথা বোল্লে তা কি তুমি কাজে কোরতে পারবে?

বিশু। সতীশ ভাই! আমি লেখাপড়া জানিনে, আমি তোমাদের মত বুদ্ধি বিবেচনার ধার ধারিনে, কিন্তু তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি, আমি যা করতে চাচ্ছি, তা কি ঠিক নয়, তা কি করা উচিত নয়? আর সে কথা বোলেই বা কি হবে। তুমি জেনে রেখো, আমি যা মনে করেছি, তা আমি কোরবোই কোরবো। এতদিন যাকে কোলে পিঠে কোরে মানুষ করেছি, তাকে আমি এমন কোরে কিছুতেই ভাসিয়ে দিতে পারবো না। আমি একবার দিদিকে খুঁজে দেখবোই।

সতীশ বলিলেন "বেশ, তাই হবে। এখন জিনিস পত্র যা যা নিতে হবে গুছিয়ে নেও। আর বেশী জিনিষপত্র নিয়েই বা কি হবে; তোমাদের যা যা দরকার হবে তা আমিই কলিকাতায় গুছিয়ে দেবো।"

নরেশ বাবু তখন বলিলেন "দেখ সতীশ, তোমার বাসায় থাকতে আমার কোন আপত্তি ছিল না; কিন্তু তুমি বুঝতেই পারছো, আমি চির জীবনের মত অজ্ঞাত বাসে যাচ্ছি; সুতরাং কলিকাতা সহরের মধ্যে আমাকে লুকিয়ে



থাকতে দিতে হবে, আমার অস্তিত্ব ভুলে যেতে হবে। তুমি তোমারই বাসার নিকটে আমার জন্য একটা ছোট খোলার ঘর হয়, কি ঐ রকম একটা কিছু হয় ঠিক কোরে দিও, আর আমাকে গোটা দুই ছেলে পড়ানো ঠিক কোরে দিও, তা হোলেই চোলে যাবে; নিতান্ত যদি খরচের অভাব হয় তখন তোমার কাছে যাইতে আমার দ্বিধা বোধ হবে না একথা তুমি অবশ্যই জান। তোমার বাসায় দশ জন লোক আসা যাওয়া করে, সেখানে দশ জনের মধ্যে থাকতে আমি সম্পূর্ণ অসম্মত। আমার মনের অবস্থা বুঝে তুমি এতে সম্মত হোতে আপত্তি কোরো না।

সতীশ বলিলেন "সে যাহা হয় কলিকাতায় গিয়ে করা যাবে, সে চিন্তা এখন কোরে লাভ নাই। কা'ল সকালেই যেতে হবে।"

নরেশ বাবু "তাতে আমার কি আপত্তি আছে, আমি এখনি যেতে প্রস্তুত।" এই বলিয়া তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

তখন বিশ্বনাথ বলিল, "কাকাবাবু, কালই যদি যেতে হয় তা'হলে একবার সরকার মশায়ের সঙ্গে আজই দেখা কোরে আসা উচিত।"

নরেশ বাবু বলিলেন, "বিশু তুমি ঠিক কথা বলেছ। লণ্ঠনটা জ্বাল দেখি, আমি একবার সরকার বাড়ী থেকে ঘুরে আসি।"

নরেশ বাবু সরকার মহাশয়ের বাড়ীতে যাইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া তুলিলেন এবং আগামী কল্য প্রত্যুষেই যে তিনি কলিকাতায় যাওয়া স্থির করিয়াছেন, সে কথা সরকার মহাশয়কে বলিলেন। বৃদ্ধ সরকার মহাশয় প্রথমে অনেক আপত্তি করিলেন; শেষে তিনি যখন দেখিলেন যে, নরেশ বাবু দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়াছেন, তখন তিনি বলিলেন, "তা বেশ, একবার কলিকাতা ঘুরেই এসো। মনটা খারাপ হয়েছে, দুই চারি দিন ঘুরে বেড়ালেই মনটা ঠিক হবে, তখন আবার বাড়ী আসবার জন্য মন কেমন কোরবে। তা যাও; ঘর দুয়ার গুলো আমিই দেখবো। জিনিস পত্র ভাল কোরে তুলে রেখে যেও; চাবিগুলো সকাল বেলায় আমাকে দিয়ে যেতে ভুলো না। তার পর যখন আসবার ইচ্ছা হবে, তার দুই একদিন আগে আমাকে একখান পত্র লিখো আমি ঘর দোর পরিষ্কার কোরে রাখবো। এখন যাও, অনেক রাত্রি হয়েছে; আমি খুব ভোরে উঠেই তোমার বড়ীতে যাবো।"

নরেশ বাবু বিদায় হইয়া বাড়ীতে আসিলেন। সে রাত্রিতে আর কাহারও নিদ্রা হইল না; বিশ্বনাথ সেই অন্ধকারেই নদীর ঘাটে যাইয়া একখানি নৌকা ঠিক করিয়া আসিল এবং মাঝাদিগকে অতি প্রত্যুষে আসিবার জন্য বলিয়া আসিল।

তাহার পর জিনিসপত্র বাঁধা আরম্ভ হইল। সতীশ যতই বলে "ও সকল নিয়ে কাজ নাই" বিশ্বনাথ ততই এটা ওটা বাঁধিতে লাগিল; নরেশবাবু বসিয়া বসিয়া বিশ্বনাথের কার্য্য দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মনের মধ্যে তখন কি যে হইতেছিল তাহা লেখনীমুখে ব্যক্ত করা অসম্ভব।

রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই বিশ্বনাথ আবার ঘাটে গেল এবং মাঝি দিগকে সঙ্গে লইয়া আসিল। এ দিকে সরকার মহাশয়ও আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

যাত্রার সময় উপস্থিত হইল। নরেশবাবু সরকার মহাশয়ের পদধূলি গ্রহণ করিলেন; সরকার মহাশয় আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন "নরেশ, শরীরের উপর দৃষ্টি রাখিও। ভবেশের পড়া শুনার একটা ব্যবস্থা করিয়া দিয়াই বাড়ীতে আসিও। স্কুলের চাকুরীটা একেবারে ছাড়া উচিত নয়; আমি চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে আজই দেখা কোরে তোমার মাস তিনেকের ছুটী মঞ্জুর করিয়ে দেবো। তুমি কলিকাতায় গিয়েই একখানা ছুটীর আরজী পাঠিয়ে দিতে, ভুলো না। বুড়ো মানুষের কথা অগ্রাহ্য কোরো না, দেশের মায়া ত্যাগ কোরো না।"

ভবেশ ও বিশ্বনাথ সরকার মহাশয়কে প্রণাম করিয়া যাত্রা করিল। তখনও গ্রামের লোক জাগিয়া উঠে নাই। পূর্ব্বের দিক্‌টা একটু লাল হইয়াছে, দুই চারিটী পাখী ডাকিতেছে। সেই সময়ে এই ক্ষুদ্র দল নদীর তীরে গেল, সরকার মহাশয় নরেশবাবুর নিষেধ না শুনিয়া তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। সকলে নৌকায় উঠিলেন। মাঝীরা নৌকা ছাড়িয়া দিল, বৃদ্ধ সরকার মহাশয় এক দৃষ্টে নৌকার দিকে চাহিয়া রহিলেন। নরেশবাবু নৌকার বাহিরে দাঁড়াইয়া তাঁহার প্রিয় জন্মভূমির দিকে চাহিয়া রহিলেন, অশ্রুজলে তাঁহার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। এই তাঁহার জন্মভূমি—আজ কত কষ্ট, কত দুঃখ বুকে লইয়া তিনি তাঁর কত সাধের জন্মভূমি ছাড়িয়া



যাইতেছেন; আর এ দেশে আসিবেন না—আর ঐ গাছগুলি দেখিবেন না; আর পরমাত্মীয়গণের স্নেহ সম্ভাষণ শুনিবেন না—আর না, আর না!

নরেশবাবুর মনে তখন কত কথা উঠিল; সুদীর্ঘ জীবনের কত সুখ, কত আনন্দ, কত আশা, কত নিরাশার চিত্র তাঁহার হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিল। বাল্যকালে তৃতীয় ভাগ পদ্যপাঠে পড়িয়াছিলেন,—

বিশাল বারিধি-বক্ষে বহিত্র বাহিয়া,
কর্ণধার নির্ভীক অনেক দেশে যায়,
কিন্তু সুস্থ চিত্তে নহে রহে কোথা গিয়া,
নিরখিতে সেই ভূমি চিত সদা চায়।"

সেই কথা আজ তাঁহার মনে হইল। মনে হইতে লাগিল,

"Home, home, sweet home
There is no place like home."

তাঁহার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল, তাঁহার বুক ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি চারি দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার গ্রামের ঘাট, ঘাটের উপরের ভগ্ন মন্দির, মন্দিরের পার্শ্বের তালের গাছ অদৃশ্য হইতে লাগিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল দূরের ঐ গাছগুলি, ঐ মন্দির, ঐ ঘাট যেন তাহাকে ডাকিতেছে,—

"এস, এস, ফিরে এস;
ওগো, ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত পান্থ
ঘরে এস, ফিরে এস।"

নরেশ বাবু তখন আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না; কাতর কণ্ঠে ভাগিরথীর বক্ষের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মাগো,—কি কর্‌লি মা!" নরেশ বাবু দুই হাতে মাথা ধরিয়া নৌকায় বসিয়া পড়িলেন। ভাঁটার টানে নৌকা কলিকাতার দিকে ছুটিতেছিল। ( ক্রমশঃ )

শ্রীজলধর সেন।

---

# মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

মৃণ্ময়ী, জ্যৈষ্ঠ। "বৈষ্ণব তত্ত্বের আভাসে" লেখক অনেক অনাবশ্যক কথা কহিয়াছেন। "গীতগোবিন্দ" শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার কৃত গীতগোবিন্দের অনুবাদ; মাঝে মাঝে টিপ্পনীগুলির আবশ্যকতা কি? এমন বেতালা বেসুরো ছন্দের চেয়ে অনুবাদটি গদ্যে লিখিলে শতগুণে ভাল হইত। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির "আসামের ও উৎকলের বঙ্গভাষা" বহুতথ্যে পূর্ণ। লেখক বলিতে চান্—বাঙ্গালা ও আসামী ভাষায় অনেক প্রভেদ আছে সত্য, কিন্তু তাহারা বিভিন্ন জাতীয় নয়। গল্পটি ভাল লাগিল না।

উপাসনা, ফাল্গুন। "কর্ম্ম ব্রহ্মবিচার" এই সংখ্যায় শেষ হইয়াছে। "সংস্কৃত ভাষাই সমস্ত আর্য্য ভাষার আদি জননী" শীর্ষক প্রবন্ধে যেমনি শিরোনামা, তেমনি ভাষা, তেমনি পাণ্ডিত্য। রচনায় একটু বিনয়ের ভাব থাকিলে বোধ হয় লেখকের পাণ্ডিত্যের হানি হয় না। কাতারে বা "পশ্চিম দিগ্বলয়ের কোবিদবৃন্দকে" একেবারে টোল বা পাঠশালার নিরক্ষর ছাত্রের মত দেখিতে কাহারো সহ্য হইবে বলিয়া বোধ হয় না। "মেধসাশ্রমে" চণ্ডী ও শাক্তধর্ম্ম সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। "রাজা রামচন্দ্র খাঁ" ঐতিহাসিক প্রবন্ধ; এরূপ প্রবন্ধের আবশ্যকতা বড় অল্প নয়। "উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব" সুন্দর হইতেছে।

আর্য্যাবর্ত্ত, জ্যৈষ্ঠ। "নিরুদ্দেশ যাত্রা" গল্পটি তেমন ভাল বলিয়া বোধ হইল না। মূল বিষয়টা যেন সুসম্বদ্ধ হয় নাই—রচনানৈপুণ্যেরও অভাব দেখিতেছি। "মিলন" শীর্ষক কবিতা চর্ব্বিত-চর্ব্বণ ভিন্ন আর কিছুই নয়। "সোনাবিবি"—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত রচিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধ, চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "পাষাণের কথা"য় নূতনত্ব আছে। রচনাও সুন্দর। নীরস বিজ্ঞান এমন করিয়া সরসতার আবরণে রাখা কম কৃতিত্ব নয়। শ্রীরমণীমোহন ঘোষ রচিত "উষা" মন্দ লাগিল না।

প্রবাসী, শ্রাবণ। "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়"—৺অক্ষয়কুমার দত্তের "উপাসনা সম্প্রদায়" নামক সুবিখ্যাত পুস্তকের তৃতীয় ভাগ অপ্রকাশিত; তাহারই কিয়দংশ এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত হইয়াছে। সম্পাদকের ভাষায় "একজন খ্যাতনামা প্রাচীন লেখকের রচনা বলিয়া" ইহার বিশেষত্ব। "একটি মেহেদির পাতা" শ্রীচারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি চলন-সই গল্প, পাঠ করিলে রবিবাবুর "জয় পরাজয়" গল্পটিই মনে পড়ে। "রবীন্দ্রনাথের মানস-সুন্দরী" রচনায় লেখক কবিবরের মানসী-প্রতিমার প্রতি গভীর প্রেম ও শ্রদ্ধার ভাবটিকে সমালোচনার ভাষায় ফুটাইয়া তুলিতে যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা ব্যর্থ হয় নাই। "স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র" উল্লেখযোগ্য আলোচনা। "সংকলন ও সমালোচনা"র মধ্যে "কংফুশিয়ো কথামৃত" "ভাগ্যচক্র" "কলিয়ুগে গ্র্যাণ্ডডিউক বোরিসের সহিত শ্যামরাজ্য ভ্রমণ" "অভিনব সংশোধনাগার" ও "প্রকৃতির তিন রাণী" বিবিধ তথ্যপূর্ণ বলিয়া উল্লেখযোগ্য। "তাঁতি-পোকা"য় শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয়ের



একটি নূতন ও চিত্তাকর্ষক আবিষ্কারের কথা আছে। পোকাগুলি রক্ষা করিবার সুবন্দোবস্ত করিতে পারিলে আমরা তাঁহার নিকট অধিকতর কৃতজ্ঞ হইতাম। "দুর্দ্দিনে" শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের কবিতা—ভালই হইয়াছে। "সাহিত্যে সুরুচি" শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত মহাশয়ের একটি উল্লেখযোগ্য ও সময়োপযোগী আলোচনা। সম্পাদকীয় foot-note টুকু পড়িয়া বিস্মিত হইয়াছি। "লেখক মহাশয়ের যুক্তি" foot-note কারের বুদ্ধিতে কেন আসিল না, তাহা আমাদের বোধগম্য হইল না। একটি পৌরাণিক আদর্শ চরিত্রের একজন কবি যদি ভাল দিকটি চিত্রিত করেন, ও অন্য এক জন তাহার কুৎসিত দিকটি লোক-চক্ষুর সম্মুখে ফুটাইয়া তুলেন, তবে—আর কিছুর না হোক,—দ্বিতীয় কবির রুচির নিন্দা করিতেই হইবে। যদি বলেন, যে সমস্ত চরিত্রটি আঁকিতে গেলে ভালমন্দ উভয়দিকই ত দেখাইতে হইবে, তাহা হইলে আমাদের বক্তব্য এই যে, তুলিকাপাত সম্বন্ধে এরূপ সতর্ক হওয়া আবশ্যক, যাহাতে মন্দ দিকটা চক্ষের সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া আদর্শকে বীভৎস করিয়া না তুলে। দ্বিতীয় কবির চিত্রে অহল্যার চরিত্র ভাষার অসদ্ব্যবহারে এরূপ কদর্য্য হইয়া পড়িয়াছে, যে তাহাতে পাঠকমাত্রকেই লজ্জিত হইতে হয়। তারপর, সম্পাদক মহাশয়ের "লেখকের পরিচিত সকল সাহিত্যসেবীর মতকে অভ্রান্ত মনে করা যায় কি? তাঁহারা কে?"—এই প্রশ্নে বিস্ময় রাখিবার আর স্থান থাকে না। "পরিচিত সকল সাহিত্যসেবীর" মত অভ্রান্ত একথা কি প্রবন্ধকার বলিয়াছেন? এরূপ মুরুব্বিয়ানা-পূর্ণ প্রশ্নের অবসর কি প্রবন্ধকার সত্যই দিয়াছিলেন? তা ছাড়া "তাহারা কে?"—এই সদম্ভ প্রশ্নের উত্তর দিতে যাওয়া কি সত্যই উপহাসাস্পদ হয় না? ঘাটের উপর মনে হয়, সম্পাদক মহাশয় তাঁহার গুরুতর গাম্ভীর্য্যের ওজন রক্ষা করিবার প্রয়োজনেই তাঁহার অভিপ্রায়কে ব্যর্থ করিয়াছেন। প্রভাত বাবুর "নবীন সন্ন্যাসী" এবার একটা "টানাবোনা" ভাবে চলিয়াছে, তেমন সরস হয় নাই। শ্রীযুক্ত কবি রজনীকান্ত সেনের "ন্যায় বিচার" সাধকের ভক্তিরসে পূর্ণ। "চন্দ্রনাথ বসু" জীবনী আলোচনার যোগ্য। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুটি কবিতার মধ্যে "মাতৃ-অভিষেক"টি আমাদের খুবই ভাল লাগিল। পরিশেষে বক্তব্য যে, মাসিক পরিচালনে সম্পাদক মহাশয়ের কৃতিত্ব যে যথেষ্ট একথা স্বীকার করিলেও তাঁহার বর্ত্তমান 'সঙ্কলন ও সমালোচন'-ballast প্রবাসী-তরণীর পক্ষে গুরুভার হইয়া উঠিতেছে বলিয়া মনে হয়।

---

# মানসী

[ ৯ বর্ষ। ]　　ভাদ্র ১৩১৭ সাল।　　[ ৭ম সংখ্যা।

## নাম-গান।

গর্ব্ব করে' নিইনে ও নাম জান, অন্তর্যামী,
　　আমার মুখে তোমার নাম কি সাজে ?
যখন সবাই উপহাসে তখন ভাবি আমি
　　আমার কণ্ঠে তোমার গান কি বাজে ?
　　তোমা হ'তে অনেক দূরে থাকি
　　সে যেন মোর জান্‌তে না রয় বাকি,
নাম-গানের এই ছদ্মবেশে দিই পরিচয় পাছে
　　মনে মনে মরি যে সেই লাজে।

অহঙ্কারের মিথ্যা হতে বাঁচাও দয়া করে',
　　রাখ আমায় যেথা আমার স্থান।
আর-সকলের দৃষ্টি হ'তে সরিয়ে দিয়ে মোরে
　　তোমার নতদৃষ্টি কর দান।
　　আমার পূজা দয়া পাবার তরে,
　　মান যেন সে না পায় কারো ঘরে,
নিত্য তোমায় ডাকি আমি ধূলার পরে বসে
　　নিত্য নূতন অপরাধের মাঝে।

২২শে আষাঢ়,　　শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

# প্রেমে প্রতিদ্বন্দী।

"দিলুয়া আমাকে ভালবাসে না।"

রমণীয় একটী উপত্যকায়, ক্ষুদ্র অথচ পরিপাটী একখানি গৃহ। তাহার পশ্চাদ্দেশে দ্রাক্ষালতার কুঞ্জ সন্ধ্যাসমাগমের বহু পূর্ব্বে স্নিগ্ধ গোধূলির সৃষ্টি করিয়াছিল। বাতায়নে সুন্দরী নাইনু; বাতায়ন তলে নাইনুর প্রেমাভিলাষী যৌবনদৃপ্ত দিলুয়া ও মুন্না। তাহারা পঞ্চদশ পল্টনের সৈনিক। উভয়ের পৃষ্ঠদেশে বন্দুক, কটিতে ছুরি, পরিধানে খাকি ও মস্তকে উষ্ণীষ। নাইনু সরবৎ প্রস্তুত করিয়া তাহাদের দিতেছিল। দিলুয়াকে এক গেলাস সরবৎ দিবার সময় সে বলিল,—

"দিলুয়া আমাকে ভালবাসে না।"

তখন তাহার অধর কোণে হাসির আভাস দেখা দিল, ললাটের কুঞ্চিত কেশ দুলিয়া উঠিল এবং আঁখিতে বিদ্যুৎ খেলিল। দিলুয়া বেচারীর মুখখানি সন্ধ্যার মেঘের মত নিবিড় হইয়া উঠিল। সে সরবৎ লইয়া একমনে পান করিতে লাগিল। মুন্না তাহার সরবৎ একটুকু ছলকাইয়া নাইনুর চক্ষে দিল। সরবৎ খাইয়া দিলুয়া বলিল, "নাইনুর হাতের সরবৎ আজ হয়ত শেষ"—

"সত্যি, নাইনু, আজ হয়ত শেষ।" মুন্না এই কথা বলিয়া বাম হস্তে একবার চক্ষু রগড়াইল নাইনু দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

দিলুয়া বলিল, "আজ সন্ধ্যার পর যখন নাম ডাকা হইবে, তখন আমাদের না পাইলেই পরওয়ানা জারি ও হুলিয়া বাহির হইবে। কতক্ষণ পলাইয়া বাঁচা যাইবে? ধরা পড়িলেই শির মাটীতে লুটাইবে।"

মুন্না। "জীবনের এত মায়া,—ধেৎ।" নাইনু মুন্নার দিকে চাহিল। মুন্না দেখিল, নাইনুর ডাগর ডাগর চোখ দুটিতে স্থির, গভীর দৃষ্টি।

দিলুয়া বলিল "জীবনের মায়া নহে, মুন্না; তুই কি তাই বুঝ্‌লি? যে জন্য যা' কর্‌লাম, তাই যে মাটি হ'তে চল্‌ল। নাইনুকে যদি না পেলাম, তবে কিসের জন্য এত কর্‌লাম? আমরা যে এযাত্রা পার পাব, সে আশা মিছে।"

মুন্না। "একান্তই যদি জান দিতে হয়, তা' আর কি করা যাবে? নাইনু,



আমাদের জন্য একটু কাঁদ্‌বে। কাঁদবি না রে, নাইনু?" মুন্না দিলুয়া অপেক্ষা বয়সে ছোট।

নাইনু চোখ মুছিয়া ভাঙ্গা-ভাঙ্গা গলায় বলিল, "তোমরা আমাকে সেই বদমাইসটার হাত থেকে বাঁচিয়েছ, আমার জাত রাখিয়াছ, ধর্ম্ম রাখিয়াছ; আমার এ ছার প্রাণ দিলে যদি তোমাদের ভাল হয়, এখনই হাসিতে হাসিতে তাহা দিতে পারি। আমার কিনা বাপ ভাই কেউ নেই, তাই কাপ্তেনটা মনে করেছিল, এ ছুঁড়িটাকে চট করে' হাত করা যাবে। আরে, রাজপুতের মেয়ে কি অত সহজে মেলে! সে আমাকে বিয়ে কর্‌বে বলে' পাঠিয়েছিল; বালাই আর কি? তার গোরটা কোথায়রে মুন্না? আমাকে এক বার দেখিয়ে আন্‌তে পারিস্ ত' তার সঙ্গে ভাল করে' বিয়ে করে' আসি।"

মুন্না বলিল, "কাপ্তেন সে দিন যখন এদিকে আস্‌ছিল, তখন তার স্ফূর্ত্তি দেখে কে? ঝাউ বনের মধ্যে তখন একটু একটু অন্ধকার হয়েছে। দিলুয়া আগে ঠাহর করতে পারে নি। সে দিন লোকটার গতিক দেখেই আমি ঠিক কর্‌লাম যে, সে এই দিকেই আস্‌ছে। তুই যে রোজ সন্ধ্যাবেলায় ঝরণায় জল আন্‌তে যাস্, কাপ্তেন বোধ হয় সে খবর রাখ্‌ত। তাই অত পোষাকের বাহার, না দিলুয়া?

নাইনু একটু হাসিল। দিলুয়া মস্তক উন্নত করিয়া বলিল, "পহেলা গুলি আমার।"

মুন্না বলিল "আমি আগে হাঁক দিয়া তার সুমুখে গেলাম। আমার ইচ্ছা যে তাকে বন্দুক উঠাতে সময় দি। ঠিক সেই সময়ে তোমার গুলি দড়াম ক'রে তার বুকে লাগ্‌ল। আর তার পিস্তলটি অমনি হাত থেকে খসে পড়্‌ল। তখন আমি আর এক গুলি ঝেড়ে দিলাম। নেহাৎ কুকুরটার মত না মেরে ফেলে, তাকে পিস্তল বাগিয়ে নিতে অবকাশ দিলে ভারি মজা হ'ত।"

দিলুয়া বলিল, "আজ তা'হলে মুন্না আর নাইনুর হাতের সরবৎ খেতে আস্‌ত না। ঝাউবনে সব ফরসা হয়ে যেত।"

মুন্না বলিল, "ঈস্; যদি নেহাত তাই হ'ত, তাতেই বা ক্ষতি কি ছিল? একদিন আগে আর একদিন পিছে বইত নয়!"

"ছি, মুন্না" বলিয়া নাইনু প্রশংসাপূর্ণ নেত্রে দিলুয়ার দিকে চাহিল। বুঝিল সে দিন দিলুয়া না থাকিলে মুন্না মরিত।

অস্তরবির অংশুমালায় পর্ব্বত চূড়া ঝলসিয়া উঠিল। উপত্যকায় আসন্ন সন্ধ্যার ছায়া পড়িল। দিলুয়া পর্ব্বতচূড়ার দিকে চাহিল এবং অঙ্গুলি সঙ্কেতে মুন্নাকে দেখাইল। একজন সৈনিক দূরবীণ্ দিয়া পর্ব্বতচূড়া হইতে চতুর্দ্দিক দেখিতেছিল। মুন্না বলিল, "আর দেরি নয়, নাইনু তবে আসি।" এই বলিয়া নাইনুর হস্ত ধারণ করিয়া ছলছল নেত্রে তাহার দিকে চাহিল।

নাইনু চক্ষু মুছিল। বলিল, "আমি কোথায় থাক্‌ব? তোমরা আমার জন্য পথে পথে বেড়াবে, জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুর্‌বে, আর আমি ঘরে বসে' আরাম করব? আর তা'ও কি ওরা আমায় আরামে থাক্‌তে দেবে? হয়ত ধরে নিয়ে গিয়ে অপমান কর্‌বে। আমিও তোমাদের সঙ্গে যাই, চল।"

দিলুয়ার মুখ কালবৈশাখী মেঘের মত গম্ভীর ও অন্ধকার হইয়া আসিল। সে মুন্নাকে ডাকিল "চলে আয় মুন্না।"

মুন্না বলিল "সত্যি নাইনু, আমাদের সঙ্গে যাবি? তোর লোকেরা কিছু বল্‌বে না ত?"

দিলুয়া কঠোর স্বরে আবার ডাকিল "চলে আয়, মুন্না। নাইনু কোথা যাবে? নিজেদের মাথা রাখ্‌বার যেখানে এতটুকু যায়গা নেই, সেখানে নাইনুকে নিয়ে কোথায় রাখ্‌ব? তুই চলে আয়।"

"নাইনুর মাথা রাখ্‌বার যায়গা হবে না, বটে!" এই বলিয়া নাইনু জানালা হইতে অদৃশ্য হইল। এমন সময় দূর হইতে বিউগিলের কর্কশ নিনাদ শ্রুত হইল! বজ্রমুষ্টিতে দিলুয়া মুন্নাকে টানিয়া লইয়া গেল—যেখানে বাব্‌লা গাছের শাখায় তাহাদের ঘোড়া বাঁধা ছিল। মুন্না সতৃষ্ণ নয়নে বাতায়নের দিকে চাহিল। নাইনু সেখানে ছিল না। মুহূর্ত্তমধ্যে অশ্বক্ষুর-ধ্বনিতে উপত্যকা প্রতিধ্বনিত হইল। কিছুক্ষণ পরে আর একটি অশ্ব তাহাদের অনুবর্ত্তী হইল। ততক্ষণে পূর্ব্বোক্ত অশ্বদ্বয় দৃষ্টিসীমার বাহিরে গিয়াছিল। শেষোক্ত অশ্বে ছিল—নাইনু।

পাহাড়ের পর পাহাড়ের সারি যেখানে দৃষ্টিরেখাকে চতুর্দ্দিকে পরিচ্ছিন্ন করিয়াছে, নির্ঝরিণীর অবিরল ধারা যেখানে পর্ব্বতগাত্র নিষিক্ত করিয়া নিম্নে



হ্রদের সৃষ্টি করিয়াছে, যেখানে ঝাউ বাবলার নিভৃত কুঞ্জে মধ্যাহ্নের খররবির কর হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য পক্ষিকুল আশ্রয় লইয়াছে, সেইখান দিয়া দিলুয়া ও মুন্না মন্দগতিতে তাহাদের অশ্ব চালাইতেছিল। তাহারা সৈনিকের বেশ পরিত্যাগ করিয়াছিল; তবে অঙ্গরাখার নিম্নে ছুরি ও পৃষ্ঠে বন্দুক ঝুলাইতে ভুলে নাই।

সমসুখদুঃখভোগী, অনির্দ্দেশ্য পথের পথিক, একই রমণীর প্রেমাকাঙ্ক্ষী দুইজন যুবক আসন্ন মৃত্যুর ছায়ায় কি রহস্যময় বন্ধনে পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা তাহারাই জানে। উভয়েই জানিত যে তাহারা বিপদের অনল-কুণ্ডে এক সঙ্গে ঝাঁপ দিয়াছে। উভয়েই জানিত—অদৃষ্ট তাহার কুহেলিকাময় আবরণের অন্তরালে যে ফল সঞ্চিত রাখিয়াছে, তাহা উভয়কে তুল্যরূপে ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু সে জন্য তাহাদের মনে অশান্তি ছিল না। নাইনুর আশা আর তাহাদের নাই, চিরজন্মের মত তাহারা সেখানে বিদায় লইয়াছে। এখন তাহারা পর্ব্বতগহ্বরে, অরণ্যে, কান্তারে গান গাহিয়া, গল্প করিয়া, যদৃচ্ছালব্ধ আহারে পরিতৃপ্ত হইয়া সময় কাটায়। নাইনুর কথা উঠিলে মুন্নার চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিত, দিলুয়া ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া অন্যদিকে চাহিয়া থাকিত। মুন্না দিলুয়া অপেক্ষা বয়সে ছোট। বয়ঃকনিষ্ঠের প্রতি জ্যেষ্ঠের যাহা কর্ত্তব্য, দিলুয়া সুযোগ পাইলে সে কর্ত্তব্য করিতে ভুলিত না। দিলুয়া জানিত, মুন্না সংসারের কিছুই জানে না, সে বালক। তাহাকে চালাইয়া লইবার, তাহাকে আগ্‌লাইয়া রাখিবার ভার যেন কে তাহার বলিষ্ঠ সহিষ্ণু স্কন্ধে ন্যস্ত করিয়াছে, এমনই ভাবে সে চলিত। মুন্না পদে পদে অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিত, বিপদের সন্নিহিত হইত, দিলুয়া তাহাকে সাম্‌লাইয়া লইত। এমনই ভাবে সপ্তাহ কাটিয়া গেল।

একদিন অনেক পথ চলিয়া তাহারা শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। অপরাহ্নের স্নিগ্ধ বায়ু তাহাদের স্বেদসিক্ত কঠিন চর্ম্ম জুড়াইয়া দিতেছিল। সে দিন কিছু ফল ও ঝরণার জল ছাড়া আর কিছু তাহাদের জোটে নাই। উভয়ে বল্‌গা ছাড়িয়া দিয়া অশ্বের যদৃচ্ছাগতির উপর নির্ভর করিয়াছিল। ক্রমে তাহারা নিম্নে অবতরণ করিতেছিল। দুইটি অনুচ্চ পাহাড়ের মধ্য

দিয়া সুপ্রশস্ত লোহিতকঙ্করময় রাজপথ চলিয়া গিয়াছে। রাস্তার দুধারে তমাল, বকুল, শিশু ও সুপারি বৃক্ষের শ্রেণী রাজপথকে অতি স্নিগ্ধ ও রমণীয় করিয়া রাখিয়াছিল। অশ্বারোহীদ্বয় পক্ষিকুলের কলরবে মোহিত হইল। একটি স্তম্ভগাত্রে একখানি লিপি সহসা তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। উভয়ে তাহার নিকটে গিয়া দেখিতে পাইল, বড় বড় ছাপার অক্ষরে একখানি ঘোষণাপত্র সেই স্তম্ভগাত্রে বিলম্বিত রহিয়াছে।

পঞ্চদশ পল্টনের কাপ্তেনের হত্যাকারী দিলুয়া ও মুন্না নামে দুইজন পলাতক সৈনিককে জীবিত বা মৃত ধরিয়া দিতে পারিলে দশ হাজার টাকা পুরস্কার প্রদত্ত হইবে—এই ঘোষণা বাহির হইয়াছে। আসামীদ্বয়ের মধ্যে একজন অপরকে ধৃত করিয়া দিলে ক্ষমা এবং যথেষ্ট পুরস্কার পাইবে,এ কথাও তাহাতে লেখা ছিল। ঘোষণা পাঠ করিয়া দিলুয়া গম্ভীর হইল। মুন্না হাসিয়া উঠিল এবং অশ্বের উপর এক লম্ফে দণ্ডায়মান হইয়া ঘোষণাপত্রখানি ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। এইবার দৃঢ়মুষ্টিতে অশ্বের বল্গা ধরিয়া তাহারা আবার অন্য পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিল। অনেকক্ষণ তাহাদের মধ্যে কোনো কথাবার্ত্তা হইল না। মুন্না অগ্রে; দিলুয়া পশ্চাতে। দিলুয়ার অশ্বক্ষুর উপলে বাজিয়া হঠাৎ শব্দ হইলে মুন্না চমকিয়া উঠিল, এবং অশ্বের মুখ একেবারে ঘুরাইয়া দিলুয়ার সম্মুখীন হইল। উভয়ে অপ্রতিভ হইল। এইবার দিলুয়া আগে আগে চলিতে লাগিল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। পথভ্রান্ত বিলম্বিতগমন হংসের শ্রেণী সশব্দে তাহাদের মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল। উভয়ে চমকিয়া উঠিয়া কটিতে ছুরিকায় হস্তার্পণ করিল। দিলুয়া পশ্চাতে সচকিতে চাহিল। তাহাদের মনে যেন কোথাও এতটুকু সন্দেহ কণ্টকের মত থাকিয়া থাকিয়া বিঁধিতে লাগিল। আবার নিঃশব্দে উভয়ে পথ চলিতে লাগিল। ক্রমেই সে নিস্তব্ধতা অসহ্য হইল। মুন্না বলিল, "আজ জ্যোৎস্না উঠ্‌তে দেরি আছে।" দিলুয়া সে স্বরেও চমকিত হইল।

জড়িতকণ্ঠে দিলুয়া উত্তর করিল "তোর কি ভয় কর্‌ছে?"

মুন্না "শ্‌ শ্‌" বলিয়া তাহাকে চুপ করিতে ইঙ্গিত করিল। উভয়ে কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিল। সন্ধ্যার সে প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মৃদু



অথচ গম্ভীর শব্দ বনান্তরাল হইতে আসিতেছিল। দিলুয়া বলিল "কিছু নাঃ।" কিছুক্ষণ আর সে শব্দ শ্রুত হইল না। আবার "বূম্‌" "বূম্‌" শব্দ হইল। আর অপেক্ষা না করিয়াই অশ্বারোহীদ্বয় প্রচণ্ড বেগে ঘোড়া ছুটাইয়া দিল। যখন তাহাদের বেগ শিথিল হইল তখন অশ্বদ্বয়ের মুখে ফেণপুঞ্জ দেখা দিয়াছে এবং আরোহীদ্বয়ের বসন ঘর্ম্মে সিক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

দিলুয়া বলিল, "আরে ওটা দূরগুম্‌ (এক জাতীয় বড় পেঁচা, স্বর আরও গম্ভীর ও ভয়ানক) মুন্না বলিল "তাইত, সেটা মনেই আসেনি।" বাস্তবিক এরূপ পেচকের ডাক তাহারা অনেকবার শুনিয়াছে—কিন্তু আজ এ কি কাণ্ড! উভয়ে উচ্চহাস্য করিয়া সে ঘটনা ভুলিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহারা মনে মনে বড়ই লজ্জিত হইয়া পড়িল। লজ্জার আরও কারণ এই যে, এমন একটা অব্যক্ত, অস্ফুট সংশয় অল্পে অল্পে তাহাদের মাঝখানে দুর্লঙ্ঘ্য এক প্রাচীরের সৃষ্টি করিয়া দিতেছিল, যে কেহ কাহারও নিকট তাহা ব্যক্ত করিতে পারিতেছিল না। তাহাদের নিজের মনেও সে সংশয়টা ভাল করিয়া—মূর্ত্তি লইয়া তখনও দেখা দেয় নাই। হঠাৎ দিনের আলোকরাশির মাঝখানে পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণের অন্ধকার যেমন ধীরে ধীরে পৃথিবী ছাইয়া ফেলে এবং সমস্ত প্রাণিকুলকে স্পন্দহীন ও ভয়ে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়, তেমনি এই সংসারের অন্ধকার তাহাদের সুস্থ সজীব হৃদয়ের উপর ধীরে ধীরে একটা বিশাল অনর্থের ছায়া পাত করিয়া তাহাদিগকে ভিতরে ভিতরে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছিল। কখন্‌ ঠিক কোনখান হইতে মনের মধ্যে এই যে প্রচ্ছন্ন একটা অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল, তাহা তাহারা ভাল করিয়া বিচার করিবার অবকাশই পায় নাই। এই বিজন, সঙ্গিহীন অরণ্যমধ্যে, হয়ত বা মরণযাত্রার পথে তাহাদের প্রকৃতি এমন একটা সুস্থ, শান্ত, উদার বন্ধুত্বের টানে পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হইতেছিল যে, এই অজ্ঞাতপূর্ব্ব সন্দেহের প্রথম আবির্ভাবে তাহারা অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। সেই ঘোষণাপত্র—পলাতক আসামী-দ্বয়ের মধ্যে যে কেহ অপরকে ধরাইয়া দিয়া ক্ষমা, পারিতোষিক, গৃহ, স্বজন, স্বাধীনতা ও সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান নাইনুর অবিভক্ত প্রেম—এ সবই পাইতে পারে। একি অজ্ঞাত আকাঙ্ক্ষা! একি দৈব ব্যাধি! তাহাদের

সৈনিকের সরল বলিষ্ঠ হৃদয়ে এমন মলিন, জঘন্য, কুৎসিত স্পর্শ আর কখনও অনুভব করে নাই। সেই পরিষ্কার ছাপার অক্ষরগুলি যেন দশগুণ বড় হইয়া চোখের সামনে নাচিতে লাগিল। বায়ুর কূজন হইতে তারকার মৃদুস্পন্দন পর্য্যন্ত যেন সেই অক্ষরগুলি ফিরিয়া ঘুরিয়া তাহাদের কাছে ফুটিয়া উঠিতেছিল।

নির্ম্মল প্রভাতে কুয়াসার মত, জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে দুঃস্বপ্নের মত, আগতপ্রায় অবশ্যম্ভাবী গুরুতর অমঙ্গলের ছায়ার মত, এই সন্দেহ সৈনিকদ্বয়ের হৃদয়কে সবলে পীড়িত ও বিধ্বস্ত করিতে লাগিল। সেইদিন তাহারা প্রথম জানিল যে প্রেমের পথ কুসুমাস্তৃত নয়—সেই দিন তাহারা বুঝিল যে তাহারা প্রেমে প্রতিদ্বন্দী। যতদিন তাহারা নাইনুর সদ্যোদ্ভিন্ন যৌবনের প্রখর কিরণে মুগ্ধ ছিল ততদিন আপনাদের হৃদয় যাচাই করিয়া দেখিবার তাহাদের অবসর হয় নাই। তাহাদের চিন্তাশূন্য অবাধ সৈনিকপ্রকৃতি এ সকল তুচ্ছ বিচার বিতর্কের বহু ঊর্দ্ধে তাহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। নাইনু তুল্যহস্তে তাহার দুর্লভ প্রেম দুইজনকে বণ্টন করিয়া দিত। তাহাতেই তাহারা সুখী ছিল—কখনো যে উভয়ের মধ্যে স্বত্ব স্বামিত্ব বা অধিকার লইয়া বিতর্ক উঠিতে পারে এ কথা তাহাদের মনে বড় স্থান পায় নাই। কারণ তাহারা বেশ জানিত যে নাইনুর পক্ষপাতিত্বই শেষে জয়পরাজয় সহজে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবে। ঘটনাপরম্পরা তাহাদিগকে অন্য দিকে টানিয়া আনিয়াছে; এখন, সেই ঘোষণাপত্রের সঙ্গে সঙ্গে বুঝি নাইনুর কোমল মুখ খানি, তাহার লজ্জাচকিত মুগ্ধ নয়ন দুটি ভাসিয়া উঠিতেছিল! কেমন করিয়া তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিবে? অতীত প্রেমের স্মৃতিকে ছাড়িয়া, যতই জোরে তাহারা তাহাদের যত্নবর্দ্ধিত বন্ধুত্বকে চাপিয়া ধরিতে চাহে, ততই সে বন্ধুত্বের মাঝে একটা প্রকাণ্ড শূন্যতা আসিয়া দেখা দেয়। এমনই করিয়া আজ অকস্মাৎ বন্ধুত্বের বন্ধন বাধা পাইতে লাগিল।

সৈনিকদ্বয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, পর্ব্বতগাত্রে শষ্পগুল্মবিহীন একখণ্ড ভূমি পাইয়া তাহারা আর উপরে উঠিতে বিরত হইল। দ্রুতবেগে এই 'চড়াই' এ আসিতে অশ্বও শ্রান্ত হইয়াছিল। একটি বৃক্ষের স্কন্ধে তাহাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়া সৈনিকদ্বয় সেই অনাবৃত ভূমিতে শয়ন করিয়া বিশ্রাম লাভ করিল।

অধিকরাত্রে যখন জ্যোৎস্না উঠিল, এবং চন্দ্রকিরণের তরল স্পর্শে চতুর্দ্দিকের বনভূমি যখন সাড়া দিয়া উঠিল, তখন সে নিস্তব্ধতা সৈনিকদ্বয়ের পক্ষে অসহ্য বোধ হইল। তাহারা কেহই এপর্য্যন্ত ঘুমায় নাই। নিশার কষ্টলব্ধ বিশ্রামকে তাহারা এত নিকটে পাইয়াও হারাইয়াছে। অন্যদিন হইলে, তাহারা গল্প করিয়া, হাসিয়া, গান গাহিয়া অবশিষ্ট রজনী প্রভাত করিয়া দিতে পারিত, কিন্তু আজ যে তাহারা পরস্পরের নিকট অপরাধী! আপনার অস্তিত্ব পাষাণগাত্রে মিলাইয়া দিয়া কোন প্রকারে আজ আত্ম-গোপন করিবার চেষ্টাই তাহাদের মধ্যে বলবতী। শয়নের পর, অপরকে জাগাইবার ভয়ে কেহ পার্শ্বপরিবর্ত্তন পর্য্যন্ত করে নাই। কিন্তু এমন করিয়া অবরুদ্ধ দুর্গতোরণে পাহারা দিবার মত কঠোরতা তাহাদিগের হৃদয়কে ক্রমেই বিদ্রোহী করিয়া তুলিতেছিল। মুন্না উঠিয়া বসিল।

দিলুয়া তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "কি ও?"

"কিছুই না।"

"ঘুমাস নি?"

"আজ বড় গরম। তোমারও বুঝি ঘুম হয়নি!"

দিলুয়া কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না।

কিছুক্ষণ উভয়ে চুপ করিয়া রহিল। তার পর, মুন্না হাসিল; দিলুয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল। মুন্না বলিল,

"আমি যদি বল্‌তে পারি, তুমি কি ভাব্‌ছিলে!"

দিলুয়া বলিল—"কি বল্ দেখি?"

"বাজি।"

"বাজি!"

"সেই ঘোষণা!"

"ঠিক বলেছিস্"। দিলুয়ার স্বর হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেল। তাইত মুন্না ত ঠিক কথা বলিয়াছে; এ কি রকম হইল! মুন্না তখনও হাসিতেছিল; দিলুয়া কিন্তু সে হাসিতে যোগদান করিতে পারিল না।

মুন্না ঘোষণাপত্রের ভাষা অনুকরণ করিয়া বলিল—"আসামী দ্বয়ের মধ্যে যে কেহ অপরকে—"

"সাবধান, মুন্না! সব জিনিস নিয়ে ঠাট্টা ভাল নয়।"

"সাবধান, দিলুয়া। সত্য গোপন করো' না,—আমাকে ধরিয়ে দিবার কথা তুমি এতক্ষণ ধরে ভাব্‌ছিলে!"

"মিথ্যা কথা! তার আগে এই বন্দুকের এক গুলিতে সব ফরসা হবে।"

এইবার মুন্না গম্ভীর হইল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সে বলিল "আচ্ছা, সেই বিকাল থেকে মাথার মধ্যে এমন একটা তোলাপাড়া আরম্ভ হয়েছে কেন বল দেখি? বেশ থাকা যাচ্ছিল, হঠাৎ সেই ঘোষণাটা—

মুন্না তাহার বাক্য শেষ করিতে পারিল না। কথাগুলি বলিতে তাহার কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া উঠিতেছিল।

দিলুয়া বলিল "হাঁ, সেই হ'তে যেন আর ভাল লাগ্‌ছে না।"

"নাঃ—আর ভাল লাগ্‌ছে না।"

আবার কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল।

"নাইনুর কথা ভাব্‌ছিস"—দিলুয়ার স্বর রুক্ষ ও ব্যঙ্গ-পরিপূর্ণ।

"তুই বুঝি তাই ভাব্‌ছিলি?"

হাঁ মুন্না। আজ নাইনু আমাদের মাঝ খানে হঠাৎ এসে পড়েছে। তা নইলে দিন গুলো বেশ কেটে যাচ্ছিল। ঘোষণাতে আমাদের বন্ধুত্ব এমন চট্‌করে ভেঙ্গে দিতে পারত না, যদি না তার পেছনে নাইনুর ছবিখানা মুখ খানা থাকৃত।"

"ঠিক বলেছিস্; আমি সেই কথাই ভাব্‌ছিলাম। যতই নাইনুর কথা ঠেলে ফেলতে যাচ্ছি, ততই আরও যেন জোর করে সে মনটাকে টেনে নিচ্ছে।"

"এখন উপায়? বিশ্বাস হারিয়ে এক সঙ্গে থাকা চলে না, মুন্না। আমাদের সে বিশ্বাসে ঘা দিয়েছে কে? নাইনু। হাঁ কি না—বল্ দেখি।"

"ঠিক কথা দিলুয়া। নাইনুই মাঝে এসে আমাদের প্রণয় ভেঙ্গে দিচ্ছে।"

দিলুয়া গম্ভীর স্বরে বলিল "তবে, এক কাজ কর্। তুই আমাকে ধরিয়ে দে। খবরদার "না" বলিস্ না। তুই ফিরে গেলে নাইনুর আর বিপদের ভয় থাকৃবে না। আমরা যে তাকে বিপদের মাঝখানে ফেলে এসেছি, তা ভাবিস নি? আমি বলছি, তুই স্বচ্ছন্দে ফিরে যা। এই আমার বন্দুক তোকে সমর্পণ করছি।"



এই বলিয়া দিলুয়া তাহার কটি হইতে ছুরি, পৃষ্ঠদেশ হইতে টোটার মালা, আর বন্দুকটি তুলিয়া লইয়া মুন্নার কাছে রাখিয়া দিল। অদূরে বৃক্ষ হইতে একটি 'মহুকা' পাখী মাঝে মাঝে ডাকিয়া তাহার প্রণয়িণীকে প্রবুদ্ধ করিতেছিল। মুন্না কিছুক্ষণ নির্ব্বাক রহিল। তার পর দিলুয়ার হস্ত ধরিয়া বলিল "তুই-ই নাইনুর যোগ্য, দিলুয়া। আমি তোর কাছে কিছুই না। তুই ফিরে যা, তোদের জন্য আমি সুখে মর্‌তে পার্‌ব।"

দিলুয়া শুষ্ক কণ্ঠে বলিল "তুই নাইনুর যোগ্য বেশী, কেননা—নাইনু তোকে ভাল বাসে।"

মুন্নার হৃদয়ের এমন একটি তন্ত্রীতে আঘাত পড়িল যে, সে এইবার অধীর হইয়া পড়িল। তার মনে হইল—সেই দ্রাক্ষাকুঞ্জ, সেই সুস্বাদু সরবৎ, আর এক খানি কোমল মুখের করুণ কাতর দৃষ্টি। নাইনু যেন তাহাকেই চাহিতেছে! মুন্নার শিরায় বিদ্যুৎ ছুটিল, সে একেবারে লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ও কঠোর কণ্ঠে ডাকিল, "আয় তবে যোগ্যতার পরীক্ষা হউক।" ভূমি হইতে দিলুয়ার বন্দুকটি তুলিয়া সে সজোরে দিলুয়ার হস্তে নিক্ষেপ করিল।

দিলুয়া উত্তর করিল; "পাগল! আমি যদি না জান্‌তাম যে আমার লক্ষ্য অব্যর্থ, তা হ'লে তোর প্রস্তাবে সম্মত হ'তে পার্‌তাম।"

"বটে! আজ একবার সে দর্প চূর্ণ হোক্।—না দিলুয়া, বেঁচে থেকে আর সুখ নেই, যদি শান্তিতে মর্‌তে চাস্, তবে বন্দুক তোল্। মনটা নইলে ক্রমেই বিগ্‌ড়ে যাচ্ছে।"

দিলুয়া বন্দুকের দিকে একবার চাহিল। পরক্ষণেই দেখিল, মুন্না জানুর উপর ভর দিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছে। দেখিয়া তাহারও রক্ত গরম হইয়া উঠিল। 'মহুকা' তখন একটু খানি চুপ করিয়াছিল। মুন্না বলিল—পাখীর পহেলা ডাক।"

"তাই হোক" বলিয়া দিলুয়াও প্রস্তুত হইল। পরক্ষণেই পাখী ডাকিল এবং যুগপৎ দুইটি বন্দুকের আওয়াজ—আর সেই সঙ্গে সঙ্গে দুইটি প্রাণহীন দেহ ভূতলে লুণ্ঠিত হইল। মরণের শান্তি তাহাদের সংশয়ক্লিষ্ট মুখমণ্ডলে আবার প্রসন্ন ভাব মুদ্রিত করিয়া দিল!

* * *

প্রভাতের আকাশ আসন্ন ঝড়ের কালিমায় নিস্তব্ধ ও নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। বৃক্ষশির ধূসর হইয়াছে, পক্ষিকুল কাকলি-বিরত হইয়াছে, আর পার্ব্বত্য প্রদেশের সেই একান্ত বিজনতা ভঙ্গ করিয়া অশ্বের হ্রেষারব শুনা যাইতেছে। এমনই দুঃসময়ে শ্রান্ত, শীর্ণ, বিষণ্ণ এক রমণী সেই দূরাগত হ্রেষাধ্বনি শুনিয়া সেই দিকে আপনার অশ্ব ছুটাইয়া দিল। সেখানে গিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার মুখমণ্ডল একেবারে পাণ্ডুর হইয়া গেল। নাইনু অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া যখন প্রিয়তমের সাক্ষাৎলাভ করিল, তখন চারিদিকে বৃক্ষ সকল ভূমিতে লুয়াইয়া পড়িতেছিল। অনাহারক্লিষ্ট বন্ধনগ্রস্ত অশ্বদ্বয়কে মুক্ত করিয়া দিয়া নাইনু যখন অশ্বারোহণ করিল, তখন তিনটি অশ্ব বিদ্যুৎবেগে ঝড়ের গতিকে উপেক্ষা করিয়া পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে ছুটিতেছিল। উন্মত্তপ্রায় নাইনুর বিস্রস্ত কেশপাশ বাতাসে উড়িতেছিল, বসনাঞ্চল পতাকার ন্যায় পশ্চাতে ভাসিতেছিল; আর তাহার চিত্ত সেই অশান্ত অশ্বেরই মত ছুটিয়াছিল।

সেই পর্ব্বতের উপত্যকাবাসিগণ ঝড়ের 'দেবতা'র নামে এখনও শিহরিয়া উঠে।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র।

---

# আমাদের জাতীয় দুর্ব্বলতার কতকগুলি কারণ।

নানারূপ লক্ষণ নিরপেক্ষভাবে দেখিলে বেশ বুঝা যায়, ভারতবাসী ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। দৈহিক হিসাবেই বলুন আর মানসিক হিসাবেই বলুন, কিম্বা আর্থিক হিসাবেই বলুন ইহার নিশ্চয় প্রমাণ ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। আমরা নিজে নিজেও কতকটা উপলব্ধি করিতে পারি। এবং সরকারের যে সব বাৎসরিক রিপোর্ট ছাপা হয় ও যাহাতে দেশের বিবিধ সংবাদ ও অবস্থার বিষয় বিশদরূপে ছাপা থাকে সেগুলি হইতেই পরপর ভাবে দেখিলে দেখা যায়, আমরা নানা বিষয়ে হীন হইয়া পড়িতেছি।



প্রথমে দৈহিক হিসাবের কথা দেখুন।

যে তিনবার লোকসংখ্যা হিসাব করা হইয়াছে, সেইগুলি পরে পরে তুলনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় মৃত্যুসংখ্যা দেশে ক্রমিকই বাড়িতেছে। যাহা পূর্ব্বে ছিল হাজার করা সাতাশটি, এখন তাহা সাঁইত্রিশটি দাঁড়াইয়াছে। আগে যে হিসাবে লোকসংখ্যা বৎসর বৎসর বাড়িত এখন আর তত বাড়ে না। তাহার কারণ মৃত্যুসংখ্যার বৃদ্ধি ও জন্মসংখ্যার হ্রাস।

এদেশে শিশুদের মৃত্যুসংখ্যা এত বেশী যে পৃথিবীর কোন দেশেই সেরূপ নাই। যে সংখ্যা সাধারণত এদেশে হাজারে সাঁইত্রিশটি, শিশুদের বেলায় সে সংখ্যা হাজারে তিনশত তেত্রিশটি। অর্থাৎ প্রায় দশগুণ বেশী। আর অন্য দেশের শিশু-মৃত্যুর সংখ্যার সহিত তুলনায় এদেশের সংখ্যা দুনারও উপর।

ভারত ৩৩৩

ম্যানচেষ্টর ১৫০

তিনটি শিশু জন্মাইলে তার মধ্যে একটি আমাদের দেশে মারা যায়। তার প্রধান কারণ বাল্য-বিবাহ। আর শুধু মৃত্যুসংখ্যা বৃদ্ধি নয়, রোগ বৃদ্ধিও দিন দিন চলিতেছে। পাড়াগাঁগুলি সর্ব্বাপেক্ষা পানীয় জল অভাবে ও দূষিত জল নিকাশ অভাবে অনেক অস্বাস্থ্যকর হইয়াছে। ম্যালেরিয়া জ্বরে বাঙ্গালার অর্দ্ধেক মৃত্যুসংখ্যা ঘটে। বিসূচিকা প্রভৃতি সংক্রামক রোগগুলি যে সকল স্থানে পাট জন্মায়, যে সকল স্থানে জলদুষ্ট হয়, সেখানে কি ভয়ানক প্রকোপ করে! যক্ষ্মাকাশের মৃত্যুসংখ্যা আজকাল এত বাড়িতেছে যে কর্ত্তৃপক্ষরা এখন এবিষয়ে কিছু ব্যবস্থা না করিয়া আর থাকিতে পারিতেছেন না। আর যাহারা আছে তাহারা বাঁচিয়া জীবন্মৃত অবস্থায় থাকে। মনে সুখ নাই, কার্য্যে উৎসাহ নাই। কেবল দিনকাটান মাত্র। দারিদ্র্যে, রোগে ও নানারূপ সামাজিক অব্যবস্থায় প্রতি সংসারে কত উৎপাত ঘটিতেছে। কোনও প্রকারেই ভাল হওয়া দূরে থাকুক ক্রমেই অধোগতি দেখা যাইতেছে।

আর অর্থাভাবের তো কথাই নাই। এত দুর্ভিক্ষ কোনও দেশেই হয় না। কেমিন-কমিসনের রিপোর্টে সে বিষয়ে বিশুদ্ধ তালিকা ছাপা আছে। তাহার মতে বিস্তর লোক অনশনে বা অর্দ্ধাশনে থাকে। লর্ড কর্জ্জনের হিসাবমত

আমাদের দেশের প্রতি লোকের আয় বৎসরে দুই পাউণ্ড বা ত্রিশ টাকা। বিলাতের প্রতি লোকের আয় পঁয়তাল্লিশ পাউণ্ড অর্থাৎ আমাদের বাইশ গুণ বেশী; এখন যদি একটি লোকের বৎসরে ত্রিশ টাকা আয় হয়, আর অন্তত তিন টাকা হিসাবে চালের মন কিনিতে হয়, তবে দৈনিক একসের হিসাবে চাউল ধরিলে তাদের সারা বৎসর খাইবার সংস্থান নাই দেখা যায়। জমিদারেরা সহরেই বসবাস করিতে ভাল বাসেন, নিজ নিজ জমীদারীর দুরবস্থা দেখেন না। সে সকল স্থানও এমন ব্যায়রামের স্থান হইয়াছে যে, সেখানে তাঁহাদের থাকাও দায়। আর অর্থ তাহারা কতরূপে অপব্যয় করেন। অনেক অসৎ কাজে ও কেবল নাম কিনিবার জন্য কত অর্থ দান করেন কিন্তু যথার্থ সৎ-কর্ম্মে খুব কমই দেন।

তারপর, ছেলেগুলির কি শিশু অবস্থায় কি পাঠ্যাবস্থায় কত অভাব ও অযত্ন। অশিক্ষিত মায়েরা ভাল করিয়া শিশু পালন করিতে জানে না ও সংসারের দারুণ অর্থাভাবে তাহা সম্ভবও হয় না। আর যে সব বালকেরা পড়িতেছে, তাহাদের পড়ার ও পরীক্ষার কি চাপ! পঠদ্দশায় ভাল করিয়া আহারও হয় না এবং অতিরিক্ত পরিশ্রম ও ভাবনাও দিনরাত থাকে। এই কারণে তাহাদের পড়িবার চাপে দেহ ভাল করিয়া বাড়িতে পারে না ও কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া অকালে মারা যায়।

আর আমাদের দেশে কতকগুলি কাজ ভিন্ন—যথা ওকালতী, ডাক্তারী ইঞ্জিনিয়ারীং প্রভৃতি ছাড়া শিক্ষা বাণিজ্য শিখিবার বড় একটা ব্যবস্থা নাই। শিক্ষা: অভাবে ও স্বভাব দোষে মানুষের এদেশে সে সব কাজে চেষ্টাও কম। কেবল বাকি রহিল কৃষিকার্য্য। জল বৃষ্টির উপর তাহা এত নির্ভর করে যে, তাহার আয় বড়ই অনিশ্চিত। পূরা আয় হইলেও সে আয় শিল্প বাণিজ্যের আয় হইতে অনেক কম। শতকরা নব্বই জন এই কৃষিকার্য্যের উপরই নির্ভর করে। তাই দেশ এত গরীব।

এই সব অসুবিধা গুলির প্রতিকার অনেকটা আমাদের হাতে নাই বটে কিন্তু আমাদের হাতে আছে এমন অনেক উপায়ও আমরা করি না। বিশেষ করিয়া এই প্রসঙ্গে আমাদের সামাজিক অবস্থার কথা বলি। আমাদের যে সব দারুণ উপসর্গ ও উৎপাত ভুগিতে হয় তাহার অন্যতম মূল কারণ, আমাদের



সামাজিক অনেক কুপ্রথা। তাহার ভিতর এই কয়টি বিশেষ করিয়া বলি। আমাদের দেশের জাতিভেদ ও জাতি বিভাগ থাকায় জাতীয় ভাবে অসীম ক্ষতি করিয়াছে। বিভিন্ন জাতিতে, তাহাতে পরস্পরের সহিত মিল হয় নাই। তাহারা পাশাপাশি থাকিয়াও মিলিতে পারে না। পরস্পরের উপর ঘৃণা বিদ্বেষ তাহা হইতে কতই আসিয়াছে। তা ছাড়া একই শ্রেণীর মধ্যে বার বার বিবাহ করিলে সন্তান ক্রমেই নিস্তেজ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, ইহা সকল জীবেই দেখা যায়। তাহাদের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পায়। মনে স্ফূর্ত্তি থাকে না। শরীরে দুর্ব্বলতা ও রোগ আশ্রয় করে। ইত্যাদি রকমে এই প্রথা নানারূপে হানিকর।

তারপর স্ত্রীলোকের অবস্থা আমাদের দেশে বড়ই হীন, বাল্যবিবাহ মজ্জায় মজ্জায় শরীর মনে দুর্ব্বলতা আনিয়াছে এবং জাতীয় জীবনকে একেবারে নষ্ট করিয়াছে। স্ত্রীজাতির শিক্ষার অভাবে সংসারে কত অনিষ্ট হয়। ছেলেদের ভাল যত্ন হয় না। অজ্ঞাতভাবে সংসারে কতপ্রকারে অপচয় হয়। কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন সংসারে কত বিপদ ডাকিয়া আনে। অবরোধ প্রথার এই একটি মহা দোষ যে বাহিরের সহিত সম্বন্ধ থাকে না বলিয়া ও ভাল লোকের সহিত মিশিবার অবসর হয় না বলিয়া শিক্ষা ও উন্নতির কত অভাব। মন কত সংকীর্ণ হইয়া পড়ে। শরীর মন বৃদ্ধিকালে ভাল থাকে না।

তারপর চির বৈধব্য প্রথা। অন্য হিসাবে ইহা যতই হানিকর হউক ও অন্যায় হউক লোকসংখ্যা বাড়ার পক্ষে ইহা একান্ত হানিকর। বাঙ্গালার মত, বার হইতে পঁয়তাল্লিশ বয়সের রমণীর সংখ্যা আছে তাহার মধ্যে চার-ভাগের এক ভাগ বিধবা। এই বয়সই সন্তান হইবার বয়স। তাহাদের সন্তান হয় না বলিয়া লোকসংখ্যা বাড়ার কত প্রতিবন্ধক হইয়াছে। সেটী জাতীয় জীবনে বড়ই গুরুতর কথা। ডাক্তার U. N. Mukerjeeর "Dying Race" নামক প্রবন্ধ পড়িলে লোকের এ বিষয়ে অনেক জ্ঞান হয়। সেনসাস্ রিপোর্ট হইতে উদ্ধৃত বিষয়ের খবর অনেকেই জানেন। আজ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার হিন্দু মুসলমান হইতে পাঁচ লক্ষ বেশী ছিল। আজ সেই হিসাব এখন এমন দাঁড়াইয়াছে যে হিন্দুর সংখ্যা এখন মুসলমান হইতে এই ত্রিশ বৎসরে তেইশ লক্ষ কম হইয়াছে। এমন যদি দিন দিন কমিতে

থাকে আরও ত্রিশ বৎসর পরে কিরূপ দাঁড়াইবে। একটী হিন্দু জন্মায় আর সেই সময়ে দুইটি মুসলমান জন্মায়। মুসলমানদের এই লোকসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ অনেক। তাহারা স্বাধীনভাবে বিবাহাদি করিতে পারে। আমাদের বিধবারা সেরূপ পারে না। আমাদের সমাজে রমণীদের আইন্ অনুসারেও সত্ত্ব কত কম। তাহারা পৈতৃক সম্পত্তি কিছুই পায় না ও এমন কি স্বামী বা অন্য কোনও আত্মীয়েরও বিষয়ে নিশ্চয় উত্তরাধিকারী হইতে পারে না। যাহাদের কোলে থাকিয়া ও স্তন্যদুগ্ধ পান করিয়া মানব জাতি পালিত হয় তাহাদের যদি এমন হীন অবস্থা করিয়া রাখা হয় কিরূপে সে সমাজে মানব জাতির উন্নতি হইবে।

তারপর আমাদের ঘরকন্নায় নিত্যকার অপচয়। সে যে কত বেশী তা এ প্রবন্ধে বলা অসম্ভব। সে সম্বন্ধে এত কথা বলিবার আছে যে তাহার জন্য এক বিস্তৃত প্রবন্ধ দরকার হইবে।

শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

---

# আপনার মাঝে।

১

ওরে পাখী! সন্ধ্যা হ'লো আয়রে কুলায়,
সমস্ত গগন ভরে'
আঁধার পড়িছে ঝরে'
ওরে পাখী! অন্ধকার! নীড়ে ফিরে আয়!
বন্ধ কর পাখা তোর—আয়রে কুলায়!

যতক্ষণ আলো ছিল মেটেনি কি আশ?
ওরে সারাদিনমান
তুই করেছিস্ পান
যত মধু ছিল ভরি' ধরণী আকাশ!
এবে আলো সাঙ্গ হ'লো—মেটেনি পিয়াস্?



ওরে আয়! ফিরে আয়! আপনার মাঝে!
ওরে বন্ধ কর্ পাখা,
অপূর্ব্ব-আলোক মাখা
অনন্ত গগনতল, হেথায় বিরাজে।
ওরে আয়! ফিরে' আয়! আপনার মাঝে!

২

ভয় নাই ভয় নাই, রে আমার মন!
এ যে শুধু ক্ষণিকের মোহ অন্ধকার!
আবৃত অন্তরে তোর জ্যোতিঃ চিরন্তন—
ডুব্‌দে ডুব্‌দে তবে আপন মাঝার

কুসুমকামিনী পুস্তকালয়।
১১ই বৈশাখ সোমবার
১৩০১ সালে স্থাপিত
পুস্তক নং
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

সিক্ত কর্ ওরে পাখী পক্ষদুটি তোর
আপন আনন্দভরা আত্মার আলোকে।
আপনারি জ্ঞানে হয়ে আপনি বিভোর
অন্তর-গগনতলে উড়িস্ পুলকে।

ব্রহ্মাণ্ডে পড়িবে তোর চরণের ছায়া,
বাসনা বিলুপ্ত হবে আত্মার মাঝারে!
দুই হাতে ছিন্ন করি শত মিথ্যা মায়া
আপনার মহিমার দুন্দুভি বাজারে!

ভয় নাই! ভয় নাই! রে আমার হিয়া!
মুহূর্ত্তের ভ্রান্তি শুধু আনিছে আঁধার;
জীবনের জ্যোতির্ম্ময় প্রদীপ ধরিয়া,
দেখারে আপন পথ আপন মাঝার।

৩

তবু যে তরাসে কাঁপে শ্রান্ত হিয়াখানি
আপনার অন্তরের পথ নাহি জানি।

সম্মুখে পশ্চাতে তার,
অন্তহীন অন্ধকার
ঘিরিছে সতত তারে শত আবরণে
এই ঘোর অন্তরের অন্ধকার বনে।

ভয় নাই, ওরে মন! করুরে নির্ভর
অন্ধকারাক্রান্ত এই আপনারি 'পর।
এই যে আঁধার রাজি
নয়ন ভরিছে আজি,
এরি মাঝে পাবি তুই আত্ম-পরিচয়,
মুহূর্ত্তের ভ্রান্তি শুধু আর কিছু নয়।

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস।

---

# মানবের অভাব ও তাহা নিবারণের চেষ্টা।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

সমাজ-জীবনের আরম্ভকালে মানবের চিত্ত ধর্ম্ম-ভাবশূন্য ছিল। সভ্য-সমাজে পূর্ব্বকালে এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, প্রত্যেক জাতিরই ধর্ম্ম-বিষয়ক কোন না কোন প্রকার ধারণা বা অনুষ্ঠান অথবা উৎসব বর্ত্তমান আছে,—তা, সে জাতি সভ্যতার হিসাবে যতই নিম্নে অবস্থিত হউক না কেন। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে অসভ্যজাতি সমূহের আচার, ব্যবহার, তাহাদিগের জ্ঞান ও বিশ্বাস লইয়া সুধিসমাজে যে সকল আলোচনা হইতেছে, তাহার দ্বারা ইহা স্পষ্ট প্রমাণীকৃত হইয়া গিয়াছে যে, মানব-সমাজের অভিব্যক্তির ইতিহাসে এমন একদিন ছিল, যখন মানুষের মনে ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় কোন idea বা ভাব একেবারেই ছিল না। Darwin এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়া ছিলেন। তিনি একস্থলে লিখিয়াছেন,—"There is ample evidence, derived not from hasty travellers, but from men who have long resided with savages, that numerous races have existed and still exist, who have no idea of one or more gods, and who have no words in their language to express such an idea." এমন অনেক জাতি এখনও বর্ত্তমান আছে, যাহারা ঈশ্বর, দেবতা, আত্মা ( অশরীরী ) বা ভূতযোনি ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন স্তরের উপাস্য বস্তুর কোন ধারণাই করিতে পারেনা।



স্যার স্যামুয়েল বেকার তাঁহার 'আলবার্ট-নিয়েঞ্জা' নামক গ্রন্থে নীলনদ তীর বাসী একজন লাটুক সামন্তের সহিত তাঁহার একদিনের কথোপকথনে মানবের এই সম্পূর্ণ-রূপে ধর্ম্মভাব-বিবর্জ্জিত মনের একটি সুন্দর চিত্র দেখাইয়াছেন। আমরা সেই কথোপকথনের অনুবাদ দিতেছি।

বেকার—মৃত্যুর পরবর্ত্তী ভবিষ্যৎ অবস্থা বিষয়ে তোমার ধারণা কিরূপ?

লাটুক—মৃত্যুর পরের আবার অবস্থা! তাও কি কখন সম্ভব? মরা মানুষ সমাধি হইতে বাহির হইতে পারে?

বেকার—তুমি কি মনে কর, মানুষে আর পশুতে কোন প্রভেদ নাই—মৃত্যুর সহিত উভয়েরই সব ফুরাইয়া যায়?

লাটুক—নিশ্চয়ই। গরু মানুষের চেয়ে অধিক বলবান। গরুরও মৃত্যু হয়। তাহার হাড় বড় ও অনেক দিন থাকে। মানুষ দুর্ব্বল ও তাহার অস্থি সহজে ও শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়।

বেকার—মানুষের কি গরুর অপেক্ষা অধিক জ্ঞান নাই? মানুষের কি মন নাই?

লাটুক—এমন মানুষ আছে যাহার গরুর চাইতে বেশী বুদ্ধি নাই। মানুষকে আগে পরিশ্রম দ্বারা শস্য উৎপন্ন করিয়া তাহার দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হয়। পশুদের সে কষ্ট সহ্য করিতে হয় না।

বেকার—তুমি কি মাননা যে, তোমার দেহ ব্যতীত আত্মাও আছে? নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নযোগে তুমি কি কখন কোন দূরবর্ত্তী স্থানে যাও নাই? সে অবস্থায় তোমার দেহ ত এক স্থানেই অবস্থান করে?

লাটুক—এমন ত প্রত্যহই হয়; কি জন্য হয় তাহা কেমন করিয়া বলিব?

বেকার—মানুষ ও পশু অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর বা অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন কোন

আত্মা ( spirit ) আছে বলিয়া তুমি বিশ্বাস কর না ? দৈহিক কারণ হইতে উৎপন্ন ভিন্ন কারণান্তরে তোমার অনিষ্ট হইতে পারে না, এই তোমার ধারণা ?

লাটুক—জঙ্গলে রাত্রিকালে আমি হস্তী কিম্বা অপরাপর বন্যজন্তুর দ্বারা অনিষ্ট হইতে পারে বলিয়া আশঙ্কা করি, আর-কিছুরই ভয় করি না।

বেকার—তবে, তুমি ভাল মন্দ কোনরূপ অদৃশ্য আত্মাই বিশ্বাস কর না? মৃত্যুই দেহ ও আত্মার পরিণাম, এই তোমার ধারণা ? তোমাতে ও পশুতে তবে কি কোনই প্রভেদ নাই ? মৃত্যুর পরে উভয়েরই এক পরিণাম ?

লাটুক—নিশ্চয়ই।

বেকার—ভাল ও মন্দ কার্য্যের মধ্যে কোন প্রভেদ দেখ কি ?

লাটুক—ভাল ও মন্দ, মানুষ ও পশুতে বর্ত্তমান আছে।

বেকার—যদি ভবিষ্যৎ জীবন নাই থাকিল, তবে মানুষ কেন ভাল হইবে ? যদি অসৎ উপায়ে সে সমৃদ্ধিশালী হইতে পারে, তবে সে কেন অসৎ হইবে না ?

লাটুক—অধিকাংশ লোকই অসাধু। বলবান ব্যক্তি নিশ্চয়ই দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিয়া থাকে, আর ভাল মানুষ মাত্রেই দুর্ব্বল ;—তাহারা ভাল, কেন না তাহারা দুর্ব্বল—কেননা অসৎ হইবার উপযুক্ত বল তাহাদিগের নাই !

উপরে যে কথোপকথন উদ্ধৃত হইল তাহাতে স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে, ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কোন প্রকারের ধারণাই এক সময়ে মানুষের ছিল না। পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্ম্ম-মত প্রচলিত আছে, ব্যাপক ভাবে দেখিতে গেলে, তাহার একটা প্রধান লক্ষণ এই যে, ইহা মানবের স্বভাবজ ইচ্ছা বা কার্য্য-সমূহের প্রতিরোধকারী দ্বিধা (Scruples). বাইবেলে আদিমাতা ইভএর সর্ব্ববিধ সংস্কার শূন্য অন্তঃকরণ—যত দিন না তিনি জ্ঞানবৃক্ষের ফল আত্মসাৎ করিয়াছিলেন—ততদিন সম্পূর্ণরূপে দ্বিধাশূন্য ছিল ও স্বাভাবিক স্বাধীনতাকে সংহত ও সঙ্কুচিত করে এমন কোন ধারণাই তখন আদি-মাতার ছিল না। কিন্তু জ্ঞান-বৃক্ষের ফল তাঁহার মনের উপর কি আশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল—লজ্জা, দ্বিধা ও সংশয়ের সৃষ্টি ত সেই ঘটনার পর হইতে ! এই দ্বিধাকে ধর্ম্মের উৎপত্তির



কারণ বলিতে পারা যায়। জ্ঞান-বৃদ্ধিই ধর্ম্ম-বিশ্বাসের মূল হেতু—কেননা, জ্ঞান সংশয় ও দ্বিধার সৃষ্টি করে। মানুষ বুদ্ধি-বিকাশের প্রথম হইতেই জ্ঞাত-বিষয়ের সাদৃশ্যের সাহায্যে অজ্ঞাত বিষয়ের ধারণা করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। সে নিজেকে সকলের অপেক্ষা অধিক জানে বলিয়াই আপনার সমস্ত ভাব ও গুণ আপনার চতুঃপার্শ্বস্থ পদার্থ সমূহের প্রতি আরোপিত করিয়া সেই সকল পদার্থ-বিষয়ক স্বীয় জ্ঞান ও ধারণার সৃষ্টি করিতেছে। আপনার ইচ্ছা ও জ্ঞান আছে বলিয়া মানুষ যাবতীয় পদার্থেরও ইচ্ছা ও জ্ঞান আছে ইহাই স্থির করিয়া লইয়াছে। মানুষ যেমন আপনার ইচ্ছা ও জ্ঞানানুসারে কার্য্য করিয়া থাকে, তাহারাও ( চেতন ও অচেতন পদার্থ সকল ) তেমনি নিজেদের ইচ্ছা ও জ্ঞানানুসারে কার্য্য করিয়া থাকে। মানুষের যেমন মৈত্রী, স্নেহ, দয়া প্রভৃতি সদ্‌গুণ ও হিংসা, দ্বেষ ইত্যাদি ইতরপ্রবৃত্তি আছে, মানুষ তেমনি অন্যান্য সমুদয় পদার্থের প্রতি সদসৎপ্রবৃত্তি নিচয়ের আরোপ করিয়া সকল মনুষ্যেতার পদার্থকে মানবের হিতকর ও অহিতকর এই উভয় ভাগে সংন্যস্ত করিয়াছে। অসৎকে তুষ্ট করিলে সে আমাদিগের অনিষ্ট করিবে না ; আর সৎকে তুষ্ট রাখিতে পারিলে আমাদিগের উপকার অধিক পরিমাণে হইবে, এই ধারণাই আদিমানবের পূজা ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার মূলীভূত কারণ।

মানুষ সভ্যতার সোপানে উঠিতে আরম্ভ করিয়া যে সমুদয় অভাবের তাড়নাদ্বারা অভিভূত হইয়াছে, ধর্ম্ম তাহাদের মধ্যে একটি প্রধান অভাব। মানবজাতিকে গঠন করিয়া লইতে যে সকল নির্ম্মাণ-শক্তির কার্য্য অতিশয় আবশ্যক হইয়াছে, ধর্ম্ম তন্মধ্যে বোধ হয় একটি প্রধানতম। মানসিক শক্তির বিকাশের পর মানবসমাজে ধর্ম্ম-বিষয়ক অভাব অনুভূত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই অভাব ব্যক্তিবিশেষকে ( individual ) ত্যাগের পথে লইয়া যায়; কিন্তু সমস্ত সমাজের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ধর্ম্মের বহির্বিকাশ—মন্দির, মসজিদ ইত্যাদির নির্ম্মাণে, অভাব-গ্রস্ত মানুষের দুঃখ নিবারণে ; সহানুভূতির স্নিগ্ধ আবরণে দুঃখের উষ্ণশ্বাসকে প্রশমিত করিবার প্রয়াসই সামাজিক ধর্ম্মের প্রাণ। চিরদিন নূতন ক্ষেত্রে নব নব আকারে আপনার বিকাশে সার্থকতা লাভ করাই ধর্ম্ম-বৃত্তির পরিপূর্ণ চরিতার্থতা। আমি এস্থানে ধর্ম্মকে সামাজিক উন্নতির মূলস্থিত একটি শক্তি এই হিসাবে দেখিবার চেষ্টা

করিয়াছি। ধর্ম্মও একটি তীক্ষ্ণ সামাজিক অভাব। ইহা সমাজের কার্য্য করিবার শক্তিকে আশ্চর্য্যরূপে পুষ্টিদান করিয়াছে। সাহিত্য, চিত্রকলা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যবিদ্যার উপর ধর্ম্ম আপনার কালজয়ী প্রভাব-চিহ্ন চিরস্থায়ী ভাবে মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছে। মানবজাতির অর্থনৈতিক জীবনের উপর ধর্ম্মের প্রভাব যে কত নিবিড়, তাহা ভারতবর্ষীয়দিগের সামাজিক জীবনে অতি উজ্জ্বলবর্ণে প্রতিফলিত হইয়াছিল।

আমি পূর্ব্বে সংক্ষেপে মানুষের অভাবসমূহের অভিব্যক্তির রীতি বিবৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। দেখিয়াছি যে, খাদ্য হইতে আরম্ভ করিয়া ধর্ম্ম পর্য্যন্ত মানুষের অভাবের মধ্যে পরিগণিত। তবে, মানুষের উন্নতির প্রথম অবস্থায় অভাবই শক্তি ও জ্ঞানের বিকাশের হেতু; কিন্তু পরবর্ত্তীকালে জ্ঞান ও শক্তির বিকাশই নূতন নূতন অভাবের সৃষ্টি করে। সমাজে নব নব অভাবের আবির্ভাব, জ্ঞান ও শক্তির অপরূপ বৃদ্ধির অবশ্যম্ভাবী ফল। কিন্তু যে সমাজের উন্নতির পথ রুদ্ধ, যাহার জ্ঞানার্জ্জন স্পৃহা জড়তা প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহার ভবিষ্যৎ জীবনের আশা তিরোহিত, সেই সমাজে কার্য্য করিবার বা শিক্ষা লাভ করিবার জন্য যে চাঞ্চল্য আবশ্যক তাহাও থাকে না। যে সমাজে এইরূপ অবস্থা—তাহার উন্নতি সুদূরপরাহত। এ প্রকার অবস্থায় নূতন অভাব অনুভব করিবার শক্তিটুকুও সমাজ হারাইয়া ফেলে। তাহার কার্য্যকারিতা শক্তি নির্দ্দিষ্ট সীমা দ্বারা আবদ্ধ হইয়া সেই গণ্ডীর মধ্যে সামাজিক অভাবকে আবদ্ধ রাখে। সেইজন্য দেখা যায় যে, জাতিবিশেষের উন্নতি কতকটা অগ্রসর হইয়া কিছুকাল আবার স্থগিত হইয়া থাকে। কিন্তু এ প্রকার অবস্থা সমাজের অস্বাভাবিক বা ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থা। ক্রমোন্নতি মানব সমাজের স্বাভাবিক লক্ষ্য। উন্নততর অবস্থা প্রাপ্ত হইবার চেষ্টাই সামাজিক জীবনের পরিণতি। যদি সমাজের নূতন অভাব-বোধ উদ্বোধিত না হয়, তবে তাহার অবনতির গতি রোধ করা দুঃসাধ্য। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

আমেরিকার পেরাগোয়া দেশে জেসুইট সম্প্রদায় একটি প্রচারোপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তদ্দেশীয় আদিম অধিবাসিবর্গের মধ্যে সভ্যতার বিস্তার ও খ্রীষ্টিয়ধর্ম্মের প্রচার উক্ত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য ছিল। জেসুইট-



দিগের আগমনের পূর্ব্বে এই আদিম অধিবাসিগণের অভাব সংখ্যায় অল্প ও দৈহিক বৃত্তি সকলের পরিতৃপ্তির দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল। আমমাংস বা বনজ ফল মূলের দ্বারা তাহাদের ক্ষুধা দূর হইত। এই অবস্থায় জেসুইট সম্প্রদায় ইহাদের কৃষিকার্য্য শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুকাল পর উন্নতির পরীক্ষা মানসে ইহাদের বর্ষকালের উপযোগী বীজ শস্য প্রদানপূর্ব্বক জেসুইটগণ, তাহারা কি করে ইহা লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। দেখা গেল, আদিম অধিবাসিগণ সমস্ত বীজ শস্য নিঃশেষরূপে ভোজন করিয়া ফেলিয়াছে। ইহারা যদি আহারের উৎকর্ষ বা বৈচিত্র বোধ অনুভব করিতে পারিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কৃষিকার্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক বিচিত্র আহার্য্য প্রস্তুত করতঃ আপনাদিগের দেহের পুষ্টিসাধন করিতে ও সাধারণ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিত।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে মানুষের অভাব অসংখ্য। সুতরাং তাহার বর্ণনা করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু অসভ্যদিগের আচার ব্যবহার আলোচনার দ্বারা ও পুরাতত্ত্বের জ্ঞানানুসারে মানবের অভাব সমূহকে কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে—খাদ্য, আত্ম-রক্ষা, বাসস্থান ও প্রসাধন। এই চারি প্রকার অভাবকে মুখ্য অভাব বলা যাইতে পারে। সভ্যতার বিকাশের পূর্ব্ব হইতে এই সকল অভাবের অনুভূতি সমাজে আবির্ভূত হয়। প্রসাধনকে মুখ্য অভাব বলিবার কারণ আছে। প্রথম দৃষ্টিতে ইহাকে গৌণ অভাব বলিয়া বোধ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রমাণ অন্যরূপ বলে। ইতিহাস-অতীত যুগের মানব ভূগর্ভে আপনার অস্তিত্বের যে চিহ্ন প্রোথিত রাখিয়া গিয়াছে সেই প্রস্তরীভূত অবশেষও মানবের ভূষণপ্রিয়তার সাক্ষ্যদান করিতেছে। বস্ত্র-ব্যবহারের পূর্ব্বেই যে ভূষণের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে—ইহা পর্য্যটকগণ অবলোকন করিয়াছেন। এই ভূষণপ্রিয়তা মানবকে পশু হইতে পৃথক করিয়া তুলিয়াছে। তাই Theophile Gautier বলিয়াছেন—"No dog ever conceived of wearing ear-rings but the stupid Papuans, who eat clay and earth-worms, hang coloured berries and shells from their ears, while they go about stark naked."

এই সকল মুখ্য অভাবের পর গৌণ বা সভ্যতার অনুমোদিত অভাবের

স্থান নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত নয়। ধর্ম্ম, ললিতকলা, সমাজ-বৃত্তি, শিক্ষা ও স্বাচ্ছন্দ্য এই কয়েক শ্রেণীর অভাবকে গৌণ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

জার্ম্মান পণ্ডিত হারমান অভাবসমূহের আর এক রকমের শ্রেণী বিন্যাস করিয়াছেন। তাঁহার মতে অভাব নিম্নলিখিত কয়েক শ্রেণীর :— absolute ( শাশ্বত ) relative ( আপেক্ষিক ), higher ( উচ্চ ), ও lower ( নিম্ন ), urgent ( আশু ) capable of postponement (অবসর-সাপেক্ষ), positive (অনিবার্য্য) ও negative (ইচ্ছাধীন), direct ( মুখ্য ), indirect ( গৌণ ), general ( সাধারণ ) ও particular (বিশেষ) constant ( নিত্য ) ও interrupted ( নৈমিত্তিক ), permanent ( স্থায়ী ) ও temporary ( সাময়িক ), ordinary ( সাধারণ ) ও extraordinary (অসাধারণ ), present ( বর্ত্তমান ) ও future ( ভবিষ্যৎ ), individual ( ব্যক্তিগত ) ও collective ( সমাজগত ), private ( গোপনীয় ) ও public ( প্রকাশ্য ) ; এই সকল অভাব ও তাহা দূর করিবার চেষ্টা হইতে সর্ব্ববিধ সাহিত্য বিজ্ঞান ও ললিতকলার উৎপত্তি হইয়াছে। সমাজ-তত্ত্বের মূলেও এই একই কথা বর্ত্তমান আছে। অর্থ-বিজ্ঞানবিৎ ইংরাজ পণ্ডিতগণ অর্থনীতির এই মূল-ভিত্তির প্রতি একেবারেই লক্ষ্য করেন নাই। তবে আদম স্মিথের সমসাময়িক ফরাসি অর্থ-বিজ্ঞানবিৎগণ এই দিকের আলোচনায় মন দিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রণীত প্রত্যেক অর্থ-বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থেই কতকাংশ অভাবের প্রকৃতি আলোচনার জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিত। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে ফরাসি পণ্ডিত লা ট্রসন্ ( La Trosne ) এ বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি অভাব সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন।

(i) অত্যন্তাবশ্যক, (ii) আবশ্যক, (iii) আরাম ও সুবিধাজনক।
Imperious, necessary, (for convenience&enjoyment)

পণ্ডিতবর কণ্ডিলাক (condillac) তাঁহার সুবিখ্যাত গ্রন্থে "বাণিজ্য ও রাজনীতি" "Le commerce at le Government" প্রথম অধ্যায়ের নামকরণ করেন "want বা অভাব" ; তাঁহার বিবেচনায়, মানবের প্রয়োজনীয়তার (need) উপর জিনিষের মূল্য নির্ভর করে ; অভাব প্রয়োজনীয়তার জনক। এই জন্য তিনি অভাবের প্রকৃতির আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে



অভাব দুই শ্রেণীর (i) constitutional বা প্রকৃতিগত, (ii) অভ্যাসোৎপন্ন (consequence of habit)। ফরাসি পণ্ডিত বাষ্টিয়াট (Bastiat) বলেন, অর্থ-বিজ্ঞানের বৃত্ত এই তিনে সম্পূর্ণ হইয়াছে "অভাব, তন্নিবারণ—প্রয়াস ও আনন্দ"। যদি চ মুখ্যভাবে অর্থ-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় ও অভাবের এত দূর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আবিষ্কার ইংরাজ অর্থ-বিজ্ঞানবিৎগণ করিতে পারেন নাই, তত্রাচ তাঁহাদিগের মধ্যে পণ্ডিত সিনিয়ার এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রকারান্তরে অনুভব করিয়াছিলেন ; তিনি বলেন, Love of Variety বা বৈচিত্র্যবোধ মানব হৃদয়ের একটি আদিম শক্তি। বৈচিত্র বোধশক্তির ফলে অভাব অনুভূত হইয়া থাকে।

অর্থনীতিশাস্ত্র একাধারে সমাজবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান। ইহাতে সামাজিক অর্থের সৃষ্টি, বৃদ্ধি ও বিভাগের আলোচনার সহিত মানব সমাজের সুখ দুঃখ, উন্নতি ও অবনতির আলোচনা ও তাহা প্রতিকার করিবার নিয়ম সমূহের আবিষ্কারের স্থান আছে। অর্থের উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও বিভাগ যথাভাবে হইলে মানবসমাজের দৈন্য দূর হয়, স্বাস্থ্য, আনন্দ ও আরাম বৃদ্ধি হয়, অর্থনীতি সেই সকল তত্ত্বান্বেষী।

মানুষ তাহার জীবন ধারণ ও পরিণতির জন্য বহির্জগতের উপর নির্ভর করে। বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের বিকাশের সহিত মানুষ বহির্জগৎ হইতে অধিক পরিমাণে আপনার উন্নতিকর উপাদান সংগ্রহ করিয়া লইতে আরম্ভ করে। বহির্জগতের কোন দ্রব্য লাভ করিবার চেষ্টা একটা অভাববিশেষ। অভাব হইতেই ইচ্ছার উৎপত্তি ; ইচ্ছা সংগ্রহ করিবার চেষ্টার জননী ; চেষ্টা সফল হইলে আনন্দ ও বিফল হইলে দুঃখের সৃষ্টি।

অর্থনীতি শাস্ত্রের ভাষায় কোন দ্রব্য পাইবার একান্ত ইচ্ছার নাম সেই দ্রব্যের প্রয়োজন ( demand ) বা টান। নিগূঢ়ভাবে অভাব অনুভবকে demand বলিলেও চলিতে পারে। আর, অনুভূত অভাব দূরীকরণের চেষ্টাকে অর্থনীতি শাস্ত্রের ভাষায় supply বা যোগান বলিতে পারা যায়। সমাজের আদিম অবস্থায় মানুষ বন্যজন্তুর মাংস বা বনজ ফলমূল ভক্ষণ পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিত। তখনকার এই স্বাভাবিক demand ক্ষুধা নিবারণের জন্য supply বা আহার্য্য তাহাকেই সংগ্রহ করিয়া লইতে হইত।

অনুন্নত সমাজের একটা লক্ষণ এই যে, তখন শ্রমের বিভাগ বা বিন্যাস থাকে না। নিজের অভাব নিজের চেষ্টাতেই দূর করিতে হয়। যখন অভাব অল্প ছিল, তখন শ্রম বিভাগের আবশ্যকতা ছিল না কিন্তু উন্নতিশীল যুগে যখন নিত্য নূতন অভাবের অনুভূতি সমাজকে অভিভূত করিয়া তুলিল, সেই সময় ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর অভাব নিবারণের জন্য শ্রম-বিভাগ আবশ্যক হইয়া উঠিল। এই শ্রম-বিভাগের ফলে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর শ্রমজীবী, শিল্পী ও বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন ও বিচিত্র অভাব নিবারণ কার্য্যে বা supplyএ নিয়োজিত হইল।

যে সকল কার্য্য মানবের অভাব দূর বা নিবারণ করে, মানবের সেই কার্য্যসমূহের নিয়ম আবিষ্কার বা আলোচনা করা অর্থনীতির অভিপ্রেত। মনস্তত্ত্ব, বিশুদ্ধ সমাজ-বিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রের সহিত অর্থনীতির প্রভেদ এই যে, অর্থনীতি মানবের অভাব ও তাহা নিবারণের চেষ্টা, এই উভয়কে অর্থের হিসাবে পরিমিত করিয়া তদ্বিষয়ক আলোচনা করে। অর্থাৎ অর্থনীতি শাস্ত্রের আলোচ্য প্রধান বিষয় ঃ—

(ক) সেই সকল কারণ, যাহার দ্বারা অভাবের মূল্য নিয়মিত হয়।

(খ) সেই সকল কারণ, যাহার দ্বারা অভাব নিবারণের চেষ্টার মূল্য নিরূপিত হয়।

(গ) এই উভয়বিধ কারণের সমন্বয়।

মানুষের অভাবের আলোচনা অর্থনীতি শাস্ত্রের মূলভিত্তি। কিন্তু অর্থ-নৈতিক পণ্ডিতগণ বহুকাল অর্থনীতির দিক্ হইতে এ বিষয়ের সম্যক আলোচনা করেন নাই। মানুষকে কেবল মুদ্রা-উৎপাদক যন্ত্র বলিয়া বিবেচনা করা প্রাচীনতন্ত্রের অর্থ-নৈতিক পণ্ডিতগণের প্রথা ছিল। তাঁহারা একথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন যে, মানব সামাজিক জীব—সে যে অর্থ উপার্জ্জন করে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বৃদ্ধিই তাহার প্রবর্ত্তক হেতু। একথা স্মরণ রাখা সবিশেষ কর্ত্তব্য। অর্থনীতির নিয়ম সকল মানবের প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত; তাহার পরিবর্ত্তে যদি অর্থনীতির নিয়ম সকল কল্পিত মানব-যন্ত্রের কল্পিত গুণাবলীর উপর স্থাপিত হয়, তবে তাহারা কাল্পনিক হইয়া উঠে ও সমাজের উন্নতির পথও রোধ করিতে পারে। সেই জন্য অর্থ-নৈতিক নিয়ম সকল মানবের নৈসর্গিক প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। সুতরাং অর্থ-



নৈতিকের পক্ষে তাহার আলোচ্য বিষয়ের দিক হইতে মানবের অভাব সকলের আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

( ক্রমশঃ )

শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ বাগচী।

---

# পতিত ব্রাহ্মণ।

( আমরা ) ব্রাহ্মণ বলে' নোয়ায় না মাথা,
কে আছে এমন হিন্দু ?
আমাদেরি কোনও পূর্ব্ব পুরুষ
গিলে ফেলেছিল সিন্ধু !
গিরি গোবর্দ্ধন ধরে' ছিল যেই,
মেরেছিল রাজা কংসে,
তার বক্ষে যে লাথি মারে, সে যে
জন্মেছিল এই বংশে ;
( বাবা, ) এখনো রেখেছি গলায় ঝুলিয়ে
অমন ধোলাই পৈতে ;
তোমরা মোদের সম্মান করিবে—
সে কথা আবার কইতে ?

আগেকার মত মুখ দিয়ে আর
বেরোয় না বটে আগুন,
( কিন্তু ) কথার দাপটে এ দুনিয়া মারি,
সাহস থাকেতো লাগুন !
যদিও এখন অভিশাপ দিয়ে
কর্ত্তে পারিনে ভস্ম ;
কিন্তু ) হাওয়ায় তর্কে গিরি উড়ে যায়,
তোমরা আবার কস্ত ?
( বাবা, ) এখনো রেখেছি গলায় ঝুলিয়ে
ইত্যাদি।

পৌরোহিত্য করে' থাকি আর
করি মোরা গুরুগিরি হে ;
আর নরক হইতে দুহাত তুলিয়া
দেখাই স্বর্গের সিঁড়ি হে ;
অনুস্বার আর বিসর্গের যোগে
বাজাই এমনি আখড়াই,
( যে ) যজমান আর শিষ্যবর্গে
বেমালুম ভাবে পাকড়াই ;
( বাবা, ) এখনো রেখেছি ইত্যাদি।

যদিও করেছি চটির দোকান,
ঠেল্‌ছি বেড়ি ও হাতাটা :
( কিন্তু ) টিকিটি সুদ্ধ বজায় রেখেছি
মহর্ষি ব্যাসের মাথাটা ;
মদটা আস্‌টা খাই, মাসে মাসে
পড়েও থাকি গো খানাতে ;
( আর ) ব্রাহ্মণ বলে' চিনিতে না পেরে'
ধরেও নে যায় থানাতে !
( কিন্তু ) এখনো রেখেছি ইত্যাদি।

যদিও ভুলেছি সন্ধ্যা ও গায়ত্রী,
জপ তপ ধ্যান ধারণা,
( কিন্তু ) ব্রাহ্মণত্ব কোথা যাবে ?—সোজা
কথাটা বুঝিতে পার না ?
টুক ক'রে ঢুকে' চাচার হোটেলে
খাইনিষিদ্ধ পক্ষী,
( আর ) ভোরে উঠিয়া গীতা নিয়ে বসি,
বাবা বলে ছেলে লক্ষ্মী !
( বাবা, ) এখনো রেখেছি ইত্যাদি।



চুরি কি ডাকাতি, খুন কি জখম,
যা খুসী দু'হাতে করে যাই ;
পক্ষী তো ভাল, রাস্তায় যদি
আস্ত "—"টা ধরে' খাই ;
আমরা হচ্ছি জেতের কর্ত্তা
আমাদের জাত নিবে কে ?
( এই ) স্বার্থের পাকা বেদীর উপরে
গলা টিপে মারি বিবেক !
( বাবা, ) এখনো ঝুল্‌ছে ব্রহ্মণ্য তেজের
Leyden jar এ পৈতে ;
তোমরা মোদের সম্মান করিবে—
সে কথা আবার কইতে ?

শ্রীরজনীকান্ত সেন।

---

# জেনার্ল মার্টিন।

কলিকাতায় খৃষ্টান বালক বালিকাদিগের শিক্ষার্থ সংস্থাপিত বিদ্যালয়-গুলির মধ্যে লামার্টিনিয়ার কলেজ সুপরিচিত। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের দারুণ ভূমিকম্পের পূর্ব্বপর্য্যন্ত এই বিদ্যালয়ের সমুচ্চ গম্বুজ কলিকাতার দক্ষিণাংশে বহুদূর হইতে দৃষ্ট হইত। ভূমিকম্পে গৃহ জীর্ণ হইলে অর্থাভাবে গম্বুজের সংস্কার না করিয়া উহা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতার জীবনকথা অত্যন্ত কৌতুহলোদ্দীপক ও একান্ত অসাধারণ।

যৎকালে ভারতে মোগলসাম্রাজ্যের শ্মশানে সাম্রাজ্য সংস্থাপন চেষ্টায় ইংরাজ ও ফরাসী সচেষ্ট, তৎকালে বহু য়ুরোপীয় সৈনিক ধনের ও যশের আশায় ভাগ্যপরীক্ষার্থ ভারতে আসিতেন। ইঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা সিদ্ধ-কাম হইয়াছিলেন, মার্টিন তাঁহাদিগের অন্যতম। তিনি ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের দক্ষিণ অংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রেশমব্যবসায়ী ছিলেন। পিতা

পুত্রকে আপনার অনুস্থত কার্য্যে ব্রতী করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু চঞ্চলচিত্ত পুত্রের ভাগ্যপরীক্ষাস্পৃহা তাঁহার সেই বৈচিত্র্যবর্জ্জিত ব্যবসা অবলম্বনের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়, তিনি অল্প বয়সেই পলায়ন করিয়া সৈন্যদলে প্রবেশ করেন।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিচারীর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া ভারতে আগমনকালে লালি স্বীয় শরীররক্ষীদলের জন্য লোক চাহিলে মার্টিন আবেদন করিয়া ঐ দলে প্রবেশ করেন। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে ভারতে আসিয়াই তিনি স্বীয় নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন। লালি নিয়মের কোন প্রকার ব্যতিক্রম সহ্য করিতে পারিতেন না, এবং অধীনস্থদিগের প্রতি অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার করিতেন। ইহাতে তাঁহার শরীররক্ষীরা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠেন। শেষে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সেনাপতি কুট্ পণ্ডিচারী আক্রমণ করিলে তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া ইংরাজপক্ষ অবলম্বন করেন। কুট মাদ্রাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে মার্টিন বন্দী ফরাসীদিগের মধ্য হইতে ইংরাজপক্ষীয় একটি সেনাদল সংগঠনের প্রস্তাব করেন। তাঁহার প্রস্তাব গৃহীত হইলে তিনি সৈনিকবিভাগে কর্ম্মচারীর পদ প্রাপ্ত হন।

এই নবগঠিত সেনাদল সহ মার্টিন অল্প দিন পরেই বাঙ্গালায় প্রেরিত হইলেন। পথে জাহাজ জলমগ্ন হইবার সম্ভাবনা হওয়ায় তিনি বহুকষ্টে সেনাদল রক্ষা করিয়া কিছু বিলম্বে কলিকাতায় উপনীত হইলেন। ইহার কিছুদিন পরে তিনি ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত হন। কিন্তু কিছুদিন পরে তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ঐ সেনাদল বিদ্রোহী হওয়াতে তাহাদিগকে বিদায় দেওয়া হয়। তখন কোম্পানী তাঁহাকে অন্য পদ প্রদান করিলেন। তিনি জরীপ ও মানচিত্রাঙ্কনে পারদর্শী থাকায় উত্তর পূর্ব্ব বঙ্গে জরীপের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ঐ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করায় তিনি ঐরূপ কার্য্যে অযোধ্যায় প্রেরিত হন। এই সময় হইতে ভাগ্যলক্ষ্মী মার্টিনের প্রতি প্রসন্ন হইলেন।

অযোধ্যায় মার্টিন লক্ষ্ণৌকে তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রের সদর করিয়া তথায় অবসরকালে যন্ত্রবিজ্ঞানের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনিই এসিয়ায় সর্ব্ব-প্রথম ব্যোমজান ( বেলুন ) নির্ম্মাণ করেন। অযোধ্যার নবাব তাঁহার বেলুন



নির্ম্মাণের কথা ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারে তাঁহার অভিজ্ঞতার বিষয় অবগত হইয়া ইংরাজের অনুমতি লইয়া তাঁহাকে স্বীয় তোপখানার অধ্যক্ষ নিমুক্ত করিলেন।

এইবার মার্টিন স্বীয় অবস্থার উন্নতি করিবার সুযোগ পাইলেন। তিনি কর্ম্মকুশলতা হেতু অল্প দিনেই প্রভুর প্রিয়পাত্র ও বিশিষ্ট পরামর্শদাতা হইয়া উঠিলেন। পরবর্ত্তী বিংশবর্ষকাল সর্ব্ববিধ রাজনৈতিক বিপ্লবে তিনি সর্ব্বদাই অভ্রান্ত ছিলেন। ইংরাজের সহিত নবাবের কোন কার্য্যই মার্টিন ব্যতীত সম্পন্ন হইত না। কিন্তু তিনি কখন আপনার ক্ষমতা সাধারণসমক্ষে প্রকাশ করেন নাই। তিনি প্রকৃতপক্ষে নবাবের পরামর্শদাতা ও চালক হইয়াই তৃপ্ত ছিলেন। প্রকাশ্য দরবারে তাঁহাকে ক্বচিৎ দেখা যাইত; কিন্তু নবাবের নিকট মন্ত্রীদিগের উপদেশ অপেক্ষা মার্টিনের উপদেশ অনেক অধিক মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইত।

মার্টিনের বেতন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে "উপরি পাওনাও" বাড়িতে লাগিল। রাজপ্রসাদলাভপ্রয়াসীরা কার্য্যসিদ্ধির জন্য তাঁহাকে অর্থ ও বহুমূল্য উপহার দানে তুষ্ট করিত। তিনি সঞ্চিত অর্থ ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া আবশ্যককালে তাঁহাদের বেনামে নবাবকে ঋণ দিয়া অর্থ লাভ করিতেন। নবাবকে য়ুরোপীয় দ্রব্য-বিলাসী করিয়া তাঁহার জন্য য়ুরোপীয় দ্রব্য ক্রয়েও মার্টিন যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। এই সময় রাজ্যমধ্যে আভ্যন্তরীন উপদ্রবে ধনসম্পত্তি নিরাপদ নহে বুঝিয়া ধনীরা তাঁহার নিকট অর্থ গচ্ছিত রাখিতেন। তিনি তাহার জন্য শতকরা বার টাকা বাট্টা লইতেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার নীল ও অন্যান্য ভারতীয় দ্রব্যের ব্যবসাও ছিল। ফলে অল্পকাল মধ্যে তিনি আসাধারণ ধনী হইয়া উঠেন। তিনি অত্যন্ত কৃপণ ছিলেন এবং স্বদেশে স্বজনগণকে সামান্য অর্থ সাহায্য ব্যতীত আর কোনরূপ ব্যয়বাহুল্য করিতেন না।

জীবনে অর্থোপার্জ্জন ব্যতীত তাঁহার আর একটি ঈপ্সিত বিষয় ছিল। তিনি স্বীয় সৈনিক পদোন্নতির জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। নবাবের কার্য্যে যোগ দিয়া তিনি কোম্পানীর বেতন ত্যাগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সৈনিক পদ ত্যাগ করেন নাই। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত টীপু সুলতানের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে তিনি স্বীয় পদোন্নতির আশায় অশ্বারোহী ইংরাজ সেনাদলের

ব্যবহারার্থ কতকগুলি উৎকৃষ্ট অশ্ব প্রদান করেন। এ বিষয়ে তিনি সফল মনোরথ হইয়াছিলেন। কোম্পানী তাঁহাকে কর্ণেল পদে উন্নীত করেন। ইহার ছয় বৎসর পরে তিনি মেজর জেনার্ল পদ প্রাপ্ত হয়েন। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড টেনমাউথ ( সার জন সোর ) তাঁহাকে বিচক্ষণ ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। এই বর্ণনাতেই প্রকাশ যে তিনি বিশুদ্ধ ইংরাজী কহিতে পারিতেন না।

তিনি লক্ষ্ণৌ সহরে গোমতীতীরে প্রাসাদতুল্য গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে বাস করিতেন। এই গৃহ বহুতলে বিভক্ত ছিল। তিনি গ্রীষ্মকালে দারুণ তাপ হইতে আত্মরক্ষার্থ ভূগর্ভস্থ তলে, বর্ষাগমে জ্বরের ভয়ে সর্ব্বোচ্চ তলে ও শীতকালে মধ্যতলে বাস করিতেন। তিনি স্বয়ং বিচক্ষণ যন্ত্রবিজ্ঞান-বিদ্ ছিলেন এবং আপনার স্বাচ্ছন্দ্যবিধানকল্পে বিচিত্র কৌশলে গৃহ নির্ম্মিত ও সজ্জিত করিয়াছিলেন। নবাব এই প্রাসাদ ক্রয় জন্য উঁহাকে বহু অর্থ ( কীনের মতে দেড় কোটী টাকা ) দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহা বিক্রয় করেন নাই। শেষে তাঁহার মৃত্যুর পর যাহাতে প্রাসাদ নবাবের হস্তগত না হয়। তজ্জন্য তিনি গৃহের নিম্নতলে আপনার সমাধির ব্যবস্থা করিয়া যান। তিনি জানিতেন, মুসলমান কখন সমাধিতে হস্তক্ষেপ করে না।

জীবনের শেষ পঞ্চদশ বর্ষকাল পাথুরী রোগে কষ্ট পাইয়া ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ই সেপ্টেম্বর মার্টিন পরলোক গমন করেন। এই বৎসর ১লা জানুয়ারী তারিখে তিনি তাঁহার 'উইল' করিয়াছিলেন। এই চরম পত্র চল্লিশের অধিক দফায় বিভক্ত। তাঁহার অর্জ্জিত ও সম্ভৃত সম্পত্তির যে, সত্যই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। মূল্য বর্ত্তমান হিসাবে প্রায় ৭৫০০০০৲ টাকা। তিনি নির্দ্দেশ করেন যে, ইহার মধ্যে তিন লক্ষ টাকার সুদ হইতে লক্ষ্ণৌ, কলিকাতা ও চন্দননগর এই তিন স্থানে প্রত্যহ দরিদ্রদিগকে কিছু কিছু দান করা হইবে এবং দানের নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রস্তর ফলকে ইংরাজী, ফরাসী বা পারশীতে লিখিত থাকিবে যে, জেনার্ল মার্টিনের আদেশে তাঁহার অর্থ হইতে এই দান হইতেছে। তিনি তাঁহার নামে কলিকাতায় একটি বিদ্যালয় সংস্থাপনের জন্য বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টকে



বহু অর্থ দিয়া গিয়াছিলেন। সেই অর্থে মার্টিনিয়ার কলেজের প্রতিষ্ঠা। এতদ্ভিন্ন তিনি জন্মস্থান লায়ন্সেও কলিকাতার অক্ষম ঋণীগণকে কারামুক্ত করিবার জন্য, স্বজনগণের সাহায্যার্থ ও লায়ন্স নগরে অন্যান্য কর্ম্মে অনেক অর্থ দিয়াছিলেন। তিনি নির্দ্দেশ করেন যে, তাঁহার লক্ষ্ণৌস্থ প্রাসাদ কখন হস্তান্তরিত করা হইবে না; পরন্তু তাহা শাসকদিগের তত্ত্বাবধানে সমাধিরূপে ব্যবহৃত হইবে। তিনি স্বীয় দেহ রক্ষার ও সমাধির বিশেষ ব্যবস্থা করেন ও সমাধির উপর উৎকীর্ণ করিবার জন্য নিম্নলিখিত রচনা রচিত করিয়া যান ঃ—

"Major General Blande Martine,
Born at Lyons, January, 1738.
Arrived in India as a common soldier, and died at Lucknow,
the 13th of September, 1800, a major general;
and he is buried in this tomb.
Pray for his soul.

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জীবনে স্বীয় সৈনিক পদের উন্নতিতে তাঁহার বিশেষ আনন্দ ছিল। পাঠক দেখিবেন, তিনি স্বীয় সমাধিস্তম্ভ-লিপিতে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি সামান্য সৈনিক হইতে মেজর জেনার্ল পদে উন্নীত হন। মার্টিন অতি অল্প কথায় আপনার জীবনের ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবন যে অসাধু ও অশোভন কার্য্যে কলঙ্কিত হয় নাই, এমন নহে। তবে শতবর্ষাধিককাল পরে আজ মনে হয়, তাঁহার অকার্য্য সকল বিস্মৃতির অঙ্কে লুপ্ত হইয়াছে; কেবল তাঁহার দানের সৌরভে তাঁহার স্মৃতি সুরভিত।

শ্রীদেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

# বিড়ম্বনা।

( সমাজ চিত্র )

চৈত্র মাসের প্রায় মাঝামাঝি। দুপুর বেলা। চারিদিক ঝাঁঝাঁ করিতেছে! আগুনের হল্কার মত তপ্ত বাতাস বহিতেছে। রৌদ্র এত প্রখর যে, তাহার দিকে চাওয়া যায় না। চৈত্র মাস বসন্তের কাল, কিন্তু বসন্ত কবে অলক্ষ্যে আসিয়া অলক্ষ্যে চলিয়া গিয়াছে কেহ তাহা জানিতেও পারে নাই। আম্র বৃক্ষের শাখাগ্রভাগে ও লিচু গাছের ঘন পল্লবাগ্রে যদি অজস্র মুকুলচিহ্ন না রাখিয়া যাইত, তবে বসন্তের আগমন কেহ বিশ্বাসই করিত না। ভয়ানক গ্রীষ্ম; আকাশে কালো মেঘের চিহ্ন মাত্র নাই, কেবল জ্বলন্ত রৌদ্রের উপরিভাগে জ্বলন্ত রূপার পাতের মত শুভ্র অগ্নিবর্ষী মেঘরাশি। নিম্নে পৃথিবী যেন সেই অগ্নিকুণ্ডের উত্তাপে মূর্চ্ছাহত হইয়া পড়িয়া আছে। সংজ্ঞা নাই—কোন সাড়াশব্দ নাই; জীবনের কোন লক্ষণই যেন লক্ষ্যগোচর হয় না। গৃহে গৃহে দ্বার বাতায়ন সব বন্দ।

এমনি সময়ে, কলিকাতার অনতিদূরস্থ ক্ষুদ্র কেয়ূর গ্রামের একখানি পুরাতন জরাজীর্ণ একতল বাড়ীর প্রকোষ্ঠে একটী তরুণকণ্ঠ করুণস্বরে কহিল —'মা, দেখনা বেলা পড়্‌ল কি না'। একটি প্রৌঢ়া রমণী জানালার নিকট আসিয়া একপাটি জানালা ঈষৎ ফাঁক করিয়া একবার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিলেন এবং পুনরায় জানালা বন্দ করিয়া দিয়া কন্যার পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। বলিলেন, 'কৈ, মা বেলা ত এখনো পড়ে নাই।' মেয়ে আর কোন কথা কহিল না। সঙ্গে সঙ্গে মায়ের একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস গৃহের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বহিয়া গেল।

কিয়ৎকাল মায়ে ঝিয়ে আর কোন কথা হইল না। অনেক্ষণ পরে কন্যা পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিল এবং কাতর স্বরে কহিল 'উঃ—মা'! মা কোন কথা কহিলেন না—কেবল ঘটি হইতে গামছা ভিজাইয়া লইয়া মেয়ের কপালে, চোখে, কানে বুলাইতে লাগিলেন। বালিকা সেই আর্দ্র ঘরের মেঝের উপর লুটাইয়া এপাশ-ওপাশ করিতে লাগিল। কখনো মায়ের পায়ের উপর



ললাট রাখিয়া কখনো মেঝেতে গণ্ড পাতিয়া ঠাণ্ডা মাটীর শীতল স্পর্শলাভের চেষ্টা করিতে লাগিল।

কিরণ বালবিধবা—বিবাহের পর ছয় মাস যাইতে না যাইতেই স্বামীকে হারাইয়াছে। স্বামী কেমন—তাহা কেবল সেই বিবাহের সময় একবার চাকিতের মত দেখিয়াছিল। সম্বন্ধ সেইটুকু মাত্র। বিবাহের পর আর দ্বিতীয়বার শ্বশুরগৃহে যায় নাই; বাপের বাড়ী থাকিতেই শ্বশুরগৃহের সম্বন্ধ হারাইয়া বসিয়াছে।

আজ তাহার প্রথম একাদশী। বিবাহের বন্ধন সুখের কি দুঃখের তাহা জানিবার পূর্ব্বেই, আজকার যে কঠিন বন্ধন তাহার গলায় আঁটিয়া বসিয়াছে, তাহাতে একাদশবর্ষীয়া বালিকার প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছে।

অসহ্য তৃষ্ণায় বালিকা ডাকিল 'মা'! নিরুপায় জননী আবার তাহার গায়ে ভিজা গামছা বুলাইতে লাগিলেন।

কিন্তু এমন করিয়া কতক্ষণ সময় কাটে? চৈত্রের সুদীর্ঘ বেলা কি যায়—না, দারুণ পিপাসা আর্দ্র বস্ত্রের প্রলেপে প্রশমিত হয়?

বালিকা শুষ্ককণ্ঠে আবার কহিল 'মা; আর বাঁচিনাত'! বলিয়া ভিজা গামছার উপর মুখ লুকাইল। এবারে মাতার অশ্রু আর বারণ মানিল না। কন্যাকে সাহস দিবার জন্য তিনি যে পাষাণে বুক বাঁধিয়াছিলেন, পাষাণ এবারে গলিয়া গেল; অশ্রুমোচন করিতে করিতে জননী ভাবিলেন, এই সবে বেলা তিনটার বাঁশী বাজিল, বাকী বেলা এবং সমস্ত রাত্রিত পড়িয়াই আছে; মা আমার বাঁচিবে কি করিয়া?

কিরণ বৃক্ষচ্যুত মাধবীলতাটির মত ভূমিতে লুটাইতে লাগিল।

বিধবা যে, তাহার রূপের বর্ণনা অনাবশ্যক, কিন্তু হতভাগিনী কিরণের শীর্ণ ছোট মুখ খানির পরিচয় দিতে তেমন বাধা দেখিতেছি না; কারণ সে রূপ দগ্ধ করে না, শীতল করে; তাপ দেয় না, আলোক দেয় এবং সে আলোক তীব্র দীপ্তিশালী নয়—কোন মতে তাহাতে ঘরের কাজ চলিয়া যায়, এই মাত্র। কখনো কখনো সন্ধ্যার পূর্ব্বে দিনের আলো না নিভিতেই আকাশে চাঁদ দেখা যায়। দিবালোকের নিমিত্ত তাহা সহজে দেখা যায় না কিন্তু যদি একবার দৃষ্টি পড়ে, চক্ষু আলোক ছাড়িয়া সেই পাণ্ডুর হীনপ্রভ চন্দনশীতল

চন্দ্ররেখার দিকে চাহিয়া শান্তি লাভ করে। কিরণের অনুজ্জ্বল সুন্দর মুখখানি সেই অপরাহ্নের চন্দ্রলেখা; অনাড়ম্বর ও অচঞ্চল বলিয়া চট্ করিয়া চোখে পড়ে না কিন্তু একবার চোখে পড়িলে, তাহার স্নিগ্ধ মাধুর্য্যে চোখ জুড়াইয়া যায়।

বালিকার যন্ত্রণা দূর করিবার কোন উপায় না দেখিয়া নূতন দিকে মন আকৃষ্ট করিবার মানসে গৃহিনী উঠিয়া গিয়া রান্নাবাড়ীর দিকের দরজা খুলিয়া দিলেন। সেখানে স্বামীর জন্য সকালের রান্নার বাসন তেমনি পড়িয়া আছে। স্বামী সেই সকালে খাইয়া আপিষে গিয়াছেন—আসিতে রাত্রি সাতটা হইবে। ততক্ষণ একলা এই মেয়েকে লইয়া কি করিয়া সময় কাটিবে, ভাবিয়া অস্থির হইতে লাগিলেন। ফটিক ইস্কুলে গিয়াছে, সে আসিলেও যে হয়! স্বামীর উপর একটা অভিমানের মেঘ তাঁহার মনে ঘনাইয়া উঠিল। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, আজ আবার তাঁহার বাড়ী ফিরিতে রাত্রি দশটা বাজিবে বলিয়া গিয়াছেন। নিকটে কোথায় এক সভা আছে। নকুড়বাবু বিখ্যাত বক্তা। সভার উদ্যোগিগণ তিন চার দিন তাঁহার নিকট হাঁটাহাঁটি করিয়া তাঁহাকে উক্ত সভায় বক্তৃতা করিতে রাজি করিয়া গিয়াছে।

এদিকে শারীরিক কষ্টে কিরণ ক্রমে অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিল। গ্রীষ্মের বেলা কাটিতে চাহে না। রৌদ্রের প্রকোপও প্রচণ্ড। তৃষ্ণায় বালিকার তালু হইতে বুক পর্য্যন্ত শুকাইয়া উঠিয়াছে। ওষ্ঠ ও জিহ্বা শুষ্ক নীরস; চক্ষু রক্তবর্ণ। অসহ্য কষ্টে বালিকার অন্য কথা বলিবার সামর্থ্য নাই। কেবল মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে মাকে ডাকিতেছে। পৃথিবী মরুভূমি; চারিদিকে তপ্ত বালুকা ছাড়া আর কিছুই নাই। যাহা কিছু শান্তি, যাহা কিছু সরসতা, তাহা যেন এই 'মা' কথাটির মধ্যে সঞ্চিত আছে। বালিকা এই দারুণ কষ্টের সময় বারবার তাহাই যেন পরখ করিয়া করিয়া দেখিতেছে। কিন্তু তাহাতে আরো মায়ের হৃদয় যে কি করিয়া ফাটিয়া যাইতেছে, তাহা যিনি এই প্রকার হতভাগিনীকে গর্ভে ধরিয়াছেন, তিনিই জানেন।

রান্নাবাড়ীর উন্মুক্ত দরজাপথে তপ্ত বায়ু বহিতে লাগিল। তবু অন্ধকার ঘরের মৌন বিষাদভার বন্দ থাকিয়া আরো যেন জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছিল, তাই মুক্ত পথে তাহা যেন কতকটা হাল্কা করিয়া দিবার জন্য গৃহিনী দ্বার মুক্তই রাখিলেন।



কিরণ দেখিতে লাগিল—আস্তাকুড়ের জল নিকাশ পথের নিকটে আর্দ্র মাটীতে পালিত হাঁসটি বুক পাতিয়া ছায়ায় শুইয়া আছে। তাহারই জোড়াটী ধীরে ধীরে, একবার দক্ষিণে, একবার বামে হেলিয়া দুলিয়া নর্দ্দমার ছ্যাদ্‌লা ও পরিত্যক্ত ভাত খুঁটিয়া খুঁটিয়া খাইতেছে। আহারের সময় তাহার ঠোঁট জোড়াটি গ্রামের বৃদ্ধ অন্ধ ফকিরের ফাটা লাঠি গাছটির মত ঘন ঘন কাঁপিতেছে ও ঠক্‌ঠক্ শব্দ করিতেছে। নর্দ্দমার গায়ে, যেখানে রান্নাঘরের জল নিকাশের মুখ, সেইখানে স্যাঁৎসেতে স্থানে যে সামান্য শেওলা জন্মিয়াছে, একটি প্রজাপতি সেই ঠাণ্ডা ছায়ায় বসিয়া বসিয়া পালক দোলাইতেছে। ক্ষণে-যুক্ত ক্ষণে-মুক্ত সেই ছোট্ট রঙিন পাখা জোড়াটির উপর বালিকা কতক্ষণ চাহিয়া রহিল। আলিসার কোনে ছায়ায় বসিয়া একটি কাক মুহ্যমান ভাবে ঝিমাইতেছে। আর কয়েকটা কলরব করিয়া নর্দ্দমার জলে থাকিয়া থাকিয়া স্নান করিতেছে ও ক্ষণে ক্ষণে জল পান করিয়া তৃষ্ণা-বিরস কণ্ঠ ভিজাইয়া লইতেছে। রান্নাঘরের পাশেই একটি কদ্‌বেল গাছ। অজস্র ফুল ধরিয়া সমস্ত গাছটি যেন একেবারে ছাইয়া ফেলিয়াছে। সেই পুষ্পরাশি ও চিক্কণ নবপল্লবান্তরাল হইতে মৌমাছিদের একটা নিবিড় গুঞ্জনধ্বনি থাকিয়া থাকিয়া কর্ণে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। এমন সময়, মাথায় গামছা দিয়া নৃত্যদাসী আসিয়া প্রথমেই গৃহিনীকে কহিল, 'ওমা, শুনেছ, পাড়ার তরঙ্গিণী ঠাকরুণের মেয়েটির কপাল পুড়েছে। জ্বরবিকারে জামাইটি আজ তিন দিন হ'ল মারা গিয়েছে—আজ চিঠি এল। আহা! এই সবে এক বছরও পেরোইনিগো! এই সেদিন শ্বশুর বাড়ী যেতে কত কাঁদাকাটা কচ্ছিল। যেতে কি চায়? পূজোর সময় আবার আন্‌ব বলে কত করে' বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাক্‌রুণ পাঠিয়ে দিল। হয়ে গেল!—এইবারে আনুক্!' আহা! বলিয়া নৃত্য মাথার গামছা নামাইয়া আঁস্তাকুড়ের এঁটো বাসনের রাশ্ লইয়া পড়িল। এই দারুণ শোকসংবাদে মা ও ঝিয়ের কেহ কোন কথা কহিলেন না। মা কেবল একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন; মেয়ে শুধু বলিল—'মাঃ'! ঐ এক 'মা' কথাটির মধ্যে কি যে মর্ম্মান্তিক দুঃখ ব্যক্ত হইল, তাহা এই শোকার্ত্ত জগতের জননী ভিন্ন আর কে বুঝিবে? নিজের কষ্ট

পরের কষ্টের সঙ্গে মিলিয়া বুকের মধ্যে আরো যেন চাপিয়া ধরিল। কিরণ আবার ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। তাহার চোখের পাশ দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল এবং জননী তাহা মুছাইতে গিয়া নিজে কাঁদিয়া ফেলিলেন।

তখনো চারটার গাড়ী যায় নাই—সদর দরজায় ঘা পড়িল—'দিদি'। জননী তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া দুয়ার খুলিয়া দিলেন। শেলেটের উপর খবরের কাগজের মলাট দেওয়া, মসীচিহ্নিত শিশুশিক্ষা ও ধারাপাত লইয়া ফটিক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ললাটে ঘাম ও মুখচোখ লাল দেখিয়া জননী বলিলেন—'ঘেমেছিস্ যে ; ওমা, ছাতা খুলে' মাথায় দিস্ নি বুঝি?'—বলিয়া তাহার মুখ মুছাইয়া দিলেন। বাস্তবিকই বালক ছাতা খুলিয়া মাথায় দিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। সে সেকথার কোন জবাব দিল না। দিদিকে মেঝেয় শুইয়া থাকিতে দেখিয়া শুধাইল—'মা, দিদির কি অসুখ ক'রেছে! সে যে আজ খাবারের পয়সা দিয়া দিদির জন্য পথ হইতে পেয়ারা কিনিয়া আনিয়াছে! বলিয়া, ছোট পকেট হইতে টানাটানি করিয়া দুইটা বড় বড় পেয়ারা বাহির করিয়া মার হাতে দিল। অসুখ বলিতে যাহা বুঝায় তাহা নয়, অথচ সুখের অভাব আর কাহাকে বলে! মা তাহার প্রশ্ন তাড়াতাড়ি চাপা দিয়া কহিলেন—'চারটে বাজে নি, এরি মধ্যে চলে' এলি যে'! ফটিক কুলুঙ্গিতে শেলেট রাখিয়া দেয়ালে ছাতাটি ঠেস দিয়া রাখিতে রাখিতে কহিল—'আজ গুরুমশায়ের একাদশী ; তাঁর বড় ক্ষিদে পেয়েছে বলে' সকাল সকাল ছুটী দিলেন যে'!

মা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিলেন "হায়! কিরণকে যদি একটু জল খেতে দিতেও পেতাম্!" শাস্ত্র এমন করিয়াও মাতৃহৃদয়কে নির্দ্দয় করিয়া তুলিতে পারে—হৃদয়ধর্ম্ম অপেক্ষাও শাস্ত্র প্রবল!

দিদির বদলে মা তাহাকে আজ রান্নাঘর হইতে তাহার জলখাবারের রুটি আনিয়া দিলেন, ইহা বালকের নিকট একটু কেমন-কেমন বোধ হইল। কিরণ ততক্ষণ উঠিয়া কলসী হইতে জল গড়াইয়া লইল ও ভায়ের আহারের কাছে বসিল। সে না খাওয়াইলে যে তাহার এই স্কুলে-পড়া প্রায়-সমবয়স্ক ভাইটির খাওয়া হয় না—সেই কথা মনে হইয়া আজ এই কষ্টের সময়ের বালিকার স্নেহ উছলিয়া উঠিল এবং তাহার উপবাসক্লিষ্ট তৃষ্ণাকাতর স্নেহ



কোথা হইতে এক শক্তির সঞ্চার হইল। কিন্তু গেলাসে জল ঢালিয়াই তাহার শীতল স্পর্শে ও টল্‌টলে দৃষ্টিতে বালিকার তৃষ্ণা যেন আবার বাড়িয়া উঠিল। সহজ অভ্যাসক্রমে গেলাসটি একবার মুখের কাছে তুলিতে গিয়া সহসা মনে পড়িল, কি করিতেছি! তাড়াতাড়ি অপ্রতিভভাবে গেলাসটি ভায়ের কাছে রাখিয়া দিল। বালক তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল "দিদি, তুই জল খা না, খেয়ে আমায় দে।" কিরণ ধরা পড়িয়া লজ্জিত হইয়া বলিল "না রে না, তুই খা।" বালক জেদ করিয়া বলিল "না, তুই না খেলে' আমি খাব না, কিছুতেই খাব না।" বালক হাত গুটাইয়া বসিল ; তখন নিরুপায় কিরণ বলিল "লক্ষ্মী ভাইটি, তুই খা। আমার আজ কিছু খেতে নেই। আজ একাদশী।" বালক আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "তুই বুঝি একাদশী করেছিস? তা, জল খেতে' কি? আমাদের পণ্ডিত মশায় ত লুচি সন্দেশ কত কি খাচ্চেন দেখে' এলাম।" কিরণ বলিল "ওরে! পুরুষ মানুষের আছে, মেয়ে মানুষের খেতে' নেই।" এই অকাট্য যুক্তি শুনিয়া বালক স্তম্ভিত হইয়া দিদির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার আর আহার মুখে রুচিতে ছিল না।

আহারান্তে দিদির নিকট আসিয়া ফটিক একবার দিদির গায়ে হাত দিয়া দেখিল। দিদি একটু ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল—'যা, কি হয়েছে'? যে কষ্টে প্রাণ ফাটিয়া যায়, এই বয়স হইতেই নারীকে তাহা গোপন করিতে শিখিতে হয়!

তারপর ভায়ের মুখে স্কুলের গল্প শুনিতে শুনিতে ক্রমে বেলা যখন একটু পড়িয়া আসিল, তেজ কমিয়া আসিয়া রোদ যখন শ্বেত আলিপনার মত গৃহ চূড়ায় ও তরুশিরে আসিয়া ঠেকিল ; কতক সহজনিত অভ্যাসে, কতক বা সন্ধ্যা সমাগমের রমণীয়তায় এবং ভায়ের সহিত গল্প করিবার উৎসাহে শারীরিক ক্লেশ যখন ঈষৎ প্রশমিত হইল, কিরণ ভায়ের হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে খিড়কির পুকুরের পোলে আসিয়া বসিল। তখন সন্ধ্যার হাওয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে ; পুকুরের ধারে তাহাদের যে কয়টা আমগাছ আছে, তাহারি মুকুল ঝরিয়া ঝরিয়া ঘাটের পথটি একেবারে ছাইয়া ফেলিয়াছে। মধু-প্রয়াসী মৌমাছির দল তখনো গুণ গুণ করিয়া পল্লব হইতে পল্লবান্তরে উড়িয়া

উড়িয়া বসিতেছে এবং তাহাদের চঞ্চল পক্ষস্পর্শে পূর্ণবিকশিত শিথিল মুকুল রাশি খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে। সন্ধ্যার বাতাস পুষ্করিণীর কালো জলের গায়ে কাঁটা দিতেছে। তাহারই উপর নয়ন রাখিয়া ভাইবোনে কত কি ছোট খাটো গল্প করিতে লাগিল। ক্রমে মৌমাছিদের গুঞ্জনধ্বনি আরো বাড়িয়া উঠিল দেখিয়া ফটিক শুধাইল, 'আচ্ছা দিদি—উহাদের শব্দ বাড়্‌ছে কেন'? কিরণ কহিল 'বোধ হয় এবারে উহাদের বাড়ী যাবার সময় হয়েছে, তাই এ ওকে ডাক্‌ছে—নয়'? ফটিক এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া বলিল -'হাঁ, তাই বোধ হয়'। যখন এই দুটি ভাইবোনের মধ্যে এইরূপ নানা অনাবশ্যক প্রশ্নোত্তর এবং নানাবিধ অদ্ভুদ জল্পনা-কল্পনা চলিতেছিল, তখন নৃত্যদাসী আসিয়া কহিল, 'দিদি ঠাকরুণ, মা তোমাকে ডাকছেন'। সন্ধ্যার আঁধার তখন ছাইয়া আসিয়াছে। ঝরা মুকুল মাড়াইয়া ভায়েবোনে যখন গৃহে ফিরিল, তখন 'সন্ধ্যা' দিয়াছে। রোয়াকের উপর পাটী পাতিয়া মা মেয়েকে কাছে ডাকিলেন। ফটিক প্রদীপের আলোকে বই লইয়া বসিল। কিন্তু আজ বাদ্‌লাদের বাড়ীতে তাহার বেড়াইতে যাইবার কথা ছিল, দিদির সঙ্গে গল্প করিতে করিতে সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিল বলিয়া, বন্ধুর জন্য থাকিয়া থাকিয়া তাহার মন-কেমন করিতে লাগিল; তাই আজ ধারাপাত মুখস্থ করিতে ফটিকের ভাল মন বসিল না। আটটা না বাজিতেই সে পড়া সাঙ্গ করিয়া আহারান্তে শুইতে গেল।

মায়ের কোলের উপর মাথা রাখিয়া, তাঁহার কোমল করস্পর্শে আরাম পাইয়া ক্লান্ত কিরণ কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তাহা জানিতেই পারে নাই। সমাজের আইন যাহাকে দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছে, সন্ধ্যার স্নিগ্ধ বাতাস ও নিদ্রার উদার শান্তি কখন নীরবে তাহাকে কোলে টানিয়া লইয়াছে!

এদিকে, আপিষের চাপকানের উপর ফুলের মালা দুলাইয়া তোড়া হাতে নকুড় বাবু যখন গৃহে ফিরিতেছিলেন, তখন সাড়ে নটার তোপ পড়িয়া গিয়াছে। ষ্টেশন হইতে তাঁহার বাড়ী প্রায় মাইলখানেক পথ। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পরে এই পথটুকু বড় অল্প নহে। কিন্তু আজ তাঁহার শারীরিক ক্লান্তি তাঁহার মানসিক উৎসাহের নিকট আমল পাইতেছে না। সভায় তাঁহার সমাজ-সংস্কার বিষয়ক ওজস্বিনী বক্তৃতায় শ্রোতৃবর্গ এরূপ মুগ্ধ



ও চমৎকৃত হইয়াছিল যে, ছেলের দল তাঁহার গাড়ী না টানিয়া ছাড়ে নাই। তাহারা তাঁহার জয়ধ্বনি করিতে করিতে ষ্টেশন পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া গিয়াছে। সওদাগরী আপিসের কেরাণী নকুড় বাবুর পক্ষে ইহা অপেক্ষা গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে? তাই আজ সমস্ত দিনের শ্রান্তিতেও তাঁহার অবসাদ আনিতে পারে নাই। তিনি যখন এই রাত্রি দশটার সময় সুপ্তিমগ্ন নিরীহ কেয়ূর গ্রামের স্বল্পালোকিত কঙ্করখচিত পথে একাকী গৃহে ফিরিতেছিলেন, তখন পদে পদে বিজয়ীর বীরদর্প ই প্রমাণ হইতেছিল! যখন গৃহে পৌঁছিলেন, তখন দশটা বাজিয়া গিয়াছে। জাগিয়া থাকিলেও, পাঁচ সাতবার ডাকাডাকির পর গৃহিনী উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন কিন্তু অন্যদিনের মত সোৎসুক প্রশ্নের কোন আগ্রহ দেখা গেল না। নকুড় বাবু আজ মনের আবেগে ইহা লক্ষ্য করিয়াও লক্ষ্য করিলেন না; তিনি মহা গর্ব্বের সহিত ফুলের মালা ও ফুলের তোড়ার ইতিহাস বলিতে বসিলেন। কহিলেন 'সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে কেহ কখনো এমন বক্তৃতা দিতে পারে নাই বলিয়া স্বয়ং সুরেন্দ্র বাঁড়ুয্যে সহস্রের মধ্যে আজ আমাকে এই মাল্যদান করিয়াছেন, জান'! বলিয়া গর্ব্বিতভাবে গৃহিনীর দিকে চাহিলেন। গৃহিনী সে কথায় মনোযোগ মাত্র না করিয়া কন্যার শয্যায় গিয়া বসিলেন। নকুড় বাবু সহসা থমকিয়া গিয়া কন্যার দিকে চাহিলেন—দেখিলেন কনকলতা ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতেছে। এতক্ষণে তাঁহার প্রথম মনে হইল, আজ ত কিরণ মাসিয়া তাঁহার চাপকান খুলিয়া দেয় নাই! উদ্বিগ্নকণ্ঠে তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া শুধাইলেন, 'কি হয়েছে কিরণের'? গৃহিনী তবুও কোন কথা কহিলেন না। গোলমালে জাগিয়া উঠিয়া কিরণ আবার তৃষ্ণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল; সে কাতরকণ্ঠে কহিল, 'মা আর বাঁচিনা—একটু জল'! মুহূর্ত্তের মধ্যে নকুড় বাবুর আর বুঝিতে কিছু বাকী রহিল না—তিনি বজ্রাহতের ন্যায় ব্যথিত ও বিস্মিত হইলেন।

সভামঞ্চের বিজয়ী বীর, দুঘণ্টা পূর্ব্বের বক্তৃতাযুদ্ধের বরেণ্য 'বক্তিয়ার'কে কে যেন কষাঘাৎ করিল! সভামণ্ডপের খ্যাতিচটুপটাধ্বনি যাহা অনবরত তাঁহার কর্ণে বাজিতেছিল, তাহা নিমেষের মধ্যে অপসৃত হইল এবং তাহার স্থানে একটী রুগ্ন ক্লিষ্ট কন্যার করুণকণ্ঠ কেবলি কর্ণে বাজিতে লাগিল—'আর

বাঁচিনা, একটু জল'। বক্তৃতা ও বাস্তবের বিড়ম্বনাময় বৈষম্য জ্বলন্ত অঙ্গার দিয়া এক মুহূর্ত্তে কে যেন তাঁহার হৃদয়ে দাগিয়া দিয়া গেল! বাক্য ও কর্ম্মের অসম্ভব অনৈক্য অনুভব করিয়া নকুড় বাবুর চিত্ত লজ্জায় ধিক্কারে একেবারে ভরিয়া উঠিল।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

---

# নব আলেখ্য।

## ভূমিকা।

কবিকুলতিলক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের পদাঙ্ক অনুসরণে এই 'নব আলেখ্য' লেখা হ'ল। এতে আমার নিজস্ব কিছুই নেই। যে মহাকবির কবিত্বানুকরণের জন্যে আমি চেষ্টা পেয়েছি, তাঁরই ভাব ও ভাষা অনেক পরিমাণে রেখেছি। যায়গায় যায়গায় তাঁর "আলেখ্যের" ভাষা প্রায় অবিকল নিইছি। "তোমার মায়ের স্বামী," "বাণবিদ্ধ পাখীর নীড়ে ফিরে যাওয়া", ইত্যাদি উচ্চভাব, ও "তবলাচাঁটি" প্রভৃতি মনোরম সুললিত ভাষা "আলেখ্য" থেকেই তুলিচি। "আলেখ্য" যাঁহারা বেশ ভাল রকম প'ড়েচেন, তাঁরাই আমার এ কবিতার মর্ম্ম বেশ ভাল রকম গ্রহণ কর্ত্তে পার্ব্বেন।

যখন এ কবিতাটি ছাপালামই, তখন মনে হচ্চে যে ছন্দ, ভাষা ও ভাব সম্বন্ধে কিছু বলা মন্দ নয়।

প্রথমতঃ ছন্দ। এ কবিতার ছন্দ 'অক্ষর হিসাবে' নয়। অনেক যায়গায় দেখা যাবে, এক পংক্তিতে উনিশ অক্ষর আছে, আবার তিন পংক্তি নীচে চোদ্দ অক্ষর বা ষোল অক্ষর। এ কবিতায় শুধু তাল বা ঝোঁকের ওপর দৃষ্টি রাখা হ'য়েচে। তবে যেখানে তাল ঠিক রাখ্‌তে পারি নি, বা ঝোঁক সামলাতে পারিনি, সেখানে অবশ্য পতন হ'য়েচে। তা সেখানে পাঠক দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পার্ব্বেন ও বাধ্য হ'য়ে মার্জ্জনা ক'রে নেবেন। হয়ত ছন্দের এ ব্যাপারটা তেমন ভাল হয় নি; তবু যা হ'ক একটা "নতুন কিছু করা" হ'য়েচে।



তার পরে ভাষা। চলিত ভাষা যতদূর পারা যায় ( শ্রুতি-কটু, নিরর্থক ও গ্রাম্যতা দুষ্ট হ'লেও ) ব্যবহার কর্ত্তে ছাড়িনি। যেখানে বাঙ্গলা বচন বা প্রবাদটি বেশ জোরের, সেখানে সেইটি ব্যবহার কল্লেই বাঙ্গলা কবিতা হবে। যেমন

"ঠিক দুপুর বেলা,
ভূতে মারে ঢেলা।"

এইবার ভাব। এক কথাতেই যত গোল। বল্‌তে গেলেই হয়ত বঙ্গীয় মাসিক পত্রে আমাকে অনেকে গাল পাড়্‌বেন। আবার হয়ত আমাকে কটাক্ষপাতের অযোগ্য ভেবে বা কৃপাপাত্র বিবেচনায় কেউ কিছু না বল্‌তে ও পারেন। তাই সাহস ক'রে এইটুকু স্বীকার কচ্চি যে, এই কবিতাটি হয়ত কবিতা না হ'য়ে ছড়া হ'তে পারে, তবে প্রহেলিকা নয়। তার মানে বুঝ্‌তে কিছু কষ্ট হবে না; তার মধ্যে কোন বৃহৎ ভাব নাই, বর্ণিত বিষয়টি অতি পার্থিব; কিন্তু তার মধ্যেও কেমন ক'রে স্বর্গীয় ভাব ফুটিয়ে তুল্‌তে পারা যায় তা এ কবিতায় বেশ দেখান হয়েচে। খুব সম্ভব আমি কোন উচ্চভাব ধারণা কর্ত্তে পারিনে; পাঠকগণ তা দেখেই বুঝ্‌তে পারবেন। তবে আমি যা ধারণা কর্ত্তে পারি, তার সম্বন্ধেই লিখি। আর আমি নিজের কবিতার মানে নিজে বুঝি।

## প্রথম চিত্র।

( উলঙ্গ শিশু )

১

বসন্তের শান্ত স্নিগ্ধ ঠিক দুপুর বেলা,
বৃক্ষ শির হ'তে যখন ভূতে মারে ঢেলা,
ঘনশ্যাম তৃণোপরে বকুল তলায় ব'সে,
আপন মনে কচ্ছ খেলা মধুর হাসি হেসে।
সারা অঙ্গে নাইক কোথাও একটু খানি সুতো,
কোমল দুটি চরণপরে পরনিক জুতো।
এ উলঙ্গ সজ্জা কি তোর ভাল লাগে যাদু,
সকল গায়ে লাল ঝোল কেন মাখিস্ হাঁদু!

এম্নি সাজে মিনিট পাঁচেক খেলা ক'রে খানিক,
তোমার মায়ের স্বামীর কাছে কাপড় পোরো মানিক!

২

ওরে বাছা দুষ্ট ছেলে কিসের অভিমানে,
গৃহ হ'তে পালিয়ে এসে দুখভরা প্রাণে,
মলয় হিল্লোল ক্লান্ত ফুল বাগানের মাঝে,
আপন মনে ক্রীড়ারত এই ন্যাংটা সাজে?
বাপের বুকে নাই কি আসন, মায়ের কোলে স্থান?
কিনে কিরে দিইনি তোরে ইজার পিরাণ?
কোথায় তারে ফেল্লি, গেল কোন চুলোয়ে?—
সারা অঙ্গে মাখিস্ কেবল বালি আর ধুলো এ!
মুক্ত অনন্তের মাঝে শূন্য দিয়ে ঘেরা,
হাঁরে বেটা! হ'ল কি তোর এই পোষাকই সেরা!

৩

না না—ভুল্ লাম্; তোরে কেন করি তিরস্কার?
অভিমান করেছ বড় বাছারে আমার।
হাঁ হাঁ—তা তো হ'তেই পারে, নাই ত রে তোর দোষ,
শিশুর যাহা অভিমান, বুড়োর তাহাই রোষ।
কেনই বা না হবে, কাল রাতে চাইলি চুমো,—
আমি চ'টে বল্লাম্ তোরে—"ঘুমোরে বেটা ঘুমো।"
বসন্তের স্নিগ্ধ সাঁঝে বৈঠকখানায় তবলা চাঁটি
সঙ্গে তাহার ছিল আবার 'লপেটি' গান পরিপাটি।
বাণ বিদ্ধ পাখী যেমন বাসায় গিয়ে থাকে মরে,'
তুইও তেম্নি শয্যায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়্লি অকাতরে!

৪

থাক্‌রে বাছা এই সাজেতে থাক্‌রে আরও কিছুক্ষণ,
উঠ্‌ল আজি কলিযুগে ধরাতলে কি নন্দন!



প্রথম বসন্তে যবে রচেছিলেন জগৎপতি—
একটি রমণী আর একটি মানুষ—তাহার পতি,
সেই মানুষটি দাঁড়িয়েছিল এম্নি ভাবে বিশ্বমাঝে,
বায়ুমণ্ডলেতে ঘেরা মুক্ত দিগম্বর সাজে।
ব্রহ্মাণ্ডের সকল আলো, সকল ছায়া, সমীরণ
করেছিল ব্যস্তভাবে সেরা সাজের আয়োজন!
এই বেশ তোর দেখে আজি আমারও তাই মনে হয়,
পাপপূর্ণ পৃথিবীতে নন্দন হ'ল উদয়!

৫

ওগো পাড়া প্রতিবাসি! সুখে আছ, সুখে থাক,
এ দৃশ্যটি যাওগো দেখে এমন সুযোগ ছেড়োনাক।
বকুল বিটপীশাখে, মাথার উপরে থাকি,
ছাড়িতেছে কুহু তান বসন্তের সেই কালো পাখী!
মন্দীভূত সমীরণ গন্ধীভূত হ'য়ে আসে,
জগৎ বাস্তবিক পক্ষে ব্যাকুল দরশ আশে!
চিত্রকরটি হ'ত যদিরে বাবাটি তোর এ
তুলিটি দিয়ে ছবিটি তোর আঁকৃত যত্ন ক'রে।
থাক্‌রে এখন মুগ্ধ হ'য়ে এম্নিভাবে খানিক,
দেখিরে আমার সোনার যাদু, দেখি আমি মাণিক!

শ্রীসন্তোষকুমার বসু।

---

# কালকা-পথে।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

একটু অগ্রসর হইয়াই সেই ঝরণায় অঞ্জলি পূরিয়া জল পান করিলাম। কালকা ত্যাগ করিয়া পাহাড়ে আরোহণ করিলে, একটু পরেই যে ঝরণাটি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও নিতান্ত ছোটো নয়। সেই খান হইতে

কালকা অঞ্চলের অধিবাসীরা জল সংগ্রহ করিয়া থাকে। সেই ঝরণার নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিবার বড় ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এখানকার স্নানের রীতি আমাদের চক্ষে বড়ই অস্বাভাবিক ও অপ্রীতিকর বলিয়া বোধ হইল। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে একত্র পরিধেয় বস্ত্রাদি দূরে রাখিয়া অসংশয়ে ও অসঙ্কুচিত ভাবে স্নান ও গাত্রাদি প্রক্ষালন করিয়া থাকে। ইহাদের আচার ব্যবহারই এইরূপ! ইহাতে তাহারা কোন প্রকার অন্যায় বা লজ্জা বোধ করে না। এই সকল ঝরণার জলের নিকট কলিকাতার কলের জল স্বচ্ছতায়, আবিল বলিলে অন্যায় বলা হয় না। যেমন নির্ম্মল, তেমনি স্নিগ্ধ ও সুস্বাদু। জল পান করিয়া যেন সমস্ত ক্লান্তির অবসান হইল।

উৎসাহে উল্লাসে ক্রমান্বয়ে সেই পাহাড়ের পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলাম। মাঝে মাঝে এক এক বার থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া পড়ি, আর নিবিড় নিস্তব্ধ পর্ব্বতের উপর আমাদের জুতার খট্ খট্ শব্দও যেন সমভিব্যাহারী সঙ্গীর মত স্তব্ধ হইয়া থামিয়া যায়। আমাদের স্বাধীন কৌতূহল, উচ্চ হাস্যে ও কথোপকথনে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া বিরাট গাম্ভীর্য্যের ভিতর এক অভিনব শিশু-সুলভ চাঞ্চল্যের চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিতেছিল।

এক খানা উপলখণ্ডের উপর বন্ধুবর উপবেশন করিলে আমিও তাহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িলাম। সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র ঝরণা ঝির-ঝির করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। এই ক্ষুদ্র ঝরণাই যে পরে সমতল ক্ষেত্রের উপর দিয়া বিপুল কলেবরে কত দেশ বিদেশ কত জানা অজানা কত উর্ব্বর অনুর্ব্বর ক্ষেত্রকে সুশীতল বারি দান করিয়া চলিয়াছে, তাহা এই ক্ষীণাঙ্গীকে অবলোকন করিলে মোটেই নির্ণয় করিতে পারা যায় না।

পাহাড়ের উঁচু নীচু পথে উঠিতে ও নামিতে বড় মন্দ ব্যায়াম হয় না। কোটের ভিতরের কামিজটি ঘামে ভিজিয়া গিয়াছিল। কিন্তু বসিতে না বসিতেই সুশীতল বায়ু স্পর্শে তাহা এক মুহূর্ত্তে শুকাইয়া গেল। পর্ব্বতের জলে ও বাতাসে, জানি না, কি এক অজ্ঞাত শক্তি আছে, যাহা ক্লান্তি ও অবসাদকে শীঘ্র দূর করিয়া দেয়। বিশ্রাম করিবার বাসনা হইলেও অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিতে না করিতে, পুনরায় চলিবার ইচ্ছা অনেক বেশী পরিমাণে জাগিয়া উঠে। আমরা উঠিয়া পড়িলাম। নবোৎসাহে সবে মাত্র চলিতে



সুরু করিয়াছি, অমনি পাহাড়ের উপর একটী ছায়া আসিয়া পড়িল। আমাদের মাথার উপরকার মেঘাবৃত আকাশের ছায়া বলিয়া মনে হইল। পূর্ব্বে জলধর বাবুর 'হিমালয়ে' পড়িয়াছিলাম যে, যদি পর্ব্বতের উপর একবার বৃষ্টি সুরু হয়, তাহা অত্যন্ত ভয়ানক, কারণ সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ঝড় আসিয়া যোগ দেয় এবং তাহাতে সমূহ বিপদপাতের সম্ভাবনা।

নিম্নে অবিচ্ছিন্ন অনন্ত গিরিশ্রেণী,—একটীর পর একটী—মনে হয় যেন ঐ শেষটীর পর আর নাই—কিন্তু তাহার পর বুঝি—সবই ভুল। যেমন দিনের পর দিনের শেষ নাই, তেমনি মনে হয়, এই অভ্রভেদি পর্ব্বতমালার শেষ নাই—সীমা নাই—অন্ত নাই, এখানে আকাশ হিমালয়কে আলিঙ্গন করিয়াছে এবং হিমালয় আকাশকে স্নেহবাহুপাশে আলিঙ্গন করিয়া উল্লাসে আত্মপর জ্ঞানশূন্য হইয়াছে।

আবার ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখি আর মেঘের লেশমাত্র নাই; এক ঝাঁক পাখী, আকাশ জুড়িয়া উড়িতেছে, তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমবেত পাখায় সূর্য্য-রশ্মি অবরুদ্ধ। এত পাখী এক সঙ্গে কখন দেখি নাই, সুতরাং শিশুর মত ঊর্দ্ধ মুখে তাকাইয়া রহিলাম। সে গুলি কোন জাতীয় বিহঙ্গম তাহা নির্ণয় করিতে পারিলাম না, আর সেই জনশূন্য পর্ব্বত প্রদেশে আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিবার মতও কেহই ছিল না।

পাহাড়ের পথ মাঝে মাঝে তৃণসমাচ্ছন্ন; এই সকল শ্যামল তৃণের ভিতর আর এক রকম ছোট ছোট তৃণ পরিলক্ষিত হয়, সেগুলিও আবার নয়না ভিরাম নানা বর্ণে রঞ্জিত, ফুলভারাবনত। যেন এক এক খানি নানা বর্ণের বিচিত্র আসন, অতিথি অভ্যাগতের জন্য প্রকৃতিসুন্দরী মঙ্গল হস্তে পাতিয়া রাখিয়াছেন। এই বিলাস-বিহীন তৃণদলের উপর উপবেশন করিলে, হৃদয় ভক্তিভরে ভগবানের চরণে লুটাইয়া পড়ে। অহঙ্কার, বিলাসিতা, সব এক নিমেষে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

আমরা একটা বাঁকের মুখে আসিয়া পড়িলাম। এই খান হইতে পথটি এবারে উত্তর হইতে পশ্চিমে ফিরিয়াছে, অপর একটি সরু পথ পাহাড়ের অন্য দিকে চলিয়া গিয়াছে। আমরা এখন কোন পথ অবলম্বন করিব? দুই জনেই সমান পণ্ডিত, পরস্পর পরস্পরের মুখের প্রতি

তাকাইলাম, এখানে ত আর গলির মোড়ে বা রাস্তার আরম্ভ মুখে অমুক লেন বা ষ্ট্রীট, পথিকের সুবিধার জন্য নির্দ্দেশ করা নাই ; এখানে উর্দ্ধে আকাশ আর নিম্নে পাহাড়।

কোন্ দিকে যাই ইতস্তত করিতেছি, এমন সময় দেখি প্রায় ২০০ দুই শত বড় বড় ছাগল ও অশ্ব, পৃষ্ঠে বোঝা বহন করিয়া সেই বড় পথে নামিয়া আসিতেছে। মনে হইল, এ আবার কি! তারপর দেখি, তাহাদের সমভিব্যাহারী পরিচালকবর্গ পাহাড়ী : হাতে বড় বড় যষ্ঠি, মাথায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাগড়ী, সকলের অঙ্গে হাতকাটা জামা। তাহারা বেশ হৃষ্টপুষ্ট, উন্নতবক্ষ, বিস্তৃতললাট। তাহাদের শরীরের প্রতি শিরায় যেন স্বাস্থ্য ও শক্তি পরিস্ফুট রহিয়াছে তাহারা বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে, আমাদের দিকে তাকাইল। এই সময় সহসা কোথা হইতে ঝড়ের মত শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। কোথাও কিছু নাই অথচ ঝড় আসিল, ব্যাপার কি জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলাম "এ কিসের শব্দ, ঝড় এলো কি ?" তাহারা প্রশ্নটা ঠিক বুঝিয়াছিল কি না বলিতে পারি না, তবে তাহাদের বড় বড় অধরের উপর বিদ্যুৎ চমকের মত একটু হাসি খেলিয়া গেল। তাহারা এরূপ শব্দের কারণ জানিত ; বলিল "ও রেলগাড়ী আস্‌ছে।" কিন্তু পরক্ষণেই শব্দ নিস্তব্ধতায় ডুবিয়া গেল ; বন্ধু হিন্দি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "যদি রেল গাড়ীর শব্দ হয়, তবে আর শোনা যাইতেছে না কেন ?"

একজন সেলাম করিয়া বলিল, "হুজুর, গাড়ী এখন একটা নীচু পাহাড়ে নামিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আসিতেছে, সেজন্য শব্দ শুনা যাইতেছে না।" তারপর, আমাদের মাথার উপরের একটী পর্ব্বত নির্দ্দেশ করিয়া পুনরায় বলিল, "ঐখান দিয়া রেল গিয়াছে ; একটু পরেই গাড়ী দেখিতে পাইবেন।"

বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা কোথায় যাইবে ?"

"কালকার বাজারে। সেখানে এই সব মোট রাখিয়া পুনরায় মোট লইয়া ফিরিব। ইহাই আমাদের কাজ।"

এ সব বোঝা কাহাদের ? তাহারা রেলে লইয়া যায় না কেন ?

"সিমলা রেলের মাশুল অত্যন্ত বেশী, তাই আমরা কালকা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া দিয়া আসি। এই রাস্তার ভাড়া খুব কম পড়ে।



"রেল লাইন খুলিয়া তোমাদের আয় অনেক কমিয়া গিয়াছে ?"

"না, ঠিক বিপরীত হইয়াছে, আয় পূর্ব্ব অপেক্ষা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে, রেল হইয়া লোকজন বেশী আসে, 'মোট ঘাট' অনেক বাড়িয়াছে, রেলের মাশুল অনেক বেশী।"

তাহাদের সঙ্গে বালক, শিশু, স্ত্রীলোক। সকলের নিকট বস্ত্রাদি আহার্য্য শয্যা ইত্যাদি ছিল, তাহাদের বেশ রীতিনীতি, পর্ব্বতের সকল প্রদেশেই যেন পরিচিত ঘর! ভয় নাই যে কোথায় গিয়া পড়িব, কোথায় আহার জুটিবে কোথায় বা শয়ন করিব। তাহারা কিরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

কোন পথে যাইলে নিকটবর্ত্তী রেলওয়ে ষ্টেশনে পৌঁছিতে পারিব জিজ্ঞাসা করিলে একজন বলিল—"হুজুর আপনারা কালকা হইতে সাত মাইল পথ চলিয়া আসিয়াছেন, এর একটু পরেই "টাঁকশাল" নামক ক্ষুদ্র গ্রাম।"

সেখানে বাজার আছে কি না অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিলাম। টাঁকশাল অতি সামান্য গ্রাম ; তিন চার ঘর মাত্র পাহাড়ীর বাস আছে ; তাহাদের যাহা কিছু প্রয়োজন হয় কালকা বাজার হইতে আনাইয়া লয়। আমাদের Dandy Road নামক একটী পথ দূরবর্ত্তী পাহাড়ের গাত্রে দেখাইয়া বলিল "ঐ পথ অবলম্বন করিলে খুব শীঘ্র টাঁকশাল ষ্টেশনে উপস্থিত হইতে সক্ষম হইবেন।" সে পথটি ধরিতে আমাদের অনেকবার উঁচুতে উঠিতে ও নীচে নামিতে হইল। এই সময় আবার গাড়ীর শব্দ শ্রুত হইল। ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখি মাথার উপরকার একটী পাহাড়ের ধারে ধারে গাড়ী চলিয়াছে, তাহা যেন একটী "কেন্‌নুয়ের" মত দেখাইতে লাগিল।

ভয় হয়, হয়ত গাড়ী একটু বাধা পাইলে নিম্নস্থ গহ্বরে পড়িয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। আমাদের নিকট হইতে রেল লাইন প্রায় হাজার ফিট উচ্চ হইবে। এখান হইতে গাড়ীর গতি বড়ই সুন্দর মনে হয়, যেন গাড়ী একই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ; আবার কখন উচ্চে ধীরে ধীরে আরোহণ করিতেছে, ও পরক্ষণেই সেস্থান হইতে অনেক নিম্নে ও পশ্চাতে

অবতরণ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। একই পথ ঘুরিয়া ফিরিয়া বেষ্টন করিয়া চলিতেছে।

আমরা গাড়ীর গতি লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতে সুরু করিলাম। গাড়ী কখন আমাদের পশ্চাতে ফেলিতেছে, আর কখন বা আমরা গাড়ীকে পশ্চাতে রাখিয়া অগ্রসর হইতেছি। এই গাড়ী আসিতেছিল, আর নয়ন-গোচর হইল না। শব্দ লক্ষ্য করিয়া হাঁটিতে লাগিলাম, কিন্তু অল্পক্ষণ পরে তাহাও আর শ্রুতিগোচর হইল না। যে পথটি আমাদের দেখানো হইয়াছিল তাহাও এখানে অগণ্য পথ সমুদ্রে হারাইয়া গিয়াছে। সুতরাং যে কোন একটি সরু পথে dandy road অনুমানে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। যখন অনেকদূর আরোহণ করিয়াছি, তখন আর পথ খুঁজিয়া পাইলাম না। এখান হইতে পর্ব্বত সরল মসৃণ ঢালু হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে।

এখন পাহাড়ের যে অংশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, সেখানকার একটী দৃশ্য বড় আশ্চর্য্যজনক। এখানে রেল লাইন লইয়া যাইতে engineer গণকে বিশেষ কষ্ট ও শ্রমস্বীকার করিতে হইয়াছে। এইস্থানে পাহাড় বিচ্ছিন্ন হইয়া এক প্রকাণ্ড গহ্বর ও গভীর শূন্যতা এবং এই বিচ্ছিন্নতাই পর্ব্বতকে সহস্রধার বিভক্ত করিয়াছে। দুটী বিচ্ছিন্ন অংশের অন্তর বড় কম নয়, প্রায় পাঁচশত হস্তের অধিক। এইখানে টেলিগ্রাফের তার ঝুলিয়া পড়িয়াছে, কারণ মধ্যে কোন প্রকার অবলম্বন দিবার উপায় নাই। বোধ হয় আরোহীগণ এখানে গাড়ী হইতে নিম্নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এখানকার পাহাড় অনেক উচ্চ। নীচের দিকে চাহিলে নিম্নস্থ কিছুই দেখা হয় না। তখন বেলা প্রায় দশটা। প্রখর সূর্য্যরশ্মি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। নীচে তাকাইয়া আমার প্রাণ উড়িয়া গেল।

তখন বন্ধুবর আমার নিকট হইতে তিন চারি হস্ত ঊর্দ্ধে কোন প্রকারে উঠিয়া বলিলেন, "নীচের দিকে দেখিবেন না। আসুন, শীঘ্র শীঘ্র উপরে উঠিতে চেষ্টা দেখি. নহিলে আর কালকা ফিরিতে পারিব না। এবং ক্লান্ত হইয়া পড়িলে পথ খুঁজিয়া আবিষ্কার করা অসাধ্য হইয়া উঠিবে।"

আশু বিপদের আশঙ্কায় মন অস্থির হইয়া উঠিল। মুখে কথা সরিল



না। মনে হইল এখন যে পথে আসিয়াছি সে পথে প্রত্যাবর্ত্তন সম্পূর্ণ অসম্ভব।

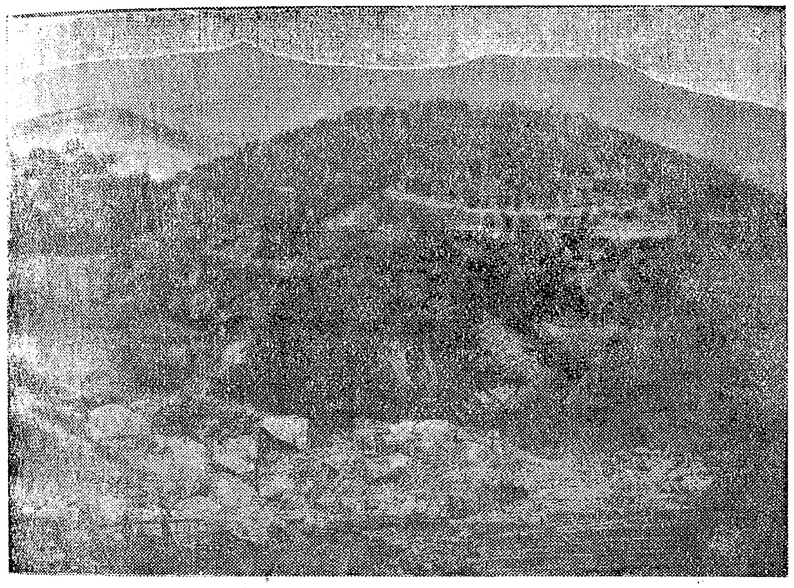

বর্দ্ধমান রাজবাটীতে গোলক ধাঁধায় যে প্রবেশ করি নাই তাহা নয় বা তাহার জ্ঞান যে ছিল না তাহাও নয়, তবে সেখানে সারাদিন ঘুরিয়া পথ আবিষ্কার করিতে না পারিলেও মন মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস থাকে শেষে গোলক ধাঁধা রক্ষক আসিয়া বাহির করিয়া লইয়া যাইবে; কিন্তু এই বিশ্বগোলক ধাঁধার পথ হারাইয়াছি। কে আসিয়া পথ দেখাইয়া দিবে? সন্ধ্যার পরত ব্যাঘ্র ভাল্লুক আসিয়া এই অনির্দ্দিষ্ট অনাহুত শিকার দেখিলে তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিবে না।

বন্ধুবর একটু এদিক ওদিক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিল "দেখি যদি এই স্থান হইতে কোন উপায় করিতে পারি"। আমি সেদিকে লক্ষ্য করিয়া দেখি, তিনি একখানি বড় জোর বারো ইঞ্চি ইষ্টকের মত পাহাড় গাত্রে সংলগ্ন পাথর ধরিয়া পরীক্ষা করিতেছেন। বন্ধু বহু কষ্টে সেই কার্ণিসের মত পাথরের উপর উঠিয়া কোন প্রকারে উপরের পাহাড়ে আরোহণ করিলেন।

আমি অকূল সমুদ্রে পড়িলাম। তাহার ও আমার মধ্যে একটা ব্যবধান আসিয়া পড়িল। তিনি বলিলেন "দাঁড়ান মশায়, আমি অগ্রে দেখিয়া আসি, কোন পথ আছে কি না। শেষে কি দুইজনেই বিপদে পড়িব।" আমি নিস্তব্ধ হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। দুই তিন মিনিট অতীত হইল তাহার কোনও সংবাদ নাই।

( ক্রমশঃ )

শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

---

## অনন্ত মূর্ত্তি।

আমি চাহি না ও রূপ, মৃত্তিকার স্তূপ,
আমার মায়ের কভু ও মূরতি নয় ;
কোন্ কুম্ভকারে গড়ে' দিবে তারে ?
ইঙ্গিত মাত্র যার সৃষ্টি, স্থিতি, লয় !

কোটি কোটি নিষ্কলঙ্ক শরদিন্দু,
যার মুখের লাবণ্য পেয়েছে এক বিন্দু,
নয়ন কোণে যার কোটি সবিতার
পূর্ণ আবির্ভাব নিরন্তর রয় ;

শ্রীপদনখরে,—এক আকাশের নয়,—
সহস্র গগনের নক্ষত্র নিচয় ;
প্রতি রোমকূপে, কোটি জগৎ রূপে,
মায়ের অসীম সৃষ্টি প্রতিভাত হয় !

নিখিল জগতের সমগ্র চপলা,
স্নিগ্ধ-সমুজ্জ্বল-প্রশান্ত-উজলা,
মোহধ্বান্তনাশী, মায়ের মধুর হাসি,
অসীম স্নেহ-দয়া-ক্ষমামৃতময় ;

## মানসী।

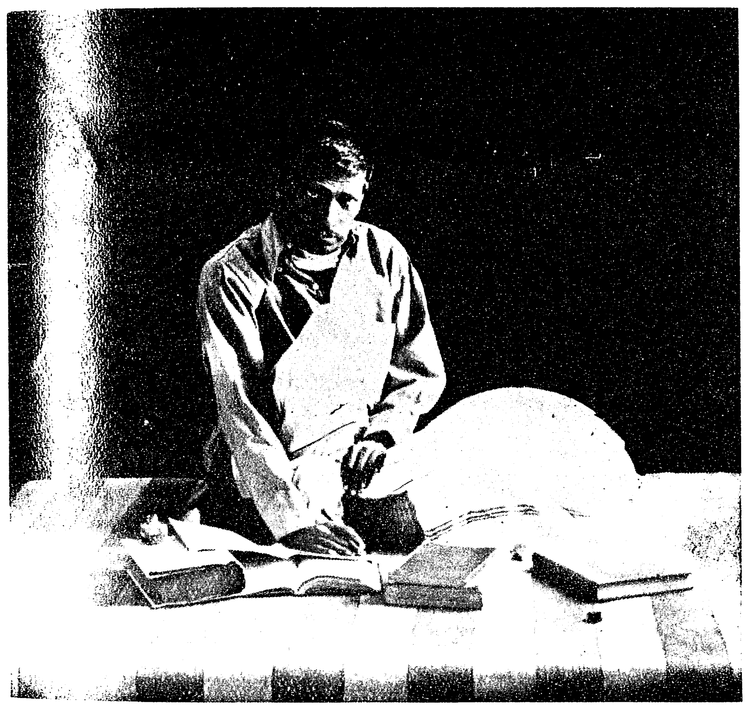

রোগ শয্যায় বাণী আরাধনারত কবি রজনীকান্ত।

Printed by K. V. Seyne & Bros.

সংখ্যাতীত পদে ফেরেন দ্বার দ্বার,
সংখ্যাতীত করে বিতরেন উদ্ধার,
জীবের দুঃখে কাঁদি, যত্নে দেন মা বাঁধি
আশীর্ব্বাদের রক্ষা-কবচ বরাভয়।

শ্রীরজনীকান্ত সেন।

---

# বিশুদাদা।

৭

কলিকাতায় অখিল মিস্ত্রীর লেনে সতীশের বাসা। বাসাটি খুব বড় নহে; সতীশের ছোট আদালতে এত পসার হয় নাই যে, মাসে একশত কি দেড় শত টাকা দিয়া বাসা ভাড়া করে, অথবা নিজের গাড়ী ঘোড়া রাখে। সতীশ অখিল মিস্ত্রীর লেনে মাসিক ৪০৲ টাকা দিয়া একটা বাড়ী ভাড়া করিয়াছিল। বাসায় একজন চাকর, একজন ব্রাহ্মণ ও একটি ঝি ছিল। দূর সম্পর্কীয় এক মামা সতীশের বাসাতেই থাকিত। সতীশের পিতা ও বিমাতা বাড়ীতেই থাকিতেন; কলিকাতায় সতীশের স্ত্রী একাকিনী থাকিতেন।

সতীশের স্ত্রী দরিদ্রের কন্যা; তাঁহার পিতামাতার অবস্থা ভাল না হইলেও তাঁহারা কন্যাকে অতি যত্নে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। সতীশের স্ত্রী গৃহ-কার্য্যে বড়ই নিবিষ্টা ছিলেন; লেখাপড়া, সূচীকার্য্য প্রভৃতিতেও তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। আজকাল লেখপড়া জানা স্ত্রীর কথা শুনিলেই অনেকের মনে যে আতঙ্কের সঞ্চার হয়, তাঁহারা কল্পনার চক্ষে বিদুষী গৃহিণীর যে চিত্র দেখিতে পান, আজ কালকার অনেকের গৃহে বিবি গৃহিণীর যে সকল অত্যুৎকৃষ্ট আদর্শ দেখিতে পান, সতীশের স্ত্রীর সে সকল কিছুই ছিল না। তিনি একালের মেয়ে হইলেও তাঁহার ভাবভঙ্গী, চা'ল চলন, আচার ব্যবহার সম্পূর্ণ সেকেলে ধরণের ছিল। সতীশ ইহাই ভাল বাসিতেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিধারী, কলিকাতা ছোট আদালতের নবীন উকিলদিগের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠ, সতীশের এ প্রকার ভাবের কথা শুনিয়া অনেক আলোকপ্রাপ্ত মহাশয় হয় ত বিস্মিত হইতে পারেন। আমরা কি করিব, আমরা ত আর তাঁহাদের খাতিরে মিথ্যা কথা বলিতে পারি না।

সতীশ যে সত্যসত্যই সেকেলে লোক তাহার সহিত যে একালের লোকের মিল হইতে পারে না, তাহার প্রমাণ পাঠক ইতঃপূর্ব্বেই পাইয়াছেন। কোথাকার এক পাড়াগাঁয়ের স্কুলের থার্ড মাষ্টার কবে সতীশের কি একটু উপকার করিয়াছিলেন, সতীশ কিনা এখনও সেই মাষ্টারের নিকট কৃতজ্ঞ রহিয়াছে! সুধু কি কৃতজ্ঞ, সতীশ তাহার এই কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ সমস্ত নরেশ বাবুর জন্য ব্যয় করিতে প্রস্তুত। নরেশ বাবুর বিপদের সংবাদ পাইয়া সতীশ স্থির থাকিতে পারে নাই, কাজকর্ম্ম সমস্ত ত্যাগ করিয়া, আদালত কামাই করিয়া, সতীশ কিনা সেই মাষ্টারের উদ্দেশে ঘোর ম্যালেরিয়া-সঙ্কুল পাড়াগাঁয়ে দৌড়াইতে একটুও ইতস্ততঃ করিল না। একালের শিক্ষিত যুবক কি এমন হইতে পারে? যাহারা পিতামাতার কথা ভুলিয়া যায়, যাহারা অশিক্ষিত পিতাকে পিতা বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয়, যাহারা সহোদর ভ্রাতার সহিত সম্বন্ধ রাখিতে চায় না, যাহারা বিধবা ভগিনী ভাগিনেয় মাসীপিসিকে একমুষ্টি অন্ন দেওয়া দূরে থাকুক, মুখের কথাটীও জিজাসা করিতে চায় না, তাহাদের নিকট সতীশের ব্যবহার নিতান্তই অসঙ্গত বোধ হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি! বিমাতার পরামর্শে যে পিতা সতীশকে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, সতীশ কিনা সেই পিতা মাতার ভরণপোষণ করিয়া থাকে,—তাঁহাদের জন্য মাসিক খরচ পাঠাইয়া দেয়! সতীশের মত বোকা কি দুনিয়ায় দুইটি আছে?

আর সতীশের স্ত্রী—সেই বা কেমন মেয়ে? লেখাপড়া শিখিয়াছে—অন্ততঃ বোধোদয় পর্য্যন্ত পড়িয়াছেই, সূচীকার্য্য জানে, বয়সও বেশী নয়, দেখিতে কুৎসিতা নয়। এমন মেয়ে সতীশের এই সকল সেকেলে ব্যবহার কেমন করিয়া সহ্য করে—কেমন করিয়া সে নীরব থাকে, একথা ভাবিয়া নবীনা পাঠিকাগণের অনেকেই হয় ত বিস্মিত হইতে পারেন। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমরা কি করিব, সত্যের অপলাপ ত করিতে পারি না। সতীশ



সত্যসত্যই নরেশ বাবুকে কলিকাতায় আনিবার জন্য ঝড় বৃষ্টি তুচ্ছ করিয়া সেই সুদূর পল্লীগ্রামে গিয়াছিল, সতীশের স্ত্রী নরেশবাবুদের জন্য পথ চাহিয়া বসিয়াছিলেন; তাঁহারা কলিকাতায় আসিলে যাহাতে তাঁহাদের কোন অসুবিধা না হয় তাহার ব্যবস্থা যথাসাধ্য করিয়াছিলেন। সতীশ নরেশ বাবু, ভুবেশ ও বিশ্বনাথকে লইয়া কলিকাতার বাসায় উপস্থিত হইলে সতীশের স্ত্রী সকলের যাহাতে কোন অসুবিধা না হয় তাহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন, এ সকল সত্য কথা না বলিয়া উপায় নাই। বিধাতা সতীশকে এবং সতীশের স্ত্রী সুলোচনাকে মানুষ গড়িয়াছিলেন; এজন্য যদি কাহারও অপরাধ হইয়া থাকে তাহা বিধাতার, আমাদের নহে।

অপরাহ্ণকালে নরেশ বাবুরা সকলে কলিকাতায় সতীশের বাসায় পৌঁছিলেন। সে রাত্রিতে আর কোন কথাই হইল না। সতীশের স্ত্রীর যত্নে, দাসদাসীদিগের সেবায় পরেশ বাবু বড়ই প্রীতি লাভ করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে নরেশ বাবু সতীশকে ডাকিয়া বলিলেন, "সতীশ, তোমাকে ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের জন্য একটা বাসা স্থির করিয়া দিতে হইবে; আজই একটা বাসা দেখ, আগামী কল্য হইতে যাহাতে আমি বাসায় থাকিতে পারি তাহার ব্যবস্থা কর।"

সতীশ বলিল "কেন কাকাবাবু, এইখানে কি আপনি কোন অসুবিধা মনে করিতেছেন? এ ত আপনারই বাড়ী। আপনি এ বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে চান কেন?"

নরেশ বাবু বলিলেন "সতীশ, তুমি কি এখনও আমার মনের ভাব বুঝিতে পার নাই? আমি কলিকাতায় একেবারে ডুবিয়া যাইতে চাই; এই মহানগরীর মধ্যে আমার অস্তিত্ব লোপ করিতে চাই। তোমার বাসায় থাকিলে তাহা হইবে না। তুমি মনে করিও না যে, তোমার সাহায্য লইতে আমার আপত্তি আছে। তোমার সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়াই ত আমি কলিকাতায় আসিয়াছি। কিন্তু তোমার বাসায় বাস করা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। তুমি আমার জন্য একটা মাষ্টারি, অন্ততঃ একটা ছেলে

পড়ান ঠিক করিয়া দেও। আমরা তিনজন তোমার সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়াই এখানে থাকিব। তবে যে মাষ্টারী চাহিতেছি তাহার কারণ এই যে, এখনও আমার কাজ করিবার শক্তি সামর্থ্য আছে; আমি যে দশ কুড়ি টাকা আনিতে পারি তাহাতে তোমারই সাহায্য হইবে।"

সতীশ নরেশ বাবুর কথায় বাধা দিয়া বলিল "আমি সে সাহায্য চাই না কাকাবাবু! আপনি এ বাসায় থাকিতে চান না, বেশ, আপনার জন্য অন্য বাসাই স্থির করিয়া দিব। এখানে থাকিলে সর্ব্বদা আমার নিকটে থাকিতেন, সুবিধা অসুবিধা সমস্তই আমি দেখিতে পাইতাম। বাড়ীর সকলেরও তাই ইচ্ছা; কিন্তু আপনি যখন থাকিতে চান না, তখন আজ আদালত হইতে আসিয়া বাড়ী দেখিব। কাজ কর্ম্মের জন্য আপাততঃ ব্যস্ত হইবার কোনই প্রয়োজন দেখিতেছি না। আপনার আশীর্ব্বাদে এখন আমি যাহা পাইতেছি তাহাতে দুই বাসার খরচ আমি অনায়াসে চালাইতে পারিব, সেজন্য আপনি কোন চিন্তা করিবেন না। বিশেষ এখন আপনার যে কিছুদিন বিশ্রামের দরকার, তাহা আপনি কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারিবেন না, আমি আপনার সমস্ত আদেশই প্রতিপালন করিব, কেবল আপনাকে চাকুরী করিতে দিব না। ভবেশই যেন এখনও উপার্জ্জনক্ষম হয় নাই, আমি ত দশ টাকা আনিতেছি।"

সতীশের কথা শুনিয়া নরেশ বাবুর মনে যে ভাবের উদয় হইল তাহা তিনি কথায় ব্যক্ত করিতে পারিলেন না; তিনি সতীশের মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার হয় ত মনে হইল, এখনও কি পৃথিবীতে এমন মানুষ আছে!

নরেশ বাবু কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, পরে বলিলেন "সতীশ, স্নেহের সহস্র বাঁধন দিয়েও একজনকে বেঁধে রাখতে পারলেম না, আর তুমি সতীশ কেমন কোরে আপনা হ'তে এমন বাঁধনে জড়িয়ে পোড়লে। দেখ সতীশ আমি পৃথিবীর উপর—মানুষের উপর একেবারে শ্রদ্ধাহীন হোয়ে পোড়ছিলাম; এমন সময়ে তুমি এসব কি কথা বল সতীশ? যে আমায় বড় আদরে——"

নরেশ বাবু আর কথা বলিতে পারিলেন না, তাঁহার শোকসাগর উথলিয়া উঠিল। সংসারের লোকের নিকট বোধ হয় আরও নির্দ্দয় ব্যবহার পাইবেন বলিয়াই তাহার মনে হইয়াছিল; কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে এ কি? পৃথিবীতে এত স্নেহ, এত ভালবাসা, এত কৃতজ্ঞতা কি এখনও আছে?



সতীশও নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার পর যখন সে দেখিল নরেশ বাবু একটু প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন, তখন বলিল "কাকাবাবু, যা' হ'বার তা হ'য়ে গিয়েছে, সে কথা চিন্তা কোরে অধীর হোয়ে কোনই লাভ দেখি না। আপনি এখন সর্ব্বদা ভাল বই পড়ুন, সকাল বিকাল বেড়াইয়া বেড়ান, কোন চিন্তা মনে আনিবেন না। ভাবিলে যদি পূর্ব্বের সেদিন ফিরে আস্‌তো তা হোলে সবাই মিলে ভাবা যেতো। আমার অনুরোধ আপনি আর পূর্ব্বের কথা তুল্‌বেন না।"

নরেশ বাবু বলিলেন "সতীশ, তা কি আমি বুঝি না; কিন্তু কি কোরবো, ঐ কথাই আমার দিনরাত্রি মনে হয়। হা ভগবান, কি পাপে আমার এমন শাস্তি।"

সতীশ বলিল "কাকাবাবু, আবার আপনি ঐ কথাই মনে করিতেছেন!"

নরেশ বাবু। না সতীশ, আমি আর ও সব কথা তোমাদের সম্মুখে বোল্‌ব না। এই বলিয়া নরেশ বাবু নীরব হইলেন।

সেই সময়ে কয়েকজন ভদ্রলোক মামলা মোকদ্দমার কথা বলিবার জন্য সতীশের নিকট উপস্থিত হইলেন, নরেশ বাবু উঠিয়া গেলেন। (ক্রমশঃ)

---

# বাঙ্গালা-নাটক-সমালোচনা।

## নূরজাহান।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

তৃতীয় অঙ্কে প্রথম দৃশ্যে কবি একটী অতৃপ্ত-প্রণয়ীযুগলের ছবি আঁকিয়াছেন। আসফের কন্যা খাদিজার সহিত শাহ্‌জাদা খুরমের বিবাহ হইয়াছে। খুরম যেমন বুদ্ধিমান ও রাজনীতি-বিশারদ, খাদিজা তেমনই সরলা প্রেমময়ী। খুরম খাদিজার সরলতায় ও প্রেমে তাহার প্রতি অনুরক্ত, কিন্তু তাহার অনুরূপ বুদ্ধিমতী সহধর্ম্মিণী না পাওয়াতে ক্ষুণ্ণ। খাদিজা পতির ধ্যান, পতির চিন্তা

ও গান লইয়াই থাকে, স্বামীর উচ্চাশা ও গভীর কর্ত্তব্যের ভাব ধারণা করিতে পারে না। প্রথম দৃশ্যে এই খাদিজা উদ্যানে বেড়াইতে বেড়াইতে গান গাহিতেছে। গানের মর্ম্ম এই যে, পৃথিবীতে যাহা কিছু সুন্দর, তাহাই তাহারই স্বামীর রূপের অনুকরণে। গানটি ভাল—দুনিয়ার সকল শোভাময় বস্তুর শোভা, গুণময় বস্তুর গুণ প্রেমিকা স্বীয় প্রেমিকের শোভা ও গুণের অনুকরণেই ঘটিয়াছে মনে করিয়া চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করিতেছেন—তা করুন, কিন্তু গানটীতে একটি চরণ আছে—

'কেন এত সুললিত পিকসঙ্গীত,—তারই কলবাণী করে ঝাঙ্কৃত।'

এই 'ঝাঙ্কৃত' শব্দের অর্থ কি? 'ঝঙ্কৃত' বা 'ঝঙ্কারিত' শব্দ জানি, তাহাদের অর্থও বুঝি, কিন্তু 'ঝাঙ্কৃত' শব্দ কোন অভিধানেও নাই। আর ব্যাপারটা কি হইল তাহাও বুঝিলাম না। কোকিলের গান এত সুললিত কেন? না, তাহারই (প্রেমিকের) কলবাণী "ঝাঙ্কৃত" করে—এইজন্য!—"ঝাঙ্কৃত" শব্দ ইতিপূর্ব্বে আর কোথায় দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। বীণার বা কোকিলের পঞ্চম তানের 'ঝঙ্কার', 'ঝঙ্কৃতি' প্রভৃতি শুনিয়াছি; দেবীচৌধুরাণীর বীণাও 'ঝন্‌ঝন্ ঝনন্ ঝন্' করিয়াই একদিন বাজিয়া মধু ছড়াইয়াছিল, কিম্বা সাগর-বউএর নূপুরের 'ঝনৎকার'ও পদসেবা পরায়ণ ব্রজেশ্বরের কানে মধুই ঢালিয়াছিল, রৌদ্রের 'ঝাঁ-ঝাঁ' অথবা ঝাঁঝরের 'ঝাঁ-ঝাঁ—মধুময় যে নহে, তাহা আমরা জানি—অথচ হাসির গানের কবি 'ঝঙ্কারের' বদলে—'ঝঙ্কৃতের' বদলে নূতন 'ঝাঙ্কৃত' শব্দ অসময়ে আনিয়া হাসির বদলে বড়ই বিস্ময় আনিয়া ফেলিয়াছেন। 'ঝঙ্কার' যেরূপ শব্দের অনুকরণ সূচিত করে—"ঝাঙ্কার" সেইরূপ এখানে কোন্ শব্দের অনুকরণ করিয়াছে, তাহাত খুঁজিয়া পাইতেছি না। রাঢ় দেশে 'ঝাঁকার' একটা শব্দ আছে—তাহার অর্থ 'তর্জ্জন-গর্জ্জন'—কবি অবশ্য শাহজাহানের বীরোচিত তর্জ্জন-গর্জ্জনের অনুকরণে কোকিল-কাকলীর উৎপত্তি কল্পনা করেন নাই। ছাপার ভুলে "া" আকারটি বেশী হইয়াছে বলিবার যো নাই, কারণ 'ঝঙ্কৃত' শব্দে কবি যে অর্থ করিতে চাহেন, সে অর্থের এখানে আবশ্যকতা নাই। তবে এটা কি? এটা "নিরঙ্কুশা হি কবয়ঃ"—অর্থাৎ শব্দসাগরে কবির যথেচ্ছচারিতার ঢেউ!



যাক্, তারপর শাহজাহান আসিলেন; উভয়ে প্রেমের আলাপে প্রেমের মধুরতা কিয়ৎকাল উপভোগ করিলেন। শাহজাহান কর্ম্মী পুরুষ তবে অপ্রেমিক নহেন। তিনি প্রেমময়ী খাদিজার ভালবাসার গভীরতা বেশ অনুভব করিতে পারেন; কিন্তু রাজ্যচিন্তাপরায়ণ শাহজাহান দিনরাত কেবল সে প্রেম উপভোগ করিবার অবসর করিতে পারেন না এবং তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিজীবীর উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী ও খাদিজা নহেন বলিয়া স্ত্রী লইয়া বেশ তৃপ্তি অনুভব করিতে পারেন না। এজন্য শাহজাহান যে নিজের মনের মত স্ত্রী, যথার্থ পক্ষে সহধর্ম্মিণী না পাইয়া, কিছু ব্যথিত ছিলেন এবং লয়লার পৌরুষব্যঞ্জক ভাবগতি লক্ষ্য করিয়া তাহার প্রতি তিনি ঈষৎ আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা তিনি, বিনা কারণে, বিনা প্রয়োজনে এই দৃশ্যে খাদিজাকে বলিয়া ফেলিলেন।—তিনি এতটাই বলিয়া ফেলিলেন যে, যদি খাদিজা স্বামী প্রেমে আত্মস্বত্ত্বা ডুবাইয়া দিয়া, অহঙ্কার অভিমানকে একবারে নষ্ট করিয়া না রাখিত, তাহা হইলে স্বামীর এই বিরাগের কথায়, এই অপরের প্রতি আসক্তির কথায়, অভিমানে দম ফাটিয়া মরিয়া যাইত।

কবি এই স্থানে খুরমকে দিয়া একটা আক্ষেপ করাইয়াছেন,—

খুরম। তুমি তোমার বাপের মেয়ে আর লয়লা নুরজাহানের মেয়ে?

খাদিজা। হাঁ।

খুরম। বিষম ভাবিয়ে দিলে।

খাদিজা। কেন নাথ?

খুরম। 'কেন নাথ'! এ রকম কখন হয়?

খাদিজা। কি হয় না?

খুরম। এই তুমি হ'লে এই রকম নিরীহ গোবেচারী, আর নুরজাহানের মেয়ে যেন দ্বিতীয় সেকেন্দর শাহ। * * শারিয়ার বেচারি এই লয়লাকে নিয়ে যে কি কর্‌বে, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

খাদিজা। কি আবার কর্বে?

খুরম। উঁহু, মোটেই খাপ খায়নি। বরং তার সঙ্গে আমার, আর শারিয়ারের সঙ্গে বিয়ে হওয়া উচিত ছিল, তোমার।

খাদিজা। তা হ'লে কি হোত?

খুরম। "কি যে হোত তা বল্‌তে পারিনে। তবে তাকে বশ করে' আমার বোধ হয়, বেশ একটু আনন্দ হোত আর তুমি যে গোবেচারী, তোমাকেও ঠিক শারিয়ারের স্ত্রী হলেই মানাতো ভাল। তা আমি বরাবরই দেখে আস্‌ছি যে যেমনটি চাই তেমন হয় না।"—পাঠক বুঝিলেন—আমরা কিছু কল্পনা করিয়া ব্যাখ্যা করি নাই। কবি নিজেই কাব্য-লেখক, আর নিজেই তাহার ব্যাখ্যাতা। (এই কথাগুলা বেশ, আক্ষেপটুকুও সঙ্গত; কিন্তু এ নাটকে এ দৃশ্যের কোন প্রয়োজন নাই। এই দৃশ্যটিদ্বারা এ নাটকের কোন ঘটনার বিকাশবিষয়ে সাহায্য হয় নাই, বা ইহা হইতে কোন ঘটনার উৎপত্তিও হয় নাই। যদি এমন বুঝিতাম যে, এই আক্ষেপের পর খুরম লয়লাকে বৈধ বা অবৈধ উপায়ে হস্তগত করিতে চেষ্টা বা তদ্রূপ আর একটা কিছু করিতেছেন, তাহা হইলে এই দৃশ্যটির অর্থ পাওয়া যাইত। তাহা যখন হয় নাই—তখন ইহা এ নাটকে একবারে নিরর্থক)।

খাদিজা নিজের প্রেমপূর্ণ হৃদয় লইয়া—স্বামীর আদর না পান,—অনাদর পান না ইহাতেই পূর্ণরূপে তৃপ্ত। খাদিজা ভালবাসার প্রতিদান আশা করেন না, তিনি ভাল বাসিয়াই সুখী। তিনি বলেন—"আমি তোমার দেহের মধ্য দিয়া তোমায় পেয়েছি—যেমন হিন্দুভক্ত প্রতিমার মধ্য দিয়া তাহার দেবতাকে পায়"—কথাটা খুব ভাল, উপমাটি বড় উপযুক্ত, কিন্তু খাদিজা এমন করিয়া হিন্দুর সাকার উপাসনা-পদ্ধতির সার সংগ্রহ করিয়া, হিন্দু-উপনিষদের সার সংগ্রহ করিয়া, আকবর বাদশাহের উপযুক্ত নাত-বউ গিরি করিতে পারিতেছে, ইহা কবির উদ্ভাবনী প্রতিভার চরম উৎকর্ষ বলিতে হইবে।

এ দিকে খাদিজা যাহাই হোক্—কিন্তু কবি খাদিজা-চিত্রে যেরূপ প্রেমিকার ছবি আঁকিতে চাহিয়াছেন, তাহাতে অতি সুন্দর কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তিনি যেমনটি আঁকিতে চাহিয়াছিলেন—তেমনটিই ফুটিয়াছে। খাদিজার রাধার তন্ময়তা আছে—প্রেমের অভিমান নাই, স্বাধীন-ভর্তৃকার দম্ভ নাই; সীতার ন্যায় স্বামীকে সর্ব্বগুণাধার, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া ধারণা আছে—কিন্তু আত্মমর্য্যাদার জ্ঞানে যতটুকু স্বাতন্ত্র্য সীতার ছিল খাদিজার তাহা নাই। প্রেমিকের এই তন্ময়তা, সাধকের এই আত্মনিবেদন বড় উচ্চ অঙ্গের,



কবি খাদিজায় তাহা বেশ ফুটাইয়াছেন। (নুরজাহান নাটকের এই শান্ত স্থির আত্মভোলা প্রেমিকা যুবতীর চিত্রটি আমাদিগকে যথার্থই মুগ্ধ করিয়াছে। এরূপ চরিত্র বাঙ্‌লা সাহিত্যে এত পরিস্ফুট করিয়া আর কেহ আঁকেন নাই। মনস্তত্ত্বের বিচারে কূটতত্ত্বদর্শী দার্শনিক সমালোচক হয় ত বলিবেন, এরূপ চরিত্র মানুষের হয় না। নাই হোক্, কিন্তু যাহা কবি আঁকিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহা যে সম্পূর্ণ কৃতিত্বের সহিত আঁকিয়াছেন, ইহা তাঁহার প্রশংসার কথা।

তাহার পর, শাহজাহানের সঙ্গে খসরুর দ্বারা শাহজাহানের মেবার-সন্ধির কথা তুলিয়া কবি এই দৃশ্যে শাহজাহানের বুদ্ধিমত্তা ও ঔদার্য্যের প্রশংসা করাইয়াছেন। এটুকু অতি সামান্য কথা। ফলে, শাহজাহানও এ দৃশ্যে মন্দ হয় নাই। দৃশ্য শেষে—শীঘ্রই স্বামীসঙ্গবঞ্চিত হইবার আশঙ্কায় খাদিজার আক্ষেপ টুকু কবি বেশ কৌশলে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন! এখানেও লয়লার কথা তুলিয়া শাহজাহান খাদিজাকে একটু ব্যথা দিয়াছেন। ব্যথায় তাহার চোখে জল আসিয়াছে; কিন্তু পরক্ষণে সে স্বামীর কর্ত্তব্য পথের বাধা তুলিয়া লইবার জন্য প্রেমের কাছে সে ব্যথাকে কেমন অতি সহজে বলিদান দিল, কেমন আপনাকে হীন বুঝিয়া শান্ত হইল, তাহা এই কটি কথায় বেশ ফুটিয়াছে,—"না আমারই অন্যায়! পুরুষের কত কাজ। তারা কত জানে, আর অভাগিনী নারী আমরা কিছুই শিখিনি, কেবল ভাল বাস্‌তে শিখেছিলাম।"

(এই দৃশ্যে খাদিজার চিত্র সুন্দর হইয়াছে।)

মুসলমানের নাম লিখিতে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল অনেক স্থলে ভুল করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দিতেছি,—এই দৃশ্যে মহাবীর রোস্তমের নাম করিতে গিয়া তিনি "রুস্তাম" লিখিয়াছেন!

( ক্রমশঃ )

---

# গ্রন্থ-সমালোচনা।

রাণী ভবানী ( তৃতীয় সংস্করণ ) সচিত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস। শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত। মূল্য কাগজের মলাট ৸০ বার আনা, কাপড়ে বাঁধাই ১৲ এক টাকা। ৩৮।২ নং ভবানী চরণ দত্তের গলি, বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

দুর্গাদাস বাবু একজন সুলেখক ও প্রবীণ সাহিত্যিক। তাঁহার রচনা মধুর ও প্রাঞ্জল। রাণী ভবানী ভাল কি মন্দ তাহা বোধ হয় এক বৎসরের সংস্করণ সংখ্যা দেখিলে উল্লেখের অপেক্ষা রাখিবে না। বই খানি আকারে সাধারণ উপন্যাস শ্রেণী হইতে অনেক বড় ও ইহার মূল্য যথাসম্ভব কম বলিয়াই মনে হয়। এত বড় পুস্তক দেখিলে কেমন করিয়া শেষ করিব আশঙ্কা হয় সত্য, কিন্তু যখন প্রথম পরিচ্ছেদে পুণ্যবতী বালিকা ভবানীকে আর একটী বালিকার সহিত পূজার্চ্চনায় ব্যাপৃত দেখি, তখন হইতেই আগ্রহ জাগিয়া উঠে। যাঁহার গৌরবময়ী কার্য্যাবলীর গুণগান, যাঁহার পুণ্যকথা, যাঁহার দেবীচরিত্রের অপূর্ব্ব বর্ণনা, যাঁহার অতুলনীয় দেবভক্তি, যাঁহার পবিত্র নাম আজন্ম শুনিয়া আসিতেছি, যাঁহাকে একদিন ইতিহাসের পাতে, বাঙ্গলার ভাগ্যচক্র নির্ণয় করিতে মুর্শিদাবাদের মন্ত্রণা-গৃহে ভারতের ভাগ্যলক্ষ্মীর মত দেখিতে পাই, সেই বাঙ্গলার গৌরব, বাঙ্গালীর গৌরব ভবানীর চরিত্র, তাঁহার কোমল হৃদয়ের করুণ ভাবোন্মেষ দুর্গাদাস বাবু নিপুণভাবেই চিত্রিত করিয়াছেন। এরূপ শিক্ষাপ্রদ জ্ঞানগর্ভ উপন্যাস বড় বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। এই বইখানি মা, বোন, মেয়ের হাতে দিয়া নিজেদের বাঙ্গালী বলিয়া গৌরব হয়। এই প্রকার উপন্যাসের সংখ্যা যত বাড়িবে, ততই বাঙ্গলা সাহিত্যের মঙ্গল সাধিত হইবে। গৃহে গৃহে রাণী ভবানীর আদর বাঞ্ছনীয়।

বঙ্গীয় নাট্যশালা। শ্রীধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, ৪৭ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য বারো আনা। গ্রন্থে গ্রন্থকার বঙ্গীয় নাট্যশালার বিশদভাবে সমালোচনা করিয়াছেন। বহুকাল কয়লা ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে একটুকরা হীরক পাইলে লোকের যে আনন্দ হয়, তথা-কথিত সমালোচনা পুস্তকের আবর্জ্জনা ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে বর্ত্তমান পুস্তকখানি লাভ করিয়া আমরা সেইরূপ আনন্দিত হইয়াছি। এই গ্রন্থে বঙ্গীয় নাট্যশালার পুস্তকনির্ব্বাচন, অভিনয়শিক্ষা, নাচগান, পোষাকপরিচ্ছদ প্রভৃতি যে সকল অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে গ্রন্থকারের মার্জ্জিত রুচি, সূক্ষ্মদৃষ্টি নিপুণ পর্য্যবেক্ষণশক্তি ও সর্ব্বোপরি অপক্ষপাত অভিমত সমালোচনার অকুণ্ঠিত ভাষায় সুন্দর-ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান রঙ্গমঞ্চ অধ্যক্ষেরা যে সুরুচি ও সুভাব সম্বন্ধে একান্ত উদাসীন, শ্রোতৃবর্গের স্কন্ধে সকল দোষ চাপাইয়া তাঁহারা নিজেদের দায়িত্ব শৈথিল্যের যে পরিচয় দিয়া থাকেন, এবং সুরুচিসঙ্গত শিক্ষিত সমালোচনার প্রতি তাহারা যে কিরূপ অশ্রদ্ধাবান, সমালোচক



সুযুক্তির সহিত সে সকল পরিস্ফুটভাবে দেখাইয়াছেন। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আলোচিত দোষগুলির নিরাকরণ করিতে মনোযোগী হইলে রঙ্গালয় অধ্যক্ষেরা এবং শ্রোতৃবর্গ যে বিশেষ ভাবে উপকৃত হইবেন তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সমাজজীবন গঠন করিতে রঙ্গমঞ্চের একটি বিশেষ স্থান আছে, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই. সুতরাং গ্রন্থকার যে সেই নাট্যালয়ের উন্নতিকল্পে এই গুরুতর শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাহার জন্য তিনি সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন। আধুনিক রঙ্গমঞ্চের অভিনয়কৃত্রিমতা ও রুচিদৈন্যের দিনে বর্ত্তমান পুস্তক-খানি বলবান ঔষধের কার্য্য করিবে আমরা এরূপ ভরসা রাখি।

বিলাত ভ্রমণ, (বিলাতের পথে) প্রথমভাগ, ডাক্তার শ্রীযুক্ত ইন্দুমাধব মল্লিক প্রণীত, ২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত, মূল্য দশ আনা। ইন্দুবাবুর নূতন পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। নানাগুণের জন্য তিনি সর্ব্বসাধারণের নিকট পরিচিত। সাহিত্য ক্ষেত্রেও তাহার রচিত "চীন-ভ্রমণ" কাহিনী ও অন্যান্য রচনা—শিক্ষিতের নিকট তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে। বর্ত্তমান গ্রন্থখানি তাঁহার বিলাতভ্রমণ কাহিনী লইয়াই লিখিত। ইন্দুবাবুর রচনা সরল ও স্বচ্ছ। ছোটো খাটো বিষয়গুলিকে চিত্রিত করিতে তিনি সুনিপুণ। তাঁহার রচনায় কোথাও সঙ্কীর্ণতা নাই, দেশাচার ও লোকাচারের গণ্ডির বাহির হইতে তিনি এই বিশ্বজগতকে দেখিতে শিখিয়াছেন। সেজন্য তিনি সকল স্থানের সৌন্দর্য্য সুন্দর ভাবে দেখাইতে সিদ্ধহস্ত। ভারতবর্ষ হইতে বিলাত যাইবার পথে যে সকল গৌরবময় স্থান আছে, গল্পচ্ছলে সহজ কথায় তিনি তাহাদের মোটামুটি যে ইতিহাস কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা এককালে শিক্ষা ও আনন্দদানে পাঠককে মুগ্ধ করিয়া দেয়। আশা করি সর্ব্বসাধারণের নিকট পুস্তক-খানির আদর হইবে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে গ্রন্থকার ভাষা সম্বন্ধে একটু মনোযোগী হইলে আমরা সুখী হইব।

দুঃখিনী—উপন্যাস। শ্রীযুক্ত জলধর সেন প্রণীত। মূল্য ॥৵০ দশ আনা। প্রকাশক—শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

জলধর বাবু একজন প্রবীণ সুলেখক। তাঁহার রচনার নূতন পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। তথাপি "দুঃখিনী" সম্বন্ধে দুই একটী কথা যে বলিবার নাই তাহাও নয়, কেন না লেখকের প্রতিভার প্রথম স্ফুরণ ইহার উপন্যাসের প্রতি ছত্রে পরিলক্ষিত হয়। 'দুঃখিনী' জলধর বাবুর প্রথম সাহিত্য সাধনার অর্ঘ্য। সভ্য জগতের সমস্ত সাহিত্য আলোচনার মধ্যেই লেখকদিগের বাল্য রচনা লইয়া প্রায়ই নাড়াচাড়া হইতে দেখা যায়। কেমন করিয়া ধীরে ধীরে রচনা ক্রমোন্নতি লাভ করিতে থাকে, কেমন করিয়া প্রতিভা অবাধ গতিতে তাহার পথ পরিষ্কার করিতে থাকে, তাহা এই বাল্যরচনার সহিত লেখকের পরবর্ত্তী রচনার তুলনা

করিলেই বেশ বুঝা যায়। তাই আজ জলধর বাবুর বাল্য রচনা "দুঃখিনী"কে পাইয়া বড় প্রীত ও সুখী হইয়াছি। তিনি ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—

"এই ক্ষুদ্র পুস্তকের একটু ভুমিকা লিখিবার প্রয়োজন আছে। ১৮৭৫ অব্দে মধ্য ইংরাজী ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা প্রদানের পর আমি এই খানি ও আর একখানি গল্প পুস্তক লিখি—তখন আমার বয়স ১৫ বৎসর।" শেষে লিখিয়াছেন "এই পুস্তকের দোষগুণের জন্য ৩৫ বৎসর পূর্ব্বের জলধর সেন দায়ী—আমি নহি।" ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে জলধর বাবুর সাহিত্যানুরাগ এক দিন দুই দিনের নয়। দুঃখিনীকে দেখিয়া আমরা জলধরবাবুর সাহিত্য আলোচনার আগাগোড়া দেখিতে পাই। পনর বৎসর বয়সের বাঙ্গালী বালকের মনোবৃত্তির বিকাশ, তাহার হৃদয়ের উচ্চতা, তাহার ধর্ম্ম বিশ্বাস, তাহার নারীর উপর প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা এ সকলের উজ্জ্বল প্রমাণ "দুঃখিনী"। যদি শ্রেষ্ঠ ও পরিপক্ক রচনার আদর্শ ধরিয়া ইহার সমালোচনা না করা হয় তাহা হইলে আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি বাঙ্গালীর ঘরে দুঃখিনীর আদর হইবে। দুঃখিনীর চিত্র সুন্দর ও মনোজ্ঞ, অতি সহজেই ইহা অন্তরে একটি করুণ রেখাপাত করিয়া যায়।

২। পুরাতন পঞ্জিকা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প ও ভ্রমণ কাহিনী। শ্রীযুক্ত জলধর সেন প্রণীত।

গল্পগুলি মনোরম ও সুন্দর। পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না। এগুলির মধ্যে বেশ একটু সুন্দর শিক্ষা আছে। সর্ব্বত্রই একটা সরল "ঘরোয়া" ভাবের আবির্ভাব পরিলক্ষিত হয়। ভ্রমণ কাহিনীগুলি একাধারে সুখপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

---

Printed & Published by K. L. Seyne & Bros.

# মানসী

২য় বর্ষ। ] আশ্বিন ১৩১৭ সাল। [ ৮ম সংখ্যা।

## নৈদাঘ-নিশীথ-স্বপ্ন।

( A Midsummer Night's Dream. )

( নাটক )

### নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| সুরেশ্বর | ... | ... | বৈজয়ন্তী নগরের রাজা। |
| অজয় | ... | ... | প্রমদার পিতা, রাজ-অমাত্য। |
| বিনোদবিহারী | } | ... | প্রমদার প্রণয়ার্থী |
| বিপিনবিহারী | } | | এবং বালসহচর। |
| ফুলেশ্বর | ... | ... | প্রিয় বয়স্য। |
| কানাই | ... | ... | সূত্রধর। |
| রামা | ... | ... | স্বর্ণকার। |
| পদা | ... | ... | তন্তুবায়। |
| ছিরে | ... | ... | কর্ম্মকার। |
| তিনু | ... | ... | কাঁসারী। |
| পাচু | ... | ... | দর্জ্জী। |
| হেমলতা | ... | ... | ভাবী রাণী। |
| প্রমদা | ... | ... | অজয়ের কন্যা, বিনোদের অনুরক্তা। |
| মানদা | ... | ... | বিপিনের অনুরক্তা, প্রমদার সখি, অন্য অমাত্য কন্যা। |
| অনঙ্গ | ... | ... | পরীদিগের রাজা। |
| তিতারা | ... | ... | পরীদিগের রাণী। |
| পঙ্ক | ... | ... | পরীদিগের বিদূষক |
| বেনফুল, বকফুল, বকুলফুল, বেগুনফুল, | | | পরীবর্গ। |

অনুচর বর্গ ইত্যাদি।

## প্রথম অঙ্ক।

### প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বৈজয়ন্তী নগর—রাজবাটী।

( সুরেশ্বর, হেমলতা, ফুলেশ্বর এবং পরিচারকবর্গের প্রবেশ )

সুরেশ্বর। দেখ, প্রিয়ে হেমলতে! শুভ বিভাবরী
আসিছে বিজলী বেগে; চারি দিন আর,
উদিবে নবীন চন্দ্র; চারি দিন আর,
তবু মনে হয়—কত ধীরে ধীরে যেন
হইতেছে কলাহীন ওই ক্ষীণ-শশী।
বিলম্বে বাসনা, প্রিয়ে, বাড়িছে কেবল!

হেমলতা। চারিদিন, প্রিয়তম, ডুবিবে সহসা
নিশি কোলে; চারি নিশি পোহাবে স্বপনে,
তখন দেখিবে শশী—রজতের ধনু
নব-নত,—আমাদের বিবাহ-বিলাসে।

সুরেশ্বর। যাও ফুলেশ্বর!
ভাসাও গে রাজধানী আমোদ-সাগরে;
জাগাও গে আনন্দের মৃদুল লহরী,
বিষাদে পাঠাও বনে, অথবা শ্মশানে;
যেন কালছায়া তার না দেখি নয়নে।

( ফুলেশ্বরের প্রস্থান। )

হেমলতে, বীরবেশে সকৃপাণ করে,
লভিয়াছিলাম আমি তোমার প্রণয়,
কিন্তু তব পরিণয়, বিলাসীর বেশে
লভিব, কুসুম-দামে, আনন্দ-উৎসবে।

( অজয়, প্রমদা, বিনোদ এবং বিপিনের প্রবেশ। )

অজয়। সুকৃতি সুরেশ্বর দীর্ঘজীবী হউন!

সুরে। মহাত্মা অজয়ের সম্ভাষণে প্রীত হইলাম। নূতন সংবাদ কি?

অজয়। মাথা মুণ্ডু! কালের বিচিত্র গতি। আমার কন্যা প্রমদার বিরুদ্ধে রাজ-সমক্ষে অভিযোগ করিতে আসিলাম। বিপিন! মহারাজের সম্মুখে



দাঁড়াও। মহারাজ! আমি ইহার সঙ্গে আমার কন্যার বিবাহ দিতে চাই!

বিনোদ! অগ্রসর হও। মহারাজ এই দুরাচার আমার কন্যাকে কি মোহিনী করিয়াছে।

দিয়াছে গলায় তার কবিতার মালা;
করিয়াছে বিনিময় প্রেম-নিদর্শন;
সচন্দ্র নিশীথে মুক্ত গবাক্ষে তাহার
ক'রেছে কৃত্রিম-কণ্ঠে কৃত্রিমতাময়
প্রেমের সঙ্গীত;—হায়! কল্পনা তাহার
ক'রেছে অঙ্কিত চারু সুকেশ বলয়ে,
কোমল-কুসুম-দামে,—প্রবঞ্চনা জালে
হরিয়াছে বালিকার কোমল হৃদয়।

তাহাতে কন্যা আমার অবাধ্য হইয়াছে। মহারাজ! যদি প্রমদা বিপিনের সঙ্গে বিবাহে সম্মত হয়, ভাল; না হয়, রাজ্যের চিরপ্রসিদ্ধ প্রথানুসারে কন্যা বলক্রমে বিপিনকে কিম্বা শমনকে প্রদান করিবার রাজাজ্ঞা হউক।

সুরেশ্বর। প্রমদে! তুমি কি বল? তোমার পিতার আদেশ প্রতিপালন করা উচিত; তোমার পক্ষে তোমার পিতা দেবতা এবং তোমার সৌন্দর্য্য-দাতা। তিনি তোমাকে গড়িয়াছেন, তিনি তোমাকে ভাঙ্গিতেও পারেন। বিশেষতঃ বিপিন একজন যোগ্য পাত্র।

প্রমদা। বিনোদও তেমনি যোগ্য পাত্র।

সুরেশ্বর। বিনোদ নিজে যোগ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন তোমার পিতার অভিমত পাইতে পার নাই, তখন বিপিনকেই যোগ্যতর মনে করিতে হইবে।

প্রমদা। পিতা যদি আমার চক্ষে দেখিতেন—

সুরেশ্বর। বরং তোমার চক্ষে তাঁহার অভিমত মতে দেখা উচিত।

প্রমদা। মহারাজ! ক্ষমা করিবেন। আমি জানি না, আমি কি প্রকারে এত প্রগল্‌ভা হইলাম! আমি জানি না, মহারাজের সমক্ষে আমার মনের ভাব খুলিয়া বলা আমার পক্ষে কতদূর শীলতা-সঙ্গত। কিন্তু আমি মহারাজের কাছে জানিতে চাহি, আমি বিপিনের সঙ্গে বিবাহে অসম্মত হইলে আমার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অমঙ্গল কি হইতে পারে?

সুরেশ্বর। মৃত্যু কিম্বা তপোবন। অতএব, প্রমদে! তোমার মন পরীক্ষা করিয়া দেখ। তোমার পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন না করিলে, তপস্বিনী বেশে আশ্রমের বৃক্ষচ্ছায়ায় শীতল নির্ম্মম চন্দ্রের দিকে চাহিয়া উপাসনা গীত গাহিয়া গাহিয়া তোমার মরু-ময় জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে।

সাধু, যারা উপেক্ষিয়া শোণিত প্রবাহ,
এরূপে সাজিতে পারে যৌবনে যোগিনী ;
কিন্তু ধরাতলে ধন্য সেই সুকুসুম
নির্জ্জনে নবীন বৃন্তে না ফুটি না ঝরি,
সুগন্ধে মোহিত করে মানবের মন।

প্রমদা। তেমতি ফুটিব আমি, তেমতি ঝরিব,
নরনাথ! তবু নাহি সমর্পিব আমি,
প্রাণ নাহি চাহে যারে, প্রণয় আমার।

সুরেশ্বর। সময় লও ; আগামী অমাবস্যা দিন, যে দিন আমি আমার প্রণয়িণীর সহিত চির-প্রেম-পাশে বদ্ধ হইব, সেই দিন তোমার পিতার আজ্ঞায় অবাধ্যতার জন্য হয় মরিতে কিংবা তাঁহার ইচ্ছানুসারে বিপিনকে বিবাহ করিতে অথবা করালিনীর মন্দিরে চির-তপস্যা-ব্রত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়া আসিও।

বিপিন। প্রমদে! এখনও ভাবিয়া দেখ। বিনোদ! তোমার অমূলক বিবাহ-সাধ পরিত্যাগ কর।

বিনোদ। বিপিন, তুমি প্রমদার পিতার ভালবাসা পাইয়াছ, তাহাতেই সুখী হও ; প্রমদার ভালবাসা পাইলেই আমার যথেষ্ট!

অজয়। নরাধম! উপহাস করিতেছ! সত্য বিপিন আমার ভালবাসা পাইয়াছে। অতএব, যাহা আমার, আমার ভালবাসা তাহাকে, তাহা অর্পণ করিবে। প্রমদা আমার, অতএব প্রমদাতে আমার সে অধিকার আছে, আমি তাহাকে প্রদান করিলাম।

বিনোদ। অর্থে, কি বংশ-মর্য্যাদায়, আমি কোন অংশে বিপিনের ন্যূন নহি। আমার প্রণয় অসীম। কিন্তু এ সকল অহঙ্কার তুচ্ছ, যখন প্রমদা আমাকে ভালবাসে। তবে আমি কেন তাহার আশা ত্যাগ করিব? আমি বিপিনের মুখের উপর বলিতেছি যে, সে নন্দের কন্যা মানদাকে ভালবাসিত



এবং তাহার মনোহরণ করিয়াছিল। সেই সরলা কন্যা, এই কলুষিত লম্পটকে এখনও দেবতার ন্যায় উপাসনা করে।

সুরেশ্বর। এরূপ বাক্‌বিতণ্ডায় প্রয়োজন নাই। প্রমদে! তুমি তোমার কল্পনাকে তোমার পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী করিতে চেষ্টা কর। এই দেশের রাজনীতি অনুসারে চলিতে আমি এক চুলও অন্যথা করিব না। মরিতে অথবা তপোবনে প্রবেশ করিতে প্রস্তুত হও। অজয় এবং বিপিন, আমাদের সঙ্গে আইস ; আমাদের শুভ বিবাহ সম্বন্ধে কোন বিশেষ কার্য্যে তোমাদিগকে নিযুক্ত করিব।

অজয়। যে আজ্ঞা মহারাজ!

( প্রমদা এবং বিনোদ ব্যতীত সকলের প্রস্থান। )

বিনোদ। কেন প্রিয়তমে তব কপোল মলিন—
সহসা গোলাপ কেন হ'তেছে বিলীন?

প্রমদা। সলিল বিহনে বুঝি শুকাইয়ে যায় ;—
এখনি করিব সিক্ত নয়ন ধারায়!

বিনোদ। একি পরিতাপ! প্রিয়ে বুঝিতে না পারি,
ইতিহাসে, উপন্যাসে অথবা জীবনে—
যথা দেখি, যথা শুনি, যথা পড়ি, প্রাণ,
প্রকৃত প্রেমের স্রোত বহে না সমান।
হয় ত বিভিন্ন রক্ত—বংশ প্রতিকূল—

প্রমদা। উচ্চে নীচে প্রেম, হায়! বিধাতার ভুল।

বিনোদ। হয় ত বয়স-দোষে অপাত্রে পতিত,—

প্রমদা। কি ঘৃণা! প্রাচীন প্রেম নবীন সহিত?

বিনোদ। কিম্বা প্রেম—নির্ব্বাচক বন্ধুর নয়ন—

প্রমদা। নরক! পরের চক্ষে প্রেম নির্ব্বাচন।

বিনোদ। সমানে সমানে কিম্বা প্রেম বিনিময়
হ'ল যদি ; মৃত্যু, পীড়া, বিগ্রহ অকালে
করিবে ছায়ায়, কিম্বা স্বপ্নে পরিণত।
মেঘাচ্ছন্ন অমানিশি বিদ্যুতের মত,
মুহূর্ত্ত ঝলসি যাহা পৃথিবী গগন,
না দেখিতে অন্ধকারে লুকায় বদন।

প্রমদা। প্রেমের কণ্টক যদি বিধাতার লিপি,
তবে কেন, প্রিয়তমে হইবে অধীর ?
নিশ্বাস, স্বপন, চিন্তা, অশ্রুর মতন
চিরদিন এ কণ্টক প্রেম সহচর।

বিনোদ। শুন প্রমদা, এক উত্তম উপায় আছে। আমার একজন সম্পত্তিশালিনী, অপুত্রা, বিধবা পিসী এখান হইতে কিঞ্চিৎ দূরে বাস করেন। তিনি আমাকে আপন সন্তানের মত স্নেহ করিয়া থাকেন। সেই স্থানটী এই রাজ্যের বহির্ভূত। প্রমদা, তুমি যদি সেখানে যাইতে সম্মত হও, তবে আমি তোমাকে বিবাহ করিতে পারি। যদি আমার প্রতি আন্তরিক প্রণয় থাকে, তুমি কাল রাত্রে তোমার পিত্রালয় হইতে গোপনে বাহির হইয়া যাইবে। নগরের অনতিদূরে বনের মধ্যে যেখানে বসন্তোৎসব উপলক্ষে একদিন প্রভাতে তোমার এবং মানদার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আমি সেখানে তোমার প্রতীক্ষায় রহিব।

প্রমদা। প্রাণের বিনোদ, আমি অনঙ্গ-আয়ুধে
কিম্বা সেই স্বর্ণচূড় তীক্ষ্ণতম বাণে,
কিম্বা যে অনলে জ্বলি অনঙ্গ-মোহিনী,
পুড়িল অনঙ্গ যবে হর নেত্রানলে,
দ্রবিল নয়ন-জলে পাদপ, পাষাণ,—
করিনু প্রতিজ্ঞা—কাল তোমার সহিত
নিশ্চয় সঙ্কেত স্থানে হইব মিলিত।

বিনোদ। প্রতিজ্ঞা যেন মনে থাকে, প্রাণ! দেখ মানদা আস্‌ছে।

( মানদার প্রবেশ। )

প্রমদা। ভাল আছ, মানদা ? কোন সৌন্দর্য্যে মোহিত করিয়া আসিলে ?

মানদা। সৌন্দর্য্য আমার! কেন কর প্রবঞ্চনা ?
তোমার সৌন্দর্য্যে কেন মোহিত বিপিন ?
তব নেত্র ধ্রুবতারা ; প্রভাত কাকলি
কৃষকের কাণে কত মধুরতাময়!
তাহ'তে মধুরতর প্রমদা তোমার
বচন সঙ্গীত ; বড় সাধ মনে—শিখি



তব সুমধুর স্বর, নয়ন-সন্ধান,
সপ্রেম কটাক্ষ ;—যদি সসাগরা ধরা
হইত আমার, আমি রাখিয়া বিপিনে
দিতাম সমস্ত ধরা তোমায়, সুন্দরি!
তোমার সৌন্দর্য্যে দেহ হ'লে পরিণত।
শিখাও—কেমনে তুমি চাহ, সুভাগিনি!
শিখাও—কি ইন্দ্রজালে বিপিনের মন
করিয়াছ আজ্ঞাধীন ; শিখিব এখন।

প্রমদা। আমি তাহার প্রতি মুখভঙ্গী করি, তথাপি সে আমাকে ভালবাসে।

মানদা। আমার হাসিতেও যদি আমি সে মুখভঙ্গীর কৌশল শিখিতে পারিতাম!

প্রমদা। আমি তাহাকে তিরস্কার করি, তথাপি সে আমাকে ভালবাসে।

মানদা। বিধাতঃ! যদি আমি উপাসনার দ্বারাও তাহার সেই ভালবাসা পাইতে পারিতাম।

প্রমদা। আমি তাহাকে যত ঘৃণা করি, সে তত আমার সঙ্গ লয়।

মানদা। আমি তাহাকে যত ভালবাসি, সে আমাকে তত ঘৃণা করে!

প্রমদা। সে তাহার নির্ব্বুদ্ধিতা ; মানদা, আমার কি দোষ ?

মানদা। দোষ ?—তোমার সৌন্দর্য্য। যদি সেই দোষ আমার হইত!

প্রমদা। তুমি সুস্থির হও, সে আর আমার মুখ দেখিতে পাইবে না। আমি এবং বিনোদ কল্য এখান হইতে পলায়ন করিব।

যতদিন বিনোদে না করেছি দর্শন,
ছিল এ নগরী যেন স্বর্গের মতন।
না জানি এ প্রেমে কি যে আছে বিদ্যমান,
করিয়াছে স্বর্গ মম নরক সমান!

বিনোদ। মানদা, মনের কথা বলিব তোমায়,
কালি নিশাকালে যবে শশাঙ্ক সুন্দরী
দেখিবে রজত মুখ সলিল-দর্পণে,
তরল মুকুতাময় করি দুর্ব্বাদল,
পালাবে বাসর ছাড়ি প্রেমিক-যুগল।

প্রমদা। কাননে যেখানে বোন্ তোমায় আমায়
শুইয়াছি কতদিন কুসুম-শয্যায়,
মধুমাখা মনকথা কহেছি দু'জনে,
সেখানে মিলিব আমি বিনোদের সনে।
যবে জন্মভূমি হ'তে ফিরাব নয়ন
অন্বেষিব নব দেশে নব প্রিয়জন।
বিদায়! আমার তুমি খেলার সঙ্গিনী,
কি বলিব, রেখো মনে আমায় ভগিনি,
ঈশ্বর-কৃপায় হ'বে বিপিনভামিনী!
বিনোদ, যুগল-নেত্র রবে নিরশন,
কালি যতক্ষণে পুনঃ না হবে মিলন।

[ প্রমদার প্রস্থান।

বিনোদ। বিদায়, মানদা; তুমি বিপিনে যেমন
বাস ভাল, সে তোমায় বাসুক তেমন!

[ প্রস্থান।

মানদা। পৃথিবীতে কারো অপেক্ষা কেহ কত সুখী! এই নগরীতে আমাকে সকলেই তাহার সমান সুন্দরী বলিয়া প্রশংসা করে, কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? বিপিন তেমন মনে করে না; যাহা সে ভিন্ন সকলে জানে, তাহা সে জানিবে না! কি আশ্চর্য্য! সে যতই প্রমদার রূপে মোহিত হইয়া ভুল করিতেছে, আমি ততই তাহার গুণে ভ্রমান্ধ হইতেছি। গুণশূন্য নিকৃষ্ট পদার্থকেও প্রেমে শোভা এবং প্রতিভাসম্পন্ন করিয়া তোলে—

প্রণয় না দেখে চোখে, দেখে শুধু মনে;
মন্মথ চিত্রিত তাই মুদিত নয়নে।
প্রেমের নাহিক রুচি, নাহিক বিচার;
পক্ষ আছে, চক্ষু নাই,—মূরতি তাহার!
তাই বলে—প্রেম যেন বালক, সরল;
নির্ব্বাচন-শক্তি তার এতই দুর্ব্বল!
দেখিয়াছিল না যবে নেত্রে প্রমদার,
বিপিন বলিত,—"আমি একান্ত তোমার";—
কতই প্রতিজ্ঞা যেন শিলা-বরিষণ!



প্রমদার রূপপ্রভা লেগেছে এখন,
সে শিলায়, এবে তাহা জলের মতন।

আমি তাহাকে প্রমদার পলায়নের কথা বলিব; তাহা হইলে সে নিশ্চয় কাল রাত্রে তাহার অনুসন্ধানে বনে প্রবেশ করিবে; আর আমি যদি ইহার জন্য শুধু ধন্যবাদ টুকু পাই, তাহাও আমার পক্ষে বহুমূল্য। সে বনে যাইবার এবং ফিরিয়া আসিবার সময়ে আমি যে তাহাকে দেখিতে পাইব, তাহাই আমার পক্ষে এই পরিশ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার হইবে। * ক্রমশঃ

নবীনচন্দ্র সেন।

---

# কবি জগদানন্দ।

সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পদকর্ত্তা জগদানন্দ, বর্ত্তমান রাণীগঞ্জ মহকুমার অধীন অণ্ডাল নামক ষ্টেসনের নিকট আগরডিহি দক্ষিণ খণ্ড নামক গ্রামে † বৈদ্য বংশে অনুমান ১৭০২ খ্রীঃ অঃ জন্মগ্রহণ করিয়া ১৭৮২ খ্রীঃ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

অপূর্ব্ব শব্দ-কবি জগদানন্দ, যখন বীরভূমের এক প্রান্তে বসিয়া কৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গলীলা বিষয়ক পদরচনায় ব্যাপৃত, সেই সময় বীরভূমের অপর প্রান্তে বসিয়া নিভৃতে পল্লীমধ্যে কবি গঙ্গানারায়ণ "ভবাণী-মঙ্গল" নামক সুবৃহৎ কাব্য রচনায় তন্ময় ‡; সন্নিহিত বাঁকুড়া অঞ্চলে জগৎরাম "অষ্টকাণ্ডীয় রামায়ণ" এবং পুত্র রামপ্রসাদ সহ 'দুর্গাপঞ্চরাত্র' গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত। আবার, নবদ্বীপে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র ও অম্বষ্ঠ বংশীয় ভক্তকবি রামপ্রসাদ সেন নিজ নিজ দিগন্ত-বিচ্ছুরিত কবিত্ব-প্রতিভায় সমগ্র দেশ আলোকিত করিতে অগ্রসর!

---

* এই অপ্রকাশিত গ্রন্থের কিয়দংশ শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় সম্পাদিত "অনুসন্ধান" পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহারই অনুমতি অনুসারে 'মানসী'তে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। মাঃ সঃ।

† জগদানন্দের সময় এই গ্রাম বীরভূমের অধীন ছিল।

‡ এই সুবৃহৎ সুন্দর কাব্যখানি এতদিন সাহিত্য-জগতে অপ্রকাশিত ছিল। সম্প্রতি এই গ্রন্থখানি উদ্ধার করিয়া, "বীরভূম-সাহিত্য-পরিষদের" দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে লেখক ইহার বিশদ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, বৈষ্ণব ধর্ম্মকে বিড়ম্বিত করিয়া তান্ত্রিক ও শাক্ত-ধর্ম্মের পোষকতা করিতেন। এই বৈষ্ণবধর্ম্মকে নিপীড়িত করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী-দিগকে নবদ্বীপের রাজাশ্রয় হইতে দূর দুরান্তরে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেন। ইহাতে বৈষ্ণবধর্ম্ম অন্তর্হিত না হইয়া কথঞ্চিৎ পরিমাণে প্রসারতা লাভ করে।

কবি জগদানন্দ যে সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, সেই সময় ভারতের মহাভাগ্য-বিপর্য্যয় সংঘটিত হয়। তখন, এক দিকে মোগল সূর্য্য অস্তমিত—শিখ, জাঠ ও মারাঠা জাতি মস্তক উত্তলনে প্রয়াসান্বিত; অপর দিকে, প্রবল প্রতাপান্বিত ভাগ্যবান্ ইংরাজবণিক ভারতের ভাগ্য-নিয়ন্তার সম্মানিত শূন্য-সিংহাসন অধিকারমানসে দৃঢ়পদক্ষেপে অগ্রসর। বঙ্গে তখন বৃদ্ধ আলিবর্দ্দী, মহারাষ্ট্রগণ কর্ত্তৃক উত্যক্ত, তাঁহার অন্তে যুবক সিরাজদ্দৌলা পলাশী-যুদ্ধে পরাজিত—তদন্তনর মুর্শীদাবাদে তখনই মিরজাফর, তখনই মিরকাসিম,—আজ যুদ্ধ, কাল রাষ্ট্রবিপ্লব—নিত্য অশান্তি! প্রজা-সাধারণ পরিবারবর্গ লইয়া নিয়তই প্রাণভয়ে ত্রস্ত ও শশব্যস্ত! ইহার উপর আবার ছিয়াত্তরের মন্বন্তর!

জগদানন্দের আবাসস্থান ক্ষুদ্র বীরভূমিও এই ভারতব্যাপী দারুণ বিপ্লব-তরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাতে যথেষ্ট আলোড়িত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্র আক্রমণ, নিয়ত যুদ্ধবিগ্রহ ও নানাবিধ দেশ-ব্যাপী অশান্তির জ্বালায় বীরভূমবাসী তখন নিতান্ত উত্যক্ত ও বিপর্য্যস্ত।

সুতরাং, এই অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যকাল ভারত ইতিহাসে মহাবিপ্লবের কাল—এক দিকে, মোগলশক্তির কালের তিমিরগর্ভে চিরতরে বিলোপ—অপর দিকে, প্রচণ্ড বৃটিশ সূর্য্যের প্রখর-রশ্মি-সমুদ্ভাসিত বরাভয়পূর্ণ উজ্জ্বল-মূর্ত্তির দ্রুত বিকাশ! এই অভাবনীয় অশান্তি ও বিপ্লবের মধ্যে বাস করিয়া যাঁহারা জনসাধারণ হইতে ঊর্দ্ধে—বহু ঊর্দ্ধে অক্ষয় শান্তিপূর্ণ সাহিত্য-কাননের আশ্রয় লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে বঙ্গবাণীর পরিচর্য্যায় রত হইয়াছিলেন—তাঁহারা বঙ্গভাষী মাত্রেরই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র সন্দেহ নাই।

তৎকালীন বঙ্গ-সাহিত্যে প্রখ্যাত বৈষ্ণব কবির নাম বিরল। দিগন্তব্যাপী শৈলমালা হইতে বিচ্ছিন্ন সুদূরসংস্থিত একক পর্ব্বতশিখরের মত, সেই সময়ের সাহিত্যে, কবি জগদানন্দকে তাঁহার বিচ্ছিন্ন মহিমা ও গৌরবময় স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই। রাজনৈতিক বিপ্লবপুঞ্জের দ্বারা কণামাত্র বিচলিত না হইয়া তিনি সমাহিতচিত্তে মধুর বৃন্দাবনের মধুর সাধন-চিন্তায় আত্মহারা ছিলেন। জগদানন্দের পদাবলী তাঁহার সাধন-কল্পতরুর অমৃত ফল।



যখন মুর্শীদাবাদে বৈষ্ণবদাসের সুবিখ্যাত পদ-সংগ্রহ গ্রন্থ "পদকল্পতরু" সঙ্কলিত হয়, তখন জগদানন্দ জীবিত। তাঁহার ছয়টি উৎকৃষ্ট পদ এই "পদকল্পতরু" গ্রন্থে স্থান লাভ করিয়াছে। সে সময় মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, সংবাদ পত্র ছিল না—দেশ, রাষ্ট্রবিপ্লবে নিত্য অশান্তিতে পরিপূর্ণ—তত্রাচ এই গুণবান কবির রচনা অত্যল্পকাল মধ্যে দূর দেশে প্রচলিত হইয়াছিল,—ইহাতে যে, তৎকালেও দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, যে কোন প্রকারেই হউক, সমাজ মধ্যে একটা সাহিত্যিক যোগ ছিল তাহা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারা যায়।

বংশ পরিচয়, পূর্ব্বকথা।—শ্রীখণ্ড নিবাসী অম্বষ্ঠকুলপ্রদীপ নরহরি সরকার ঠাকুর ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর মুকুন্দ সরকার ঠাকুর চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রিয়তম ভক্ত ছিলেন। নরহরি ঠাকুর আজীবন কৌমার-ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। মুকুন্দ, প্রথমতঃ গৌড়াধিপতির চিকিৎসক রূপে কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া চৈতন্যদেবের সহিত মিলিত হন। ইনিও অগ্রে বিবাহ না করিয়া পরে মহাপ্রভুর অনুমতি অনুসারে বিবাহ করেন। রঘুনন্দন ঠাকুর ইঁহার পুত্র; ইনি মহাপ্রভুর এত প্রিয় ছিলেন যে লোকে তাঁহাকে মহাপ্রভুর বরপুত্র বলিয়া অভিহিত করিত। প্রবাদ এই যে, ইঁহাদের কুলদেবতা শ্রীগোপীনাথ ঠাকুর, এই বালক রঘুনাথের প্রার্থনামত প্রত্যক্ষরূপ গ্রহণ করিয়া ক্ষীর-লড্ডুক ভোজন করিয়াছিলেন। তদবধি মহাপ্রভুর আদেশ মত কীর্ত্তন সমাজে রঘুনন্দন সর্ব্বাগ্রে মাল্য-চন্দন প্রাপ্ত হইতেন—ঠাকুরবংশীয়গণ অদ্যাপি এই সম্মান প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন।

বংশ-তালিকা—৭ মুকুন্দ, ৬ রঘুনন্দন, ৫ কানাইঠাকুর ৪ মদনমোহন ও রায় ঠাকুর, ৩ পরমানন্দ ঠাকুর ও অপর চারি পুত্র, ২ নিত্যানন্দ ঠাকুর ১ জগদানন্দ ঠাকুর ও অপর তিন ভ্রাতা সচ্চিদানন্দ, সর্ব্বানন্দ ও কৃষ্ণানন্দ।

জগদানন্দের পিতা নিত্যানন্দ ঠাকুর, শ্রীখণ্ড বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আগরডিহি দক্ষিণ খণ্ডে আসিয়া বাস স্থাপন করেন। তদনন্তর জগদানন্দ, তাঁহার ভ্রাতৃগণ হইতে পৃথক্ হইয়া বীরভূম জেলার অন্তর্গত দুবরাজপুর থানার অধীন জোঁফলাই নামক গ্রামে আসিয়া বাসস্থাপন করেন।

এই জোঁফলাই গ্রামে জগদানন্দ, শ্রীগৌরাঙ্গ এবং শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহের সেবা প্রকাশ করেন। শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ—'ডেঙ্গো', অর্থাৎ একক—রাধা মূর্ত্তি বিহীন। জগদানন্দ, স্বপ্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ সেবার নিমিত্ত কোনরূপ

দ্রব্যাদির তালিকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া যান নাই। তদানীন্তন বীরভূমের রাজধানী রাজনগরের রাজার দেওয়ান বা কর্ম্মচারী জোঁফলাই নিবাসী বক্সী-পরিবার এই সেবা পরিচালন জন্য ভূসম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত, জগদানন্দ পঞ্চকোটি কাশীপুরাধিপতির নিকট হইতে স্বীয় অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন পূর্ব্বক আমলালা নামক গ্রাম খানি সেবা পরিচালনার্থ প্রাপ্ত হন। এই গ্রাম এখনও শ্রীগোপীনাথের সম্পত্তি।

চিরকুমার জগদানন্দ, একজন সংসারবিরাগী সাধু ও ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। অতিথিসেবা তাঁহার জীবনের একটি মুখ্য ব্রত ছিল। বহু ব্রাহ্মণ সন্তান, জগদানন্দের শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিয়া আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছিলেন।

পদাবলী—জগদানন্দ, রাধাকৃষ্ণ লীলা ও গৌরাঙ্গ লীলা বিষয়ক বহু সংখ্যক পদ রচনা করিয়াছেন। এই পদাবলী মধ্যে তিনি ভাব অপেক্ষা শব্দ চয়নে অপূর্ব্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। জগদানন্দের পদাবলী স্থূলতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ—

(১) বাহ্য-চিত্র—অর্থাৎ একই বর্ণের অনুপ্রাসযুক্ত পদাবলী যথা ঃ—

কৈতব কেশব কুশল কি কহব কঞ্জলোচনী রাই।
কি জানি কতক্ষণে কব কি হোওব কহিতে আওল ধাই॥
কুসুম কার্ম্মুক কোপে কাতর কেলি কুঞ্জে লোটবাই।
কুলকলঙ্কিনী কি কহু কান্দই কিছু না ভাওই॥

ইত্যাদি। এইরূপ ক, খ, গ, ঘ প্রভৃতি বর্ণে রচিত পদ এই শ্রেণীর অন্তর্ভূত।

(২) অন্তশ্চিত্র—এই শ্রেণীর কবিতায় কোন বিশিষ্ট সংখ্যক পংক্তি পাঠ করিলে ভিন্ন কবিতা বা বাক্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। একটী কবিতার ৩য়, ৯ম, ১৫শ, এবং ২১শ বর্ণ অবরোহ আরোহ ক্রমে পাঠ করিলে "হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে। হরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে॥" এই মন্ত্রটি প্রাপ্ত হওয়া যায়। তদ্রূপ অন্য একটি পদে প্রতি পংক্তির ১ম, ৪র্থ, ৭ম, ১২শ ও ১৬শ বর্ণ পূর্ব্বোক্ত রূপ ক্রমানুযায়ী পাঠ করিলে "নরহরি প্রভু তুমি। কি আর বলিব আমি॥ তনু মন এক করি। চরণ যুগল ধরি॥ সমাপন তুয়া পায়। জগৎ আনন্দ গায়!" এই কবিতাটি প্রাপ্ত হওয়া যায়।



(৩) অনুকৃত প্রাচীন কবিগণের অনুকরণে রচিত পদাবলী ও (৪) সাধারণ।

শ্রীরাধার নিশীথ সময়ে কুঞ্জে অভিসার উপলক্ষে জগদানন্দ এই পদ রচনা করিয়াছেন ঃ—

"মঞ্জু বিকচ কুসুম পুঞ্জ, মধুপ শব্দ গুঞ্জ গুঞ্জ, কুঞ্জর গতি গঞ্জি গমন, মঞ্জুল কুলনারী।
ঘন গঞ্জন চিকুর পুঞ্জ, মালতি ফুল মালে রঞ্জ, অঞ্জন যুত কঞ্জ নয়নী, খঞ্জন গহি হারী॥
কাঞ্চন রুচি রুচির অঙ্গ, অঙ্গে অঙ্গে ভরু অনঙ্গ, কিঙ্কিনী কর কঙ্কন, মৃদু ঝঙ্কৃত মনহারী।
নাচত যুগল ভুজঙ্গ, কালিদমন দমন রঙ্গ, সঙ্গিনী সব রঙ্গে পহিরে, রঙ্গিল নীল সাড়ি॥
দশন কুন্দ কুসুম নিন্দু, বদন জিতল শরদ ইন্দু, বিন্দু বিন্দু ছরম ঘরমে, প্রেম-সিন্ধু প্যারী।
বলিতাধরে মিলিত হাস, দেহ দীপতি তিমির নাশ, নিরখি রূপ রসিক ভুপ, ভুলল গিরিবারী॥
অমরাবতী যুবতীবৃন্দ, হেরি হেরি পড়ল ধন্দ, মন্দ মন্দ হসনানন্দ, নন্দন সুখকারী।
মনি মাণিক নম ধিরাজ, কনক নুপুর মধুর বাজ, জগদানন্দ থলজলরুহ চরণক বলিহারি॥

কুঞ্জভঙ্গের একটি পদ শুনুন ঃ —

"অকরুণ পুন বাল অরুণ, উদিত—মুদিত কুমুদ বদন,
চমকি চুম্বি চঞ্চরি, পদুমীনিক সদন সাজে।
কি জানি সজনী রজনী ভোর, ঘু-ঘু মন ঘোষত ঘোর,
গত যামিনী—জিত দামিনী, কামিনী কুল লাজে॥
ফুকরত হত শোক কোক, অব জাগব সকই লোক,
শুক শারিক পিক কাকলী, নিধুবন ভরি আজে।
গলিত ললিত বসন সাজ, মণিযুত বেণী ফণি বিরাজ,
উচকোরক—রুচ চোরক, কুচজোরক মাঝে॥
তড়িত জড়িত জলদ ভাতি, তুঁহু সুখে সুতি রহল মাতি,
জিনি ভাদর—রস বাদর, পরমাদর সেজে॥
বরজ কুলজ জলজ নয়নী, ঘুমল বিমল কমলনয়নী,
রতি লাগিস—ভুজ বালিস, আলিস নাহি তেজে॥
টুটল কিএ ঘূণ ধনুগুণ, কিএ রতিরণে ভেল তনুগুণ,
সমর মাজ পড়ল লাজ, রতিপতি ভয়ে ভাজে॥
বিপতি পড়ল যুবতী বৃন্দ, গুরুগণ গতি কহই মন্দ,
জগদানন্দ সরস বিরস, রসবতী রস রাজে॥"

গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদে তিনি রূপ বর্ণনে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন এস্থানে একটিমাত্র পদ উদ্ধৃত হইল—

"শশধর যশ ধরু, নলিন মলিন করু, নয়ন নয়ন তুঁহু তোর।
তরুণ অরুণ জিনি, রসন দশন মণি, মোতিম জ্যোতি উজোর॥

চিতচোর গৌর তুঁহু ভাল।
জিতলি শিতল, কিরণে হিরণ-মণি দলিত ললিত হরিতাল ॥
পদকর শরদরবিন্দ, নিনিন্দহ নখবর, নখতর পাঁতি।
রসনা রসায়ন, রদন ছেদন হেরি, মোতিম রোহিত কাঁতি ॥
শুক মুখ দুরগতি, ধরণী বরনি নহ, বিধিক অধিক নিরনন।
অতএ কতএ কুল যুবতী উমতি ভেল, জগত জগতে করু গান ॥"

এইস্থানে একটী অপ্রকাশিত পদ প্রদত্ত হইল—

জগদানন্দের স্বহস্ত লিখিত কয়েকটি পত্র, লেখকের "রতন লাইব্রেরী"তে রক্ষিত আছে। এই পুঁথি এবং অন্যান্য প্রাচীন পদ সংগ্রহ পুথিতে জগদানন্দের কতকগুলি অপ্রকাশিত প আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই পদটি জগদানন্দের স্বহস্ত লিখিত পুঁথি হইতে অবিকল উদ্ধৃ হইল। লেখক।

"মিলিত সুললিত, নীরমলয় সমীর, বহ অতি মন্দ।
বিপথ গামিনী, তীর বিহরহ, ধর পদ অরবিন্দ ॥
দেখ গৌরবর গুণধাম।
নিরখি শুভগ, শরীর কম্পে, অথির দামিনী দাম ॥ ধ্রু ॥
রুচির নাভি, গভীর ওরাই, হীরমণি সব দোল।
বলিত নিলীম, চির ওজর, জঙ্গীর মঞ্জির দোল?
করত রস পরিহাস, কত সমবেশ, বয়সহি মেলি।
অগত আনন্দ; হৃদয় মন্দির, ঐছে কর নিতি কেলি ॥"

স্বর্গীয় কালিদাস নাথ মহাশয়, "জগদানন্দ পদাবলী" গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন - 'কি কবিত্ব, কি ছন্দলালিত্য, কি রচনা চাতুর্য্য, কি শব্দ-বিন্যাস কি বৈচিত্র, বোধ হয় ঠাকুর জগদানন্দ সকল বিষয়েই তাঁহার পূর্ব্বতন ও পর-বর্ত্তী কবিকুলের বন্দনীয় ও অগ্রগণ্য। যে কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া, যে রসে ডুবিয়া মানুষ কিয়ৎকালের জন্য শোকতাপ ভুলিয়া যায়, জগদানন্দের কবিতা এই শ্রেণীর" ইত্যাদি।

"ভাষা-শব্দার্ণব" নামক জগদানন্দ-বিরচিত একখানি পুঁথির কিয়দংশ মাত্র সম্প্রতি স্বর্গীয় কালিদাস নাথ মহাশয় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে প্রথম কল্লোল বা অধ্যায়ের শেষাংশ, দ্বিতীয় কল্লোলের সম্পূর্ণ এবং তৃতীয় কল্লোলের প্রথমাংশ মাত্র আছে। এই গ্রন্থে, ক-কারাদি অনুপ্রাস যুক্ত শ্রীকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক পদাবলী আছে। প্রথম কল্লোলে, "কা-দি দিগ্দর্শন, দ্বিতীয় কল্লোলে "খা-দি দিগ্দর্শন" তৃতীয় কলোলে "গা-দি দিগ্দর্শন" ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত নাথ মহাশয়, জগদানন্দের একটি 'খসড়া' প্রাপ্ত হইয়াছেন।



ইহাতে কবি, ককারাদি বর্ণমালানুক্রমে এবং সমস্বরবিশিষ্ট শব্দ-মালা একত্র সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এই সমস্বর বিশিষ্ট কতকগুলি শব্দ উদ্ধৃত হইল --

অমল, বিমল, কমল, ঘুগল, চলল, টলল, তরল, ঘামল, ঘূমল, চুমল, দূমল, ধামল, ধোয়ল, বিরল, সরল, গরল ঘেরল, হেরল' কষিল, ঘর্ষিল, ধনিল, পশিল, রহিল, হাসিল, মিলল, অলল, চলল, দুলল, জলল, পলল, টলল, কলল, বলল ; কোল, গোল, চোল, ডোল, ঢোল, দোল, রোল, ভোল, মোল, বোল ; অলক, রূপক, তিলক, ভালক, পলক, ফলক, হলক, ইত্যাদি।

কবি জগদানন্দের স্মরণার্থ প্রতিবৎসর বামন-দ্বাদশীর দিন জোঁফলাই গ্রামে তিন দিন ধরিয়া একটী নাতিবৃহৎ মেলার অধিষ্ঠান হইয়া থাকে। *

শ্রীশিবরতন মিত্র।

---

# কেরাণী-জীবন।

টাকাটি ভাঙ্গালে, দু'দণ্ডের বেশী
পয়সা বাক্সে থাকে না ;
মাসের দোসরা মুদি ও কাপুড়ে
আধলাটি বাকী রাখে না।
সপ্তাহ গত না হতেই, যায়
মাইনেটি সোজা উড়িয়া ;
(আর) চিৎ হাত কেহ উপুড় করে না
মরি যদি মাথা খুঁড়িয়া।
আর ক'টা দিন মাসের যা' থাকে
চালাইতে হয় বাকিতে ;
দুনিয়ার মধু-ভ্রূকুটি দেখিয়া,
জল আসে পোড়া আঁখিতে।
এ মাসে গোয়ালা শোধ হ'ল নাকো
দিব এই মাস কাবারে,

* বীরভূম সাহিত্য-পরিষদের প্রথম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

গোয়ালা বলিছে, "তা' কি হয়, বাবু
অত দেরী, ওরে বাবারে!"
কলু বলে, "বাবু তেলের দামটা
চুকাইয়া দিলে হয় না?"
স্যাক্‌রা বলিছে, "টাকা নাই, তবে
কেন মাগ চায় গয়না?"
ঊর্দ্ধ সপ্তপুরুষের মুখে
দিয়া নানাবিধ খাদ্য;
সেই করে' যায় পিতৃলোকের
বিহিত মাসিক শ্রাদ্ধ।
জ্যেষ্ঠ পুত্র বাকী ক'রে কার
মেঠাই খেয়েছে লুকিয়ে;
ওঠে না সে তার সাড়ে তের আনা
তখনি না দিলে চুকিয়ে।
আজকে নেহাৎ নাচার—ভায়া হে,
হস্ত নেহাৎ রিক্ত;
সে বলে, "মেঠাই খেতে বেশ লাগে
দাম দেওয়াটাই তিক্ত।"
ষষ্ঠী দেবীর চরণ-কমলে
গৃহিনীর মতি অচলা—
উর্ব্বরতার বর দিলা দেবী
বর্ষ যায় না অফলা।
রাত যত বাড়ে দিন তত কমে
প্রকৃতি-বিজ্ঞান বলিছে;
ষষ্ঠী লক্ষ্মীর অনুকম্পাটি
সেই অনুপাতে চলিছে।
খোকার জ্বর, সে বার্লি খায় না
ওষুধ খায় না খুকীটে;
মারিয়া ধরিয়া খাওয়াইতে হবে
আমারি ঘাড়ে সে ঝুঁকিটে।



খেটেখুটে এসে মনে মনে ভাবি
আজকে বড্ড রাগবো;
রেতে দু'টো খেয়ে চক্ষু মুদেছি
খোকা বলে, "বাবা——"।
এটা ঘুমাইলে ওটা জেগে বসে
অকারণে জোড়ে কান্না;
তবু তাহাদের শাসনের হেতু
গিন্নি খুঁজিয়া পান না।
বড় ছেলেটি ত প্রায়শঃ আসেন
ইস্কুল থেকে পালিয়ে;
টেড়ীও কাটেন, সিগারেটও খান
বাপের হাড়টী জ্বালিয়ে।
ষষ্ঠ শ্রেণীতে পেয়েছেন তিনি
কায়েমী মৌরসী পাট্টা;
আমার শাসন, শিক্ষকের গালি—
সকলই তাহার ঠাট্টা।
নেহাৎ নাচার হইয়া, চড়টা
দিলে—কি কানটা মলিলে;
"অহো কি নিঠুর" বলিয়া গিন্নি
ভাসেন নয়ন-সলিলে।
মাতৃস্নেহের মাত্রা যে দিন
বেড়ে উঠে অতিরিক্ত;
আঁখিজলে আমি ভিজি বা না ভিজি
উপাধান হয় সিক্ত।
হঠাৎ যে দিন অভিমান উঠে
রোষের মূর্ত্তি ধরিয়া;
ভীম ঊর্ম্মিমালে উথলে সেদিন
নয়ন সলিল দরিয়া।
বিদ্যুৎবেগে মুখের সাম্‌নে
নাড়িয়া কোমল হস্ত;

বলেন, "আমরি বিদ্যায় তুমি
নিজে তো পণ্ডিত মস্ত!
তোমারি তো ছেলে, গাধার পুত্র
বৃহস্পতি হবে নাকি গো,
তোমার বাপ্‌কে ফাঁকি দিয়াছিলে,
ও দেয় তোমারে ফাঁকি গো।
বাসার ভাড়াটী দু'মাসের বাকি
জমিদার অসহিষ্ণু ;
তাগাদা করিছে দু'বেলা—বলিনে
গঙ্গা, রাম, কি বিষ্ণু।
সন্ধ্যায় ফিরি' কাছারী হইতে
খুলি' কাছারীর পোষাক ;
বাইরে আসিয়া দেখি বসে আছে
চুনি সাহা দেব বসাক।
তামাকটি সেজে ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ
টানি আর জুড়ি গল্প,
দিবসের সেই শুভ মুহূর্ত্ত
বেঁচে থাক্ কোটি-কল্প।
কাছারিতে খাই সাহেবের গালি
বাড়ীতে গিন্নি খাপ্পা ;
(এই) উভয় সঙ্কট মাঝে আছে এক
পরম বন্ধু 'ডাব্বা'।
অন্দর হতে মেয়ে এনে দেয়
তেল নুন মুড়ি লঙ্কা ;
বলি, "দেব ভায়া কলেরার দিনে
লুচি খেতে হয় শঙ্কা!
নইলে আমার ঘরে করা লুচি
রোজ হয় জল খাবার ;
হিসেবী গিন্নি খাইয়ে খাইয়ে
করে দিলে সব কাবার।



খাবার কষ্ট বুঝলে ভায়া হে,
সহ্য হয় না মোটেই ;
(আর) নেহাৎ পক্ষে রোজ দু'টো টাকা
উপরি, বুঝলে? জোটেই!
দেব বাবুদের পান এনে দাও
যাও তো লক্ষ্মী ভেতরে—"
বলিয়া মেয়েকে পাঠাই, গিন্নি
বলেন, "পাঠালে কে তোরে?
সাত দিন হ'ল এনে দিয়েছিলে
এক পয়সার সুপুরি ;
বাইরে বসিয়া নবাবী হচ্ছে
রোজ দু'টো টাকা উপুরি।
বল্‌গে বাইরে—হাত জোড়া আছে
পান তো দেবার যো নেই ;"
শুনতে পেয়েও কিচ্ছু শুনি না
চেপে রাখি মনে মনেই।
দূরদেশাগত বাল্য-বন্ধু
যদি কেহ আসে বাসাতে,
কিছু না শুনিয়া সে অমৃত বাণী
পারে না সে কভু পাশা'তে।
উচ্চকণ্ঠে বলেন গিন্নি--
"মরণ আর কি আমার ;
ধানের গোলা যে দিয়েছ বাড়ীতে—
প্রচুর জোত ও খামার।
যত রাজ্যের ভব-ঘুরে এসে
জোটে গো তোমারি বাসায় ;
অন্নসত্র খুলে ব'সে আছি
স্বর্গে যাবার আশায়।"
শুনে তো বন্ধু এক বেলা থেকে
ও বেলা থাকিতে চান্ না ;

"ষাঁড়ের মতন চেঁচিও না"—যেই
বলেছি, অমনি কান্না।
"মাগো, বাবা গো দেখে যাও" বলে'
সটান্ মেজেতে লম্বা ;
সে রেতের মত ঐ হয়ে গেল—
আহার অষ্টরম্ভা !
মেজাজ বিগ্‌ড়ে না গেলে, অবশ্য
তিনিই দুবেলা রাঁধেন ;
( আর ) রাঁধ্‌তে রাঁধ্‌তে হাড় জ্বলে গেল—
ব'লে মাঝে মাঝে কাঁদেন।
তোমাদের তবু মাঝে মাঝে আছে
পরবে পরবে ছুটিটে ;
আমার কামাই এক বেলা নাই
কারো ভাত কারো রুটিটে।

* * * * * *

যদি বা অনেক সাধ্যসাধনে
ঘুমায় সখের সেনানী ;
সুরু হয় সেই করুণ-কঠোর
গিন্নির ভ্যান্‌ভ্যানানি।
যদিও সংসারে থেকে, নিতে হয়
সুখ ও দুখের বখ্‌রা ;
তবু, হা কপাল, ঘুমাইয়া পড়ি
জবাব দিলেই ঝগড়া !
জেগে দেখি আমি ঘুমিয়ে রয়েছি,
এত কলরবে জাগিনি ;
এখনো বাজিছে জল-তরঙ্গ
নাসিকায়—খট্‌ রাগিণী।
কতদিন হ'ল দিতে চেয়ে ছিলে
একটা ইহুদী মাক্‌ড়ী ;



কতই বা দাম, তাও তো হল না ;
হায় রে সখের চাকরী!

* * * *

ছেলে গুলো সব স্বনামধন্য
"মুন্‌কে রঘুর" বাচ্ছা,
ডাল ভাত লুচি রুটি তরকারী
যত দাও—তাই আচ্ছা।
দিনে রেতে হয় ভোজন তাদের
গড়ে অন্ততঃ চারবার ;
এই কারবারে জেরবার করে'
ফিকির করেছে মারবার,
হাতে পায়ে কিছু ছোটবড়, কিন্তু
উদরগহ্বরে সমতা ;
"গরীব নাচার বাবা" ব'লে নাই
ভোজনের বেলা মমতা।
পুত্রগণের ঔদরিকতা
পিতার জীবন চরিতে,
যদিও একটু কেমন দেখায়
লিখিতে কিম্বা পড়িতে ;
কিন্তু তোমরা এতটা পড়িয়া
বুঝিতে পারনি পাঠক,
( যে ) এখন আমার থাকিবার স্থান
সটান পাগ্‌লা-ফাটক ?
শ্বশুর কিম্বা ভগিনীর পতি
কেহ নাই মোর আপিসে ;
নিজের কিম্বা পিতার শ্যালক ,
না খুড়ো, না জ্যাঠা, না পিসে,
সুতরাং আর motion দিবে কে ?
inertiaর law জানো ?

(আর) নিজেরো একটু tact থাকা চাই—
কর্ত্তৃনিচয় ভজানো।
নতুবা যেখানে আছ, রয়ে গেলে—
পাহাড় কিম্বা বৃক্ষ ;
চরণের নীচে সব মাটি, আর
উপরে অন্তরীক্ষ !
এত গিরি তুমি চূর্ণ করেছ,
"কেরাণী-গিরি টে রাখিবে ?
হে বিধি, তোমার শক্তির সুযশে
কলঙ্কের কালী মাখিবে !

শ্রীরজনীকান্ত সেন।

---

# বিশু দাদা।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

পূর্ব্ব রাত্রিতেই সুলোচনা বিশ্বনাথকে ডাকিয়া বাড়ীর মধ্যে লইয়া গিয়াছিলেন। বিশ্বনাথ নূতন কলিকাতায় আসে নাই। সতীশের বাসা হইতে বিশ্বনাথ অনেকবার কলিকাতায় সতীশের বাসায় আসিয়াছে। সুলোচনা বিশ্বনাথকে বড়ই শ্রদ্ধা করিতেন, বিশ্বনাথ যে নরেশ বাবুর বাড়ীর চাকর তাহা একদিনও তাঁহার মনে হয় নাই ; তিনি মনে করিতেন বিশ্বনাথ নরেশ বাবু ও সতীশ উভয়েরই অভিভাবক। সুলোচনাও বিশ্বনাথকে 'বিশুদাদা' বলিয়াই ডাকিতেন।

বিশ্বনাথ বাড়ীর মধ্যে গেলে সুলোচনা তাহাকে আদর করিয়া বসাইলেন, নানা প্রকার জল খাবার আনিয়া দিলেন। বিশ্বনাথ সামান্য একটু জল খাইয়া যখন স্থির হইয়া বসিল, তখন সুলোচনা বলিলেন "বিশুদাদা, আমি বাবুর কাছে সব কথা শুনেছি। কাকাবাবু, বাবুকে যে চিঠি লিখেছিলেন তা আমি পোড়েছি। হায় হায়, এমন কাজও কি কেউ করে। আচ্ছা বিশুদাদা, তোমরা সুমতি দিদির খোঁজ খবর কোরেছিলে। কে এমন কাজ কোরেছে তার কি কিছু সন্ধান পেয়েছ ?



বিশ্বনাথ। না দিদি, কোন খোঁজই হয় নি। আমি ত খুঁজবার জন্য বের হোতে চেয়েছিলুম, কিন্তু সকলেই নিষেধ কোরলেন, সকলেই বোললেন, আর খোঁজ খবর কোরে কি হবে, তাতে কি আর কলঙ্ক মুছবে। আমি আর কি করি দিদি ! কাকা বাবুকে আর ভবেশকে এমন অবস্থায় একেলা বাড়ীতে ফেলে রেখে আমি যদি খুঁজতে বেরিয়ে যেতুম, তা হোলে ওরা কত কষ্ট পেতেন। তাই এতদিন চুপ করে আছি, কিন্তু এখন আর চুপ কোরে থাকবো না,—যে আমাদের এমন সর্ব্বনাশ কোরেছে, তার রক্ত দেখ্‌বো, তবে আমার নাম বিশ্বনাথ।"

সুলোচনা বলিলেন "না বিশুদাদা, অন্যায়ের শাস্তি ভগবান দিবেন, তুমি আমি কি শাস্তি দিবার কর্ত্তা ? তুমি এত অধীর হয়ো না। যে এমন পাপের কাজ কোরেছে, তার শাস্তি নিশ্চয়ই হবে ; তুমি কেন তাকে শাস্তি দেবার জন্য ব্যস্ত, বিশু দাদা ! অমন কর্ম্মও কোরো না। তবে লোকটা চিনে রাখা ভাল ; তার অন্যায় কার্য্যের কথা দশ জনের জানা ভাল, তাতে লোকে সাবধান হতে পারে। কিন্তু কেমন কোরে খোঁজ কোরবে ?

বিশ্বনাথ। খোঁজ করা শক্ত বটে ; কিন্তু আমি ত আগে দিদিকে খুঁজে বের কোর্‌বো। আমি সেই জন্যই এখানে এসেছি। আমার বিশ্বাস, দিদি এই সহরেই আছে। আমি স্বপন দেখেছি, দিদি এখানে গঙ্গার ধারে কোন স্থানে আছে। আমি আগে দিদিকে চাই। দেখি সে কেমন অবস্থায় আছে ? দেখি তার মনে কোন কষ্ট হোয়েছে কিনা ? যদি দেখি সে পাপে গা ভাসিয়ে দিয়েছে, তা হোলে তার মুখ আর দেখবো না—তার কথা আর বোলবো না,—বুকের ভিতর থেকে তার মুখখানা তুলে ফেলে দেবো—তার জন্য একটা নিশ্বাসও ফেলবো না, আর যদি দেখি—দিদি আমার কেঁদে আকুল হোচ্চে,—চারিদিক অন্ধকার দেখ্‌ছে—হায় হায় কোরছে, তাহলে আমি তাকে বুকে তুলে নিয়ে আস্‌বো—কারো কথা শুন্‌বো না। দেখ দিদি ! সকলে বলে যে, তাকে ত আর ঘরে নেওয়া যাবে না। আমি তাদের মুখের উপর বোলেছি, যে তাকে ঘরে না নিতে চায় না নিক্, আমি তাকে ঘরে তুলে নেবো। কেউ তারে যদি গ্রহণ কোরতে না চায়—তার বাপ ভাই যদি তাকে ক্ষমা না করেন, আমি তাকে কোলে তুলে নেবো। তাকে নিয়ে আমি কাশী চোলে যাব,—সেখানে ভিক্ষা কোরে তাকে খাওয়াবো ; তার জন্য—"

বিশ্বনাথের কথায় বাধা দিয়া সুলোচনা বলিলেন "বিশুদাদা, সে সব কিছু কোর্‌তে হবে না। আমি তাঁকে মাথায় তুলে নেবো; আমি তাঁকে আমার দিদির আসনে বসাবো; তাতে কেউ কিছু বোললেও আমি শুনবো না। তুমি বাবুর কথা ভাবছো,—আমি বোল্‌ছি, তিনি এতে কিছু অমত কোরবেন না। এতে যদি কেউ আমাদের সঙ্গে ব্যবহার না করেন, বেশ। বিশুদাদা, তুমি দিদিকে নিয়ে এসো, কোন ভাবনা কোরো না, তিনি যেমন দিদি ছিলেন তেমনই থাক্‌বেন।"

বিশ্বনাথ। ধন্য দিদি তুমি! এমন কথা কেউ আমাকে কোন দিন বলে নাই। দিদি! দিদি আমার হঠাৎ যদি অন্যায় কাজ কোরেই থাকে, একদিন হঠাৎ যদি পাপে পোড়ে থাকে, আর তার পরে যদি তার প্রাণের মধ্যে আগুন জ্বলে থাকে, তা হোলে কি তাকে চিরকাল নরকের মধ্যেই ফেলে রাখতে হবে।

সুলোচনা। না—কিছুতেই না, বিশু দাদা! কিছুতেই না। তুমি কাল থেকেই খুঁজতে বেরুবে; যে দিন যে খবর পাবে আগে আমাকে দিয়ে যাবে। আমি তোমার পথ পানে চেয়ে থাক্‌বো। কিন্তু বিশুদাদা! আমি ভাব্‌ছি কি, এত বড় কলিকাতা সহরে কোথায় তিনি রোয়েছেন, তা তুমি কেমন কোরে জান্‌বে। এখানে লুকিয়ে থাক্‌লে কি কেউ খুঁজে বা'র কর্‌তে পারে?

বিশ্বনাথ। আর কেউ না পারে আমি পারবো—আমি খুঁজে বের কর্‌বোই। একদিনে না হয়, দশ দিনে—দশ দিনে না হয়, দশ মাসে দিদিকে পাবোই।

সুলোচনা। মা কালি! তাই যেন হয়। আচ্ছা বিশুদাদা! তুমি কেমন করে খোঁজ কোরবে?

বিশ্বনাথ। দিদি! সে কথা আমি ভেবে রেখেছি। আজ রাত্রিতে আমি এই সহরের সকলের দ্বারে দ্বারে গান গেয়ে ফিরবো—পথে পথে গান করবো। দিদি আমার গান শুন্‌তে পেলেই দৌড়ে আস্‌বে, আমার গলা সে চেনে। আজ সতেরো বৎসর তাকে খালি গান শুনিয়েছি। সেই দিদি আমাকে না বোলে পালিয়ে গেল!"

বিশ্বনাথের চক্ষু ছলছল করিয়া আসিল। তাহাকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য সুলোচনা বলিলেন "বিশুদাদা, তুমি যে গান করিতে জান, তা তো আমি



জান্‌তাম না; ঠিক এতদিনও ত আমাকে একটা গান শোনাও নাই। আজ তোমাকে একটা গান গাইতে হবে।"

বিশ্বনাথ। কি গান গাইব দিদি?

সুলোচনা। শ্যামাবিষয় গাও।

বিশ্বনাথ তখন প্রথমে একটু গুণ গুণ করিল, তাহার পর সুর উচ্চে চড়াইয়া গান ধরিল।

মা মা বলে আর ডাক্‌বনা;
তারা দিয়েছ দিতেছ কত যন্ত্রণা।
ছিলাম গৃহবাসী, বানালে সন্ন্যাসী।
আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী,
আমি ঘরে ঘরে যাবো,
ভিক্ষা মেগে খাবো;
দেখ্‌ব মা মোলে কি আর ছেলে বাঁচেনা।

গান শুনিতে শুনিতে সুলোচনার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। সতীশ গানের আওয়াজ পাইবামাত্র বাড়ির মধ্যে আসিয়া দেখে বিশ্বনাথ তন্ময় হইয়া গান করিতেছেন, আর অশ্রুপূর্ণ লোচনে সুলোচনা এক মনে সেই গান শুনিতেছেন। সতীশ অবাক হইয়া এই দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন, তাহার মনে হইল এ স্বর যেন স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিতেছে—তাহার মনে হইল স্বয়ং ষোড়শী যেন সুলোচনার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সাধকের আবদার শুনিতেছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজলধর সেন।

---

# পূজার অভিভাষণ।

পূজা সম্বন্ধে দেশের লোককে কি কথা বলা আবশ্যক এ বিষয়টি অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং এ বিষয় অনেকে আমাকে একটি প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। প্রবন্ধ লিখিবার সময় আমার নাই, বেশী কথা বলিবার অবসরও অতি অল্প। তবে আমি একটী কথা বলিতে চাই। ভরসা করি আমার স্বদেশবাসীগণ সেই কথাটি গ্রহণ করিবেন। পূজা উপস্থিত।

বস্ত্রাদি অনেক জিনিষই কেনা হইবে। যখন এই পূজা উপলক্ষে খরিদ বিক্রী উপস্থিত হইবে, তখন যেন উদার স্বদেশী মন্ত্র ও স্বদেশী প্রতিজ্ঞাটি মনে থাকে। বারবার আমরা এই মন্ত্রটি উচ্চারণ করিয়াছি, ভগবানকে সাক্ষী করিয়া বারবার এই পুণ্য মন্ত্রটি পাঠ করিয়াছি, দেশ বিদেশে স্বদেশী ধর্ম্ম প্রচার করিতে আমরা বদ্ধপরিকর ; এই উপলক্ষে যেন আমরা এই মন্ত্রটী না ভুলি, এই প্রতিজ্ঞাটি বিস্মৃত না হই। এবারে সভাসমিতির অধিবেশন অনেক কারণে হয় নাই, সে বিষয়ের সমালোচনা করা অনাবশ্যক, কিন্তু এই মন্ত্রটি আমাদের শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত হইতেছে। কোন্ প্রকৃত বাঙ্গালী স্বদেশীমন্ত্রে দীক্ষিত নয়। যদি কেহ না থাকে তবে সে বাঙ্গালী নহে। তাই বলি যে পূজা উপলক্ষে আমার এই মন্ত্রটী পালন করিয়া যাহাতে মায়ের পূজা সুসম্পন্ন করিতে পারি, তাহার উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। তাহা হইলে আমরা ধন্য হইব, দেশ গৌরবান্বিত হইবে, ভগবান আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। ন্যায়ের, ধর্ম্মের, আইনের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আসুন আমরা এই মহাব্রত উদ্‌যাপন করি।

মণিরামপুর,
২৬ ভাদ্র ১৩১৭।

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

# সেকালের কালী কলম।

ছেলেবেলা যখন গ্রামের পাঠশালায় লিখিতাম, ( তখন পড়িতাম না, লিখিতাম ), তখন কালী-কলম-কাগজ নিজেকে জোগাড় করিয়া লইতে হইত। তাল-গাছের পাতা কাটানা, কঞ্চি ও শর কাটা, কালী করা, বিদ্যাশিক্ষার এ একটা স্মরণীয় অঙ্গ ছিল। সকলে তাল-গাছে উঠিতে পারে না, সকল গাছে লেখার পাতা থাকে না। কোন্ কঞ্চি ও শরে কলম ভাল হয়, তাহা আলোচনা গবেষণার বিষয় ছিল। গ্রামে কঞ্চি ও শরের অপ্রতুল ছিল না, ছিল ছুরীর কর্মকার ছুরী গড়িয়া দিত। ছুরীর বাঁট লোহার, কঞ্চি কাটিবার উপযুক্ত বটে, দোষ এই, ধার মোটা, বারবার না শিলাইলে কঞ্চি কাটিতে হাতে জোর পড়িত। তালগাছের পাতা কাটা হইলেই লেখার যোগ্য হয় না। পাতার আগা ও গোড়া কাটিয়া দুই তিন দিন পুকুরের জলে ডুবাইয়া রাখিতে হইত,



নতুবা পাতা তেলা থাকিত, নরম হইত না। কেহ কেহ তাড়ী বাঁধিয়া পাঁকে পুতিয়া রাখিত। ইহাতে পাতা কাল হইত, একটু খস্‌খসা হইত, সহজে কাটিতও না। পাতা খস্‌খসা না হইলে অক্ষরের ছাঁদ দেখানা যায় না।

প্রথম কলম রাম-খড়ী। প্রথম কাগজ পাঠশালার মেঝিয়া। গুরুমহাশয় ক খ বড় বড় করিয়া লিখিয়া দিতেন। সেই লেখায় খড়ী বুলাইতে হইত। দুই দশদিন পরে লেখার সঙ্গে সঙ্গে পড়াও চলিত। তখন ক-খ গ-ঘ হাকিয়া পড়িতে হইত।

আজি-কালি সে কাগজ নাই, সে কলম নাই, সে লেখা নাই। এখন শিশু ছবি দেখিয়া পড়িতে শেখে, পরে লিখিতে শেখে। শ্লেট ও পেনশিল আছে বটে ; কিন্তু শ্লেট ছোট, সেকালের ক লিখিতে আঁটে না ; পেনশিল সরু, মুঠা করিয়া ধরিতে পারা যায় না, চাপিয়া লিখিতে পারা যায় না। এখন বিদ্যালয়ের কাগে ক-খ লেখাইবার কথা হইতেছে, প্রথমে বড় বড় অক্ষর লেখা দরকার বোঝা যাইতেছে। কিন্তু দাঁড়াইয়া লেখা ও বসিয়া লেখা এক কথা নহে, সব বিদ্যালয়েও কাঁথকে লেখ্য করিতে পারা যায় না। হাতে-খড়ীর পর তালপাতে লেখা। সেখানেও কলম মুঠা করিয়া ধরিতে হইত। কলম কঞ্চির, বামহাত আধার, তালপাতা লেখ্য। অবশ হাত বশ করিতে একটু বলপ্রয়োগ চাই।

বাজারে যে কষকালী বিক্রয় হয়, তাহাতে কাগজে লেখা চলে, তাল-পাতায় লেখা চলে না। তাড়ীর পাতা লেখা শেষ হইলে ধুইয়া আবার লেখা যাইত। সুতরাং এমন কালী-চাই, যাহা পাতায় লেখা চলিবে, ধুইলে পাতায় দাগ থাকিবে না। এই কালী মষী-কালী ( অপভ্রংশে ভূষকালী )। এই কালী—India Ink, যাহার তুল্য স্থায়ী কালী আর নাই। India ink কালী দামী, তাই সকলে পায় না ; চিত্রকর দাম দিয়া কেনে, কারণ এ কালী না হইলে চিত্র লেখা চলে না। এখন মষী-কালীর গুণ শুনিতে পাই, কখনও দেখিতে পাই ; কিন্তু সে কালী ভিন্ন আমাদের অন্য কালী ছিল না ; কালী ফুরাইলে তৈয়ার করিয়া লইতাম। মুড়ি ভাঙ্গা খোলার তলা তালপাতা দিয়া চাঁচিয়া মষী লইতাম।

কিন্তু মষী ও জল মেশে না ; মাড়িয়া মিশাইয়া রাখিয়া দিলে জলের তলে মষী পৃথক হয়। অতএব এমন একটা দ্রব্য চাই, যাহা মষীকণাকে জলে মিশাইয়া রাখিতে পারে। অর্থাৎ আঠা দরকার। চাল-চোঁআনি ( চাল-চোঁআ-পানি ) সুলভ আঠার জল। চাল চোঁআইলে তাহার শ্বেতসার

( starch ) এক প্রকার আঠায় ( dextrin or British gum ) পরিবর্তিত হয়। চাল-চোঁআ জলে ভিজাইয়া রাখিলে এই আঠা জলে মিশিয়া যায়। এই আঠা বেশী চট্‌চটা নয়। এই রকম আঠাই চাই। জলে মুড়ি ভিজাইলেও আঠা হয়, কিন্তু খরাইয়া ভাজিলে যত হয়, খাবার মুড়িতে তত হয় না। খইমণ্ড শ্বেতসারের আঠা; এ আঠা জলে মেশে না। চাল-চোঁআনি কে আবিষ্কার করিয়া ছিল, কে জানে। চাল-চোঁআনির আরও গুণ থাকিতে পারে। বাবলা আঠা দিয়াও মষীকালী করা যাইতে পারে। কিন্তু বাবলা গাছ সকল গাঁয়ে পাওয়া যায় না, গাছে সব সময় আঠাও থাকে না। চিত্রকরের India Ink করিতে শীরিষ আঠা লাগে। ফলে তার মষী ও আঠা ভিন্ন India Ink অপর কিছু নয়।

এই মষী-কালীর সঙ্গে কেশুতে পাতার রস মেশানা হইত। কেশুতের ভাল নাম কেশরাজ, যাহা চুল কাল করিয়া রাখিবার ঔষধ বলিয়া আয়ুর্বেদে গণ্য আছে। কোথাও কোথাও কেশুতের নাম লাউকেশুতে; হরিতবর্ণ বুঝাইতে লাউ শব্দের যোগ ( যেমন লাউডগা সাপ )। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলাম, কেশরাজের ভস্মে লৌহাংশ কিছু বেশী আছে। এই কারণে কেশরাজ তৈল উপকারী হইতে পারে; কিন্তু মষীকালীতে কেশরাজের সে প্রয়োজন থাকিতে পারে না। দেখা যায়, চাল-চোঁআনি ও মষীর লেখা উজ্জ্বল দেখায় না, কেশরাজের রস-মেশানা কালীতে উজ্জ্বল হয়, গাঢ় কালও হয়। আরও কারণ থাকিতে পারে। সম্প্রতি এই পর্য্যন্ত।

মষী কালী দিয়া কাগজে লেখাও চলে। গ্রামে এই কালী এখনও আছে। এই কালীর দোষ এই, জলে ধুইলে লেখা উঠিয়া যায়। এই হেতু এই কালীতে পুথী লেখা হয় না। পুথী-লেখা কালী কষ-কালী, যে কালী বাজারে বিক্রয় হয় এবং যে কালী দিয়া আজি-কালি আমরা লিখিয়া থাকি। পুথীলেখার কালী পাকা কালী। এই কালীর লেখা উজ্জ্বল, কৃষ্ণবর্ণ, বরং একটু তাম্রবর্ণ। একবার এক কবিরাজ-মহাশয় লেখককে পুথী-লেখা কালী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। হরীতকী বয়ড়া আমলকী—ত্রিফলা কষায়-রস জন্য প্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে বয়ড়া নিকৃষ্ট, তাহাতে কষায়-রস ( কষায়ীন, tannin) অল্প থাকে। পাকা আমলকী কষ-সম্বন্ধে একেবারে অকর্মণ্য, তাহাতে কষায়ীন প্রায় থাকে না। কাঁচা হরিতকী ও কাঁচা আমলকী উৎকৃষ্ট। কবিরাজ-মহাশয় কিন্তু ত্রিফলা না লইয়া টেরী শুঁটী লইয়াছিলেন। টেরীর নামের নানা রূপান্তর আছে, টেরী,



তেরী, তারী। টেরী গাছ কাঁটা গাছ, কতকটা গিলাগাছের মতন। শুঁটীতে ২।৪টা বীজ থাকে। বীজ ফেলিয়া দিয়া শুঁটী ধুইয়া কবিরাজ-মহাশয় জল দিয়া লোহার কড়াইতে রোদে রাখিয়া দিতেন। কষায়ীনের সহিত লোহার যোগে জল ক্রমশঃ কাল হইতে লাগিল। ঐ জলে একটুকু খয়রও পড়িয়াছিল। কিন্তু হিরাকশ দেওয়া আবশ্যক হয় নাই। আট-দশ দিন পরে কালী লিখিবার যোগ্য হইয়াছিল। কঞ্চি, শর, খাগড়ার কলমে এই কালী বেশ সরিত।

কবিরাজ-মহাশয় কালী-পচা নিবারণের উপায় করেন নাই। সে সময়ে তাঁহাকে এ বিষয় জিজ্ঞাসিতে ভুলিয়াছিলাম। এক ভট্টাচার্য মহাশয় সে ত্রুটি পূরণ করিয়া দিয়াছেন। ইনি আমলকী দিয়া কালী করিয়াছিলেন, হিরাকশও দিয়াছিলেন। শেষে দিয়াছিলেন সোহাগা। সোহাগার যে পচা নিবারণের গুণ আছে, তাহা ভট্টাচার্য মহাশয় বিলক্ষণ জানিতেন। আমলকী হরীতকী অপেক্ষা যে টেরীতে অধিক কষায়ীন আছে, তাহা কবিরাজ-মহাশয় জানিতেন। হিরাকশ না দিয়াও যে ভাল কালী হয়, তাহা দেখিয়াছিলেন।

কষকালীর মোটামোটি ব্যাপার এই—কষায়ীন ও লোহা যোগে কৃষ্ণবর্ণ, প্রায়ই আনীল কৃষ্ণবর্ণ, সূক্ষ্ম কণা হয়। এই কণা জলে গলে না। এত সূক্ষ্ম যে কালীতে ভাসিতে থাকে। মষীর কালীও এই রকম। এই দুই কালীর লেখা অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া দেখিলে মষীর লেখায় কণার সারি দেখিতে পাওয়া যায়, যেন কাল কণার সারি গাঁথিয়া লেখা। কষকালীর লেখাও প্রায় এইরূপ দেখায়। কিন্তু কিয়দংশ কালী কাগজের আঁশের ভিতরে ঢুকিয়া আঁশকে কাল করিয়া রাখে। এই হেতু জলে ধুইলে লেখা সম্পূর্ণ ওঠে না। নূতন কষকালী এই রকম। কালীতে বাতাস লাগিলে উহার কষাইবার গুণ চলিয়া যায়, দোআতের তলায় কাল কাদা জমে, উপরে জল ভাসিতে থাকে। তখন কালীর কালীত্ব থাকে না।

এই দোষ নিবারণ করিতে বাবলা আঠা যোগ করা হয়। আঠা-জলে কাল কাদা শীঘ্র থিতায় না। কিন্তু আঠার দোষ, কলমের মুখে কালী সহজে সরে না। এই দোষ নিবারণ করিতে কিছু চীনী মিশাইতে হয়। একে উদ্ভিজ্জ-কষ আপনি পচে, তার উপর আঠা চীনীযোগে আরও শীঘ্র পচে। পচা-নিবারণ করিতে একটা বিষ যোগ করিতে হয়।

এত করিয়াও ভাল কালী দুর্লভ। কালী এমন হইবে যে কলমের মুখে সহজে সরিবে, লিখিতে লিখিতে কিংবা একটু পরে গাঢ় কালবর্ণ হইবে। লেখা

জলে ধোআ যাইবে না, রোদ বাতাসে বিবর্ণ হইবে না, লোহার কলম নষ্ট হইবে না, কাগজ নষ্ট হইবে না। এমন কালী কোথায়? কালীর এ গুণ আছে ত ওগুণ নাই।

বাজারের কষকালী, কষায় ও হিরাকশের কালী, লোহার কলম নষ্ট করে। লোহা ক্ষয় করিয়া যাহার জন্ম, তাহাতে লোহার মোছ ( নিব ) টিকিতে পারে না। লোহার উপরে তামার কলাই থাকিলেও সে কলাই দুই চারি দিনের মধ্যে উঠিয়া যায়। লিখিবার সময় মোছ কাগজে ঘষা না পাইলে তামার কলাই কাজের হইত। দুই-এক দিন লিখিলে মোছের কচের কলাই উঠিয়া যায়, তখন লোহা বাহির হয়, এবং লোহা ও তামা একযোগে তাড়িত-ক্রিয়াবশতঃ দ্রুত ক্ষয় পাইতে থাকে। ফলে কচ ফাঁক হয়, কলমে লেখা অসাধ্য হয়। কষের সঙ্গে হিরাকশের অম্ল একত্র হইয়া লোহা ক্ষয় করে। লোহা অপেক্ষা জর্মণ-সিলভার স্থায়ী, সোনা সর্বাপেক্ষা স্থায়ী। কিন্তু সোনার দোআত-কলম হওয়া সুকৃতের ফল। হাঁসের ও ময়ূরের কলম অম্লে নষ্ট হয় না। কিন্তু কে কাটে, কে বা কাটিতে শেখে? শরের কলম, খাগড়ার কলম, কলমী ডাঁটার কলম, কঞ্চির কলমে বাঙ্গালা লেখা ফার্সী লেখা সুন্দর হয়। কিন্তু ইংরেজী অক্ষর সরু মোটা খেলে না। আজ কাল ইংরেজী লেখাতেও সরু মোটা খেলানা কম হইতেছে। যেখানে "ষ্টাইলো পেনে" ( stylo-pen ) লোকে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেখানে ইংরেজী অক্ষরের পূর্বকার সৌন্দর্য্যও গিয়াছে। বাঙ্গলা লিখিবার পক্ষে "রিলিফ পেন" ( relief pen ) উৎকৃষ্ট। ইহাতে ইংরেজী লেখাও বেশ হয়। দোষ এই অক্ষর সরু মোটা খেলে না। আশ্চর্য্য এই, এই কলমের মোছ এবং কচ অবিকল আমাদের দেশী কলমের মতন। লম্বা "রেড ইঙ্ক পেন" ( red ink pen ) অনুকরণে দেশে কলমের মোছ হইতেছে। কিন্তু আশা ছিল এই মোছ দেশী কলমের অনুকরণে হইবে।

কলম বাঁচাইতে এবং সস্তায় কালী পাইতে হইলে রঙ্গ কালী ভাল। টীনের কৌটায় বিলাত হইতে নানাবিধ সস্তা রঙ্গ এদেশে আসিতেছে। এসব রঙ্গের সাধারণ নাম আনীলীন রঙ্গ। কোন বালাই নাই, জলে ফেলিলেই কালী। কেহ বেগুনা কেহ সবুজ কেহ নীল রঙ্গের কালী ভাল বাসে। পূর্বে শুভকথা আল্‌তার রঙ্গ কালীতে লেখা হইত। আল্‌তার রঙ্গ প্রায় পাকা, আনীলীন-রঙ্গ-কালী কাঁচা। জলে ধুইলে যে রঙ্গ উঠিয়া যায়, সে রঙ্গ কাঁচা। কিন্তু আলো লাগিলে যে রঙ্গ বিবর্ণ হয়, সেও কাঁচা। জলে পাকা



রঙ্গ আর আলোয় পাকা রঙ্গ, দুই প্রকার। হলুদের রঙ্গ জলে পাকা, আলোয় কাঁচা। আনীলীন-রঙ্গ আলোয় কাঁচা। লেখা স্থায়ী করিতে হইলে আনীলীন-রঙ্গ অকর্মণ্য। মষীকালী জলে কাঁচা, আলোয় পাকা। শতবর্ষ আলো লাগিলেও কজ্জল কজ্জলই থাকে।

অন্য উপাদানে রঙ্গ কালী করা যাইতে পারে। কালী দুই রকম বলা যাইতে পারে। এক রকম, জলে-ভাসা সূক্ষ্ম কণা ( writing ink ); অন্য রকম, জলে-গোলা রঙ্গ (writing fluid)। ষ্টিফেনের রঙ্গ কালী ( Stephen's blue-black writing fluid ) কৃত্রিম রাসায়নিক উপাদানে প্রস্তুত হয়। এই রঙ্গ আলোতে বিবর্ণ হয় না। কিন্তু কালে লেখা সরু হইয়া পড়ে।

রঙ্গ-কালীর একটা গুণ দোআতে কালী শুখাইলে একটু জল দিলে আবার কালী পাওয়া যায়। মষীকালীর এই গুণ আছে। কষকালীর নাই। রঙ্গকালীতে বাতাস লাগিলে দোআতে কাদা জমে না। এই কারণে সোনার 'ফোআরা' কলমে ( fountain pen ), ষ্টাইলো নামক কাঁটার কলমে রঙ্গ কালীর সঙ্গে আনীলীন নীলরঙ্গ মিশাইয়া নীলকৃষ্ণ কালী হইয়া থাকে। লিখিবার সময় লেখা নীলবর্ণ হয়, পরে বাতাস লাগিয়া কষকালী কৃষ্ণবর্ণ হয়। তবে নীলকৃষ্ণ কষকালী, রঙ্গকালী ও কষকালীর মিশ্রণ।

ভাল কষ-কালী করা সহজ নহে। রাসায়নিক ক্রিয়ায় যেমন উপাদানের পরিমাণের স্থিরতা আছে, কষকালীর তেমন নাই। অনেক কালীর লেখা কালে বিবর্ণ হয়, লেখায় লোহার মড়িচা দেখা দেয়। কিন্তু পুথীর লেখায় মড়িচা দেখিতে পাই না।

কাগজের দোষেও ভাল কালীর লেখা বিবর্ণ হয়। শ্রীরামপুরী কাগজ শাদা কাগজ; বোধ হয় শ্রীরামপুরের কলে প্রথমে শাদা কাগজ হইয়াছিল। বালির কাগজ বাদামী রঙ্গের; বোধ হয় বালির কলে প্রথমে এই বাদামী রঙ্গের কাগজ হইয়াছিল। কাগজ শাদা করিতে নানাবিধ মশলা লাগে। কোন কোন মশলার আধিক্যে লিখিবার সময় কালী বিবর্ণ হয়। ছাপার কাগজ ও লিখার কাগজ যে এক নহে, তাহা আমরা ভুলিয়া যাই।

কালী-কলমের কথা হইতেছে, কাগজের নয়। লোকে কথায় বলে, কালী কলম মন, লেখে তিন জন। কাগজ যেন কেহ নয়! আমরা অনেক সময় কাগজের দোষ বুঝিতে না পারিয়া কালীর দোষ দি-ই। কিন্তু জানি কাগজে তেল সরে, কালী চোপসাইয়া যায়, কলম দ্রুত চলে না, লেখা বিবর্ণ হয়। যে

কাগজ ছাপার পক্ষে ভাল, সে কাগজ লেখার পক্ষে ভাল না হইতে পারে। ছাপার কালী ঘন তেল-কালী, লেখার কালী পাতলা জল-কালী।

ওড়িশায় কাগজের প্রয়োজন হইত না। গাছের তাল পাতা, কামার ঘরের 'লেখন' থাকিলে পুথী লেখা হইতে জমীদারী সেরেস্তার ও ঘরকরনার কাজ, সব চলে। 'লেখন' লোহার মোটা সূচ বলিলে হয়। ডাইন হাতের পাঁচ আঙ্গুল এবং বাঁ হাতের বুড়া আঙ্গুল, এই ছয় আঙ্গুলে 'লেখন' চলে। বাঁ হাতের বুড়া আঙ্গুল লেখনকে এ পাশে ও পাশে উপর নীচে ঘোরায়, ডাইন হাতের আঙ্গুল তাল পাতার উপর লেখনকে টিপিয়া রাখে। চামারজাতি তালপাতা কাটিয়া যোগায়। একশ খান পাতার দাম দুই পয়সা। কিন্তু লেখনের দাম তিন চারি আনা। শিল্পী কর্মকার লেখনের মাথায় পাত-কাটার চন্দ্রাকার ছুরী করে। ইহাতে উপর-মুখ ভারী হয়। তর্জনীর মূলের উপরে থাকিয়া লেখন কতকটা ঢেঁকীকলের মতন ওঠে পড়ে।

কলমের মাথা ভারী হইলে সুবিধা হয়। লিখিবার সময় তর্জনীর মূলে কলমের ভার পড়িলে লেখা দ্রুত হয়, আঙ্গুলে শীঘ্র ব্যথা হয় না। আজি-কালির সরু-মাথা কলম দেখিতে ভাল বটে, কিন্তু শিল্পীর হাতে পড়িলে মাথা-ভারী কলমও সুন্দর হইতে পারে। হয়ত বিবর্তনে মাথাভারী কলম দাঁড়াইবে, হাতের পাঁচ আঙ্গুলের কর্ম যাহাতে হয়, তেমন করিয়া কলম ধরিবার রীতি সুবিধাজনক বিবেচিত হইবে। ইহার মধ্যে বোঝা গিয়াছে, সরু কলম হাতে ব্যথা জন্মায়, ধরিবার দোষে হাত আড়ষ্ট করে। তখন মোটা কলম দরকার হয়, কলম ধরিবার রীতিও পরিবর্তন করিতে হয়। বস্তুতঃ লেখা একটা কলা; কলাবান হইতে গেলে অনেক ছোটখাট ব্যাপারে মন দিতে হয়। *

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি।

---

* 'টাইপ' অভাবে ও তাড়াতাড়িতে এবারে আমরা শ্রদ্ধাস্পদ লেখক মহাশয়ের প্রচলিত কয়েকটি নূতন বর্ণমালা এই প্রবন্ধ মুদ্রণে ব্যবহার করিতে পারিলাম না, তজ্জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। মাঃ সঃ।



# সুরসভা।

চন্দ্র। সভার রীতিমত কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে সভাপতি নির্ব্বাচন করা আবশ্যক। আমি প্রস্তাব করি আমাদের মহামান্য পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত সুরেশ্বর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন।

পঞ্চানন। আমি পঞ্চমুখে এই প্রস্তাবটির অনুমোদন করি। শ্রীযুক্ত সুরেশ্বর পণ্ডিত ত' বটেন ই, আর এখন ত তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত নেতা। ( করতালি। )

সভাপতি। আপনারা আজ আমাকে সভাপতিত্বে বরণ করিয়া আমাকে যেরূপ গৌরবান্বিত করিয়াছেন, আমি সে গৌরবের উপযুক্ত নহি ( না, না ধ্বনি ) তবে আপনাদের আদেশ অমান্য করিতে পারি না, বিশেষ, দেবতাদের মধ্যে যেখানে কলহ সেইখানেই আমি বিদ্যমান্। তবে আজিকার সভার কার্য্যারম্ভ হউক।

( নেপথ্যে সঙ্গীত )

চন্দ্র। গত বৎসরের কার্য্যবিবরণী পাঠের পূর্ব্বে আমার কয়েকটি বিষয় বক্তব্য আছে। সভাপতি মহাশয়, আমি নিশ্চয়ই অভিশাপগ্রস্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি, নহিলে চিরদিনই আমি ঘূর্ণীবায়ুরোগে আক্রান্ত থাকিব কেন, পৃথিবীর চারি দিকে ঘোরাই কি আমার জীবনের ব্রত? আমি কি পৃথিবী ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাইব না, শুনিতে পাইব না, কোনও রূপ ধারণা করিবার অবসরও পাইব না। যখন গোটা পৃথিবীটার সঙ্গে মিশে ছিলাম সে বরং এর চেয়ে সহস্র গুণে ভাল ছিল; তখন পৃথিবীর বাহিরে প্রকাণ্ড বিশ্বকে দেখিবার অবসর ছিল, তখন একটা মহতী সত্তা বোধ হয় অনুভব করিতে পারিতাম, একটা বিরাট আকাশতরঙ্গ পৃথিবীর চারি দিকের বায়ু-তরঙ্গকে ঈষৎ হিল্লোলিত করিয়া আমার অন্তরতম স্নায়ুতরঙ্গে এমন একটা নিগূঢ় অথচ বিপুল আবেগ সঞ্চার করাইয়া দিত যে সমগ্র পিণ্ডটা একটা বিরাট সঙ্গীতে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিত। জীবনের প্রথম প্রত্যুষের সেই যে সেরা আনন্দ, সেই যে বিশ্বসঙ্গীত কেন তাহা হারাইলাম, কবে হারাইলাম, কি পাপে হারাইলাম?

পৃথিবীর সহিত যখন নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলাম, তখন হইতেই এই ঘূর্ণীরোগ আমাকে আক্রমণ করিয়াছে, কিন্তু তখন কোনও কষ্ট অনুভব

করিতাম না; ধরিত্রীর সহিত নিবিড় প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ থাকিয়া যে "বল্"নাচ নাচিতাম, তাহার তুলনায় তোমাদের "ওয়াল্‌টজ"—তোমাদের "পল্‌কা" কিছুই নয়। ঘুরিতাম, অন্ধভাবে ঘুরিতাম, অন্য সকলে যেমন ঘুরিত তেম্নি ঘুরিতাম. অনুরাগ ভরে—প্রেমভরে—আনন্দভরে ঘুরিতাম। অগ্রপশ্চাৎ চাহিয়া দেখিবার অবসর ছিল না, ইচ্ছাও বোধ হয়, হইত না। এক দিন যখন ঘুরিতে ঘুরিতে সেই সুদূর বিশ্বসঙ্গীতের ধ্বনি সহসা আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, হঠাৎ থম্‌কিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলাম. চেষ্টা ব্যর্থ হইল; ঘুরিতে ঘুরিতে চলিলাম; মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিলাম; আমার জীবন-সহচরীর বাহুপাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইবার একটা প্রবল বাসনা আমার মনে জাগিয়া উঠিল; জড় পৃথিবী অবাক্ হইয়া আমার আচরণ দর্শন করিতে লাগিল।

পারিলাম না; মুক্ত হইতে পারিলাম না; নিজেকে বিশ্বজগতে বিকীর্ণ করিয়া দিতে পারিলাম না। যাহাকে জীবন-সঙ্গিনী বলিয়া গ্রহণ করিয়া সংসারযাত্রা আরম্ভ করিয়াছি, তাহাকে লইয়াই আমার জীবনযাত্রা শেষ করিতে হইবে।

যখন প্রেমের উত্তাপ মন্দীভূত হইয়া আসিল, আমার সহচরীও ক্লান্ত হইয়া পড়িল, আমি যেন তাহার স্কন্ধের উপর একটা জগদ্দল পাথরের মত হইয়া বসিয়াছিলাম। এক দিন, যখন প্রথম বসন্তে আমার অসাড় পিণ্ডেও চাঞ্চল্য অনুভূতির লক্ষণ প্রকাশ পাইবার উপক্রম করিল, সহসা মনে হইল যেন সমস্ত গ্রহ তারকা উপগ্রহের পশ্চাৎ হইতে কে যেন আমাকে আহ্বান করিতেছে; বলিতেছে এস, চলে এস। অনন্ত কালসমুদ্র মথিত ক'রে যে সুধাভাণ্ড হাতে লয়ে বিশ্বে প্রকটিত হয়েছিলে, আমরা সমস্ত গ্রহতারকা অনিমেষনেত্রে তোমার সেই সুধাভাণ্ডের প্রতি লোলুপদৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলাম, সেটি কি ঐ বৃহৎ পৃথ্বীর গাত্রে চুরমার করিয়া ফেলিয়াছ?

আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না; সত্যইত,—আমার সেই সুধাভাণ্ডের প্রতি এত দিন লক্ষ্য রাখি নাই কেন? যাহা কিছু অবশেষ ছিল, সেইটুকু লইয়া আমি অকূলে ঝাঁপ দিলাম; কিন্তু মনে হইল সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি যেন আমাকে উন্মাদব্যাধিগ্রস্ত মনে করিয়া অট্টহাস্য করিতেছে। হঠাৎ সর্ব্বাঙ্গে একটা বেদনা অনুভব করিলাম, ঝন্ ঝন্ শব্দে একটা শৃঙ্খল বাজিয়া উঠিল। আমি চাহিয়া দেখি, যে আমি এখনও আবদ্ধ আছি, পৃথিবীর সহিত আবদ্ধ আছি; আবার নূতন করিয়া ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছি, এবার আমার পুরাতন সহচরী পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছি; প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও তাহার সহিত আর মিলিতে পারিব না, তাহার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিব না।



এখন কোথায় তাহারা, যাহারা আমাকে সত্যের দিকে—নীতির দিকে, অঙ্গুলি-সঙ্কেত করিয়া মিলনের জন্য আহ্বান করিয়াছিল? কাহার দোষে আমার এমন অবস্থা হইল? এক দিন আমি নিজের গর্ব্বে মহীয়ান ছিলাম; মনে মনে ভাবিতাম আমার নিজের দীপ্তি আমাকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে; দেবতারা যে সুধাভাণ্ড আমার হস্তে দেখিয়াছিলেন, তাহা ভুল নহে; আমি সেই অমৃতকণা দ্যুলোকে ভূলোকে বণ্টন করিতে পারিলাম কই?

আমি অপরাধ করিয়াছি; অধীরচিত্তে নিজের সম্পদের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া মরীচিকার মধ্যে ঝাঁপ দিয়াছি; অনির্দ্দেশ্য রহস্যান্ধকারের মধ্যে দীপ্ত তারকানিচয়ের সৌন্দর্য্যের স্ফুলিঙ্গবৃষ্টির মধ্যে ঝাঁপ দিয়াছি; সাতাইশটি তারকা লইয়া নূতন করিয়া গৃহস্থালি পাতাইয়া আমার এই নূতন চন্দ্রলোককে সুরলোক বলিয়া অভিহিত করিয়াছি; কিন্তু একটু নড়িলে চড়িলেই শৃঙ্খলের ঝন্ ঝন্ শব্দ আমাকে সজাগ করাইয়া দেয় ও স্মরণ করাইয়া দেয় যে, আমি পৃথিবীর মাটি ছাড়াইয়া যাইতে পারিব না।

সভাপতি। শ্রদ্ধাস্পদ বক্তামহাশয়ের আবেগময়ী বক্তৃতার মাঝখানে আমার কোনও কথা বলা সাজে না, কিন্তু আজ মনে হয়, বক্তামহাশয়ের চিত্তবিক্ষেপ হইয়াছে; আজ না হয় সভা বন্ধ করিয়া দুটো গল্প করা যাক্।

পঞ্চানন। তাই, না হয়, করা যাক্,—যদিও যে বক্তৃতা শুনিতে ছিলাম, গৈরিকনিঃস্রুতা স্রোতস্বিনীর ন্যায় সেই বক্তৃতায় গা ভাসাইয়া দিয়াছিলাম; এ বক্তৃতার প্রশংসা আমি পঞ্চমুখে—

চন্দ্র। থাক্, থাক্; আমি কি আপনাদের সমক্ষে আজ এই স্নিগ্ধ, সুন্দর, পূর্ণিমানিশীথে বক্তৃতা করিতে উঠিয়াছি? বক্তৃতা করিবার সামর্থ্য থাকিলে এমন করিয়া আমার নিজের কথা বলিতে পারিতাম যে, আমার ক্রন্দন একটা বিরাট ক্রন্দনে পরিণত হইত। আপনাদের কাছে আজ যে কয়টি কথা বলিব মনে করিয়াছি, সেই কয়টি কথা বলিয়া লই, বেশী সময় লইব না; তার পরে আপনারা সভার কার্য্য নিরুদ্বেগে করিতে পারিবেন।

আমি মাটির কথা, ধূলির কথা বলিতেছিলাম; আমি যে ধূলা বরাবর

মাখিয়াছিলাম, যে মাটির সঙ্গে বরাবর আশ্লিষ্ট ছিলাম, সেই ধূলা, সেই মাটি ছাড়াইয়া কখনও উঠিতে পারিলাম না, তজ্জন্য আমি বড় বেশী দুঃখ অনুভব করি না ; পঞ্চভূতে আমার বিশ্বাস যদি প্রগাঢ় হয়, তাহা হইলে আপনারা আমায় দোষ দিতে পারেন কি? আমি ভৌতিক সৌন্দর্য্য বুঝি; আধ্যাত্মিকতার ধার ধারি না ; একবার ঠকিয়াছি, আর ঠকিতে রাজি নহি। সেই যখন, আমার প্রথম যৌবনে আমার আত্মা বিশ্বের সৌন্দর্য্যের সহিত লীন হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া আমার জীবননাট্যকে একটি অত্যন্ত করুণ বিরহ-কাব্যে পরিণত করিল, সেই দিন হইতে আমার ঐ বিশ্বসৌন্দর্য্য সম্বন্ধে একটা প্রগাঢ় অবিশ্বাস জন্মিয়াছে। ধূলি ঝাড়িয়া, মাটি ছাড়িয়া উঠিবার সামর্থ্য আমার নাই, চোখ বুঁজিয়া পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছি ও করিব, ইহার বাহিরে আরও কিছু আছে—এ কথায় আর প্রবঞ্চিত ও প্রতারিত হইতে রাজি নহি।

আমার চোর অপবাদ জগতে ঘোষিত। সভাপতি মহাশয়, আমাদের এই সুরসভায় ইহা অপেক্ষা জঘন্য অপবাদ আর হইতে পারে কি? সত্য বটে, সেকালে দেবতাদের মধ্যে মাঝে মাঝে চুরি অপবাদটা শুনা যাইত; কিন্তু এই বর্ত্তমান সভ্য যুগে এই চুরি অপবাদ কি সহ্য করা উচিত? আমার নাকি নিজের দীপ্তি নাই, রবির কিরণে ভাস্বর হইয়া আছি। সহস্রাংশুমালী আমাকে বিশ্বের গোচরীভূত করিয়াছেন,নহিলে আমি অনাদি তিমিরের গর্ভেই অজ্ঞাত রহিয়া যাইতাম ; কেহ দেখিতে পাইত না, কেহ চিনিতে পারিত না, কেহ সন্ধানও লইত না। আমি পরের জিনিষ আমার নিজের বলিয়া চালাইয়া আসিয়াছি, এই কথা শুনিতে পাই। আমি ঋণী, আমি চোর! আমি রোষে সেই অপবাদকারিদিগকে পদাঘাত করিলাম ( উত্তম! উত্তম! ) না, না, পদাঘাত করিতে উদ্যত হইলাম, তাহারা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল,—সাবধান্! সুরলোকের আল্‌নস্কর, তোমার কাচের বাসনের যাহা কিছু আছে, যাহা এত দিন তুমি অক্ষয় সুধাভাণ্ড বলিয়া যত্ন করিয়া রাখিয়াছ, ওগুলি তোমার নিজের পদাঘাতে চূর্ণ হইয়া যাইবে!

হায় রে কলঙ্কী চাঁদ! তোমার একটু নিভৃতে বিজনকক্ষে বসিয়া একবার কাঁদিবার অবসরটুকু পর্য্যন্ত নাই। একদিনের, এক মুহূর্ত্তের একটি ভুলে তুমি সব হারাইলে! তোমার জীবন মিথ্যা, তোমার চন্দ্রিকা মিথ্যা, তোমার এই পূর্ণিমা নিশীথিনী একটা প্রকাণ্ড মায়ামরীচিকা! তুমি একটা বিষম



মোহের আবর্ত্তে ঘুরিতেছ ; নিদ্রা নাই, বিরাম নাই, শান্তি নাই ; তুমি বসুমতীকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছ ; মাঝে মাঝে সেই অদৃশ্য শৃঙ্খলের ঝন্ ঝন্ শব্দ তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে যে, বিপুলা বসুমতী তোমাকে ছাড়িবে না। তবে তাহাই হউক, সুরেশ্বর,—বসুমতী আমার, আমি বসুমতীর, এই ভাবেই থাকা যাক্। ঈর্ষা, কলহ, দ্বন্দ্ব আর যেন করিবার প্রবৃত্তি না হয় ;—আশীর্ব্বাদ করুন, আমার কলঙ্ক আমাকে গৌরবশ্রী দান করুক। আমার হৃদয় আমার প্রেমে ভরিয়া উঠুক। ( উপবেশন )

সভাপতি। বসুমতীর সহিত আপনার প্রেমের সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ট হউক। আপনার কলঙ্ক মুছিয়া যাইবে। আজ আমাদের সভায় একটি বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে। যদি আজিকার আপনার কথাগুলিতে প্রেম আসিয়া ঈর্ষার স্থান অধিকার করে, তাহা হইলে আমরা কৃতার্থ হইব, আপনার এই শরৎপৌর্ণমাসীর চন্দ্রিকাও ধন্য হইবে। আজ তবে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।

---

# মাছ-ধরা।

( ঘাটে )

জামরুল গাছে হেলিয়া আরামে
কাছে রাখি ছিপগাছি—
জলের উপরে নয়ন রাখিয়া
সারাদিন বসে' আছি।
চন্দনদীঘি প্রসিদ্ধ গ্রামে ;
বহুদূর হ'তে মৎস্যের নামে
বন্ধুরা আসি' বসি ডানে বামে—
দূরে—কেহ কাছাকাছি।

স্নিগ্ধ-শীতল চন্দনদীঘি
সকল দীঘির সেরা,
লক্ষ পাখীর আবাস-কুঞ্জ
আম্রকাননে ঘেরা ;

দর্পণ জিনি' স্বচ্ছ সে বারি
বক্ষে ধরিয়া তীর-তরুসারি—
চঞ্চল জলে ছায়া লয়ে তা'রি
খেলা করে আলোকেরা।

রৌদ্রের তাপে বিবশ দিবস
বিলসিছে তরুতলে,
একে একে একে প্রহর গুলিন
নেয়ে যায় যেন জলে!
খুলি দিয়া বাস উদাসীন বায়ে
স্তব্ধ দুপুর—সলিলের গায়ে
ছবিখানি দেখে গ্রীবাটি হেলায়ে—
বেলা ক্রমে বেড়ে' চলে।

হেথা কেহ ছিপ বাগায়ে ধরেছে
ফাতনায় কাঁপে প্রাণ,
হোথা কেহ হেসে ঘুরায় যন্ত্র
সূতায় পড়েছে টান;
আমি বসে' বসে' শুধু দেখি চাহি';
কল্পনা ফিরে কত পথ বাহি'
আমার এ জলে মাছ বুঝি নাহি—
মনে ভাবি কতখান!

মাথার উপরে মৌমাছিদের
গুঞ্জন আসে কানে,
থেকে থেকে দূরে ঘুঘুর আলাপ
কত কথা মনে আনে!
ঝরি ঝরি পড়ে জামরুলরেণু,
বাঁশের কুহরে কোথা বাজে বেণু,
দূর কোনে ঐ নামিয়াছে ধেনু
তৃষাতুর জলপানে।



মাছরাঙা ঐ করমচা শাখে
তাক করি বসি জলে,
এক পায়ে ভর দিয়ে হোথা বক
ঝিমাইছে তারি তলে;
দূরে ঘনবনে কাট্-ঠোকরার
উদাস ধ্বনিটি কাঁদে বারবার;
একই কথা যেন করে সে প্রচার—
জীবন অসার বলে!

বৈকালি হাওয়া জলে দেয় কাঁটা,
কূলে লাগে ভাঙা ঢেউ;
পতঙ্গ এক খেলা ভাবি মনে
সাথে তার খেলে সেও!
পল্লীবধূরা আসে দলে দলে,
কেহ নেয়ে উঠে, কেহ নামে জলে;
চরণ আঁকিয়া সোপানের তলে
জল নিয়ে যায় কেউ।

'কিহে কি খবর তোমার ওখানে
'শুধায় বা কেহ হেসে,'
'কিছুই হ'ল না, বেচারির আজ'
বলে কেহ ভাল বেসে';
আমি বসে' আছি মূর্ত্তির মত;
ভাষাহীন কথা মনে জাগে কত,
তত আন্‌মনা বেলা পড়ে যত
ক্রমাগত দিন শেষে।

সন্ধ্যার ছায়া ধীরে নেমে' আসে,
কালো হয়ে আসে জল,
তালিতরু বেয়ে উঠিছে আলোক
ধীরে ছাড়ি ধরাতল;

চিক্কণ-ঘন নারিকেল শিরে
রৌপ্যমুকুট পরাইয়া ধীরে
দিবা অবসান—রবি চলে ফিরে
লভিতে অস্তাচল।

চকিতে ধরণী টানি দিল শিরে
গোধূলি-রঙিন বাস,
হাল্কা হাওয়ায় উঠিল ভাসিয়া
প্রদোষের রসাভাস ;
পঞ্চম সুরে পাগল পাপিয়া
আকাশটি যেন ফেলিবে ছাপিয়া,—
সহসা কর্ণে উঠিল কাঁপিয়া
বন্ধুর পরিহাস !

কল্পতরীর উধাও যাত্রা
ঠেকিল বালির চরে—
তাড়াতাড়ি লাজে ছিপটি গুটায়ে
লইনু তুলিয়া করে ;
'মাছ ত ধরেছ, এবে চল বাড়ি
আমাদের দলে এমনো আনাড়ি !'
উদাসীন মনে নিশ্বাস ছাড়ি'
ফিরিয়া চলিনু ঘরে।

পথে যেতে যেতে কত না রঙ্গ
কত হাসি কত কথা,
মোর মনে সেই চন্দনদীঘি
মনে জাগে তার ব্যথা !
কত কথা আরো—ঠিক নাহি জানি,
শষ্পগন্ধী গৃহপথ খানি
ভরিয়া তুলিল ঝিল্লীর বাণী
সন্ধ্যার নীরবতা।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগ

# মানসী।

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস।

*Printed by K. V. Seyne & Bros.*



## বিয়োগে।

আজ যাঁহার স্মরণার্থ আমরা সকলে মিলিত হইয়াছি তাঁহাকে ইহলোকের সামান্য সম্বন্ধের সূত্রে জড়াইব না। ভ্রাতা বলিয়া তাঁহার অপমান করিব না, পিতা পুত্র বা স্বামী বলিয়া তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করিয়া গৃহের কোণে টানিয়া আনিব না। আজ তাঁহাকে অনুভব করিব, তাঁহার প্রকৃত সত্ত্বা উপলব্ধি করিব; আজ তাঁহাকে অনন্ত লোকে সর্ব্বচরাচরে ব্যাপ্ত দেখিব। আজ আমরা কাঁদিব না; অশ্রুসিক্ত মলিন নয়নে তাঁহাকে দেখিতে পাইব না। আপনার ক্ষুদ্র দুঃখ, সামান্য অভাব বড় করিয়া তুলিলে সেই অনন্ত অমর, অবিনাশী আত্মার সন্ধান পাইব না। নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবকঃ এই যে অব্যয় অনন্ত মুক্ত আত্মা, আমাদিগের শোক-দুঃখ-জরাবেষ্টিত মৃত্যুভয় জড়িত খেলাঘরে আবদ্ধ হইব না। আজ প্রাণকে প্রশস্ত করিতে হইবে; হৃদয়কে শান্ত করিতে হইবে এবং সুখ দুঃখের শৃঙ্খল হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া অনন্ত আনন্দময়ের আনন্দালোকে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে হইবে। ভগবান আমাদিগের সহায় হউন।

মৃত্যু আমাদিগের নিকট হইতে কি কাড়িয়া লইয়াছে? যাঁহাকে দেখিতে পাইতাম, তাঁহাকে আর দেখিতে পাই না। যাঁহাকে স্পর্শ করিয়া আনন্দ অনুভব করিতাম, তিনি আজ স্পর্শাতীত হইয়া গিয়াছেন। বিপদে পড়িলে যাঁহার কাছে আসিতাম, আজ ডাকিলে তাঁহার সাড়া পাই না; খুঁজিলে তাঁহাকে দেখিতে পাই না। যে ঘরে সর্ব্বদা তাঁহাকে দেখিতাম সে ঘর আজ শূন্য বলিয়া বোধ হয়। যে গৃহ সর্ব্বদা আনন্দে পরিপূর্ণ ছিল সে গৃহ আজ মলিন। দিবস শেষে কর্ম্মক্লান্ত হইয়া যাঁহার কোমল বাক্যে স্নেহদৃষ্টিতে শরীর মন জুড়াইয়া যাইত, আজ তিনি আমাদের নয়নাতীত, শ্রবণাতীত হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু এ শুধু আমাদের স্বার্থের ক্রন্দন, শোকের অধৈর্য্য, ক্ষুদ্র অন্তরের আত্ম-অভিমান। শান্ত মনে শুদ্ধচিত্তে ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি, মৃত্যু লইয়াছে দুদিনের সুখ, সামান্য স্নেহ, ইহলোকের ক্ষণিক আশ্রয়, দৃষ্টির আরাম, স্পর্শের আরাম। কিন্তু মৃত্যু দিয়াছে কি? সত্যের আনন্দ, বিশ্বাসের বল, এবং অনন্তের জ্ঞান। যাহা কিছু মিথ্যা তাহা সরিয়া গিয়াছে, যাহা সত্য তাহা সম্মুখে আসিয়াছে। যাহা ছোট ছিল তাহাকে বড় করিয়াছে। যাহাকে মলিন করিয়া ধরিয়াছিলাম তাহাকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়া গিয়াছে এবং

তাঁহার সমস্ত জীবন হইতে অনন্ত লোকের আভাসগুলি একত্র করিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছে। সেই যে সকল কর্ম্মের মধ্যে আপনাকে লুকাইয়া রাখা, সেই যে জীবনের কাজকেই বড় করিয়া আপনাকে ছোট করিয়া ধরা, সেই যে দয়া দাক্ষিণ্যপূর্ণ আড়ম্বরহীন স্বার্থশূন্য জীবন, সেই জীবনের প্রতি কাজের নিগূঢ় সত্য ও অনন্ত মহিমা—আজ আমাদের প্রাণে কেমন পরিষ্কার রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। যাঁহাকে সাংসারিক সম্বন্ধ দ্বারাই শুধু চিনিতাম, যিনি আত্মীয়তা বান্ধবতার গণ্ডীতে শুধু আবদ্ধ ছিলেন, যাঁহার স্নেহপ্রেম দয়াদাক্ষিণ্য আমাদের একমাত্র বন্ধনের সূত্র ছিল, জীবিত অবস্থায় যাহাকে মোহের আবরণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলাম, মৃত্যুতে সে আবরণ খসিয়া পড়িয়াছে ; আজ তাঁহার পিতৃত্বে জগৎপিতাকে দেখিতেছি, তাঁহার পতিত্বে জীবনস্বামীকে দেখিতেছি, তাঁহার স্নেহ মমতায় সেই বিশ্বপ্রেমের আস্বাদ পাইতেছি। তিনি যে জীবনে সকল বন্ধনের ভিতর দিয়া সকল সম্বন্ধের মধ্যে সেই অনন্ত সম্বন্ধ উপলব্ধি করাইতেছিলেন এতদিন তাহা বুঝি নাই। এখন বুঝিতেছি, মানবজীবন মাত্রই অসীমের পূজা। সে জীবনের প্রতি কার্য্য প্রতি অনুষ্ঠানের দ্বারা নীরবে সেই মহাপুরুষের পূজা করি। জীবনের সকল কর্ম্ম, সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে সেই অনন্তের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করি। পূজা অন্তে ভক্ত যেমন নির্ম্মাল্যের ডালি মন্দিরের বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া দেবতার চরণে প্রণাম করেন, তেমনি মানবজীবনের কর্ম্ম অন্তে আপনার দেহ বর্জ্জন করিয়া নূতন লোকে নূতন কর্ম্মের মধ্যে নূতন পূজার আয়োজন করিতে চলিয়া যায়।

এতদিন এই মহান সত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। এতক্ষণ তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। আমার স্বামী, আমার পিতা, আমার ভ্রাতা এইরূপে তাঁহাকে স্নেহের গণ্ডীর মধ্যে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম এবং আপনারও বাঁধা পড়িয়াছিলাম। আমাদের জীবনে অনন্তের আহ্বান শুনিতে পাই নাই। সেই জন্যই তাঁহার জীবনে অনন্তের আভাস লক্ষ্য করিতে পারি নাই। কোন ভাল কাজ করিলে মনে করিতাম, আমাদের আত্মীয় ভাল লোক, অমনি গর্ব্বে হৃদয় স্ফীত হইত। আদর পাইলে মনে করিতাম, কত ভালবাসেন, যত্ন পাইলে মনে করিতাম, কি কোমল স্বভাব! আমাদের কত যত্ন করেন। একথা কখন মনে করি নাই যে এই স্নেহ ভালবাসার কোমলতা স্বার্থহীনতা—ইহার সহিত অনন্তরাজ্যের নিত্য সম্বন্ধ—আমরা উপলক্ষ্য মাত্র। আমাদের জ্বালাইয়া ঊর্দ্ধমুখীন সে অমর আত্মা আপনার মহিমা নিঃশব্দে অলক্ষিতভাবে



বিস্তার করিতেছিল! আমরা মোহে অন্ধ, তাই দেখিতে পাই নাই। এত দিন যাঁহাকে চিনিতে পারি নাই। মৃত্যু তাঁহাকে আজ চিনাইয়া দিয়াছে।

কিন্তু এ কাহার বিধান? মৃত্যুর ভিতর অমর আত্মার সন্ধান এ কাহার লীলা? দুঃখ শোকের ভিতর আনন্দস্পর্শ! এ কাহার করুণা? যিনি মঙ্গলময় বিধাতা, সকল মঙ্গলের আকর, সকল বস্তুর সার, সকল প্রশ্নের উত্তর, সকল আনন্দের ভিত্তি, সেই মঙ্গলময় বিধাতা পুরুষই আমাদের মৃত্যুর ভিতরে অমৃতের আস্বাদ দিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বব্যাপী অনন্ত আনন্দমূর্ত্তির ভিতর আমরা যাঁহাকে হারাইয়াছি, তাঁহাকে পূর্ণতরভাবে দেখিতে পাইতেছি।

হে পরলোকবাসি, মৃত্যুর মুহূর্ত্তেও তোমার মুখে কোন ভীতির চিহ্ন দেখি নাই। তুমি বীরের ন্যায় অকাতর চিত্তে শান্ত মনে মৃত্যুকে জয় করিয়াছিলে! তুমি কোথায় আছ জানি না, কোন লোকে আজ তোমার বিজয়নিশান উড়িতেছে আমরা দেখিতে পাইতেছি না। কিন্তু তুমি আছ, তাহা জানি। যে অনন্ত সত্তায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অবস্থিতি করিতেছে, যে অনন্ত সত্তা নীরবে আপন অলক্ষিতে জীবনে উপলব্ধি করিতেছিলে সেই অনন্ত সত্তায় গ্রথিত পুষ্পের ন্যায় বিরাজ করিতেছ। আজ তোমার কাছে, শোক দুঃখের আবেদন লইয়া আসি নাই। আজ তোমাকে ভ্রাতা বলিয়া অপমাননা করিব না। তোমাকে স্বামী বলিয়া, পিতা বলিয়া আমাদের ক্ষুদ্র গৃহের কোণে টানিয়া আনিব না। হে অমর, হে অবিনাশি, তুমি ইহলোকে সেই অনন্ত পুরুষকে ব্যক্ত করিয়াছ! তুমি পরলোকেও সেই মহাপুরুষকে ব্যক্ত করিতেছ। ভগবান তোমার সহায় হউন। আমরা আজ তোমাকে যে নিত্য সম্বন্ধে জানিতে পারিয়াছি, তাহারই উপর জীবন প্রতিষ্ঠিত করি।

হে আনন্দময় বিধাতাপুরুষ, তুমি আজ আমাদিগকে মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাও।

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস।

# নতুন খেয়া।

নেই কি মনে সেকালে সেই
দাঁড়াতে ওই চাঁপার ছায়ে,
শিউলি ফুলের বৃন্ত-রঙ্গীণ
আঁচল খানি জড়িয়ে গায়ে ?
হৃদয়-তুরগ ফিরিয়ে দিলে
বকুল মালার বল্গা টানি',
মধুর দু'টি গণ্ড-কূপে
প্রবাল-প্রভা ফুট্‌ল রাণি!

২

জাগ্‌ছে মনে দোলের দিনে
রঙ্গে চোখে আবীর দেওয়া,
বিজয়াতে জ্যোৎস্না-রাতে
লুকিয়ে ছাতে প্রণাম-নেওয়া।
বকুল হের তেম্‌নি ব্যাকুল,
ভিন্ন নয়কো একটি তিল';
শ্যামার শিশে উতল হাওয়া,
নীল আকাশ ওই তেম্‌নি নীল।

৩

সাঙ্গ আজি সে পথ-চাওয়া,
বন-কাঁপানো বেণুর তান ;
এখনকার এ নূতন তৃষা,
নূতন দাবি, নূতন দান।
এ বারের এই খেলার ঘরে
আজ্‌কে মোদের কুলায় না—
চুম্বনে নাই দ্রাক্ষা-ধারা,
কটাক্ষও আর ভুলায় না।



৪

মাঠের কোণে তালের বনে
জম্‌ছে কালো 'ভুসো'র রাশ—
মিলিয়ে এল স্মৃতির আলো,
সুখের শানাই, দুখের শ্বাস।
ছাড়্‌ল মোদের নতুন খেয়া
ভাঙ্গন-ধরা নদীর পাড়—
নিব্‌ল পিছে অন্ধকারে
আতস-বাজীর তারার ঝাড়!

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

# পাণ।

## ১। প্রত্নতত্ত্ব।

পাণ কতকাল হইতে ভারতে আছে? এই আকস্মিক প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে প্রাচীন সভ্যতার জন্মভূমি গ্রীস্ দেশের ইতিহাস খুঁজিতে হয়। কেহ কেহ হয়ত সদম্ভে বলিবেন যে, প্রাচ্যজগতের ভারতবর্ষ, চীন, মিশর প্রভৃতি দেশই মানব-সভ্যতার আদি জন্মস্থান। কিন্তু এ অন্ধ বিশ্বাসের কোনও ভিত্তি নাই। আর্য্যজাতির আদিবাস যে য়ুরোপখণ্ডে, বল্‌টিক্ সাগরের তীরভূমিতে, বা ঐরূপ কোনও একটা স্থানে ছিল, ইহা অবিসংবাদিত সত্য। 'অন্যে পরে কা কথা', ব্রাহ্মণকুলতিলক বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয় পর্য্যন্ত এই দিকে ঢলিয়াছেন। সুতরাং সভ্যতার প্রথম বিকাশ যে প্রতীচ্য জগতে হইয়াছিল এই সারতত্ত্ব অনার্য্য ভিন্ন কেহই অস্বীকার করিবেনা। এ অবস্থায় পাণের জন্মকথা আলোচনা করিতে হইলে, প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রস্থল গ্রীস্ দেশের ভাষা ও ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হয়, এ কথা কি আর বার বার বলিতে হইবে?

এই অনুসন্ধানকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার পথে একটি সামান্য বাধা আছে; লেখক গ্রীক্‌ভাষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কিন্তু তত্ত্বানুসন্ধানের ক্ষেত্রে ইহাতে বড় আসিয়া যায় না। সকলেই জানেন, ভাষাতত্ত্ববিচারে ভাষায় অধিকারের

আদৌ প্রয়োজন নাই। এ ক্ষেত্রে অভিধানই আমাদের পরম সহায়; শব্দচয়নকার্য্য অভিধানের সাহায্যে সহজে ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। মহাজন-প্রদর্শিত এই সুগম পন্থা অনুসরণ করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা পাঠকসমাজকে উপহার দিতেছি।

গ্রীক্ ভাষায় প্যাণিক্ (panic) শব্দটি দেখা যায়। এই শব্দের অর্থ অকারণ আতঙ্ক। বৈষ্ণবধর্ম্মে যেমন অহেতুকী প্রীতি, তেমনই একটা অহেতুকী ভীতিও আছে। দিনমানের সমস্ত বিচিত্র কোলাহল স্তব্ধ হইলে অর্দ্ধরাত্রে শয্যাগৃহে প্রদীপ নির্ব্বাণলাভ করিলে যখন সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারে একমাত্র জ্ঞানচক্ষুঃ উন্মীলিত থাকে তখন সকলেই এই অহেতুকী ভীতির সত্তা অনুভব করিয়াছেন। ইহাই গ্রীক্ ভাষায় প্যাণিক। এক্ষণে শব্দের অর্থবিচারে বৃথা বাগাড়ম্বর না করিয়া, প্রণিধান করিয়া দেখা যাউক্ শব্দটি হইতে আমরা কি ঐতিহাসিক তথ্য লাভ করিতে পারি। বাস্তবিক, শব্দের অর্থ বুঝিবার চেষ্টায় অনর্থক সময়ক্ষেপ না করিয়া একটিমাত্র শব্দ অবলম্বন করিয়া ভূরি ভূরি ঐতিহাসিক তথ্যের আবিষ্কার করাই আধুনিক-প্রণালী-সম্মত গবেষণা (modern method)।

কথায় বলে, ইতিহাস নিজেকে পুনরাবৃত্তি করে (History repeats itself)। এই গ্রীক্ প্যাণিক্ শব্দ হইতে বেশ বুঝা যায় যে আজকাল আমাদের মধ্যে যে পাণাতঙ্ক দেখা দিয়াছে, বহুযুগ পূর্ব্বে এইরূপ একটা পাণাতঙ্ক গ্রীস্-দেশে দেখা দিয়াছিল। তাহার ফলে প্যাণিক্ শব্দের উদ্ভব। খুব সম্ভব সেই সময় হইতেই প্রতীচ্যখণ্ডে পাণ খাওয়ার আর চলন নাই। আমরাও এই সুযোগে পাশ্চাত্য সুসভ্য জাতিগণের অনুসরণ করিতে পারিবনা কি? কালক্রমে এই প্যাণিক্ শব্দের অর্থের ব্যাপ্তি ঘটিয়া সকল প্রকার অমূলক আতঙ্ক বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছিল। অর্থের এরূপ পরিণতি ভাষাতত্ত্বে একটা মোটা কথা।

এইবারে কথাটা ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখা যাউক। গ্রীস্‌দেশে পাণাতঙ্ক যখন ঘটিয়াছিল, তখন তথায় যে পাণ খাওয়ার প্রথার পূর্ব্বাবধি প্রচলন ছিল ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ। Pantheon, Pancratium, Panathenaic প্রভৃতি গ্রীক্ শব্দেও একথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে পাণ (গ্রীক্ উচ্চারণ প্যাণ) একটা উপসর্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। শারীরবিজ্ঞানের pancreatic juice এরও



এই পাণ হইতে উদ্ভব; এই কারণেই পাকস্থালীতে ভুক্ত দ্রব্য সহজে জীর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে আহারান্তে পাণ চিবানর ব্যবস্থা, ইহাতে pancreatic juice অর্থাৎ পাণদ্বারা সৃষ্টরস বহুলপরিমাণে নিঃসৃত হয়।

কেহ কেহ বলিবেন, গ্রীক্‌দিগের মধ্যে Pan নামক এক অরণ্যচারী দেব-যোনি ছিলেন, তাঁহারই নাম হইতে panic শব্দ নিষ্পন্ন। ইহাকেই বলে পুঁথিগত বিদ্যা! এই জন্যই 'অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী' একটা প্রবাদ আছে। এই পল্লবগ্রাহী পণ্ডিতগণ জানেননা যে এই Pan দেব আদিতে পাণের অধি-ষ্ঠাতা দেব, এবং তাঁহার নিবাসারণ্য ব্যাঘ্রতরক্ষুসঙ্কুল কণ্টকারণ্য নহে, পাণের বরজ। কল্পনাকুশল সৌন্দর্য্যপ্রিয় কবিত্বপ্রবণ গ্রীক্ জাতি প্রকৃতির প্রতি বৃক্ষে, প্রতি লতায়, প্রতিপুষ্পে দেবতার সঞ্চার দেখিতেন, তাঁহারা কবিত্ব-রসাভিষিক্ত প্রেমিকপ্রেমিকার রসালাপের নিত্যসহচর পাণের বেলায় সে ভাবটি বিস্মৃত হইয়াছিলেন ইহা কি সম্ভবপর? ক্রমে গ্রীক্ জাতির মন বিস্তার-লাভ করিলে প্যাণ (রোমীয় ফণস্) এই পাণপত্র হইতে সমস্ত উদ্ভিদ্-প্রকৃতির দেবতা হইয়া পড়িলেন। পল্লবগ্রাহী পণ্ডিতগণ শুধু এই শেষ কথাটাই জানেন।

এতক্ষণে প্রমাণ হইল পাণ 'কোথায় ছিল'; এক্ষণে ভারতবর্ষে 'কে আনিল এ মধুর পাণ' ইহার বিচার করিতে হইবে।

সকলেই জানেন, পুরাকালে ফিণীশীয় জাতির বাণিজ্যের বিলক্ষণ প্রসার ছিল। এই বণিগ্‌বৃত্তি জাতির নাম হইতেই সংস্কৃত বণিক্ (বণিজ্), আপণ, বিপণি, পণ, পণ্য প্রভৃতি বাণিজ্যব্যবসায়ের শব্দগুলির উদ্ভব। সংস্কৃতে এরূপ বিদেশজাত শব্দের অভাব নাই, ইহা বৈয়াকরণেরা স্বীকার করেন। উচ্চারণবৈষম্যে ফিণীক্ বণিক্ হইয়াছে। এই ফিণীশীয় জাতির নিকট হইতে গ্রীস্ ও ভারতবর্ষ বর্ণমালা সংখ্যালিখনপ্রণালী প্রভৃতি গ্রহণ করিয়াছে, বড় বড় পণ্ডিতেরা ইহা বলিয়া গিয়াছেন। এই জাতির গ্রীস্ ও ভারতবর্ষ উভয়দেশের সঙ্গেই বাণিজ্যসম্বন্ধ ছিল। তাহা হইলেই দাঁড়াইতেছে, এই জাতি গ্রীস্ হইতে ভারতবর্ষে পাণের প্রথম আমদানী করেন। গ্রীসে পাণাতঙ্ক (Panic) আরম্ভ হওয়াতে অন্যদেশে পাণ চালান দেওয়ার ব্যবস্থা হইবার সম্ভাবনা।

বেদে এই জাতি পণিনামে উল্লিখিত। আর্য্যেরা অল্পস্বর ভাল বাসিতেন, সেইজন্য ফিণীশ্যান্ বা পিউণিক্ (Punic) পণি হইয়াছে। এই পণি হইতেই

পাণ। পরে যখন পৌরাণিক যুগে বৈদিক যুগের আচাররীতি সকলে ভুলিয়া গেল, তখন প্রকৃত ব্যুৎপত্তির স্মৃতিলোপ হইয়া পর্ণ হইতে পাণ এই নূতন ব্যুৎপত্তি দাঁড়াইল। 'পুত্র' 'অসুর' প্রভৃতি শব্দের ব্যুৎপত্তির বেলাও এইরূপ ঘটিয়াছে। বিদেশ হইতে আনীত বলিয়া কপিশালগমের ন্যায় পাণও অদ্যাপি অনেক শুদ্ধাচার ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারিণী বিধবা ব্যবহার করেন না। কিছুকাল বিদেশ হইতে আমদানী হওয়ার পর, উদ্যমশীল ব্যবসায়িগণ এদেশেই ইহার চাষ আরম্ভ করিলেন। অবশ্য প্রথম প্রথম বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থানে ইহার চাষ হয়, সেইজন্য আজও নৈহাটী অঞ্চলে উৎকৃষ্ট পাণ জন্মে।

পাণব্যবসায়ীদিগকে বারুই বলে। অনুমান হয়, স্মরণাতীত কালে এক সম্প্রদায় লোক গ্রীস্ দেশের Pherae নামক স্থান হইতে আসিয়া পাণের ব্যবসায়সূত্রে ভারতবর্ষে চাষ আবাদ করে ও ক্রমে এদেশের বাসিন্দা হইয়া পড়ে। আজকাল ঠিক এইভাবেই অনেক হিন্দুব্যবসায়ী আফ্রিকা ও আমেরিকায় বসবাস করিতেছে। স্বদেশের নামে এই জাতি বারুই ও ইহাদের আবাদ বরজ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। হিন্দুসমাজের স্বভাবসিদ্ধ সঙ্কীর্ণতার দোষে এই বিদেশ হইতে আগত জাতি, শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণদিগের ন্যায়, হিন্দুসমাজের সঙ্গে ভালরূপ মিশিতে পারে নাই।

পাণের আর এক নাম তাম্বূল, পাণব্যবসায়ী আর এক সম্প্রদায়ের নাম তাম্বুলী বা তামুলি। তাম্বূল Stamboul হইতে আসিয়াছিল বলিয়া ইহার এইরূপ নামকরণ হয়, অথবা প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বর্ত্তমান তমলুকে ইহার প্রথম আবাদ হয়, অথবা দাক্ষিণাত্যের তামিল জাতির সঙ্গে ইহার কোন সংস্রব আছে, এই জটিল প্রশ্নসম্বন্ধে ( সময়াভাবে ) কোনও স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই। অনুমান হয়, প্রথমটিই সত্য, কেননা এতদ্দেশবাসীরা চিরদিনই সৌখীন।

এই অনুমান সত্য হইলে বাজারে যাহা ছাঁচি পাণ বলিয়া বিক্রীত হয় তাহাই বোধ হয় Stamboul এর আমদানী। মুসলমান ভ্রাতারা কথাটা সমজাইবেন। একই জিনিশের একই দেশে ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে ভিন্ন ভিন্ন কালে আমদানী হওয়া মানবেতিহাসে বিচিত্র ঘটনা নহে। ইংলণ্ডে তথা ভারতবর্ষে খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মের আমদানী, ইংরাজী ভাষায় ল্যাটিন্ শব্দের আমদানী ইত্যাদি ঐতিহাসিক উদাহরণের অভাব নাই।

মানসী—

পদ্মপাদাচার্য্য　　জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্য　　হস্তামলকাচার্য্য
তোটকাচার্য্য　　সুরেশ্বরাচার্য্য
( রাজা রবিবর্ম্মা অঙ্কিত চিত্র হইতে, রাজবর্ম্মার অনুমত্যানুসারে )



২। ভাষাতত্ত্ব।

আপাততঃ ভাষাতত্ত্ববিচারের একটু প্রয়োজন আছে। 'পাণ' শব্দের বাণান লইয়া কিঞ্চিৎ গোলযোগের সম্ভাবনা। কেহ কেহ এ শব্দটিতে দন্ত্য 'ন' চালাইতে চাহেন। তাঁহারা বোধ হয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যেহেতু জল খাইলেই পাণ খাইতে হয়, অতএব 'পান' শব্দের লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা তাম্বূল অর্থ দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু আমি পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, বেদের 'পণি' শব্দ হইতে 'পাণ' শব্দ সিদ্ধ। অতএব মূর্দ্ধন্য 'ণ' এস্থলে অপরিহার্য্য। বৈদিকভাষা ছাড়িয়া দিলেও লৌকিক ব্যাকরণের মতেও 'পর্ণ' শব্দের অপভ্রংশ পাণ, যেমন চূর্ণ=চুণ, স্বর্ণ=সোণা, কর্ণ=কাণ, বর্ণন=বাণান। [ পাণ সকল পর্ণ বা পাতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; সুতরাং ইহা একাই নামটি দখল করিয়া লইয়াছে। যেমন সম্বন্ধের মধ্যে যাঁহার সহিত সকলের অপেক্ষা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক তিনিই সম্বন্ধী par excellence হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। রঘুবংশের সিংহ এই জন্যই 'সম্বন্ধিনো মে প্রণয়ং' বলিয়া প্রণয়ের দোহাই দিয়াছেন ইতি সুধীভির্বিভাব্যম্।]

অতএব দেখা গেল এ হিসাবেও মূর্দ্ধন্য 'ণ' সঙ্গত প্রয়োগ। তবে হয় ত কেহ ব্যাকরণের সূত্র তুলিয়া তর্ক করিবেন যে অপভ্রংশে যখন রেফের অভাব ঘটিয়াছে তখন ণত্ববিধানের আর অবসর নাই। কারণ 'নিমিত্তস্যাপায়ে নৈমিত্তিকস্যাপ্যপায়ো ভবতি।' কিন্তু ইহা বিজ্ঞানসম্মত কথা নহে। পূর্ব্বে যেস্থান দ্বীপ ছিল তাহার দ্বীপত্ব লোপ পাইলেও দ্বীপনামের লোপ হয় না—যথা নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ। মনোবিজ্ঞান ও শারীরবিজ্ঞানে বলে, কোনও অঙ্গের অভাব হইলেও সে অঙ্গের অনুভূতির অভাব ঘটে না। 'মাথা নাই তা'র মাথাব্যথা' বৈজ্ঞানিক সত্য। একজন সৈনিকের পায়ের বুড়া আঙ্গুল কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি তাহার ঐ অঙ্গে কণ্ডূয়নপ্রবৃত্তি মধ্যে মধ্যে বিলক্ষণ সজাগ হইত। জীবিত ভাষায়ও জীবিত দেহের ন্যায় স্নায়ুমণ্ডলী আছে, অঙ্গচ্ছেদ হইলেও স্নায়ুর কার্য্য চলিতে থাকে। অতএব রেফের অভাব হইলেই যে শব্দের ণত্ব লোপ পাইবে ইহা সঙ্গত যুক্তি নহে। বরং এরূপ বর্ণ-বিন্যাসে ব্যুৎপত্তিজ্ঞানের সহায়তা করে।

৩। বিজ্ঞান।

এক্ষণে ব্যাকরণের কচ্‌কচি ছাড়িয়া এই দেশব্যাপী আতঙ্কের নিদান-নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যাক্। পাণে কিরূপে ও কেন পোকা ধরিল? কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরার কথা জানা আছে। 'কদু কুমড়ো ছেড়ে, আল্লা সব্বির মধ্যি

তেল,' মাণিকপীরের গানে একথাও শুনিয়াছি। কিন্তু এ যে তাহা অপেক্ষাও বিস্ময়কর। 'বৈদ্যবাটী' অর্থাৎ কুমড়া মূলা বেগুনে পোকা হইলে ত কোনও ক্ষতি ছিল না! বাল্যকালে একবার মাছে পোকা হইয়াছিল অল্প অল্প মনে পড়ে। কিন্তু সে সময়ে কেহবা চাতুর্ম্মাস্য করিয়াছিলেন কেহবা অতি সুবিবেচনার সহিত অনুকল্পে মাংসভোজন করিয়া 'কথমপি পরিত্যাগদুঃখং বিষেহে।' রঙ্গপুর অঞ্চলে পাকা আমে পোকা দেখা যায়। কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না, কেননা সে দেশে অজস্র কাঁঠাল মেলে। কিন্তু পাণে পোকা, এ যে অসহ্য অকথ্য অবাঙ্‌মনসগোচর! যাক্ বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব-নির্ণয়-ক্ষেত্রে মিছামিছি প্রলাপবাক্যপ্রয়োগে কোনও ফল নাই।

কোনও কোনও বৈজ্ঞানিক বলেন, হ্যালির ধূমকেতু যখন পৃথিবীর সহিত সঙ্ঘর্ষে আসে তখন অজস্র উল্কাবৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু সেই উল্কাপিণ্ডের ধ্বংসাবশেষ তাঁহারা বহু অনুসন্ধানেও জলে স্থলে অন্তরিক্ষে কোথাও পান নাই। এমন কি সম্ভব নহে, যে ঐ উল্কাসমূহের সূক্ষ্ম অণুগুলি পাণের বরণে পতিত হইয়াছিল এবং ভাদ্রমাসের প্রচণ্ড রৌদ্রে ডিম্বাকৃতি অণুগুলি ফুটিয়া কীট আকারে দেখা দিয়াছে? একজন সংবাদপত্রের পত্রপ্রেরক নীল পীত হরিদ্রা প্রভৃতি নানান্‌বর্ণী পোকা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। 'ইন্দ্রধনু চূর্ণ হ'য়ে' এরূপ বর্ণবৈচিত্র্য ঘটাইয়াছে কিনা কে জানে? যাঁহারা আকাশতত্ত্বে অভিজ্ঞ তাঁহারা এই সকল ( hypothesis ) অনুমানের সত্যতাসম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিতে পারেন। পক্ষান্তরে এরূপও হইতে পারে যে ভারতবর্ষের বাহিরে, নীলনদের তীরে বা দক্ষিণ আমেরিকার আরণ্যপ্রদেশে, এমন কোনও ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে যাহার দরুণ এই অত্যাহিত। কেননা সম্প্রতি একজন বৈজ্ঞানিক বহু গবেষণায় ও বিস্তর নূতন উদ্ভাবিত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির প্রাকৃতিক কারণ দক্ষিণ আমেরিকার আরণ্যপ্রদেশে নিহিত রহিয়াছে। 'অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি?'

পাণের পোকার নিদাননির্ণয় একটু সময়সাপেক্ষ। কিন্তু ইতিমধ্যেই রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর সংবাদপত্রে ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন যে পাণে তিনি অণুবীক্ষণযোগেও কোনও পোকা দেখিতে পান নাই ঃ—যদিও অনেকে শাদা চোখেই দেখিতে পাইতেছেন ও বলিতেছেন "still it moves"! রায় বাহাদুরের এই অভয়বাণী যদি সত্য হয়, তবে বলি চুণী বাবুর মুখে ফুলচন্দন—



শ্রীবিষ্ণুঃ—পাণসুপারি পড়ুক্। তিনি আতঙ্কনিগ্রহ করিয়া হিন্দুসমাজের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এক্ষণে মুসলমানসমাজ হইতে কোনও খয়েরখাঁ হকিম মুস্কিল আসান করিলেই সোণায় সোহাগা হয় অর্থাৎ পাণে চূণখয়ের সমান হয়, বাঙ্গলা মায়ের উভয় সন্তান মায়ের দুই গালের চর্ব্বিত পাণ খাইয়া ধন্য হয়। [ শেষ কথাটিতে কেহ স্বরাজের বিভীষিকা দেখিবেন না ত? ]

৪। সমাজ ও সাহিত্য।

যাহা হউক, এই হুজুগ বেশীদিন থাকিলে বাঙ্গালীর ধর্ম্মকর্ম্ম, বাঙ্গালীর সামাজিক জীবন, বাঙ্গালীর কাব্যসাহিত্য, সব রসাতলে যাইবে। বাঙ্গালীর উন্নতিবৃক্ষে পোকা ধরিবে। এই হুজুগ চলিলে, বাঙ্গালীর আসরে আর ঘন ঘন তামাকপাণ ও পরনিন্দার অনুপান চলিবে না, বাঙ্গালী গৃহিণী আর স্বামিবশীকরণের অভিপ্রায়ে পাণের সঙ্গে শিকড় খাওয়াইতে পারিবে না, বাঙ্গালী বীর আর পাণের থেকে চূণ খসিলে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধাইতে পারিবে না, বিবাহের স্ত্রী-আচারে আর হাইআমলা বাঁটিয়া বাঙ্গালী বরের দুই গালে পাণ দিয়া মার্কা দেওয়া চলিবে না, শুভদৃষ্টিকালে আর কনের শরমমাখা ঢল্‌-ঢলে মুখখানি পাণ দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া চলিবে না, বাঙ্গালীর ঘরের কচি মেয়ে আর 'পাণ, পাণ, পাণ কোথাও না যান' বলিয়া সাঁজপূজনী ব্রত করিবে না, আর পাণ দিয়া ঠাকুরাণীবরণ হইবে না, পাণসুপারির অভাবে ৺সত্যনারায়ণের পূজাপাঠ চলিবে না, ব্রাহ্মণভোজনের রজতখণ্ড দক্ষিণার সঙ্গে আর পাণ দেখা দিবে না, চাপ্‌রাশী সাহেবের আর 'পাণ খা'বার জন্য' পিকি বক্‌শীশ মিলিবে না।

তাহার পর কাব্যসাহিত্যের কথা। কাব্যের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে আপাততঃ মনে হয় বটে, পাণে পোকা হইয়া ভালই হইল। কবিদের একটা নূতন উপমা যুটিল; এতদিন সেই মামুলি ব্যবস্থা ছিল ঃ—চন্দ্রে কলঙ্ক, বসন্ত-বায়ুতে গরল, কুসুমে কণ্টক, যুবতীর মুখে ব্রণ, রমণীহৃদয়ে কপটতা, ইলিশ মাছে কাঁটা। এখন হইল, পাণে পোকা। অর্থাৎ জগতে কিছুই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নহে। কিন্তু এই নূতন উপমা আপাতমনোরম পরিণামবিষম। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি তাম্বূলরসের অভাবে অচিরে বাঙ্গালীর জীবনে ও বাঙ্গালীর সাহিত্যে কাব্যরসের অত্যন্তাভাব ঘটিবে। সাহিত্যপরিষদের বিজ্ঞানপিপাসু সম্পাদক ও সভ্যগণ একবার এ সর্ব্বনাশের কথাটা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি?

প্রথমেই দেখুন, কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় যে ডানাঝরা পরীরা 'মিঠাপানের খিলির সঙ্গে মিঠা কথা' বেচিত তাহারা দুর্লভদর্শন হইল; হায়! আর আমরা সেই কাব্যের উপেক্ষিতা তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী পত্রলেখার পপুলার সংস্করণগুলিকে দেখিতে পাইব না; স্ত্রীস্বাধীনতার সেই জলন্তচিত্রগুলি না দেখিতে পাইয়া সমাজসংস্কার ও ধর্ম্মসংস্কারে আর আমাদের তাদৃশ নিঃস্বার্থ অনুরাগ ও উৎসাহ জন্মিবেনা; সৌন্দর্য্যচর্চ্চার (aesthetic culture) এমন সুগম পন্থা, এমন সুলভ সহায় আর থাকিবে না। হায়! 'ইংলিশ্‌ম্যান' তথা 'প্রবাসী' পত্রিকার বিরাট্ আন্দোলনে যে ফল ফলিল না, সামান্য একটিপোকায় সে বিভ্রাট্ ঘটাইল।

অথবা মৃদু বস্তু হিংসিতুং
মৃদুনৈবারভতে প্রজান্তকঃ।

পাণওয়ালীদের সংহারের জন্য ইংলিশ্‌ম্যানের অশনি ও প্রবাসীর কষাঘাত কাযে লাগিল না, ক্ষুদ্র একটি কীটে প্রমাদ ঘটাইল। হায়! এ যে ক্লিওপেট্রার অপেক্ষাও সাঙ্ঘাতিক অবস্থা!!

শুধু ইহাই নহে। আর দুরন্ত শিশুকে 'ঘুমপাড়ানিয়া মাসীপিসী' 'বাটা ভরা পাণ গাল ভ'রে' খাইবার লোভে ঘুম পাড়াইতে আসিবে না। সুতরাং নবীনা জননীগণের কাব্যচর্চ্চার তথা প্রণয়চর্চ্চার অবসর হইবে না ('খোকা যে ঘুমায় না')। ইংরাজীনবীশ কবি আর বাঙ্গালীর মেয়ের রূপ-বর্ণনায় 'তাম্বূলে তামাকুরস রাঙ্গা রাঙ্গা ঠোঁট' পাঠকের সমক্ষে ধরিয়া আসর জমাইতে পারিবেন না। ভাবুক কবি আর "পাণ কিন্‌লাম চুণ কিন্‌লাম ননদভাজে খেলাম। একটি পাণ হারা'ল দাদাকে ব'লে দিলাম।" ইত্যাকার মেয়েলি ছড়ার কবিত্ববিশ্লেষণ করিতে পারিবেন না। রসিক সমালোচক আর 'বঁধু একটা পাণ খেয়ে যাও' গানের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শুনাইয়া ভক্তহৃদয় পুলকিত করিতে পারিবেন না। ললিত আর তেমন করিয়া লীলাবতীর চিবুক ধরিয়া "লীলাবতী ক'রেছ কি হেরে হাসি পায়। রক্তগঙ্গাতরঙ্গিণী চিবুক তোমার।" বলিয়া আদর করিবে না। আর আমরা বিলাসভবনে সে পাণের সঙ্গে প্রাণের বিনিময় দেখিতে পাইব না। নবীননবীনার দাম্পত্যলীলায় সে কাড়াকাড়ি ছোড়াছুড়ি, সে পাণের দোনার grape-shot, সে 'রাধাধরসুধাপান,' সে 'দেবাসুরে সদা দ্বন্দ্ব সুধার লাগিয়া' আর দেখিতে পাইব না! আফিসের ফেরতা ঘরে আসিয়া আর তেম



করিয়া পাণের বাটা সাম্‌নে লইয়া চূণখয়েরে রঞ্জিতাঙ্গুলি তাম্বূলরসে রঞ্জিতাধরা 'ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলা' কুট্টিমাসীনা স্রস্তবসনা মনোহারিণী নারীমূর্ত্তি দেখিতে পাইব না।

( পতন ও মূর্চ্ছা )

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

# মহানাটক হইতে কিয়দংশ।

## দ্বিতীয় অঙ্ক।

( পথে পরশুরামের সহিত সাক্ষাৎকার )

সেই ধনুর্ভঙ্গ হতে বিষম ভৈরব ধ্বনি
স্বর্গমর্ত্ত্য কাঁপাইয়া হইল নিঃসৃত।
প্রলয়-মারুতোদ্ভূত কল্পান্ত-অনল-সম
জামদগ্ন্য-রোষানল হ'ল প্রজ্জ্বলিত॥
লক্ষ্মণ — রবি-বিম্ব-বিনির্গত রক্তচ্ছটা-সম যাঁর
দৃষ্টি রোষদীপ্ত,
ক্ষত্রক্ষণ্ঠচ্যুত রক্তে অদ্যাপি কুঠার যাঁর
রহিয়াছে সিক্ত,
তীব্রভাবে প্রবাহিত নিঃশ্বাস-পবন যাঁর
ভুবন-উৎপাৎ পুন করিছে সূচিত,
টঙ্কারিয়া ধনুর্গুণ ত্রিলোক-বিজয়ী সেই
জামদগ্ন্য হেথা দেখ আসি উপনীত॥
শিখা-স্পৃষ্ট-কক্ষপত্র তূণদ্বয় পৃষ্ঠে অলম্বিত
স্নিগ্ধ পূত ভস্ম-চিহ্নে বক্ষদেশ হয় অলঙ্কৃত,
রুরু হরিণের চর্ম্মে হইয়াছে অঙ্গ-আচ্ছাদন;
মৌঞ্জমেখলায়-বদ্ধ অধোবাস মাঞ্জিষ্ঠা-বরণ;
পাণিতে কার্ম্ম ক শোভে, অক্ষমালা, পিপ্পলের দণ্ড
—ওই দেখ আসিছেন জামদগ্ন্য তাপস প্রচণ্ড॥

আ-জনম-ব্রহ্মচারী, স্থূল-ভুজ-স্তম্ভে শোভে
ধনুর্গুণ-আঘাতের চিহ্ন সারি-সারি।
সমস্ত ধরণীচক্র করিয়াছিলেন জয়
—প্রশংসা-অক্ষর-লিপি যেন সে তাহারি।
ঘন-অস্ত্র-ব্রণ-কিণ—বক্ষ তায় সুকঠিন,
সেই বক্ষে দিয়া শান্ বাণ যাঁর তীক্ষ্ণীকৃত,
ক্ষাত্র নৃপ-মৃগরূপী মৃগয়ায় যে কৌতুকী,
—সেই মুনি এবে হেথা এসেছেন সুনিশ্চিত॥
সপ্ত সিন্ধু সহ মহী কার্ত্তবীর্য্য হ'তে যিনি
করিলা অর্জ্জন ;
পিতৃবধ-জাত কোপে ঘোর রণে কণ্ঠ তাঁর
করিয়া ছেদন
কুঠার-আঘাতে, পরে সবেগে সহস্র বাহু
করেন খণ্ডন
—যে সহস্র বাহু দিয়া কার্ত্তবীর্য্য বীর
করিয়াছিলেন রোধ রেবা-নদী নীর॥

( ক্রোধোদ্দীপ্ত পরশুরাম সন্দিগ্ধ হইয়া, এই হরধনু কোন্ ব্যক্তি ভগ্ন করিল, ইহা বারত্রয় বলিলেন )

জামদগ্ন্য।— নিজ-পতি-অস্ত্র বলি' পার্ব্বতী অর্চ্চিল যারে
প্রীতির সহিত ;
যাহারে সাদরে নন্দী বাসুকীর নিরমোকে
করে আচ্ছাদিত,
ত্রিপুর-ইন্ধন যাহা সেই শঙ্করের ধনু
আমি বিদ্যমানে
সে কি না করিল ভগ্ন যে জন এ ধরণীতে
খ্যাত রাম নামে।
হরধনু ভাঙ্গে যেই থাকিতে ধরণী মাঝে
এ পরশুরাম,
মোর যশশ্চন্দ্রমারে করে যেই আচ্ছাদিত
—কোথা সেই রাম ?



গর্ভ-হ'তে বার করি' খণ্ড খণ্ড করিয়াছি
ক্ষত্রিয় সন্তান,
এক বিংশতি বার ক্ষত্র হীন করিয়াছি
এই ধরাধাম,
সেই সে ক্ষত্রিয় রক্তে পিতৃ হ্রদ সংস্থাপিয়া
ক্রোধানল করেছি নির্ব্বাণ।
এ মোর প্রভাব, যাহা জানে ভাল সর্ব্বজন
জান না কি তুমি তাহা রাম ?

শ্রীরাম। ( সানুনয়ে )—
আপনার বাহুবল কিংবা হরধনু-বল
—কিছু মাত্র মোর কাছে নহেক বিদিত ;
সুতরাং অপরাধী, ক্ষম এই অপরাধ,
বালক-চেষ্টায় কি গো গুরুজন নহেন হর্ষিত ?
দেখুন ভগবন্ !—
ছুঁইতে না-ছুইতেই হরধনু খানি
ভাঙ্গিল আপনা হতে, কি করিব আমি ?
রত্নহার কি কুঠার যাই স্কন্ধে করি না গ্রহণ :
জল কি কজ্জল নেত্রে ধরুক মোদের নারীগণ,
ধন কি স্বজন মুখ যাই দেখি তাহে নাহি ক্ষতি
তবু না প্রকটি মোরা বীরদর্প ব্রাহ্মণের প্রতি॥

অপিচ— গো ব্রাহ্মণ বধ করা রঘুবংশী জনদের
নহেক বিহিত ,
শোনোগো পরশুরাম ! কুঠারে কাটো এ কণ্ঠ,
কর যথোচিত॥

( রামের সহিত পরশুরাম যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলে )

ক্ষমা কর মুনি !
হে ব্রাহ্মণ তব সহ যুদ্ধ করা দূরে থাক্
নাহি কহি সংগ্রামের কথা ;
হীনবল মোরা সবে, সর্ব্ব বলবান্-মাঝে
তোমরা যে উচ্চতম মাথা।

রাজন্যের বল এই একগুণ ধনুক্-ই কেবল
আর, নবগুণযুক্ত উপবীত ব্রাহ্মণের বল ॥

লক্ষ্মণ ( পরশুরামের প্রতি সক্রোধে )—

আজ হতে আর্য্য রাম নহেন অগ্রজ মম,
তাঁহা হতে স্বতন্ত্র হইলাম আমি অতঃপর।
রঘুকুল নৃপগণ যাই বলুন্ না কেন
দুষ্ট দ্বিজ দমনার্থ হ'ব আমি বদ্ধপরিকর ॥

রাম।— দিনকর-কুলে, আর শ্রোত্রিয় ক্ষত্রিয় হতে
লভেছি জনম ;
বিশ্বামিত্র ঋষি হতে জৃম্ভনাদি দিব্য অস্ত্র
করেছি গ্রহণ ;
সেই বংশে পাছে লোকে করে মোর অপযশ
তাই গুরু ব্রাহ্মণের প্রতি
প্রয়োগ করিতে অস্ত্র
আমি ভীত অতি ॥

পরশুরাম ( শ্রীরামের প্রতি )

হরধনু ছিল ভগ্ন হর-ভুজ-নিপীড়ন-বলে
তুমি ত নিমিত্ত মাত্র, তব বীর্য্য কোথা এই স্থলে ?
এ ধনু গরুড়ধ্বজ, যাতে আমি ক্ষত্রগণে
করিনু সংহার
কর দেখি আকর্ষণ তাহলে বুঝিব আমি
শকতি তোমার ॥
সে ধনু উঠায়ে রাম জুড়ি শর তায়
করিলেন আকর্ষণ মুহূর্ত্তে হেলায়।
সাক্ষাৎ কন্দর্প যেন রামে হয় বোধ
ভার্গবের হল সদ্য স্বর্গগতি রোধ ॥
তারকারি রামচন্দ্র আকর্ষিলে সেই ধনু,
জনক-দুহিতা সীতা অপাঙ্গ-আয়ত-আঁখি
মনোভাব লুকাইয়া দেখেন ঈরিষা-ভরে
পুন অন্য কন্যাসনে পরিণয় হবে নাকি ॥



পরশুরাম ( সবিনয়ে )

আমি বীর জামদগ্ন্য, যুঝি' কার্ত্তবীর্য্য সনে
সহস্র সংখ্যক বাহু ছেদিনু তাহার,
কিন্তু তব করস্থিত ওই শর নিরখিয়া
ব্রাহ্মণ্যে অনুরক্ত হইনু আবার ॥
ধূর্জ্জটীর ধর্ম্মপুত্র সেই এ পরশুরাম
ক্ষত্রিয়-শোণিত-ক্ষুণ্ণ যাহার কুঠার
করিল পিচ্ছিল অতি সসাগরা বসুমতী,
ত্রিলোক অভয়দান যে করিল আর ;
তার পদ কে করিতে পারিত গো অধিকার
যদি না এ রামচন্দ্র
সূর্য্যবংশ অবতংশ
আবির্ভূত হইতেন ধরণী মাঝার ॥

রাম। ( জামদগ্ন্য-চরণে নিপতিত হইয়া )

জামদগ্ন্য হতে জন্ম, পিণাকী যাঁহার গুরু,
যিনি হর-ভক্ত,
যাঁর বীর্য্য যাঁর কর্ম্ম কোনরূপে নাহি হয়
বাক্যে পরিব্যক্ত,
দানে যার সীমা নাহি যিনি সপ্ত সিন্ধু মহী
অকপটে করিলেন দান,
আপনি সে জামদগ্ন্য আপনার কোন্ কর্ম্ম
অলৌকিক নহে ভগবান ॥
রামের প্রভাব জানি' গাঢ়রূপে আলিঙ্গিয়া
রামে তেজ করিয়া বিন্যস্ত,
সেই জমদগ্নি-পুত্র মহাক্ষত্র বধ হ'তে
তদবধি হলেন নিরস্ত ॥
রামে আলিঙ্গিয়া মুনি
চলিলেন আপন আশ্রমে,
দশরথো চলিলেন
অযোধ্যায় পুত্রদের সনে ॥

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

# যন্ত্রবদ্ধ শিক্ষাপ্রণালী।

আমি নিজে শোণপুরের মেলা দেখি নাই, কিন্তু আমার কোন মান্য বন্ধুর নিকট মেলার গল্প শুনিয়াছি। মেলার দিন নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু কে কবে ঐ দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে, তৎসম্বন্ধে কোন জনশ্রুতি নাই। মেলার জন্য কেহ কোন বিজ্ঞাপন বাহির করে না, পূর্ব্ব হইতে হইতে কোন আয়োজন করে না। যথা সময়ে মেলার ক্ষেত্রে লোকজন জিনিষপত্র আসিতে আরম্ভ হয়। বহুকাল হইতে যে জিনিষের যে স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে সেই স্থানে সেই জিনিষ আসিয়া স্তূপীকৃত হইতে থাকে। স্থানের জন্য কোনরূপ বিবাদ বিসংবাদ হয় না। হাতীর স্থানে হাতী, ঘোড়ার স্থানে ঘোড়া, গরুর স্থানে গরু, গণ্ডায় গণ্ডায়, দশে দশে বা শতে শতে আসিয়া উপস্থিত হয়। দিগ্‌দিগন্ত হইতে ব্যবসায়ী ক্রেতারা আসে, হাজার হাজার টাকার দ্রব্য দিন দিন বিক্রয় হয়, কোনরূপ শান্তি ভঙ্গ হয় না, কোনরূপ গণ্ডগোল হয় না, আবার দিন অতিক্রান্ত হইলে যে যাহার আপন দেশে চলিয়া যায়। মেলা কেহ ডাকে নাই, মেলা ভাঙ্গিতেও কাহারও আদেশ দিতে হয় না। আর কয়েক দিনের মধ্যে বিনা উদ্যোগে বিনা আয়োজনে বিনা বিজ্ঞাপনে একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার ঘটিয়া যায়। এইরূপ বৎসরের পর বৎসর চলিয়া আসিতেছে,—কতকাল হইতে চলিতেছে তাহা কেহ বলিতে পারে না।

এ হইল এ দেশের পুরাতন নিয়ম। হালের নিয়মে সেবার কলিকাতায় শিল্পমেলা হইয়া গেল, এবার এলাহাবাদে মেলা হইবে। এই মেলার ব্যবস্থা অন্যরূপ। মেলার ছয় মাস আগে হইতে খবরের কাগজে লেখালেখি—জেনারল কমিটি, অধ্যক্ষ কমিটি, সবকমিটি—চাঁদা তোলা—দেশবিদেশের ব্যবসায়ীদিগকে নিমন্ত্রণ—স্থান নিরূপণ—কাঁচা পাকা ঘর নির্ম্মাণ—স্থানের বিভাগ—কে আট কাঠা জায়গা পাইবে, কে পৌনে দুই কাঠা জায়গা পাইবে, কে চল্লিশ বর্গ ফুটে সন্তুষ্ট হইবে, তাহা লইয়া তর্ক বিতর্ক—আলো জল হাওয়ার বন্দোবস্ত—আগুন নিবাইবার বন্দোবস্ত—অফিসার কেরানী ভলণ্টিয়ার—চেয়ার টেবিল বেঞ্চি—রীম রীম কাগজ—বস্তা দরুনে লালফিতা—হাজার টাকার ডাকটিকিট—পাঁচ হাজার টাকার ছাপাখানার বিল—তদুপরি নাচ গান বাজি কৌতুক তামাসা—চায়ের সরঞ্জাম—তকমাপরা পিয়ন—খবরের কাগজে বহ্বারম্ভ বিবরণ ও বিজ্ঞাপন—শেষ পর্য্যন্ত উদ্যোগীরা ক্লান্ত হইয়া পড়েন—আয় চেয়ে ব্যয়ের

মানসী।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

Printed by K. V. Seyne & Bros.

মাত্রা অধিক হইয়া যায়—রিপোর্ট ছাপিবার খরচ কুলায় না—ও আয় ব্যয়ের হিসাব বাহির হয় না!

ফলে একটা মেলার মত বৃহৎ আয়োজন সফল করিতে হইলে একটা বৃহৎ যন্ত্রের সৃষ্টি করিতে হয়। সেই বৃহৎ যন্ত্রের ভিতর বিস্তর ছোট বড় চাকা থাকে, যন্ত্র চালাইতে বিস্তর ইন্ধন ব্যয় করিতে হয়। চাকায় চাকায় আটকাইয়া যাইবার আশঙ্কায় প্রচুর তেল খরচ করিতে হয়; এবং যন্ত্র যখন সবেগে চলিতে থাকে, তাহার ঘর্ষণে সমস্ত দেশে একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, তাহার শব্দে দেশের লোকের নিদ্রা ভঙ্গ হয়। বুঝিয়া লইতে হইবে, শব্দের যত বাহুল্য, আয়োজনের তত সাফল্য।

দেশের পুরাতন মেলাগুলিতে এত শব্দ নাই, এত ঘর্ষণ নাই, এ রকম একটা প্রকাণ্ড যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতেও হয় না। নিঃশব্দে ধীরে ধীরে সমুদয় দেশ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া উহা যথাকালে আপনা হইতে জমাট বাঁধিয়া উঠে, আবার যথাসময়ে আপনা হইতে লীন হইয়া যায়।

অথচ ইহা বলা চলে না, মেলার বা প্রদর্শনীর যে সফলতা তাহা এইরূপ যন্ত্রবদ্ধ চেষ্টায় অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে, আর যে চেষ্টা যন্ত্রবদ্ধ নহে, তদ্দ্বারা সেরূপ সফলতা পাওয়া যাইতেছে না!

একালের যন্ত্র চালিত প্রদর্শনীতে চাকচিক্য সূক্ষ্ম কারুকার্য্য অধিক থাকে, লোক ডাকিয়া আনিবার জন্য নানা প্রলোভন সংগ্রহ করিতে হয়, যে যেখানে যত চিকণ জিনিষ তৈয়ার করে, সে তাহা লইয়া উপস্থিত হয় এবং চিকণ জিনিষে যাহাদের চোখ ঝলসায়, তাহারা বহুপরিমাণে প্রদর্শনীক্ষেত্রে আকৃষ্ট হয়। আর সেকালের প্রদর্শনীতে মোটা মোটা হাতী আসে, বড় বড় বলদ আসে, মোটা কম্বল আর সতরঞ্চ আর গালিচার স্তূপ উঠে—সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের প্রলোভন বিশেষ একটা থাকে না—বড়লোকে বা শিক্ষিত লোকে সেখানে কলেরা ব্যাসিলাসের ভয়ে পদার্পণে কুণ্ঠিত হন আর দূরে রহিয়া দূরবীন লাগাইয়া কৌতুক দেখেন;—কিন্তু সমস্ত দেশের বৃহৎ হৃদয়ের সহিত ও রক্তবহা নাড়ার সহিত এই চেষ্টাহীন উদ্যমের যে চিরন্তন সংযোগ আছে, একালের বহুচেষ্টাজাত বৃহৎ আয়োজনের সহিত সেরূপ সংযোগ কুত্রাপি দেখা যায় না।

গোড়াতেই একটা পার্থক্য এই যে একালের "বিরাট" শিল্পপ্রদর্শনী বা কারু-কার্য্য প্রদর্শনী—যাহার পূর্ব্বে ন্যাশনাল বা জাতীয় বা ভারতীয় এইরূপ একটা কিছু বিশেষণ দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য হয়—তাহাতে প্রবেশলাভের জন্য

অন্ততঃ চারি আনা দর্শনী দেওয়া অত্যাবশ্যক। চারি আনার টিকিট খরিদ করিতে যে হতভাগ্য অসমর্থ—জাতীয় প্রদর্শনীর প্রবেশ দ্বার তাহার জন্য অর্গল-রুদ্ধ রহিয়াছে এবং তাহার দ্বারদেশে পুলিশ অথবা ভলণ্টিয়ার অর্দ্ধচন্দ্র লইয়া উপবিষ্ট থাকে। আর সেকালে মেলার আয়তন যত ক্ষুদ্র হউক, অথবা বিপুল হউক,—বিধাতার নীল চন্দ্রাতপের নিম্নে যাহার স্থান,—ধনী দরিদ্র অন্ধ খঞ্জ সকলেরই জন্য তাহা সর্ব্বদা মুক্ত আছে, কোনরূপ প্রাচীরের বেষ্টনী দিয়া তাহাকে ঘেরিয়া রাখিতে কেহ কখনও কল্পনায়ও আনে না।

চারি আনা হাতে লইয়া না গেলে যেখানে দরিদ্রব্যক্তি প্রবেশাধিকার পাইবে না, প্রত্যুত তাহাকে অপমানিত হইয়া ফিরিতে হইবে, সেখানে যেমনই প্রলোভন ও যেমনই আকর্ষণ থাক না কেন, মানব-সমাজের হৃৎপিণ্ড আন্দোলিত হইয়া সেখানে রক্তধারা পাঠায় না, বা সেখান হইতে শোণিতধারা বাহির হইয়া সমস্ত সমাজের স্নায়ুকে স্পন্দিত বা পেশীকে পুষ্ট করিতে পারে না।

কাজেই আকস্মিক ঢক্কানিনাদে ও চক্রঘর্ঘরধ্বনিতে শ্রবণেন্দ্রিয়ে যতই আঘাত লাগুক, স্থায়ী ফল তুলনা করিতে গেলে উভয়ের মধ্যে অনেকটা পার্থক্য আসিয়া দাঁড়ায়।

যন্ত্রযোগে কোন মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হয় না বা সম্পন্ন হইতে পারে না, এমন কথা যদি আমি বলিতে যাই, তাহা হইলে পাঠকেরা আমাকে গণ্ডমূর্খের দলে ফেলিবেন। ঐ বিশেষণে বিশিষ্ট হইতে আদৌ ইচ্ছা করিনা। যন্ত্র জিনিষটা কৃত্রিম, উহাকে চেষ্টা পূর্ব্বক গড়িতে হয় ও অনবরত সচেষ্ট থাকিয়া চালাইতে হয়, চেষ্টার কোন একটা ত্রুটী হইলে যন্ত্র বিকল হয়, ভাঙ্গিয়া যায়, এমন কি বিপদ্ পর্য্যন্ত টানিয়া আনে, যন্ত্র চালাইতে হইলে বাহির হইতে ব্যয় সাধ্য ইন্ধনের জোগাড় করিতে হয়, সহসা ইন্ধনের অভাব ঘটিলে সমুদয় যন্ত্র অচল হইয়া পড়ে। এই সমস্ত দোষ থাকিলেও এই বিংশ শতাব্দীতে—যন্ত্রের যুগে—যন্ত্রের শক্তি অপলাপ করিয়া দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিতে প্রস্তুত নহি।

অন্যদেশের ব্যবস্থা অন্যরূপ, কিন্তু এদেশে যন্ত্রবদ্ধ উদ্যম সবে আরম্ভ হইয়াছে; আশা করি এই উদ্যম ক্রমে প্রসার ও পরিপুষ্টি লাভ করিবে, এবং এই উদ্যমের ফলে দেশেরও শক্তি সামর্থ্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে। আমার অভিপ্রায় এই যে এই যন্ত্র মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া আমরা যেন এদেশের প্রাচীন উদ্যম অনুষ্ঠানগুলি,—যাহা কেহ চালায় না, যাহা আপনা হইতে চলে, যাহার পরিচালনের জন্য কেহ এক কড়া কড়ি ব্যয় করে না বা পাঁচ মিনিট মাথা ঘামায় না—যাহা কোন্



বীজ হইতে উৎপন্ন অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইয়া বৎসরের পর বৎসর ও শতাব্দীর পর শতাব্দী কাল সমান ভাবে চলিতেছে—যাহা বটবৃক্ষের মত বহু পুরুষের পতন উত্থান দেখিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে, যাহা চারিদিকে শাখাপল্লব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, যাহার শাখাপ্রশাখা হইতে অধোমুখে মূল বিলম্বিত হইয়া দেশের ভূমি হইতে রস আকর্ষণ করিতেছে—সেই পুরাতন উদ্যম অনুষ্ঠান-গুলিকে অবজ্ঞা না করি।

আর একটা দৃষ্টান্ত দিলে আমার বক্তব্য স্পষ্ট হইবে। সম্প্রতি এদেশে শিল্প শিক্ষা দিবার জন্য একটা সচেষ্ট আয়োজন আরব্ধ হইয়াছে। বিদেশের সহিত প্রতিযোগিতায় আমাদের প্রাচীন শিল্পগুলি ক্রমেই উৎসন্ন যাইতেছে, কাজেই এখন নূতন প্রণালীতে শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। বিদেশের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইলে বিদেশের শিক্ষাপ্রণালীও অবলম্বন করিতে হইবে। বিদেশে,—অর্থাৎ বিলাতে, জর্ম্মনিতে, আমেরিকায়, শিল্প শিক্ষার জন্য চেষ্টা যন্ত্রবদ্ধ হইয়াছে। সে আবার কি প্রকার যন্ত্র! আধুনিক কালের উপযোগী একটা শিল্প বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে আরম্ভেই দু ক্রোর দশ ক্রোর টাকা লইয়া বসিতে হয়। মার্কিণ দেশের এক এক জন কোটিপতি বা অযুতপতি এইরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে জীবনে উপার্জ্জিত সর্ব্বস্ব দান করিয়া ফেলিতেছেন। প্রথমেই বড় বড় অট্টালিকা গাঁথিতে হয়—তার মধ্যে বৃহৎ শিল্পাগার, বৃহৎ পরীক্ষাগার, বৃহৎ যন্ত্রাগার—লাইব্রেরি, লেবরেটারি, কারখানা। বড় বড় ডাইনামো, বড় বড় মোটর—বড় বড় এঞ্জিন—উনান, চিমনি, ষ্টীম হামার—সর্ব্বত্র বিশাল ও বিপুল সরঞ্জাম,—বড় বড় অধ্যাপক ও শিক্ষক, কেহ শিক্ষাগারে উপদেশ দেন, কেহ পরীক্ষাগারে পরীক্ষাকর্ম্মে সাহায্য করেন, কেহ কারখানা ঘরে হাতে কলমে কাজ শেখান। এখানে পর্য্যবেক্ষণ, ওখানে পরীক্ষা, ওখানে লেকচার—সর্ব্বত্র একটা হৈ হৈ ব্যাপার। অথচ সর্ব্বত্র শৃঙ্খলার সহিত সকল কাজ সম্পন্ন হইয়া যাইতেছে এবং যাহারা শিক্ষাগার হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে, তাহারা সেই উপার্জ্জিত অভিজ্ঞতার ফলে ধরাপৃষ্ঠে দম্ভের সহিত পা ফেলিয়া বেড়াইতেছে।

বিদেশের এই প্রকাণ্ড উদ্যমের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইলে ঐরূপই প্রকাণ্ড উদ্যম আবশ্যক—ঐরূপ প্রকাণ্ড শিক্ষাযন্ত্র স্থাপন করা আবশ্যক। সচেষ্ট উদ্যমের সহিত লড়াই করিতে হইলে সচেষ্ট উদ্যমই আবশ্যক—এখানে ধীর ভাবে বসিয়া সমাজের ধীর গতির উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না। দেশের

যে সকল পুরাতন আয়োজন আছে, তাহাতে কুলাইবে না। এই চিন্তা আমাদের মনে জাগিয়াছে, কিন্তু অর্থাভাবে লোকাভাবে সামর্থ্যাভাবে আমরা যে আয়োজন আরম্ভ করিয়াছি, তাহা সমুদ্রের তুলনায় গোষ্পদ। এখানে সেখানে দুই চারিটা শিল্পবিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে বটে, কিন্তু স্থানাভাবে কারখানা হইতেছে না, অর্থাভাবে যন্ত্র আসিতেছে না, লোকাভাবে শিক্ষক জুটিতেছে না। পরন্তু কি উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে; কোন্ বিদ্যা শিখাইতে হইবে, কোন্ বিদ্যায় কি প্রয়োজন সাধিত হইবে, কোন্ বিদ্যা শিখিয়া কি কাজে লাগাইতে হইবে, এই সকল বিষয়ে শিক্ষাযন্ত্রচালকগণের কোনরূপ স্পষ্ট ধারণা নাই। ফলে শিক্ষাযন্ত্রগুলি যদি কিছুদিন ঘর্ঘর শব্দে চলিয়া শেষে তৈলাভাবে মরিচা ধরিয়া অচল হয়, এবং যাঁহারা শিক্ষা পাইয়া বাহির হইতেছেন, তাঁহারা নিষ্ফলা বিদ্যার বোঝা কাঁধে করিয়া অশ্রুজলে ধরাতল অভিষিক্ত করিতে থাকেন, তাহা হইলে বিস্ময়ের কারণ হইবে না। আমাদের যেরূপ সামর্থ্য, দেশের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে এই সকল উদ্যমগুলি যদি ব্যর্থ হইয়া পড়ে, তাহাতে ব্যর্থ উদ্যমের নৈরাশ্য আনিয়া দেশে আবার জড়তা আনিবে কি না তাহা চিন্তিবার বিষয়।

দেশে শিল্পশিক্ষার যে পুরাতন প্রণালী ছিল, তাহা আধুনিক পাশ্চাত্য প্রণালীর মত যন্ত্রবদ্ধ ছিল না, এবং তাহার সহিত প্রতিযোগিতাতেও সমর্থ ছিল না বটে, কিন্তু তাহার কতকগুলি গুণ ছিল, তাহা সেকালের সমাজের পক্ষে উপযোগী ছিল। প্রাচীন কালে আমাদের দেশে লোকের যে যে অভাব ছিল, সেকালের শিক্ষাপ্রণালী সেই সেই অভাব মোচনের উপযোগী ছিল। এবং সেই শিক্ষাপ্রণালী এমন নিঃশব্দে কাজ করিত, যে উহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত হয়ত সকলে জানিতে পারিত না।

হিন্দু সমাজে জাতিভেদ প্রথার অন্য যতই দোষ থাকুক, উহা দেশ ব্যাপিয়া শিল্পশিক্ষার অতি সহজ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিল। এবং সেই উপায় এই দেশের অবস্থার উপযোগী। অন্যান্য দেশের বৃহদ্ব্যাপার ছাড়িয়া এ দেশে ক্ষুদ্রাকারে শিল্পবিদ্যার যে সকল ব্যবস্থা হইতেছে, তাহার সহিত তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে। যে বিদ্যালয়ে আধুনিক প্রণালীতে শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়, সেখানে নানারূপ শিক্ষা সরঞ্জাম আবশ্যক হয়—ব্যয় করিয়া সেই সকল সরঞ্জামের সংগ্রহ করিতে হয়—মূল্য দিয়া বিদেশ হইতে যন্ত্রাদি কিনিতে হয়, আনিতে হয়, চালাইতে হয়; ইহা ব্যয় সাধ্য ব্যাপার। তার পর বেতন দিয়া উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করিতে হয়—উচ্চ বেতনে পরিচালক ও



পরিদর্শক নিযুক্ত করিতে হয়। এই সকল কারণে এই শিক্ষাও ব্যয় সাধ্য হইয়া পড়ে। যাহার কিছু সঙ্গতি আছে, সেই এই বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ করিতে পারে; দরিদ্রের পক্ষে অর্থাৎ আমাদের দেশের সাড়ে পোনের আনার পক্ষে ইহার দ্বার রুদ্ধ। যাঁহারা শিক্ষা পাইয়া বাহিরে আসিয়া জীবিকা অর্জ্জনে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহাদের অবস্থাও সঙ্কটাপন্ন। স্বাধীন ভাবে শিল্পীর জীবন আরম্ভ করিতে হইলে যে সকল যন্ত্র সরঞ্জাম সংগ্রহ করিতে হইবে, যে কারখানা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, যে মুটেমজুর নিযুক্ত করিতে হইবে, তার জন্যও প্রচুর মূলধন আবশ্যক। বিশেষ সঙ্গতি না থাকিলে কোন ব্যক্তি শিক্ষা লাভ করিয়াও, অর্জ্জিত বিদ্যা ফলাইতে পারিবেন না। কাজেই দরিদ্রের পক্ষে এই শিক্ষা নিষ্ফল হইবার আশঙ্কা আছে।

এ দেশের প্রাচীন প্রণালীকে জাতিভেদে ব্যবসায়ভেদের ব্যবস্থা থাকায় শিল্প-শিক্ষার বন্দোবস্ত অতি সহজ হইয়া আছে। পিতা যে শিল্পে অভিজ্ঞ, পুত্রকেও সেই শিল্প শিখিতে হয়। তাহার নিজের ঘরই তাহার বিদ্যালয়, নিজের বাপ-খুড়াই তাহার শিক্ষক। ঘরের ভাত খাইয়া সে বিদ্যালাভ করে—হোটেল ভাড়া দিতে হয় না, বোর্ডিং খরচ দিতে হয় না। পয়সা খরচ করিয়া যন্ত্র কিনিতে হয় না, এক পয়সা বেতন পর্য্যন্ত দিতে হয় না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যখন তাহার সুবিধা, যখন তাহার বাপ খুড়ার সুবিধা, তখনই শিক্ষালাভ করিতে পায়, এবং বাপখুড়ার যতটুকু বিদ্যা আছে, তাহা যথাকালে দখল করিয়া লয়। শিক্ষা সমাপ্তির পর নিজে যখন স্বাধীন জীবন যাত্রা আরম্ভ করে, তখনও মূলধন সংগ্রহ করিতে হয় না; হাতিয়ার সরঞ্জাম যাহা কিছু দরকারী, পিতার নিকট উত্তরাধিকার সূত্রে এক কড়া মূল্য না দিয়া পাইয়া থাকে। সকলের উপর দ্রষ্টব্য এই, শিক্ষকের উপর পরিদর্শক রাখিতে হয় না—শিক্ষক এখানে ছাত্রকে ফাঁকি দেয় না—শিক্ষকের যতটুকু বিদ্যা আছে, তাহার এক ক্রান্তি সে হাতে রাখে না—ষোল আনা যত্নের ও শ্রদ্ধার সহিত তাহা শিক্ষার্থীকে অর্পণ করে; কেন না, এখানে শিক্ষকের ও শিক্ষার্থীর স্বার্থ একবারে অভিন্ন।

বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া সমস্ত দেশের মধ্যে এই শিক্ষাপ্রণালী চলিয়া আসিতেছে, এবং এই প্রণালীর কল্যাণে এ পর্য্যন্ত দেশের যাবতীয় অভাব পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। আধুনিক পাশ্চাত্য প্রণালীর সহিত ইহা প্রতিযোগিতা করিতে পারে না ও পারিবে না, তাহা সত্য কথা; কিন্তু তাই বলিয়া এই প্রণালীকে অবজ্ঞা করিলে চলিবে না। সে দিন পর্য্যন্ত এই শিক্ষাপ্রণালী বিশ

কোটি লোকের বস্ত্র যোগাইয়াছে ; এখন পর্য্যন্ত এই প্রণালীই ত্রিশ কোটি লোকের অন্ন যোগাইতেছে। যাঁহারা হিন্দু সমাজের জাতিভেদ উঠাইবার জন্য কোমর বাঁধিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এই কথাটা বিবেচনা করিতে অনুরোধ করি। বিদেশের প্রতিযোগিতায় তাঁতির ব্যবসায় গিয়াছে বা যাইতেছে ; কিন্তু কামার কুমার ছুতারের ব্যবসায় আজিও উঠে নাই। কামার কুমার ছুতারের বিদ্যা একালের প্রণালীমতে অথচ সহজে ও সস্তায় শিখাইবার ব্যবস্থা যত দিন না হইতেছে, ততদিন জাতিভেদের সহিত লড়াই করিলে ফল পাওয়া যাইবে কি ?

অথচ দেশের মধ্যে এই যে পুরাতন শিক্ষাপ্রণালী বর্ত্তমান আছে, ইহাকে যন্ত্রবদ্ধ প্রণালী বলা যায় না। এই দেশ-জোড়া শিল্প শিক্ষার উন্নতির জন্য কোথাও কোন একটা সমিতি নাই, কেহ ইহার আয় ব্যয়ের হিসাব করে না, কেহ ইহার বার্ষিক রিপোর্ট প্রস্তুত করে না, ইহার সম্পর্কে ডাক ঘরের এক পয়সা আয় বৃদ্ধি হয় না ; ছাপাখানা হইতে কেহ এক খানা বিল পাঠায় না। কোন্ ব্যক্তি কোন্ তারিখে এই শিক্ষাপ্রণালীর উদ্ভাবন করিয়াছে, কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারেন না, অথচ এই প্রণালী সমস্ত দেশ জুড়িয়া আপনা হইতে চলিয়াছে। সমস্ত ভারতবর্ষের জমিতে যেমন যথাসময়ে ঘাস গজায়, কেহ তাহার জন্য পূর্ব্ব হইতে আয়োজন করে না, সেইরূপ ভারতবর্ষ জুড়িয়া কামার কুমার ছুতারের যথাকালে উৎপত্তি হইতেছে। কস্মিন্‌কালে তাহার অভাব বোধ হয় নাই। ইহাকে যন্ত্র বলা চলে না। যন্ত্রের মধ্যে অতি নিকৃষ্ট যন্ত্র কলুর ঘানিও ঘুরিবার সময় কট্ কট্ ধ্বনি করে ; কিন্তু এই শিক্ষাপ্রণালী নিঃশব্দে চলিয়া আসিতেছে।

আর একটা গুরু গম্ভীর দৃষ্টান্ত দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। এবার শিল্পশিক্ষার দৃষ্টান্ত নহে ; এবার খাঁটি বিদ্যাশিক্ষার দৃষ্টান্ত। যে বিদ্যার সঙ্গে বিশ্বকর্ম্মার সম্পর্ক আছে কি না জানি না, কিন্তু যাহার সহিত মা সরস্বতীর সম্পর্ক আছে।

আধুনিক প্রণালী-সম্মত বিদ্যাশিক্ষার যন্ত্রের নাম ইস্কুল বা কালেজ ; এখন গ্রামে গ্রামে ইস্কুল ও নগরে নগরে কালেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও হইতেছে। এক একটি ইস্কুল বা কলেজ এক একটি যন্ত্র। অথবা সমুদয় ইস্কুলগুলি বা কলেজগুলি লইয়া একটা "বিরাট্ যন্ত্র"—যে যন্ত্র চালাইতেছেন বিশ্ববিদ্যালয় বা স্বয়ং গবর্ণমেণ্ট। এক একটা ইস্কুল কালেজকে ঐ বিরাট্ যন্ত্রের এক এক খানা চাকা মনে করিলেও করিতে পারি।

হাল আইনে একটা নূতন কালেজ খুলিতে হইলেই উদ্যোগকারীকে কিছু



অর্থ—যাহার পরিমাণ নিতান্ত অল্প নহে—লইয়া বসিতে হয়। এক খানা পাকা বাড়ী চাই—তাহার এত গুলা কুঠরি দরকার—প্রত্যেক কুঠরি দীর্ঘ এত, প্রস্থ এত, খাড়াই এত—তাহাতে প্রত্যেক ছাত্রের জন্য এত ঘন ফুট হাওয়া আবশ্যক—এত বাতির সমান আলো চাই। কর্ত্তৃপক্ষ বাড়ি মঞ্জুর করিলে তারপর বেঞ্চি ডেস্ক টেবিল কেদারা আলমারি টানাপাখা ব্ল্যাকবোর্ড ইত্যাদি সরঞ্জাম আবশ্যক—তারপর অধ্যক্ষ অধ্যাপক শিক্ষক—ইহাঁর বেতন এত টাকা, ইনি হপ্তায় এত ঘণ্টার অধিক কাজ করিবেন না—ইনি এত ঘণ্টা পড়াইবেন, এত গুলি কাগজ দেখিবেন, এতক্ষণ বিশ্রাম করিবেন—সমস্ত কাঁটায় কাঁটায় বন্দোবস্ত। তারপর কেরাণী, উপকেরাণী, দপ্তরী, দরোয়ান, পিয়ন ইত্যাদি। তদুপরি লাইব্রেরি, লাবরেটারি ইত্যাদি ত আছেই। সকল বিষয়েই কর্ত্তৃপক্ষ খুঁটিনাটি আইন বাঁধিয়া দিয়াছেন। বিদ্যালয় ত হইল—তার পর বিদ্যালয় পরিচালন করিবে কে ? যিনি উদ্যোগকারী, যিনি মূলধনী—যিনি ক্ষতির সম্ভাবনা সত্ত্বেও বিদ্যালয় খুলিতে বসিয়াছেন, তিনি বিদ্যালয়কে বিদ্যাবিপণিতে পরিণত করিয়া ফেলিবেন এই আশঙ্কা থাকে, তাঁহার মূলধন হইতে চক্রবৃদ্ধির নিয়মানুসারে কুসীদ আদায় করিয়া লইবেন, এই আশঙ্কা থাকে। তাই কর্ত্তৃপক্ষ বিদ্যালয়ের পরিচালনার নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব তাঁহার উপর দিতে চাহেন না—পরিচালনার জন্য নিরপেক্ষ লোক লইয়া কমিটি নিযুক্ত হয়। কমিটি মাসে মাসে অধিষ্ঠান করেন, খরচপত্রের ব্যবস্থা করেন, শিক্ষক হইতে পিয়ন পর্য্যন্ত বাহাল বরতরফ করেন, কোন শিক্ষক মায়ের শ্রাদ্ধে তিন দিনের উপর পাঁচ দিন কামাই করিলে তাঁহার মাহিনা কাটেন, কোন্ শিক্ষক ক্লাসে গিয়া কয় মিনিট ঘুমাইয়া থাকেন, তাহার আলোচনা করেন—এবং কমিটির যিনি সেক্রেটারি তিনি গুরুগম্ভীর ভাবে এই সকল বিরাট মীমাংসা খাতার মধ্যে লিপিবদ্ধ করেন। এবং সেক্রেটারি কোন বানান ভুল করিলেন কিনা তাহা দেখিয়া সভাপতি সেই লিপি মঞ্জুর করেন।

বিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বারে দরোয়ানকে অতিক্রম করিয়া আপিস,—সেখানে কেরাণীবর্গ বেষ্টিত হইয়া আপিসের অধ্যক্ষ অধিষ্ঠিত। বিদ্যালাভার্থী ছাত্রগণ সভয়ে স্পন্দিতহৃদয়ে আপিসঘরের দুয়ারে বারাণ্ডায় কাতার দিয়া দণ্ডায়মান এবং প্রবেশ করি কি না করি এই সন্দেহদোলায় দোদুল্যমান। কেন না, আপিসের যিনি কর্ত্তা তাঁহার মুখ গম্ভীর ; যাঁহারা তাঁহার অধীন তাঁহাদের মুখ আরও গম্ভীর—এবং সকলেরই মুণ্ড সম্মুখে রক্ষিত

খাতার প্রতি বদ্ধদৃষ্টি। খাতার কাছে খাতা, খাতার উপরে খাতা, মেজের উপর, টেবিলের উপর, ছাদের নীচে সর্ব্বত্রই খাতা,—সমচতুর্ভুজ, সমচতুরস্র, দীর্ঘচতুরস্র, বহুবিধ খাতা। এ হেন খাতা-প্রাকাররক্ষিত দুর্গ মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া দুইটা মিষ্টবাক্য উপহার না পাইয়া যদি কোন ছাত্র প্রবেশিকা জমা দিয়া খাতার মধ্যে নাম লেখাইয়া নিষ্ক্রান্ত হইতে পারে, তাহার ছাত্রজীবন ধন্য।

প্রবেশান্তে বিদ্যালাভের ব্যবস্থা। কর্ত্তৃপক্ষ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, কোন্ শাস্ত্রের কতটুকু অধ্যয়ন করিতে হইবে, কোন্ শাস্ত্রসম্পর্কে কয়খানি বহি পড়িতে হইবে, কোন্ বহির কোন্ পাতাটা বর্জ্জন করিতে হইবে, কোন্ শাস্ত্র সম্পর্কে কত ঘণ্টা লেকচার হইবে, ঘণ্টার অর্থ ষাট মিনিট কি ছত্রিশ মিনিট, কতগুলি লেকচার শুনিতে হইবে এবং কতগুলি ফাঁকি দেওয়া চলিবে—লেকচার শুনিতে শুনিতে কত মিনিটকাল ঘুমাইয়া পড়িলে সেই শ্রবণ ক্রিয়া অগ্রাহ্য হইবে ইত্যাদি—অতএব এ সকল বিষয়ে শিক্ষক বা শিক্ষার্থী কাহারও কোন দুশ্চিন্তার প্রয়োজন নাই। কিন্তু লেকচার অনেক সময়ে এ কাণে ঢুকিয়া ওকাণ দিয়া বাহির হইয়া যায়, এবং কোন শিক্ষকই ইহা নিবারণ করিতে পারেন না; কাজেই মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীকে পরখ করিয়া বাজাইয়া লওয়া দরকার হয়; সপ্তাহে পরীক্ষা, মাসান্তে পরীক্ষা, বৎসরান্তে পরীক্ষা, এবং চূড়ান্ত পরীক্ষা, এবং এই পরীক্ষা পরম্পরায় যে বিদ্যার বিশুদ্ধি বা শ্যামিকা নির্দ্ধারিত হয় তাহার নগদ মূল্য প্রতিমাসে চারি মুদ্রা, এবং মাসের পোনেরই তারিখে বিদ্যালয়ের আপিসে জমা দিতে না পারিলে অতিরিক্ত দেয় জরিমানা চারি আনা।

বিদ্যাদানের এই যন্ত্রের মধ্যে নানাবিধ মহার্ঘ সামগ্রী আছে—দারোয়ান চাপরাসী সেক্রেটারি দপ্তরী অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ বেঞ্চি টেবেল, লাইব্রেরি, হষ্টেল, ডিপ্লোমা উপাধি, জরিমানা, রসীদ, ডাকটিকিট, এবং অনেক চামড়া-বাঁধা খাতা—কিন্তু কেবল হৃদয় নাই। শিক্ষক ছাত্রের মধ্যে কোনরূপ নাড়ীর টান নাই, কোনরূপ প্রীতি সম্পর্ক নাই। শিক্ষক ছাত্রের নাম জানেন না, মুখ চেনেন না; ঘণ্টা বাজিলে আপন কর্ত্তব্য সারিয়া মাসান্তে বেতন গ্রহণ করেন; চুক্তি মতে আঠারর জায়গায় উনিশ ঘণ্টা কোন সপ্তাহে কাজ করিতে বলিলে কপালে চোখ তোলেন; আর অধ্যক্ষ বসিয়া বসিয়া দারিদ্র্যাপরাধী ছাত্র বেতন দিতে দেরি করিলে তাহার জলখাবারের পয়সা হইতে জরিমানা করেন, ও কেরাণীরা মুখ ভেঙচায়।



এ পর্য্যন্তও সহ্য হয়, কিন্তু ইহার ভিতরে একটা মস্ত ফাঁকি আছে, সেটা প্রায় অসহ্য। ছাত্রেরা দিনের পর দিন পলিটিকাল ইকনমি শাস্ত্রে লেকচার শুনিতেছে, কিন্তু পলিটিকাল ইকনমির সমুদয় সিদ্ধান্ত যদি মিথ্যা হয়, তাহাতে তাহাদের কিছুমাত্র ক্ষোভের হেতু নাই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া লাবরেটারিতে দাঁড়াইয়া তাহারা কষ্টিক লোশন মধ্যে রূপার আবিষ্কার করিতেছে, কিন্তু রূপা না থাকিয়া যদি সীসা থাকিত, তাহাতে তাহাদের কিছু মাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হইত না; পৃথিবীর অভ্যন্তরে চুম্বক আছে কি না এই লইয়া তাহারা অনেক বিচারবিতর্ক মুখস্থ করিতেছে; কিন্তু ভূকেন্দ্রে চুম্বক না থাকিয়া একটা ভল্লুক থাকিলেও তাহারা কিছুমাত্র বিস্মিত হইত না। তাহারা চায় কেবল এক খানা ডিপ্লোমা—যাহার বলে ভবিষ্যতে মুন্সেফী বা কেরাণিত্ব ঘটিবে, যেখানে চুম্বক বা ভল্লুক উভয়েরই সমান মর্য্যাদা; নিতান্তই দায়ে পড়িয়া তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিহিত পোলিটিকাল ইকনমির লেকচার শোনার অত্যাচার সহ্য করিতেছে।

অথচ এই শূন্যগর্ভ ফক্কিকা এবং হৃদয়-হীন দোকানদারি আশ্রয় করিয়া আমাদের শিক্ষাযন্ত্র বিকট শব্দ করিয়া অহরহ ঘূর্ণিত হইতেছে।

এই আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীর পার্শ্বে দেশের পুরাতন শিক্ষাপ্রণালীর আলোচনা করা যাইতে পারে। চতুষ্পাঠীতে যে সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার সহিত আধুনিক বিদ্যামন্দিরে দত্ত শিক্ষার বিষয়ের তুলনা করা আবশ্যক নাই। শিক্ষার বিষয় লইয়া এখানে আলোচনা হইতেছে না, শিক্ষার প্রণালী লইয়া আলোচনা।

টোলের প্রণালীর মুখ্য লক্ষণ এই যে, ইহার ভিত্তিতে ফাঁকি নাই। কেন না এই বিদ্যা গোঁড়াতেই অর্থকরী বিদ্যা নহে। যাঁহারা এই বিদ্যালাভে উৎসুক, তাঁহাদের অর্থলাভের প্রলোভন নাই। টোলের বিদ্যায় হাকিমি বা দারোগা গিরি বা কেরাণীগিরি জুটিবার সম্ভাবনা নাই। কালেজে যে কেমিষ্ট্রী পড়ে, আদালতের নাজির হইবার তাহার অধিকার জন্মে; কিন্তু মুগ্ধবোধ বা অমরকোষ সটীক কণ্ঠস্থ থাকিলেও পেয়াদার চাপরাস পাইবারও অধিকার জন্মে না। টুলো ছাত্রের যে অর্থাসক্তি নাই এমন নহে, তাহারও জীবিকার প্রয়োজন আছে, কিন্তু ভবিষ্যতে টোল খোলা ভিন্ন তাহার অন্য দুরাকাঙ্ক্ষা থাকে না, এবং টোল খুলিয়া সময়ে সময়ে শ্রাদ্ধের বিদায় ও বড়লোকের বাড়ী কিঞ্চিৎ বৃত্তি ভিন্ন লাভের আশা নাই, তার জন্য আবার সারাবৎসর কতকগুলি ছাত্র পুষিতে

হয়। কাজেই টোলের যে ছাত্র অমরকোষ মুখস্থ করিতেছে, সে সেই অমর কোষেরই খাতিরে; যে স্মৃতির ব্যবস্থা কণ্ঠস্থ করিতেছে, ব্যবস্থাপত্র দিয়া কিঞ্চিৎ অর্থাগমের সম্ভাবনা থাকিলেও মোটের উপর সে স্মার্ত্ত বলিয়া নাম জাহির করিতে চাহে, সেই প্রলোভনে। যে যে শাস্ত্র শিখিতে আসিয়াছে, সে সেই শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া কিঞ্চিৎ খ্যাতিলাভ করিবে, সেই প্রত্যাশায়।

জন্মস্থান হইতে পঁচিশ ক্রোশ দূরে অধ্যাপক আবিষ্কার করিয়া যে ছাত্র তাঁহার নিকট ন্যায়ের ফাঁকি শিখিতে যায়, সে নিতান্ত স্বেচ্ছাক্রমেই যায়—কেহ তাহাকে জোর করিয়া পাঠায় না, কেহ তাহাকে স্কলার্সিপের প্রলোভন দিয়া ডাকেও না। সে নিতান্তই ন্যায়ের ফাঁকি শিখিতেই যায়—অন্য কোন ফাঁকি দিতে বা শিখিতে যায় না। এখানে উভয় পক্ষে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে। তাহার যতটুকু ক্ষমতা আছে, তাহার সাহায্যে যতটুকু পারে তাহা শিখিবার জন্য যায়, এবং অধ্যাপক যখন তাহাকে গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার যতটুকু বিদ্যা আছে, তাহা দানের জন্যই গ্রহণ করেন। উভয়ের সম্পর্ক এইরূপে স্থাপিত হয়, কিন্তু সেই সম্পর্কে উভয় পক্ষে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য থাকে, কোনরূপ আইনকানুনের বাধ্য বাধকতা থাকে না; প্রতিনিধি দ্বারা হাজিরা বহিতে হাজিরা লিখাইবার দরকারই হয় না। ছাত্র যাহা পড়িতে চায়, তাহাই পড়ে; শিক্ষক যাহা পড়াইতে পারেন, তাহাই পড়ান। কোথাও কোন দরোয়ান থাকে না, কেরাণী থাকে না, রেজিষ্টারির খাতা পাবে না, জরিমানা থাকে না, লেকচারের ঘণ্টা পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ থাকে না। অথচ শিক্ষকের সহিত ছাত্রের যে প্রীতিবন্ধন না থাকিলে শিক্ষামাত্রই অপশিক্ষায় পরিণত হয়, তাহা বর্ত্তমান থাকে। ছাত্রকে বেতন দিতে হয় না, হোষ্টেল ভাড়া ও বোর্ডিং খরচাও দিতে হয় না; উপরন্তু শিক্ষকের গৃহে বাস করিয়া, শিক্ষকের অন্নে পালিত হইয়া শিক্ষকের পরিবারভুক্ত হইয়া থাকিতে পারে। তৎপরিবর্ত্তে ছাত্র শিক্ষকের কাঠ চেলায়, ভাত রাঁধে, তলপী বহে, এবং—এবং—বসুন্ধরে, তুমি বিদীর্ণ হও—সময়ে অসময়ে অধ্যাপকের ফাটা পায়ে তেল মালিস করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই সকল গর্হিত ভদ্রানুচিত কর্ম্মে ঘৃণা বোধ না করিয়া শ্লাঘা বোধ করাই সেখানে রীতি।

এই যে বিনা বেতনে বিদ্যাদান—যাহা ভারতবর্ষের চির দিনের অভ্যস্ত—বৈদেশিকেরা এই ব্যাপারের পূর্ণ মাহাত্ম্য কিছুতেই বুঝিতে পারেন না। তাঁহাদের ধাতুর সহিত ইহা মিলিবে না। আধুনিক পাশ্চাত্য নিয়ম হইতেছে লেনা-দেনার



ব্যাপার,—তুমি যখন আমার নিকট উপকার পাইতেছ তখন তাহার মূল্য আমাকে দিবেনা কেন? এক পক্ষে দান, অন্য পক্ষে প্রতিদান, একালের হিসাবে এই ব্যবস্থাই স্বাভাবিক। ইহার বিপরীত ব্যবস্থা—অর্থাৎ এক পক্ষে দান, অন্যপক্ষে গ্রহণ মাত্র—ইহা অস্বাভাবিক—এই ব্যবস্থার ভিত্তির উপর কোনরূপ সামাজিক অনুষ্ঠান স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। এই ব্যবস্থার পক্ষে বলিবার আছে। যাহা গ্রহণ করিব, তাহা মূল্য দিয়া লইব, কাহারও অনুগ্রহের উপর লইব না, সর্ব্ববিধ স্বাতন্ত্র্যের এই মূল ভিত্তি। এইরূপ পরমুখাপেক্ষিতা পরানুগ্রহে নির্ভর ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের অনুকূল হইতে পারে না, এবং শেষ পর্য্যন্ত সামাজিক স্বার্থেরও প্রতিকূল হয়। ইহাই পাশ্চাত্য সমাজের নীতি, এবং এক হিসাবে ইহা সন্নীতি সন্দেহ নাই। এই নীতি মানিয়া লইলে আপনা হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয়, যে দানধর্ম্ম সর্ব্বত্র ধর্ম্ম নহে। বিখ্যাত দার্শনিক হার্বট স্পেন্সার—যিনি ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী ছিলেন তিনি আপন গবর্ণমেণ্টের নিকট ও দান গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন না। রাষ্ট্রের স্বার্থ যখন প্রজার স্বার্থ হইতে অভিন্ন, তখন প্রজামাত্রকেই সরকারি ব্যয়ে বিদ্যাদান করিয়া রাষ্ট্রহিতে সমর্থ করিয়া তুলিতে পারিলে রাষ্ট্রেরই লাভ; অতএব রাষ্ট্রের ব্যয়ে প্রজা-মাত্রেরই বিদ্যাশিক্ষা ব্যবস্থা উচিত,—এই নীতি আজকাল পাশ্চাত্য দেশে গৃহীত হইতেছে বটে, কিন্তু স্পেন্সারের মত পণ্ডিতগণের ইহাতেও ঘোর আপত্তি। যে বিদ্যালাভ করিতে চায়, সে বিদ্যালাভের ব্যয় বহন করুক; রাষ্ট্রের অর্থ—যাহা তাহার নিজস্ব অর্থ নহে, যাহা প্রজাসাধারণের অর্থ—তাহাতে ভাগ বসাইবার তাহার অধিকার নাই। পরের ছেলেকে লেখা পড়া শেখাইবার জন্য অন্য পাঁচজনে ত্যাগস্বীকার করিবে, এরূপ ব্যবস্থা অনুচিত; ইহা অস্বাভাবিক। এইরূপে স্বাতন্ত্র্যের ব্যাঘাত জন্মাইয়া পরতন্ত্রতার প্রশ্রয় দিলে শেষ পর্য্যন্ত রাষ্ট্রেরই—সমাজেরই—স্বার্থহানি অবশ্যম্ভাবী। বলা উচিত, স্বাতন্ত্র্যানুকূল বিনিময় ব্যাপারে অভ্যস্ত হইয়াও স্বাতন্ত্র্যবাদের এই চরম পরিণতি আধুনিক স্বাতন্ত্র্যবাদী ইউরোপও পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

সে যাহাই হউক, যে লাভ চায়, সে তাহার মূল্য দিবে, এই নীতি স্থূলতঃ পাশ্চাত্য সমাজ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের নীতি ইহার বিপরীত। এই নীতির অনুষ্ঠানে যে লেনা-দেনা বিনিময় দোকানদারির ভাব আসে, তাহা ভারতবর্ষের ধাতুর সহিত মিলে না। ভারতবর্ষীয় নীতির সমর্থন

করিবার এ স্থান নহে। সে সময় বা সে প্রবৃত্তি আমার নাই ; কিন্তু ভারতবর্ষ এই দোকানদারিতে চিরকাল কুণ্ঠিত ; ভারতবর্ষের ইহাই স্বভাব। ভালই হউক, আর মন্দই হউক, ভারতবর্ষের সমাজতত্ত্বের ইহা একটা মূল সূত্র। ইহা মানিয়া না লইলে ভারতবর্ষের অনেক সামাজিক প্রথার তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। সমাজের মধ্যে বণিগ্‌বৃত্তির অস্তিত্ব থাকিবেই ; সকল সমাজেই থাকিবে। ভারতবর্ষের সমাজেও ইহা আছে ; কিন্তু ভারতবর্ষ এই বণিগ্‌বৃত্তির প্রতি পক্ষপাত দেখাইতে সঙ্কুচিত। এ দেশে ধনীর গৃহে কোন উৎসব সমারোহের অনুষ্ঠান হইলে সেখানে ইতর সাধারণের জন্য দ্বার অবারিত থাকে, কাহাকেও দ্বারদেশে টিকিট দেখাইতে হয় না—পাড়ার লোকে চাঁদা করিয়া বারোয়ারির যাত্রা দিলেও সেখানে টিকিটের ব্যবস্থা হয় না। এদেশে মেলা বসিলে দর্শনী দিয়া তাহা দেখিতে হয় না। গৃহস্থের বাড়ী ভোজ হইলে অনাহূত ও রবাহূত সমান আদরে আহূতগণের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজনে বসে। এদেশে যে বস্তু যত আদরের, সেই বস্তুর দানে ততই গৌরব এবং সেই বস্তুর জন্য মূল্য প্রার্থনা ততই অগৌরবের বিষয়।

একটা দৃষ্টান্তে বুঝা যাইবে। এদেশের শাস্ত্রে চিকিৎসা ব্যবসায়ের প্রতি কিছু অবজ্ঞা প্রকাশ আছে ; সমাজের শীর্ষে অবস্থিত ব্রাহ্মণ চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিতে এদেশে সাহসী হন নাই। শাস্ত্রকে নিন্দা করিবার এখানে একটা প্রচুর অবসর হইয়াছে। সেদিন এক মাসিক পত্রিকায় এজন্য হিন্দু-সমাজের নিন্দাও দেখিলাম। ব্যাধিতের ব্যাধি মোচন—মনুষ্যের প্রাণদান, যে ব্যবসায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য—সেই ব্যবসায়ের অবজ্ঞা—ইহাই যে দেশে ব্যবস্থা, সে দেশের কল্যাণ কিসে ? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে—যেহেতু মনুষ্যের প্রাণদানের ন্যায় মহৎ দান আর হইতে পারে না—ব্যাধিতের ব্যাধি মোচনের ন্যায় মহৎ কার্য্য আর কিছু হইতে পারে না—ঠিক্ সেই হেতু এই মহৎ দানকে জীবিকার্জ্জনে বিনিয়োগ ভারতবর্ষকে ভাল লাগে না। মনুষ্যের প্রাণদানকে যিনি ব্যবসায় করিয়াছেন—যিনি উহাকে জীবিকার্জ্জনের উপায় করিয়া লইয়াছেন,—তিনি জীবিকার জন্য প্রাণদানের বিনিময়ে তুচ্ছ অর্থ গ্রহণে বাধ্য হন, ভারতবর্ষের ধাতুর সহিত ইহা সম্পূর্ণ মিলে না। অথচ ব্যবসায়ী চিকিৎসক না থাকিলে কোন সমাজই চলে না—তিনি থাকুন—কিন্তু ভারতবর্ষ তাঁহাকে ষোল আনা সম্মান দিতে অসমর্থ।

জ্যোতির্ব্বিদ্যার মত মহতী বিদ্যাকেও যাঁহারা জীবিকার উপায় করিয়াছেন,



তাঁহাদিগকেও ঠিক্ এই কারণে ভারতবর্ষ সমুচিত সম্মান দিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন। অর্থ বিনিময়ে প্রাণদানের ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠায় ভারতবর্ষ অগত্যা সম্মত হইয়াছেন কিন্তু অর্থ বিনিময়ে বিদ্যাদানের ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠায় ভারতবর্ষ আদৌ সম্মত হইতে পারেন নাই। কেননা, ভারতবর্ষের হিসাবে প্রাণের অপেক্ষা বিদ্যার গৌরব অধিক।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস যাহা আছে, তাহার আলোচনাতে ইহাই দেখা যায়। ভারতবর্ষের প্রাচীন সমাজে বেদ ও বিদ্যা সমার্থক ছিল, তৎকালে যে বিদ্যা ছিল তাহার সমষ্টির নামই বেদ। এই বেদকে বেদপন্থী সমাজ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলিয়া ভাবিতেন—বেদ শব্দরাশি এবং শব্দই ব্রহ্ম। তিনি বলেন, শব্দ ব্রহ্ম স্বরূপ, ইহা অনাদি—ব্যক্ত চরাচরের পূর্ব্বেই ইহা বিদ্যমান ছিল—এই শব্দ হইতেই—এই বেদ হইতেই চরাচরের অভিব্যক্তি হইয়াছে। বেদ অপৌরুষের, কোন পুরুষে ইহার প্রণয়ন বা রচনা করেন নাই—স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা, যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা হইলেও পুরুষমাত্র, তিনিও ইহার সৃষ্টি করিতে সমর্থ নহেন। এই অনাদি বাণী তাঁহার বদন হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল মাত্র—আর যাঁহারা ভাগ্যবান্, যাঁহারা ক্ষমতাবান্, যাঁহাদের দেখিবার শক্তি ছিল, তাঁহারা সেই বিধাতৃমুখনির্গত মূর্ত্তিমতী বাণী দেখিয়াছিলেন মাত্র, যাঁহাদের শুনিবার শক্তি ছিল, তাঁহারা তাহা শুনিয়াছিলেন মাত্র। তাঁহারা ঋষি, তাঁহারা দ্রষ্টা—তাঁহারা যাহা দেখিয়াছেন, তাহাই ইতর সাধারণকে বলিয়াছেন, অতএব তাঁহারা প্রবক্তা মাত্র। ইহা একবারে কবিকল্পনা নহে, ইহার মধ্যে বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত আছে। হালের ভাষায় দৃষ্টান্ত সহকারে এইরূপে সর্ব্বসাধারণকে বুঝান যাইতে পারে। ধর, উইলিয়াম সেকসপীয়ার নামক কবি ম্যাকবেথ নামক কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন—লোকে জানে ম্যাকবেথ কাব্যের রচনাকারী উইলিয়াম্ সেক্সপীয়ার। এই ম্যাকবেথ লোকটা বড় মন্দ ছিল না, তোমার আমার মত ভদ্রলোক সাজিয়া সে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিত। কিন্তু তাহার চিত্ত দুর্ব্বল ছিল এবং সেই দৌর্ব্বল্যের ছল পাইয়া মনুষ্যের প্রবল শত্রু শয়তান তাহার উপর অধিকার স্থাপন করিল। সংসারের পথ পিচ্ছিল; যেখানে পিচ্ছিলতা একটু অধিক,সেইখানেই উহাকে এক একটা ধাক্কা দিয়া ক্রমে তাহাকে এমন পঙ্কে ডুবিয়াছিল যেখান হইতে হতভাগ্যের আর উদ্ধারের আশা থাকিল না। মনুষ্যের আদি দম্পতী যেদিন ধরাধামে বিচরণ আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতেই শয়তানের এই শয়তানী আরম্ভ,ইহা হইতেই সংসারে পাপ ও মৃত্যু।

বস্তুতঃ সংসারে এই পাপপুণ্যের অধিকার আরম্ভ মনুষ্যের আবির্ভাবের সময় হইতে হইয়াছে বলিলে সত্যকে অকারণে সঙ্কীর্ণ করা হয়। যে মায়া হইতে এই বিশ্বজগতের অভিব্যক্তি, যে মায়ার নাম অবিদ্যা বা অজ্ঞান, মানবের অন্তর্দেহে প্রভুত্ব-প্রার্থী এই পাপপুরুষ, তাহারই মূর্ত্তিভেদ মাত্র। মানবের উপর তাহার এই দৌরাত্ম্য, বর্ত্তমান জগৎ-প্রণালীরই একটা অঙ্গ মাত্র। এই যে সত্য, ইহা চিরন্তন সত্য, ইহা অনাদি সত্য, ইহা চিরকাল আছে, ইহার একটা দিক্ মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া সেক্সপিয়ারের সমীপে প্রতিভাত হইয়াছিল, ইহা শব্দরূপে ছন্দোবদ্ধ বাক্যরূপে তাঁহার কর্ণে ধ্বনিত হইয়াছিল, কাজেই সেকালের ভাষায় বলিতে পারি সেক্সপীয়ার কেবল কবি নহেন, তিনি এই ছন্দোময় বাক্যের দ্রষ্টা,—তিনি ঋষি।

অথবা ধর—সার আইজাক নিউটন, আপেল ফল চিরদিনই ভূকেন্দ্রের অভিমুখে পতনোন্মুখ—চন্দ্র যেমন ভূকেন্দ্রের মুখে পতনোন্মুখ—গ্রহগণ যেমন সূর্য্যের মুখে পতনোন্মুখ সেইরূপ পতনোন্মুখ;—এই পতনোন্মুখতা চিরদিনই আছে। নীহারিকা অথবা উল্কামালা জমাট বাঁধিয়া সৌরজগৎ অথবা তদ্বিধ নানা জগৎকে অভিব্যক্ত করিয়াছে—তাহার প্রত্যেক কণিকাতে এই পতনোন্মুখতা বর্ত্তমান ছিল—কবে হইতে বর্ত্তমান ছিল, তাহা কে জানে? ইহা সনাতন সত্য—প্রত্যেক মনুষ্যের চোখের সামনে এই সত্য উপস্থিত ছিল। সকলের সাধনা সমান নহে, ইতর মনুষ্য চক্ষুঃ সত্ত্বে অন্ধ! নিউটন চক্ষুষ্মান্ ছিলেন—তাঁহার সমীপে এই অশরীরী সত্য মূর্ত্তিগ্রহণ করিয়া দেখা দিল, তাঁহার কর্ণে ইহা ধ্বনিত হইল—তিনি যাহা দেখিলেন এবং শুনিলেন, ইতর সাধারণকে তাহা জানাইলেন। মাধ্যাকর্ষণ ঘটিত মন্ত্রের তিনি ঋষি।

যাক্, প্রাচীন বেদপন্থী আর্য্যসমাজে আবহমান কাল হইতে যে বিদ্যা পুঞ্জীভূত হইয়া সনাতন বাণী বলিয়া গৃহীত হইত, তাহার রক্ষাকর্ম্ম প্রত্যেক সামাজিকের অবশ্য প্রতিপাল্য ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইত। এখানে কোন রূপ বিচার বিতর্ক, কোন সুবিধা অসুবিধা বিবেচনার অবসর মাত্র ছিল না। কোনরূপ ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রশ্ন উঠিবারই অবসর ছিল না। বিদ্যালাভের উদ্দেশ্য কি, ইহার উদ্দেশ্য স্বার্থসাধন কি পরার্থসাধন, ইহার উদ্দেশ্য চরিত্র গঠন জীবন সংগ্রামে সামর্থ্যলাভ বা রাষ্ট্রীয় বলবিধান, এই সকল প্রশ্ন উঠিবার কোনই অবসর ছিল না। প্রত্যেক সামাজিককে এই বিদ্যা গ্রহণ করিতেই হইবে, নতুবা তাহার মানবজন্ম সম্পূর্ণ হইবে না বা সার্থক হইবে না।



এই বিদ্যা যে গ্রহণ করে, তাহার দ্বিতীয় জন্ম হয়; এই দ্বিতীয় জন্ম গৌরবে প্রাকৃতিক জন্মের হীন নহে।

একালে যাহাকে নিম্ন শিক্ষা বলে, জীবনসংগ্রামে কিঞ্চিৎ সামর্থ্য লাভের জন্য তাহা প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে অত্যাবশ্যক। অনেক দেশে রাজদণ্ড প্রয়োগে ইহা প্রত্যেক ব্যক্তিকে গ্রহণ করাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে; এ দেশেও কথাটার কল্পনা জল্পনা হইতেছে। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে বাধ্য করিবার কল্পনা কোন দেশেই হয় নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষে যাহা উচ্চতম শিক্ষা বলিয়া গৃহীত হইত, তাহা গ্রহণ করিতে প্রত্যেকেই বাধ্য ছিল, কিন্তু এই বাধ্যতা স্থাপনের জন্য কোনরূপ রাজব্যবস্থার, কোনরূপ রাজদণ্ড প্রয়োগের প্রয়োজন হয় নাই। এই ব্যবস্থাকে যন্ত্রবদ্ধ করিবার কোন প্রয়োজন হয় নাই। যথাকালে আচার্য্যের নিকট উপনীত হইয়া ব্রহ্ম-চর্য্য করিতেই হইবে, ইহা সকলেই যেন এক বাক্যে মানিয়া লইয়াছিল। সনাতনী বাণী, সমুদায় সমাজতন্ত্র যাঁহার প্রভুত্বের অধীন, তাঁহাকে যথাশক্তি রক্ষা করিতেই হইবে, নতুবা প্রত্যবায় হইবে, ইহা প্রত্যেক সামাজিক নির্ব্বিবাদে বিনা বিচারে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। এ বিষয়ে দ্বিজাতি মাত্রেরই—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রত্যেক বর্ণেরই অর্থাৎ তাৎকালিক আর্য্য-সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিরই সমান অধিকার—সে বিষয় কোনরূপ মতদ্বৈধ ছিল না।

কেননা ইহা একটা ঋণ, মনুষ্য ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র এই ঋণের বোঝা মাথায় লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। মানুষের নানা ঋণ আছে। দেবতাগণের নিকট ঋণ আছে; মনুষ্যের শুভাশুভ, অথবা শুভাশুভের যে অংশ আপনার আয়ত্ত নহে, দেবতারা তাহার নিয়ন্তৃত্ব করেন, অতএব দেবতাগণের নিকট ঋণ আছে। পিতৃগণের নিকট ঋণ আছে, কেননা মানুষের যাহা লইয়া মনুষ্যত্ব, তাহা পিতৃপুণ্যে অর্জ্জিত, পিতৃপুরুষ পরম্পরার নিকট হইতে তাহা সে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব পিতৃগণের নিকট ঋণ আছে। মনুষ্যগণের নিকট ঋণ আছে, কেন না মনুষ্য যখন সমাজবদ্ধ, যখন একের হাত ধরিয়া অন্যকে চলিতে হয়, তখন প্রত্যেক মনুষ্য অপর মনুষ্যের ঋণী। যাবতীয় ভূতগণের নিকট ঋণ আছে, কেননা পশুপক্ষী তরুলতা, নদীপর্ব্বত, সকলেই মানবজীবনের কল্যাণে কিছু না কিছু আনুকূল্য করে। কিন্তু সকল ঋণের উপর ঋষিগণের নিকট ঋণ; কেননা যে সত্যের উপর বিশ্বজগৎ প্রতিষ্ঠিত, যে সত্যের বলে বিশ্বজগৎ চলিতেছে, সেই সত্যের মূর্ত্তি তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন,

সেই সত্যকে তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছেন, সেই সত্যকে তাঁহারা সনাতনী বাণী দ্বারা প্রকাশ ও প্রচার করিয়াছেন ; সেই সনাতনী বাণী মনুষ্যের নিকট অভয় ঘোষণা করিতেছে, সেই বাণী মর্ত্ত্য জগতে অমরত্বের ভরসা আনিতেছে ; আর সমুদয় তুচ্ছ—সেই বাণীই পরম পদার্থ। সেই বাণীকে পূজা করিতেই হইবে। ঋষিগণ মুক্ত হস্তে যে অভয়বাণী বিতরণ করিয়া গিয়াছেন, তাহাকে অঞ্জলি পাতিয়া গ্রহণ করিতেই হইবে। এই ঋষিগণের নিকট এই কারণে সকলেই ঋণী। এই ঋণমোচনে সকলের সমান অধিকার, এই ঋণ মোচনের অবসর পাইলে মানবজীবন ধন্য হয়, পূর্ণ হয়—ইহাতে বিচার বিতর্কের অবসর নাই। মাথা পাতিয়া এই ঋণ গ্রহণ করিয়া জীবনকে ধন্য করিতে হইবেই। ঋষিগণ অন্য প্রতিদান চাহেন না, তাঁহারা চাহেন, এই যে তাঁহাদের দত্ত দান সাদরে গৃহীত হউক, রক্ষিত হউক, পূজিত হউক।

এই ঋণ মোচনের অধিকার দ্বিজাতিসমাজে প্রত্যেকেই অকুণ্ঠিত ভাবে অঙ্গীকার করিয়াছেন, যথাকালে আচার্য্যগৃহে উপনীত হইয়া যথাশক্তি ব্রহ্মচর্য্য পালন করিলে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের অধিকার জন্মিত। গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়াও যাবজ্জীবন ব্রহ্ম অভ্যাস করিতে হইত—কেননা ব্রহ্ম অভ্যাস মহাযজ্ঞ, এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য—ইহার অনুষ্ঠানে কোন স্বার্থ-সিদ্ধির আশা নাই, ইহার অকরণে প্রত্যবায় আছে। অতএব যে আর্য্যসমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রহ্মাভ্যাসে অধিকার লাভ করিয়াছে, তাহাকে যাবজ্জীবন—এই যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হইত। গৃহীর অনুষ্ঠেয় সর্ব্ব মহাযজ্ঞের মধ্যে এই যজ্ঞের স্থান সকলের উপর। দেবোদ্দেশে দ্রব্য ত্যাগের নাম যজ্ঞ। এই যজ্ঞের দেবতা সত্য ; এই যজ্ঞের দেবতা ব্রহ্ম। গৃহস্থের জীবন এখানে সেই দ্রব্য, ফলকামনা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া যাহা সেই দেবতার উদ্দেশে অর্পণ করিতে হইবে। ইহাতে কোনরূপ স্বাতন্ত্র্য পারতন্ত্র্যের কথা উঠে না। ইহাতে কি লাভ হইবে তাহা জানার প্রয়োজন নাই। ব্যক্তিগত হিত হইবে, বা রাষ্ট্রগত হিত হইবে, সে বিতর্কের কোন প্রয়োজন নাই। জীবন সংগ্রামে জয় হইবে বা পরাজয় হইবে, সে তুচ্ছ কথার আলোচনার কোন প্রয়োজন নাই।

ভারতবর্ষের প্রাচীন সমাজে বিদ্যাদান সম্বন্ধে এই থিওরি উদ্ভাবিত ও ঐকমত্যে স্বীকৃত হইয়াছিল এবং এই থিওরি কার্য্যক্ষেত্রে পরিণত করিবার জন্য কোনরূপ বিশেষ আয়োজন উদ্যোগ করিতে হয় নাই। কোন ইস্কুল কালেজ—মায় সেক্রেটারি, দারোয়ান, দপ্তরী আপিস, খাতা,—কোন যন্ত্র-প্রতিষ্ঠার



আবশ্যকতা উপলব্ধ হয় নাই। ভারতবর্ষের ভূমিতে যেমন যথাকালে তৃণগুল্ম উৎপন্ন হইত, তেমনি বিদ্যান্বেষী যথাকালে বিদ্যাদাতার নিকট উপস্থিত হইয়া বিদ্যাগ্রহণ করিত ; কখনও বিদ্যান্বেষীরও অভাব হয় নাই, বিদ্যাদাতারও কখনও অভাব হয় নাই। সর্ব্বসাধারণের পক্ষে এই নিয়ম ছিল। আর যিনি বিশেষতঃ জ্ঞান-পিপাসু—তিনি আপনার পিপাসার তৃপ্তির জন্য, কোন্ গোমুখী হইতে জাহ্নবী ধারা নিঃসৃত হইতেছে, তাহা অন্বেষণ করিয়া লইতেন, এবং বিনীত ভাবে বিনীত বেশে সমিৎ হস্তে বাঞ্ছাকল্পতরু আচার্য্যের সমীপস্থ হইয়া জ্ঞান পিপাসা মিটাইয়া লইতেন।

যন্ত্রবদ্ধ প্রণালীতে বিদ্যাদান প্রণালী ভারতবর্ষে যে একবারে অপরিচিত তাহা নহে। দেশে যখন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবলতা হইয়াছিল, সেই সময়ে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী-গণের বিহারে ও সঙ্ঘারামে সহস্র সহস্র বিদ্যার্থী বিদ্যালাভার্থ সমবেত হইত। এই সকল বিহারের ও সঙ্ঘারামের প্রতিষ্ঠার্থ কোটিপতি আপনার অর্থকোষ উন্মুক্ত করিয়া দিতেন, রাজা আপনার রাজ্যের অংশ ছাড়িয়া দিতেন, গৃহস্থ আপনার সর্ব্বস্ব দান করিতেন। নানা দিগ্দেশ হইতে বিদ্যার্থী সেখানে সমাগত হইত, কাব্যকলা মুখরিত হইত, বিচার বিতণ্ডার ফোয়ারা ছুটিত, বুদ্ধির সহিত বুদ্ধির ঘাত-প্রতিঘাতে জ্ঞানাগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ ছুটিত। স্থাপত্য বিদ্যা ও ভাস্কর্য্য বিদ্যা সৌধে অট্টালিকায় প্রাচীরে বাতায়নে গৃহদ্বারে আপনার সমস্ত ঐশ্বর্য্য উদ্ঘাটিত করিত। শিক্ষক পরীক্ষক পরিদর্শক, এমন কি প্রহরী দপ্তরী কিছুরই অভাব ছিল না

কিন্তু ভারতবর্ষের মৃত্তিকায় এই যন্ত্রবদ্ধ শিক্ষাপ্রণালী স্থায়ী হয় নাই। ইহা ভারতবর্ষের সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু ভারতবর্ষের ধাতুর সহিত বোধ করি ইহার সামঞ্জস্য হয় নাই ; ইহার মধ্যে যে কৃত্রিমতা ছিল, তাহা বোধ করি ভারতবর্ষের ধাতুর সহিত মিশিতে পারে নাই। অথবা ইহার অভ্যন্তরে সেই প্রাণ শক্তির অভাব ছিল, যাহা সত্য হইতে বল সঞ্চয় করে, সত্যের উপরে তাহার প্রতিষ্ঠা।

আধুনিক চতুষ্পাঠীর শিক্ষাপ্রণালীকে আমি সেই প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালীর জীর্ণ শীর্ণ রুগ্ন ভগ্ন বিকলাঙ্গ সন্ততিস্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করি। ইহাতে একটা বৃহৎ আদর্শের ছায়া দেখিতে পাই। ইহাতে একটা প্রাচীন মহৎ আদর্শের জীর্ণ পরিণাম দেখিতে পাই ; ইহার দোষ অনুসন্ধান করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যে আদর্শের ইহা ধ্বংসাবশেষ মাত্র, সেই আদর্শ

আমার চক্ষুতে অত্যন্ত মহীয়ান্ ; আমার চিত্তপটে সেই আদর্শের ছায়াপাত মাত্রে আমি আত্মসংবরণে অসমর্থ হই। বর্ত্তমান কালের আদর্শকে তাহার পার্শ্বে উপস্থিত করিতে আমার কুণ্ঠা ও লজ্জা বোধ হয়। বর্ত্তমানকালে যে প্রাচীন আদর্শের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে, তাহাতে পুনরায় সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চার করা সম্ভবপর কি না তাহা জানি না। হয়ত একালের প্রবর্ত্তিত ও অনুমোদিত যন্ত্রবদ্ধ প্রণালীই একালের উপযোগী, কিন্তু এই প্রণালী যতদিন যন্ত্রমাত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে, যতদিন ইহার অভ্যন্তরে হৃদয়ের স্পন্দন অনুভূত না হইবে ; ততদিন কেবল অট্টালিকা এবং লাইব্রেরি ও লাবরেটারির ঐশ্বর্য্য বাড়াইয়া জাতীয় জীবনের অভিব্যক্তিতে অধিক ফল পাওয়া যাইবে, সে বিষয়ে আমার সংশয় আছে। অট্টালিকা এবং লাইব্রেরি ও লাবরেটারি অর্থ-সাপেক্ষ ; অর্থ থাকিলে ঐ সকল সম্পত্তি বাজারে কিনিতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু প্রকৃত প্রাণ-শক্তি, যাহার বলে দেহমধ্যে অঙ্গের সহিত অঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত হয়, যাহাতে স্পন্দমান হৃৎপিণ্ডের শোণিত ধারা সর্ব্বশরীরে সঞ্চালিত করিয়া দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে সজীব ও সুন্দর রাখে, তাহা অর্থের বিনিময়ে পাওয়া যায় না। আইনের বলেও তাহার সৃষ্টি হয় না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি, শিক্ষাপ্রণালীই এই প্রবন্ধের আলোচ্য, শিক্ষার বিষয় লইয়া কোন কথা উত্থাপন অপ্রাসঙ্গিক। সহস্র বা চতুঃসহস্র বৎসর পূর্ব্বে মনুষ্যের জ্ঞানের পরিসর যতদূর বিস্তৃত ছিল, বর্ত্তমান কালের পরিসরের সহিত উহার তুলনা হয় না। মানবজাতির সৌভাগ্যবলে মানবেতিহাসে ঋষির অভাব কোন যুগেই ঘটে নাই। পুরাতন ঋষিগণের আবিষ্কৃত বিদ্যার সহিত আধুনিক ঋষিগণের আবিষ্কৃত বিদ্যার সংযোগ হইয়াছে। জ্ঞানের প্রবাহ এখন শতমুখে সহস্রমুখে ধাবিত হইতেছে ; শতমুখী জাহ্নবীর প্রবাহের ন্যায় এই জ্ঞানের প্রবাহ মানবের মনোভূমিকে আর্দ্র সিক্ত ও উর্ব্বর করিতেছে। শিক্ষাদানের যে প্রণালীই অবলম্বিত হউক না, এই জ্ঞানতরঙ্গিণীর এই সহস্র ধারাকে তাহার অনুকূল করিয়া লইতে হইবে। এই বিষয়ে কাহারও কোন মতদ্বৈধ হইতে পারে না। তবে কোন্ প্রণালী অবলম্বিত হইলে দেশ কাল পাত্র বিবেচনায়, জাতিগত বৈশিষ্ট্য বিবেচনায়, সম্যক্ ফল পাওয়া যাইতে পারিবে, অস্মদ্দেশে সুধীগণের ও মনীষিগণের পক্ষে এক্ষণে তাহাই বিচার্য্য।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

---



# মাঝি। *

( ১ )

এহ দিন সন্ধ্যার ক্ষণপূর্ব্বে কাঁসাইয়ের খেয়াঘাটে স্বেদসিক্ত কলেবরে আসিয়া দেখি, ঘাটে পান্সী নাই। পরপারের যাত্রীরা আকাশে মেঘ দেখিয়া বুঝি আলো থাকিতে থাকিতে পাড়ি দিয়াছে। খেয়াঘাটের উপরেই একটী সুবৃহৎ বটগাছ, বট্‌গাছটিই পার ঘাটের নিশানা। নদী তীরে ঘন হোগলার বন। বহু দিন হইল এই ঘাটে পার হই নাই। পূর্ব্বে যখন কল্যাণপুরে অবস্থান করিতাম, তখন দুই বেলা এই ঘাটে পারাপার হইতাম—ঘাটে আসিয়া নিতাই বলিয়া ডাকিতে অবসর সহিত না, যেখানেই সে থাক,—নিতাই উত্তর দিত "এই আমি এলাম বলে" তাহার শ্রবণ শক্তি অসম্ভব তীক্ষ্ণ ছিল। হয়ত, কোনো দিন নৌকা—ছাড়িয়া দিয়াছে, নৌকা প্রায় পরপারে পৌঁছায় পৌঁছায় হইয়াছে—আমারা স্বভাবতই দূর হইতে চীৎকার করিতে করিতে আসিতাম "নিতাই পান্সী নিয়ে আয় - বেলা হ'য়ে গিয়েছে"—অমনি উত্তর আসিত—'এই এলাম বলে একটু দাঁড়ান'! এই সঙ্গে সঙ্গে তাহার সেই প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় কুকুর 'বাঘা' চীৎকার করিয়া সাড়া দিত—এইরূপ উত্তর শুনিবার লোভে আমি অনেক দিন নিতাইকে দেখিতে পাইলেও অনর্থক ডাকিতাম।

রাত্রি দিন নিতাই ঘাটে থাকিত। বেচারীর সংসারে কেহ ছিল না। খেয়া দিয়াই সে তার জীবনের খেয়া শেষ করিয়া আসিতেছিল।

গ্রামের ভিতর নিতাইয়ের একটী ভগ্ন কুটীর ছিল ; তাহার সংস্কার হইতে দেখি নাই। তাহাকে সেখানে বড় খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না—সে সংসারের সকল মায়া কাটাইয়া খেয়াঘাটে তার একমাত্র অবলম্বন—সেই জীর্ণ তরণী খানির উপর কুকুরের কণ্ঠ জড়াইয়া পড়িয়া থাকিত। যে যখন আসিত, তখনই তাকে পার করিয়া দেওয়াই তার সুখ ছিল। কেহ যদি বলিত "নিতাই তুই আবার বিয়ে কর্, সংসার কর্, এ রকম করে কয় দিন বাঁচ্‌বি বল্? সে তার বড় বড় গোল গোল সরল চক্ষু দুইটি তাহার মুখের উপর রাখিয়া উত্তর করিত "আর ক দিনই বা বাকী, বিয়ে করে পায়ে শিকল পরে' মিছে কষ্ট পাব! পার করার এমন সুখটী হ'তে বঞ্চিত হব বইত নয়!"

---

* ম্যাক্সওয়েলের কোন গল্প অবলম্বনে লিখিত।

'তোর কি, বাড়ীর মধ্যে থাকতে ইচ্ছে করে না, দিন রাত এই একটানা খাটুনিতে কি তোর বেজার ধরে না—কেবল জলের উপর থাকতে কষ্ট হয় না' ?

নিতাই হাসিতে হাসিতে বলিত ? "কাজ কই দাদা, কজনকেই বা পার করি ? ঘরের মধ্যে চুপ করে পড়ে থাকতে কখন "শিখিনি—মেয়েটা যখন আমাকে ছেড়ে পালায়, তখন তার পোষা বাঘাটাকে আমার কাছে দিয়ে যায়। সেই অবধি বাঘাটা যেন মেয়েটার সব কথা আমাকে মনে করে দেয়। তাই নিয়ে ভুলে আছি। নইলে সব ফেলে এক দিকে চলে যেতাম। ঘরের মধ্যে যদি কোনো দিন গিয়ে পড়ি ত ঘুম হয় না—ভয়, পাছে চাপা পড়ে মরি—ঘরের মধ্যে যেন হাঁপিয়ে উঠি, নৌকার উপর শুয়ে—নির্ভাবনায় ঘুমিয়ে বাঁচি—কোনো ভয় নেই, সব খোলা হাত পা ছড়িয়ে আরাম পাই— শুয়ে শুয়ে দেখি, আকাশে মেঘগুলা কেমন ছুটে ছুটে বেড়ায়, আর মনে হয়, ওরাও বুঝি কোন বড় সাগর-পারে খেয়া দিচ্ছে !'

কেউ যদি বলতো 'নিতাই' তোর ঘরখানা মেরামত কর্—নইলে হয় ত কোন দিন পড়ে যাবে। নিতাই যদিও লেখা পড়া জান্ত না ( তবুও তার জ্ঞান বড় কম ছিল না। ) সে বলত "কার জন্য আর নূতন করে মায়ার গিরো বাঁধব ? আশীর্ব্বাদ কর, দাদারা—যেন এই খেয়া দিতে দিতেই আমার খেয়া শেষ হয়।

নিরক্ষর নিতাই বড় মিষ্টভাষী ছিল। পরিশ্রম করবার জন্যই যেন বেচারী বলিষ্ঠ দেহ ও অক্ষুন্ন স্বাস্থ্য নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেছিল। তার মুখে অসন্তোষের ভাব কোনো দিনই দেখা যাইত না। সদাই হাস্য করিয়া, সকল সময় গান গাহিয়া সে বেশ আনন্দ উপভোগ করিত। নৌকার হালের উপর তার সেই সুদৃঢ় বাহুর ভার দিয়া, দেহ হেলাইয়া যখন সে হাসিতে হাসিতে বলিত "ঠিক হ'য়ে বস, নড়ো চড়ো না" তখন আরোহীদের মনে এই সাবধানতা বেশ একটু ভয়ের সঞ্চার করিয়া আনিত, তাহারা পরস্পর মুখের প্রতি চাহিয়া সুশিক্ষিত সৈনিকের মত নিতাইয়ের আদেশে সংযত হইয়া বসিত। কিন্তু পরক্ষণেই সহসা নিতাই গান ধরিত ; সঙ্গে সঙ্গে তার বাঘা কুকুরটা নাচিতে আরম্ভ করিত—সেই নৃত্যের ভারে নৌকা টলিতে থাকিত ; সকলে আশঙ্কায় আত্মহারা হইয়া সেই পারের কাণ্ডারী নিতাইয়ের মুখের দিকে তাকাইত—সেখানে ভয়ের চিহ্নমাত্র নাই। নিতাই গান বন্ধ করিয়া বলিত "কোন ভয়



নেই, সংসারের মায়া কাটিয়েছি বলে তোমরা মনে ভাবতে পারবে না, পার করার মায়া পূরা মাত্রায় আমার আছে—তার সেই হাসি ভরা আশ্বাসবাণীতে এমন একটা অজ্ঞাত শক্তি নিহিত ছিল যে, এক দণ্ডে সমস্ত ভাবনা বাতাসের মত উড়িয়া যাইত।

তার দোষের মধ্যে ছিল, যাহা কিছু উপার্জ্জন করিত সমস্তই সে তাড়ী খাইয়া এবং বাঘার ও নিজের আহার্য্যের জন্য ব্যয় করিত। একটী পয়সা সঞ্চয় করিতে পারিত না—কোনো কোনো দিন ভাঁড় ভাঁড় তাড়ী খাইয়া সেই বটগাছের তলায় বাঘার সঙ্গে গান ও নৃত্য হইত—দুই জনে এক সঙ্গে আহার করিত। কুকুর ও মানুষের মধ্যে যে প্রভেদ যে সম্পর্ক, তাহা নিতাই ও বাঘার মধ্যে দৃষ্ট হইত না। নিতাই মনে করিত বাঘা তার আত্মীয়, সঙ্গী, পুত্র—বাঘা মনে করিত, নিতাই তার গুরু, মন্ত্রী, দেবতা। এই অপরূপ প্রেমের কল্পনা করা, সাধারণের পক্ষে যথেষ্ট অভিনব ও অস্বভাবিক বলিয়া প্রতীয়মান যে না হইত এমন নয়, তবে তাহারা নিতাইকে অনেক দিন হইতে দেখিয়া আসিতেছে, তাহাকে সাধারণ মাঝির মত দেখিত না—তাহাদের নিকট নিতাইয়ের এই সকল ব্যবহার অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত বলিয়া অনুমিত হইত না। বাঘাও সকলের প্রীতি ও স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছিল ; পারের পয়সা শুধু যে নিতাই পাইত, তাহা নয়,—বাঘার ভাগও নিষ্ফল যাইত না। তারও প্রতিদিন দুই এক আনা দান আদায় ছিল।

নদীকূলে দাঁড়াইয়া অনেকবার "নিতাই ! নিতাই" বলে' হাঁকিলাম কিন্তু আজ এই নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় খেয়াঘাটে আঁধারের মধ্যে বাতাসের হু হু শব্দ বটগাছের দীর্ঘশ্বাসের মত শোনাইল। ক্রমে নদীর উপর অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিল। স্রোতের মৃদু মৃদু কলধ্বনি বেশ সুস্পষ্ট শোনা যাইতে লাগিল ; কিন্তু নিতাই নাই, পারে যাবার উপায়—নৌকা নাই ! আজ—নিতাইকে যেন বিশেষ করিয়া মনে পড়িতেছিল, তার সেই আশ্বাসবাণী শুনিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল কিন্তু তাহার কোনো সাড়া আজ তেমন করে জানান হইল না—বাঘাটাও একবার ডাকিল না। তবে কি নিতাই তার জীবনের খেয়া শেষ করিয়া পলাইয়াছে ?—নিরুপায় হইয়া কত রকম ভাবিতেছি, এমন সময় জলের উপর দূরে ঝপ্‌ঝপ্ দাঁড় ফেলার শব্দ শ্রুত হইল, মনে হইল তবে বুঝি নিতাই আসিতেছে !

( ২ )

যে নৌকায় পার হইলাম, সে খানি নূতন পান্সী, এখানির উপর ছই নাই, নিতাইয়ের নৌকার উপর বেশ একটী সুন্দর ছাউনি করা ছিল, সে যে তার মধ্যেই থাকিত!

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,

"তুমি কি নিতাইয়ের কেউ হও।

"আজ্ঞে না; আমি এ ঘাটে দু বছর নৌকা চালাচ্ছি!

"কেন,—নিতাই কোথা গেল?

এই প্রশ্নে সে যেন বিস্মিত হইয়া তীব্র দৃষ্টিতে আমার মুখের প্রতি চাহিল —তারপর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আস্তে আস্তে কহিল, 'কেন কিছু কি শোনেন নি'?

"বলিলাম না, অনেক দিন এ অঞ্চলে আসি নাই! নিতাই ভাল আছে ত"?

"চুপ করুন,—চুপ করুন," শুনতে পেলে ভয়ানক ব্যাপার হবে।

আমার মনে হ'লো নিতাইকে নিয়ে যেন একটা গূঢ় রহস্য চলিয়াছে—এই খেয়াঘাটের পারাপারের মধ্যে যেন একটা বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে; তখন পান্সী প্রায় কিনারার কাছাকাছি হইয়া পড়িয়াছিল—আমি আগ্রহ প্রকাশ করিয়া বলিলাম "চুপ্ করব কেন, কি হয়েছে?"

নূতন মাঝি উত্তর করিল, 'নিতাই কথা শুনতে পেলে এখনি এসে দাঁড়াবে দুচারটা পয়সা না নিয়ে—ছাড়বে না! আহা অমন ভালো লোক অমন হয়ে যায়—সবই অদৃষ্ট'!

মাঝি নিতাইয়ের আগমনটাকে যেন ভয় করিতেছিল তাহার কথার ভিতর হইতে নিতায়ের প্রতি দয়া দুঃখ ও স্নেহ প্রকাশ পাইল; মনে করিলাম "হয়ত সে এমন একটা গুরুতর অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছে—যে তাতে বোধ হয়, তার নৌকা চালানো একবারে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। নিতাইকে দেখিবার জন্য কেমন একটা প্রবল ইচ্ছা হৃদয়মধ্যে গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিতেছিল, তাহার সেই সুগঠিত বিপুল দেহ, সেই থালার মত প্রকাণ্ড গোল মুখ, বড় বড় চোখ, সরল শান্ত দৃষ্টি, উন্নত বিশাল বক্ষঃ, লোহার মত কঠিন হাতের গুলি, বড় চুল, সবতেই যেন তাহার কেমন একটা বিশেষত্ব ছিল—আরোহীদের সাবধান করিবার জন্য সেই শাসনবাণী শুনিতে বেশ লাগিত—সেই নিতাইয়ের কি



হইয়াছে, সেই বা কেমন হইয়াছে—দেখিবার জন্য অধীর হইয়া পড়িলাম। আমাকে চিন্তিত দেখিয়া মাঝি কহিল। "ঐ দেখুন! ঐ যে, তীরে হোগলার বন দেখছেন, ঐ যে,—হোগলার বন দুলে' উঠল না? ঐ নিতাই এখনো তার বাঘাকে খুঁজছে! বেচারী খাওয়া দাওয়া ত্যাগ করেছে—কেবল লোকে দয়া করে' যা দুই একটা পয়সা দেয়, তাই দিয়ে তাড়ী খায়, দিন নেই রাত্রি নেই, ঝড় নেই,বৃষ্টি নেই শীত নেই বর্ষা নেই, সকল সময় সে ঐখানে পড়ে আছে এই নদীর কিনারা ছেড়ে কোথাও নড়বে না, যে দিন ঝড়ে ওর নৌকা উল্টে যায়. শুনেছি সেই দিন কুকুর বাঘা কোথায় ভেসে যায়, বেচারী নাকি সে দিন সমস্ত রাত বাঘা! বাঘা! বলে চেঁচিয়েছে। সাঁতার দিয়ে দিয়ে তাকে খুঁজে ছিল, তারপর থেকেই ওর মাথা কেমন খারাপ হ'য়ে গেছে।'

বাঘার অন্তর্দ্ধানের কথা শুনে' হঠাৎ একটা অতীতের কথা মনে পড়িয়া গেল, এক দিন নৌকায় আমি আর একটী ভদ্রপরিবার পার হইতেছিলাম, নিতাই যে বাঘাকে কত ভাল বাসে তা যে এ কাহিনী শুনিয়াছে সেই অবগত হইয়াছিল, নিতাই গান গাহিতেছিল, বাঘা তার সম্মুখে নৃত্য করিতেছে, বাঘার গায়ে ভদ্র লোকের ছোট মেয়েটি হাত বুলাইতেছিল ও মাঝে মাঝে হাত তালি দিয়া উল্লাসে হাসিতেছিল, বাঘাও লাঙ্গুল ফুলাইয়া নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গী দেখাইতেছিল—শেষে ভদ্রলোকটি নিতাইয়ের নিকট কুকুরটি কিনিতে চাহিলেন, সহসা নিতাইয়ের মুখ লাল হইয়া উঠিল, গান থামিয়া গেল, চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। যিনি পার হইতেছিলেন তিনি যে এক জন সমৃদ্ধিশালী লোক তাহা তাঁহার স্ত্রীর গাত্র আভরণ হইতে বেশ প্রকাশ পাইতেছিল। নিতাই অনেকক্ষণ নিরুত্তর রহিল; বুঝি এ প্রস্তাব তাহার পক্ষে ষড়ই বেদন-দায়ক হইয়াছিল।

বাবুটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কত দাম হবে বল, যত দাম চাও তাই দেব।

নিতাই আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, সে বলিল—দাম আর কি, যদি বাঘাকে আমার কাছ থেকে নেন, তবে খুকীটিকে আমায় দিন, আপনার যেমন খুকী, আমার তেমন বাঘা! এই কথাগুলির ভিতর দিয়া সে দিন বাঘার প্রতি তাহার যে ভালবাসা ও মমতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। ইহা 'প্রেম' নয়, বাক্যের ঝঙ্কার নয়, উপন্যাসের বর্ণনা নয়, ইহা যে তাহার প্রাণের কথা—বাবুটি নির্ব্বাক হইয়া গেলেন,

তাঁহার স্ত্রীও অঞ্চল দিয়া নয়ন মুছিলেন—যাবার সময় তাঁহার স্ত্রী অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে মৃদুকণ্ঠে কি বলিলেন—ভদ্র লোকটি কুকুরের পৃষ্ঠে একবার ধীরে ধীরে হাত চাপ্‌ড়াইলেন এবং নিতাইয়ের হাতে একটী টাকা দিয়া গেলেন।

এমন সময় আমাদের নৌকা আসিয়া তীরে ভিড়িল। তখন জ্যোৎস্নার শুভ্র আলোক জলের উপর কাঁপিতেছিল, মাঝি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল—"ঐ দেখুন নিতাই নদীর ধারে আসছে,—হয়ত এখনই বাঘাকে খুঁজতে জলে পড়বে, ঐ রকম করে লোকটা মারা যাবে।"

আমি অনিমেষ নয়নে তাহার প্রতি চাহিলাম, তাহার পূর্ব্বের আকৃতি—তাহাকে এখন দেখিয়া, মোটেই মনে আসে না—বিশ্রী হইয়া গিয়াছে। যে বাঁধনের ভয়ে নিতাই একদিন ঘর সারাইতে রাজি হয় নাই—বিবাহ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিল—একটী পশুর অভাব আজ তাহার অধিক করিয়া বাজিয়াছে। নিস্বার্থ ভালবাসার নিকট সবাই পরাজিত। নিস্তব্ধ নদীর ধারে আসিয়া নিতাই চারিদিকে চাহিল, তারপর 'বাঘা! বাঘা! আয়, খাবার এনেছি আয়'! বলিয়া সে নদীগর্ভে ঝাঁপাইয়া পড়িল। অনেক দূর সন্তরণ করিয়া নিরাশ অন্তরে ক্লান্ত অবসন্ন দেহে নদী-সৈকতে হোগলাবনের পার্শ্বে আসিয়া শুইয়া পড়িল। সে দৃশ্য কি মর্ম্মান্তিক, কি হৃদয়বিদারক—তাহা বলিতে পারি না।

আমি ধীরে ধীরে তাহার নিকট গিয়া ডাকিলাম "নিতাই।"

সে শূন্যদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া আমার মুখের প্রতি তাকাইয়া রহিল। কিছু বলিতে পারিল না।

"নিতাই এই নাও, এই নোটখান তোমার কাছে রাখ। এমন করে নদীর ধারে যদি পড়ে থাক কদিন বাঁচবে? চল তোমার ঘরে থাকবে, আমরা যেমন করে পারি, তোমার একটা বন্দোবস্ত করে দিব।'

তবে দাঁড়ান, আমার বাঘাকে ডেকে আনি—সে নইলে আমি কার কাছে থাকব। 'বাঘা! বাঘা'! বলিয়া সে নদীর ধার ধরিয়া হোগলা বনের ভিতর দিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল—অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম, সে আর ফিরিল না। কেবল নদী-তটে তাহার আকুল আহ্বানের প্রতিধ্বনি হইতেছিল "বাঘা বাঘা আয়"।

শ্রীফকির চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

---



# ৺রমেশচন্দ্র দত্ত।

## প্রথম অধ্যায়।

রমেশচন্দ্রের জীবনে ভাগ্য ও পুরুষকারের সাহচর্য্য—
তাঁহার নানামূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ—তাঁহার
পূর্ব্বপুরুষ, জ্ঞাতি ও আত্মীয়গণের
সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

পুরুষকারের প্রোজ্জ্বল মূর্ত্তি স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসাদ হইতে কখনও বঞ্চিত হন নাই। সাধু জনক, স্নেহময়ী জননী, ঋষিপ্রতিম অগ্রজ, গুণবতী স্ত্রী ও দুহিতৃগণ, সুশিক্ষিত পুত্র ও জামাতৃবর্গ, সোদরোপম বন্ধু, প্রচুর অর্থ, অদম্য অধ্যবসায়, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, উচ্চ রাজপদ, দেশব্যাপী সম্মান—ভাগ্য ও পুরুষকার উভয় শক্তির প্রভাবে লভ্য সকল সম্পদেই তিনি অধিকারী ছিলেন। করুণাসিন্ধু বিদ্যাসাগরের দুরারোগ্য ব্যাধি, পারিবারিক অশান্তি ও সামাজিক নির্য্যাতন, "বৃত্র সংহার" ও "কবিতাবলী" রচয়িতা বরেণ্য কবির জীবনসায়াহ্নে চক্ষুরত্ননাশ ও দারিদ্র্যের কঠোর পেষণ, অক্লান্তকর্ম্মী সুরেন্দ্রনাথের যৌবনপ্রারম্ভে দুর্লভ সিভিল সার্ভিস হইতে অপসারণ—রমেশচন্দ্রের সমসাময়িক বরণীয় বাঙ্গালীগণের অনেকের জীবনেই এইরূপ পুরুষকারের সহিত মন্দভাগ্যের সংঘর্ষণ ঘটিয়াছিল। কিন্তু রমেশচন্দ্রের জীবনতরী পুরুষকারের প্রবল স্রোতে ভাসমান হইয়া নির্ব্বিঘ্নে সাফল্য-পোতাশ্রয়ে উপনীত হইয়াছিল—দুর্ভাগ্য-ঝটিকা তাঁহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট বা হতশ্রী করিতে পারে নাই।

রমেশচন্দ্র অনেক মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। মাতৃভাষার ভক্ত উপাসক রমেশচন্দ্রের সাধনার ফল—"বঙ্গবিজেতা", "মাধবী কঙ্কণ," "জীবন প্রভাত," "জীবন সন্ধ্যা," "সংসার" ও "সমাজ" এই ছয় খানি উপন্যাস এবং ইংরাজী ভাষায় রচিত বঙ্গীয় সাহিত্যের ইতিহাস। ভারতের প্রাচীন গৌরব স্ফীত বক্ষ রমেশচন্দ্রের সংস্কৃত সাহিত্য তপোবনে আরাধনার ফল—"ঋগ্বেদ সংহিতা"র বঙ্গানুবাদ, "হিন্দু শাস্ত্র," ও "Civilisation in Ancient India" এই তিন খানি বিরাট গ্রন্থ, এবং রামায়ণ ও মহাভারতের অংশবিশেষের ইংরাজী-পদ্যে অনুবাদ। বর্ত্তমান ভারতের দারিদ্র্যে মুহ্যমান দেশহিতব্রত রমেশচন্দ্রের গবেষণার ফল—"Open Letters to Lord Curzon,"

"India under Early British Rule," এ "India in the Victorian Age" এই তিন খানি বিবিধতত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থ। বিচক্ষণ ও ন্যায়নিষ্ঠ রাজকর্ম্মচারী রমেশচন্দ্রের কার্য্য-নিপুণতার ফল—বাঙ্গালী সিভিলিয়ানের কমিশনর ও তদপেক্ষা উচ্চতর পদে নিয়োগের পথ-প্রসারণ এবং বরোদা রাজ্যের বহুবিধ উন্নতি। পর্য্যটক ও বক্তা রমেশচন্দ্রের অধ্যবসায়ের ফল—"Three years in Europe," "Rembles in India," "Speeches and Papers" প্রভৃতি পুস্তক। বিবিধ মূর্ত্তিতে, নানাবিধ কার্য্যপরম্পরায়, রমেশচন্দ্র বাঙ্গালী জাতিকে অপরিশোধ্য ঋণে বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

বিডন স্কোয়ার ডাকঘরের দক্ষিণে অবস্থিত রামবাগান পল্লীতে, বাণীপূজক দত্তবংশীয়গণ পুরুষানুক্রমে বাস করিতেছেন। কিয়দূন সার্দ্ধশতাব্দী ব্যাপিয়া এই বংশে পাশ্চাত্য শিক্ষার স্রোত অব্যাহত ভাবে প্রবাহিত হইতেছে। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের এক খানি দলিল * হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়, যে রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রপিতামহ নীলমণি দত্ত মুচ্ছুদ্দি ছিলেন, এবং ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন বলিয়া, শোভাবাজার রাজবংশের সংস্থাপক মহারাজা নবকৃষ্ণ তাঁহার সহায়তা গ্রহণ করিতেন! ঐ দলিলের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :—

To the first interrogatory this Deponent saith that he is of the Hindoo or Gentoo Religion that his Profession is that of a Banian and that he can take upon himself to say that he is well acquainted with the family transactions of the late Raja Nobkissen by reason' that he this Deponent was very intimate at his house and that the said Raja Nob Kissen most generally employed him in whatever he did with English gentlemen or in the English language."

ক্রমশঃ

শ্রীগৌরহরি সেন।

* শ্রদ্ধাস্পদ রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেববাহাদুর স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া লেখককে এই দলিল দেখিতে দিয়াছেন।

# বঙ্গ রমণী।

## সমাজে পদমর্য্যাদা।

আমরা বাঙ্গালী, সুতরাং বঙ্গসমাজের কথাই আমাদিগের আলোচ্য। বাঙ্গালীর ঘরে, বঙ্গীয় সমাজে বঙ্গ রমণীর অবস্থা কি, বঙ্গবাসী মাত্রেরই তাহা ভাবিবার বিষয়।



পুরুষের সহিত নারীর সাধারণতঃ কি সম্বন্ধ প্রথমে তাহাই দেখা যাউক। পুরুষ ও স্ত্রীলোক লইয়াই সৃষ্টি। একের বিহনে অন্যের মূল্য—এমন কি অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়। নরনারী না থাকিলে সৃষ্টিই হইত না। আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত এই একই নিয়ম দেদীপ্যমান আছে। সৃষ্টি প্রকরণে পুরুষের যেরূপ প্রয়োজন, প্রকৃতিরও তদ্রূপ প্রয়োজন। তজ্জন্যই সংসারে উভয়েরই স্থান সমান। যাঁহাদিগের সামান্য জ্ঞান আছে, তাঁহাদিগকেও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে।

ভারতের সৌভাগ্য-সূর্য্য যখন মধ্যাকাশে বিরাজিত, সভ্যতালোকে দিঙ্মণ্ডল উজ্জ্বলীকৃত, বেদগানে গগন প্রতিধ্বনিত, যজ্ঞধূমে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন, সেই সময়ে, সেই আদিমকালে আর্য্য ঋষিগণ সমস্বরে মানব সমাজে স্ত্রীলোকের সমাদরের কথা পরিকীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। মনু স্পষ্টই বলিয়াছেন পুত্র ও কন্যা উভয়কেই সমভাবে লালনপালন করিতে ও শিক্ষা দিতে হইবে।" ঋষিগণের সেই মহাবাণী তদানীন্তন সমাজে অবশ্য পালনীয় ছিল, কাজেই সমাজও উচ্চ শ্রেণীতে অবস্থিত ছিল। হিন্দুশাস্ত্রে স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা না থাকিলে গার্গী, খনা, লীলাবতী প্রমুখ বিদুষীর আবির্ভাব এদেশে হইত না।

গভীর পরিতাপের বিষয় ইদানীং হিন্দু সমাজের অধঃপতনের সহিত প্রাচীন ঋষিবাক্যের প্রতিও লোকের হতাদর ঘটিতেছে, কাজেই সমাজের শনৈঃ শনৈঃ অধঃপতন হইতেছে।

শাস্ত্রে লিখিত আছে, যে গৃহে রমণীর প্রতি অনাদর প্রদর্শন করা হয়, সে গৃহে লক্ষ্মী চঞ্চলা হইয়া থাকেন। এই সকল কথার মূলে কত অর্থ নিহিত আছে, তাহা নিবিষ্ট চিত্তে অনুধাবন না করিলে হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হয় না।

যাহারা অধুনা পাশ্চাত্য সমাজে স্ত্রীলোকদিগের আদর যত্ন দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া থাকেন, তাঁহারা প্রাচীন ভারতের পবিত্র সামাজিক নিয়মাদির বিষয় অবগত নহেন। প্রতীচ্য যখন অসভ্যতায় ঘোর তমসাবৃত, প্রাচ্যে তখন নানারূপ সুনিয়ম প্রচলিত ছিল। সেই সকল সনাতন নিয়ম যদি আমরা অব্যাহত রাখিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমাদিগকে অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হইতে হইত কি?

ক্রমশঃ

শ্রীতারাপ্রসন্ন মিত্র।

# শেষ।

গানে সম আছে, ছন্দে যতি আছে এবং এই যে লেখা চল্‌চে এই লেখার অন্য সকল অংশের চেয়ে দাঁড়ির প্রভুত্ব কিছুমাত্র কম নয়। এই দাঁড়ি গুলোই লেখার হাল ধরে রয়েছে—এ'কে একটানা নিরুদ্দেশের মধ্যে হু হু করে ভেসে যেতে দিচ্চে না।

বস্তুত কবিতা যখন শেষ হয়ে যায় তখন সেই শেষ হয়ে যাওয়াটাও কবিতার একটা বৃহৎ অঙ্গ। কেন না কোনো ভাল কবিতাই একেবারে শূন্যের মধ্যে শেষ হয় না—যেখানে শেষ হয় সেখানেও সে কথা বলে—এই নিঃশব্দে কথাগুলি বলবার অবকাশ তাকে দেওয়া চাই।

যেখানে কবিতা থেমে গেল সেখানেই যদি তার সমস্ত সুর সমস্ত কথা একেবারেই ফুরিয়ে যায়, তাহলে সে নিজের দীনতার জন্যে লজ্জিত হয়। কোনো একটা বিশেষ উপলক্ষ্যে প্রাণপণে ধুমধাম করে যে ব্যক্তি একেবারে দেউলে হয়ে যায়, সেই ধুমধামের দ্বারা তার ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পায় না, তার দারিদ্র্যই সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

নদী যেখানে থামে সেখানে একটি সমুদ্র আছে বলেই থামে—তাই থেমে তার কোনো ক্ষতি নেই। বস্তুত এ কেবল এক দিক থেকে থামা অন্য দিক্ থেকে থামা নয়।

মানুষের জীবনের মধ্যেও এই রকম অনেক থামা আছে। কিন্তু প্রায় দেখা যায় মানুষ থাম্‌তে লজ্জা বোধ করে। সেই জন্যেই আমরা ইংরেজের মুখে প্রায় শুন্‌তে পাই যে, জিন্-লাগাম-পরা অবস্থায় দৌড়তে দৌড়তে মুখ থুবড়ে মরাই গৌরবের মরণ। আমরাও এই কথাটা আজকাল ব্যবহার করতে অভ্যাস করছি।

কোনো একটা জায়গায় পূর্ণতা আছে একথা মানুষ যখন অস্বীকার করে তখন চলাটাকেই মানুষ একমাত্র গৌরবের জিনিষ বলে মনে করে। ভোগ বা দান যে জানে না সঞ্চয়কেই সে একান্ত করে জানে।

কিন্তু ভোগের বা দানের মধ্যে সঞ্চয় যখন আপনাকে ক্ষয় করতে থাকে তখন এক আকারে সঞ্চয়ের অবসান হয় বটে কিন্তু আর এক আকারে তারই সার্থকতা হতে থাকে। যেখানে সঞ্চয়ের এই সার্থক অবসান নেই সেখানে লজ্জাজনক কৃপণতা।

মানসী—

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

*Printed by K. V. Seyne & Bros.*

জীবনকে যারা এই রকম কৃপণের মত দেখে তারা কোথাও কোনো মতেই থাম্‌তে চায় না, তারা কেবলি বলে, চল, চল. চল। আমার দ্বারা তাদের চলা সম্পূর্ণ ও গভীর হয়ে ওঠে না—তারা চাবুক এবং লাগামকেই স্বীকার করে, বৃহৎ এবং সুন্দর শেষকে তারা মানে না।

তারা যৌবনকে যৌবন পেরিয়েও টানাটানি করে নিয়ে চলে—সেই দুঃসাধ্য ব্যাপারে কাঠ খড় এবং চেষ্টার আর অবধি থাকে না—তা ছাড়া কত লজ্জা কত ভাবনা কত ভয়।

ফল যখন পাকে তখন শাখা ছেড়ে যাওয়াই তার গৌরব। কিন্তু শাখা ত্যাগ করাকে যদি সে দীনতা বলে মনে করে তবে তার মত কৃপাপাত্র আর কে আছে।

নিজের স্থানকে অধিকার করার সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটি মনের মধ্যে রাখ্‌তে হবে যে, এই অধিকারকে সম্পূর্ণ করে তুলে এ'কে ত্যাগ করে যাব—এই অধিকারকে যেমন করে পারি শেষ পর্য্যন্ত টানা হেঁচড়া করে রক্ষা করতেই হবে—তাতেই আমার সম্মান আমার কৃতিত্ব এই শিক্ষাই যারা শিশুকাল থেকে শিখে এসেছে অপঘাত যতক্ষণ তাদের পেয়াদার মত এসে জোর করে টেনে নিয়ে না যায় ততক্ষণ তারা দুই হাতে আসন আঁক্‌ড়ে পড়ে থাকে।

আমাদের দেশে অবসানকে স্বীকার করে, এই জন্যে তার মধ্যে অগৌরব দেখ্‌তে পায় না। এই জন্যে ত্যাগ করা তার পক্ষে ভঙ্গ দেওয়া নয়।

কেন না সেই ত্যাগ বল্‌তে ত রিক্ততা বোঝায় না পাকা ফলের ডাল ছেড়ে মাটিতে পড়াকে ত ব্যর্থতা বল্‌তে পারিনে। মাটিতে তার চেষ্টার আকার এবং ক্ষেত্র পরিবর্ত্তন হয়--সেখানে সে নিশ্চেষ্টতার মধ্যে পলায়ন করে না। সেখানে বৃহত্তর জন্মের উদ্যোগপর্ব্ব সেখানে অজ্ঞাতবাসের পালা। সেখানে বাহির হতে ভিতরে প্রবেশ।

আমাদের দেশে বলে পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ।

কিন্তু সে বন ত আলস্যের বন নয় সে যে তপোবন। সেখানে মানুষের এতকালের সঞ্চয়ের চেষ্টা, দানের চেষ্টার ক্ষেত্রে প্রবেশ করে।

করার আদর্শ মানুষের একমাত্র আদর্শ নয়, হওয়ার আদর্শও খুব বড় জিনিষ, ধানের গাছ যখন রৌদ্রবৃষ্টির সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে বাড়ছিল সে খুব সুন্দর কিন্তু ফসল ফলে যখন তার মাঠের দিন শেষ হয়ে ঘরের দিন

আরম্ভ হয়, তখন সেও সুন্দর। সেই ফসলের মধ্যে ধান ক্ষেতের সমস্ত রৌদ্র বৃষ্টির ইতিহাস নিবিড় ভাবে নিস্তব্ধ হয়ে আছে বলে কি তার কোনো অগৌরব আছে?

মানুষের জীবনকেও কেবল তার ক্ষেতের মধ্যেই দেখব, তার ফসলের মধ্যে দেখ্‌ব না, এমন পণ কর্‌লে সে জীবনকে নষ্টই করা হয়।

তাই বলচি মানুষের জীবনে এমন একটি সময় আসে যখন তার থামার সময়। মানুষের কাজের সময়ে আমরা মানুষের কাছ থেকে যে জিনিষটা আদায় করি তার থামার সময়েও আমরা যদি সেই জিনিষটাই দাবী করি তাহলে কেবল যে অন্যায় করা হয় তা নয় নিজেকে বঞ্চিত করাই হয়।

থামার সময় মানুষের কাছে আমরা যেটা দাবী কর্‌তে পারি সেটা করার আদর্শ নয়, সেটা হওয়ার আদর্শ। যখন সমস্তই কেবল চল্‌চে, কেবলি ভাঙাগড়া এবং ওঠাপড়া, তখন সেই হওয়ার আদর্শটিকে সম্পূর্ণভাবে স্থিরভাবে আমরা দেখ্‌তে পাইনে—যখন চলা শেষ হয় তখন হওয়াকে আমরা দেখতে পাই। মানুষের এই সমাপ্ত ভাবাটি এই স্থিররূপটি দেখারও প্রয়োজন আছে। ক্ষেতের চারা এবং গোলার ধান আমাদের দুইই চাই।

কেজো লোকেরা কাজকেই একমাত্র লাভ বলে মনে করে—এই জন্য মানুষের কাছ থেকে তার অন্তিমকাল পর্য্যন্ত কেবল কাজ আদায় করবারই চেষ্টা করে।

যে সমাজে যে রকম দাবী সেই দাবী অনুসারেই মানুষের মূল্য। যেখানে সমাজ যুদ্ধ দাবী করে সেখানে যোদ্ধারই মূল্য বেশি, সুতরাং সকলেই আর সমস্ত চেষ্টাকে সংহরণ করে যোদ্ধা হবার জন্যেই প্রাণপণে চেষ্টা করে।

যেখানে কাজের দাবী অতিমাত্র, সেখানে অন্তিমমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কেজো ভাবেই আপনাকে প্রচার করার দিকে মানুষের একান্ত প্রয়াস। সেখানে মানুষের দাঁড়ি নেই বল্লেই হয়, সেখানে কেবলি অসমাপিকা ক্রিয়া। সেখানে মানুষ যে জায়গায় থামে সে জায়গায় কিছুই পায় না কেবল লজ্জা পায়,—সেখানে কাজ একটা মদের মত, ফুরোলেই অবসাদ; সেখানে স্তব্ধতার মধ্যে মানুষের কোনো বৃহৎ ব্যঞ্জনা নেই; সেখানে মৃত্যুর রূপ অত্যন্তই শূন্য এবং বিভীষিকাময় এবং জীবন সেখানে নিরন্তর মথিত, ক্ষুব্ধ, পীড়িত ও শত সহস্র কলের কৃত্রিম তাড়নায় গতিপ্রাপ্ত।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

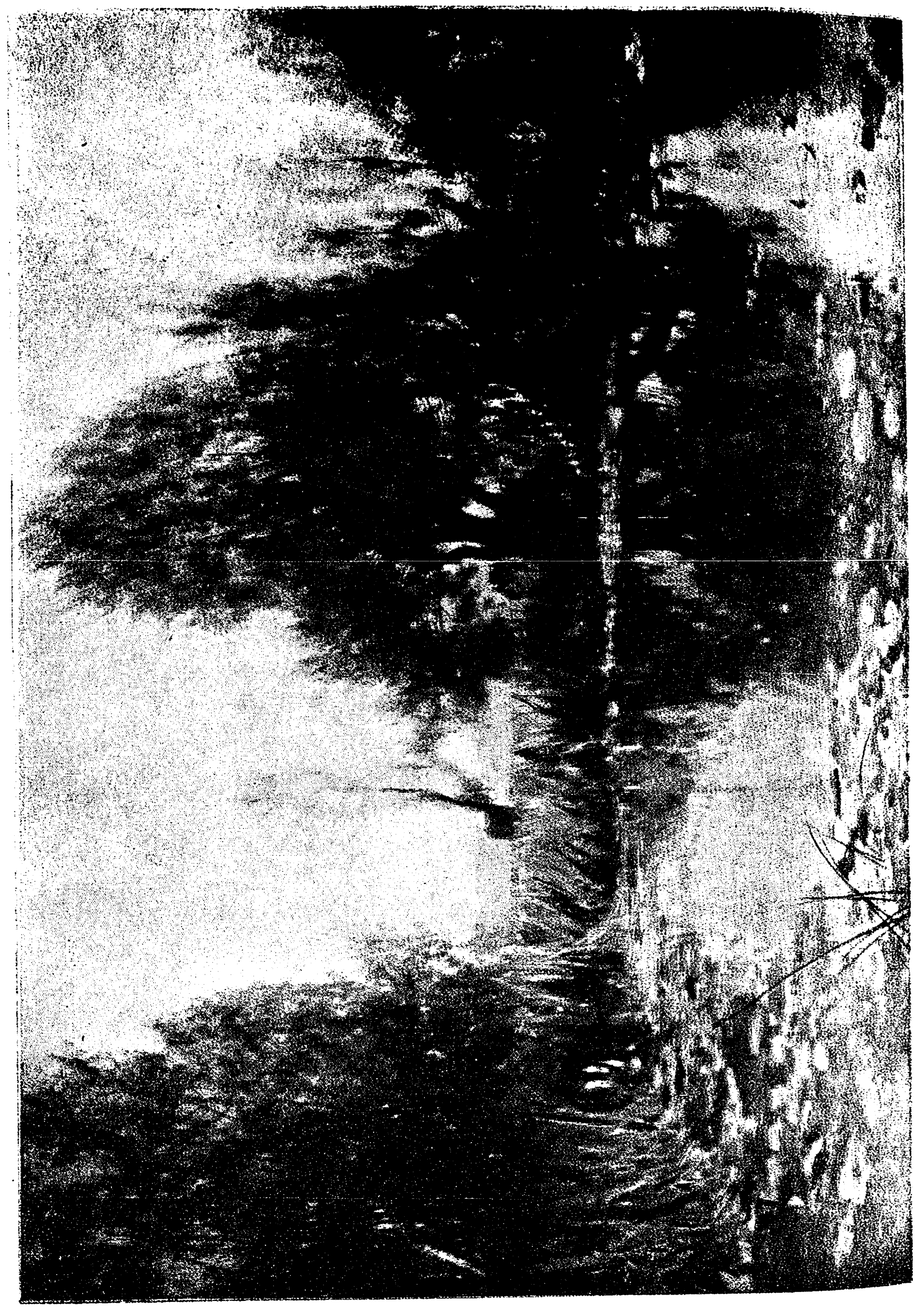

মানসী—

# মানসী

২য় বর্ষ। ] কার্ত্তিক ১৩১৭ সাল। [ ৯ম সংখ্যা।

## বঙ্গীয় যুবক-সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ জীবিকা-অর্জ্জন।

( সমস্যা )

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ও উপাধিধারীর সংখ্যা দেখিয়া আমরা সময়ে সময়ে ভয় পাই। অবশ্য বাঙ্গালা দেশেই পাশ্চাত্য শিক্ষার উন্নতি বহুল পরিমাণ হইয়াছে। কিন্তু আট কোটি জনসংখ্যার তুলনায় শিক্ষিত লোকের সংখ্যা মুষ্টিমেয়, এমন কি হিসাবে নগণ্য বলা যায়। কিন্তু বাঙ্গালী জাতি বিদ্যা শিক্ষার জন্য যে প্রকার আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে তাহাতে বোধ হয় ক্রমশঃই শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়িতে থাকিবে। ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্ম্মেণী, জাপান প্রভৃতি দেশে আপামর সাধারণ মধ্যে যে প্রকার শিক্ষা বিস্তার হইয়াছে ও হইতেছে সে তুলনায় আমরা কোথায় পড়িয়া আছি তাহার স্থিরতাই হয় না। কিন্তু আমাদের দেশে ইতিমধ্যে এ প্রকার হাহাকার পড়িয়াছে কেন? প্রকৃত পক্ষে দেখিতে গেলে আমাদের বিদ্যাশিক্ষার অন্তরালে শিক্ষালাভ ব্যতীত আর একটী গূঢ় উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভ হইতেই, এমন কি যখন নবাবী আমলে পার্শী রাজভাষা বলিয়া পরিগণিত হইত তখন হইতেই কেবল চাকুরী করা বা ওকালতি পেশা অবলম্বন করাই বাঙ্গালীর বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য হইয়া রহিয়াছে। এ দেশে ইংরাজী শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য এই ছিল যে সহজে চাকরী জুটাইব। মহাত্মা রাজনারায়ণ বসুর "সেকাল আর একালে" এ সম্বন্ধে অনেকগুলি কৌতুকাবহ কাহিনী আছে। একস্থানে তিনি বলিতেছেন,—"ইংরাজদের যে সকল সরকার থাকিত, তাহাদের ভাষা ও কথোপকথন আরো চমৎকার ছিল। একজন সাহেব তাঁহার সরকারের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। সরকার বলিল—মাষ্টর

ক্যান্ লিব্, মাষ্টর ক্যান্ ডাই। ( Master can live, master can die ) অর্থাৎ মনিব আমাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারেন, অথবা মারিয়া ফেলিতে পারেন। সাহেব, "What, master can die?" এই কথা বলিয়া সরকারকে মারিবার জন্য লাঠি উঠাইলেন। সরকারের তখন মনে পড়িল, "ডাই"—শব্দের অন্য অর্থ আছে, তখন "ষ্টাপ্ দেয়ার" ( stop there ). অর্থাৎ প্রহার করিতে লাঠি উঠাইও না, এই বলিয়া হাত উচু করিল, তৎপরে অঙ্গুলি দ্বারা আপনাকে দেখাইয়া বলিল, "ডাই মি" ( Die me ) অর্থাৎ আমাকে মারিয়া ফেলিতে পারেন। "ইফ্ মাষ্টর ডাই, দেন আই ডাই, মাই কো ডাই, মাই ব্ল্যাক্ ষ্টোন্ ডাই, মাই ফোরটিন জেনেরেশান ডাই।" "If master die, then I die, my cow die, my blackstone die, my fourteen generation die." "যদ্যপি মনিব মারেন, তবে আমি মরিব, আমার 'কো' অর্থাৎ গরু মরিবে, আমার 'ব্ল্যাক্ষ্টোন্' অর্থাৎ বাড়ীর শালগ্রাম ঠাকুর মরিবেন, আমার 'ফোরটিন জেনেরেশান' অর্থাৎ চোদ্দ পুরুষ মরিবে।" একবার রথের দিবস এক সরকার কামাই করে। পরদিন সে আইলে, সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল কেন আইস নাই?" সরকার রথের ব্যাপার কিরূপে বুঝাইবে ভাবিয়া আকুল। শেষে বলিয়া উঠিল, "চর্চ্চ" ( church )। রথের আকার গির্জ্জার মত, তাই এই কথাটী বুঝাইবার পক্ষে বড় উপায় হইল। কিন্তু "চর্চ্চ" বলিলে ইঁটের গাঁথুনি বুঝায়, এ জন্য পরক্ষণেই বলা হইল, "উডেন্ চর্চ্চ" অর্থাৎ কাষ্ঠের গির্জ্জা। তাহা হইলেও বুঝা গেল না; তখন তাহারে আরো ব্যাখ্যা করিতে হইল—"থ্রি ষ্টারিস্ হাই"। "Three stories high" "গাড আল্মাইটী সিট আপন" (God Almighty sit upon) অর্থাৎ জগন্নাথ-দেব বসিয়া আছেন, "লাং লাং রোপ" ( Long long rope ) "থৌজণ্ড মেন ক্যাচ ( Thousand men catch ), "পুল, পুল, পুল" ( Pull, pull, pull ) "রনাওয়ে, রনাওয়ে" ( Run away, Run away ). "হরি হরি বোল—হরি হরি বোল।" *

এই তো গেল ইংরাজ রাজত্বের প্রথম আমলের কথা। তাহার পর যখন ডেপুটী কালেক্টরী, মুন্সেফী প্রভৃতি পদের সৃষ্টি হইল ও সেক্রেটেরিয়টের অল্পাধিক বেতনের কেরাণীগিরির জন্ম হইল, তখন দশ পনরো বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিলাভের এক চরম উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল শীঘ্র শীঘ্র পাশ করিয়া এই সকল

* সেকাল আর একাল—২৫—২৭ পৃঃ।



পদলাভ করা। কাজেই আমাদের সমাজের এক সংস্কার জন্মিল যে ইংরাজী লেখাপড়া শিক্ষা করিলেই চাকুরী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা সহজ হইবে। কিন্তু একথা কেহ তলাইয়া দেখিল না যে অজস্র চাকুরীর সৃষ্টি কতদিন চলিবে? আমাদের দেশে বহুকাল হইতেই একটী সারবান্ বচন চলিয়া আসিতেছে,—

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ তদর্দ্ধং কৃষি কর্ম্মণি।
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ॥"

নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার কলিকাতা অবরোধের পর ইংরাজদিগের সহিত যে সন্ধি স্থাপিত হয় তাহার অন্যান্য সর্ত্তের মধ্যে একটা সর্ত্ত এই ছিল যে সিরাজ ব্যবসায়ের ক্ষতিপূরণস্বরূপ শুধু আর্ম্মেণীয় বণিকদিগকে সাত লক্ষ টাকা দিবেন।* ইহাতেই বুঝা যায় যে গোবিন্দপুর সুতানুটী ও কলিকাতা এই তিন খানি গ্রাম ইজারা লইবার পর হইতে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সমগ্র কলিকাতায় বাণিজ্য ব্যাপার কি প্রকার বিপুল হইয়া উঠিয়াছিল। বলা বাহুল্য আর্ম্মেণীয়দের প্রাপ্ত সাত লক্ষ টাকা এখনকার ক্রয় বিক্রয়ের মূল্যানুসারে ( purchase value ) অন্ততঃ পক্ষে পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকার সমান হইবে। তাহার পর এই দেড় শত বৎসরের মধ্যে সমগ্র ভারতের আমদানী ও রপ্তানী একত্র করিলে প্রায় সাড়ে তিন শত কোটি টাকায় পরিণত হয়। এই বিশাল বাণিজ্য-ব্যাপারে কয়জন বাঙ্গালী সওদাগর সংসৃষ্ট আছেন? আমাদের দেশ হইতে যে সমস্ত শস্য সামগ্রী ( raw produce ) রপ্তানী হয় তাহার সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র বাঙ্গালীর হাতে। কিন্তু তাহাও তেলী, তামলী, সাহা, গন্ধবণিক প্রভৃতি শ্রেণীর করায়ত্ত হইয়া রহিয়াছে। যদি এই সকল শ্রেণীর মধ্যে যথেষ্ট শিক্ষার বিস্তার থাকিত তাহা হইলে আমাদের কিছুমাত্র ক্ষোভের কারণ থাকিত না। কিন্তু তাহা না থাকায় ইউরোপীয় বণিকগণ ব্যবসায় চালাইবার যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া থাকেন ইহারা তাহার কোনই খবর রাখেন না। সত্য বটে ইংরাজ আমলের প্রারম্ভে, এমন কি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বাঙ্গালীর সহায়তা ব্যতীত ইউরোপীয় সওদাগরগণ ( for want of local knowledge ) তাহাদের কার্য্য-সিদ্ধি করিতে পারিতেন না; এই জন্যই রামদুলাল দে, মতিলাল শীল প্রভৃতি ক্রোরপতি হইয়াছিলেন, এবং অপর অনেক অনেক বাঙ্গালী হৌসের মুৎসুদ্দি

* "For the effects plundered from the Armenian inhabitants of Calcutta. I will give the sum of seven lacks of ruppees." Vide Stewart's History of Bengal. Appendix, page XX., Article No. VII.

হইয়া বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন। প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী যে বাণিজ্য ব্যাপারে শীর্ষস্থান অধিকার করিবে ইহার সূত্রপাত হইয়াছিল। * কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইঁহাদের উত্তরাধিকারীগণ প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও ভোগ-বিলাসে রত হইয়া ভবিষ্যতে বাণিজ্যব্যাপারে দাঁড়াইবার স্থান পাইলেন না। বাণিজ্য ও ব্যবসায় যেন বাঙ্গালীর প্রকৃতিবিরুদ্ধ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালীর অনুপযুক্ততার জন্য বাণিজ্য বসিয়া থাকিবার নয়; প্রকৃতি চিরদিনই শূন্যতার বিরোধী। ( Nature abhors vacuum ). বাঙ্গালীর বাণিজ্যে অনভিজ্ঞতা ও বাণিজ্য-বিমুখতা দেখিয়া মাড়োয়ারী ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা বাণিজ্য ক্ষেত্রটী একেবারে দখল করিয়া বসিয়াছে। এই কারণেই ইউরোপীয়গণ, মাড়োয়ারীগণ বাঙ্গালার নগরে নগরে এমন কি গণ্ডগ্রাম পর্য্যন্ত নিজের ব্যবসায়ক্ষেত্র বিস্তৃত করিয়া ফেলিতেছে। বাণিজ্য দ্বারা কার্য্য-ক্ষেত্র কি প্রকার বিস্তার লাভ করে তাহার একটী মাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি। এই সাড়ে তিন শত কোটি টাকার পণ্য-দ্রব্য বহন করিবার জন্য কতশত বৃহদায়তন ষ্টীমার সমুদ্রবক্ষে বিরাজ করিতেছে। আবার এই সমস্ত ষ্টীমার চালাইবার জন্য কত সহস্র ও লক্ষ নাবিক, কাপ্তেন, ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত রহিয়াছে। আবার এই সমস্ত গড়িবার জন্য গ্লাসগো লিভারপুল প্রভৃতি নগরে কত বৃহদায়তন ডক্ রহিয়াছে। আর সেখানে সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ মজুর এবং কত বিজ্ঞানবিৎ ইঞ্জিনিয়ার ইহার নক্সা ( naval architecture ) নির্ম্মাণের জন্য ব্যাপৃত রহিয়াছেন। আমরা যদি এই প্রকারে কর্ম্মোৎসাহ (spirit of enterprise) বাণিজ্য-পটুতা (commercial activity) না হারাইতাম তাহা হইলে আজ আমাদের নদীবক্ষে ও বঙ্গোপ-

* "Biswanath Mutilal, lately the Dewan of the Salt Golahs, began life with eight Rupees a month, and is generally understood to have amassed twelve or fifteen lakhs of Rupees before he was required to relinquish his office. The father of Babu Ashutosh Deb, the founder of that wealthy family, served a native master at five rupees a month, before he became a clerk in the late firm of Fairlie Ferguson & Co., in whose employ, and also in that of the American Merchants—who named one of their ships after him Ramdulal Dey, he accumulated a colossal fortune. The present Dictator in the money market, the Rothschild of Calcutta, Muti Babu, began his career with the humble salary of ten Rupees a month."

Vide The Indian Mirror, Aug. 14, 1910.



সাগরের উপকূলে কত শত শত ষ্টীমার চালিত হইত তাহাতে কত বাঙ্গালী কাপ্তেন, ইঞ্জিনিয়ারের জীবিকা-নির্ব্বাহ হইতে পারিত! অধিক কথা কি, আমাদের দেশে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এত বৎসর স্থাপিত হইয়াছে কিন্তু এই বিদ্যালয়ের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ চাকুরী ব্যতীত আর কোনও উপজীবিকা খুঁজিয়া পান না। Vide J. G. Cumming's Report on "Technical and Industrial Instruction in Bengal", 1888—1908. Part I. of Special Report, page 12.—"The great attraction is the comparative certainty of subsequent official employment. Eight out of every ten students of the Engineer Department find employment under Government, and only one out of ten finds private employment. Mr. Heaton, the Principal, has remarked that this discloses in a startling manner the state of arrested industrial development in Bengal." এই প্রকারে অন্তর্ব্বাণিজ্য আমাদের হাতছাড়া হইয়া যাওয়ায় আমরা কোটি কোটি টাকা হারাইতেছি। আবার এই সমস্ত ষ্টীমার নির্ম্মাণের জন্য কত mechanical engineerএর প্রয়োজন হইত? আশ্চর্য্যের বিষয় এই, আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর রচিত ( ১৯২ অব্দে ) মৃচ্ছকটিক নাটক পাঠে জানা যায় যে ইহার নায়ক চারু দত্ত ( ব্রাহ্মণ বণিক ) ছিলেন। চীন পরিব্রাজক ফা হিয়ানের ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠে জানা যায় যখন তিনি ভারতবর্ষ ও সিংহল হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন তখন অনেক ব্রাহ্মণ বণিক তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন। তাহার পর শ্রীমন্ত সওদাগরের কথা বাঙ্গালা দেশের ঘরে ঘরে প্রচলিত আছে। কিন্তু যেদিন হইতে সমুদ্র যাত্রা ও বিদেশ গমন বন্ধ হইল সেই দিন হইতেই আমরা বাণিজ্য-পটুতা ( commercial activity ) হারাইয়াছি। বর্ত্তমান সময়ে একবার বেলেঘাটায় গিয়া কি প্রকারের নৌকায় আমাদের অন্তর্ব্বাণিজ্য চালিত হয় আর একবার গঙ্গার ধারে জেটিতে যাইয়া বহির্ব্বাণিজ্য কিরূপে নির্ব্বাহিত হয় তাহা দেখিয়া তুলনায় সমালোচনা করিলে অনেক শিক্ষালাভ করিতে পারা যায়। একদিকে দেড়শত হইতে 'হাজার মণি নৌকা' অপরদিকে আট হাজার দশ হাজার হইতে পঞ্চাশ হাজার টন ভারবাহী বিরাট পোত দাঁড়াইয়া আছে। এ উভয়ের মধ্যে তুলনা অসম্ভব হইলেও, শিক্ষালাভ অসম্ভব নহে। প্রথমে সমুদ্রযাত্রা নিষেধ ও তাহার পর জাতিভেদরূপ মহা নিগড়ে যেদিন আমরা

নিজেদের হাত-পা বাঁধিয়াছি সেদিন হইতে অনেক ব্যবসায় লোপ পাইয়াছে আর তাহার বিষময় ফল আমরা এখন ভোগ করিতেছি। যতদিন আমরা ইউরোপের সহিত সংঘর্ষণে আসি নাই ততদিন আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীসমাজ জাতিভেদের বিষময় ফল ভোগ করে নাই। এই পাশ্চাত্য সংঘর্ষণ এত শীঘ্র ঘটিয়াছে যে আমরা উহার ধাক্কা সামলাইয়া উঠিতে পারি নাই। পূর্ব্বে প্রত্যেকটী গ্রাম ক্ষুদ্র সাধারণ তন্ত্রের মত ছিল। প্রত্যেক গ্রামে কামার, কুমার, ধোবা, নাপিত, যজমান, যাজক স্ব স্ব বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়াছে; কিন্তু এখন অনেক জনাকীর্ণ সহরের সৃষ্টি হইয়াছে সুতরাং সে নিয়ম ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে। এখন কলিকাতায় পয়সা দিলেও খাঁটি দুধ মিলে না, মাছ অগ্নিমূল্য ও দুষ্প্রাপ্য; বর্ষাকালে ধোবার বাড়ী কাপড় দিয়া তিন সপ্তাহ কখনো বা এক মাস হাঁ করিয়া পথ তাকাইয়া থাকিতে হয়। এই হাঁ করিয়া থাকিবার জন্য আমরাই দায়ী, কারণ যেমন অন্যান্য বিষয়ে তেমনি এ বিষয়ে আমরাই নিজেদের অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখিয়াছি। পনরো টাকার নকল-নবিশির জন্য সাহেবের বড় বাবু ও আফিসের পেয়াদার খোসামুদী করিয়া ছয়মাস কাটাইতে আমাদের লজ্জা বোধ হয় না কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রণালীতেই হৌক বা লোক রাখিয়া বস্ত্র ধৌত করিবার একটা কারবার (laundry খুলিতে আমাদের সমুদয় সম্মান লোপ পায়। এমন কি আমরা এমনি অসহায় যে নিজেদের কাজটুকুও কোনমতে চালাইয়া লইতে পারি না। এখন বিলাতের মত বড় আয়োজনে (scaleএ) Dairy firming, আমেরিকার মত মৎস্যের চাষ (Pisci culture) শিখিয়া মৎস্য জন্মাইবার চেষ্টা দরকার; তাহার সঙ্গে আবার (laundry firming) কাপড় ধোলাই করিবার কারখানা থাকা চাই। কিন্তু এ সব ব্যাপারে বিদ্যাবুদ্ধি ও সংগঠনী শক্তির সহিত (powers of organisation) যৌথ কারবার খোলা দরকার। কিন্তু আমরা নিশ্চেষ্ট ও অকর্ম্মণ্য হইয়া বসিয়া আছি; সেই সাবেক গোয়ালা, ধোবা ও জেলের উপরেই নির্ভর রহিয়াছে। পদ্মায় অজস্র ইলিশ জন্মায় বটে কিন্তু জেলেদের কাছে দাদন দিয়া বরফাবৃত করিয়া রেলগাড়ী যোগে কলিকাতায় পৌঁছিয়া দিবার ভার বৈদেশিকের উপর নির্ভর করিয়া আমরা সুখে নিদ্রা যাইতেছি এবং ব্যবসায়ের মুনফা আমাদের হস্তচ্যুত হইয়া যাইতেছে। এই প্রকারে বাঙ্গালীর কার্য্যক্ষেত্রের পরিসর ক্রমশঃ গুটাইয়া আসিতেছে। যাহা কতক আমাদের জ্ঞাতসারে ও কতক অজ্ঞাতসারে একবার গুটাইতে আরম্ভ করিয়াছে তাহাকে যথাসময়ে ঠেকাইয়া রাখি-



বার চেষ্টা না করিলে পরে যে কেবল অনুশোচনা করিতে হইবে এ কথা বলাই বাহুল্য। দেখিতে সামান্য অথচ ফলে বৃহৎ এই যে ব্যাপারগুলি এ গুলি আমাদের দৃষ্টি এড়ায় ইহা কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নহে।

আমাদের দেশে যাহাদের আমরা এখন "ভদ্রলোক" বলিয়া থাকি তাহাদের জীবিকার একমাত্র অবলম্বন চাকুরী হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং এই চাকুরী জোগাড় (secure) করিবার একমাত্র উপায় বিশ্ববিদ্যালয়ের "ছাপ" আদায় করা। সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারে আসিয়া আঘাত করিতেছে। যদি বুঝিতাম যে বিদ্যাশিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিলাভ করা একই কথা তাহা হইলে আমার কোনও আপত্তি ছিল না কিন্তু এই উপাধিলাভের প্রধান উদ্দেশ্য কেরাণিগিরি বা ওকালতিতে প্রবেশাধিকার লাভ, এ কথা প্রসঙ্গক্রমে পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে. শতকরা নিরান্নব্বই জন লোক উপাধিলাভের পর সরস্বতী দেবীর নিকট হইতে চির বিদায় গ্রহণ করেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় একটী বিরাট কারখানা বা সুরকির কলে পরিণত হইয়াছে। আমা-ঝামা ও ভাল পোড়ের ইট এক সঙ্গে পেষিত হইয়া সেই সুরকিতে পরিণত হয়। প্রতিভা (Genius) র স্ফূর্ত্তি হয় না। আজকাল দেখা যায় এক এক কলেজে বিশেষতঃ দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে সাড়ে চারি শত পাঁচ শত ছাত্র। অধ্যাপক ও ছাত্রের সহিত এখানে ব্যক্তিগত কোন সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া অসম্ভব। কেবল টীকা টিপ্পনি গলাধঃকরণ করানো ও percentage রক্ষা করাই যেন বিদ্যাশিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাস্তবিক এ বিষয়ে আলোচনা করিলে দেখা যায় যাহারা যৌবনকালে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ফার্কতনামা লইয়া বিদায় হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যেই প্রকৃত প্রস্তাবে অনেকের প্রতিভার বিকাশ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। এখনি কয়েকটী নাম আমার মনে আসিতেছে। কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, নলিন বিহারি সরকার, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, শিশির কুমার ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই সকল ক্ষণজন্মা পুরুষ স্ব স্ব ক্ষেত্রে যে প্রকার অসাধারণত্ব দেখাইয়াছেন, জিজ্ঞাসা করি কয়জন উপাধিধারী তাহা পারিয়াছেন? এস্থলে ইহা বুঝিতে হইবে না যে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার বিরোধী; আমার বক্তব্য এই যে অন্যান্য সুসভ্য দেশের ন্যায় সকলেই মোটামুটি—যিনি যতদূর পারেন সকলেই স্কুলে বিদ্যাভ্যাস সমাপন করিয়া নানা ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ বাণিজ্য ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবেন। অবশ্য একেবারেই ভুঁইফোড় হইয়া

রামদুলাল সরকার হইবেন এ কথা বলি না ; কিন্তু মাড়োয়ারীদিগের ন্যায় শিক্ষানবিশ ( apprentice ) হইয়া বাণিজ্যক্ষেত্রে ঢুকিবেন। কারণ সকল ক্ষেত্রেই শিক্ষানবিশির একটা মূল্য আছে। না-পড়িয়া পণ্ডিত হওয়ার মত ভয়ঙ্কর জিনিস আর কিছুই নাই। বিশেষতঃ ব্যবসায় ক্ষেত্রের উত্থান পতন অতি ভয়ানক ; যে কাজ এত গভীর দায়িত্বপূর্ণ সে কাজে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে একটু শিক্ষার দরকার একথা বুঝাইয়া বলিবার দরকার করে না। অল্পদিনের মধ্যেই অনভিজ্ঞ লোকের ব্যবসায় চেষ্টা নিষ্ফল হইয়া যায়, তাহার দৃষ্টান্ত খুঁজিবার জন্য বেশি দূর যাইতে হইবে না। সুতরাং এ শিক্ষাকে কিছুতেই উপেক্ষার ভাবে দেখিতে বলিতে পারি না।

প্রকৃত প্রস্তাবে বলিতে গেলে গত পাঁচ বৎসর হইতে আমাদের জাতীয় জাগরণের সূত্রপাত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে আমরা কল কারখানা স্থাপন ও নানা প্রকার ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছি, কিন্তু কোনও দিকে তাদৃশ কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই বলিয়া হতাশ্বাস হইয়া পড়িতেছি এবং কেহ কেহ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে বাঙ্গালী জাতির দ্বারা কিছু হইবে না ; কিন্তু তাঁহারা অনেক সময়ে ভুলিয়া যান যে ইউরোপ যে আজ বাণিজ্যক্ষেত্রের সর্ব্ববাদিসম্মত নায়কত্ব লাভ করিয়াছে তাহা পাঁচশত বৎসর বা ততোধিক কালের বংশপরম্পরালব্ধ অভিজ্ঞতার ফল। আমরা তাহা এক দিনেই করিতে পারি নাই বলিয়া নিরাশ হইবার কোনও কারণ নাই। যে সময়ে বঙ্গদেশ রঘুনন্দনের শাসনে নিপীড়িত হইয়া জড়বৎ হইয়াছিল এবং সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হওয়ায় ভারতবর্ষের বাহিরে যাতায়াত বন্ধ হইয়াছিল সেই সময়ে একবার ভিনিসের অবস্থা ও নৌ-বাণিজ্যের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়।*

* "It is not easy to realise what Venice must have looked like with this teeming life along her quays and streets, when the pulse of the commercial world beat fullest at Rialto ; but there stand forth, to assure us of its splendour, the enthusiastic descriptions of Frate Faber, Pietro Casola, above all of Francesco Petrarch, who bursts into panegyric. "From my windows on the Riva degli Schiavoni", he says, "I see vessels as large as my house with masts taller than its towers. They sail to all parts of the world, and brave a thousand dangers. They carry wine to England : honey to the Scythians ; saffron, oil, linen to Assyria, Armenia, Persia and Arabia ; wood to Egypt and Greece ; then return laden with

মানসী—

ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

*Printed by K. V. Seyne & Bros.*

আজকাল দেখা যায় শিল্প বাণিজ্য শিখিবার জন্য শত শত বাঙ্গালী যুবক ইউরোপ জাপান আমেরিকায় ছুটিতেছেন। তাঁহারা শিক্ষিতব্য বিষয়ে যতদূর পারেন জ্ঞানলাভ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া হতাশ হইয়া বেড়াইতেছেন। তুমি বস্ত্ররঞ্জনই (dyeing) শেখ, বৈদ্যুতিক পূর্ত্তকার্য্যই (electric engineering) শেখ, কি কোন বিশেষ রাসায়নিক শ্রমশিল্পই ( chemical industry ) শেখ, যতদিন আমাদের দেশের লোক সেই সমস্ত ব্যাপারে (enterprise) প্রবৃত্ত না হইবে ততদিন এই বিদেশলব্ধ শিক্ষা কার্য্যকরী ও ফলবতী হইতে পারিবে না ও এই সকল লোকের কাজে লাগিবার কোন উপায়ই হইবে না। এমন কি স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মাও যদি স্বর্গ হইতে আমাদের কল কারখানা নির্ম্মাণ করিবার জন্য অবতীর্ণ হন তাহা হইলেও তিনি হার মানিয়া পলাইবেন। বঙ্গদেশে যত কল কারখানা, বলিতে গেলে বৈদেশিকের হস্তে ; তাঁহারা যে স্বজাতির মধ্য হইতে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি নির্ব্বাচন করিয়া লইবেন ইহাতো সহজ কথা। আমরা গতানুগতিক হইলে চলিবে না।

উপসংহারে শুধু এই কথাই বলিতে চাই যে এই ভীষণ প্রতিযোগিতার দিনে আমাদের যুবকগণ বসিয়া থাকিলে অথবা নিজীবভাবে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পাশ ফেল গণনা করিলে চলিবে না। দেশে ছোট বড় অনেক চাকুরে লোক আছে তাহাদের বংশ বৃদ্ধি করা কখনও যুবকদের জীবনের লক্ষ্য হইতে পারে না। এ আশা, এ মায়া ত্যাগ করিতেই হইবে। একটী সবল, জীবন্ত যুবক সমাজের দরকার হইয়াছে। গণ্ডীছাড়া স্বাধীন শিক্ষা লাভের জন্য উৎসুক, কর্ম্মোৎসাহে চির নবীন যুবক সম্প্রদায় চাই ; তাহারাই এ দেশকে নূতন করিরা গড়িবে নূতন মহিমায় মহিমান্বিত করিয়া তুলিবে। বঙ্গীয় যুবকসমাজের সম্মুখে এক বিষম সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। এই সমস্যার সমাধান যদি তাঁহাদের দ্বারা সম্ভবপর না হয় তাহা হইলে ভবিষ্যৎ বড় অন্ধকারময়। যদি এ প্রবন্ধে আমি কোথাও কঠোর কথা ব্যবহার করিয়া থাকি তবে তাহা ক্ষোভের বশবর্ত্তী হইয়াই করিয়াছি, আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই, থাকিতেও পারে না। যেমন নব রবিকিরণে উদ্ভাসিত তরুণ

merchandise to be distributed all over Europe. Where the sea ends their sailors quit the ships and travel on to trade with India and China ; they cross the Caucasus and the Ganges, and reach the Eastern Ocean." Vide The Venetian Republic, page 81.

কিশলয়ের শোভা মনোমুগ্ধকর হইলেও আপনাকে বড় করিয়া তুলিবার তাহার একটা ক্ষমতা নাই তেমনি আমাদের দেশের যুবকবৃন্দের দুর্ব্বল স্বাস্থ্যের স্নিগ্ধ হাস্য দেখিয়া আমার একদিকে সহানুভূতি ও অন্যদিকে গভীর দুঃখ হয়। বিধাতার সৃষ্ট একটা জাতির পরিণাম কি এতই ভয়ানক হইবে? এমনি করিয়া কি দিন দিন নিশ্চেষ্টতা ও উৎসাহবিহীনতা বঙ্গের যুবকদিগকে গ্রাস করিতে থাকিবে? তাহা কখনই হইতে পারে না। তাঁহাদের জড়তা ত্যাগ করিতেই হইবে; তাঁহাদের উঠিয়া বসিয়া নূতন পন্থা অবলম্বন করিতেই হইবে। এ পথ ছাড়া আর কোনও পথ নাই। এ পথ অবলম্বন করিতে না পারিলে কেবল অনাহারে এতটা মস্তিষ্কশক্তিসম্পন্ন বাঙ্গালীজাতি লয় প্রাপ্ত হইবে।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

---

# মাধবী-লতা।

( একটি মৃতপ্রায় মাধবী-লতাকে পুনর্জীবিত দেখিয়া
এই কবিতাটি লিখিত হইল )

১

মাধবী লতা, মাধবী লতা,
জীর্ণ শীর্ণ ছিলি;
হোত ভাবনা, তুই ললনা,
মরণে বরিলি!—
কোন্ সে যোগে? কোন্ বিয়োগে,
ছিলিরে জ্ঞানহারা?
বাণ-আহত পাখীর মত,
নাহিক ছিল সাড়া!
তুষারে হারা ঝরণা-পারা
ছিলিরে যেন শব!
পোড়ো বাড়ির শাঁকের মত,
তুই ছিলি নীরব!—



মাধবী লতা, মাধবী লতা,
জীর্ণ শীর্ণ ছিলি,
হোত ভাবনা, তুই ললনা,
মরণে বরিলি!

২

অকস্মাৎ ঝঞ্ঝাবাৎ
থাম্‌লে যেমন ধনি,
নীল আকাশে চন্দ্র হাসে,
হাসে তারা-মণি,
স্নেহের লতা, মাধবী লতা,
হাস্‌লি তেম্‌নি তুই,
ফুলে ফুলে উঠ্‌লি দুলে,
লো আনন্দময়ি!—
গভীর রাতি, নাহিক বাতি,
দীপ্‌টি ল'য়ে করে,
সুহাসিনী, গৃহের রাণী,
পশেন যবে ঘরে,
ঘরটি হাসে কি উল্লাসে!—
তেম্‌নি ধনি ঠিক্,
জ্বল্‌লো তোর অমল দেহে,
জ্বল্ জ্বল্ মাণিক!—
মাধবী লতা, মাধবী লতা,
জীর্ণ শীর্ণ ছিলি,
শুভক্ষণে, লো ললনে,
জীবনে বরিলি!

৩

হেরি স্বজনি, দুখ-রজনী
গেল পোহায়ে তোর,
কি তামাসা! নাচ্চে আশা
দেহ-দেউলে মোর!

মধুর মধুর বাজ্‌চে নূপুর,
হীরক জ্বলে ভালে,
যাদুকরী, আশাপরী
নাচ্চে তালে তালে!
বল্‌চে আশা, মধুর-ভাষা,
জীবন-লতায় * মোর—
"প্রাণ-স্বজনি দুখ-রজনী
তোরো হবে ভোর!
"(যেমন) ভাঙ্গা বীণার কথা ফুটে,
নিপুণ গুণীর করে!
"(যেমন) নীরব শঙ্খ বেজে উঠে
উৎসবের ঘরে!
"(তোরো) প্রাণ-বাঁশরী উঠ্‌বে বাজি
পেয়ে বংশীধরে!"
(আহা) কি মধুবাণী! জুড়ায় প্রাণী,
অবাক্ হয়ে রই!—
ঢাল্ ঢাল্ আবার অমিয়ার ধার,
আশা সুধাময়ী!

৪

(যদিও) "মলিন-ছবি জীব-মাধবী!
দেহ-নিকুঞ্জে হায়,
"অনাথিনী, ভিখারিণী,
ধূলায় ধূসর কায়,
"কাঁপে থর থর, মরণের শর
লেগেছে যেন গায়!
"(আহা!) ধূলায় চুমে লুটায় ভূমে;—
যদিও ঝঞ্ঝাবাৎ
করিয়ে দীর্ণ, জীর্ণ শীর্ণ,
বহিছে সারা রাত,

* জীবনলতা=জীবাত্মা।



"(তবু) এত সাধনা, এত কামনা,
বিফল নাহি হবে!
"(তুই) অমর হবি, জীব মাধবি,
জাগ্‌বি কোকিল-রবে!—
"(যেমন) গুটি * ভেদি, প্রজাপতি
হিরণ-বরণ পাখা;
"(যেমন) ভেদি তিমির নিশীথিনীর,
ফুল্লচন্দ্র রাকা;
"(যেমন) অঙ্কে পতির বিরহিণীর,
বহু রজনী পর
হাসি লজ্জা ফুটে উঠে,
রঞ্জি' দু'অধর;
"(যেমন) বহু ভাগ্যে বন্ধ্যা নারীর
অঙ্কে সুকুমার;
"(যেমন) ভেদি পাথর ঝর্ ঝর্ ঝর্
ঝরে গঙ্গাধার;
"(তোরো) এ শীত-অন্তে নব বসন্তে
ফুট্‌বে কুসুমদল!
"(আর) জাগ্‌বে আহা বিশ্ব প্রেমের
হর্ষ-কোলাহল!"—
(আহা) কাণ জুড়াল, প্রাণ জুড়াল,
অবাক্ হ'য়ে রই!
ঢাললি আহা, সুধার ধারা,
আশা সুধাময়ি!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

* গুটি=গুটিপোকা।

# নৈদাঘ-নিশীথ-স্বপ্ন।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বৈজয়ন্তী নগরী—কানাইয়ের বাটী।

( কানাই, রামা, ভুতো, ছিরে, তিনু এবং পাঁচুর প্রবেশ। )

কানাই। আমাদের দল সব এয়েছে ত ?

ভুতো। তুই ফর্দ্দ মতে একে একে তাদের ডেকে দেখ্ না।

কানাই। এ যে ফর্দ্দ ! সব কটীই সহর-বাছা লোক ! সকলে বলে যে, রাজার বিয়ে-রাত্রে থিয়েটার কর্‌বার জন্যে এমন লোক আর পাওয়া যাবে না।

ভুতো। কানাই, প্রথম বল্, কি নাটক নাচ্‌তে হবে। তার পর, যারা নাচ্‌বে, তাদের নাম পড়িস ; তবে সে কথার যুত হয়।

কানাই। আমাদের নাটকের নাম ( পড়িতে পড়িতে ) "শোকাবহ হাস্যান্তক নটন্যাস ইন্দ্রজিত বধ।"

ভুতো। বড় মজার বহি। আমি ঠিক বল্‌ছি, ওতে বড় মজা আছে। এখন কানাই, তোর নাচ ওয়ালাদের ডাক্। দাঁড়াও হে, সার করে দাঁড়াও।

কানাই। আমি যেমন ডাক্‌বো, উত্তোর করিস। ভূতনাথ তাঁতি।

ভুতো। হ্যেঁ দে ! আমার পাঠ কি বল, তার পর আর নাম করিস্।

কানাই। ভূতো, তুই ইন্দ্রজিত সাজ্‌বি।

ভুতো। ইন্দ্রজিত কি ছিলো রে ! রসিক না তিক্ষি ?

কানাই। হ্যাঁ রে, রসিক ; পীরিতির জন্য পরাণ দিয়ে ছিলো।

ভুতো। তবে কাঁদতে হবে বুঝি ? তা হ'লে তুই দেখিস্, আমি আসর ভাসিয়ে দিব। কিন্তু তিক্ষি হ'লে বেশী কাঁদতে পার্‌তাম—

"যদি পাষাণে বীজ না হবে অঙ্কুর,
তবে কেন বলি তোরে দয়াল ঠাকুর।"

দেখ্‌ছিস কেমন রামপ্রসাদী ! এখন আর বাকি সকলের নাম বল্।

কানাই। শ্রীরাম কর্ম্মকার।

ছিরে। হেথা।

কানাই। তুই প্রমীলা সাজ্‌বি।



ছিরে। সেটা কি বলরামের গোষ্ঠী নাকি ?

কানাই। না রে, ইন্দ্রজিতের "ইস্তিরী।"

ছিরে। না ভাই, আমাকে মেয়ে মানুষ সাজাস্ নে, আমার দাড়ি উঠ্‌ছে।

কানাই। তাতে আট্‌কাবে না ; তোর যে মুখোস থাক্‌বে। খুব ছোট করে কথা বল্‌বি।

ভূতো। যদি মুখোস্ পর্‌তে হয়, তবে আমি প্রমীলাও সাজবো। আমি খুব ছোট ছোট বল্‌বো। "প্রমীলা" "প্রমীলা", "প্রাণের ইন্দ্রজিত", "তোমার প্রমীলা", তোমার দুঃখিনী জননী।"—

কানাই। দূর গাধা, সীতা রামের মা নহে, মাগ। তুই ইন্দ্রজিত সাজবি, আর ছিরে প্রমীলা হবে।

ভূতো। আচ্ছা।

কানাই। বেচারাম দর্জ্জি।

বেচারাম। হাজির, কানাই।

কানাই। বেচারাম, তুমি ইন্দ্রজিতের দ্রোপদী সাজ্‌বে।

রাম চন্দ্র স্বর্ণকার—

রামা। হেথা, কানুরাম।

কানাই। তুমি ইন্দ্রজিতের বাবা, আমি প্রমীলার বাবা। তিনকড়ি কাঁসারী ! তুমি হনুমান সাজ্‌বে। আর তা হ'লেই একখানি থিয়েটার হ'লো !

তিনু। হনুমানের পাঠ লেখা আছে ? তা হ'লে আমাকে দেও, আমি শীঘ্র মুখস্ত কর্‌তে পারিনে।

কানাই। তোর্ শিখ্‌তে হবে না, তুই বক্তৃতা করে ফেলিস। কারণ, তোর পাঠ কেবল গজরাণ মাত্র।

ভূতো। আমি হনুমান সাজ্‌বো। এমন গজরাব যে, লোকের পিলে উল্‌টে দেব। রাজা শুনে খোস্ হবে।

কানাই। তা হলে তুই এক বিট্‌কেলে কার-খানা করে ফেল্‌বি ; রাণী শুনে হয় ত মূর্চ্ছা যাবে ! তা হলেই আমাদের প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

সকলে। তা হলে আমাদের সক্কোলের ফাঁসি দেবে।

ভূতো। রাণী ভয়ে রাজাকে বাপ ডেকে ফেল্লে তো ফাঁসি দেবে ! কিন্তু ভয়ে আমি গলা এত চড়িয়ে নেব যে, পায়রার ডাকে মধুর মধুর গজ্‌রাব। বুল্‌বুলের ডাকে গজরায়ে সকলের আক্কেল গুড়ুম করে দেব।

কানাই। তুই কেবল ইন্দ্রজিত সাজবি। রাম তোর মত আলকাতরা মাখা তেলাল জোরা ছিল।

ভূতো। আচ্ছা, তবে তাই সাজবো। হনুমানের লেজে আগুণ দিতে হবে ত? নেজে আগুণ দিলে যে আসর পুড়ে যাবে।

কানাই। এই নে তোর পাঠ। কাল মুখস্ত করে রাত্রে বনের ভিতর যাবি। সেখানে জ্যোৎস্নায় বসে মুজরো হবে; তা না হ'লে কালেজের যত বদ ছেলে আমাদের পেছনে লাগবে, আর সব মাটি করবে। সেই বটতলা—বুঝলি?

সকলে। আচ্ছা।

[ প্রস্থান।

ক্রমশঃ

---

# তামাকের ধোঁয়া।

প্রাতে চা-পানের পর যখন ধূমপানের পালা আসে, তখন আপনার গড়গড়াটির দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়াছেন কি? আপনার মুখ হইতে যে ধোঁয়া বাহির হয়, তাহার রঙ প্রায় সাদা। কিন্তু প্রত্যেক টানের শেষে কলিকা হইতে যে ধূম নির্গত হয় তাহার রঙ সুস্পষ্ট নীল। যদি তামাক না চলে, তবে আপনার চুরুটের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করি। চুরুটের ডগা হইতে আপনা আপনি যে ধোঁয়া বাহির হইবে, তাহার বর্ণ নীল দেখাইবে। আর আপনি মুখ হইতে যে ধোঁয়া ছাড়িবেন, তাহার বর্ণ প্রায় সাদা দেখাইতে থাকিবে। যদি তামাক বা চুরুট কিছুই না চলে, আর স্বয়ং পরীক্ষা করিতেও যদি সাহস না হয়, তবে আপনাকে কোন ধূমপায়ী বন্ধুর শরণাপন্ন হইতে বলিতেছি। তিনি যদি পাকা লোক হন, তবে অবিলম্বে পরীক্ষা সুরু করিয়া ধোঁয়ার দুই রঙ্ দেখাইয়া দিবেন। হুঁকা কলিকাতেও পরীক্ষা চলিবে,—কিন্তু নস্যতে কখনই চলিবে না।

তামাক চুরুটের ব্যবহার যুগ যুগান্তর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু ইহার বর্ণ বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিয়া কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত হইয়াছেন এসংবাদ পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই। সেদিন একখানা কেতাবে পড়িতেছিলাম, ব্যাপারটি একদিন হঠাৎ চুরুটসেবী প্রসিদ্ধ ইংরাজ বৈজ্ঞানিক টিণ্ডাল ( Tyndal ) সাহেবের নজরে পড়িয়াছিল। তার পর ইঁহারি কয়েক বৎসর



ব্যাপী গবেষণার ফলে এখন আমরা সাধারণ বর্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল রহস্য জানিতে পারিয়াছি তাহা বড়ই অদ্ভুত। এক তামাকের ধোঁয়ার তত্ত্বনির্ণয় করিতে গিয়া ইনি অনন্ত মহাকাশ, বিশাল মহাসমুদ্র, দিগন্তবিস্তৃত মহারণ্য প্রভৃতি খুব বড় বড় ব্যাপারের বর্ণরহস্য আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছিলেন। সত্যই,—প্রকৃতিদেবী কোন ছলে কখন তাঁহার মুখের বিচিত্র আবরণখানি টানিয়া নিজের মূর্ত্তি প্রকাশ করেন, তাহা আমরা কল্পনাই করিতে পারি না। সাদাসিধে তামাকের ধোঁয়ার ভিতর দিয়া যে, কখন অনন্ত মহাকাশ ও অকূল সমুদ্রের বর্ণ বৈচিত্র্যের একটা কিনারা পাওয়া যাইতে পারে, একথা নিশ্চয়ই খুব পাকা তাম্রকুটসেবীও কোনদিন মনে করিতে পারেন নাই।

যাহা হউক মুখ দিয়া যে ধোঁয়া ছাড়া যায় তাহা সাদা হয় কেন, আর কলিকার আগুনের ধোঁয়াই বা অনন্ত মহাকাশের নীলিমার অনুকরণ করে কেন, তাহা বুঝিবার পূর্ব্বে, বর্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞানের মূল সূত্রটিকে একবার স্মরণ করা আবশ্যক হইবে। তাম্রকুটের বর্ণদ্বৈত উহারি উপর প্রতিষ্ঠিত। পাঠক অবশ্যই জানেন আমরা মাঠেঘাটে ফুলে ফলে ঘটেপটে যে সকল বর্ণ দেখিতে পাই, তাহার সকলি সূর্য্যালোকের বর্ণ। লোহিত হইতে আরম্ভ হইয়া অনুজ্জ্বল বেগুণে পর্য্যন্ত সকল বর্ণই সূর্য্যালোকে আছে। এগুলি সব একসঙ্গে থাকিলে সাদা রঙ্ প্রকাশ পায়। কিন্তু ইহাদেরি মধ্যে যদি দুই একটি রঙকে হরণ করা যায়, তবে পূর্ব্বের সেই সাদা রঙ আর সাদা থাকে না, স্পষ্ট রঙিন্ হইয়া দাঁড়ায়। লাল কাচের ভিতর দিয়া আমরা যখন সাদা সূর্য্যালোককে আনিয়া ফেলি, আলোক লাল দেখায়। রশ্মির হরণই এই ব্যাপারের কারণ। স্বচ্ছ লাল কাচের এমন একটি গুণ আছে যে, সূর্য্যালোক হইতে সব কয়েকটি রঙ্ হরণ করিয়া সে কেবল লালকে ভিতর দিয়া যাইতে দেয়। কাজেই বাহিরের সাদা সূর্য্যালোক কাচ ভেদ করিয়া বাহিরে আসিলেই লাল হইয়া দাঁড়ায়। যত রঙিন্ স্বচ্ছ জিনিস আছে, সকলেরই বর্ণ ঠিক পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তুঁতে গোলা জলের এমন একটি গুণ আছে যাহা দ্বারা জলটা সূর্য্যালোকের লোহিত পীত নীল বেগুণে প্রভৃতি সকল বর্ণকেও গ্রাস করিয়া, কেবল সবুজকে ভিতর দিয়া আসিতে দেয়। এই জন্যই তুঁতে-গোলা সবুজ।

যে সকল জিনিস অস্বচ্ছ অথচ রঙিন্ তাহাদের বর্ণোৎপত্তির আর একটা কারণ আছে। মনে করা যাউক যেন লাল ফুলের বর্ণোৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান

করা যাইতেছে। বৈজ্ঞানিকগণ বলিবেন, সাধারণ সাদা সূর্য্যালোক যখন ঐ ফুলের উপর আসিয়া পড়ে, ফুলটা লাল ব্যতীত অপর সকল বর্ণরশ্মিকে গ্রাস করিয়া বসে। কাজেই সূর্য্যালোকের সেই সাতটা বর্ণের মধ্যে এক লাল ব্যতীত আর কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না। এই রশ্মি প্রতিফলিত হইয়া যখন আমাদের চোখে আসিয়া পড়ে, তখনি আমরা ফুলটিকে লাল দেখি। সবুজ পাতা লাল পীত নীল বেগুণে ইত্যাদি সকল রশ্মিকে হরণ করিয়া কেবল সবুজকে প্রতিফলিত করে, তাই গাছের পাতা সবুজ। রঙিন অস্বচ্ছ জিনিস মাত্রেরই বর্ণোৎপত্তির এই প্রকার ব্যাখ্যান দেওয়া যাইতে পারে।

এখন তামাকের ধোঁয়ার রঙের কারণ অনুসন্ধান করা যাউক। কলিকার বা চুরুটের আগুন হইতে যে ধোঁয়া বাহির হয়, তাহার বর্ণ ঘোর নীল। রৌদ্রে বসিয়া পরীক্ষা করিলে রঙ্‌টাকে ঠিক শরৎ-কালের আকাশের ন্যায়ই ঘোর নীল দেখায়। কিন্তু ধোঁয়াটাকে সূর্য্য ও চক্ষুর মাঝখানে রাখিয়া পরীক্ষা করিলে, তখন তাহার আর সে নীলবর্ণ থাকে না। ভিতর দিয়া যে সূর্য্যালোক আসে, তাহাতে উহা লাল্‌চে বাদামি রঙের আভাযুক্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং বলিতে হয়, তামাকের ধোঁয়াকে যখন আমরা পাশ হইতে দেখি, তখন সূর্য্যালোকে সেটি সাধারণ অস্বচ্ছ জিনিসের ন্যায় কাজ করে। অর্থাৎ ধোঁয়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলি সকল রঙকে হরণ করিয়া সূর্য্যালোকের কেবল নীল রঙটাকেই আমাদিগকে দেখায়। কিন্তু উহারি ভিতর দিয়া যখন সূর্য্যালোক আসিয়া চোখে পড়িতে থাকে, তখন আমাদের পূর্ব্ব উদাহরণের রঙিন স্বচ্ছ পদার্থের ন্যায় উহার কার্য্য সুরু হয়। এই অবস্থায় সূর্য্যালোকের অনেক রঙ্‌ই ধোঁয়ায় আট্‌কাইয়া যায়, এবং যাহাতে বাদামি রঙের উৎপত্তি হয় সেই প্রকার কয়েকটি রঙ্‌ নির্ব্বিঘ্নে বাহিরে আমাদের চোখে পড়ে।

একাধারে একই জিনিসে এই প্রকার দুই রঙের প্রকাশ বড়ই দুর্লভ এবং অদ্ভুত। বোধ হয় অধ্যাপক টিণ্ডাল এই জন্যই বিষয়টি লইয়া গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। যাহা হউক গবেষণার ফলে জানা গিয়াছিল, যে সকল জিনিস অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণা দ্বারা গঠিত তাহাদের উপর সূর্য্যালোক পড়িলেই, আলোকের কেবল নীল রঙটাই প্রতিফলিত হইয়া আসে। চুরুট তামাক বা কাষ্ঠ সকলেরি ধোঁয়া অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গারকণা দিয়া গঠিত। এই জন্যই উহার উপর হইতে সূর্য্যালোকের যে রশ্মিটা প্রতিফলিত হইতে পায়, তাহা নীল। কলিকার নীল ধোঁয়া গুড়গুড়ির জলের ভিতর হইতে বাহির হইলেই



তাহার নীলিমা ঘুচিয়া যায়। জিনিসটা প্রায় সাদা হইয়া পড়ে। চুরুটের ধোঁয়া কয়েক সেকেণ্ডের জন্য মুখবিবরে রাখিয়া ছাড়িয়া দিলেও তাহারো ঐ দশা ঘটে। ইহার ব্যাখ্যানে টিণ্ডাল সাহেব বলিয়াছিলেন,—আগুন হইতে বাহির হইবা মাত্র ধোঁয়ার কণাগুলি যত ক্ষুদ্র থাকে, চুরুটের ভিতর দিয়া বা গুড়গুড়ির নলের ভিতর দিয়া মুখে আসিলে সেগুলি তত ছোট থাকে না। সংকীর্ণ স্থানে কিছুকাল ঘেঁসাঘেসি হইয়া থাকায় কণাগুলি পরস্পর মিলিয়া আকারে বড় হইয়া পড়ে। এ অবস্থায় উহারা আর নীলরশ্মি প্রতিফলিত করিতে পারে না। সূর্য্যালোকের প্রায় সকল রশ্মিই ধোঁয়ার বড় বড় কণিকায় ঠেকিয়া আমাদের চোখের দিকে আসে। কাজেই আমরা তখন ধোঁয়াকে সাদাই দেখিতে থাকি।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কোন জিনিস খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং বিচ্ছিন্ন কণা দ্বারা গঠিত হইলে সূর্য্যালোকের পীত লোহিতাদি রশ্মিগুলিকে গ্রাস করিয়া সেটি কেন নীলকেই প্রতিফলিত করে? যে ঈথর নামক সর্ব্বব্যাপী পদার্থের ক্ষুদ্র তরঙ্গের আলোকের উৎপত্তি হয়, তাহার দৈর্ঘ্য ইত্যাদি মাপিয়া বৈজ্ঞানিক ও গাণিতিকগণ একত্রে প্রশ্নটির মীমাংসা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধীয় হিসাব পত্রের একটা স্থূল বিবরণ দিতে গেলেও একটা বৃহৎ নীরস গ্রন্থ হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই বৈজ্ঞানিক ও গণিতবিদ্‌দিগের সিদ্ধান্তে পাঠককে বিশ্বাস করিতে বলা ছাড়া এখন আর উপায় দেখিতেছি না।

তামাকের ধোঁয়া নীল হউক বা লোহিত হউক, তাহাতে বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই—কিন্তু এই সামান্য ব্যাপার হইতে বর্ণোৎপত্তির যে একটা নিয়ম ধরা পড়িয়াছে তাহাই উল্লেখযোগ্য। আকাশের রঙ্‌ নীল। এই ব্যাপারটীর কারণ দেখাইতে গিয়া কত লোকে কত কথাই না বলিয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ ইহার ব্যাখ্যানে এখন বলিতেছেন, ধোঁয়ায় সূর্য্যালোক প্রতিফলিত হইলে যেমন নীলটাই চোখে আসিয়া পড়ে, এখানেও সেই প্রকার আকাশে ভাসমান সূক্ষ্ম জলীয় বাষ্প বা ধূলির কণায় পতিত শুভ্র আলোক সব মৌলিক রশ্মিগুলিকে হারাইয়া কেবল নীলকে লইয়া চোখের দিকে ছুটিয়া আসে। জলোদুধ পাঠক অবশ্যই দিবারাত্রি দেখিতেছেন। কিছুক্ষণ রাখিলেই এই অপূর্ব্ব জিনিসটার রঙ্‌ মহাসমুদ্রের মত নীল হইয়া পড়ে। দুধে যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘৃত-কোষ থাকে তাহাতে সূর্য্যালোক প্রতিফলিত হইয়া দুধকে নীল করে।

চক্ষুর তারা নীল সবুজ কালো কত রকমেরই আছে। নয়নযুগল নীলাব্জের

ন্যায়ই হউক, কি ভ্রমরকৃষ্ণ হউক, সকলের মূলে কিন্তু সেই তামাকের ধোঁয়ার সিদ্ধান্তটাই বর্ত্তমান। শারীরবিদ্‌কে জিজ্ঞাসা কর, তিনি বলিবেন মানুষের চোখের খুব ভিতর দিকে একটা কৃষ্ণ পর্দ্দা আছে। তাহার উপর আবার এক প্রকার অর্দ্ধস্বচ্ছ তরল জিনিসে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা ভাসিতে থাকে। এই তরল বস্তুর একটা বর্ণ আছে। খুব ফিকে বাদামি হইতে আরম্ভ করিয়া লোকবিশেষে প্রায় কৃষ্ণবর্ণ পর্য্যন্ত নানা রঙ উহাতে দেখা যায়। যাঁহার চক্ষুতে জিনিসটা গাঢ় বাদামে রঙে থাকে তাঁহার ত কথাই নাই। তিনি এক জোড়া ভ্রমরকৃষ্ণ নয়ন লাভ করিয়া বসেন। কিন্তু রঙ্‌টা একটু ফিকে রকমের হইয়া পড়িলেই সর্ব্বনাশ! তখন সেই ভাসমান কণাগুলি নীল রঙ প্রতিফলিত করিয়া, নীচেকার সেই কালো পর্দ্দার যোগে চক্ষুর তারাকে নীল বা সবুজ করিয়া তুলে। বিড়ালাক্ষ ও নীলনয়নের যতই আকর্ষণী শক্তি থাকুক না কেন, কিন্তু সকলের মূলে যে সেই তামাকের ধোঁয়ার ব্যাপারটা লুকানো আছে, তাহা মুগ্ধ সমজদারগণকে আবার স্মরণ করাইয়া দিতেছি।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

---

## বর্ষা-উপহার।

দিয়াছি শারদ প্রাতে, কুবলয় স্নিগ্ধ উপহার
বন্দিনী করেছি তোমা' দুটী হাত বাঁধিয়া মৃণালে,
হেমন্তে দিয়াছি ঢেকে সুকৃষ্ণ ও কবরী তোমার
শেফালির মালা দিয়ে; তারপর জীর্ণ শীতকালে
গন্ধ-পুষ্প রাশি রাশি, তার সাথে বিচিত্র গোলাপ
আনিয়াছি সুচরিতে, মুগ্ধ আমি দিতে প্রেমাঞ্জলি!
বসন্তে অঞ্চল তব শোভিয়াছে যেন ইন্দ্রচাপ
ফুলে ফুলে; ঘিরি তারে নাচিয়াছে মধুমত্ত অলি।
মালতী বকুল চাঁপা, ঈষদুষ্ণ নিদাঘ-প্রভাতে
ঢালিয়া দিয়াছি এনে সুকোমল শয্যায় তোমার,
প্রাবৃটে রজনী-গন্ধা, হেনারাণী অন্ধকার রাতে
ফুলশয্যা পাতিয়াছে তোমা' লাগি' আনন্দে অপার;
বরষা প্রভাতে আজি আঁখি মেলে চেয়ে দেখ সখি
দুয়ারে দাঁড়ায়ে কবি হাতে ল'য়ে ফুটন্ত কেতকী!

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।



# লজ্জার উৎপত্তি ও অভিব্যক্তি।

লজ্জার সহিত মানুষের যেমন ঘনিষ্টতা, বোধ করি স্নেহ মায়া প্রভৃতির সহিত ততদূর নয়। এমন লোক আছে যাহাদের স্নেহ মমতা নাই, কিন্তু লজ্জা নাই একথা বলা যায় না। লজ্জা যেন মানবের নিত্য সহচরী। ইহার হাত এড়ান মানুষের পক্ষে একরূপ অসম্ভব। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি লজ্জার উৎপত্তি ও অভিব্যক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ লজ্জা বলিতে আমরা কি বুঝি তাহাই দেখা যাউক। লজ্জা শব্দে প্রধানতঃ তিনটি ভাব ব্যক্ত হয়। সে তিনটি ভাব এই –(১) Shyness অর্থাৎ লোক ভীরুতা বা আলাপ-বিমুখতা। অনেক লোক আছে, যারা অপরের সম্মুখে বাহির হইতে, কথা কহিতে, কি কোন কাজ করিতে কেমন একরূপ অকারণ সঙ্কোচ বোধ করে—এ একরূপ লজ্জা; (২) Shame—অপরাধ জনিত সঙ্কোচ—এও একরূপ লজ্জা; (৩) Modesty—"লজ্জা স্ত্রী জাতির ভূষণ" এ কথাটিতে, স্ত্রীলোকের আচার ব্যবহারে, কথা বার্ত্তার, ভাব ভঙ্গিতে ও বেশ ভূষায় যে একরূপ সুকুমার শালীনতা, অপ্রগল্‌ভতা ও বিনয় নম্রতাকে উদ্দেশ করা হয় তাহাই—এও একরূপ লজ্জা।

লজ্জার উৎপত্তি বিশ্লেষণ করিতে গেলে দেখা যায় সর্ব্বপ্রকার লজ্জার মূলে দুইটি স্বতন্ত্র ভাব নিহিত আছে—(১) ভয়; (২) আত্মবোধ বা আত্মানুভূতি। ভয় ও আত্মবোধকে অবলম্বন করিয়াই লজ্জা প্রকাশ পাইয়া থাকে।

ভয়ের সহিত লজ্জার যে একটা সম্বন্ধ আছে প্রাচীন কালেও লোকের নিকট তাহা অবিদিত ছিল না। Aristotle তাঁহার গ্রন্থের মধ্যে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। পৃথিবীর অনেক ভাষার ভয় ও লজ্জা একই শব্দ দ্বারা ব্যক্ত হয়। ইংরাজি timid শব্দে ভীরু ও লাজুক দুই অর্থই হয়।

ভয় ও লজ্জা পরস্পরে কিরূপ সম্বন্ধ—তাহার কথা পারে হইবে—এখন আত্মবোধের সহিত লজ্জার কি সম্বন্ধ তাহাই দেখা যাউক।

আত্মবোধ না হইলে, লজ্জা জন্মায় না। দুই এক বৎসরের শিশুর ভয় থাকা সম্ভব বটে, কিন্তু লজ্জা থাকার কোন সম্ভাবনা নাই। তখনও তাহার আত্মবোধ হয় নাই সে আপনাকে অনুভব করিতে পারে নাই। আত্মবোধ আত্মবোধ আছে বলিয়াইত আমাদের সম্বন্ধে কেহ যদি কোন কথা বলে,

আমরা তাহা অবাধে উপেক্ষা করিতে পারিনা। লোকের মতামতকে আমরা মনে মনে ভয় করিয়া থাকি। আত্মবোধ যখন লজ্জার একটি প্রধান কারণ—তখন ইহার সম্বন্ধে এস্থলে দুচারিটা কথা বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

দু তিন বৎসরে শিশুর অস্তিত্বজ্ঞান জন্মায় বটে, কিন্তু তাহার আত্মবোধ জন্মাইবার কোন লক্ষণ পাওয়া যায় না। সে নিজের বিষয়ে আপনার মনকে নিযুক্ত করিতে পারেনা, তাহার জীবনের ভূতভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সম্বন্ধে কোন চিন্তা করিতে পারেনা। অধিক কি, সে যে দেখিতে কেমন, তাহারও একটা ধারণা করিতে সক্ষম হয় না। অনেকে বলেন শিশু যেদিন হইতে প্রথম পুরুষ ব্যবহার করিতে শিখে, সেই দিন হইতে তাহার আত্মানুভূতির অস্পষ্ট সঞ্চার হয়। শিশু কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াই কিছু 'আমি' পদ ব্যবহার করে না। এ সময় যে তৃতীয় পুরুষ প্রয়োগ দ্বারা আপনাকে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করে। তাহার নাম যদি হরি হয় তাহা হইলে "আমি খাব" না বলিয়া "হরি খাবে" "আমি শোব" না বলিয়া "হরি শোবে" এইরূপ বলিয়া থাকে। তারপর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে "আমি খাব" "আমি শোব" প্রভৃতি বলিতে থাকে। সেই সময় হইতেই তাহার আত্মবোধের সৃষ্টি। Sully ইহাকে আত্মজ্ঞানের অঙ্কুরাবস্থা বলিয়াছেন। এখনও তাহার পূর্ণ আত্মবোধ হয় নাই। কেবল তাহার জড়দেহ সম্বন্ধে আত্মবোধ হইয়াছে মাত্র। তাহার মন সম্বন্ধে আত্মবোধের এখনও বিলম্ব আছে এবং যতদিন ইহা না জন্মায়, ততদিন পূর্ণ আত্মবোধ জন্মিয়াছে বলা যায় না। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে আত্মবোধ দুই প্রকার, জড়দেহ সম্বন্ধে আত্মবোধ ও মন সম্বন্ধে আত্মবোধ বা অন্তর্দ্দর্শন।

দেহ সম্বন্ধে আত্মানুভূতি যার খুব বেশী হয়—সে সর্ব্বদা আপনার রূপ বিষয়ক চিন্তায় মগ্ন থাকিতে ভালবাসে। সে মনে করে তার রূপটা শুধু তার নিকট নয়—অপরের নিকটও চিন্তার বিষয় হইয়াছে। এই বিশ্বাস বশতঃ যে যেখানেই থাক্ না কেন, মনে করে লোকের চক্ষু তাহার উপরেই পড়িয়া আছে। এখন তাহার যদি এমন জ্ঞান থাকে যে সে ভারি সুপুরুষ, তাহা হইলে সে মনে করিবে যে লোকেরাও তাহাকে সুপুরুষ বলিয়াই মনে করিতেছে। আর তাহার নিজেকে যদি কুৎসিত বলিয়া ধারণা থাকে তবে তাহার মনে হইবে যে লোকে তাহার এই কুরূপ লইয়া আলোচনা করিতেছে



এবং উপহাস করিতেছে। দার্ব্বিন্ ( Darwin ) বলেন মানুষের আপনার বাহ্য রূপের প্রতি এই যে একান্ত দৃষ্টি, ইহা হইতেই লজ্জার সৃষ্টি হইয়াছে। কাহারও রূপ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিলে তাহাতে সে যত লজ্জিত হয় তেমন আর অন্য কিছুতেই নয়। দৈবক্রমে কোন ব্যক্তির একটা দাঁত যদি কিছু বড় হয়, কিম্বা নাকটা একটু ছোট হয় এবং কেহ যদি উক্ত দাঁত ও নাকের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাহাতে সেই ব্যক্তির যত লজ্জা হইতে দেখা যায়, এমন বোধ করি আর কিছুতেই নয়। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীজাতির রূপানুরাগ বেশি, সেই জন্যই পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী জাতির মোটের উপর লজ্জার পরিমাণও বেশি। বৃদ্ধের লজ্জাবোধ, তরুণদিগের অপেক্ষা ঢের কম। শিশুর আত্মবোধ না থাকায়, কিছুমাত্র লজ্জা হয় না। আর একটি কথা এই যে, কোন যুবতী অপর এক যুবতীর রূপ সম্বন্ধে যদি কোন কথা বলেন, তাহাতে তিনি যত লজ্জিত না হয়েন, ঠিক ওই কথা যদি কোন পুরুষ বলে, তাহাতে তাঁহার অতিরিক্ত পরিমাণে লজ্জার উদ্রেক হয়। পুরুষের বেলায়ও ঠিক ওইরূপ ব্যাপার ঘটিতে দেখা যায়।

দ্বিতীয় প্রকার আত্মবোধের নাম অন্তর্দ্দর্শন। শিশু যত বড় হইতে থাকে, সে ততই তাহার মনের সন্ধান পায়। সে বুঝিতে পারে তার এই জড় দেহটা লইয়াই সে নয়—ইহার উপর আর যেন কিছু আছে। সে যে চিন্তা, ভাব ও ইচ্ছাশক্তি বিশিষ্ট একটা জীব, তাহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। এখন হইতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সে আপনাকে পরীক্ষা করিতে থাকে। তাহার মনে যে সকল চিন্তার উদয় হয় এবং সে যে সকল কার্য্য করে, তাহাদের ভাল মন্দ বিচার করিবার শক্তি জন্মায়। এখন সে তাহার বুদ্ধির সম্বন্ধেও ধারণা করিতে সমর্থ হয়। তাহার জীবনের অতীত ইতিহাসের আলোচনা এবং ভবিষ্যৎ জীবনের কর্ত্তব্যাবধারণ করিতে সক্ষম হয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে দেহজাত আত্মানুভূতির আতিশয্য হইতে লজ্জা জন্মায়—আবার অতিরিক্ত অন্তর্দ্দর্শন হইতেও যে লজ্জা জন্মাইতে না পারে এমন নয়। এ ব্যক্তি মনে করে লোকে তাহার শক্তি সামর্থ্য, চরিত্র আচরণ প্রভৃতি লইয়া আলোচনা করিতেছে এবং তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপ করিতেছে। এইরূপ ভাব মনে উদিত হইবামাত্র তাহার লজ্জা হয়। কিন্তু নিজের শক্তি সামর্থ্যাদি সম্বন্ধে যদি তাহার ভাল ধারণা থাকে তাহা হইলে লজ্জা না হইবারই সম্ভাবনা।

এখন প্রশ্ন এই—কাহারও যে লজ্জা হইয়াছে তাহা বুঝিবার উপায় কি? লজ্জা হইলে চোক মুখের একরূপ পরিবর্ত্তন হয়—তাহা দ্বারা আরও কত গুলি ভাবভঙ্গি দ্বারাও লজ্জা ব্যক্ত হয়। লজ্জাজ্ঞাপক ভাবভঙ্গি গুলি আবার দেশ বিদেশে, জাতি বিশেষে কতকটা বিভিন্ন হইতে দেখা যায়। আমাদের দেশের কোন স্ত্রীলোকের লজ্জা হইলে তিনি মাথার কাপড়টা হয়তো একটুখানি টানিয়া দিবেন, কোন ইংরাজ মহিলার লজ্জা হইলে তিনি হয়তো মুখখানি একটু নত করিবেন। এই জন্য এগুলিকে সার্ব্বজনীন-লজ্জা-জ্ঞাপক চিহ্ন বলা যাইতে পারে না। সর্ব্বাপেক্ষা সাধারণ লজ্জাজ্ঞাপক চিহ্ন হইতেছে—সহসা মুখ লাল হওয়া। সুতরাং লজ্জার ইহাই সর্ব্ব-প্রধান বাহ্য লক্ষণ।

মুখ লাল অবশ্য মুখমণ্ডলে অধিক রক্ত যায় বলিয়াই হইয়া থাকে। এ সময় মুখের blood vessels রক্তবহা নালীগুলি অধিক প্রসারিত হয় ( Vasodilating )। ভাবের উত্তেজনায়, হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বৃদ্ধি বশতঃ উহাদের মধ্যে অধিক রক্ত প্রেরিত হয়, এই জন্যই মুখ ও কর্ণমূল রক্তিমাভ হয়। এখানে এই তর্ক উঠিতে পারে, লজ্জা হইলে, সুধু মুখের রক্তবহা নালীগুলিই প্রসারিত হয় কেন? অন্যত্র হয় না কেন? এ সম্বন্ধে অনেক মত দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন আমাদের শরীরের অন্যান্য অংশের তুলনায় মুখমণ্ডলই সর্ব্বদা অনাবৃত থাকে, এই জন্য ইহার রক্তবহা-নালীগুলির প্রসারণ ও সঙ্কুচন শক্তি অন্যান্য অংশের নালীগুলি অপেক্ষা অধিক পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে। দার্ব্বিন ( Darwin ) ইহার সমর্থন করেন না। তিনি বলেন, তবে লজ্জা হইলে আমাদের হস্তদেশই বা লাল হয় না কেন? আমাদের হস্তও ত বড় কম অনাবৃত থাকে না। দার্ব্বিন বলেন শরীরের কোন বিশেষ স্থানে যদি একান্ত মনে নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা হইলে সেই স্থানই লাল হইতে পারে। পৃথিবীর সর্ব্বদেশে, সকল জাতির মধ্যেই মুখই রূপের প্রধান কেন্দ্র বলিয়া বিবেচিত হয়। এই জন্য পুরুষপরম্পরায় আমাদের মনটা শরীরের অন্যান্য অংশের তুলনায় মুখের প্রতিই বিশেষ আকৃষ্ট। তাহারই ফলে ইহার রক্তবহানালী গুলির ( blood vessels ) প্রসারণ শক্তি অধিকতর পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে। যখনই আমাদের মনে হয় কেহ আমাদের মুখের প্রতি লক্ষ্য করিতেছে, তখনই আমাদের মনটাও আমাদের নিজের মুখের দিকে ধাবিত হয়, সেই সঙ্গে



মুখের দিকে অধিক রক্ত প্রেরিত হয় আর উহা রক্তাক্ত হইয়া উঠে। দার্ব্বিনের এ যুক্তি অনেকেই সমর্থন করেন না। সে যাহাই হউক লজ্জায় যে মুখ লাল হয়, ইহাতে আর তিলমাত্র সন্দেহ নাই।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী।

---

# জ্যোৎস্না নিশীথে।

স্থান,—পার্ব্বত্য প্রদেশ।

সময়,—মধ্যরাত্রি।

আজি বসন্তের এক অপূর্ব্ব রজনী!
দ্বাদশীর ভাঙ্গা চাঁদ সোণা মুখ খানি
হেলায়ে গগন প্রান্তে,—রূপসীর মত
ঘুমে যেন দেখিছে স্বপন। কত শত
তারকারা খুলি দিয়া আঁখি সুকুমার
হেরিতেছে নির্নিমিষে ঘুমন্ত ধরার
জীবন-স্পন্দন। আর নিথর আকাশে
একখণ্ড শুভ্র মেঘ ধীরে ধীরে ভেসে
নিরুদ্দেশ লক্ষ্যপানে করিছে প্রয়াণ;—
কে জানে কোথায় গিয়া হবে অবসান
এই দীর্ঘ পর্য্যটন!

দক্ষিণ বাতাস,
সহসা আসিয়া কাছে ফেলে দীর্ঘশ্বাস
বিরহীর মত। সুন্দরী অরণ্য ভূমি
প্রমত্ত এ পবনের ওষ্ঠাধর চুমি'
পল্লব মর্ম্মরে করে প্রেম সম্ভাষণ।—
পাদপে পবনে আজ একি আলিঙ্গন!
অরণ্য কুসুম রত্নে পূর্ণ বনস্থল,—
আকুল হৃদয় পূর্ণ।

জোছনা তরল
দিকে দিকে পড়িয়াছে মূর্চ্ছাতুর প্রায়
অন্তর বেদনা ভারে ; গভীর তন্দ্রায়,
ঝিল্লির মধুর রবে মগ্না নিশিথিনী ;
অদূরে অরণ্যমাঝে আজ কোন প্রাণী
ডাকে না এখন ; একি অপূর্ব্ব সজ্জায়
সেজেছে বসন্ত নিশি লঘু জোছনায় !
সম্মুখে বহিয়া যায় স্তব্ধ একাকিনী
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি প্রশান্ত তটিনী ;
সকম্পিত তীর-তরু-ছায়া বারে বারে
ম্লান চন্দ্রকর সহ কতনা আকারে
খেলিছে সলিল 'পরে। হেরি চারিধার,
পূর্ণপ্রাণ অনিমিষে বিমুগ্ধ আমার !

অতিদূরে শৈলশ্রেণী বনস্পতি সহ
আচ্ছন্ন ঘুমের ঘোরে। অন্তরে দুঃসহ
ব্যথা ল'য়ে আমি হেথা নিদ্রাহীন চোখে
চেয়ে আছি নিসর্গের পানে চন্দ্রালোকে।
মনে মনে রচিতেছি অসীমের সীমা
এ অপূর্ব্ব দৃশ্য দিয়া গড়িয়া প্রতিমা।

শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

---

## ৺রমেশচন্দ্র দত্ত।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

নীলমণি দত্তের তিন পুত্র—রসময়, শ্রীদাম ওরফে হরিশ, এবং পীতাম্বর। এটর্ণি শ্রীযুক্ত কালীনাথ মিত্র, সি, আই, ই, নীলমণির দুহিতার বংশধর।

রসময় দত্ত কলিকাতার ছোট আদালতের প্রথম বাঙ্গালী জজ ও সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ইংরাজী, সংস্কৃত, আরবী ও পার্সী ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল।

রসময়ের পাঁচ পুত্র—কৃষ্ণচন্দ্র, কৈলাসচন্দ্র, গোবিন্দচন্দ্র, হরচন্দ্র ও গিরীশচন্দ্র। এটর্ণি শ্রীযুক্ত নিমাইচন্দ্র বসু ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ রসময় দত্তের দৌহিত্র।



কৃষ্ণচন্দ্রের দুই পুত্র—হেমচন্দ্র ও চারুচন্দ্র। হেমচন্দ্র কলিকাতার টাকশালের দেওয়ান ছিলেন, এবং পাথুরিয়াঘাটার ৺খেলাচন্দ্র ঘোষের দুহিতার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বনামখ্যাত রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর হেমচন্দ্রের জামাতা। চারুচন্দ্র কলিকাতা হাইকোর্টের এক জন ব্যারিষ্টার।

কৈলাশচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র, ইংরাজী ও ফরাসী সাহিত্যে কৃতবিদ্য, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত কলিকাতা মিউনিসিপালিটির কলেক্টরের কার্য্য করিতেন। উমেশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত যোগেনচন্দ্র দত্ত, এম্, এ, একজন এটর্ণি ও অনারেরি ম্যাজিষ্ট্রেট।

"Dutt Family Album"—প্রকাশক, হিন্দু কলেজের সিনিয়ার স্কলার, গোবিন্দ্রচন্দ্র দত্ত কণ্ট্রোলার জেনেরলের আফিসে মাসিক সহস্রাধিক মুদ্রা বেতনের কর্ম্ম করিতেন। তাঁহার বিদুষী দুহিতা কুমারী তরু দত্তের "A Sheaf gleaned in French fields" ও Lays and Ballads of India" পুস্তকদ্বয় তৎকালীন শিক্ষিত সমাজকে স্তম্ভিত করিয়াছিল।

"Lotus Leaves" প্রণেতা হরচন্দ্র যৌবনকালে উন্মাদরোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ডাক্তার অরুণচন্দ্র এক শ্বেতাঙ্গীর পাণিগ্রহণ করিয়া বিলাতে বাস করিতেছেন। রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বরুণচন্দ্র দত্ত, এম্ এ, হরচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র।

গিরীশচন্দ্র "Cherry Blossoms" নামক কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা।

স্বর্গীয় পাদরি বম্‌উইচ সাহেবের প্ররোচনে উক্ত চারুচন্দ্র, উমেশচন্দ্র, গোবিন্দচন্দ্র, হরচন্দ্র ও গিরীশচন্দ্র কুলধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। রসময় দত্তের বংশে কেবল তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ও জ্যেষ্ঠ পৌত্র হেমচন্দ্র হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন নাই।

শ্রীদাম ওরফে হরিশের দুই পুত্র—শ্রীকৃষ্ণ ও রাজকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের চারি পুত্র—রমেশচন্দ্রের বাল্যবন্ধু ও হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত, বি, এল্ * পরলোক গত ডাক্তার ইউ, কে, দত্ত, এল, আর, সি, পি, সব্ জজ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত, বি—এল, এবং এটর্ণি শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত, এম্, এ। রাজকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র ডাক্তার উপেন্দ্রকৃষ্ণ এক বিলাতী মহিলা বিবাহ করিয়া ইংলণ্ডে বাস করিতেছেন।

* শ্রদ্ধেয় সুরেন্দ্র বাবুর অনুগ্রহেই, এই অধ্যায়ে বর্ণিত অনেক তথ্য, লেখক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে।

রমেশচন্দ্রের পিতামহ পীতাম্বরের দুই পুত্র—ঈশানচন্দ্র ও শশীচন্দ্র। প্রথমা স্ত্রী গত হইলে পীতাম্বর দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন—তাঁহার পুত্র সন্তান হয় নাই। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে পীতাম্বরের মৃত্যু হয়।

রমেশচন্দ্রের পিতা ঈশানচন্দ্র ১৮১৮ সালের ১লা মার্চ্চ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে তিনি হিন্দু কালেজে প্রবিষ্ট হন। উক্ত কলেজের যে কয় জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছাত্র একটী বিতর্ক সভা স্থাপিত করিয়া "হিন্দুবার্ত্তাবহ" নামক একখানি মাসিকপত্র প্রচার করিতেন, ঈশানচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। হিন্দু কলেজ পরিত্যাগ করিয়া ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হন। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তথায় পাঠ সমাপন করিয়া প্রশংসাপত্র ও স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। চিকিৎসক-কুল-তিলক গুডীভের সহিত বিলাতে গিয়া চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে তাঁহার বাসনা ছিল, কিন্তু ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে আত্মীয় কৈলাসচন্দ্র দত্তের প্ররোচনে, তিনি ডাক্তারি ছাড়িয়া ডেপুটি কলেক্টর হইতে বাধ্য হন। একবিংশ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার বেতন মাসিক পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছিল। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে খুলনার নিকট হঠাৎ জলমগ্ন হইয়া তাঁহার দেহান্তর হয় †।

রমেশচন্দ্রের মাতা থাকমণি কৃষ্ণসিংহের গলি ( এখন বেথুন রো ) নিবাসী স্বর্গীয় রামরতন বসুর কন্যা। থাকমণির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺চন্দ্রনাথ বসু, পঞ্জাবের অন্তর্গত গুরুদাসপুরে ডাক্তারি করিতেন, এবং কনিষ্ঠভ্রাতা অমৃতলাল বসু গুরুদাসপুরের ডেপুটি কমিশনরের আফিসের হেডক্লার্ক ছিলেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে রমেশচন্দ্রের জননী পরলোক গমন করেন।

ঋগ্বেদ সংহিতা"র উৎসর্গ-পত্রে রমেশচন্দ্র তাঁহার পিতামাতার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন ঃ—

"যাঁহাদিগের সরল সত্যপরায়ণ পবিত্র জীবনের স্মৃতিমাত্র এ জগতে আমার ধর্ম্মস্বরূপ হইয়াছে; যাঁহাদিগের অসীম স্নেহ ও বাৎসল্যের চিন্তা আমার শান্তি স্বরূপ হইয়াছে; সেই স্বর্গারূঢ়া জননী থাকমণি ও স্বর্গীয় জনক ঈশানচন্দ্র দত্তের পবিত্র নাম গ্রহণ করিয়া এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিলাম।"

ঈশানচন্দ্রের তিন পুত্র ও তিন কন্যা, যোগেশচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, অবিনাশচন্দ্র, শ্রীমতী চমৎকারমোহিনী, শ্রীমতী অপরাসুন্দরী ও স্বর্গীয়া সুরথকুমারী।

† রামলাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত "ঈশানচন্দ্র দত্তের জীবনী" হইতে লেখক সাহায্য পাইয়াছেন।

মানসী—

স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত।

*Printed by K. V. Seyne Bros.*

কাশ্মীরের ইতিহাস "রাজতরঙ্গিনী"র ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া ও "Indian Pilgrim" নামক কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া, যোগেশচন্দ্র খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ১৯১০ সালের ৮ই মে তারিখে তাঁহার স্বর্গপ্রাপ্তি হইয়াছে। অগ্রজ যোগেশচন্দ্র সম্বন্ধে, "জীবন সন্ধ্যা" পুস্তকের উৎসর্গপত্রে, রমেশচন্দ্র লিখিয়াছিলেন :—

"প্রিয় ভ্রাতঃ, এই সংসার-স্বরূপ ভীষণ কার্য্যক্ষেত্রে তোমার ভালবাসা, আমার জীবনের শান্তিস্বরূপ হইয়াছে। শৈশবে ঐ স্নেহে আমি পুষ্ট হইয়াছিলাম, বাল্যকালে ঐ ভালবাসায় আমি স্নিগ্ধ ও প্রফুল্ল হইয়াছিলাম। এখনও জীবনের নানা আকাঙ্খায় যখন ক্লান্ত হই, বহুদূরে প্রবাসে জীবনের অনন্ত চেষ্টা পরম্পরায় যখন শ্রান্ত হই, প্রণয়ের অলীকতায় বা সংসারের বাহ্যাড়ম্বরে যখন বিরক্ত হই, তখন ঐ আদর্শরূপ নির্ম্মল চরিত্র, ঐ অকৃত্রিম অমায়িক স্নেহের কথা চিন্তা করি, আমার হৃদয় শীতল হয়, আমি শান্তিলাভ করি।

জগৎ এ সমস্ত কথা জানে না, এ কথা কাহাকে বলিব, কে বুঝিবে? জগতে নানা আকাঙ্খার কথা শুনিতে পাই; ধন, মান, খ্যাতি, ক্ষমতার জন্য অনন্ত চেষ্টা ও উদ্যম দেখিতে পাই; এই চেষ্টায় ভ্রাতাকে ভ্রাতা ঠেলিয়া যাইতেছে, পিতাকে পুত্র ঠেলিয়া যাইতেছে। এ ভীষণ কার্য্যক্ষেত্রে তোমার ন্যায় ঋষিতুল্য অমায়িক লোক অলক্ষিত, অপরিচিত, অনাদৃত!

শৈশব ও বাল্যকালের একমাত্র সহচর! জীবনের প্রথম ও প্রিয়তম সুহৃদ্! ত্রিশ বৎসর যে তোমার অতুল স্নেহে প্রফুল্লতা ও শান্তিলাভ করিয়াছে, অদ্য সে তোমাকে এই সামান্য উপহার দান করিয়া আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিল।"

যোগেশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র একজন সিভিলিয়ান। তাঁহার মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত অশোকচন্দ্র এখন বিলাতে পাঠ সমাপন করিতেছেন।

রমেশচন্দ্রের অনুজ অবিনাশচন্দ্র ইংলণ্ড ও জর্ম্মনিতে বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিয়া, প্রথমে পাটনা কলেজে ও তৎপরে হুগলী কলেজে বিজ্ঞানাচার্য্যের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়. অনুজ সম্বন্ধে "মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত" গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে, রমেশচন্দ্র লিখিয়াছেন :—"প্রিয় ভ্রাতঃ, ইউরোপ হইতে তুমি যে নানা ভাষা ও নানা বিদ্যা আহরণ করিয়া আনিয়াছ, তাহা যখন চিন্তা করি, তখনই আনন্দিত হই। কিন্তু তুমি ইহা অপেক্ষাও অমূল্য রত্নের অধিকারী। সে রত্ন নির্ম্মল উদার চরিত্র মনঃসংযমে অসাধারণ ক্ষমতা,

বিজ্ঞানচর্চ্চায় আনন্দনীয় উৎসাহ ও জীবনব্যাপী চেষ্টা। এই অসাধারণ সদ্‌গুণ সমূহ দ্বারা স্বদেশের মঙ্গল সাধন কর, ভ্রাতার এই মঙ্গলেচ্ছা। ভ্রাতার জীবন-ব্যাপী স্নেহের সামান্য নিদর্শন-স্বরূপ এই পুস্তকখানি তোমাকে অর্পণ করিতেছি।"

সহোদরাগণ সম্বন্ধে, "হিন্দুশাস্ত্র" গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রে রমেশচন্দ্র লিখিয়াছিলেন :—

"হিন্দুশাস্ত্র পাঠ করাই তোমাদের পরম আনন্দ, হিন্দুধর্ম্ম পালন করাই তোমাদের জীবনের ব্রত. তোমাদের স্নেহ, তোমাদের ভালবাসা, তোমাদের যত্ন, আমি এ জীবনে কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না ; তবে এ পুস্তকখানি হাতে করিয়া তোমরা আনন্দলাভ করিবে; শাস্ত্রকথাগুলি পাঠ করিয়া সন্তোষ-লাভ করিবে, কেবল এই ভরসায় আমার এই কার্য্যফল তোমাদিগকেই উৎসর্গ করিলাম।"

বিলাত-প্রত্যাগত ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু, আই, এম্, এস্, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত জ্যোতিশচন্দ্র বসু, এম্, এ, রমেশচন্দ্রের গ্রন্থ-প্রকাশক শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ মিত্র—ইহারা দত্ত মহাশয়ের ভাগিনেয়।

রমেশচন্দ্রের পিতৃব্য শশীচন্দ্র, ১৮২৪ খ্রীষ্ট্রাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬২ হইতে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি ছোটলাটের দপ্তরে কর্ম্ম করিয়াছিলেন। রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের সময়, তিনি ছয়শত টাকা বেতনের, রাজস্ব বিভাগের হেড্ এসিষ্টাণ্ট ছিলেন। কার্য্যদক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ তিনি "রায় বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁহার লেখনী প্রসূত "Historical studies and Recreations," "India Past and Present," "Reminiscences of a Kerani's life," "A vision of Sumeru and other poems" প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। রমেশচন্দ্রের পিতৃবিয়োগ হইলে, শশীচন্দ্র তাঁহার শিক্ষা পরিদর্শন করিতেন। তিনিই রমেশচন্দ্রের হৃদয়ে তেজস্বিতা ও সাহিত্যিক গৌরবস্পৃহার বীজ রোপণ করেন। এ সম্বন্ধে যোগেশচন্দ্র লিখিয়াছেন ;—"Two very important lessons my brother learned from him—independence of character and thirst for literary fame." ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র তাঁহার "Literature of Bengal" নামক পুস্তক, শশীচন্দ্রের নামে কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ও স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ ("as a token of gratitude, esteem and affection") উৎসর্গ করিয়াছিলেন। শশীচন্দ্রের উন্মাদরোগাক্রান্ত পুত্র ও সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ পৌত্র এক্ষণে মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীটে বাস করিতেছেন।

শ্রীগৌরহরি সেন।

---



# বঙ্গ রমণী।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

সমাজের অঙ্গ সবল থাকিলে যেরূপ পূর্ণতা লাভ করা যায়, অঙ্গ হানি হইলে তদ্রূপ ধ্বংসের পথেও অগ্রসর হইতে হয়। বাঙ্গালীর সমাজ এখন আর সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ, সৌষ্টবসম্পন্ন নহে, হীনতায় মলিন ও নিষ্প্রভ। ইহার প্রধান কারণ, নারী সমাজের দুরবস্থা। পুরুষ ও রমণী লইয়াই সমাজ গঠিত। উভয়ের সম্বন্ধ এরূপ ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত যে, একের অবনতিতে অন্যের অবনতি অপরিহার্য্য। এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম কুত্রাপিও ঘটে না। বঙ্গসমাজে নারীকুলের প্রতি অবজ্ঞা ও তাচ্ছীল্য প্রকাশ যে আমাদিগের অবনতির প্রধানতম কারণ, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না।

পরিতাপের বিষয়, এদেশে যাঁহারা শিক্ষিত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও এরূপ লোক দেখা যায়, যাঁহারা পাশ্চাত্য আচার ব্যবহার, রীতিনীতির নাম শ্রবণেই নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন। ইহারা যুক্তিও মানেন না, গোঁড়ামীর ধুয়া ধরিয়া সকল কথাই উড়াইয়া দিতে চাহেন। ইঁহাদিগের অপেক্ষা সমাজের অধিকতর অনিষ্টকারী আর কেহই নাই। কারণ অজ্ঞ, অন্ধবিশ্বাসী, একদেশদর্শী, সেকালের কুসংস্কারপূর্ণ মতাবলম্বীরা পূর্ব্বোক্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়কে পৃষ্ঠপোষক স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে উন্নতির পথাবরোধ করিতে অগ্রগণ্য হইয়া থাকেন। যতদিন এই শোচনীয় অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইতেছে, ততদিন দেশে সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে আন্দোলন করা উচিত। যাঁহারা বলেন, গলাবাজিতে কোন কাজ হইবে না, এখন কেবল কাজ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, আমরা তাঁহাদিগের সহিত একমত হইতে পারি না। গলাবাজীই বলুন, প্রবন্ধ লেখাই বলুন, আর "হাতে কলমে" কাজ করাই বলুন, সকলই ফলপ্রদ।

কোনটাই নিরর্থক বা নিস্ফল হয় না। বক্তৃতাপ্রদান বা লেখনীচালনাকে একটা প্রধান কার্য্যের মধ্যে গণ্য করিতে হইবে। আমরা যাহা ভাবি, তাহাও যখন নিস্ফল বা নিরর্থক হয় না, তখন বক্তৃতা প্রদান বা প্রবন্ধ লেখায় যে অধিকতর কার্য্য হয় না তাহা কেহই বলিতে পারেন না।

আর এক কথা। আমরা কার্য্যানুষ্ঠানের বিরোধী নহি। তবে বক্তৃতা ও প্রবন্ধ লেখায় কোন উপকার হয় না, সুতরাং উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত, এরূপ কথা যাঁহারা বলেন, আমি তাহাদিগের সহিত একমত হইতে পারি না। সভ্য জাতির প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন, দেখিবেন আমাদিগের সমাজ প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্য সমাজ অপেক্ষা কত নিম্ন স্তরে অবস্থিত। এরূপ মনে করিবেন না যে, আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতা ভব্যতা, শিক্ষা দীক্ষার অন্ধ পক্ষপাতী, তজ্জন্যই ঐরূপ অভিমত প্রকাশ করিতেছি। আমরা জানি, আমাদিগের দেশে এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা গৃহমার্জ্জারবৎ কোণে বসিয়া গর্জ্জন করিতে পটু, অথচ সাহেবের সমাজে যাইলে লাঙ্গুল গুটাইতে লজ্জা বোধ করেন না, ইঁহারা পাশ্চাত্য সমাজের ত্রুটী অম্লানবদনে স্বীকার করিয়া থাকেন। আমরা এই শ্রেণীর অসার অপদার্থ যুক্তিতর্ক গ্রাহ্য করি না। যাঁহাদিগের মনুষ্যত্ব আছে, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া তাঁহারা বলুন দেখি, পাশ্চাত্য মহিলা দেখিলে আমাদিগের রমণীকুল নতশির হয়েন কিনা, সাহেবদিগের নিকট অনেকে পাশ্চাত্য সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন কি না? পাশ্চাত্য রমণীর নিকট বঙ্গ রমণী যেন সকল বিষয়েই হীনা বলিয়া প্রতীয়মানা হইয়া থাকেন। কেন এমন হয়, তাহা কেহ বলিয়া দিতে পারেন কি? উভয়ের শিক্ষা দীক্ষা যদি সমশ্রেণীস্থ হইত, উভয়ের সভ্যতাদি যদি উচ্চ শ্রেণীর হইত, উভয়েরই অভিজ্ঞতা, বিচক্ষণতায় যদি তারতম্য না থাকিত, তাহা হইলে এমনটী ঘটিত না। একের নিকট অন্য নিষ্প্রভ বা হীনতেজা বলিয়া প্রতীয়মান হইত না।

পাশ্চাত্য সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে আমাদিগকে বোধ হয় আর কোনরূপ যুক্তি তর্কের অবতারণা করিতে হইবে না। যদি তাহাই হইল, তাহা হইলে শ্রেষ্ঠ সমাজে রমণীর আদর কিরূপ, তাহা জানা কর্ত্তব্য। আর কেবল পাশ্চাত্য সমাজের কথাই বা বলি কেন, বৈদিক কুলে আর্য্য জাতির মধ্যেও নারীদিগের মর্য্যাদা কিরূপ ছিল, তাহাও পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। সেই প্রাচীন সমাজ আর এই বর্ত্তমান হিন্দু সমাজ—দুয়ের পার্থক্য কত



বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের অধঃপতনের একটা প্রধান কারণ যে নারীজাতির প্রতি হতাদর করা, তাহা বোধ হয় আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

হিন্দুসমাজে নারীজাতির সত্ত্ব দ্বিবিধভাবে সংরক্ষিত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ ব্যবস্থা-শাস্ত্র সম্মত, দ্বিতীয়তঃ আচার-ব্যবহারানুমোদিত। এদেশে ফৌজদারী আইনে স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধে কোনরূপ স্বতন্ত্র নিয়ম পরিদৃষ্ট হয় না, উভয়েই একই প্রকার নিয়মাধীন।

তাহার পর দেওয়ানী সত্ত্বের কথা। হিন্দু আইন অনুসারে কোন কোনস্থলে বিধবা স্বামীর সম্পত্তির, দুহিতা পিতার, এবং জননী সন্তানের সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়া থাকেন। যদিও স্ত্রীলোকের আইনসঙ্গত বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে সম্পত্তি দান বিক্রয় করিবার ক্ষমতা নাই তথাপি তাঁহার জীবদ্দশায় সম্পত্তির আয় হইতে তাঁহাকে কেহ বঞ্চিত করিতে পারে না।

তাহার পর ভরণপোষণের সত্ত্ব এবং স্ত্রীধনের সত্ত্ব আছে। হিন্দু ব্যবহার শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের ভরণপোষণের টাকা পাইবার সম্বন্ধে যে সুন্দর বিধান আছে, এমন আর কোন সমাজে আছে বলিয়া আমরা অবগত নহি।

স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তিধারী কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল "বঙ্গসমাজে স্ত্রীলোকের স্থান" বিষয়ক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, In its (Hindu Civil Code) rules regarding inheritance, maintenance and more specially "Stridhan" that Code must be acknowledged to be eminently just and equitable towards our country men.*

স্ত্রীধনের কথা অনেকেই অবগত আছেন। স্ত্রীধনে রমণীর সম্পূর্ণ সত্ত্ব থাকে। ইচ্ছা করিলে তিনি উহার যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারেন। স্ত্রীধন ষষ্ঠ প্রকারের। শাস্ত্রে আছে

"অধ্যগ্ন্যধ্যাবাহনিকং ভর্ত্তৃদায়ং তথৈবচ।
ভ্রাতৃদত্তং পিতৃভ্যাঞ্চ ষড়বিধং স্ত্রীধনং স্মৃতম॥
দায়ভাগ ধৃত নারদ বচন॥
প্রাপ্তং শিল্পৈস্তু যদ্বিত্তং প্রীত্যাচৈব যদন্যতঃ।
ভর্ত্তুঃ স্বাম্যাং ভবেৎ তত্র শেষস্তু স্ত্রীধনং স্মৃতম্।
কাত্যায়ন।

* The position of women in Bengali Society. Published by T. P. Mitra, Manager, Bengalee, 76 Colootola Street, Calcutta.

মনু বলিয়াছেন, "বিবাহের হোমাগ্নির সময় যাহা প্রদত্ত হয়, যৌতুকস্বরূপ যাহা প্রদত্ত হয়, স্নেহপরবশ অভিভাবক কর্ত্তৃক যাহা প্রদত্ত হয়, জননী, জনক বা ভ্রাতা যাহা প্রদান করেন, তাহাই স্ত্রীধন হইয়া থাকে।" কাত্যায়ন স্পষ্ট বলিয়া গিয়াছেন, এই স্ত্রীধনে জনক জননী, সহোদর, স্বামী প্রভৃতি কাহারও কোনরূপ ক্ষমতা থাকে না—কন্যা ইচ্ছা করিলে উহা দান বিক্রয় করিতে পারেন।

এখন দেখুন, হিন্দু সমাজে মহিলাদিগের কিরূপ সমাদর আর্য্য ঋষিগণ করিয়া গিয়াছেন। আমাদিগের মনে হয়, এই অধঃপতিত সমাজের নেতারা যদি ব্যবস্থাপক হইতেন, তাহা হইলে স্ত্রীলোকের ধনাধিকার সম্বন্ধে কখনই এরূপ সুন্দর ব্যবস্থা করিতেন না।

শ্রীতারাপ্রসন্ন মিত্র।

---

# দেবতাকাণ্ড।

সম্প্রতি মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের যত্নে শ্রীযুক্ত রংগাচার্য্য এম, এ, 'সর্ব্বসিদ্ধান্ত সংগ্রহ' নামে একখানি দর্শন-সংগ্রহ গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন। এ গ্রন্থ শ্রীশঙ্করাচার্য্য বিরচিত বলিয়া প্রকাশ। গ্রন্থ সম্পাদক রংগাচার্য্য এই শঙ্করাচার্য্যকে প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার শ্রীশঙ্করাচার্য্যের সহিত অভিন্ন ব্যক্তি মনে করেন এবং গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি স্বমতের সমর্থক কয়েকটী যুক্তিরও অবতারণা করিয়াছেন। সে যুক্তির সারবত্তা বিচার করা এ প্রবন্ধের লক্ষ্য নহে। 'সর্ব্বসিদ্ধান্ত সংগ্রহ' যাঁহারই রচিত হউক এ গ্রন্থ যে মাধবাচার্য্যের সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ হইতে প্রাচীন, একথা রংগাচার্য্য নিসংশয়ে প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি ভূমিকায় দেখাইয়াছেন যে, মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে এই গ্রন্থ হইতে অন্ততঃ তিনটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। সে শ্লোকত্রয় এই ঃ—

অগ্নিহোত্রং ত্রয়ো বেদাস্ত্রিদন্তং-ভস্মগুণ্ঠনম্।
বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকেতি বৃহস্পতিঃ॥
পরিব্রাট্ কামুকশুনামেকস্যাং প্রমদা তনৌ।
কুণপঃ কামিনী-ভক্ষ্য ইতি ত্রিস্রোবিকপ্পনাঃ॥
ষট্‌কেন যুগপদ্যোগে পরমাণোঃ ষড়ংশতা।
ষণ্ণাং-সমান দেশত্বে পিণ্ডঃ স্যাদণুমাত্রকঃ॥



'সর্ব্বসিদ্ধান্ত সংগ্রহ' অনুষ্টুপ ছন্দে বিরচিত পদ্য গ্রন্থ। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ গদ্যে রচিত। কেবল স্থানে স্থানে মাধবাচার্য্য প্রমাণ স্বরূপ গ্রন্থান্তর হইতে শ্লোকসমূহ উদ্ধৃত করিয়াছেন। উপরে যে তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল তাহাদের যথাস্থান সর্ব্বসিদ্ধান্ত সংগ্রহের সেই সেই অধ্যায়ে যেখান হইতে মাধবাচার্য্য তাহাদিগকে উদ্ধৃত করিয়াছেন। মাধবাচার্য্য চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক। তিনি বিজয় নগরাধিপতির মন্ত্রী ছিলেন এবং শেষ জীবনে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 'বিদ্যারণ্য' মুনি নামে পরিচিত হন।

শেষ-গোবিন্দ নামে মধুসূদন সরস্বতীর এক শিষ্য এই সর্ব্বসিদ্ধান্ত-সংগ্রহের এক টীকা রচনা করেন। তিনি প্রায় ৩৫০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক। সেই টীকার প্রারম্ভে শেষ-গোবিন্দ ইষ্টদেবতা ও গুরুর প্রণাম করিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন ঃ—

আচার্য্যশঙ্কররকৃতেঃ শেষগোবিন্দসূরিণা।
গুঢ়ার্থক পদব্যাখ্যা সাংপ্রতং সংপ্রতণ্যতে॥

"পণ্ডিত শেষ-গোবিন্দ আচার্য্য শঙ্কর কৃত এই গ্রন্থের গূঢ়ার্থক পদের ব্যাখ্যা সংপ্রতি করিতেছেন।" অতএব, শেষ-গোবিন্দের মতে এ গ্রন্থ আচার্য্য শঙ্কর কৃতই বটে। তাঁহারও পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রীবৈষ্ণব সংপ্রদায়ভুক্ত 'মনবালমা' মুনি এই সর্ব্বসিদ্ধান্ত সংগ্রহ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন ঃ—

"সর্ব্বসিদ্ধান্তসংগ্রহে শঙ্করেণোক্তঃ"

এই 'মনবালমা' মুনি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক। অতএব, সর্ব্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ যাঁহারই রচিত হউক, ইহা যে আধুনিক গ্রন্থ নহে এ কথা নিঃসংশয়িত বলা যাইতে পারে।

গ্রন্থের উপোদ্ঘাত প্রকরণে ( introduction ) গ্রন্থকার লিখিয়াছেন ঃ—

"চতুর্দ্দশসু বিদ্যাসু মীমাংসৈব গরীয়সী"

অর্থাৎ "চতুর্দ্দশ বিদ্যার মধ্যে মীমাংসাই সর্ব্বপ্রধান।" হিন্দুদিগের চতুর্দ্দশ বিদ্যাভেদ সুপ্রসিদ্ধ। বিদ্যার গণনা করিয়া পুরাণের অনেকস্থলে

"বিদ্যাহ্যেতা চতুর্দ্দশঃ"

এইরূপ উক্তি দেখা যায়। গ্রন্থকার উপোদ্ঘাতে প্রথমতঃ এই চতুর্দ্দশ বিদ্যার উল্লেখ করিয়াছেন। বেদের ছয় অঙ্গ চার উপাঙ্গ এবং চার উপবেদ এই সকল চতুর্দ্দশ বিদ্যা।

অঙ্গোপাঙ্গোপবেদাঃস্যুর্বেদস্তৈবোপকারকাঃ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামাশ্রয়াঃ স্যুশ্চতুর্দ্দশঃ॥

অর্থাৎ "অঙ্গ উপাঙ্গ ও উপবেদ এই চতুর্দ্দশ বিদ্যা ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের আশ্রয় এবং বেদেরই উপকারক।"

ছয় বেদাঙ্গ কি কি? শিক্ষা, (স্বরশাস্ত্র), কল্প (প্রয়োগ শাস্ত্র), ব্যাকরণ, নিরুক্ত (etymology), ছন্দঃ ও জ্যোতিষ। মীমাংসা, ন্যায়শাস্ত্র, পুরাণ ও স্মৃতি বেদের এই চার উপাঙ্গ এবং আয়ুর্ব্বেদ, অর্থবেদ, ধনুর্ব্বেদ ও গন্ধর্ব্ববেদ (সঙ্গীত শাস্ত্র) এই চার উপাঙ্গ। এইরূপে চতুর্দ্দশ বিদ্যার উল্লেখ করিয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন ঃ—"চতুর্দ্দশসু বিদ্যাসু মীমাংসৈব গরীয়সী।" এই মীমাংসা শাস্ত্রের পরিচয় স্থলে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, ইহা প্রতিপাদ্য বিষয়ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত এবং ২০ অধ্যায় যুক্ত।

বিংশত্যধ্যায়যুক্তা সা প্রতিপাদ্যার্থতোদ্বিধা। মীমাংসা শাস্ত্রের এই দুই বিভাগের নাম পূর্ব্ব মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা।

কর্ম্মার্থা পূর্ব্বমীমাংসা দ্বাদশাধ্যায়বিস্তৃতা।
অস্যাং সূত্রং জৈমিনীয়ং শাবরং ভাষ্যমস্ততু॥

'কর্ম্মকাণ্ড লইয়া পূর্ব্বমীমাংসা। ইহা দ্বাদশাধ্যায়ে বিভক্ত। জৈমিনি ইহার সূত্র করিয়াছেন এবং শবরকৃত তাহার ভাষ্য আছে।' ইহার পর গ্রন্থকার উত্তরমীমাংসার পরিচয় স্থলে বলিতেছেন ঃ—

ভবত্যুত্তরমীমাংসা ত্বষ্টাধ্যায়ী দ্বিধা চ সা।
দেবতাজ্ঞানকাণ্ডাভ্যাং ব্যাসসূত্রংদ্বয়োস্সমম্॥

উত্তর মীমাংসা আট-অধ্যায়ে বিভক্ত। তাহার আবার দুই বিভাগ-দেবতাকাণ্ড ও জ্ঞান কাণ্ড। উভয়েরই ব্যাসপ্রণীত সূত্র আছে।' জ্ঞানকাণ্ডে মীমাংসা করিয়া বাদরায়ণ যে ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহা আমাদের সুপরিচিত গ্রন্থ। ইহা চার অধ্যায়ে বিভক্ত এবং শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ইহার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। এই জ্ঞানকাণ্ড উত্তরমীমাংসার প্রতি লক্ষ্য করিয়া গ্রন্থকার লিখিতেছেন ঃ—

ভাষ্যং-চতুর্ভিরধ্যায়ৈর্ভগবৎপাদ নির্ম্মিতম্।
চক্রে বিবরণং তস্য তদ্বেদান্তং প্রচক্ষতে॥

'চার অধ্যায়ে বিভক্ত জ্ঞানকাণ্ড মীমাংসার "ভগবৎপাদ" ভাষ্য নির্ম্মাণ করিয়া বিবরণ করিয়াছেন। তাহাকেই বেদান্ত বলে।' এই ভগবৎপাদ কে? যদি শঙ্করাচার্য্য সর্ব্বসিদ্ধান্ত সংগ্রহের গ্রন্থকার হন তবে এই ভগবৎপাদ তিনিই হইতে পারেন না, টীকাকার শেষগোবিন্দ বলেন ঃ—

"ভগবৎপাদঃ শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্য গুরুর্গোবিন্দভগবত্পূজ্যঃ"

অতএব তাঁহার মতে শঙ্করের গুরু গোবিন্দই "ভগবৎপাদ" শব্দের নির্দ্দেশ্য। তাঁহার প্রণীত বেদান্ত সূত্রের কোন বিবরণভাষ্য প্রচলিত নাই। অতএব, মনে হয় যে ভগবৎপাদ স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য এবং যে ভাষ্য উপরি-উদ্ধৃত শ্লোকের লক্ষ্য তাহা শ্রীশঙ্করাচার্য্যের প্রসিদ্ধ শারীরকভাষ্য। কিন্তু সে যাহাই হউক দেবতা-কাণ্ড সূত্র কি গ্রন্থ? ইহার সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলিতেছেন ঃ—

পূর্ব্বাধ্যায়-চতুষ্কেণ মন্ত্রবাচ্যাত্র দেবতা।
সঙ্কর্ষণোদিতা তদ্ধি দেবতাকাণ্ড মুচ্যতে॥

উত্তরমীমাংসা আট অধ্যায়ে বিভক্ত সূত্র গ্রন্থ। গ্রন্থকার বলিতেছেন 'পূর্ব্ব চার অধ্যায়ের নাম দেবতাকাণ্ড। বৈদিক মন্ত্রে যে সকল দেবতার উল্লেখ আছে সঙ্কর্ষণ এই দেবতাকাণ্ডে তাহার বিবরণ করিয়াছেন।' উত্তর মীমাংসার যে সূত্রগ্রন্থ এখন প্রচলিত আছে তাহা চার অধ্যায়ে বিভক্ত। সূত্রাত্মক পূর্ব্ব চার অধ্যায় যাহাকে গ্রন্থকার দেবতাকাণ্ড বলিয়াছেন তাহার কেহ কোন সন্ধান রাখেন কি? এরূপ গ্রন্থ যে এক সময়ে প্রচলিত ছিল সর্ব্বসিদ্ধান্ত সংগ্রহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। কিন্তু এই গ্রন্থের বিবরণ কোথা পাওয়া যাইবে?

সর্ব্বসিদ্ধান্ত সংগ্রহ গ্রন্থে গ্রন্থকার তদানীং প্রচলিত দার্শনিক সিদ্ধান্ত সমূহের সংগ্রহ করিয়াছেন। সে বিবরণ হইতে দেখা যায় যে তখন ন্যায় বৈশেষিক সাংখ্য পাতঞ্জল পূর্ব্বমীমাংসা এবং উত্তরমীমাংসা এই বৈদিক ষড়দর্শন ব্যতীত অবৈদিক লোকায়ত জৈন এবং বৌদ্ধ দর্শনও প্রচলিত ছিল ঃ—

অক্ষপাদঃ কণাদশ্চ কপিলো জৈমিনিস্তথা।
ব্যাসঃ পতঞ্জলিশ্চৈতে বৈদিকাঃ সূত্রকারকাঃ॥
বৃহস্পত্যার্হতৌ বুদ্ধোবেদমার্গবিরোধিনঃ।

গ্রন্থকার প্রথমতঃ অবৈদিক লোকায়ত জৈন ও বৌদ্ধ দর্শনের বিবরণ করিয়াছেন। লোকায়ত দর্শনকে চার্ব্বাক দর্শন বলে। বৃহস্পতি নাকি এই মতের প্রবর্ত্তক। গ্রন্থকার এই অধ্যায়ের নাম দিয়াছেন লোকায়তিক পক্ষ।

অতঃপর তিনি জৈন দর্শনের বিবরণ করিয়াছেন। এ অধ্যায়ের নাম আর্হত পক্ষ। বৌদ্ধপক্ষের বিবরণস্থলে গ্রন্থকার তদানীংপ্রচলিত মাধ্যমিক যোগাচার সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক মতের বিবরণ করিয়াছেন। তাহার পর যথাক্রমে বৈশেষিক ও নৈয়ায়িক পক্ষের পরিচয় দিয়া পূর্ব্ব মীমাংসা দর্শনের বিবরণস্থলে প্রভাকর পক্ষ ও ভট্টপক্ষ এই উভয় মতেরই বিবরণ করিয়াছেন। তাহার পর সাংখ্য ও পাতঞ্জল পক্ষের পরিচয় দিয়া বেদব্যাস পক্ষের বিবরণ করিয়াছেন। শেষ পক্ষ বেদান্ত পক্ষ—গ্রন্থকার ও অধ্যায় অদ্বৈত বেদান্তের বিবরণে নিয়োজিত করিয়াছেন।

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, গ্রন্থোল্লিখিত সমস্ত পক্ষই দার্শনিকদিগের পরিচিত মত। কেবল গ্রন্থকার যাহাকে 'বেদব্যাস পক্ষ' বলিয়াছেন (যাহা তাঁহার মতে মহাভারতে ব্যাস কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে) এই পক্ষের কোন দার্শনিক ভিত্তি দৃষ্ট হয় না। গ্রন্থের বিষয় সংস্থানের প্রতি দৃষ্টি করিলে মনে হয় যে, গ্রন্থকার শেষ দুই অধ্যায় অর্থাৎ বেদব্যাস পক্ষ ও বেদান্ত পক্ষ উত্তর-মীমাংসার বিষয়ীভূত দেবতাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের বিবরণে নিয়োজিত করিয়াছেন। অথচ বেদব্যাস পক্ষ প্রকরণে দেবতার প্রসঙ্গ অত্যল্প। ইহাতে প্রধানতঃ সাংখ্যোক্ত ত্রিগুণতত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়া সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতির গুণ কর্ম্ম বিবেচিত হইয়াছে। সেইজন্য সংশয় হয় যে, গ্রন্থকার উপোদ্ঘাত প্রকরণে উত্তর মীমাংসার পূর্ব্ব অধ্যায়-চতুষ্টয়-নিবদ্ধ যে দেবতাকাণ্ডের উল্লেখ করিয়াছেন বেদব্যাস পক্ষ তাহারই বিবরণ কি না। এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা আলোচনা করিলে ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের এক অজ্ঞাত অধ্যায় আবিষ্কৃত হইতে পারে। সেই আশায় এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এই দেবতাকাণ্ডের প্রতি তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিলাম।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

---



# পূজার ছুটি।

## এক অঙ্কে সমাপ্ত নাটক।

স্থান ঃ—দ্বিতল কক্ষ। কৌচে স্বামী, চেয়ারে স্ত্রী, গড়গড়ায় ধূমোদ্গারী-কলিকা, বারান্দায় কাকাতুয়া, টবে গাছ।

সময় ঃ—আশ্বিনের শুক্লপক্ষ, নিতান্ত নিরালা কক্ষে সূক্ষ্ম চন্দ্রলেখা। পূজার ছুটির পূর্ব্ব সন্ধ্যা।

স্ত্রী। সারাদিন ঘুরে ঘুরে একটা অসুখ না করে, আর ছাড়বে না! এই আপীস থেকে এসেই আবার বেরিয়েছ।

স্বামী। না, ঘুরতে যাই নি ত! সঙ্গীত সমাজে গেছলুম। সেখানে আজ রিজিয়া—প্লে হ'ল কি না; তাই বাবুরা আমাকে ভারি চেপে ধরেছিলেন, যাবার জন্যে।

স্ত্রী। এই রকম ক'রে লোক না জোটালে বুঝি তাঁদের প্লেতে লোক হয় না?

স্বামী। তা হ'বে কেন? তাঁরা যে খুব ভাল প্লে করেন, এমনটি পেশাদারী থিয়েটারেও হয় না।

স্ত্রী। তা আমাদেরত আর দেখাবে না! ভালই হোক আর যা'ই হোক্!

স্বামী। তা না হয় তোমাকে পূজার সময় এক দিন অলিক্ থিয়েটার দেখিয়ে নিয়ে আস্‌ব।

স্ত্রী। আমার থিয়েটারে গিয়ে কায নেই; পেশাদারী থিয়েটার গুলো ভালও নয়, উপরন্তু রাত জাগতে হয় লোকের ভিড়, গরম সব—বিশ্রী। আর আমি জানি, তুমিও ত ওসব পছন্দ কর না!

স্বামী। তবে শীতকালে সার্কাস এলে, দেখে এস।

স্ত্রী। হ্যাঁ তত দিন যদি বাঁচি! সে বন্দোবস্ত এত আগে থেকে করবার কিছু দরকার নেই।

স্বামী। তবে আর কি করা যায়, তাই ভাবচি—

স্ত্রী। (অবগুণ্ঠন একটু টানিয়া) কেন, এই ছুটিতে বেড়াতে গেলে হয় না?

স্বামী। না, সে কি কম হাঙ্গাম। তোমাদের সকলকে এই ভিড়ের মধ্যে নিয়ে যাওয়া—সে হ'তেই পারে না।

স্ত্রী। তবে থাক্‌গে যাক্। কায নেই। আচ্ছা এত ভিড় হচ্ছে কেন গা?

স্বামী। এই পূজার ছুটিতে অনেক লোক হাওয়া খেতে যাবে কি না? হাওয়া খেতে ঠিক নয়, হাওয়া পরিবর্ত্তন কর্‌তে—অসুখের জন্যে।

স্ত্রী। আমিও সেই জন্যে ভাবছিলুম—তোমার শরীরটাও ত ভাল নেই, ভাল ঘুম হয় না, খাওয়া কমে গেছে, দিন দিন কাঁচা হলুদের মত রঙ-কালি মেড়ে দিচ্ছে—

স্বামী। তার আর উপায় কি বল? কোথাই বা যাওয়া যায়?

স্ত্রী। ( ভাল হইয়া বসিয়া ) যদি যাও, তবে আগ্রায় চল। তাজ দেখে আসা যাবে।

স্বামী। আগ্রা—সে যে অনেক দূ—র। তাজের দেখবে কি? একটা আগাগোড়া মার্ব্বেলের মস্‌জিদ্!

স্ত্রী। বল কি? এই সেবার তাজমহল দেখে এসে, তুমি এত সুখ্যাতি কর্‌লে। তোমার সে কবিতায়ও ত তার সুখ্যাতি ধরে না। দেখ্‌বে যে কবিতায় কি লিখেছিলে? সেই জন্যই ত আমার অত আগ্রহ।

স্বামী। (জিভ কাটিয়া) ওঃ সেই কবিতা। (হাস্য) তোমার সে কবিতাটা খুব ভাল লেগেছিল ( হাস্য ), হ্যাঁ হয়েছিল মন্দ না! সকলেই খুব প্রশংসা করেছিলেন, ছাপাতেও বলেছিলেন তা আমি ছাপাই নি! ( হাস্য )।

স্ত্রী। ঐ ত তোমার দোষ! ছাপালে একটা নাম থাক্‌ত। আর অমন সুন্দর কবিতা! কবিতাটা পড়্‌লে, তাজ না দেখে থাকা যায় না!

স্বামী। তা ঠিক! কিন্তু সে সবার জন্য নয়। কবিরা এক রকম চোখে দেখেন, অন্যে কি তাই দেখ্‌তে পারে এই মনে কর, ওয়র্ড্‌স্‌ওয়ার্থ—

স্ত্রী। কবির স্ত্রী হ'লেও পারে না? মনে কর সাক্ষাৎ স্ত্রী—কবির স্ত্রী-লিঙ্গ কি গা?

স্বামী। কবির আবার স্ত্রীলিঙ্গ কি?

স্ত্রী। যেমন বাঘের স্ত্রীলিঙ্গ বাঘিনী, চাকরের স্ত্রীলিঙ্গ চাকরাণী সেই রকম একটা অবশ্য আছে—

স্বামী। সে যাক্, এবারে আগ্রায় যাওয়া হতেই পারে না। এই ছুটিতে একটু বিশ্রাম করলেই আমার শরীর ভাল হয়ে যাবে। তোমাদের নিয়ে এখানে সেখানে ছুটোছুটি করলে অসুখ বেশী হবে বই কম্‌বে না।

স্ত্রী। তবে গিয়ে কায নেই—তবে গিয়ে কায নেই। আমি মনে করলুম অসুখ ভাল হয়ে যাবে। বল্লে কি না—সবাই অসুখ ভাল হ'তে যাচ্ছে!



স্বামী। তারা যাচ্ছে অবিশ্যি—সে কি জান—সেটা ঠিক—মানে যে জন্যে যাওয়া—অর্থাৎ—

স্ত্রী। যাক্ ও কথা থাক্। আমার জেঠাই পূজার সময় এখানে আস্‌ছেন—বেশ থাকা যাবে—

স্বামী। ( উঠিয়া বসিয়া ) সে কি? বাড়ীতে যায়গা হবে কোথায়? তাঁর যে অনেকগুলি ছেলে, মেয়ে—মেয়ের ছেলে এ সব—

স্ত্রী। সে সব রেখে তাঁকে একলা আস্‌তে হবে না কি?

স্বামী। তাঁদের আসা কি ঠিক হয়ে গিয়েছে?

স্ত্রী। চিঠি, নিয়ে আস্‌ব—দেখবে?

স্বামী। যাক্, দেখ—একটা কথা ভাবছি—দিন কতক কোথাও গেলে হয় না?

স্ত্রী। সে কায নেই—আবার সে—টানাটানিতে অসুখ বেশী হ'বার সম্ভব। ছিষ্টি সংসার অমন ক'রে ফেলে যাওয়া—সে হতেই পারে না।

( অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় নলটি হস্তে লইয়া )

স্বামী। এই যে একটু আগে বলছিলে আগ্রায় যাবার কথা। তাই না হয় স্থির করা যাক্।

স্ত্রী। না, সে তোমার আবার অসুখ হ'বে। সে সবে আমি নেই!

( কাকাতুয়া চীৎকার করিল। )

যাই—কাকাতুয়াটা ডেকে মরছে!

স্বামী। ( আগ্রহের সহিত গাত্রোত্থান ) শোনো, আমার অসুখ ত সে রকম কিছুই নয়। সে জন্যে তুমি ভেবো না।

স্ত্রী। শুধু তাই নয়, জেঠাই মা এলে তিনি ভারি দুঃখিত হবেন।

স্বামী। সে জন্য তুমি ভেবো না। সে আমি এখনই লিখে দিচ্ছি যে আমরা আগ্রায় বেড়াতে যাচ্ছি।

স্ত্রী। না—আগ্রায় যাবার দরকার নেই। তার চেয়ে হরিদ্বার কি দিল্লি যাওয়া ভাল। আগ্রায় এক তাজমহল বইত নয়, সেও নাকি দেখবার মত কিছু নয়!

স্বামী। দেখ্‌বার মত কিছু নয় কে বলিল? কবির চোখে বেশী ভাল লাগে, তাই বল্লুম্।

স্ত্রী। তা একটা কবি আঁচলে বাধা থাক্‌লেও কি সে ফল হয় না?

স্বামী। তা সে যাই হোক্। বড় ভিড় হবে তাই ভাবছি। আগে হ'লে গাড়ি রিজার্ভ করা যেত। এখন সে চেষ্টা করা বৃথা।

স্ত্রী। ( হাসিয়া ) গাড়ি রিজার্ভ করা আমার সারা, সে কি চাঁদ, আমি তোমার জন্যে বাঁকি রেখেছি।

( কাকাতুয়া খিলখিল হাসিয়া উঠিল। )

যবনিকা।

---

# দশপুত্তলির ব্রত।

( নক্সা )

রাত্রে ভারি গরম গিয়াছে, বাতাসের একেবারে নামগন্ধও ছিল না। শ্রীশ সারারাত একবার চোখে পাতায়ও করিতে পারে নাই, একবার ঘর একবার বাহির করিয়া বেড়াইয়াছে। কিন্তু সেজন্য নবনলিনীর গাঢ় নিদ্রার এতটুকুও ব্যাঘাত জন্মিয়াছিল বলিয়া ভ্রম হইবার কোন কারণই ছিল না।

জানালার মধ্য দিয়া সকালবেলার শুভ্র আলো তাহার ঘুমন্ত মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, কপালের স্বেদ বিজড়িত চুলগুলির উপর প্রভাতের বাতাস মৃদু মৃদু খেলা করিতেছিল; চারিধার বেশ শান্ত ও সুস্নিগ্ধ। শ্রীশ কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। অভিমান ও বিরক্তিতে তাহার হৃদয় পূর্ণ। কিন্তু তাহার সে ভাবটা ক্রমেই চলিয়া যাইতেছিল, সে যদি চিত্রকর হইত, শুধু যদি এই সুপ্ত, সুন্দর, শান্ত মুখখানিকে তাহার তুলির বর্ণের রেখায় রেখায় ফুটাইয়া তুলিতে পারিত!

শ্রীশ ধীরে ধীরে তাহাকে স্পর্শ করিল। স্বপ্নরাজ্যের রাজকন্যা সোনার কাঠির স্পর্শে চকিত হইয়া চক্ষু চাহিল। বিস্ময় ব্যাকুল দৃষ্টি—সে যদি কবিও হইতে পারিত!

নলিনী বলিল, "তুমি যে আজ আগে উঠেছ! ও মা কত বেলা হয়ে গ্যাছে! এতক্ষণ আমায় ডেকে দিতে হয়" বলিয়াই সে তাড়াতাড়ি খাট হইতে নামিতে গেল। শ্রীশ বাধা দিয়া হাসিয়া বলিল "যামিনী না যেতে জাগালে না কেন বেলা হলো - কি গানটা আছে না? না, এ



থেকে আমায় ছবি আঁকা শিখতে হবে দেখচি। তোমায় এত সুন্দর দেখাচ্ছিল!" নলিনী বাড়ির ছোট বউ, সে কাক কোকিল পর্য্যন্ত না ডাকিতে বাড়ির কোন লোকের ঘুম না ভাঙ্গিতে হাতের চুড়ি ও পায়ের মল কয়গাছার শব্দটি অবধি বাঁচাইয়া শয্যাগৃহ ত্যাগ করিয়া বিধবা পিসশাশুড়ি বা ঠান্‌দির শয্যাপ্রান্তে আশ্রয় লইত ও তাঁহারি সহিত ঘোরঘোর থাকিতে নীচে নামিয়া আসিত।

কিন্তু আজ সবটাই গোলমাল হইয়া গিয়াছে। নলিনী তাহার হাত ছাড়াইয়া লইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া বলিল "না সত্যি আমায় ডেকে না দেওয়া বড় অন্যায়, লোকে কি বলবে বল দেখি?

শ্রীশ রাগ করিয়া কথা কহিল না।

ছোট বউ নীচে নামিবামাত্র শুনিল বড় ঠাকুরঝি মেজ কাকীকে বলিতেছেন, এখনকার মেয়েদের কথাই হয়েচে আলাদা, ভাসুর শ্বশুরের সামনে দিয়ে উঠে আসতে লজ্জা নেই, ঘরে ঢুকতেও লজ্জা নেই। ওমা দেখে দেখে লজ্জায় নিজেরাও মরে থাকি? মুখের উপর ঘোমটাটা একটু বেশি করিয়া টানিয়া দিয়া বৌ পুখুরের দিকে হুড়হুড় করিয়া ছুটিল, সামনে পড়িলেন খুড়শ্বশুর—পথ ছাড়িয়া ধাক্কা বাঁচাইলেন একটু হাসিয়া তিনি বলিলেন "অতবড় ঘোমটার ভেতর থেকে কি কিছু দেখা যায়? যাও আস্তে আস্তে যাও পড়ে যাবে মা" সেজপিসি কাপড় কাচিয়া ফিরিতেছিলেন একটুখানি মুখ টিপিয়া হাসিলেন। "বউমানুষের কি চলন গা, যেন ঘোঁড়ার নাচ নাচচেন।"

ঘাটে যাইতেই মাঝের বাড়ির ন-ঠাকুরঝি আসিয়া ধরিল "এত বেলাতেও ছোটদা বুঝি ধরে রেখেছিল? ইস্! তবু কি মিথ্যুক। তবু স্বীকার করবেন না।

নলিনী কাপড় কাচিয়া পূজার উদ্যোগ করিতে আসিল। বেলা হইয়া গিয়াছে সকলেরি মন ভার। শাশুড়ী পূজার বাসন ধুইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, বধূকে দেখিয়া উৎসাহের সঙ্গে কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন। কুণ্ঠিত বধূ চোরের মতন ভয়ে ভয়ে হাত হইতে কাজ লইতে গেলে গম্ভীর মুখে বলিয়া উঠিলেন, "থাক থাক আমিই করব এখন, একদিন কেউ করবেন একদিন বা ফুরসৎ হবে না, তার চেয়ে বাপু বুঝবো যে আমাকেই সব করতে হবে আর কেউ কর্ব্বার লোক নেই। বিন্দি চন্নটা ঘষে দে।"

অন্যদিন ছোট বউই চন্দন ঘষিত, আজ সে অপরাধিনী, তাহার হাতের কাজ লইতে কেহই ইচ্ছুক নয়। ভাঁড়ারের দ্রব্যাদি বাহির করা, কুটনা ছাড়ান কোন কাজেই সে আজ তাহার নিজের অধিকার ফিরিয়া পাইল না। ইহাই তাহার আজিকার এই পাপের শাস্তি!

সে কাঁদো কাঁদো মুখে ভাঁড়ার ঘরের দোর ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল, নতুন লোক ভাঁড়ার বাহির করিতে গিয়া নিতান্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে; একটা জিনিষ খুঁজিতে সাতটা হাঁড়ি নামাইয়া ঠোঁট কামড়াইয়া, কপাল কুঁচকাইয়া বিরক্তি প্রকাশ করিতেছে, অথচ সে সেখানে উপস্থিত থাকিতেও তাহার সাহায্য পর্য্যন্ত লইতে চাহে না। সে নীরবে দেখিতে লাগিল, সাহায্য করিবার সাহস হইল না, হয়ত এখনই সে বলিবে "অত গিন্নেপণায় কাজ নেইগো, আমারও চোখ আছে।"

এমন সময় ছোট ননদ কিরণ আসিয়া বলিল "ছোট বৌদি যে—বাঃ, আজ কি বত্তটত্ত করতে হবে না?" ছোট বউ যেন বাঁচিয়া গেল, বন্দিশালার দ্বার খোলা দেখিলে কয়েদীর যেমন আনন্দ বোধ হয় সে তেমনি আনন্দে গম্ভীর মুখ ও কঠিন দৃষ্টির সীমাটা এড়াইয়া ঘোমটা খুলিয়া বাঁচিল।

ঠাকুরঘরে স্থান সংকুলান হয় না তাই লক্ষ্মীপূজার ঘরকেই মেয়েরা নিজেদের খাসমহল করিয়া লইয়াছিল। ব্রত অনেকগুলি গোকল, হরিরচরণ, দশপুত্তল, পুন্যিপুকুর, অশথ পাতা, আদা হলুদ, যাবাপান, রণের পৃথিবী এবং বোশেখ চাঁপা; কিরণ, ছটাকী, চুণি, পাশের বাড়ির হরিদাসী ও ছোট বৌ—এতগুলি লোকের বত্ত আঁকা একা ছোটবৌকেই করিতে হয়, কারণ সেই সকলের মধ্যে বয়সে বড়, তাছাড়া শিল্পকুশলা বলিয়া তাহাদের দলের মধ্যে তাহার একটা খ্যাতি ছিল। পিটুলির পোঁচ দিয়া পাঁচদশে পঞ্চাশটি পুতুল পাঁচমিনিটে আঁকিয়া ফেলিয়া সেইখানে এক একটা সিঁদুরের টিপ লাগাইয়া চন্দন দিয়া হরির চরণ কল্পনায় দুখানা করিয়া পা আঁকা হইয়া গেল।"

"আজ বড় তাড়াতাড়ি বত্তগুলো শীঘ্র না সেরে নিলে নয়, কাসুন্দির আম ছাড়াতে হবে," কিরণ বলিল "ছোট বৌদি শিগ্‌গির মন্তরগুলো বলে দাও ভাই, চুনি আবার সব জানে না।" ছোট বৌ মল্লিকাফুল ও তুলসীপাতা লইয়া মন্ত্র বলিতে লাগিল "চন্দনে ডুবুডুবু হরির পা, হরি বলেন ওগো মা! আজ কেন আমার শেতল পা, কোন রমণী পোজেন পা? সে রমণী কি চান? অক্ষয় অমর সোয়ামী চান, দরবার আলো বেটা চান, সভা আলো জামাই



চান, রূপবতী ঝি চান, গুণবতী বউ চান, ধনসাগরি মা চান, সদানন্দ বাপ চান, রাজ্যেশ্বর ভাই চান, আনলায় কাপড় দলমল করে, ঘরের ঘটিবাটি ঝকমক করে, সীথের সিঁদুর ঝলমল করে, গৈলে গরু মরায়ে ধান, বচ্ছর বচ্ছর পুত্তুর চান, সোয়ামি পুত্তুরের কোলে মরণ হয় যেন একগলা গঙ্গার জলে।"

সবেমাত্র একটি ব্রত হইয়াছে,—রনেএয়ো জনেরশো আকালে ভাত সকালে পুত – এই সামান্য কামনাটিমাত্র জোয়ানের পুঁটুলি সিঁদুর কৌটা কাজলনতা হাতে লইয়া বলা হইতেছে এমন সময় কিরণ হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "ঐরে ছোটদা। এখনি সব গোলমাল করে দেবে।"

ছোটবধূ এক হাত ঘোমটা টানিয়া দিল, সে বিরক্তি ও লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কি বেহায়া জানে সে এখানে আছে, তবু কেন এখানে আসা! একে আজ তার উপর সবাই চটিয়া আছে আরো একটা খোঁটার ঘর বাড়িবে! শ্রীশ জুতাসুদ্ধ ঘরে ঢুকিয়া বলিয়া উঠিল "ওবাবা! এগুলো কিরে? ভুতের পলটন চলেচে নাকি? পাঁচদল যে!"

কিরণ এই ভয়ই গোড়া হইতে করিতেছিল। সে জানে ছোটদা যখন আজ আসিয়া পড়িয়াছে ভালোয় ভালোয় বত্ত শেষ হওয়া আজ দুষ্কর, রাগিয়া বলিল "অমন করে বলতে আছে বুঝি? ওসব দশপুত্তুল, আমরা পূজ করব।"

"এই তোদের পূজা! কি সর্ব্বনাশ ওরা হলো দশপুত্তুল। ছোটবেলায় পড়েছিলুম 'পুত্তলিকার চক্ষু আছে দেখিতে পায় না, কর্ণ আছে ইত্যাদি' কিন্তু এখন দেখচি, পুত্তলিকার কিছুই নাই। কিরণ ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া তীক্ষ্ণস্বরে কহিল কিছু নেই কি রকম? এইতো হাত পা মাথা সবি রয়েছে দেখতে পাচ্চ না?" শ্রীশ হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিল "হাত, পা মাথা ঐ হলেই একটা মানুষের পক্ষে ঢের হলো, না? আচ্ছা হাতগুলো সরু ও লম্বা আঙ্গুলগুলো কাঠির মতন পাদুটো বাঁখারি মাথাটা—" কিরণ সমালোচনা শুনিতে শুনিতে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিল, চীৎকার করিয়া বলিল "থামো গো থামো, তোমাকে কেউ নিন্দে করতে ডাকেনি, আমাদের ঐ ভাল, তোমরা না হয় রবিবর্ম্মার মতন ছবি এঁকে দাওনা যদি এতই জানো।"

শ্রীশ রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইল।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

# মাদাগাস্কারী কবিতা।

স্ত্রী। নিত্যই তুমি বল 'ভালবাসি',
আজিকে সুধাই তাই,
কিসের মতন ভালবাস মোরে ?
আমি তা' শুনিতে চাই।

পুরুষ। অন্নের মত ভালবাসি তোমা',—
অন্নগত এ প্রাণ ;—
যা' নহিলে চোখ্ দেখিতে না পায়,
শুনিতে না পায় কাণ।

স্ত্রী। ক্ষুধার তাড়না না থাকে যখন
অন্ন তখন কিবা ?
এই ভালবাসা ? ইহারি গর্ব্ব
কর তুমি নিশিদিবা ?

পুরুষ। স্নিগ্ধ বিমল নির্ঝর জল
সম তোমা ভালবাসি,
কর্ম্ম-ক্লান্ত সমুদ্ভ্রান্ত
তাই কাছে ছুটে আসি।

স্ত্রী। গুম্ফে ও চুলে ধূলা যবে ঝুলে,—
লোকে হেসে বলে 'চাষা',
তখনি কেবল প্রয়োজন জল ;
এই তব ভালবাসা ?

পুরুষ। শীতে সম্বল 'লম্বে'র মত
তুমি গো আমার পক্ষে,
তাই সাথে লয়ে ফিরি চিরদিন
বাঁধিবারে চাই বক্ষে।

স্ত্রী। হ'লে পুরাতন ফুরায় যতন
দূরে পড়ে থাকে লম্ব ;
এই পুরুষের ভালবাসা বুদ্ধি ?
এই ল'য়ে এত দম্ভ ?

পুরুষ। মধুচক্রের মতন তোমায়
ভালবাসি প্রাণ ভরে,
হরষে যে ধন লুটিয়া এনেছি,
যতনে রেখেছি ঘরে।



স্ত্রী। মধুচক্রের সব নহে মধু
সবি নহে পরিপাটি,
অনেক তাহাতে আছে জঞ্জাল,
ঢের আছে মলামাটি !

পুরুষ। রাজার মতন ভালবাসি তোরে,
ভালবাসি গরিমায়,
যাহার আদেশে ওঠে বসে লোক,
যার গুণ সবে গায়।

স্ত্রী। রাজার সঙ্গে প্রেমের তুলনা
কোরো তুমি চিরদিন,
যার কটাক্ষে নত হ'য়ে আসে
নয়ন লজ্জাহীন ;
যায় কটাক্ষে কলঙ্কী হীয়া
সরমে মরিয়া যায়,
যার ইঙ্গিতে সব সঙ্কোচ
নিঃশেষে লয় পায়।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

---

# নূর-জাহান।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

(দ্বিতীয় দৃশ্যে কবির সঙ্কল্পিত জটিল-চরিত্র নূরজাহান লাহোরপ্রাসাদে রাত্রি-কালে মহার্ঘ বেশভূষায় ভূষিত হইয়া ঘরের মধ্যে পাদচারণা করিতেছেন। এইরূপে বেড়াইতে বেড়াইতে দশ এগার পংক্তিতে যে প্রলাপ ( কবির কথায় জটীল মনোভাবের আবেগে ) বকিয়াছেন, তাহা ব্যাসকূটের ন্যায় দুর্ব্বোধ্য, আমরা তাহার কোন অর্থই করিতে পারিলাম না ; ) পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি, পারেন অর্থ করিয়া লইবেন, "আমি ক্ষমতার মদিরা পান করেছি— প্রতি ধমনীতে তার উষ্ণ উত্তেজনা অনুভব কর্ছি ! এইত জীবন ! শুধু আত্ম রক্ষা ও জন্মদানের তন্ত্র এই সৃষ্টির মহাচক্র ঘোরাচ্চে না। এর মধ্যে সম্ভোগও আছে।" —এই "জন্মদানের তন্ত্র" আর 'সম্ভোগ' দেখিয়া পাঠক বর্গ "কাব্যে দুর্নীতি" ঠাহরাইবেন না উহা হাস্যরসরসিক কবির দার্শনিকতা ; উহাই তাঁহার Laws of Reproduction আর Survival of the Fittest ; এ ব্যাখ্যায় যদি ভুল হয়, তবে সে ভুল আমাদের। কবি দ্বিজেন্দ্র বাবু সে ভুলের জন্য কোন ত্রুটি লইবেন না, কারণ তিনি উহার পরে ঐ "সৃষ্টির মহাচক্র" ঘুরাইবার জন্য যে "আত্মরক্ষা" "জন্মদানের তন্ত্র" এবং "সম্ভোগের" মধ্যে কার্য্য-কারণ-পরম্পরা গভীর দার্শনিকতথ্যপূর্ণ প্রশ্নসপ্তকের দ্বারা

দেখাইয়া দিয়াছেন, তাহার কোন অর্থ তিনি না বলিয়া দিলেও বা, প্রকৃত প্রস্তাবে কিছু না থাকিলেও তাহা অদ্ভুত, সুতরাং হাস্যের কবি দর্শনের কথাতেও যে বিস্ময়ের হাসি হাসাইতে পারিয়াছেন, এজন্য আমরা মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা করিতেছি। প্রশ্ন কয়টি এই,—

(১) নহিলে বিহঙ্গ আবেগে গেয়ে উঠে কেন? (২) বৃক্ষ এত বিবিধ পত্রপুষ্পে বিকশিত হয়ে উঠে কেন? (৩) নদীর বক্ষে এত উজ্জ্বল ফেণিল তরঙ্গ উঠে কেন? (৪) আকাশে চন্দ্র এত হাসে কেন? (৫) যদি ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবৃত্তিই জীবনের চরমলীলা, তবে খাদ্য এত সরস হবার কি প্রয়োজন ছিল? (৬) পুষ্পগন্ধ এত হওয়ার অর্থ কি ছিল? (৭) সঙ্গীত এত মিষ্ট হল কেন?"—বাস্তবিক "সম্ভোগ" না থাকিলে, দ্বিজেন্দ্রলাল এত বৃথা বাক্যাড়ম্বরে, উদ্ভট প্রশ্নের ছড়া গাঁথিয়া নাটকও লিখিতেন না, আর আমাদেরও তাহার সমালোচনায় কষ্টভোগ করিতে হইত না। [আমরা দেখিতেছি, "ক্ষমতার মদিরা" নুরজাহান একা পান করেন নাই, কল্পনায় তাঁহাকে যিনি জন্ম দিয়াছেন, তিনিও পান করিয়াছেন, আর উভয়েই প্রতি-ধমনীতে তার "উষ্ণ উত্তেজনা" অনুভব করিতেছেন,—নতুবা যে ইংরাজী ভাবগুলি কবি রবীন্দ্রনাথের হস্তে পুরাদস্তুর বাঙ্‌লা হইয়া ভাষায় প্রবেশ করে, সেই ভাবগুলি দ্বিজেন্দ্রলালের হস্তে ইংরাজীর মধ্যে 'স্কটিসিজমে'র ন্যায় বাঙ্‌লাতেও ফ্যাটফেটে হইয়া থাকিবে কেন? নুরজাহানের এই সৃষ্টিরহস্যঘটিত প্রশ্নগুলির ব্যাখ্যা কোন্ বৈদান্তিক টীকাকার করিয়া দিবেন, তাহাতো বলিতে পারি না! গ্রন্থকার যিনি, তিনি সমস্ত 'কেন'র অর্থ এক 'সম্ভোগ' দেখাইয়া দিয়াই খালাস; তাহা হইতে প্রশ্নগুলির আবশ্যকতা তোমরা বুঝিতে পার—আর নাই পার, তাহার জন্য তিনি দায়ী নহেন; আর কথাওতো তাই বটে; বই লিখিয়া যদি সকলকে তাহার অর্থ বুঝাইয়া বেড়াইতে হয়, তাহা হইলে চলিবেই বা কেন? তিনিতো ভূমিকাতেই সে কথা বলিয়াছেন,—সেরূপ অল্পবুদ্ধির জন্য তিনি এ নাটক লেখেন নাই।]

আর ও এক কথা,—এই প্রশ্ন গুলির সহিত 'জন্মদান তন্ত্র' ও সম্ভোগের সঙ্গতি বুঝিতে না পারিয়া যদি কোন মূঢ় সমালোচক আর একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন যে,—দ্বিজেন্দ্র বাবু যাহা পারেন, হাসির গান—তাহা না লিখিয়া, যাহা পারেন না—"এই ত জীবন" বলিয়া জীবনের দার্শনিক তত্ত্ব কোনও ( Philosophy of Life ) লিখিতে যান কেন?" তাহা হইলে দ্বিজেন্দ্র বাবু উত্তর দিবার পূর্ব্বে তাঁহার নুরজাহান উত্তর দিয়া রাখিয়াছেন, "প্রতিভা শুদ্ধ সত্য রাজ্য আবিষ্কার ক'রে ক্ষান্ত নয়, কল্পনার সুবর্ণ রাজ্য সৃষ্টি করে।" অতএব প্রতিভাবান কবি যাহাই কেন লিখুন না, তাহা বুঝিতে না পার চুপ করিয়া থাক; কারণ তাহা সত্যের উপরে কল্পনার সুবর্ণ রাজ্যে, সেখানে তোমার আমার অধিকার নাই! ক্রমশঃ

উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় রমণী চরকায় সূতা তুলিতেছে।

*Printed by K. V. Seyne & Bros*

# মানসী

দ্বিতীয় ভাগ ] অগ্রহায়ণ ১৩১৭ সাল। [১০ম সংখ্যা।

## সাহিত্য-পণ্য।

জগতের ইতিহাসে মুদ্রাযন্ত্র আধুনিক সম্পদ—সে দিনকার জিনিস বলিতে পারা যায়। বিশেষ ভাবে আমাদের দেশে কেবল মাত্র এক শতাব্দী অতীত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ( ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে ) চার্লস্ উইল্কিন্স নামক জনৈক ইংরাজ ছয় বৎসর কাল পরিশ্রম করিয়া মুদ্রা-যন্ত্রের উপযোগী এক প্রস্থ বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুত করেন। ঐ অক্ষরের সাহায্যে এদেশে সর্ব্ব প্রথম মুদ্রণ কার্য্যের সূচনা হইয়াছিল। সে আর কয়দিনের কথা। প্রাচীনতম সভ্য ভারতসমাজের তুলনায় ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্র কল্যকার অনুষ্ঠান বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

ইহার পূর্ব্বে দীর্ঘ—সুদীর্ঘ কাল সাহিত্য সেবার এরূপ প্রয়োজনজ্ঞান জাতীয় জীবনে পরিস্ফুট হয় নাই। গ্রন্থরচনা ও দশজনকে শ্রবণ করান এক সুকঠিন ব্যাপার ছিল। রচিত গ্রন্থ সকলের যে খানি ক্রমশ জনসমাজে আদৃত ও বহু সমাদর প্রাপ্ত হইত, কেবল সেই গুলিরই প্রতিলিপি পাইবার জন্য তদানীন্তন শিক্ষিত সমাজ ব্যাকুল হইত। এইরূপেই বিদ্যাপতির রচনা, কবিকঙ্কন ও প্রসাদী গীতাবলী, অন্নদামঙ্গল, ও বিদ্যাসুন্দর, চৈতন্য-চরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত, চৈতনমঙ্গল ও গীতগোবিন্দ ইত্যাদি গ্রন্থের সমাদর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বহু বহু প্রতিলিপি প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিল। যে গ্রামে ঐ সকল ও অপর নানা শাস্ত্রগ্রন্থের পুঁথি ছিল, সেই সকল গ্রাম জনসমাজের বহুসম্মানের স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইত।

ইহারও পশ্চাতে যাও—আরও প্রাচীনকালে গেলে সমগ্র ভারতব্যাপী অসংখ্য সম্প্রদায়ের রুচিপ্রকৃতি, রীতিনীতি ও আচারব্যবহারের অনুরূপ নির্দ্দেশপূর্ণ গ্রন্থনিচয় ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ঐ একই ভাবে লিখিত রক্ষিত ও প্রচারিত হইত। সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতাভিজ্ঞ সম্প্রদায় সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রগ্রন্থ সকল ঐ উপায়ে রক্ষা করিয়া সম্ভোগ করিতেন। অধিক কি ভারতীয় আর্য্যগণের বেদোক্ত উপদেশ ও ধর্ম্মবাক্য সকল সুদীর্ঘকাল বিজ্ঞমণ্ডলীর মুখে মুখেই বিরাজ করিয়াছিল। সে সময়ে লিপিকৌশলও উদ্ভাবিত হয় নাই। লিপিকৌশল উদ্ভাবিত ও প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে বহু শতাব্দী ধরিয়া মানব-ভাষা মহতের মুখেই অবস্থিতি করিত। তখন বাগ্‌দেবী বীণাপাণি বিদ্বান্‌গণের রসনাগ্রে বিরাজ করিতেন। মুদ্রাযন্ত্রের আবির্ভাবে গ্রন্থ-দারিদ্র্য দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেবীও সাধুগণের সরস রসনার অগ্রভাগ ত্যাগ করিয়াছেন। রঘুনাথের অসামান্য স্মৃতিশক্তির বিবরণ এখন কল্পনা ও উপকথায় পরিণত হইয়াছে। এটা যে জাতীয় জীবনের ঘোর দরিদ্রতার পরিচায়ক, আধুনিক ভারত সমাজ তাহা এককালে বিস্মৃত হইয়াছে। জাতীয় জীবনের সুবৃহৎ ঐশ্বর্য্য-সুখ সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষা গোষ্পদের জলে তৃষ্ণানিবারণচেষ্টার ন্যায় ফনোগ্রাফিতে পরিণত হইয়াছে। এখন ঘরে ঘরে ফণোগ্রাফ যন্ত্রের বহুলতায় ধৃত মৃতস্মৃতিশক্তির সঙ্গসুখে লোকসকল জীবন্ত স্মৃতিশক্তির পরিচর্য্যা পরিত্যাগ করিতেছে। এটা কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের চিন্তাশীলগণের চিন্তাপথে আর প্রতিভাত হইতেছে না। এ দেশের জীবনস্রোতঃ যে পথে চলিয়াছে, তাহাতে আর যে কখন চিন্তার গতি এ পথে প্রধাবিত হইবে, তাহা মনে হয় না। সুতরাং নিত্য অন্নাভাবের ন্যায় স্মৃতিদারিদ্র্যও আমাদের জাতীয় জীবনের অধঃপতন পরিবর্দ্ধন করিতেই থাকিবে।

অনন্ত জীবনের সত্তা ও তাহার আভাসে বঞ্চিত পাশ্চাত্য তামসিক ও রাজসিক ভাবাপন্ন জাতিসমূহের দৃষ্টিতে আধুনিক বাইস্কোপ যন্ত্র যোগে নেপোলিয়ন বা গ্লাডোষ্টোনের নীরব অভিনয় সন্দর্শন প্রীতিপূর্ণ উল্লাসের কারণ হইতে পারে, কিন্তু যে জাতির জাতীয় সাহিত্যে শরশয্যায় শায়িত মহাগুরু ভীষ্মের অন্তরাত্মা পাণ্ডবশিবিরে সমুপস্থিত ব্যাসদেবের সমক্ষে "সত্য" এই পরিচয়ে বিচরণ করিয়াছিলেন, তাহাদের নিকটে "বাইস্কোপ"এর সমাদর জাতীয় অধঃপতনের সোপানাবলী রচনা করিয়া দিতেছে। যে যন্ত্রযোগে বাইস্কোপের অভিনয় হয়, তাহা অপেক্ষা ভীষ্মাত্মার স্বতন্ত্র বিচরণ কতই না



অদ্ভুত, কতই না অসম্ভব, কিন্তু ইহাও সম্ভব এবং সত্য ; এই জ্ঞান জড়প্রিয়, জড়বাদী ও জড়সেবক পাশ্চাত্য জাতিসকলের সংস্পর্শে আমরা হারাইতে বসিয়াছি। জড়বস্তুর ভিতর দিয়া সচ্চিদানন্দের আবির্ভাব কখন কখন হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা কেবলমাত্র কোন কোন ভাগ্যবান পুরুষেই ঘটিয়া থাকে, সকলের ভাগ্যে ঘটে না। এবং তাহা সাধারণ বিধিও নহে। মহামান্য ও সর্ব্বজনবরেণ্য স্বর্গীয় হার্বার্ট স্পেসারের পরিণত বয়সে জড় মাতৃরূপিণী জননীর বেশে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার প্রিয় সেবককে ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছিলেন, তাই প্রবীন সাধু স্পেসার সেই মহামায়ার মায়াজাল সর্ব্বত্র প্রসারিত দেখিয়া জগৎশক্তিকে মাতৃ-সম্ভাষণে কৃতার্থ বোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা জড়ের সেবা করিতে করিতে আমাদের পরম ধন আত্মার সঙ্গে দিন দিন অধিকতর অপরিচিত হইয়া পড়িতেছি। এ জাতীয় অধঃপতন কি সহজে নিবারণ হইবার? কে এই বিষম আবর্ত্ত হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিবে?

উপরে যে দুটি বিষয়ের দ্বারা আমরা "সাহিত-পণ্য" শীর্ষক প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম, ঐ দুটির দ্বারা আমি শব্দ এবং মূর্ত্তির জীবন্তভাব ও তাহাদের নিজত্ব ও সে নিজত্বের বিশুদ্ধতার এক কণার ইঙ্গিত করিলাম মাত্র। কারণ শব্দ এবং মূর্ত্তি এ দুয়ের পূর্ণ মর্য্যাদা জ্ঞান আমার হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করি না। তবে সাধুসঙ্গগুণে ও ভাগবতী কৃপায় যে সামান্য আভাসটুকু পাই, তাহাকে এক কণার অধিক বলিতে পারি না। এই কণা মাত্রের মর্য্যাদাজ্ঞান যখন হৃদয় অধিকার করে, তখন বিস্ময়ানন্দে বিহ্বল হইয়া যাই। শব্দের শব্দত্ব ও মূর্ত্তির মূর্ত্তিত্ব এ দুই বস্তুই জীবন্ত ব্রহ্মবস্তু। বৈদিক, দার্শনিক ও পৌরাণিক যুগের ঋষিগণের বাক্য উচ্চারণের সময়ে তাঁহাদের শব্দসকল মর্ম্মস্থান স্পর্শ করিয়া প্রকাশ পাইত, তাই সেই উচ্চারিত বাক্যসকল, গভীর আন্তরিকতার গুণে প্রবলশক্তিসম্পন্ন বলিয়া বিদিত, কারণ বাক্যে ব্রহ্মস্থিতি করিয়া থাকেন। আর তাঁহাদিগের উচ্চারিত বাক্যসকলে ঐরূপ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা ছিল বলিয়াই তাঁহাদের সর্ব্বজনপূজ্য মূর্ত্তিসকলে স্বাভাবিকতা—কপটতাপরিশূন্য সারল্যের আভাস বিজ্ঞাপিত হয়। প্রত্যেক মানবসন্তানের মুখখানি তাহার অন্তরাত্মার স্বাভাবিক অবস্থার সাক্ষ্য দান করিতেই গ্রন্থসূচীর ন্যায় সর্ব্বদাই প্রস্তুত। মুখ দেখিয়া ভিতরে কি আছে, বুঝা যাইত। কারণ ব্যাস, বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র

প্রভৃতির নিকট দেহ দেবমন্দির মাত্র, তাঁহাদের বদনমণ্ডল দেবমণ্ডলের দ্বার স্বরূপ ছিল। তাই তাঁহাদের শব্দনিষ্ঠা ও মূর্ত্তিনিষ্ঠা ঈশ্বরপরায়ণ ভগবৎপ্রাণ সাধুগণের পরমসম্পদ, এই সম্পদে বঞ্চিত লোকমণ্ডলী গ্রামোফন্ ও বাইস্কোপের সঙ্গসুখে চরিতার্থ হইতেছে। আশু প্রীতিকর ঐ সকল সঙ্গে যে তৃপ্তিটুকু পাওয়া যায়, তাহাই যদি কেবল লক্ষ্য হইত তাহা হইলে, জাতীয় জীবনে অধিক ক্ষতি হইত না। কিন্তু ক্ষতি তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক হইতেছে, তাহা চিন্তা করিবার অবসর কই? এই সকলের দ্বারা বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের শিক্ষিত ও সঙ্গতিপন্ন লোক মণ্ডলীর রুচি ও প্রবৃত্তির উৎকর্ষ সাধিত না হওয়াতে লঘুচিত্ততা তরলমতিত্ব ও কিয়ৎ পরিমাণে নির্দ্দোষ ব্যাসনপ্রিয়তার প্রসার বৃদ্ধি পাইতেছে মাত্র, জীবনের মূলে যে উচ্চ আকাঙ্ক্ষার আভাস পাওয়া যায়, এইরূপ চল্‌তি ভাবের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের মধ্যে সে উচ্চ আকাঙ্ক্ষার লেস মাত্রও স্থান পায় না। এরূপ অবস্থাবিপর্য্যয়ের মধ্যে জাতীয় জীবনের অধোগতিই অনিবার্য্য। কে এই সকলের বজ্রবন্ধন হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিবে? বর্ত্তমান সময়ে নরেন্দ্র, সুরেন্দ্র ভূপেন্দ্র জাতীয় জীবনের রাজনৈতিক তরঙ্গ তুফানে নিত্যনিয়ত ভাসমান। রাজা মহারাজাগণ আপন আপন সামাজিক ও লৌকিক পদমর্য্যাদার পরিরক্ষণে বদ্ধপরিকর, অধ্যাপক ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতমণ্ডলী নীরব ও পঙ্গুর ন্যায় সম্পন্ন লোকের দ্বারস্থ, সুতরাং সুবৃহৎ অধোগতির এ সুপ্রশস্ত রাজপথ রচনায় বাধাদিবার ব্যক্তি কোথায়?

রাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট, রাজশক্তিসম্পন্ন অসামান্য গুণসম্পন্ন নরনারীই চিরদিন বিষয়ী লোকের আদর্শ। সংসারের সম্পন্ন লোকেরা চিরদিনই ঐ আদর্শে আপন আপন পারিবারিক ও সামাজিক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ত্রেতায় রামচন্দ্র, দ্বাপরে মহারাজ যুধিষ্ঠির তৎপরবর্ত্তী পৌরাণিক ভারতে রাজচক্রবর্ত্তী মহারাজ বিক্রমাদিত্য আদর্শ পুরুষ। ইহাঁদের সময়ে ভারত সমাজ যথা সম্ভব ইঁহাদেরই আদর্শে পরিচালিত হইয়াছিল। আরও পরবর্ত্তী কালে মগধাধিপতি মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত, মহারাজ অশোক, আদিশূর ও বল্লাল সেনের আদর্শে আমাদের দেশের লোকমণ্ডলী সমাজ গঠন করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছে। আরও আধুনিক কালে নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রও ঐ আদর্শের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন। রাজশাসন, রাজ-দেশ, রাজ-অভিপ্রায় সমাজকে অনেক পরিমাণে নিয়মিত ও সুপথে রা



কুপথে পরিচালিত করিয়া থাকে। রাণী এলিজাবেথের সময়ের ইংলণ্ডীয় সমাজ কিয়ৎ পরিমাণে উচ্ছৃঙ্খল। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সামাজিক জীবন ইংলণ্ডকে প্রচুর পরিমাণে নৈতিক উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে সহায়তা করিয়াছে। দিল্লীর পাঠান ও মোগল সম্রাটগণের মধ্যমণি ভারতসম্রাট মহামান্য আকবর অসংখ্য বিদেশীয় নরপতির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আজ পর্য্যন্ত ভারতবাসীর হৃদয়ের পূজা প্রাপ্ত হইতেছেন। বোধ হয় তদীয় রাজত্বকালে রাজদরবারের রীতিনীতি আচারব্যবহার সমগ্র ভারতে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল ও সকলেই সে সকলের অনুমোদন করিত। তাই তাঁহার সমগ্র ভারত-পরিব্যাপ্ত প্রতিপত্তি আজও অক্ষুণ্ণভাবে লোকহৃদয় অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। ইহাকেই বলে শক্তি। সমাজের উপর শাসনদণ্ড পরিচালনে সক্ষম আর এক সম্প্রদায় মহানুভব ব্যক্তি রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট রাজার শিরোভূষণ রাজমুকুটকেও পদানত করিয়া থাকেন। শুকদেব, নারদ, বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, মনু, পরাশর, বিশ্বামিত্র, ব্যাস, যাগ্যবল্ক জৈমিনি ইত্যাদি ঋষিগণের তপোবল অসামান্য শক্তির দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। পরবর্ত্তী কালে অসামান্য গুণসম্পন্ন ও সাধননিরত সিদ্ধার্থের সিদ্ধিলাভ সমগ্র ভারতবাসীকে মুগ্ধ করিয়াছিল এবং ভারতসমাজ প্রায় সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধের উপদেশের অধীন হইতেছিল। এমন সময়ে আর এক বিচিত্র শক্তিশালী পুরুষ অভ্যুদিত হইয়া বৌদ্ধপ্রভাব খর্ব্ব ও উপনিষদের দার্শনিক ধর্ম্মবিজ্ঞানের ভিত্তির উপর পৌরাণিক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার দ্বারা ভারতবাসী লোকমণ্ডলীকে স্বমতে ও স্বপথে আনয়ন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের বাহ্য প্রকাশ ও বিকাশ অদৃশ্য হইল বটে, কিন্তু সে সময়ের সামাজিক জীবনে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও বৌদ্ধ ক্রিয়াকলাপ, বৌদ্ধ ভাব ও আচার-আচরণ হিন্দুভাবের অন্তরালে বসবাস করিতে লাগিল। ইহাকেই বলে শক্তি, এ জীবন্ত শক্তির প্রভাব হইতে জনসমাজ সহজে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। এ সময়ের এ শক্তিকে ভারতবাসী পণ্ডিতমণ্ডলী শঙ্করশক্তি বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন।

বর্ত্তমান সময়ে আমরা ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় ইংরাজের দাসানুদাস—ইংরাজ রাজশক্তির অনুগত প্রজাবৃন্দ আমরা সর্ব্বদাই ভয়ে ও বিস্ময়ে ইংরাজের অভিপ্রায় মতে পার্শ্বপরিবর্ত্তনে সম্যক পটুতা লাভ করিয়াছি, সুতরাং এখন আমাদের শিক্ষা, দীক্ষা, ভাব ও ভাবনা, রুচিপ্রবৃত্তি, এমন কি আচারব্যবহারও অংশতঃ ইংরাজী ছাঁচে ঢালাই হইয়া আমাদের সুখ দুঃখ, শান্তি

অশান্তি, উল্লাস ও অবসাদ বৃদ্ধি করিতেছে। এই সামাজিক ও জাতীয় জীবনের নূতন পত্রাঙ্কের সূচনায় আমরা আমাদের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কাজেই ইংলণ্ডের আদর্শ গ্রহণ করিয়া থাকি। এই আদর্শগ্রহণের ফলে আমরা আপাততঃ ত্রিবিধ শক্তির দ্বারা শাসিত, নিয়মিত ও পরিচালিত হইতে আরম্ভ করিয়াছি। আমার এই কয়টি কথায় হয়ত অনেক প্রাচীন তন্ত্রের আস্থাবান হিন্দুসন্তান ও চরমপন্থী নব্য সম্প্রদায় সহসা আপত্তি করিবেন ও ক্ষুণ্ণ হইবেন, কিন্তু সত্য, সত্যই থাকিবে, এবং সত্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বুকে হাত দিয়া কথা কহিতেগেলে, অনেকেরই মুখে বাক্য স্ফুরণ হইবে না। প্রাচীন তন্ত্রাবলম্বী আস্থাবান মহাশয়গণকে ও নূতন দলকে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে তাঁহাদের গার্হস্থ্য জীবন কি পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের প্রাচীন তন্ত্রের আস্থাবান হিন্দুগার্হস্থ্য-জীবনের লেশ মাত্রও রক্ষা করিতে পারিতেছে? সে শাঁখা সাড়ীও নাই আর সে নিষ্ঠাপূর্ণ পূজাপদ্ধতি ও সামাজিক রীতিনীতি দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন সামাজিক জীবন অর্থগত, পুত্রের বিবাহ, পণের টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করিতেই ব্যস্ত; তাই বলিতেছি, অধুনা ইংলণ্ডের গিনি, পাউণ্ড, সিলিং পেন্স বঙ্গের গার্হস্থ্য-জীবনের মেরুদণ্ড হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে হ্যাটকোট, ধুতি চাদরের স্থান অধিকার করিয়াছে, এখন উপবীতের উচ্চ অধিকার নেকটাইয়ের নিম্নে স্থান পাইয়া নীরবে নিদ্রা যাইতেছে। এই তন্ত্রের সঙ্গে খাপ্ খাওয়াইয়া যে সামাজিক জীবন যাপন করিতে হয়, তাহা ইংলণ্ডের ছাঁচে ঢালাই না করিলে কিরূপে সম্ভবপর হইবে? সুতরাং আমরা এক্ষণে ইংলণ্ডের ত্রিবিধ শক্তির দ্বারা সর্ব্ব বিষয়ে শাসিত নিয়মিত ও পরিচালিত হইতেছি, স্থির ভাবে ভাবিয়া দেখিলে, এ কথায় ক্ষুণ্ণ হইবার কিছুই নাই।

অধুনা ইংরাজসংস্রবে আমাদের সমাজে ও গার্হস্থ্য জীবনে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, যে সকল পরিবর্ত্তন আনয়নে স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদপ্রভাকর, মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ-প্রতিষ্ঠিত ও অক্ষয় কুমার দত্ত পরিচালিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্যতম গুরু বঙ্কিম চন্দ্রের বঙ্গদর্শন, স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর ও বিদ্যাভূষণ পরিচালিত সোমপ্রকাশ প্রভৃতি মাসিক, পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্রগুলি যে শক্তিসঞ্চার করিয়াছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। গুপ্তকবির ব্যঙ্গ বঙ্গসমাজকে শাসন করিয়াছে, তত্ত্ববোধিণী নিত্য নূতন তত্ত্বের অবতারণা করিয়া লোক শিক্ষার দ্বার প্রশস্ততর করিয়াছে, আর বঙ্গদর্শন নূতন সামাজিক ভাব ও চিন্তার তরঙ্গ তুলিয়া বঙ্গ



সমাজকে প্লাবিত করিয়াছে, ইহার উপর স্নিগ্ধজ্যোতিসম্পন্ন সোমপ্রকাশের স্থির বুদ্ধি সর্ব্বদাই সমাজকে সুপথ দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছে। এই জন্য ইংলণ্ডের ন্যায় এদেশেও অতি অল্পকাল মধ্যে সংবাদপত্রপ্রমুখ সাহিত্য একটা প্রবলশক্তিতে পরিণত হইয়া উঠিয়াছে। এখন এ দেশে, ইংলণ্ডের রাজশক্তি, ইংলণ্ডের অনুকরণে গঠিত আভিজাত্য-শক্তি ও সংবাদপত্র বা সাহিত্য-শক্তি কার্য্য করিতেছে। ইংলণ্ডের অনুকরণে এদেশে এখনও প্রজাশক্তির সৃষ্টি হয় নাই। ইংলণ্ডে প্রজা আপন অধিকার বুঝিয়া লইতে ও সে অধিকারের স্বেচ্ছামত ব্যবহার ও প্রয়োগ করিতে শিখিয়াছে, এদেশে এখনও সে শক্তির সৃষ্টি হয় নাই বলিয়া আমাদের দেশের সংবাদপত্রপ্রমুখ সাহিত্যশক্তিকে তৃতীয় শক্তি বলিতেছি। প্রজাশক্তি প্রবল হইলে সংবাদ পত্র চতুর্থ শক্তি বলিয়াই অভিহিত হইবে। কিন্তু প্রজাশক্তির জাগরণ ও পরিবর্দ্ধনে এখনও বহু বিলম্ব আছে।

আমাদের বর্ত্তমান আলোচনার বিষয়—"সাহিত্য পণ্য" প্রবন্ধে আমরা পরিষ্কার করিয়া দেখাইতে চাই যে বালকের বাচালতাভরা বর্ত্তমান শিশু বাঙ্গালা সাহিত্য বৃন্দাবনবিহারী বালক কৃষ্ণের ন্যায় গিরিগোবর্দ্ধন ধারণেও সক্ষম, বালক শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় তাড়কা বধে ও হরধনু ভঙ্গে সক্ষম। ভাগীরথীধারা এক পারে রাজমহল ও অপর পারে মালদহ অতিক্রম করিয়া যেমন শত সহস্র ধারায় প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, অধুনা বাঙ্গালা সাহিত্যও সেইরূপ কতশত পথে পরিচালিত হইয়া সমগ্র দেশকে প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছে। শাসনবিহীন শক্তি যেমন সমাজকে উচ্ছৃঙ্খল ও বিপন্ন করিয়া তুলে, বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যও ঠিক সেইরূপ শাসনসীমা অতিক্রম করিয়া স্বেচ্ছাচারিতার পথে পদার্পণ করিয়াছে ও সেই পথে অগ্রসর হইতেছে। প্রত্যেক সাহিত্যসুহৃদের এ দিকে দৃষ্টিপাত করা এবং ইহার প্রতিকারের পন্থা অবলম্বন করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়। বালক শ্রীচৈতন্যের বাচালতা বা বালক বিদ্যাসাগরের বাল্যচপলতা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকসেবার মন্দাকিনী ধারায় পরিণত হইলেও সকল বালকই মহাপ্রভু বা বিদ্যাসাগরে পরিণত হয় না। সুতরাং শাসনব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়াছে। এ বিষয়ে এক সময়ে মাসিকপত্র সাহিত্য ও আপাততঃ সাপ্তাহিক হিতবাদী কিঞ্চিৎ বাক্যব্যয় করিলেও আশানুরূপ কোন চেষ্টাই হইতেছে না। উপযুক্ত চেষ্টায় বাধা অনেক। আজ কালকার দিনে লঘু

গুরুজ্ঞান কিছু ম্লানভাবাপন্ন হইয়াছে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র সকল জাতিই ইংরাজস্পর্শে পরস্পরের সহিত সমকক্ষতা করিতে ব্যাকুল। এভাব এতটাই প্রবল হইয়াছে যে পুত্র পিতামাতার, কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের উপদেশ ও সুপরামর্শের অধীন হইতে চাহে না। ক্রমশঃ এমন দিন নিকটতর হইয়া আসিয়াছে, যখন দেশের মাতৃভাব, মাতৃসম্মান ও মাতৃপূজা ফ্রান্সের ন্যায় ( Maternity held in contempt ) অবজ্ঞার বস্তু হইয়া দাঁড়াইবে। অসামান্য গুণ-সম্পন্না গরিয়সী বিদুষী বেশান্তের সম্প্রদায়ই বল, রামকৃষ্ণ মিশন বা আর্য্য সমাজের আগ্রহপূর্ণ যত্ন চেষ্টাই বল, আর ব্রাহ্মসমাজের অশেষবিধ উন্নতি প্রয়াসই বল, এ সকলের কোনটিই সমাজের অন্তস্তল, অসংখ্য কোটী আহার-বিহারপ্রিয় শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ভারতবাসীর হৃদয় অধিকার করে নাই। সতর্কতা সহকারে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, যে এখানে ওখানে দুএকটি গোলাপগন্ধরাজ, চম্পকচামেলি বা কমলকামিনীর সৌরভ সম্ভোগ ঘটিলেও তমোময় রজভাবাপন্ন ব্যক্তিবৃন্দে দেশ পরিপূর্ণ—কাজে কাজেই দেশ দুর্দ্দিনের পথেই সত্বর অগ্রসর হইতেছে।

এ দুর্দ্দিনে, এ পররাষ্ট্রাধীন, পরভাগ্যোপজীবী ভারতবাসীর ভাগ্যের শুভ অঙ্কপাত করিবার ভার কে লইবে? বর্ত্তমান সময়ে ইহার একমাত্র সদুত্তর আমার হৃদয়ে জাগিয়া উঠে, সে উত্তর দানে যাঁহারা আমার লক্ষ্যস্থল, তাঁহারা কি দয়া করিয়া সে কথায় কর্ণপাত করিবেন? বর্ত্তমান সময়ে সাহিত্য-সেবকই সেই সৎকার্য্য সম্পাদনে সক্ষম। কেবল যদি তাঁহারা তাঁহাদের প্রাপ্ত শক্তি—অমূল্য ধন ভাষাকে তাঁহাদের পুলিসবৃত্তি চরিতার্থ করিতে নিয়োগ না করিয়া নিষ্ঠাসহকারে সেই দেবী বীণাপাণির পরিচর্য্যায় প্রাণপাত করেন, তাহা হইলেই কেবল বর্ত্তমান অবস্থায় দেশের দেবশক্তি, দেশের পিতৃমাতৃশক্তি ও মানবশক্তিকে জাগ্রত, সবল ও সুস্থ করিয়া তুলিতে পারেন। চন্দ্রে কলঙ্ক আছে বলিয়া চাঁদের আলোতে প্রীতিলাভ করিতে কেহ বিরত হয় না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মর্ত্ত্য-সম্পদ সূর্য্যমণ্ডলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলঙ্ককণা দেখা গিয়াছিল, তাই বলিয়া লোক দিবালোকে অন্ধকার দেখে না, অসামান্য গুণসম্পন্ন রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা রচনায় অসাবধানতার রেখা-পাত দেখিয়া যাঁহারা তাণ্ডব নৃত্য করিয়াছেন তাঁহারা অন্তর্দৃষ্টি সহকারে আত্মপরীক্ষা করিলে কি স্বীকার করিবেন না যে তাঁহাদের এতাদৃশ ব্যবহারে তাঁহাদেরই পবিত্র সাহিত্য-শক্তিকেন্দ্রের বিনাশ সাধনে তাঁহারা অগ্রসর



হইয়াছিলেন। প্রায় চতুর্থাংশ শতাব্দী পূর্ব্বে রবীন্দ্রের চিত্রাঙ্গদা বঙ্গসাহিত্যে প্রথম দেখা দেয়, এতদিন পরে এটাকে নিয়ে এরূপ ভাবে ঠিক যেন একটা নূতন ঘটনার ন্যায় জনসমাজে উপস্থিত করিয়া এমন অশান্তির সৃষ্টি করিবার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া গেল না। যদি কোন গুপ্ত তত্ত্ব ইহার তলদেশে লুক্কাইত থাকে, তবে তাহা কি সাহিত্যসেবকগণের পক্ষে কল্যাণকর?

আমাদের দেশের সুধী জ্ঞানী ও বিদ্বান সমাজের বরণীয় ব্যক্তি বিশেষের বালিকা বিধবা কন্যার শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতি অনুসারে বিবাহনিবন্ধন যে আন্দোলন হইয়াছে, পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, সে আন্দোলনের কতটুকু মতামত ও ধর্ম্মবিশ্বাসের ভিত্তির উপর দাঁড়াইতে পায়। সে আন্দোলনের পনের আনা কেবল ব্যক্তিগত বিদ্বেষ, নিন্দা ও মর্য্যাদাহানিকর ব্যাপারে পরিপূর্ণ। সে আলোচনায় এরূপ ঘৃণিত উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল, এরূপ ইতর বিদ্রূপবিষ প্ররোগ করা হইয়াছিল, যে অধঃপতিত পরাধীন জাতির পদলেহন বৃত্তির সহিতই কেবল তাহার সামঞ্জস্য সাধন সম্ভব। উচ্চ উদার স্বাধীন প্রকৃতির সাহিত্যসেবকের পক্ষে সেরূপ আলোচনা কোন মতেই সম্ভবপর নহে। লোকের ইতর বৃত্তির এরূপ স্ফূর্ত্তি সম্পাদনে নিযুক্ত ব্যক্তিগণকে সাহিত্যসেবকগণের নামাবলীভুক্ত করিয়া সে পবিত্র নামমালার মর্য্যাদা হানি করিতে যাঁহারা ব্যস্ত, তাঁহাদের আচরণের পক্ষ সমর্থনের কি সম্বল আছে বলিতে পারি না। এইরূপ ভাবে সাহিত্য সেবার উদ্দেশ্যের বাহিরের বস্তু সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করিলেই এই পবিত্র ও সাধু উদ্দেশ্যের মর্য্যাদা হানি হইল বলিয়া প্রত্যেক ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি স্বীকার করিবেন।

হীন বৃত্তির দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তি পেটের দায়ে তস্করবৃত্তি অবলম্বন করে, ধরা পড়িলে অনেকস্থলে তাহার ক্ষুধানলের উপর ধনঞ্জয়ের ব্যবস্থা হয়, অথবা রাজদ্বারে দণ্ড পায়। আর এই হীনবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি দুর্ব্বল না হইয়া যদি সবল ও সাহসী হয়, তাহা হইলে সে দিবা দ্বিপ্রহরে দস্যুবৃত্তি করে। রঘুনাথ ও বিশ্বনাথ এদেশে সর্ব্বজনবিদিত দস্যু। তাহারা দস্যুবৃত্তি করিয়া বারমাসে তের পার্ব্বণ, বার ব্রত ও অন্য শতবিধ ধর্ম্ম কর্ম্ম করিলেই কি তাহাদের কৃত দুষ্কর্ম্মের মার্জ্জনা হইত, না হইয়াছে? এরা যে পরগৃহে প্রবেশ করিয়া শতবিধ অত্যাচার দ্বারা অর্থ লুণ্ঠন করিত, সিমন্তিনীগণের নাসিকা

কর্ণ ছিন্ন করিয়া বলপূর্ব্বক অলঙ্কার গ্রহণ করিত, কে তাহার পক্ষ সমর্থন করে? কেহই করেন না। সিমন্তিনীর নাসা কর্ণ ছিন্ন করিয়া অর্থোপার্জ্জন যদি নীতিজ্ঞ ব্যক্তিবৃন্দের দৃষ্টিতে দুষ্ট কার্য্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তবে নারীর নারীধর্ম্মে কলঙ্ক কালিমা ঢালিয়া দিলে, স্বাধ্বী রমণীর নিন্দা রটনা করিলে, কুলবধূকে কলঙ্কের চিত্রে অঙ্কিত করিলে, কতশত গুণে অপরাধের মাত্রা বৃদ্ধি পায় তাহা কি দেশের লোক ভাবিতে শিখিয়াছেন? দুঃখ অভিমান ও ক্ষোভে হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায় যখন স্মরণ হয় যে এদেশের নবীন সাহিত্যের পরিচর্য্যাক্ষেত্রে জঠরানলনির্ব্বাণপ্রিয় দস্যুতস্করের বিচরণ সহজসাধ্য হইয়াছে। অক্ষয়কুমারের সুপবিত্র বিদ্যারণ্যে "কাম ও পান" দোষের প্রবেশ লাভ তাঁহার দারুণ মনস্তাপের সাক্ষ্যদান করিতেছে, অধুনা সেই সুবিস্তৃত সাহিত্যারণ্যে দস্যুতস্করের বিচরণ ভাবী সাহিত্যের অমঙ্গল বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে। মানীর মান ও সতীর সুযশ অপহরণপরায়ণ ব্যক্তিবৃন্দ যদি সাহিত্যসেবকগণের বর্জ্জনযোগ্য না হয়, অপিচ তাহাদেরই স্তব বন্দনা ও পূজা অর্চ্চনা দেখিলে কোন্ বিবেচক ব্যক্তি শান্তভাবে নীরবে তাহা সহ্য করিতে প্রস্তুত। গীতাভাষ্যে শঙ্করমতে আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানের অংশ, যিনি আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে ব্যস্ত, তিনিই পার্শ্ববর্ত্তী জনবৃন্দের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য ঠিক সেই পরিমান দায়ী। অন্যের মর্য্যাদা রক্ষায় বিমুখ ব্যক্তি সাহিতসেবার যোগ্য নহে। আর আমরা যদি জ্ঞাতি গোষ্ঠী, আত্মীয় স্বজন সাহিত্যসেবার ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া এই শ্রেণীর লোককে বাল্মীকি ও ব্যাসের পবিত্র আসনে সমাদরে উপাবেশন করাই, তাহা হইলে, আমাদের শেষ আশাটুকু অর্থাৎ সাহিত্য শক্তিটুকুও অচিরে অন্যবিধ শক্তিসকলের ন্যায় মন্দীভূত ও ক্রমে বিলুপ্ত হইবে। বাণিজ্য ভাল, কিন্তু ধর্ম্ম লইয়া সওদাগরী করা যেমন ঘৃণার জিনিস, সাহিত্য লইয়া সেইরূপ ব্যবসায় করা ও তদ্দ্বারা উদরপূর্ণ করা ঘৃণার বস্তু। সাহিত্যে ব্যবসার বৃত্তি প্রবিষ্ট হইয়া ইহার পবিত্রতা ইহার উচ্চশক্তি সামর্থ্য বিনষ্ট করিতেছে, যদি সাহিত্যসেবকগণের এদিকে সুতীব্র দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে আমার এই সামান্য আলোচনা সহায়তা করে, তাহা হইলে এই সামান্য যত্ন চেষ্টা সফল হইল বলিয়া মনে করিব এবং ঐ শ্রেণীর উচ্চ উদার সাহিত্য সেবকগণকে পুজার যোগ্য জানিয়া তাঁহাদের বন্দনা করিব।

আমার শেষ কথা এই যে এই আলোচনায় কেহই আমার লক্ষ্য নহেন,



আমার লক্ষ্য সাহিত্যসেবাকে কোন আকারে পণ্যে পরিণত করা না হয়। সাহিত্য কিরূপে পণ্যে পরিণত হইতে পারে ও হইতেছে, তাহারই আভাস দিবার জন্য বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিবৃত্তের কোন কোন ঘটনার ( abstract form ) ইঙ্গিত মাত্র করিতে বাধ্য হইয়াছি, কিন্তু সে সকল ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত ভাবে আমি আমার আলোচনার বিষয়ীভূত করি নাই। এরূপ ভাবে আলোচনা করাতেও কেহ যদি ক্ষুণ্ণ বা ব্যথিত হন, তবে তাঁহার নিকট করজোড়ে এই ভিক্ষা চাহিতেছি যে তাঁহারা আপনাকে ও বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখককে দূরে রাখিয়া বিষয়টির বিচার করিতে গিয়া লেখকের অপরাধ পাইলে যেন দণ্ড দিতে পরাঙ্মুখ না হন। ন্যায়দণ্ডে দণ্ডিত হইতে ন্যায়প্রিয় লোকের ভীত হইবার কোন কারণ নাই।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

# বিজয়িনী।

এই নিবন্ধের যে নামকরণ হইল, তাহা হইতে সাহিত্যামোদী পাঠক অবিলম্বে বিষয় স্থির করিয়া লইবেন। কারণ, বঙ্গের গীতিকবিতার দেবতা, বাঙ্গালীর Apollo রবীন্দ্রনাথের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতার শীর্ষে এই নাম আছে এবং কাব্যশিল্পের একটি অনিন্দ্য সুন্দর কীর্ত্তির অতি সুকোমল রেখাবলি এই নামটির সঙ্গে আমাদের চিত্তপটে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হইয়া গেছে। কবি যে বর্ণাধার এবং তুলিকা লইয়া, সৌন্দর্য্য ও চিরবসন্তের নিত্যনবীন উষাচিত্র, কবিকল্পনার নন্দনকানন চিত্রাঙ্গদায় ফুটাইয়াছেন, বোধ করি তাহারই শেষ দুই ক্ষেপে এক পার্শ্ববর্ত্তী পটবস্ত্রে 'বিজয়িনী'র আলোকপাত করিয়াছেন,—সে আলোক ধরণীর শৈলশিখরে কখনও পড়ে নাই, শুধু কবিরই ললাট হইতে প্রতিফলিত হইয়াছে।

আমাদের অভিপ্রায় এই মোহন কলাকৌশল হইতে আনন্দ আহরণ করি। সমালোচনার স্পর্দ্ধা রাখি না, প্রাণ যাহা সহজে গ্রহণ করে, পাণ্ডিত্যের অভিশাপ বহন করিয়া সে অমৃতের কণামাত্র হইতে বঞ্চিত হইতে পারিব না। সমালোচকদিগেরই কোনও মহারথী বলিয়াছেন, "The most valuable critic is he who communicates sympathy by an

exquisite record of his own delights, not the critic who attempts to communicate thought আজ শরতের নির্ম্মল প্রভাতে শেফালির সৌরভ এবং পদ্মের শোভা প্রাণের ভিতর সরল সহজ প্রীতি ভরিয়া তুলিয়াছে, যাহা মুগ্ধ করে তাহাকে আরতি করিতে বলে, হৃদয় ছাপাইয়া উঠে, মস্তিষ্কের কুটিলতা উপভোগে বাধা দেয় না; আনন্দ সহজ এবং প্রকাশের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে।

বনভূমির কোন নিভৃত পরিসর নব বসন্তের ইন্দ্রজালে অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। সেখানে প্রচ্ছায়সঘন পল্লবশয়নতলে মধ্যাহ্নের জ্যোতি মূর্চ্ছিত হইয়া আছে। পাতার মর্ম্মর এবং চম্পকশাখায় উপবিষ্ট কপোত-দম্পতির ঘন চঞ্চুচুম্বনের অবসরকালে বিহ্বল কূজন শুনিতে শুনিতে এতই অন্যমনা হইয়াছিলাম যে সরস্তীরে, প্রথমে শ্বেত শিলাতলে এবং তৎক্ষণাৎ বুকভরা আলিঙ্গনরাশির মত কূলকূলে প্রসারিত নীল জলরাশির একপ্রান্তে, বকুলের ঘনচ্ছায়াতলে যে অপূর্ব্ব বিস্ময়ের আয়োজন রহিয়াছে, তাহা এতক্ষণ দেখি নাই। কিন্তু দেখিবামাত্র নিস্পন্দ হইয়া গেলাম। স্নানার্থিনী অচ্ছোদের জলে নামিয়াছে, সজ্জা ও প্রসাধনের উপকরণগুলি অতি সাবধানে শ্বেত শিলাতলে রাখিয়া গিয়াছে। বসনের মধ্যে একখানি নীলাম্বর ও নিচোল; ভূষণের মধ্যে নূপুর ও মেখলা; আর স্বর্ণপাত্রে খানিক চন্দন ও কুঙ্কুমপঙ্ক, লীলাকমলরূপে দুইটি রক্ত শতদল এবং কেশে বাঁধিবার জন্য একগাছি শ্বেত করবীর মালা। দেখিবামাত্র নারী-সৌন্দর্য্যের যে প্রতিমা নিমেষের মধ্যে মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠে, আর একটু অগ্রসর হইয়া তটাধোভাগে চাহিবা-মাত্র তাহা জীবন্ত হইয়া উঠিল। আবক্ষ জলে ডুবাইয়া যে সুন্দরী বসিয়া আছে, সে একা নাই, একটি শুভ্রপক্ষ রাজহংসীকে বুকের কাছে ধরিয়া আপনার কোমল কপোল তাহার পৃষ্ঠে বুলাইতেছে।

কিন্তু এই চিত্রনাট্যের আর একটি অভিনেতা আছে। সে বসন্তসখা মদন। বকুলের তলায় তরুপরে হেলিয়া সে নিঃশব্দে স্খলিত বিবশ ফুলগুলির উপর বসিয়া আছে, পা দুখানি নব তৃণস্তরে প্রসারিত। তাহার হলুদ বর্ণের উত্তরীয়খানি ভূমে লুটাইতেছে, কুঞ্চিত কুন্তলে মালতীর মালা গাঁথা। সে কৌতুককটাক্ষে অন্তরাল হইতে তরুণীর স্নানলীলা দেখিতেছিল। তাহার অঙ্গুলি এক্ষণে অধীর হইয়া উঠিয়াছে, নির্ম্মল কোমল বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া সে পুষ্পশরের অবসর প্রতীক্ষা করিতেছিল।



এমন সময়ে স্নান শেষ করিয়া তরুণী সোপানের উপর উঠিয়া দাঁড়াইল। সদ্যস্নাতা সুন্দরীর পূর্ণ নিটোল পরম সুন্দর অবয়বের উপর রবিরশ্মির স্বর্ণমায়া যে অপূর্ব্ব অভাবনীয় অজেয় মহিমা মণ্ডিত করিয়া দিল তাহাই কবিতাটির পূর্ণ পরিণাম। অনঙ্গদেব মৃদুমন্দ হাসিয়া উঠিয়া যখন সম্মুখে আসিলেন, তখন সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষণকাল নিমেষহীন নয়নে মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। তারপর ভূমিতলে জানুর উপর বসিয়া নির্ব্বাক বিস্ময়ে নতশিরে পুষ্পধনু ও পুষ্পশরভার পূজা-উপচারের মত পদপ্রান্তে ধরিয়া দিলেন। বিজয়িনী শান্ত প্রসন্ন দৃষ্টিতে নিরস্ত্র মদনের উপর আঁখি নত করিলেন।

কবিতাটির মর্ম্ম এই, কিন্তু কিরূপে মুগ্ধ করে এখনো বলি নাই। তথাপি যতটা আভাস ইতিমধ্যে পরিচয়ের মধ্যে দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতেই কবিতা হিসাবে ইহার স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্ব ধরা যাইবে। সে বিশেষত্ব—ইহা কবিতায় একখানি ছবি। চিত্রকরকে ত' কবি এখানে ধরিয়া ফেলিয়াছেনই, উপরন্তু তাঁহাকে হারাইয়া দিয়াছেন। আশ্চর্য্য কীর্ত্তি! যেন বর্ণকবি ও ছন্দ-কবির মধ্যে কাহার কৃতিত্ব অধিক, এই লইয়া যে একটা বিসম্বাদের সৃষ্টি হইতে পারে তাহা একেবারে মিটাইয়া দিয়াছে। কোনও ইংরাজ কবি-সমা-লোচক এক কবিতার সমালোচনা উপলক্ষে বলিয়াছিলেন "In it we hear hues and see harmonies." কথাটা ঠিক ঐ অর্থে এস্থলে সমভাবে প্রযোজ্য হইলেও আমাদের আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়, এ কবিতায় অক্ষরের মসীচিহ্নগুলি একেবারে ইন্দ্রধনুবর্ণের চিত্ররেখায় ফুটিয়া উঠে। যখন পড়ি,

সরোবর প্রান্তদেশে ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী
কলনৃত্যে বাজাইয়া মাণিক্য কিঙ্কিণী
কল্লোলে মিশিতেছিল—

তখন কি Harmonies কাণ হইতে চোখে আসিয়া পড়ে না? আর যখন নবীন বসন্তের বর্ণসম্ভার কবি জলে স্থলে আকাশে অতি ধীরে ধীরে অতি সুকুমার অথচ গভীর রেখায় টানিয়া যাইতে লাগিলেন তখন কি প্রাণের ভিতর বাসন্তী রাগিণীর মতই একটা সুর শুনিতে পাইতেছি বলিয়া বোধ হয় নাই? আবার,

সারস ঘুমায়েছিল দীর্ঘ গ্রীবাখানি
ভঙ্গিভরে বাঁকাইয়া পৃষ্ঠে লয়ে টানি,

ধূসর ডানার মাঝে—

চিত্রকর তাঁহার বর্ণতুলিকায় 'রূপ'কে আর বেশী কি রূপ দিতেন!

এ পর্য্যন্ত ত' চিত্রকরের সহিত সমকক্ষতা গেল, যদিও সে সমকক্ষতা কবির পক্ষেও কম শ্লাঘার কথা নয়, কারণ সকলের কাব্যেই "We hear hues and see harmonies" বলিবার অবসর নাই, সকলের কার্য্যেই বর্ণ শব্দে এবং শব্দ বর্ণে পরিণত হওয়ার মত ব্যাপার ঘটিতে পারে না। কিন্তু কবি চিত্রকর অপেক্ষা অনেক বিষয়ে সুবিধাবান, তাই তাঁহার তুলনায় শ্রেষ্ঠতর, তাই আমরা এমন কবিতাকে সুনিপুণ তুলিকাকীর্ত্তি অপেক্ষাও উপাদেয় মনে করি। কবি এখানে কেবলমাত্র দেখিবার বস্তুই দিলেন না, সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুও দেন দেখিতেছি—

ছায়াখানি রক্ত পদতলে
চ্যুত বসনের মত রহিল পড়িয়া

এখানে চিত্রকর তাঁহার চিত্রে রক্তপদতলে ছায়াখানিই দেখাইতে পারিতেন, কিন্তু চ্যুত বসনের মত দেখাইতে পারিতেন না। আর এক কথা, চিত্রে গতি নাই, শুধু এক মুহূর্ত্তের যে ভঙ্গি তাহাই চিত্রকর ধরিয়া রাখিতে পারেন, কাজেই ঘটনার পারম্পর্য্যে যে সৌন্দর্য্যের বিকাশ তাহা তাঁহার নাই। অশ্রু, একের পর অন্য গড়াইয়া পড়িতেছে, বা সন্ধ্যার মেঘে যে বর্ণের পর বর্ণ নিমেষে ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহার সৌন্দর্য্য চিত্রকরের সাধ্যাতীত। সুন্দরের পর যে অধিকতর সুন্দর, অতএব বিস্ময়ের পর অধিকতর বিস্ময়—এই বিকাশমাধুর্য্য কবিরই আয়ত্ত। কবিতাটির প্রথম অংশে চিত্রের সেই নিশ্চলতা—সমস্ত দৃশ্য চিত্রার্পিতের মতই নিশ্চল। কিন্তু সহসা এই নির্বাত নিষ্কম্প জলরাশি চঞ্চল হইয়া উঠিল। কুহক ভাঙ্গিয়া গেল। গতি এবং ক্রিয়া প্রবেশ করিয়া সজীব অভিনয়ে কাব্যাংশ পরিস্ফুট করিয়া দিল। সে কখন?—যখন

জলপ্রান্তে ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণ কম্পন রাখিয়া
সজল চরণচিহ্ন আঁকিয়া আঁকিয়া
সোপানে সোপানে, তীরে উঠিল রূপসী,
মুক্ত কেশভার পৃষ্ঠে পড়ি গেল খসি'।

প্রথমে জলপ্রান্তে কম্পন রাখিয়া, পরে সোপানে সোপানে চরণচিহ্ন আঁকিয়া রূপসী তীরে উঠিল। তারপর মুক্ত কেশভার পৃষ্ঠে খসিয়া পড়িয়া গেল।



সৌন্দর্য্যটুকু কেমন ক্রমে ফুটিয়া উঠিয়াছে! ইহাকেই বলিতেছিলাম, সৌন্দর্য্যের ক্রমবিকাশ। এই জন্য আমরা কবিতাটিকে শুধু উৎকৃষ্ট চিত্র বলি না, চিত্র হইতেও উৎকৃষ্ট বলি। এখানে কবিরই জয়।

এই কাব্যচিত্রের আর একটি বিশেষত্ব, যাহাকে ইংরাজিতে harmony বলে। এমন আর কোথায়ও দেখি নাই। পটভূমিকা ও চিত্রের বিষয় একেবারে একসুরে বাঁধা—এমন চুপে চুপে মিলিয়া দুইটা এক হইয়া এমন ভাবের সমগ্রতার সৃষ্টি করিয়াছে, যে বিস্ময়বিমুগ্ধ হইতে হয়। বনপ্রকৃতির মধ্যে নব বসন্ত, জীবন্ত প্রতিমা এই রমণীরই হৃদয়ের মুকুলিত প্রায় "প্রথম প্রেমের মত, কাঁপিয়া কাঁপিয়া ক্ষণে ক্ষণে শিহরি শিহরি ফিরিতেছিল।" আবার তাহার সঙ্গে মূক পশুপ্রকৃতি "সযত্ন-পালিত শুভ্র রাজহংসীটি"র রূপে তরুণীর নগ্ন বাহুপাশে মিলিয়া রহিয়াছে। যেন সরসীর সুনীল জলে শৈবালের উপর একটি সবুজ পতঙ্গ বসিয়া আছে—চিত্রভূমিকার মধ্যে আলেখ্য এমন ডুবিয়া আছে যে প্রথমে বর্ণবিচ্ছেদ করা যাইতেছিল না। কিন্তু পতঙ্গটি পক্ষস্পন্দন করিল—তরুণী সোপানের উপর উঠিয়া দাঁড়াইল, আর সমস্ত predicament টাই বদলাইয়া গেল; বুঝা গেল, আর একটা কিছু আছে, তখনি একটা পরিণামের কথা মনে হইল আর চিত্র হইতে কাব্য ফুটিয়া বাহির হইল—উষার বক্ষ হইতে উষাকে ছাড়াইয়া অরুণোদয় হইল। পাঠক মদনের পক্ষে ইহাই বিস্ময়, ইহাই তাহাকে অভিভূত করিল।

সমগ্রভাবে কবিতাটির বহির্দ্দেশে এইরূপ অপূর্ব্ব বিশেষত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার পর যে খণ্ড সৌন্দর্য্যগুলি পরস্পর গাঁথা রহিয়াছে তাহার দুই একটিও বিচ্ছিন্নভাবে এখানে আমাদের দৃষ্টি এড়াইলে চলিবে না।

শ্বেত শিলাতলে যে সুনীল বসনখানি লুটাইতেছে—

"শ্রীঅঙ্গের উত্তপ্ত সৌরভ এখনো জড়িত তাহে"

সে কেমন?—

"আয়ু পরিশেষ
মূর্চ্ছান্বিত দেহে যেন জীবনের লেশ"

এ উপমা যেমন বাস্তব তেমন কবিচিত্তের অতি সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যানুভূতির উদাহরণ স্থল। উপমান ও উপমেয় উভয়ের মধ্যেই কি পেলবতা!—কি সৌকুমার্য্য! শেলির

"The Champak odour fails
Like sweet thoughts in a dream."

মনে পড়ে।

সরসীর নীল নীর কূলে কূলে প্রসারিত, যেন 'বুকভরা আলিঙ্গন রাশি।' প্রিয়জনের যে হৃদয়প্লাবী প্রীতি, আলিঙ্গন ভিন্ন অন্য কোনও রূপে যাহা চোখে ধরা পড়ে না, পরিপূর্ণ সরসীর জলে তাহা আরও স্পষ্ট রূপ ধরিয়াছে। ইন্দ্রিয়াতীত সুন্দর ভাবকে আরও সুন্দর এবং ইন্দ্রিয়গোচর করাই যদি উপমার সার্থকতা হয়, তবে উপমা আর কোথায়ও বোধ হয় এমন সার্থক হয় নাই।

আবার, রাজহংসীটির লম্ব-গ্রীবা স্কন্ধের উপর রাখিয়া রমণী—

কোমল কপোল
বুলাইছে হংসপৃষ্ঠে পরশ—বিভোল।

পড়িতে পড়িতে স্পর্শটা আরো বেশী করিয়া অনুভব করিতে ইচ্ছা করে, ফিরিয়া দেখি, পাখীটি সত্যই তত নিকটে নাই। রূপ, রস, গন্ধ সহজেই কল্পনার বশীভূত, কিন্তু স্পর্শ শীঘ্র ধরা দেয় না। ক্ষমতা অসাধারণ বটে।

এতক্ষণ আমরা যাহা আলোচনা করিলাম তাহা কবিতাটির বহিরাবরণ লইয়াই। কিন্তু যাহা মুগ্ধ করিতেছে, তাহা শুধুই বহিরাবরণ বা খণ্ড-সৌন্দর্য্য নহে; তাহার অন্তরালে একটী অপরিমেয় অখণ্ড ভাবসৌন্দর্য্য রহিয়াছে, যাহা পূর্ব্ব হইতেই অজ্ঞাতসারে হৃদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মনকে অধিকার করিয়া লয়। সেটি কাব্যের অর্থ এবং সমগ্র চিত্রখানির আলোক। কবি অবশ্য তাহা নিজেই করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাহা বুঝিবার পূর্ব্বে আর একটা কথা অর্থ খুঁজিতেছে, তাহা মদনের আত্ম-সমর্পণ। যখন দেখিলাম, সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর মহিমশ্রীর সম্মুখে মদন জানু পাতিয়া বসিয়াছে, তখন বুঝিলাম, মানবের নিকৃষ্ট চঞ্চল প্রেম, যাহা সাধারণ ক্ষুদ্র সৌন্দর্য্যে পরিপুষ্ট হয়, তাহা শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্যের সম্মুখে সাধ্বসসন্ন ও ভক্তিপূত হইয়া উঠে। সেই অমর কবিপ্রবচন "Beauty is Truth, Truth Beauty" তৎক্ষণাৎ বুঝা গেল। যাহা সুন্দর তাহা সত্য, এবং সত্যই সুন্দর। সুন্দরকে যখন সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিলাম, তখন নিজের সত্ত্বা সেই সত্যে সমর্পণ করিলাম। যাহা সত্য বলিয়া বুঝি, তাহা এমনি করিয়া আমাদের জয় করে। এদিকে যাহা শ্রেষ্ঠ তাহাই সত্য, এবং সুন্দরই শ্রেষ্ঠ বা শ্রেষ্ঠই সুন্দর।



তাই "Beauty is Truth" ইত্যাদি। মদন তাহা বুঝিল, এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে বিজিত হইয়া গেল। এ ত গেল বিজিতের অর্থ, কিন্তু 'বিজয়িনী'র অর্থই কবিতার মুখ্য অর্থ; কবি তাহা অপূর্ব্ব কৌশলে একটিমাত্র নামের সঙ্কেতে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা "অচ্ছোদ"।

এখন মনে পড়িল, যে এই স্নানার্থিনী নারী শুধুই সৌন্দর্য্যের সারভূতা কবির মানসদুহিতা নহে, সে অচ্ছোদের তরুণ তাপসী। গন্ধর্ব্বরাজকন্যা মহাশ্বেতা এবং ঋষিকুমার পুণ্ডরীকের মধ্যে সেদিন বনপথে যে পরিচয় হইল, পারিজাত পুষ্প ও একাবলী হার যে অনর্থের মূল, কাদম্বরী কাব্যের সেই চিরস্মৃত ঘটনার অব্যবহিত পূর্ব্বেই অচ্ছোদের তীরে আমাদের সহিত এ কবিতায় মহাশ্বেতার সাক্ষাৎ হইয়াছে। সেই দিনই বসন্ত-পরশে বনচ্ছায়া আলসে লালসে পূর্ণ ছিল। সেই দিনই নরনারী-জীবনের রহস্যদেবতা অদৃষ্টের প্ররোচনায়, মদনের অঙ্গুলি পুষ্পশরক্ষেপে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। কবি ভবিষ্যৎ দেখিতে পাইয়া, মদনের এই অপূর্ব্ব পরাজয়-কাহিনী প্রচার করিয়া দিলেন। সে ভবিষ্যৎ—প্রেমকে হৃদয়ের অতি গভীর অন্তস্তলে বশীভূত করিয়া প্রিয়তমের জন্মান্তর-স্বপ্নের অবসানে পুনরুত্থান পর্য্যন্ত তাপসীর বিনিদ্র প্রতীক্ষা। এ ধৈর্য্য, এ নিষ্ঠা, এ যোগসাধনা, এ অপ্রমত্ততা, প্রেমের এতটুকু স্বাতন্ত্র্য থাকিলে রক্ষা পাইত না। তাহা হইলে যাহা হইত, কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাঁহার 'Laodamia'তে তাহারই বর্ণনা করিয়াছেন। ট্রয়যুদ্ধে নিহত গ্রীক বীর প্রোটোসিলাসের বধূ লাওডমায়া দেবতাদিগকে পূজায় প্রসন্ন করিয়া স্বামীর ছায়া-মূর্ত্তির সহিত ক্ষণকাল মিলনের অনুমতি পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয় প্রেমের বিদ্রোহে অন্ধ হইয়া সংযম হারাইয়াছিল। স্বামীর প্রেতাত্মা বলিলেন,—

And thou, though strong in love, art all too weak
In reason, in self-government too slow;
I counsel thee by fortitude to seek
Our blessed re-union in the shades below.

কিন্তু তিনি তাহা পারিলেন না; তাঁহার প্রেম তখনও রিপু, তাহাকে জয় করিতে পারেন নাই। তাই ছায়ামূর্ত্তির অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মূর্চ্ছাহত মৃতদেহ শিলাকুট্টিমে লুটাইয়া পড়িল। মহাশ্বেতা পারিয়াছিলেন, তাই দেবতাদের সহানুভূতি ছিল ও তাই পুনর্মিলন সম্ভবপর হইয়াছিল। কারণ,—

"The gods approve the depth, and not the tumult of the soul."

এই পরম সত্যের প্রতি, অচ্ছোদের তাপসীর সেই মহাসিদ্ধির প্রতি ইঙ্গিত করিয়াই কবি 'বিজয়িনী'-চিত্রে শেষ রেখাপাত করিয়াছেন।

গান থামিয়া গেল, কিন্তু বীণার তারগুলি এখনও কাঁপিতেছে। যে বর্ণগুলি, একের পর অপর, সুন্দরতর রেখায় ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহা এখন অপরিবর্ত্তনীয় শাশ্বত চিত্রে পরিণত হইয়া গেছে। মানবের অতি পরিচিত একটি অত্যাচারী দেবতা 'বিজয়িনী'-নারীর সম্মুখে অবনত মস্তকে দীনতা স্বীকার করিয়া, আমাদের স্বর্গশিখরী মনোমন্দিরে তাহাকে দেবীপদে অধিষ্ঠিত করিয়া দিল। এখন হইতে ধূপ পুড়াইয়া নিত্য তাহার আরতি হইবে।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

---

## প্রেমের রাজ্যবিস্তার।

আজি শুধু মনে হয় প্রথম সে পরিচয়
জীবনের নবীন আলোকে,
ঊষার রক্তিম রাগে নবপ্রেম অনুরাগে
কি মোহ মাখা'ল দুহুঁ চোখে।
আকাঙ্ক্ষার বাষ্প দিয়ে নব বিশ্ব বিরচিয়ে
কত কাল কাটানু আবেশে—
কি যে তৃপ্তি কি অতৃপ্তি কামনার নিত্য দীপ্তি
আলসে বিলাসে ভালবেসে'।
ভাবিতাম এই ভাল এই রূপে চিরকাল
কাটাইব একেলা দুজনে,
প্রেম যত বেড়ে যাবে কেহ ভাগ নাহি পাবে
মোরা শুধু ভুঞ্জিব গোপনে।
মনে হেসে চুপে চুপে পুত্ররূপে কন্যারূপে
জগৎ দাঁড়াল লয়ে দাবী ;
কোমল দুর্ব্বল করে নাহি জানি কি মন্তরে
খুলে' দিল ভাণ্ডারের চাবী।



আমাদের প্রেম মাঝে ওতপ্রোত হয়ে রাজে
ছেলের মেয়ের ভালবাসা,
গোপন মরম-বীণে বেজে উঠে দিনে দিনে
বিশ্বের উদার মহাভাষা।
ভাগে প্রেম ক্ষীণ হয় জেনেছি সে মিছে ভয়
যত দাও তত বাড়ে সীমা,—
যাহার অস্তিত্বটুকু ছিল নাকো জাগরূক
দিয়ে বুঝি কি তার মহিমা।
এরূপে বাহির দিয়ে দিন দিন করি প্রিয়ে
অন্তরের নিত্য আবিষ্কার—
কত নব নব দেশে পতাকা উড়িছে হেসে
আঁকা চিহ্ন তোমার আমার।

শ্রীদ্বিজেন্দ্র নারায়ণ বাগচী।

---

## অর্থনীতি।

আদম স্মিথ বলিয়াছেন যে পরিশ্রমকে বিভাগ করিয়া লইলে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। কোন বস্তু উৎপাদন করিতে একই ব্যক্তি শ্রম না করিয়া যদি বিভিন্ন ব্যক্তি ঐ দ্রব্যটীর ভিন্ন ভিন্ন অংশ প্রস্তুত করে, তাহা হইলে ঐ দ্রব্যটী সত্বর এবং সুন্দররূপে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহাকে শ্রমবিভাগ বলা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আদম স্মিথ আলপিন প্রস্তুতের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। একটী আলপিন প্রস্তুত করিতে অষ্টাদশ প্রকারের প্রক্রিয়া আবশ্যক। প্রথমতঃ লৌহ হইতে তার করিতে হয়, পরে তাহাকে সমানভাবে বিভক্ত করিয়া একদিকে চোয়াল করিতে হয় ; পরে উহার মাথা লাগাইয়া বার্ণিস করিয়া কাগজে গ্রথিত করিতে হয়। একটী লোককে যদি এই অষ্টাদশ প্রকারের কার্য্যই করিতে হয়, তাহা হইলে দৈনিক কুড়িটীর অধিক আলপিন সে প্রস্তুত করিতে পারে না। কিন্তু যখন পরিশ্রমকে বিভাগ করিয়া দেওয়া হয় অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন কারিকর ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত হয়, তখন মাত্র দশজন দৈনিক পঞ্চাশ হাজার পিন প্রস্তুত করিতে পারে। খেলিবার তাস প্রস্তুতে

বায়াত্তরটী ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়া আবশ্যক। একজনকে যদি সকল কাজই করিতে হয়, তবে দৈনিক দুই এক খানির অধিক তাস প্রস্তুত হইতে পারে না, কিন্তু ত্রিশটী লোকের মধ্যে যদি এই বায়াত্তর রকমের কার্য্য বিভক্ত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহারা দৈনিক পনের হাজার পাঁচ শত তাস প্রস্তুত করিতে পারে। আমাদের দেশে যাহারা প্রতিমা নির্ম্মাণ করে, তাহাদের কার্য্যের এইরূপ শ্রমবিভাগ আছে। যাহারা পটুয়া বা মালীদের বাড়ীর কার্য্যাবলী দেখিয়াছেন তাহারা জানেন যে বাড়ীর স্থবির ও বৃদ্ধ স্ত্রীপুরুষে 'বড়ে' বাঁধে। বালকবালিকারা উহাতে কর্দ্দম মাখাইয়া "একমেটে" করে, বয়স্কা স্ত্রীলোকে "দোমেটে" করিয়া দেয় এবং যাহারা প্রবীণ ও কার্য্যদক্ষ তাহারা প্রতিমার মুণ্ড নির্ম্মাণ ও রংয়ের কার্য্য এবং পটচিত্র করে। যদি এই শেষোক্তদিগেরই সকল কার্য্য করিতে হইত তাহা হইলে ইহাদের অন্ন জুটিত না, কিন্তু এই প্রকার শ্রমবিভাগ আছে বলিয়াই ইহারা অনেকগুলি প্রতিমা গঠন করিতে পারে।

আমাদের দেশে প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ যে জাতিভেদ বা বর্ণভেদ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে শ্রমবিভাগ ব্যতীত কিছুই নহে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকলেরই ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ ইহা শ্রমবিভাগেরই অন্য নাম মাত্র। কিন্তু এখন এই বিভাগের যেরূপ দিন দিন অধোগতি হইতেছে তাহাতে ও নানা কারণে এইপ্রকার জাতিভেদ বাঞ্ছনীয় নহে।*

* কলিকাতায় একদিন বরোদার গুইকোয়ার মহোদয় বলিয়াছিলেন "Egypt in the ancient time had abundant resources, but failing to note the value of human life, failing to conserve the interests of the working masses, she sank from the pinnacle of power and culture into political servitude. The nation that despises its humblest classes, that provides for them no opportunity to rise in the social scale and in self-esteem, is building its house upon the sand. The wealth of a nation is the quality of its manhood. And again "Break the monopoly of caste prerogatives and social privileges. They are self-arrogated and are no more inherent in any one caste than commercial predominance or political supremacy in any one nation. Elevate your brethren of the humbler castes to your own level and smooth all artificial angularities." বর্ত্তমান ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকেই The Depressed Classes Mission দেখা যাইতেছে ইহা যে একটী শুভ সূচনা তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহও নাই। জোর করিয়া ( যাহাকে Brute force বলে ) কাহাকেও নীচু রাখা যায় না। গুণকর্ম্মানুসারে সকলকে স্ব স্ব স্থান দিতে হইবে। ইংলণ্ডে জোর করিয়া শ্রমজীবিগণের পারিশ্রমিকের হার নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছিল বলিয়াই Wat Tyler's Rebellion, ইহা যেন আমাদের মনে থাকে। বস্তুতঃ এখানেও তাহাই হইতেছে।

"Indian Industry subsidiary to agriculture would be much more efficient if labour could be further divided. কি করিয়া উহা সম্ভব তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই প্রণিধান করা কর্ত্তব্য।



শ্রমবিভাগ করা হইলে সাধারণতঃ তিনটি সুবিধা ভোগ করা যায়। প্রথম—কার্য্যে নিপুণতালাভ। এক ব্যক্তি যদি ক্রমান্বয়ে বহু বৎসর ধরিয়া একই কার্য্য করে তাহা হইলে স্বভাবতঃই সে কার্য্যে সে বিশেষ পারদর্শীতা লাভ করিতে পারে। ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার অনেক দিন ধরিয়া ঔষধ মাপিতে মাপিতে এমন অভ্যাস লাভ করে, যে অনেক সময় সে আন্দাজ করিয়া ঠিক যতটুকু ঔষধ দরকার ঠিক ততটুকুই লইতে পারে। প্রায় সকল ভাল কাটা কাপড়ের দোকানেই দেখা যায় যে "কাটার" সে কাপড় কাটে, কিন্তু শেলাই করে না। আবার শেলাইকর শেলাই করে, কাপড় কাটে না। উভয়ের কার্য্য ভিন্ন; কিন্তু এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন নিজ নিজ কার্য্যে অনবরত লিপ্ত থাকিয়া তাহারা ইহাতে যথেষ্ট নিপুণতা লাভ করে।

দ্বিতীয়তঃ ইহাতে যথেষ্ট সময়সংক্ষেপ হয়। একব্যক্তির বিভিন্ন প্রকারের কার্য্য যদি নিজেকেই করিতে হয়, তাহা হইলে এক কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য কর্ম্মে হাত দিতে এবং এই দ্বিতীয় কর্ম্মোপযোগী সাজসরঞ্জামাদি ঠিক করিয়া লইতেও অনর্থক সময় অতিবাহিত হয়। যাহারা পল্লীগ্রামবাসী তাহারা সকল সময়েই দেখিতে পান যে, ঘরামীগণ চাল ছাইবার জন্য যতক্ষণ চালের উপরে থাকে, ততক্ষণ একমনে কাজ করিয়া যায়, কিন্তু যদি সামান্য কোন দ্রব্যের অভাবের জন্য একবার উপর হইতে নামিয়া আইসে, তাহা হইলেই বাজে কাজে কিছু সময় অতিবাহিত করে। এইজন্য এক কাজে লাগিয়া থাকিলে সময় নষ্ট কম হয়।

তৃতীয়তঃ, একজন এক কার্য্যে অনবরত নিযুক্ত থাকিলে কি প্রকারে স্বল্প পরিশ্রমে বা স্বল্প সময়ে সেই কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে তাহার বিষয় চিন্তা করে এবং অনেকক্ষেত্রে এইরূপেই তাহার উপায় উদ্ভাবিত হয়।*

উপরে লিখিত শ্রমবিভাগের তিনটী সুবিধা আদম স্মিথই উল্লেখ করিয়া-

ছেন। তাঁহার পরে বাবেজ সাহেব শ্রমবিভাগ সম্বন্ধে আরও একটা বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইহাকে শ্রেণীবিভাগ বলা হয়। যে কারিকর যে কার্য্যে উপযুক্ত তাহাকে কেবল সেই কার্য্যেই নিযুক্ত করা উচিত। একটী দ্বাদশ বৎসরের বালককে দিয়া যে কার্য্য চলে, সে কার্য্যে প্রাপ্তবয়স্ককে নিযুক্ত করিলে অযথা লোকসান হয়। যে দৈনিক দশ টাকা বেতনের উপযুক্ত কার্য্য করিতে পারে, তাহাকে দুই টাকা বেতনের কার্য্যে নিযুক্ত করিলে তাহারও ক্ষতি, দেশেরও ক্ষতি। পক্ষান্তরে যে দুই টাকা বেতনের কার্য্যে উপযুক্ত, তাহাকে দশ টাকা বেতনের কার্য্যে নিযুক্ত রাখিলেও যথেষ্ট ক্ষতি। ক্রমশঃ

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

---

# পুনরাগমন।

যখন পিতৃদেব আমাকে রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন, তখন সংসারে আমি ও আমার বালিকাপত্নী; তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যে পুরাতন ভৃত্য বৃদ্ধ রামচরণ।

পিতার সঙ্গতি ছিল না—আয়েরও বিশেষ কোনো পথ ছিল না। জমি জমা যাহা কিছু ছিল তাহা হইতে ধান, বাঁশ ও খড় বিক্রয় করিয়া বৎসরে প্রায় একশত টাকা পাইতাম, কিন্তু তাহাতে তিনটী প্রাণীর ভরণপোষণ চলা অত্যন্ত কঠিন, সুতরাং পিতৃদেবের মৃত্যুতে মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল—সংসারের আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া যেন কেমন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম। লেখা পড়া ভাল শিখি নাই—কোথাও চাকুরী পাইবার আশা ছিল না। যখন ভাবিতাম যে সংসারে আমি একা নহি, আমার সুখদুঃখভাগিনী আরো একজন আছে, তখন চক্ষে অন্ধকার দেখিতাম; মনে মনে পিতৃদেবের উদ্দেশে বলিতাম—"বাবা, একি করিলে? স্নেহপরবশ হইয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে আর একটী জীবনকেও অনির্দ্দিষ্ট পথে নিক্ষেপ করিলে কেন?"

আমার এত চিন্তা এত যন্ত্রণার মধ্যে একমাত্র শান্তির উপায় ছিল রামচরণ দাদা। যখন সকালে তাঁতি বৌ কাপড়ের দাম চাহিতে আসিবে তখন তাহাকে কি বলিব,—যখন ঘোষেদের বিরজা তাহার প্রাপ্য পাঁচসিকার জন্য উঠানে দুধের কেঁড়ে নামাইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া থাকিবে তখন তাহাকে কি বলিব,—যখন মহেশ কলু তাহার চৌদ্দ ছটাক তেলের দামের



জন্য জাঁতার মত মুখ ঘুরাইতে থাকিবে—তখন তাহাকে কি বলিব—এই সকল ভাবিতে ভাবিতে যখন আকুল হইয়া পড়িতাম, তখন কঠিন বলিষ্ঠ রামচরণ দাদা কাঁধে গামছা ও হাতে হুঁকা লইয়া আমার কাছে বসিয়া আমার সমস্ত ভাবনার কারণ বুঝিয়া লইত এবং আশ্বাস দিয়া আমায় বলিত "তুই অত ভাবিস্ কেন দাদা, যা'কে যা' দিতে থুতে হয় আমি দেবো—তুই একটু হাতের লেখা মক্কো কোরগে যা' "।

হাতের লেখা মক্কো! বয়স যে আঠারো বৎসর পার হইয়াছে তাহা রামচরণ দাদার জ্ঞান নাই। এই অর্দ্ধপক্ক ঊনবিংশ বয়স্ক প্রৌঢ়বালককে লইয়া যে "লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ" প্রভৃতি নীতি বচন গুলির সার্থকতা সম্পাদন করিতে হইবে সে ধারণা আমার ছিল না। যাহা হউক, রামচরণ দাদাকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য মাঝে মাঝে হলুদে বালির কাগজের খাতা, কঞ্চির কলম ও বেগুনে কালী লইয়া বসিতাম। দুঃখের বিষয়, যৎসামান্য বাঙ্গালা সাহিত্য জানা থাকিলেও আমাকে রামচরণ দাদার তাড়ায় সেই একঘেয়ে "আজ্ঞাকারী" "প্রতিপাল্য" প্রভৃতি পাঠ লিখিতে হইত। দাদার গোঁফজোড়াকে আমি বড়ই ভয় করিতাম, একটু রাগিয়া গেলে তাহার পাকা পাকা গোঁফগুলা যেন শাণিত ছুরিকার মত বোধ হইত।

"মেঘনাদবধ" "বৃত্রসংহার" প্রভৃতি কাব্য বুঝিতে পারিতাম—বাঙ্গালা ব্যাকরণও কিছু কিছু জানিতাম, কিন্তু হাতের লেখা অতি কদর্য্য ছিল; সেইজন্য আমাদের দেশের জমীদার মহাশয়ের সরকারে আমার একটী চাকুরী হইল না; দেখিয়া শুনিয়া রামচরণ দাদা আমায় এই বয়সে পাঠশালার পোড়ো করিয়াছিল।

আমার শ্বশুরবাড়ীর অবস্থা বড়ই খারাপ; সুতরাং স্ত্রীকে কাছে না রাখিলে আর কোথায় ফেলিব? কিন্তু বড় কষ্ট! নিজে সব সহ্য করিতে পারিতাম, কিন্তু আমার উপর একান্তনির্ভরা একটী ক্ষুদ্র বালিকার বিষণ্ণ মুখ দেখিতে আমার বুক ফাটিয়া যাইত। রামচরণ দাদা কষ্ট জানিতে দিত না, কিন্তু কোথা হইতে দুর্ভাবনা আসিত, কে জানে!

রামচরণ দাদাকে কখনো মাহিনা দিই নাই—সে কখনো চাহে নাই; আমাদের দুঃখের ভাগী হইয়া তাহার যে কি লাভ, কি স্বার্থ, তাহা সেই জানিত। ঠিক মনে হয় না, বাবাও তাহাকে কখনো মাহিনা দিতেন কিনা

বলিতে পারি না। রামচরণ দাদার ঘরবাড়ী পুত্র পরিবার ছিল কিনা জানিনা,—কখনো তাহাকে আমাদের বাটী ছাড়া অন্যত্র দেখি নাই; জিজ্ঞাসা করিলে বুড়ার দন্তহীন মুখ স্বর্গীয় জ্যোতিতে উৎফুল্ল হইত, হাসিতে হাসিতে হুঁকার উপর কাশিতে কাশিতে বুড়া বলিত—"আমি তোর ভাই।"

দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। সংসারের ভাবনা আর বড় বেশী কষ্টদায়ক বলিয়া বোধ হয় না। যখন যাহা প্রয়োজন, রামচরণ দাদা এক রকম করিয়া যোগাইত। একমাত্র পত্নীকে লইয়া পল্লীযুবকের জীবন এক রকম নির্ব্বিবাদে কাটিতে লাগিল। আমার মত দুই একটা নিষ্কর্ম্মা যুবকও বন্ধুরূপে সহায় হইল। সমস্তদিন তাহাদের সহিত গল্পগুজবে অতিবাহিত করিতে আরম্ভ করিলাম। কোনো ভাবনা নাই;—বেশ একটু সুখান্বেষী হইয়া পড়িয়াছি—সংসার চলিতেছে, চলিবে; মানুষের জীবনটা তো আর কেবল ভাবনার জন্য সৃষ্ট হয় নাই!

ঘরে চাল নাই,—হাঁড়ি উনানে চড়িবে কিনা সন্দেহ। মধ্যাহ্নে একরকম অন্নমুষ্টি জুটিয়াছিল, রাত্রে যে কি হইবে তাহার ঠিক নাই। বৈকালে রামচরণ দাদাকে বলিলাম। দাদা বলিল "তা'র আর ভাবনা কি?" একখানা গামছা ও একটী ধামা লইয়া বৃদ্ধ চাউল আনিতে গেল। কোথায় গেল—কোথায় অর্থ পাইল, তাহা জানি না। যখন রামচরণ দাদা বাটীর বাহির হয়, তখন পশ্চিমাকাশে কালো পাথরের মত একখানা ঘন মেঘ উঠিয়াছিল।

রামচরণ দাদা চলিয়া যাইবার পর বন্ধুরা আসিয়া উপস্থিত হইল। রুচি অনুসারে নানাপ্রকার গল্প ও নানা বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ হইল। এতক্ষণ থাকিয়া, মেঘখানা সমস্ত আকাশ ছাইয়া ফেলিল, শীতল বাতাস আমাদের মস্তক স্পর্শ করিল। মেঘ দেখিলে ময়ূরের আনন্দ হয়, এবং প্রকৃতির শিশুর বক্ষে আনন্দধারা ছুটে; আমার একটী বন্ধু অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় একটা অসাময়িক গান ধরিয়া ফেলিলেন। তাহার আনন্দ প্রাণের কিনা বলিতে পারি না, আমাকে কিন্তু গানটা লাগিল ভাল। মনে মনে ভাবিলাম একটা হারমোনিয়ম কিনিতে হইবে। আকাশ নামিয়া আসিল—মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল; গভীর মেঘগর্জ্জনের সঙ্গে সমস্ত দর্দ্দুরগুলা সমস্বরে ডাকিয়া উঠিল। দুর্য্যোগ বুঝিয়া গৃহের অবস্থা দেখিবার জন্য বাটীর মধ্যে গেলাম; সেখানে দেখি ভয়চকিতা পত্নী বাক্স পেঁটরা লইয়া ব্যস্ত; খোড়ো চালের



মট্‌কা ভেদ করিয়া হুহু শব্দে গৃহের মধ্যে জল পড়িতেছে। কোনো রকমে ঘর দ্বার সামলাইয়া আসিয়া আবার বন্ধুদের কাছে বসিলাম। হায়, তখনো মনে হইতেছিল—একটা হারমোনিয়ম চাই!

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। ভেকের মকমকধ্বনি ও বৃষ্টিপতনের ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ শব্দের সঙ্গে সমস্ত গ্রামের শঙ্খরোল মিশিয়া গেল। এমন সময়ে দেখি যে রামচরণ দাদা চাউলের ধামার উপর একটী টোকা বসাইয়া সেই ভয়ঙ্কর দুর্য্যোগে ফিরিয়া আসিতেছে। বিশাল বক্ষ, কিন্তু মাংস একটু লোল হইয়া পড়িয়াছে, শিরাবিশিষ্ট লৌহদণ্ডের মত বাহুযুগল, কিন্তু কতকটা তেজ যেন তাহা হইতে ঝরিয়া গিয়াছে—স্কন্ধের উপর চাউলের ধামা ছিল বলিয়া মস্তকটী ঈষৎ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে—চিবুক বক্ষসংলগ্ন হইয়াছে; দন্তহীন মুখ ঈষৎ বিবৃত্ত হইয়া শ্রমকাতরতার লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছে। আমাকে বন্ধুবেষ্টিত দেখিয়া বুড়া একটু গম্ভীর মুখে বাটীর ভিতর চলিয়া গেল। রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত বন্ধুদের সহিত গল্পগুজবে কাটাইয়া বাটীর মধ্যে আহার করিতে গেলাম। শুইবার সময় পত্নীর মুখে শুনিলাম যে রামচরণ দাদা রাত্রে আহার করিবে না; বৃষ্টিতে ভিজিয়া তাহার শরীর অসুস্থ হইয়াছে। সমস্ত রাত্রি কিন্তু আমি হারমোনিয়মের স্বপ্ন দেখিয়াছি।

সকালবেলা উঠিয়া দেখি রামচরণ দাদা আমার পত্নীর নিকট একটু তেল চাহিতেছে। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বৃদ্ধ বলিল—"ভাই, আর গায়ে শক্তি নেই—এক সময় আড়াই মুনি বস্তা ঘাড়ে কোরে এক কোশ মেঠো পথ ভেঙ্গেছি, আর আজ এই আধমুনি ধামা ঘাড়ে কোরে একপোয়া পথ আস্‌তে বড় কষ্ট হোয়েচে; ঘাড়ের একটা শির টেনে ধোরেছে; বৌমার কাছ থেকে তাই একটু তেল চাইছিলুম, মালিস কোর্‌বো"।

একবার মনে মনে ভাবিলাম বৃদ্ধের কাল পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু কেমন এক বিষয়ে ঝোঁক! হারমোনিয়মের চিন্তা আমাকে বৃদ্ধের কথা ভাবিবার অবসর দিল না। আমি বুড়ার কাছে হারমোনিয়মের জন্য আব্‌দার ধরিয়া বসিলাম।

বুড়া বলিল—"এখন আর হারমুনি কি হবে? ও সব বয়াটে ছোঁড়াগুলোর সঙ্গে মিশিস্‌নি।"

আমি নাছোড়বান্দা,—কোনোরকমে সরল বুড়াকে সম্মত করাইলাম। পরদিন দুইটা তালগাছ ও তিনটা জামগাছ বিক্রয় করিয়া বুড়া আমায়

ত্রিশটাকা দিল। বলা বাহুল্য দুই একদিনের মধ্যেই আমি হারমোনিয়ম আনিয়া ভাঙ্গাঘরে সারেগামা সাধিতে আরম্ভ করিলাম।

দুই দশদিন বাজাইয়াই সক মিটিয়া গেল। যখন বন্ধুদের সহিত বসিয়া আনন্দ করিতাম তখন রামচরণ দাদার মুখ যেন বিষণ্ণ হইয়া যাইত। সরল বুড়ার স্নেহ মনে করিয়া প্রাণ যেন কেমন ছট্‌ফট করিত, শান্তি পাইতাম না। মনে করিতাম বুড়া আমাকে ভালবাসিয়া আমার আবদার শুনিয়াছে হায়, আমি কেন তাহার কাছে কপট হইলাম! মনে সুখ না পাইয়া একদিন হারমোনিয়মটী একজন বন্ধুকে পঁচিশ টাকায় বিক্রয় করিয়া ফেলিলাম; বুড়ার হাতে টাকা দিয়া বলিলাম—"দাদা, আমার হারমোনিয়মে দরকার নেই—তুমি জমিদারসরকারে এবার একটী চাকুরীর সন্ধান দেখ, আমার হাতের লেখা পেকেছে।" দাদা একগাল হাসিয়া বলিল—"বেশ দাদা, এই তো চাই; আমি কালই জমিদারবাড়ী গিয়ে সন্ধান নেবো।"

রামচরণ দাদার যত্নে ও চেষ্টায় সেবার জমিদারসরকারে খোরাকীসমেত একটী ছয়টাকার বেতনের চাকুরী পাইলাম। জমিদার মহাশয় পাটের কারবার করিতেন। তাঁহার কার্য্যের জন্য আমাকে কিছুদিন ঢাকা, নারায়ণগঞ্জে থাকিতে হইল। পত্নীকে মাসিক পাঁচটাকা খোরাকী দিয়া তাহার মাসীর বাটীতে রাখিয়া দিলাম। রামচরণ দাদা আমায় নারায়ণগঞ্জে পৌঁছিয়া দিবার জন্য সঙ্গে চলিল। কখনো বিদেশে যায় নাই, যদি সে কোনো বিপদে পড়ে, সেই জন্য রামচরণ দাদা তাহার স্নেহের ভাইটীর সঙ্গে চলিল।

ভাদ্রমাস; কুলবিধ্বংসিনী পদ্মা এককুল ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে ছুটিয়াছে। রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর—আকাশে মেঘ করিয়াছিল; ক্রমে সে মেঘখানি বিস্তৃত হইয়া পড়িল—ভয়ঙ্কর ঝড় উঠিল। আমাদের নৌকাখানিকে নাচাইয়া নাচাইয়া, তরঙ্গ হইতে তরঙ্গে নিক্ষেপ করিয়া ভৈরবী পদ্মা যেন ক্রীড়া করিতে লাগিল। ঘাট আর বেশীদূর নহে, প্রায় নিকটে আসিয়াছে, এমন সময় মাঝি বলিল—"আরে সর্ব্বনাশ, নৌকো বান্‌চাল হ'য়েছে"। একটা ছিদ্রমুখ দিয়া হুহুশব্দে নৌকায় জল উঠিতে লাগিল। রামচরণ দাদা তাড়াতাড়ি ছিদ্রমুখে কতকগুলা পাট গুঁজিতেছে, এমন সময়ে হঠাৎ সেখানকার একখানা তক্তা ছাড়িয়া গেল। নৌকা হইতে সকলে লাফাইয়া পড়িলাম দেখিতে দেখিতে নৌকাখানি জলমগ্ন হইল। আমি ভাল সাঁতার জানিতাম



না,—সে প্রখর টানে আপনাকে সামলাইতে না পারিয়া একপেট জল খাইলাম। রামচরণ দাদা বহুকষ্টে আমায় কুলে তুলিল। বৃদ্ধ না থাকিলে সে যাত্রা রক্ষা পাইতাম না।

নারায়ণগঞ্জের কাছারীবাড়ীতে দুই তিন দিন থাকিয়া রামচরণ দাদা আমার নিকট বিদায় লইল, বলিল "ভাই, ঘরদুয়ার জায়গাজমি দেখ্‌তে আমি যাই, তুমি কেমন থাক আমায় পত্র দিও।" রামচরণ দাদাকে বিদায় দিয়া যতদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে তাহার পথের দিকে চাহিয়া রহিলাম। বুড়া একবার করিয়া আমার দিকে চাহিতেছিল ও তাহার গামছা দিয়া চক্ষু মুছিতেছিল।

প্রায় একমাস নারায়ণগঞ্জে রহিলাম; জমিদার মহাশয়ের কার্য্য শেষ হইয়াছে—বাটী ফিরিবার সময় আসিয়াছে। এমন সময় একখানি পত্র পাইলাম; তাহাতে রামচরণ দাদা লিখিয়াছে,—"ভাই, শীঘ্র বাটী আইস; আমি পীড়িত, সত্বর না আসিলে আর সাক্ষাৎ হইবে না"। তাড়াতাড়ি বাটী প্রত্যাগমনের জন্য যাত্রা করিলাম। বাটীতে আসিয়া দেখি রামচরণ দাদা জরাতিসারে কঙ্কালসার হইয়াছে, বিছানা হইতে উঠিবার সামর্থ্য নাই, পাড়ার দুই একজন প্রতিবাসী তাহার সেবা করিতেছে। আমি ছুটিয়া গিয়া রামচরণ দাদার বিছানায় বসিলাম। বুড়ার নিষ্প্রভ নয়ন যেন একটু প্রসন্ন হইল। আমি তাহার অস্থিচর্ম্মসার বক্ষে হাত বুলাইতে লাগিলাম। বুড়া বলিল—"দাদা, বৌমাকে আনাও; আমি আর বাঁচ্‌ব না। তোমাদের চোখে দেখে মরলেও আমার স্বর্গ হবে।"

আমি পত্নীকে আনাইলাম। দুইজনে মিলিয়া, দুর্দ্দিনের বন্ধু, স্নেহের আধার রামচরণ দাদার সেবা করিতে লাগিলাম। কবিরাজ ঔষধ দিল, কোনো ফল হইল না। একদিন রামচরণ দাদা আমায় কাছে ডাকিয়া বলিল—"ভাই, রান্নাঘরের বায়ুকোণে পাঁচশো টাকা একটা ঘটিতে পোঁতা আছে,—সে তোমার পিতৃদত্ত ধন, তুমি নিও। এখন দাদা, নারায়ণের নাম কর, আমি চোখ বুজি—যদি সম্ভাবনা থাকে তোমাদের সুদিন দেখ্‌তে আবার আস্‌বো।"

কথার উত্তর দিতে পারিলাম না। চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া গেল। রামচরণ দাদার ক্ষীণ বুকের উপর সন্তর্পনে মাথা রাখিয়া অনেক অশ্রু বিসর্জ্জন করিলাম। সে দিন সন্ধ্যার সময়ে দাদা আমাকে একা ফেলিয়া চলিয়া গেল।

পত্নীকে লইয়া সংসারে ঝাঁপ দিলাম। একমাত্র সহায় চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইল।

সেদিন হইতে মনে মনে একএকবার ভাবিতাম, পুনর্জন্ম কি সম্ভব! মানুষ মরিয়া গেলে কি আর ফিরিয়া আসে! রামচরণ দাদা বলিয়াছে "আবার আস্‌বো"। জগদীশ্বর তাই যেন সত্য হয়।

* * * * * *

তার পর আজ পনেরো বৎসর কাটিয়াছে। তিন চারিটী পুত্রকন্যা হইয়াছে। আমাদের গ্রামের আর সে তৃণকুটীর নাই; তাহার স্থানে ইষ্টকালয় স্থাপিত হইয়াছে। এখন আমি একজন পাটের বড় দালাল। গ্রামের মধ্যে একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি হইয়াছি। এমন সুখের দিনে আমার সরল স্নেহময় রামচরণ দাদা কোথায়! হায় বৃদ্ধ হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ দিয়া আমাদের বর্দ্ধিত করিয়াছিলে,—আজ ফলপুষ্পশোভিত বৃক্ষের পরিপূর্ণতা দেখিবে কে!

একদিন গৃহদ্বারের নিকট বসিয়া বসিয়া এই সকল কথা ভাবিতেছি, এমন সময়ে দেখি যে একটী দশ বারো বৎসরের বালক কাঁদিতে কাঁদিতে আমাদের দ্বারের নিকট দাঁড়াইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কাঁদ্‌ছ কেন বাপু? তোমার কি হ'য়েছে?" বালক বলিল—"আমার কেও নেই, মা বাপ কবে মারা গেছেন মনে পড়েনা। গ্রামের জমিদারবাটীতে ছিলুম; আজ তাঁ'রা তাড়িয়ে দিয়েছেন।"

বালকটীকে জমিদারবাটীতে যেন দেখিয়াছিলাম বলিয়া মনে হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি জমিদারবাড়ীতে কি কোরে এসেছিলে?"

বালক বলিল—"তা' জানিনা; শুনেছিলুম, আমি তাঁ'দের একজন প্রজার ছেলে; মা বাপ ছিলনা বলে আমায় তাঁ'রা বাড়ীতে রেখেছিলেন।"

"তোমাকে তাঁ'রা তাড়িয়ে দিলেন কেন"?

"চোর বোলে তাড়িয়ে দিয়েছেন"।

"তুমি কি চুরি কোরেছিলে?

"না;—আমার বিছানার নীচে টাকা পাওয়া গিয়েছিল। কে রেখেছিল জানিনা"।

বালকের মুখে একটা দৃঢ়তা ও সরলতা দেখিয়া আমার মনে বিশ্বাস হইল যে সে টাকা চুরি করে নাই। আমি তাহাকে বাটীতে রাখিয়া দিলাম।



বালকটীকে দেখিয়া কেন যে মনে এত স্নেহের সঞ্চার হইয়াছিল তাহা বলিতে পারিনা।

বালক দিনে দিনে তাহার সরল বিশ্বাস ও কর্ম্মনিষ্ঠার দ্বারা আমার হৃদয় অধিকার করিয়া ফেলিল। সে যেন আমার পুত্রদিগের মধ্যে একজন। বাটীতে ফিরিতে যদি আমার কোনো দিন রাত্রি হইত—বালক জাগিয়া বসিয়া থাকিত; কখনো আমার রোগ হইলে বালকের বিষণ্ণমুখ আমার নিকট তাহার অন্তরের ব্যথা প্রকাশ করিত।

ক্রমে বালক একটী বলিষ্ঠকায় যুবকে পরিণত হইল। তাহার কৃষ্ণ বর্ণ দৃঢ়মাংসপেশী ও বিশাল বক্ষ দেখিয়া আমার রামচরণ দাদার কথা মনে হইত। তাহার নাম ছিল 'ভেলু'।

একদিন চৈত্রমাসে মধ্যাহ্নে ছাতি মাথায় দিয়া গ্রামান্তরে একজন বন্ধুর বাটীতে যাইতেছিলাম; সঙ্গে ভেলু ছিল। চারিদিকে রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, পথে জনপ্রাণীও নাই, এমন সময় দেখি একটা রক্তচক্ষু ক্ষিপ্ত মহিষ, আমার ছাতি দেখিয়া ঊর্দ্ধপুচ্ছে ছুটিয়া আসিতেছে, আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কোন দিকে যাইব স্থির করিতেছিলাম; এমন সময়ে "বাঁশ ঝাড়ের দিকে সরে যান" বলিয়া ভেলু যষ্টি হস্তে মহিষ ও আমার মধ্যে দাঁড়াইল। আমি ছাতি ফেলিয়া বাঁশঝাড়ের মধ্যে লুকাইলাম, মহিষ শৃঙ্গের দ্বারা ভেলুকে দশহাত দূরে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেল। আমি বাঁশঝাড় হইতে বহির্গত হইয়া ভেলুর নিকট গিয়া দেখি সে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার গায়ের দুই তিন জায়গায় কাটিয়া গিয়াছে। অমি নিকটস্থ একটী পুষ্করিণী হইতে বস্ত্র ভিজাইয়া জল আনিয়া তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিলাম সে উঠিয়া বসিল এবং কিছুক্ষণ পরে আমার দিকে চাহিয়া বলিল "আপনাকে কোথাও লাগেনি তো"? আমি বলিলাম "না ভেলু, আমায় লাগেনি, তুমি সুস্থ হ'য়েছ?" সে বলিল "হাঁ—কেবল মাত্র একটা পায়ে একটু বেদনা বোধ হচ্ছে"। তাহার হাত আমার কাঁধের উপর দিয়া আমি তাহাকে বাটী লইয়া গেলাম। সেই দিন হইতে ভেলু আমার পুত্রের মত প্রিয় হইল। বাস্তবিক তাহার পীড়া হইলে বা কার্য্যস্থল হইতে কোনো দিন বাটী আসিতে বিলম্ব হইলে আমি ভাবিয়া আকুল হইয়া পড়িতাম।

একবার বিশেষ কার্য্যের জন্য নারায়ণগঞ্জ যাইতে হইল; সঙ্গে ভেলুও চলিল। তখন ষ্টীমার হইয়াছে, যাতায়াতের কষ্ট ও বিপদ অনেক কমিয়াছে।

ষ্টীমার যখন ঘাটের নিকট হইতে অনেক দূরে আছে, তখন ভয়ঙ্কর একটা ঝড় উঠিল। ষ্টীমার ঘাটের কাছে আসিতে চাহেনা, বিপরীত দিকে চলিয়া যায়। কাপ্তেন কিছু দূর হইতে নঙ্গর করিলেন। ঘাট ও ষ্টীমারের মধ্যে প্রায় দশকুড়ি হাত ব্যবধান রহিল। তিনি তখন অরোহীদিগকে নামিতে নিষেধ করিলেন। ষ্টীমারখানিকে চারিগাছি কাছি দিয়া বাঁধা হইল।

ঝড় ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। আরোহীরা মহাভয়ে কেহবা নৌকায় কেহবা জলে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা পাইল। ভয়ঙ্কর শব্দে এক-গাছা কাছি ছিঁড়িয়া গেল। কিছুক্ষণ ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ষ্টীমারখানি যেন বিধ্বস্ত হইয়া পড়িল। আরোহীরা অনেকেই পলাইয়াছে—কতক বা স্রোতের টানে ভাসিয়া গিয়াছে।

নিকটে কোনো বাড়ী নাই। যে কয়খানি দরমার ঘর ছিল, তাহার একখানিরও অস্তিত্ব নাই। বড় বড় বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত হইয়া পড়িয়াছে। রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত ঝড় নিবৃত্ত হইল না। ভেলু ও আমি ষ্টীমারের উপর হইতে নীচে আসিয়া দেখি যে তিন গাছি দড়ি ছিঁড়িয়াছে—বাকী একগাছি। সে দড়িগাছটী ছিঁড়িলেই ষ্টীমার স্রোতে কোথায় ভাসিয়া যাইবে তাহার ঠিকানা নাই।

কি ভীষণ তটসংঘাত! কিরূপে লাফাইয়া পড়িব! আজ কে রক্ষা করিবে! মনে পড়িল একদিন এমনি অন্ধকারে এমনি ঝড়ের দিনে এমনি উন্মত্ত পদ্মার গর্ভ হইতে এক বৃদ্ধের বাহুবল আমায় রক্ষা করিয়াছিল!

কি করি, আর তো ষ্টীমারে থাকা যায় না। দেখিতে দেখিতে শেষ দড়ি ছিঁড়িল—তীরবেগে ষ্টীমার ছুটিল, আমি উন্মত্তের মত পদ্মাগর্ভে লাফাইয়া পড়িলাম, আমার পশ্চাতেও 'ঝুপ' করিয়া শব্দ হইল। ফিরিয়া দেখিবার অবসর ছিলনা—অন্ধকারে দেখাও অসম্ভব। জলে লাফাইয়া পড়িবার পর কি হইল জানিনা, কিন্তু একটা বাহু যেন আমায় বেষ্টন করিয়াছিল।

যখন জ্ঞান হইল তখন মনে হইল যেন আমি রামচরণ দাদার কোলে মাথা দিয়া শুইয়া আছি; সেই দন্তহীন প্রসন্ন বদন—সেই ললিত মাংস-বিশাল বক্ষ। দুইহাতে চক্ষু মুছিয়া দেখি সে মূর্ত্তি নাই, তাহার স্থানে ভেলু বসিয়া আছে, আমি তাহারি কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া আছি। মনে মনে



ভাবিলাম—প্রত্যাবর্ত্তন! পুনর্জ্জন্ম! ইহা কি সত্য! একবার রামচরণ দাদার শেষ কথা মনে পড়িল "আবার আস্‌বো"।

শ্রীনফরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

# কালকা পথে।

গভীর অন্ধকার রজনীতে পথভ্রান্ত পথিক সহসা আলো পাইলে যে রূপ উল্লসিত হয়, বন্ধুবর যখন আসিয়া ডাকিল "আসুন একটা পথ পাওয়া গিয়াছে" তখন আমারও অনেকটা সেইরূপ অবস্থা হইয়াছিল।

বহুকষ্টে পাহাড়ের গাত্র বহিয়া বন্ধুবরের সাহায্যে উপরে উঠিলাম, কিন্তু পরিধেয় বস্ত্রখানি ছিঁড়িয়া গেল, পায়ের ও হাতের তিন চারি স্থানের চর্ম্ম উঠিয়া গিয়া রক্ত নির্গত হইতে লাগিল। সর্ব্বশরীর কাঁপিল, তালু শুষ্ক হইয়া পিপাসায় প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইল; আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া পড়িলাম। নিকটবর্ত্তী একটী অল্পবিস্তৃত সমতল পাহাড়ের উপর দেখি একজন পাহাড়ী লাঙ্গল দিতেছে, এখানে এই নিত্য-অভ্যস্ত দৃশ্যটি বড়ই অভিনব দেখাইতে লাগিল। যাহা কতদিন চক্ষে পড়িয়াছে, কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে একটী রেখাপাতও করিতে পারে নাই, আজ এই সুদূর পার্ব্বত্য প্রদেশের নিস্তব্ধ বিজনতার মধ্যে তাহা যেন এক স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে বিভূষিত দেখাইতে লাগিল, যেন তাহার দিক হইতে নয়ন ফিরাইতে ইচ্ছা করিল না।

অল্প বিশ্রাম করিয়া জলের অন্বেষণে উক্ত ব্যক্তির নিকট উপনীত হইলাম। সে আমাদের আসিতে দেখিয়া লাঙ্গল হস্তে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দেখিলাম সে সামান্য ভূমি কর্ষণ করিতেছে। এতদূর আসিয়াছি কিন্তু কোথাও মৃত্তিকা দেখিতে পাই নাই। এখানে কেমন করিয়া এইটুকু ভূমি পাথর না হইয়া রহিয়াছে তাহা বুঝিলাম না। সে আমাদের একটী নিকটবর্ত্তী ঝরণা দেখাইয়া দিল। তাহার সহিত দুই একটী কথা কহিয়া অবগত হইলাম যে অল্পদূরেই তাহার কুটীর। যে পথ দিয়া আমরা উপরে আরোহণ করিব সেই পথেই তাহার ক্ষুদ্র কুটীর পরিলক্ষিত হইবে।

সেই পথ ধরিয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলাম। সে ব্যক্তি বলিল "আপনারা যে পথে আসিয়াছেন, ওপথে কেহ পাহাড়ে উঠিতে সাহস করে না।" আমাদের দুঃসাহসিকতা তাহার নিকট নির্ভীকতার পরিচায়ক হইয়া দাঁড়াইল।

অল্পদূর আসিতেই একটী ঝরণা দৃষ্টিগোচর হইল! অঞ্জলি পূরিয়া স্নিগ্ধবারি মুখেচখে প্রদান করিলাম এবং আকণ্ঠ পান করিয়া তৃষ্ণা দূর করিলাম।

এবার পথের দিকে খুব দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে লাগিলাম, মাঝে মাঝে কোনো কারণে যদি শুষ্ক পত্রে মর্‌মর্‌ শব্দ হয়, অমনি আতঙ্কে চারিদিকে চাহিয়া দেখি। আরম্ভের উৎসাহ শেষে আতঙ্কে আশঙ্কায় পরিণত হইতে লাগিল। একটী উচ্চ পর্ব্বত হইতে এইখানে পথটি নীচু দিকে নামিয়াছে, বড়ই ঢালু, খুব সন্তর্পণে পা ফেলিয়া যাইতে হয়, কোনো গতিকে পদস্খলন হইলে আর নিস্তার নাই। এইখানে দুই তিনখানি ক্ষুদ্র কুটীর নয়নগোচর হইল। মনে যেন একটু আশার সঞ্চার হইল। এই কুটীরগুলির সৌন্দর্য্য এই নিরালয় পর্ব্বতপ্রদেশে যেন চিত্রকরের নিপুণ তুলিকার কোমল করুণ আঘাত বলিয়া অনুমান হইতেছিল। কুটীরের দ্বারদেশে দুইটি বালিকা ও একটী বালক খেলা করিতেছিল, কেহ পাথরের উপর পাথর দিয়া খেলাঘরের পর্ব্বত নির্ম্মাণ করিতেছিল, কেহ সঙ্গীর চেষ্টাকে বিফল ও খর্ব্ব করিতে অনেক গুলি বড় বড় শিলাখণ্ড সংগ্রহ করিয়া একটী বড় পাহাড় প্রস্তুতে প্রয়াস পাইতেছিল। ইহাদের খেলারও বিশেষত্ব আছে।

আমাদের সেই বিজন প্রদেশে আসিতে দেখিয়া তাহারা খেলা ছাড়িয়া শিলাগুলি ছড়াইয়া উঠিল। একটি বালিকা ছুটিয়া গিয়া কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিল। হুলস্থূল ব্যাপার পড়িয়া গেল। তিনখানি কুটীর সন্নিবেশিত স্থানটি যেন চঞ্চল ও মুখর হইয়া পড়িল। রমণীরা পর্য্যন্ত ছুটিয়া কুটীরের বহির্দ্দেশে আসিয়া দেখিতে লাগিল। সেই লাঙ্গলধারী ব্যক্তির কথা মনে পড়িল। ইহার মধ্যে একখানি কুটীরই তাহার শান্তিনিকেতন, যেখানে আসিয়া সারা দিনের ক্লান্তিকাতর দেহভার ঢালিয়া সে বিশ্রামআনন্দ উপভোগ করে।

একটী বালককে জিজ্ঞাসা করিলাম "ষ্টেশন কোন্ দিকে?" অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাহাদের কুটীরের পশ্চাত দিক দিয়া যে সঙ্কীর্ণ পথটি আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে সে তাহাই দেখাইয়া দিল! আমরা আবার চলিতে সুরু করিলাম;



অনেক দূর অগ্রসর হইলাম, কিন্তু রেললাইন বা ষ্টেশনের কোনো চিহ্নই দেখিলাম না! আশঙ্কা হইল আবার কি পথ হারাইলাম! ভয়ে নানাপ্রকার বিপদের কল্পনা মূর্ত্তিমতী হইয়া নয়নের সমক্ষে ফিরিতে লাগিল, শরীর যেন ক্রমশই শিথিল ও অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল; অথচ কোনো উপায় নাই। নিকটে গ্রাম নাই, লোকালয় নাই, দোকান পশার ত অনেক দূরের কথা।

কিছুক্ষণ এইরূপ আন্দোলিত অন্তঃকরণে চলিয়াছি, সহসা বন্ধু চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "ঐ ষ্টেশন দেখা গিয়াছে।" উল্লাস রাখিবার স্থান রহিল না; ছুটিয়া বন্ধুর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম।

দূর হইতে ষ্টেশনটিকে একখানি অঙ্কিত চিত্রের মত দেখাইল। খুব তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিলাম, অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই ষ্টেশনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ষ্টেশন ঘরটি কাঠের নির্ম্মিত—কপাট জানালা কাচের। গৃহের ছাদটি দুইদিক ঢালু, মধ্যখানটি উঁচু। বরফ জমিবার ভয়ে এইরূপ গৃহ প্রস্তুত হইয়াছে। কাহারও সাড়া শব্দ নাই। চারিদিকে সীমাহীন গিরিমালা, মধ্যে ষ্টেশন। কাচের ভিতর দিয়া গৃহাভ্যন্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই দেখিলাম—একজন পাঞ্জাবী কর্ম্ম করিতেছেন। কাচের উপর আঙ্গুলের টোকা মারিতেই তিনি দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক বাহিরে আসিয়া বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে আমাদের আপাদমস্তক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লইলেন। ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আপনারা দেখিতেছি বাঙ্গালী! কেমন করিয়া এখানে আসিলেন?"

"এই পাহাড়পথ অবলম্বন করিয়া আসিয়াছি, এটি কোন ষ্টেশন।"

তিনি ইহাতে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, বলিলেন "গোমন"। "টাঁকশাল কি ইহার আগের ষ্টেশনের নাম?"

লোকটি আর একটু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া উত্তর করিলেন "আপনারা কি কালকা হইতে হাঁটিয়া আসিতেছেন, টাঁকশাল ত পথে ফেলিয়া আসিয়াছেন! টাঁকশাল হইতে গোমণ পাঁচ মাইল দূর।

শুনিয়া ত নির্ব্বাক্! কিছুক্ষণ পরে বলিলাম "মহাশয় এখান হইতে কালকায় ফিরিবার গাড়ি কখন? তিনি উত্তর করিলেন গাড়ি এখানে ধরে না—"আসুন ঘরের মধ্যে গিয়া কথোপকথন করি, বহুদিন পরে কথা কহিবার লোক পাইয়াছি।"

বন্ধু বলিলেন "বাহিরে বেশ বাতাস আসিতেছে, এখানেই একটু বিশ্রাম করা যাক্।"

তিনি ব্যগ্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন "না না তাহা হইতে পারে না, এখন বাঘ্ আসিতে পারে।"

"সে কি" বলিয়া আমি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলাম, বলিলাম "এ পাহাড়ে বাঘ আছে নাকি?"

"ভিতরে বসিবেন চলুন। দেখিতে পাইবেন বাঘ ঐ নিম্নের ঝরণায় জল পান করিতে আসিবে। আমাদের ষ্টেশনে ত মাঝে মাঝে আসিয়া দরজায় জানালায় আঘাত করিয়া যায়।" তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর গিয়া উপবেশন করিলাম।

এই ভদ্রলোকটী এখানকার asst. station master, তিনি আমাদের যথেষ্ট খাতির ও যত্ন করিলেন। ষ্টেশন মাষ্টার একজন বাঙ্গালী, এক বৎসর হইল তিনি এই কর্ম্ম উপলক্ষে এখানে আছেন। একথা যখন জানিতে পারিলাম তখন আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি তখন আহার করিতে গিয়াছিলেন। একজন pointsmanকে দিয়া তাঁহাকে ডাকাইতে পাঠান হইল। অল্পক্ষণ পরেই তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমাদের দেখিয়া তাঁহার মুখের উপর আনন্দদীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। তাঁহার মত তদ্রলোক খুব কম দেখিয়াছি।

শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

---

## নিয়তি।

ওগো প্রিয়!

দুঃখ মোরে বাসে ভাল রমণীর মত,
আকুল উচ্ছ্বাস ভরে বাঁধিছে সতত
নিবিড় প্রণয় ডোরে, আমি নিরুপায়
কেমনে ছাড়াব তারে; ভাবি হায়! হায়!
দুঃখ নাহি চাই!



ওগো প্রিয়!

সুখেরে বেসেছি ভালো, পুরুষের মত
চঞ্চল ছলনা ভরে, জালায় সতত
মরু মরীচিকা সম; ভাবি হায়! হায়!
কেমনে বাঁধিব তারে, আমি নিরুপায়
কাঁদিতেছি তাই।

শ্রীঅমলা দাস গুপ্তা।

---

## মুসলমান রাজা ও হিন্দু প্রজা।

পৃথ্বীরাজের পতনের পর যখন দিল্লীর সিংহাসন পাঠানের করায়ত্ত হইল, তখন হইতে মুসলমান ভারতের রাজা হইলেন। কিন্তু প্রজাসাধারণ হিন্দুই থাকিয়া গেল। ক্রমে মুসলমানেরা এদেশে আসিয়া হিন্দু প্রজাদের স্থান অধিকার করিতে লাগিল ও হিন্দু মুসলমান উভয়ে এই ভারত সাম্রাজ্যের প্রজা হইয়া উঠিল। অবশ্য মুসলমানেরা রাজার জাতি, কাজেই তাহারা যে হিন্দুগণ অপেক্ষা রাজানুগ্রহ অধিক লাভ করিবে তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু হিন্দু প্রজারা যে একেবারে রাজার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল এমন নহে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে মুসলমান রাজারা হিন্দু-প্রজাসাধারণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেন।

ভারত সাম্রাজ্য করায়ত্ত করিয়া পাঠানেরা যখন আপনাদের গৌরবমদে মত্ত হইয়া উঠিল, তখন হিন্দুসাধারণ যে তাহাদের শানিত কৃপানের পিপাসা মিটাইবার জন্য আপনাদের শোনিত-দান করিতে লাগিল, ইতিহাস তাহার উল্লেখ করিয়া থাকে। কেবল তাহা নহে, শোণিত দানের সহিত অনেকে জাতি ধর্ম্মও দান করিয়াছিল। তাই শীঘ্র শীঘ্র ভারত সাম্রাজ্যে মুসলমানের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। হিন্দুসাধারণে মুসলমানের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে সাহসী না হইলেও হিন্দুজাতির ভস্মস্তূপের মধ্যেও তাহাদের শক্তি তখনও পর্য্যন্ত জাগ্রত ছিল। তাই রাজপুতের অসি ঝণৎকারে পাঠানসম্রাটের শোণিত ও রূপ পিপাসা অনেক সময়ে তৃপ্ত হইতে পারে নাই। ভারতে হিন্দু জাতি তখনও পর্য্যন্ত আপনাদের অস্তিত্ব দেখাইতে বিস্মৃত হয় নাই। অনেক

দিন পর্য্যন্ত পাঠান সম্রাটেরা আপনাদের গৌরবমদেই মত্ত ছিলেন। যখন দেখিলেন যে ভারতে একছত্র মুসলমান সাম্রাজ্য বা মুসলমান ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কিছুমাত্র সুযোগ নাই, তখন তাঁহারা হিন্দুদিগের প্রতি শুভদৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। ধর্ম্মের প্রভাব কমিয়া আসিল, রাজপুতনা প্রভৃতি জয়ের আশাতেও জলাঞ্জলি দিতে হইল। কিন্তু ক্রমে তাঁহারা ভারতের স্বাধীন সম্রাট হইয়া উঠিলেন, এবং প্রজা-সাধারণের প্রতি সুদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হিন্দু প্রজারা অনুগ্রহ পাইতে লাগিল। যাহারা কার্য্যদক্ষ তাহারা রাজকার্য্যেও নিযুক্ত হইতে লাগিল। অবশ্য, মুসলমানের অনুগ্রহের মাত্রা যে অধিক ছিল, তাহা বোধ হয় নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই।

পাঠান সম্রাটেরা প্রজার যথাসর্ব্বস্বে হস্তক্ষেপ করা আর ন্যায়-সঙ্গত মনে করিলেন না। কাজেই তাহাদের নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট কর লওয়ার ব্যবস্থা হইল। হিন্দু রাজত্বকালে প্রজারা শস্যের ষষ্ঠাংশ কর স্বরূপে প্রদান করিত, অবশ্য মুসলমান রাজগণ তাহা অপেক্ষা কিছু অধিক লইতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ক্রমে তাহার মাত্রা কিছু বাড়িয়া যায়। কারণ, আমরা আলাউদ্দীন খিলজীর বন্দোবস্তকালে দেখিতে পাই যে, প্রজাদিগকে আপনাদের আয়ের অর্দ্ধাংশ কর প্রদান করিতে হইত। সে যাহা হউক, তথাপি করের জন্য একটি নির্দ্দিষ্ট হার প্রচলিত থাকায়, তাহারা তাদৃশ কষ্টভোগ করিত না। মুসলমান প্রজাদের মধ্যে অনেকে নিষ্কর ভূমি ভোগ করিতে পাইত, হিন্দুদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও প্রতি সেরূপ অনুগ্রহও বর্ষিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত হিন্দুদিগের মধ্যে যাহারা রাজকার্য্যে দক্ষ তাহারাও রাজদরবারে প্রবেশলাভ করার অধিকার পাইল, তবে তাহাদের অধিকাংশই রাজস্ব বিভাগে নিযুক্ত হইত।

দিল্লী সাম্রাজ্য হইতে যখন বঙ্গরাজ্য স্বতন্ত্র হইয়া উঠিল, তখন তাহার পাঠান রাজাগণ হিন্দুদিগের সহিত বিশেষরূপ সদ্ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা হোসেন সাহাই ইহার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন। তিনি বাল্যকালে ব্রাহ্মণের অধীনে সামান্য কার্য্য করিয়া আপনার জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন বলিয়া হিন্দুর প্রতি ভালবাসা দেখাইয়া গিয়াছেন, রূপ সনাতনের ন্যায় কর্ম্মচারীর নিয়োগ তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তদ্ব্যতীত হিন্দু গ্রন্থকারদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের এক অভিনব যুগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র নসারেত সাহাও পিতার দৃষ্টান্তের



অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাহার পর যখন ভারতে মোগল সাম্রাজ্য স্থাপিত হইল, তখন হইতে হিন্দু সাধারণের প্রতি রাজার আরও সুদৃষ্টি পড়িয়াছিল বলিয়া ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, তবে কেহ কেহ যে নিগ্রহও দেখাইয়াছিলেন তাহারও উল্লেখ আছে।

পানিপথ ক্ষেত্রে আপনার বিজয়পতাকা উড়াইয়া যখন বাবর সাহ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলেন, তখন হইতে হিন্দুদিগের প্রতি মোগল বাদসাহদিগের সুদৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিল। সঙ্গরাণার অসি চালনায় মুগ্ধ হইয়া বাবর সাহ রাজপুত ও হিন্দুকে জাগ্রত জাতিই বলিয়া বুঝিয়া লইয়াছিলেন। হুমায়ুন বাদসাহ তাহাদের সহিত ঘনিষ্টতা করিবার সদ্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাহার পর মোগল কেশরী আকবর বাদসাহ হিন্দুদিগকে আপনার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ গণ্য করায় হিন্দুরা তাঁহাকে "দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা" বলিয়া অভিহিত করিত; কেবল তাহা নহে, তিনি পূর্ব্ব জন্মে মুকুন্দ ব্রহ্মচারী নামে সন্ন্যাসী ছিলেন, এবং সার্ব্বভৌমত্ব ইচ্ছা করিয়া পরজন্মে আকবর বাদসাহ রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াও প্রচার করিয়াছিল। যমুনার প্রবল তরঙ্গ আগরার নূতন দুর্গের ভিত্তি যখন অপসারিত করিতে লাগিল, তখন শ্রীকৃষ্ণের বংশধর করৌলী রাজকে আনাইয়া যখন নূতন দুর্গের ভিত্তি পুনঃস্থাপিত হইল, তখন হিন্দুগণ বাদসাহের আচরণে মুগ্ধ হইয়া গেল। বীরবল, টোডরমল্ল, মানসিংহ যখন তাঁহার দক্ষিণহস্ত স্বরূপে ভারতসাম্রাজ্য শাসনে ব্যাপৃত হইল তখন সকলে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। হিন্দু ব্রাহ্মণগণ যখন নিষ্কর ভূমি ভোগ করিতে লাগিল, তখন সকলেই তাঁহার রাজ্যের চিরস্থায়িত্ব কামনা করিতে লাগিল। হিন্দুর ধর্ম্ম যখন অক্ষুণ্ণ থাকিল, মন্দিরচূড়ায় যখন পতাকা হেলিয়া দুলিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল, তখন সকলে মনে মনে হিন্দু রাজত্বের কথা স্মরণ করিতে লাগিল। পরবর্ত্তী মোগল সম্রাটগণও আকবর সাহের হিন্দুপ্রীতি একেবারে বিস্মৃত হন নাই, কিন্তু তাঁহাদের প্রীতি যে শিথিল হইয়া আসিতেছিল তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

জাহাঙ্গীর ও সাজাহান প্রকাশ্যভাবে হিন্দুদিগের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিলেও কৌশলে দেবমন্দির ভাঙ্গিবার ব্যবস্থা করিতে ত্রুটী করেন নাই, তবে হিন্দুসাধারণের প্রতি তাঁহাদেরও যে যথেষ্ট অনুগ্রহ ছিল, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। ইহার পর আরঙ্গজেবের রাজত্বকালে হিন্দুরা কিছুকালের জন্য একটু কঠোরতা অনুভব করিয়াছিল। ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়

যে আরঙ্গজেব গোঁড়া মুসলমান হওয়ায় অনেক দেবমন্দির ভঙ্গের আদেশ দিয়াছিলেন। সে কথা সত্য বটে, কিন্তু আকবরের পর হইতেই তাহার কিছু কিছু সূচনা না হইলে আরঙ্গজেব যে একেবারে এরূপ আদেশ দিতে সক্ষম হইতেন, তাহা বোধ হয় না। সেইজন্য আমরা দেখিতে পাই যে জাহাঙ্গীর ও সাজাহান কৌশলে তাহা করিতে প্রয়াস পাওয়ায়, আরঙ্গজেব প্রকাশ্যভাবে এরূপ আদেশ দিতে সাহসী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার জন্য তাঁহাকে যে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল তাহাও ইতিহাসে দেখা যায়। কেবল মন্দিরভঙ্গ বলিয়া নহে, হিন্দুদের প্রতি জিজিয়া বা শিরঃশুল্কের প্রাবল্য, ব্রাহ্মণদিগের নিষ্কর ভূমির প্রতি সামান্য কর স্থাপন এবং রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের উচ্ছেদ করার চেষ্টা করায় হিন্দুরা তাঁহার রাজত্বে অত্যন্ত অশান্তি ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাঁহার এই কঠোর ব্যবহারের জন্য হিন্দু জাতি আবার জাগ্রত হইয়া উঠে, তাই রাজপুত মহারাষ্ট্রীয় ও পরিশেষে শিখের বীরত্ব কাহিণীতে আজিও ভারতের ইতিহাস উজ্জ্বল হইয়া আছে। পরবর্ত্তী মোগল সম্রাটগণ কঠোরতা অনেক পরিমাণে হ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু সে সময়ে হিন্দুগণ জাগ্রত হইয়া উঠায় ও বৈদেশিক ইংরেজ ফরাসী প্রভৃতি ভারতে আধিপত্য স্থাপনের প্রয়াসী হওয়ায়, তাঁহাদের প্রভুত্বের অন্তর্ধান ঘটে।

মোগল রাজত্বের শেষ ভাগে বঙ্গদেশে হিন্দুগণও যথেষ্ট রাজনুগ্রহলাভ করিয়াছিল। আরঙ্গজেবের মাতুল সায়েস্তা খাঁ ভাগিনেয়ের আদেশ রক্ষার জন্য বঙ্গদেশের হিন্দুললনাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিলে, ক্রমে ক্রমে তাহারা শান্তি লাভে সক্ষম হইয়াছিল। যদিও নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর সময়ে আমরা দুই একটি মন্দির ভঙ্গের কথা ও হিন্দু জমিদারগণের উৎপীড়নের বিষয় অবগত হই, তথাপি তাহার পর নবাব সুজাউদ্দীন ও আলিবর্দ্দীর সময়ে হিন্দুগণ যে সুখে সচ্ছন্দে বাস করিয়াছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সুজাউদ্দীন হিন্দু জমিদারগণের প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়া তাহাদের আশীর্ভাজন হইয়াছিলেন। আলিবর্দ্দী রাজস্ব বিভাগ হইতে সৈনিক বিভাগে পর্য্যন্ত বাঙ্গালী হিন্দুদিগকে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের যে গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, ইহা আর কোন নবাব বা বাদসাহ করিতে পারেন নাই। সিরাজউদ্দৌলাও অনেক পরিমাণে আলিবর্দ্দীর দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী নবাবগণের সময়েও উক্ত দৃষ্টান্তের অভাব ছিল না, তাহার পর হইতে



ভারতে ব্রিটিস সাম্রাজ্য স্থাপিত হইলে আমরা যে অনুগ্রহ লাভ করিয়াছি, হিন্দু রাজত্বের পর আমাদের ভাগ্যে আর তাহা ঘটে নাই। মুসলমান রাজগণ আমাদের প্রতি যে যথেষ্ট অনুগ্রহ দেখাইয়াছিলেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধ আলোচনা করিলে সকলেই তাহা অবগত হইতে পারিবেন। তবে বর্ত্তমান সময়ে আমরা যে অনেক বিষয় অনুগ্রহ লাভ করিতেছি ইহা অবশ্য স্বীকার করিতেই হইবে।

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

---

# হরিদাস।

## ( চিত্র )

দুপুরবেলা যখন পদ্মপুকুরের নিস্তব্ধ পাড়টি পাখীর সুরে ভরিয়া উঠিত, তখন প্রায়ই দেখিতাম হরিদাস একটি গুল্‌তি আটাকাটি বা তীরধনুক লইয়া ঝোপে ঝোপে গাছের তলায় তলায় ফিরিতেছে।

এক সময়ে হরিদাসের আর্থিক অবস্থা বড়ই খারাপ হইয়া গিয়াছিল—পাঁচ সাত বিঘা জমিতে যে ফসল উৎপন্ন হইত, তাহাতে খরচের সংকুলান হইত না। এই সময় হইতেই তাহার শীকারের আরম্ভ। বনের পাখী ধরিয়া হাটে বিক্রয় করিয়া যখন সে দুপয়সা উপার্জ্জন করিতে সুরু করিল, তখন ব্যাধবৃত্তির দুর্ণামের কথা একবারও তাহার মনে স্থান পাইল না।

যখনি পাখীরা কোনো গাছের উপর বা পুকুরের পাড়ে তাহাদের নিরীহ সভাটিকে আহ্বান করিত, তখন হরিদাস চুপি চুপি চোরের মত আসিয়া তাহাদের শান্তিটুকু নষ্ট করিতে একটুও কুণ্ঠিত হইত না।

একদিন হরিদাস একখানি কালাপেড়ে তাঁতের কাপড় ও একটি পাঞ্জাবী জামা পরিয়া খুব গম্ভীরভাবে চলিয়াছে। তাহার চালচলন অদ্ভুত রকমের—দেখিয়া হাস্যসংবরণ করা যায় না। শুনিলাম সে শ্বশুরের বিষয়সম্পত্তি দখল করিয়া দৈন্যদশা কতক পরিমাণে ঘুচাইয়াছে।

হঠাৎ অবস্থা পরিবর্ত্তিত হওয়াতে হরিদাস হয়ত ব্যাধবৃত্তিকে একটু ঘৃণা করিয়াছিল, কেননা ইহার পর তাহাকে পূর্ব্বের মত বনে বনে ফিরিতে দেখি নাই; কিন্তু মাথার উপর দিয়া কাকটা চিলটা উড়িয়া গেলে হঠাৎ

তাহার তীরধনুকটির কথা মনে পড়িয়া যাইত, একবার তীরধনুক বাহির হইলে তাহা কোনো পশুপক্ষীর রক্তপান না করিয়া নিবৃত্ত হইত না।

হরিদাসের কালো মিশমিশে চেহারা, খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ী দেখিয়া পাড়ার ছেলেরা 'জুজু' বলিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিত। শ্বশুরের সম্পত্তি পাইবার পর যদিও সে একটু ভদ্র হইয়াছিল, যদিও লোকের দু একটা কাজে যোগদান করিয়া আপনার চিরকালের অখ্যাতিটুকু কমাইতে চেষ্টা করিত, তবুও কেহ তাহার সহিত বেশী মেলামেশা করিত না; সকলেই তাহার কীর্ত্তিকলাপ জানিত। একবার একটা গরু তাহার পুকুরে জল খাইয়াছিল বলিয়া হরিদাস সেটিকে লাঠি মারিয়া হত্যা করে। তাহাকে একবার বলিয়াছিলাম "হরিদাস, শেয়ালগুলো বড়ই উৎপাত আরম্ভ ক'রেছে।" হরিদাস কেবল বলিয়াছিল "বটে চাড়ুয্যে মশায়, বটে?" পরদিন যখন দেখিলাম চারিটা রক্তমাখা শিয়াল আমার বাড়ীর দরজার কাছে অসাড় হইয়া পড়িয়া আছে, তখন বাস্তবিক মনে করিয়াছিলাম হরিদাসকে কথাটা বলিয়া ভাল করি নাই।

একদিন পাড়ার 'বাঁড়ুয্যেদের' বাড়ী বাসন্তীপূজা। প্রতিমা আনিবার দিন 'বাঁড়ুয্যে মশায়' বলিয়া দিলেন "ওরে চণ্ডীমণ্ডপটা পরিষ্কার ক'রে দে ত।" চাকরেরা ছোট ছোট অশ্বত্থ বটগাছের চারাগুলি তুলিয়া চণ্ডীমণ্ডপখানি ঠাকুর ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের থাকিবার উপযোগী করিয়া তুলিল। 'বাঁড়ুয্যে মশায়' আমার প্রতিবাসী—একবার সব দেখাশুনা না করিলে ভাল হয় না। সেদিন বৈকালে বেড়াইতে বেড়াইতে চণ্ডীমণ্ডপের কাছে উপস্থিত হইলাম, আমার পিছনে পিছনে হরিদাসও আসিয়াছিল।

তখন রৌদ্র পড়িয়া আসিয়াছে। 'বাঁড়ুয্যে মশায়' দেখিলেন একটা কাকের ছানা চণ্ডীমণ্ডপের ভিতর উপরদিকে একটি কোণে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। কাক একটা অপবিত্র জীব। 'বাঁড়ুয্যে মশায়' একেবারে অস্থির হইয়া চীৎকার করিলেন "একটা কাক, সর্ব্বনাশ কোর্‌লে—সব একসা কোর্‌লে রে—শিগ্‌গির আয়।" চাকরেরা ছুটিয়া আসিল, অনেক তাড়া দিল, কিন্তু ছানাটা একটুও নড়িল না। 'বাঁড়ুয্যে মশায়' বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, টিকি নাড়িয়া কাঁপিতে কাঁপিতে গলা সপ্তমে চড়াইয়া বলিলেন "আরে কাকটাকে বের কোর্‌তে পার্‌লে না?" ব্রাহ্মণের সর্ব্বাঙ্গ দিয়া যেন তাড়িত প্রবাহিত হইতে লাগিল।



চণ্ডীমণ্ডপের গায়েই একটি আমগাছ—নূতন মুকুলের গন্ধ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; তাহারি একটি ডালে একটি ঠোঁটকাটা কাক নিতান্ত ব্যাকুলভাবে চীৎকার করিতেছে। কাকটার লক্ষ চণ্ডীমণ্ডপের গায়ে একটি গর্ত্তের উপর। সেখান দিয়া এই আর্ত্ত জননী ছানাটির ভীতত্রস্তভাব দেখিতে পাইতেছিল। কাকটি একবার এক ডালে একবার অন্য এক ডালে বসিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সেই গর্ত্তের নিকটবর্ত্তী ডালটির উপর উড়িয়া বসিতেছিল; তাহার ক্ষুদ্রপ্রাণের বেদনা কেহ বুঝিল না, বুঝিবার অবসরও ঘটিল না।

হরিদাস একটি ইষ্টকখণ্ড লইয়া সদম্ভে অগ্রসর হইল, বলিল "একটা কাকের ছানাকে বের করবার ক্ষমতা নেই?" তারপর সে নিরীহ জীবটিকে লক্ষ করিয়া সেই ইষ্টকখণ্ড নিক্ষেপ করিল, ছানাটি মাটীতে পড়িয়া গেল, দুই একবার মাথা নাড়িয়া, ডানাদুটি বিস্তার করিয়া নিশ্চল হইয়া পড়িল, চোখ উল্টাইয়া গেল। কাজটা এত তাড়াতাড়ি হইল, যে বারণ করিবার একটুও অবসর পাইলাম না। অনেক দিনের পর এই শীকার! হরিদাসের আনন্দ আর ধরে না। ছানাটিকে লইয়া একেবারে সে নিজের বাড়ীর দাওয়ায় উঠিল। মৃতদেহটি মাচায় বাঁধিয়া সে কিছুক্ষণ গর্ব্বিত অন্তঃকরণে এদিক সেদিক করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কাকের দল চীৎকারে আকাশ বিদীর্ণ করিতেছিল। হরিদাস দেখিল একটা ঠোঁটকাটা কাক মাচার উপর বসিয়া মৃত ছানাটির আশে পাশে ঘুরিয়া ফিরিয়া একটা অতি করুণ শব্দ করিতেছে। হরিদাস অনেকক্ষণ সেদিকে চাহিয়া রহিল। দৃশ্যটা তাহাকে ভাল লাগিল না তাহার উপর কাকের অসহ্য চীৎকার। হরিদাস মৃত ছানাটিকে লইয়া নিকটবর্ত্তী পুকুরে ফেলিয়া আসিল।

পরদিন হরিদাস পুকুরধারে আসিয়া দেখিল—সেই কাকের ছানাটির গলিত দেহ তীরে আসিয়া লাগিয়াছে, আর ঠিক সেইখানে সেই ঠোঁটকাটা কাক কা কা করিয়া পুকুরধারটিকে তাহার করুণ চীৎকারে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। হরিদাস চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তখন সবেমাত্র প্রভাতের আলো দেখা গিয়াছে। চরিদিকে পাখীর কলরব, কিন্তু হরিদাসের কানে এই কাকের শব্দটি খুব স্পষ্ট বলিয়া বোধ হইতেছিল। হরিদাস অনেকক্ষণ শুনিল, তাহার শরীর ও মন অবসন্ন

হইয়া আসিল, ধীরে ধীরে পিছুপানে না চাহিয়া সে আপনার ঘরে আসিয়া বসিল।

হরিদাসের সঙ্গে যখন দেখা হইল তখন বলিলাম "হরি, করলে কি? ঠাকুরঘরে নিরীহ জীবটাকে মেরে ফেল্লে।" হরিদাস প্রথমে কোনো কথা কহিল না, তারপর একটু হাসিয়া বলিয়া ফেলিল "তা'র আর কি হ'য়েছে।" হাসিটা কেমন বেতালা বেসুরো বলিয়া বোধ হইল। খুব জোর করিয়াই সে কথাগুলি বলিল বটে কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মুখে একটা চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিল। দেবতার জায়গায় একটা নিরীহ জীবকে হত্যা করিয়া সে যে অন্যায় করিয়াছে তাহা সে বুঝিয়াছিল, কিন্তু চোখেমুখে বা কথার ভঙ্গীতে তাহা প্রকাশ করিতে কোনোমতেই রাজী হইল না।

বিসর্জ্জনের সময় 'বাঁড়ুয্যে মশায়ের' বাসন্তী প্রতিমাখানি চণ্ডীমণ্ডপের একখানা কাঠে ধাক্কা লাগিয়া চুরমার হইয়া গেল। ভয়ানক অমঙ্গলের চিহ্ন! 'বাঁড়ুয্যে মশায়' দুর্গানাম জপ করিতে লাগিলেন। সমস্ত গ্রামে এই দুর্ঘটনা রাষ্ট্র হইয়া গেল। জমিদার হরিহর মুকুজ্যে হইতে উদো দুলে পর্য্যন্ত সকলেই একথা শুনিল, সকলেই মনে করিল গ্রামে একটা অনর্থপাত হইবে। হরিদাস যখন একথা শুনিল একটা অজ্ঞাত ভয় অলক্ষিতে তাহার মনে তীব্র অন্দোলন আনিয়া দিল। বাহিরে আসিয়া সব বিষয় একবার দেখিতে ইচ্ছা হইল—কিন্তু কাহারো কাছে মুখ দেখাইতে আদৌ প্রবৃত্তি হইল না।

যখন দুই এক জন বন্ধু ডাকিয়া গেল, হরিদাস ধীরে ধীরে বাড়ীর বাহিরে আসিল। তাহার বোধ হইল যেন সকলেই তাহার পানে চাহিতেছে। পথের ধারে দুএকজন স্ত্রীলোক কথা কহিতেছিল। হরিদাস মনে করিল বুঝি তাহারা তাহারি সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছে। পথে কেহ হাত তুলিলে হরিদাস মনে করে—সে যেন তাহাকেই উপস্থিত অমঙ্গলের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। এমন অবস্থায় সে ধীরে ধীরে 'বাঁড়ুয্যে মশায়ের চণ্ডীমণ্ডপের এক কোনে আসিয়া দাঁড়াইল—দেখাইতে চাহিল সে অতি নির্দ্দোষী; তখন প্রতিমার চূর্ণ অংশগুলি সংগ্রহ করিয়া সকলে বিসর্জ্জনের জন্য লইয়া গেছে।

অপরাহ্ণ; গাছের ছায়াগুলি দীর্ঘ; দিনের রৌদ্রের পর বেশ একটু ঠাণ্ডা পড়িয়াছিল; চারিদিক নিস্তব্ধ। বহুদূরে একটা কোকিল মাঝে মাঝে



চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল। ঘোষেদের গরুটি এতক্ষণ শুইয়াছিল, এইবার সে উঠিয়া দু একবার শব্দ করিল। বাঁশবনের ভিতর বড় সাড়াশব্দ নাই।

হরিদাস চুপ করিয়া সেখানে বসিয়া পড়িল; কেহ তাহার সঙ্গে কথা কহিল না, সকলেই একে একে স্থান ত্যাগ করিল। হরিদাস শূন্য উৎসবগৃহের পানে চাহিয়া আপনাকে নিতান্ত অপরাধী ও লাঞ্ছিত মনে করিয়া লইল। অবিরত তাহার মনে হইতে লাগিল ঠাকুরঘরে কাকের ছানা মারিয়া সে দেশের বিরুদ্ধে একটা কাজ করিয়া বসিয়াছে—দেশ তাহার উপর নিশ্চয়ই প্রতিশোধ লইবে।

বিসর্জ্জনের বাজনা অনেকদূর হইতে আর শোনা যাইতেছে না। এমন সময় কা কা করিয়া একটা কাক চণ্ডীমণ্ডপের পাশের আমগাছটির উপর উড়িয়া বসিল। হরিদাস চমকিয়া উঠিল, লক্ষ করিয়া দেখিল পাখীটার ঠোঁট কাটা।

কাকটা কা কা করিয়া অবিরত ডাকিতে লাগিল। অপরাহ্নে মৌন ঈষৎ আঁধার গ্রাম্য পথটি তাহারি সুরে ভরিয়া উঠিল। হরিদাস দু একবার তাহার পানে চাহিয়া দেখিল—কাকটী তাহারি পানে চাহিয়া আছে। চক্ষু অবনত করিয়া সে ধীরে ধীরে উঠিল, একবার এদিক সেদিক চাহিল, তারপর একটি ইষ্টকখণ্ড কাকটিকে লক্ষ করিয়া নিক্ষেপ করিল; কাক নড়িল না, তাহার চীৎকারও থামিল না। হরিদাস পিছুপানে না চাহিয়া খুব তাড়াতাড়ি আপনার বাড়ীর দিকে চলিল। তখনো তাহার কানে দূর হইতে কাকটির একঘেয়ে আর্ত্ত চীৎকার ধ্বনিত হইতেছিল।

তাড়াতাড়ি বাড়ীর দালানে উঠিয়া হরিদাস দেখিল—একটা কাক মাচার উপর বসিয়া আছে। তখনি উন্মত্তের মত সে একটি লাঠি লইয়া তাহার দিকে ছুটিয়া গেল। কা কা শব্দে হরিদাসের বাড়িখানি পূর্ণ করিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে কাকটি কোথায় মিলাইয়া গেল, তাহা আর নির্ণয় করা গেল না।

মুখ খানা ভার করিয়া হরিদাস অনেকক্ষণ দালানে বসিয়া রহিল। কেবল তাহার মনে হইতে লাগিল—কাকের ছানা মারিয়া ফেলার জন্যই 'বাঁড়ুয্যে মশায়ের' বাসন্তীপ্রতিমা ভাঙ্গিয়াছে—যদি আরো কোনো অমঙ্গল হয়, তাহার জন্য সেই দায়ী। এই ভাবনা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। ইহার উপর যখন সেই ঠোঁটকাটা কাকটির করুণ সুর মনে পড়িল, সে আর স্থির হইতে পারিল না, নিজের উপর একটা দারুণ ঘৃণা আসিল; কিন্তু আবার

যখন মনে পড়িল, প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে সে এইরূপ একটা কাককে ধরিয়া তাহার ঠোঁট কাটিয়া দিয়াছিল, সেই হয়ত সময় বুঝিয়া তাহার উপর প্রতিশোধ লইতে আসিয়াছে, তখন তাহার অন্তরে ক্রোধ জাগিয়া উঠিল। ঠোঁটকাটা কাক হইতে সমস্ত কাকজাতির উপর সেই ক্রোধ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। হরিদাস বেশ বুঝিল—কাকবংশ ধ্বংস না করিলে তাহার কোথাও শান্তি নাই।

একদিন দেখিলাম—হরিদাস তীরধনুক লইয়া বনের কাছে কাছে বেড়াইতেছে—কাক দেখিলেই লক্ষ্য করে। হরিদাসের এভাব দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। ডাকিতেই সে ধীরে ধীরে আমার কাছে আসিল, তাহাকে বলিলাম "হরি, এমন কোরে কাকবংশ ধ্বংস করবার উদ্যোগ কোর্‌লে কেন ?"

হরিদাস বলিল "বড় বিরক্ত করে"। এমন সময় পাশের গাছে একটা কাক হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল। হরিদাস চমকিয়া কহিল "চুপ"। আমি বলিলাম "কেন ? হয়েছে কি"। হরিদাস ধনুক তুলিতে তুলিতে বলিল "কিছুই না"। স্তম্ভিত হইলাম, কাকটি উড়িয়া গেল। হরিদাস এদিক সেদিক করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহাকে বাড়ী যাইতে বলিয়া আমি সরিয়া গেলাম।

দূর হইতে দেখিলাম—হরিদাস বনের ভিতর প্রবেশ করিতেছে, মুখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভাব আঁকা। কোথাও কিছু নাই—অথচ সে চুপি চুপি যেন কাহারো অপেক্ষায় রহিয়াছে। ডাকিলাম—সে আমার কাছে আসিল না, আমাকে দেখিয়াই তীরধনুক লুকাইবার উপক্রম করিল। তাহার কাছে গিয়া বলিলাম "কই, বাড়ী গেলে না?"

হরিদাস মুখ অবনত করিয়া রহিল, উত্তর দিলনা।

আমি বলিলাম "তুমি দিন দিন পাগলের মত হচ্ছ কেন?"

হরিদাস মাথা তুলিল, বলিল "কই কিছু না।"

হঠাৎ একটা কাকের শব্দ শুনিয়া হরিদাস ধনুক তুলিয়া ধরিল। আমি বলিলাম "ওকি ?" হরিদাস কি বলিতে বলিতে থামিয়া গেল। অস্পষ্ট শব্দ শুনিলাম "যমদূত—যমদূত।" বুঝিলাম সে প্রকৃতিস্থ নয়। যাই হোক, অনেক বুঝাইয়া তাহাকে বাড়ী যাইতে বলিলাম ; এবার সে বাড়ীর দিকেই চলিল। দূর হইতে দেখিতে পাইলাম—সে ধনুক তুলিয়া আবার উপর দিকে লক্ষ্য করিতেছে।



তার পর অনেক বুঝাইয়া হরিদাসকে প্রকৃতিস্থ করিব মনে করিয়াছিলাম ; কিন্তু অনেকদিন কাটিয়া গেল, তবুও কোনো ফল দেখা গেল না।

একমাস যাইতে না যাইতেই 'বাঁড়ুয্যে মশায়' কলেরা রোগে গতাসু হইলেন। ভয়ানক রোগের প্রাদুর্ভাব হইল, মড়াকান্নায় গ্রামখানি ভরিয়া গেল। আজ অমুকের বাড়ী রোগ, কাল অমুকের বাড়ী তিন জন মরিয়াছে এইরূপ কথা সকলেরি মুখে। দুপুর বেলা নিস্তব্ধ উদাস গাছপালাগুলি পর্য্যন্ত যেন বলিয়া দিত—মৃত্যুর রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছে। হঠাৎ দারুণ গ্রীষ্ম পড়িল, আর ঘরে থাকা যায় না, মানুষ জলের জন্য হাহা করিতে লাগিল, মহামারীর প্রকোপ বাড়িয়া উঠিল।

এমনি একদিনে পূর্ণিমার আলো চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। গ্রীষ্মে ঘরে থাকিতে না পারিয়া একখানি ভিজা গামছা কাঁধে ফেলিয়া বাড়ীর বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া বসিয়াছি। তখন রাত্রি প্রায় বারোটা। গ্রামখানি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। উচ্ছল জ্যোৎস্না বাঁশগাছের উপর দিয়া গলিয়া পড়িতেছে। একটা কাক থাকিয়া থাকিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছে।

চুপ করিয়া বসিয়া আছি। একটু একটু তন্দ্রাবোধ হইতেছে, একবার মনে করিতেছি—এবার ঘরে গিয়া শুইব, আবার ভাবিতেছি—ঘরে যাইতে যাইতে এ তন্দ্রা ছুটিয়া যাইবে। এমন সময় বোধ হইল—যেন একটা মনুষ্যমূর্ত্তি আমার আলোটাকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। ভয় হইল, দেখিলাম—মানুষটার হাতে তীরধনুক, আর বুঝিতে বাকী রহিল না। উন্মত্ত হরিদাস আমার কাছে ছুটিয়া আসিল। আমি বলিলাম "ব্যাপার কি হরিদাস ?" হরিদাস বলিল "সর্ব্বনাশ"। আমি বলিলাম "হয়েছে কি ?" সে বলিল "চুপ,যমদূত ডাক্‌ছে।"

বাঁশবনের ভিতর হইতে সেই জ্যোৎস্নামত্ত কাকটা কা কা করিয়া চীৎকার করিল। হরিদাস চমকিয়া উঠিল, বলিল "ওই যমদূত, ও আমাকে না নিয়ে যাবে না।" তারপর সে আমার পাদুটি জড়াইয়া ধরিয়া অনর্গল অশ্রুপাত করিতে লাগিল, কত কাঁদিল, ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া নিস্তব্ধ জ্যোৎস্না-ধবল রাত্রিতে একটি হৃদয়ের কত গোপন বেদনা জানাইয়া শতবার আপনার চুল ছিঁড়িতে উদ্যত হইল, তাহার স্মৃতিটুকু এখনো আমার মনে জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে।

ক্রমে ক্রমে দারুণ গ্রীষ্ম কাটিয়া গেল ; আকাশে মেঘ ডাকিল ; গ্রামের মহামারীর প্রকোপও কিছু কমিল।

একদিন 'বাঁড়ুয্যে মশায়ের' চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া আছি। হরিদাসও আমার সঙ্গে আসিয়া পাশের একটি ঘরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তখন অপরাহ্ণ; আকাশে মেঘ ছিল বলিয়া বেলা ঠিক করিতে পারি নাই। গ্রাম্যপথের শুষ্ক পাতা ভিজিয়া কাদার সহিত মিশিয়া আছে। ছোট ছোট গর্ত্ত, ডোবা সমস্ত ভরিয়া গিয়াছে, জলে ভিজিয়া গাছগুলি শীর্ণ দেখাইতেছিল, আমি বসিয়া বসিয়া উচ্চের শীর্ণতা আর নিম্নের পরিপূর্ণ শ্রী দেখিতেছিলাম।

দূর হইতে পদ্মপুকুরের উচ্ছল জলরাশি দেখিতে পাইতেছিলাম। বাতাস একদিক হইতে তাহার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের স্রোত ছুটাইতেছিল। বৃষ্টির জলরাশি নানাপথ দিয়া কলকল শব্দে পুকুরে পড়িতেছিল, কিন্তু এখন পুকুর ভরিয়া গিয়াছে, শব্দও কমিয়াছে। দুই একজন চাষা টোকা মাথায় করিয়া কই খলিসা মাছ ধরিবার জন্য এদিক সেদিক ছুটাছুটি করিতেছে। আর একটা পুকুরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া পদ্মপুকুরের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। দেবদারু গাছের গোড়ায় বাঁধা একটা গাভী নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া আছে, কেহ তাহাকে গোয়ালঘরে লইয়া যায় নাই।

ঝড় উঠিল। শাখায় শাখায় বৃক্ষে বৃক্ষে, লতায় লতায় তাহার উদ্দাম লীলা প্রকটিত হইল। সুদূর দিক্‌সীমা হইতে বায়ুর শব্দতরঙ্গ ফুলিয়া ফুলিয়া চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া দিল। বড় বড় নারিকেল সুপারি গাছগুলি প্রতিক্ষণে ভূমিচুম্বন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

চুপ করিয়া বসিয়া আছি, ঝড়ের শব্দ ছাড়া অন্য কোনো শব্দ নাই, কেবল মাঝে মাঝে একটা কাকের আকুল সুর শুনিতে পাইতেছিলাম, চাহিয়া দেখিলাম চণ্ডীমণ্ডপের পাশের আমগাছের একটি ডালে একটা কাক বসিয়া আছে।

বাতাসে ডালটি ভয়ানক নড়িতেছিল, কাকটা তবুও তাহার স্থান ত্যাগ করে নাই। কালো কালো ঠোঁট ফাঁক করিয়া, ঘাড় হেলাইয়া পাখাদুটি ঈষৎ বিস্তৃত করিতে করিতে সে অবিরত ডাকিতে লাগিল "কা—কা"। পাশের ঘরে হরিদাস শুইয়া আছে, এখনি সে ভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিবে মনে করিয়া একখণ্ড ইঁট কাকটাকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলাম। কাক নড়িল না, ত্রিমাত্রায় সুর তুলিয়া গলা বাঁকাইয়া সে আবার ডাকিয়া উঠিল "কা—কা"।

আবার ইঁট ছুঁড়িলাম—তবুও সে নড়িল না, সেইখানে চণ্ডীমণ্ডপের দিকে চাহিয়া ভাঙ্গা গলায় একঘেয়ে সুর তুলিয়া সে অবিরত ডাকিতে লাগিল "কা—কা—কা।"



এত ঝড়ের বেগ, তাহার উপর ইঁট ছুঁড়িতেছি, তবুও কাকটা নড়ে না কেন? দেখিলাম কাকটার ঠোঁট কাটা। পাঁচ মাসের আগেকার কথা, 'বাঁড়ুয্যে মশায়ের' বাসন্তীপূজা, সেই নিরীহ কাকের ছানাটি—সব কথাগুলি একে একে আমার মনে পড়িয়া গেল।

কাকটি কাঝে মাঝে চণ্ডীমণ্ডপের উপর উড়িয়া বসে, আবার আমডালের উপর উড়িয়া আসে। ক্রমশঃ তাহার ডাক বাড়িয়া উঠিল, ঝড়ের শব্দ এই নিরীহ জীবটির কাতর চীৎকারে যেন অভিভূত হইয়া গেল। আমার এমন হইল যে কিছুক্ষণ পরে একটা দিগন্তব্যাপী সহস্র কম্পনে আচ্ছন্ন কা কা শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনিতে পাইলাম না। কাকটির শাবকের জন্য এই করুণ বিলাপ আঁধারে ঘেরা অস্পষ্ট বিশ্বের যেন একটা চিরন্তন মহান বিলাপের মত আমার কাণে ধ্বনিয়া উঠিল।

আর একবার কাকটির পানে চাহিলাম। দেখিলাম—সে নিশ্চল, ঝড়ের তুমুল আন্দোলনের মধ্যেও সে নিশ্চলভাবে মাথাটি নীচু করিয়া ফুকারিয়া উঠিতেছে। মাতৃহৃদয়ের পাঁচমাসের সঞ্চিত পুত্র শোক সহসা আজ যেন জীবন্ত হইয়া ভিজা মাটী গাছপালার উপর দিয়া ঝাপ্‌টা হাওয়ার স্তরে স্তরে প্রতিধ্বনি তুলিয়া সুদূর অনন্তের পানে ছুটিয়া চলিয়াছে।

বিশ্ব ভরিয়া উঠিল, বায়ু মুখরিত হইল, আকাশ প্লাবিত হইয়া গেল? কে তোমাদের মানুষের অধিকার হইতে বিচ্যুত করিল বলিয়া দাও, হে পুত্রহারা জননি, বলিয়া দাও কোন্ অজ্ঞাত দিনে মানুষের আর্ত্তধ্বনি বিশ্বে দুঃখের ঘন কালিমার স্রোত ছুটাইয়া আপনার প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল আর তোমাদের দুঃখ পত্রশাখান্তরালে তোমাদের কোমল গ্রীবা ছিন্ন করিয়া, বক্ষ টুটিয়া বন-ভূমিকে মুখরিত করিয়া তাহার সমকক্ষ হইতে পারে নাই; বলিয়া দাও—কেমন করিয়া মানুষ আপনাকে বড় ভাবিয়া মনুষ্যজীবনে পশু হৃদয় পোষণ করিয়াও সদম্ভে বিচরণ করিয়াছিল আর তোমরা তোমাদের জীর্ণ অদৃপ্ত পদবীতে কোমল মাতৃহৃদয়ে অনুপম স্নেহ প্রেম সঞ্চিত করিয়াও বিশ্বে নগণ্যের মত পরিচিত হইয়াছিলে!

তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গিয়া দেখি হরিদাসের ভয়ানক কম্প দিয়া জ্বর আসিয়াছে। আমি ডাকিলাম "হরিদাস, জ্বর হ'য়েছে, হরিদাস আমার দিকে চাহিল, তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ—দেখিলেই বোধ হয় যেন ফাটিয়া বাহির হইয়া পড়িবে। আমাকে দেখিয়াই সে উঠিয়া বসিল, রক্তচক্ষু ঘুরাইয়া

ঘুরাইয়া এদিকে সেদিকে শূন্যদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চুপি চুপি বলিল "যমদূত—যমদূত।" বুঝিলাম গতিক ভাল নয়—পুত্রহারা জননীর অভিশাপ তাহার উপর বর্ণে বর্ণে ফলিয়া উঠিয়াছে।

ধরাধরি করিয়া হরিদাসকে তাহার বাড়ীতে রাখিয়া আসিলাম।

পরদিন বেলা দুইটার সময় দেখি কাকেরা দলে দলে হরিদাসের বাড়ীর উপর আসিয়া পড়িতেছে। সকালে তাহাকে ভাল দেখিয়াছিলাম, এখন এই কাকের শব্দে সে কেমন আছে একবার দেখিতে চলিলাম।

আসিয়া দেখি—সে উন্মত্তের মত একটা ঠোঁটকাটা কাকের গলা টিপিয়া আছে, মাথার উপর অসংখ্য কাকের দল চীৎকার করিতেছে। দেখিলাম হরিদাস মূর্চ্ছিত, বৃদ্ধা মা কাকটিকে কোনোমতেই ছাড়াইতে না পারিয়া ভয়ে ও উদ্বেগে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। হরিদাসের চোখেমুখে জল দিলাম। প্রায় এক ঘণ্টা পরে সে চক্ষু চাহিল। আমাকে দেখিয়া আমার পাদুটি জড়াইয়া সে যে করুণ কান্নার সুর তুলিল তাহাতে অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলাম না।

অনেক বুঝাইবার পর যেন সে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া নিদ্রাতুরের মত পড়িয়া রহিল। যখন আমি বাড়ী ফিরিলাম তখন রাত্রি বারোটা বাজিয়াছে। যাইবার সময় দেখিলাম হরিদাসের জ্বর প্রবল। যাহারা সেখানে উপস্থিত ছিল, তাহাদের বিপদের সময় সংবাদ দিতে বলিয়া গেলাম।

বড় পিপাসা—বড় গায়ের জ্বালা! রাত্রি একটার সময় হরিদাস উঠিয়া বসিল। আর ঘরে থাকা যায় না। আস্তে আস্তে দরজাটি খুলিয়া সে বাহিরে আসিল। নিঝুম রাত্রি—ঝিল্লীর শব্দ অন্ধকারকে পর্য্যন্ত যেন কাঁপাইয়া তুলিতেছে। হরিদাস বাহিরে বসিল, জমাট-বাঁধা অন্ধকার, কোলের মানুষ চেনা যায় না, ঝিম ঝিম করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। শরীরটা অবসন্ন হওয়াতে সে বসিয়া পড়িল। মাঝে মাঝে গুড় গুড় করিয়া মেঘ ডাকিতেছিল। বাহিরের মাচার নীচু দিয়া কি একটা সর সর করিয়া নড়িয়া গেল।

হরিদাস আর বসিতে পারিল না, অনাবৃত মেঝে লুটাইয়া পড়িল। অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া স্তরে স্তরে যেন কিসের একটা বিপুল মূর্ত্তির মত দেখাইতে লাগিল। তারপর তাহা আরো বড় হইল। প্রকাণ্ড তাহার গ্রীবা, বড় বড় ঠোঁট, কালো মিশ্‌মিশে। হরিদাস দেখিল—একটা ভয়ানক বিপুল কাক মাচার উপর বসিয়া আছে; তারপর সেটা পাখার ঝাপটে সমস্ত



অন্ধকার উড়াইয়া দিয়া কালো কালো বড় বড় চোখ ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া হরিদাসের মাথার কাছে তাহার দীর্ঘায়তন ঠোঁট দুখানি বিস্তৃত করিয়া, আকাশভেদী সুরে ডাকিল "কা—কা"। হরিদাস চীৎকার করিয়া উঠিল, তারপর উর্দ্ধশ্বাসে অন্ধকার আঁকড়াইতে আঁকড়াইতে কোথায় ছুটিয়া গেল।

শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

# অন্তঃপুরিকা।

আর যে আমার সইছে নারে সইছে না আর প্রাণে,
এমন ক'রে কতদিন আর কাট্‌বে কে তা' জানে!
দিন গুণে দিন ফুরায় নাক' নিমিষ গণি তাই,
বুকের ভিতর হাঁপিয়ে ওঠে, আকুল চোখে চাই।
যেখানটিতে বস্‌ত সে জন বস্‌ছি সেথায় গিয়ে,
দেখ্‌ছি খুলে চিঠিটি তার ঘরে দুয়োর দিয়ে;—
বেশী আমি পাইনি এবার পাইনি বেশী আর,
পারে যাবার একটি কড়ি একটি চিঠি তার।
হাসিয়েছিল কোন্ কথাতে,—হাস্‌ছি মনে করে,
দেখ্‌তে হঠাৎ ইচ্ছে হ'য়ে চক্ষু এল ভ'রে।
শোবার ঘরে কবাট এঁটে ছবিটি তার লিখি,
হয় না কিছু,—সেইটি তবু নয়ন ভরে দেখি।
নানান্ কাজে ব্যস্ত থাকি তবুও কেন ছাই
মনটা ওঠে আকুল হ'য়ে, উদাস হ'য়ে যাই।
ডানা যদি দিতেন বিধি উড়ে যেতাম চ'লে,
সকল ব্যথা সইত, মাথা রাখ্‌তে পেলে কোলে।
সীতা সতী বুদ্ধিমতী,—প্রণাম করি পায়,—
আজ বুঝেছি বনে কি সুখ, কি দুখ অযোধ্যায়।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

---

# ৺রমেশচন্দ্র দত্ত।

## দ্বিতীয় অধ্যায়।

রমেশচন্দ্রের শৈশব—মফস্বলে অবস্থান ও বিদ্যাভ্যাস—পিতামাতার দেহান্তর—হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষালাভ—বিবাহ—দুই কন্যার জন্মগ্রহণ—বিলাত গমন—সিভিল সার্ভিস ও ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় সফলতা—ইউরোপ ভ্রমণ—ভারতে প্রত্যাগমন।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই আগষ্ট তারিখে, কৃষ্ণ সিংহের গলির (বর্ত্তমান বেথুন রো) অন্তর্গত কালী মন্দিরের পূর্ব্বদিক সংলগ্ন গৃহে রমেশচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হন। ঐ বাটী রমেশচন্দ্রের মাতামহের—এখন উহা ভূমিসাৎ করিয়া তথায় খোলার চাল নির্ম্মিত হইয়াছে। তাঁহার অগ্রজ যোগেশচন্দ্র যখন পাঁচ বৎসরের এবং রমেশচন্দ্র যখন চার বৎসরের, তখন এক শুভদিনে তাঁহাদের হাতে খড়ি হয়। গুরুমহাশয়ের নিকট তালপাতা ও কলাপাতায় লেখা অভ্যাস হইলে, রমেশচন্দ্র কলুটোলা ব্র্যাঞ্চ স্কুলে ভর্ত্তি হন। এখন ঐ বিদ্যালয় হেয়ার স্কুল নামে পরিচিত। এই স্কুলে প্রবেশ করিবার অল্প দিন পরেই, রমেশচন্দ্রের পিতা ডেপুটি কলেক্টর ইশানচন্দ্র বীরভূমে বদলি হন, এবং রমেশচন্দ্রকেও পিতামাতার সহিত তথায় গমন করিতে হয়। বীরভূমে অবস্থানকালে তাঁহার জননীর পীড়াবশতঃ একজন সাহেব ডাক্তার আহূত হন। সাহেবের গৃহিণী বাহিরে শকটে বসিয়া একখানি বিচিত্র পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন, বালক রমেশচন্দ্রের উক্ত পুস্তকখানি ছোঁ মারিয়া আত্মসাৎ করিতে সাধ হয়। সাহেব-মহিলা দত্ত মহাশয়ের মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া, পুস্তকখানি জোর করিয়া ধরিয়া থাকাতে, বালক-দস্যুর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই। *

ঈশানচন্দ্র বীরভূম হইতে কুমারখালীতে বদলি হইলে, রমেশচন্দ্র ঐ স্থানের বিদ্যালয়ে আসিয়া ভর্ত্তি হইলেন। সেখানে তাঁহাদের বিশ্বস্ত ভৃত্য যুধিষ্ঠির ওরফে যোষ্টে, রমেশচন্দ্র ও তাঁহার অগ্রজকে প্রত্যহ কৃত্তিবাস-রচিত রামায়ণ

* স্বর্গীয় যোগেশচন্দ্র দত্ত, রমেশচন্দ্রের জামাতা শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত আই-সি-এস মহোদয়কে রমেশচন্দ্রের বাল্য-জীবনী সম্বন্ধে কয়েকটী ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। গুপ্ত মহাশয়ের অনুগ্রহে লেখক সেগুলি জ্ঞাত হইয়াছেন।



পাঠ করিয়া শুনাইত। রামায়ণ কাহিনী শুনিতে রমেশচন্দ্রের এত ভাল লাগিত, যে একদিন রাত্রে ঢুলিতে ঢুলিতে লক্ষ্মণের শক্তিশেল পর্য্যন্ত শুনিয়া, যতক্ষণ না যোষ্টে লক্ষণের চেতনালাভ পর্য্যন্ত পাঠ করিল, ততক্ষণ তিনি কিছুতেই শয্যাগ্রহণ করিলেন না। জঙ্গলে জরিপ-সংক্রান্ত কার্য্য করিবার জন্য রমেশচন্দ্রের পিতা কোম্পানির নিকট হইতে একটি হস্তী পাইয়াছিলেন। রমেশচন্দ্র ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সময়ে সময়ে তৎপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বেড়াইতেন। একদিন সকালে তাঁহারা দুই ভাই নদীতে স্নান করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, যে ঐ হাতীকেও তথায় স্নানার্থ লইয়া যাওয়া যাইতেছে। বালকদ্বয়ের পীড়াপীড়িতে মাহুত তাহাদিগকে হাওদা-হীন হাতীর পিঠে তুলিল। যোগেশচন্দ্র মাহুতকে ধরিয়া বসিলেন, কিন্তু রমেশচন্দ্র সাহসে ভর করিয়া তাঁহার ভ্রাতা বা মাহুতকে ধরেন নাই। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল ফলিল—হাতী যেমনি চলিতে আরম্ভ করিল, অমনি তিনি ধপাস করিয়া ভূমিসাৎ হইলেন। সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহাকে অধিক আঘাত লাগে নাই।

কুমারখালী হইতে ঈশানচন্দ্র বহরমপুরে বদলি হইলে, রমেশচন্দ্র তথাকার বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। বঙ্গদেশের প্রথম ছোটলাট সার ফ্রেড্‌রিক হ্যালিডে, এই সময়ে বহরমপুরে একটী দরবার করেন। ঈশানচন্দ্র ও তাঁহার কয়েকজন আত্মীয় ঐ দরবারে উপস্থিত হইতে নিমন্ত্রিত হন। এ সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র লিখিয়াছেন ঃ—

"Durbars and official matters did not attract my boyish wonder or attention; my pleasantest recollections connect themselves with green fields and the quiet village scenes, in which it was my privilege and my delight to pass my early days. Those were happy days, before malaria had appeared in its terrible form in Bengal, and residence in the outlying Districts conduced to health, as it refreshed and strengthened and educated the mind."

(ভাবার্থ ঃ—বাল্যকালে দরবার প্রভৃতি সাহেবিকাণ্ডে আমার মন কিছুতেই আকৃষ্ট হইত না। তখন বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর আবির্ভাব হয় নাই। শান্তিনিকেতন শস্যশ্যামল পল্লীগ্রামগুলির আনন্দ ও স্বাস্থ্যদায়িনী শক্তির পরিচয়, আজও স্মৃতি অধিকার করিয়া আছে।)

বহরমপুর হইতে কলিকাতায় আসিয়া রমেশচন্দ্র পুনরায় কলুটোলা ব্র্যাঞ্চ স্কুলে ভর্ত্তি হন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতা পাবনায় বদলি হইলে, তিনি

তথাকার বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। সিপাহী-বিদ্রোহ দমন উপলক্ষে এই সময় একদল গোরার পল্‌টন পাবনায় অবস্থান করিতেছিল। বিদ্রোহ দমনান্তর পাবনা পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে পল্‌টনের উচ্চতম কর্ম্মচারীরা "ম্যাক্‌রেথ" নাটক অভিনয় করে। রমেশচন্দ্রের জীবনে ইংরাজী নাটকাভিনয় দর্শনের এই সূত্রপাত। পাবনায় অবস্থানকালে তিনি অশ্বারোহণ বিদ্যায় শিক্ষিত হইয়াছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে মহারাণী ভিক্টোরিয়া নিজে রাজ্যভার গ্রহণ করিলে, তাঁহার ঘোষণাপত্র ভারতবর্ষের অন্যান্য সহরের ন্যায় পাবনায়ও পঠিত হইয়াছিল। ঘোষণাপত্র পাঠের পর যাঁহারা গগণভেদী রবে "Long live the Queen" বলিয়া চিৎকার করিয়াছিলেন, ভবিষ্যৎ-ম্যাজিষ্ট্রেট রমেশচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। পাবনা বাসকালে রমেশচন্দ্র তাঁহার অগ্রজকে আসন্নমৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারা দুই ভাই কয়েকজন বন্ধুর সহিত একটী কাঠের সিন্ধুক লইয়া খেলা করিতেছিলেন। রমেশচন্দ্র যখন একটু দূরে, তখন দুই তিনজন বালক যোগেশচন্দ্রকে উহার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া শিকল টানিয়া দেয়। ঠেলাঠেলির চোটে শিকল এমন আটকাইয়া যায়, যে রমেশচন্দ্র দৌড়িয়া আসিয়া সিন্ধুক খুলিয়া না দিলে, যোগেশচন্দ্রের প্রাণত্যাগ হইবার সম্ভাবনা ছিল।

পাবনা স্কুলে রমেশচন্দ্র প্রথম পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পদ্মাতটে খেলাধূলায় এতটা সময় ব্যয়িত হইত, যে পরীক্ষায় স্বীয় সফলতা দর্শনে রমেশচন্দ্র বিস্মিত হইয়াছিলেন। তৎসম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন :—

"I did fairly well in Pubna school and carried away a prize, but can scarcely say that I deserved it, For we were wild boys, my elder brother and I – and delighted in play and mischief the whole day long."

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। ঐ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর তাঁহার মাতৃদেবীর স্বর্গলাভ হয়। স্ত্রীর মৃত্যুর পর, ঈশানচন্দ্র তাঁহার পুত্রগণকে আর মফস্বলে লইয়া যান নাই। ১৮৬০ সালের প্রারম্ভে তিনি কয়েক মাসের জন্য অবসর গ্রহণ করেন, এবং কলিকাতায় ফিরিয়া তাঁহার পুত্রগণকে ইংরাজী সাহিত্যে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। পিতার সহিত "আরব্য রজনী" ( Arabian nights ) পাঠে রমেশচন্দ্র প্রভূত আনন্দ-লাভ করিয়াছিলেন। পুত্রগণকে সুশিক্ষিত করিতে ঈশানচন্দ্রের আন্তরিক



ইচ্ছা ছিল, এবং তাঁহাদের শিক্ষাকার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য তিনি শীঘ্র শীঘ্র পেন্সনের দরখাস্ত করিতে মনস্থ করিতেছিলেন, এমন সময়ে ১৮৬১ সালের ৮ই মে, হঠাৎ জলমগ্ন হইয়া তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। দুই বৎসরের মধ্যে প্রত্যক্ষ দেবদেবী জনক ও জননী উভয়কেই হারাইয়া, রমেশচন্দ্র অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন, একথা বলা বাহুল্য। এ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন :—

"In my early years I lost my parents,—the most worthy, the most affectionate of parents that ever lived,"

পিতার মৃত্যুর পর খুল্লতাত শশীচন্দ্র রমেশচন্দ্রের শিক্ষা পরিদর্শন করিতেন। প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে সেক্সপীয়ার, মিল্‌টন, বায়রণ প্রভৃতি ইংরাজ কবিগণের রচনায় কোন কোন অংশ আবৃত্তি ও অধ্যয়ন করা হইত। শশী চন্দ্রের ন্যায় রমেশচন্দ্র প্রত্যহ দুইবার স্নান করিতেন। বিলাত যাওয়া পর্য্যন্ত এইরূপ অভ্যাস ছিল।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারি তারিখে, স্বর্গীয় নবগোপাল বসুর কন্যা শ্রীমতী মনোমোহিনীর সহিত রমেশচন্দ্রের বিবাহ হয়। নবগোপাল বসুর বাটী কৃষ্ণ সিংহের গলির ( এখন বেথুন রো ) ২৩ নম্বর। রমেশচন্দ্রের শ্রদ্ধেঠাকুরাণী এখনও তথায় বাস করিতেছেন। রমেশচন্দ্রের শ্যালক স্বর্গীয় ক্ষেত্রনাথ বসু, মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত হোসঙ্গাবাদে ওকালতি করিতেন। রমেশচন্দ্রের শ্যালক-পুত্র শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু এখন হোসঙ্গাবাদে ব্যারিষ্টারি করেন। রমেশচন্দ্রের শ্যালীপতিভ্রাতা শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ, বনগ্রাম স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৩০২ বঙ্গাব্দে তিনি রমেশচন্দ্রের একখানি সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে, হেয়ার স্কুল হইতে, এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, রমেশচন্দ্র মাসিক চৌদ্দ টাকা বৃত্তি পান। দুই বৎসর প্রেসি-ডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করিয়া, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি এফ, এ, পরীক্ষা দেন। ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রবৃন্দের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া তিনি মাসিক বত্রিশ টাকার বৃত্তি পান। রমেশচন্দ্র যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে এফ, এ, পড়িতেন, তখন ভক্তিভাজন সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গণিতের সহকারী অধ্যাপক ছিলেন। ১৩১৬ সালের ১৮ই মাঘ তারিখে তিনি লেখককে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :—

"ইংরাজী ১৮৬৫ সালে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে, রমেশচন্দ্র দত্তের সহিত আমার প্রথম দেখা হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, সেই বৎসর তিনি উক্ত বিদ্যালয়ের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র হয়েন, এবং আমিও সেই সময় তথায় গণিতের সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত হই। অনুশীলনার্থে আমি ছাত্রদিগকে বাটী হইতে পাঁচ সাতটী অঙ্ক কষিয়া আনিতে বলিতাম। পর পর দুই দিন, রমেশচন্দ্র দত্ত অঙ্ক কষিয়া আনেন নাই দেখিয়া, তাহা না আনিবার কারণ জিজ্ঞাসা করি। তাহাতে তিনি উত্তর দেন, তাঁহার অঙ্কশাস্ত্রে অনুরাগ বা দক্ষতা না থাকায় তিনি নির্দ্দিষ্ট অঙ্কগুলি কষিতে চেষ্টা করেন নাই। এ উত্তর সন্তোষদায়ক মনে না হওয়ায়, আমি তাঁহাকে বলি, তাঁহাদের যে পরিমাণ গণিত শিখিতে হয়, তাহার নিমিত্ত নিউটন লাপ্লাসের প্রতিভার প্রয়োজন হয় না, এবং তাঁহাদের যে পরিমাণ সাহিত্য পাঠ করিতে হয়, তন্নিমিত্তও সেক্‌সপীয়ার, মিল্‌টনের প্রতিভার প্রয়োজন হয় না, সহজ বুদ্ধি থাকিলেই ঐ ঐ পরিমাণ গণিত ও সাহিত্য সকলেই আয়ত্ত করিতে পারে। এই সামান্য তিরস্কার বাক্যে রমেশচন্দ্রের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়াছিল, তিনি বলিয়াছিলেন সেই দিন হইতে তিনি অঙ্কশাস্ত্রের প্রশ্ন সমাধানার্থ যথাশক্তি যত্ন ও চেষ্টা করিবেন। তাহার পর প্রতিদিনই তিনি নির্দ্দিষ্ট প্রশ্নের সকলগুলির না হউক, অধিকাংশেরই উত্তর লিখিয়া আনিতেন। আমি তখন একজন প্রবীণ শিক্ষক নহি, কলেজ ছাড়িয়া নূতন শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়াছি, আমার কথায় তাদৃশ গুরুত্ব থাকা সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু আমি সামান্য শিক্ষক হইলেও রমেশচন্দ্র উপযুক্ত ছাত্রের ন্যায় আমার উপদেশ অবনতমস্তকে গ্রহণ করেন, তদনুসারে গণিতানুশীলনার্থে যত্ন করেন, এবং তাহাতে কৃতকার্য্য হয়েন। এই ক্ষুদ্র ঘটনা রমেশচন্দ্র দত্তের সুনীতি, সুবুদ্ধি ও প্রতিভার প্রচুর পরিচয় দেয়; এবং সেই সময়েই আমার ধ্রুব ধারণা হইয়াছিল, এই ছাত্র পরে দেশের এক জন গণ্যমান্য লোক হইবেন। রমেশচন্দ্রের জীবন সেই ধারণা যথার্থ যথেষ্ট সপ্রমাণ করিয়াছে।"

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন, অর্থাৎ সপ্তদশ বৎসর বয়সে রমেশচন্দ্রের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী কমলা ভূমিষ্ঠ হন। ১৮৬৭ সালের ২রা নবেম্বর, তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী বিমলা জন্মগ্রহণ করেন।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে, এবং ১৮৬৮ সালের ও ফেব্রুয়ারি মাসে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন। ১৮৬৮ সালের ৩রা মার্চ্চ, তিনি ও তাঁহার দুইজন সুবিখ্যাত বন্ধু, সিভিল সার্ভিশ পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাত যাত্রা করেন। তখন বিলাত গমন করিলে ঘোর সামাজিক নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইত, এবং রমেশচন্দ্রের পিতামহ বিলাত-যাত্রার বিরোধী ছিলেন। সেইজন্য রমেশচন্দ্রকে গোপনে পলায়ন করিতে হইয়াছিল। রমেশচন্দ্রের সহাধ্যায়ী, কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুপ্ত, অভিভাবকের বিনানুমতিতে রমেশচন্দ্রের



সহিত বিলাতে চম্পট দিয়াছিলেন। স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন ডভ্‌টন কলেজের ছাত্র ছিলেন। তিনি তাঁহার পিতার সম্মতিক্রমে ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। আত্মীয় স্বজনের নিকট ধরা পড়িবার ভয়ে, জাহাজের টিকিটে রমেশচন্দ্র ও বিহারীলালের নাম ছিল না—"Surendranath Banerjee and two friends" এই নামে টিকিট ক্রয় করা হয়। স্বর্গীয় ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ রায় ঐ সময়ে বিলাত গমনে উদ্যত হইয়াছিলেন। তাঁহার ভারতত্যাগে বাধা পড়াতে, রমেশচন্দ্র তাঁহারই ন্যায় দীর্ঘকায় দেবেন্দ্রনাথের হ্যাট, কোট, সার্ট ইত্যাদি ক্রয় করিয়াছিলেন। একমাত্র যোগেশচন্দ্র এই বিলাতে পলায়ন ব্যাপার পূর্ব্ব হইতে অবগত ছিলেন, এবং তিনি তাঁহার মধ্যম ভ্রাতাকে বাটী হইতে গোপনে অর্থসংগ্রহ করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ্চ, রমেশচন্দ্র "মুলতান" নামক জাহাজে বঙ্গোপসাগরে উপনীত হইলেন। ঊর্দ্ধে তারকাখচিত অনন্ত নীলাকাশ, নিম্নে ঊর্ম্মিমালার তাণ্ডব নৃত্য, এই গম্ভীর সৌন্দর্য্যের প্রথম দর্শন-স্মৃতি রমেশচন্দ্রের মনে বহুকাল জাগরুক ছিল। ১০ই মার্চ্চ তিনি সিংহলদ্বীপে অবরোহণ করিয়া তথাকার নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যে অত্যন্ত মুগ্ধ হন। এই স্থানেই তিনি প্রথমে ভূধর-দর্শন-জাত সবিস্ময় উল্লাসের আস্বাদ উপভোগ করেন।

বহু অর্থব্যয়ে বিলাতবাসের পর, সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বিফল হইয়া, স্বদেশে সমাজচ্যুত হইয়া থাকিতে হইলে কি হইবে, এই চিন্তায় রমেশচন্দ্র সময়ে সময়ে অভিভূত হইয়া পড়িতেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

"As we sat for hours together on the deck, watching this still nightly scene, other thoughts than those suggested by the scene oft arose in our minds. For we have left our home and our country, unknown to our friends, unknown to those who are nearest and dearest to us, staking our future, staking all, on success in an undertaking, which past experience has proved to be more than difficult. ... ...Shall we achieve that success ? or shall we come back to our country, impoverished, socially cut off from our countrymen, and disappointed in our hopes, to face the reproaches of advisers and the regrets of our friends ?"

২১শে মার্চ্চ রমেশচন্দ্র এডেন নগর দর্শন করেন। ২৭শে মার্চ্চ তিনি সুয়েজ উপসাগরে প্রবেশ করেন—তখনও সুয়েজ খাল কাটিয়া ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগর সংযুক্ত হয় নাই। আলেকজাণ্ড্রিয়া নগর দর্শনান্তর, ২রা

এপ্রেল তিনি মাল্টা দ্বীপে গমন করেন। তৎপরে জিব্রাল্টরে অবরোহণ করিয়া, তথাকার সুবিখ্যাত দুর্গ দর্শন করেন। ১১ই এপ্রেল ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী সৌদাম্‌টনে উপস্থিত হইয়া, ঐ দিবস সন্ধ্যার পর, তিনি লণ্ডন নগরে পৌঁছিলেন। এই সময়কার মনোভাব রমেশচন্দ্র দুইটী কবিতায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

## স্বদেশ-ভবন।

"দাঁড়াইয়া জাহাজের বক্ষের উপর,
অনন্ত অর্ণব-বারি হেরি নিরন্তর ;
সুদূরে ভূধর-খণ্ড নীলকান্তি ধরে,
আনন্দে সাগর-পক্ষী কলরব করে ;
দেশ-দেশান্তরে করি যদিও ভ্রমণ,
সতত হৃদয়ে জাগে স্বদেশ-ভবন।
হেরিয়াছি সিংহলের সুরভি কানন,
সুগন্ধেতে স্নিগ্ধ যথা বসন্ত পবন,
হেরিয়াছি এডেনের শৈলরাশি সার,
ঊর্ম্মিরাশি বৃথা যাহে করিছে প্রহার ;
দেশ দেশান্তরে করি যদিও ভ্রমণ,
সতত হৃদয়ে জাগে স্বদেশ-ভবন।

* * *

যত দিন দেশে দেশে করিব ভ্রমণ,
মাতৃভূমি তব দুঃখে করিব রোদন ;
হেরিয়া টেমস্ নদী কিম্বা দ্রুত রোন্,
স্মরিব জাহ্নবী কূল করিব রোদন।
দেশ-দেশান্তরে করি যদিও ভ্রমণ,
সতত হৃদয়ে জাগে স্বদেশ-ভবন।"

## সুন্দর বসন্ত।

"সুন্দর বসন্তকান্তি শোভিল ধরায়,
নিরানন্দ প্রবাসীর কি সুখ তাহায় ?
মাতৃভূমি পরিহরি বিদেশে ভ্রমণ,
অনন্ত সমুদ্র-বক্ষে করি পর্য্যটন।
চারি দিকে ঊর্ম্মিরাশি ভীষণ কল্লোলে,
উল্লাসে প্রমত্ত যেন আস্ফালিয়া চলে।



প্রবল সাগর-বায়ু উচ্চরবে ধায়,
প্রবাসীর কর্ণে যেন দুখ-গান গায়।
সুন্দর বসন্ত যথা জগতে পশিছে,
জীবন-বসন্ত মম যৌবনে উদিছে।
ঐ শোন, যশোদেবী ভৈরব নিস্বনে,
ডাকে মোরে, যুঝিবারে যশের কারণে।
সময় সময়ে কেন ভীরু চিন্তা করি,
দূরে যাক্ বিষণ্ণতা,—চিন্তা—অশ্রুবারি।
নির্ভয়ে যুঝিব আমি যশের কারণ,
নাহি খেদ হয় যদি শরীর পতন।"

বিলাতে যাইয়া প্রথম বৎসর, রমেশচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুদ্বয় গুরুতর পরিশ্রম করেন। তিনি বলিয়াছেন, "never before did we study so hard and so unremithdly." তিনি লণ্ডনের য়ুনিভার্সিটি কলেজে ভর্ত্তি হন। ✓ প্রাতঃকালে স্নান ও প্রাতরাশের পর তিনি কলেজে যাইতেন। বৈকালে বাসায় ফিরিয়া, আহারান্তে বায়ুসেবনার্থ বাহির হইতেন। তৎপরে বাটীতে ফিরিয়া, চা খাইয়া, অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিতেন। কলেজের নির্দ্দিষ্ট পাঠ ভিন্ন তিনি আচার্য্য হেন্‌রি মর্লের নিকট ইংরাজী সাহিত্য সম্বন্ধে ও আচার্য্য থিওডোর গোল্ডষ্টুকারের নিকট সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে, উপদেশ গ্রহণ করিতেন। উক্ত অধ্যাপকদ্বয় তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। আচার্য্য মর্লে সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র বলিয়াছেন,

"I have never known a kinder, a more genuine and true-hearted Englishmen than Mr. Henry Morley."

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় প্রায় সওয়া তিন শত ছাত্র উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কয়েক জন বিশ্ববিদ্যালয়ভুক্ত শিক্ষার্থী ছিলেন, কিন্তু অনেকেই স্বর্গীয় রেণ্ (wren) সাহেবের নিকট এই পরীক্ষার জন্য বিশেষভাবে শিক্ষিত হইয়াছিলেন। প্রত্যেক বিষয়েই লিখিত ও বাচনিক উভয়বিধ পরীক্ষা হইয়াছিল, এবং প্রায় এক মাস ধরিয়া পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল। ইংরাজী সাহিত্য ও ইতিহাস, গণিত, মনোবিজ্ঞান, জড় বিজ্ঞান ও সংস্কৃত সাহিত্য, এই কয়েকটী বিষয়ে রমেশচন্দ্র পরীক্ষা দেন। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে ৫০০র মধ্যে ৪৩০ পাইয়া প্রথম স্থান, ও ইংরাজী সাহিত্যে ৫০০র মধ্যে ৪২০ পাইয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

মোটের উপর তিনি তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিহারীলাল গুপ্ত ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। নিজের ও বন্ধুদ্বয়ের পরীক্ষার ফল বাহির হইলে, রমেশচন্দ্র আনন্দে অধীর হইয়া লিখিয়াছিলেন ঃ—

"I cannot describe the transport, which I felt on that eventeil day. My friends too had passed. The great undertaking, on which we had staked everything in life had succeeded, that feture of our life was determined and a path, we ventured to hope, had been opened for our young countrymen."

বাঙ্গালীর মধ্যে একমাত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ইহার পূর্ব্বে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

ইহার পর প্রায় দেড় বৎসর কাল রমেশচন্দ্র বিলাতে ছিলেন। তিনি এই সময়ের মধ্যে আইন, অর্থনীতি, এবং ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত ও প্রচলিত ভাষা সম্বন্ধে কয়েকটী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, এবং যথারীতি ব্যারিষ্টার হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,—

"I have been called to the Bar after keeping 12 terms at the Middle Temple."

বাঙ্গালীর মধ্যে মনোমোহন ঘোষ, মাইকেল মধুসূদন ও উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণ রমেশচন্দ্রের পূর্ব্বে ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

ভারতবর্ষে প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে রমেশচন্দ্র স্কটলণ্ড, আয়র্লণ্ড, ফ্রান্স, সুইজর্লণ্ড, ইটালী প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করেন।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে উপস্থিত হইয়া রমেশচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ ও বিহারীলাল এক বিষম সমস্যায় পতিত হন। পারিসের রেলওয়ে ষ্টেসনে পৌঁছিলে, তথাকার পুলিসপুঙ্গবগণ মনে করেন, যে ঐ তিন জন বিদেশী নিশ্চয়ই communist সম্প্রদায়ভুক্ত বদমায়েস। রমেশচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুদ্বয় নিদেশ পত্র ( passport ) দেখাইলেন, কিন্তু তাহাতে কোন সুবিধা হইল না। তাঁহাদিগকে সমস্ত রাত্রি হাজতে থাকিতে হইল। পর দিবস প্রাতঃকালে কমিশনর সাহেবের নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃত হইলে, তিনি তাঁহাদের মুক্তিদান করিলেন, এবং বৃথা ক্লেশ পাইতে হইয়াছে বলিয়া আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিলেন। এ সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

"We were fortunate that we were not tried and shot on mere suspicion."



সুইজর্লণ্ডের কৃষকগণের বুদ্ধি, পরিচ্ছন্নতা ও শিষ্টাচার দেখিয়া রমেশচন্দ্র অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন। ইটালীর অন্তর্গত ভিনিস নগর দর্শনে তিনি বিস্ময়াভিভূত হইয়াছিলেন। এই নগর সমুদ্রের উপর নির্ম্মিত—পৃথিবীর অন্যান্য সহরে এক গৃহ হইতে গৃহান্তরে যাইতে হইলে যেমন রাজপথ দিয়া যাইতে হয়, ভিনিসে সেইরূপ নৌকা সহযোগে যাইতে হয়।

জীবনের প্রথম ব্রত উদ্যাপন করিয়া, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে, রমেশচন্দ্র জন্মভূমিতে প্রত্যাগমন করেন।

শ্রীগৌরহরি সেন।

---

# বিশু দাদা।

( ৯ )

সতীশচন্দ্র যখন দেখিলেন যে, নরেশ বাবু কিছুতেই তাঁহার বাসায় বাস করিতে সম্মত হইলেন না, তখন তিনি অখিল মিস্ত্রীর লেনের মধ্যেই নিজের বাসার অনতিদূরে একটী ছোট বাসা ভাড়া লইলেন। পরেশবাবু ভবেশ ও বিশ্বনাথকে লইয়া সেই বাসায় গেলেন। নরেশবাবু বলিয়াছিলেন যে, পাকের ব্রাহ্মণ রাখিবার প্রয়োজন নাই, তিনি নিজেই সে কার্য্য করিবেন; কিন্তু সতীশ ইহাতে সম্মত না হওয়ায় একজন ঠিকা বামুনঠাকুর নিযুক্ত হইল। সতীশই সমস্ত ব্যয় ভার বহন করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

সতীশ জানিতেন যে, নরেশবাবু এমন ভাবে অধিক দিন থাকিতে চাহিবেন না, তিনি যাহাতে নিজে কিছু উপার্জ্জন করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতেই হইবে। সৌভাগ্যক্রমে একটা সুবিধা হইয়া গেল। সতীশচন্দ্রের একজন ধনী মাড়োয়ারী মক্কেল ছিল। তাঁহার নাম রামজীদাস। রামজী দাসের পুত্রটীর জন্য একজন শিক্ষকের প্রয়োজন হইল। প্রতিদিন প্রাতঃকালে তিনঘণ্টা পড়াইতে হইবে, মাসিক বেতন ৩৫ টাকা। সতীশ নরেশবাবুকে এই কার্য্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন। সতীশ চেষ্টা করিলে নরেশবাবুকে কোন বিদ্যালয়েও নিযুক্ত করাইতে পারিতেন; কিন্তু নরেশ বাবু বলিলেন যে মাসিক ৩৫ টাকা তাঁহাদের তিনজনের পক্ষে যথেষ্ট।

ভবেশের পরীক্ষার ফল বাহির হইলে তাহাকে কলেজে পড়াইতে হইবে, সেজন্য ব্যয়ও বাড়িবে ; কিন্তু নরেশ বাবু নিশ্চিত জানিতেন যে, ভবেশ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইবেই। সেই কারণে তিনি ঐ ৩৫ টাকাই যথেষ্ট মনে করিতেন, বিশেষতঃ, তাঁহার মনের যে প্রকার অবস্থা তাহাতে তাঁহার যদি ভরণপোষণের অন্য কোন উপায় থাকিত তাহা হইলে এ চাকুরীও তিনি গ্রহণ করিতেন না। বাড়ী ভাড়ার টাকা ও বামুন ঠাকুরের বেতন সতীশ দিবার জন্য অঙ্গীকার করিয়াছিল, নরেশ বাবু তাহার মত পরিবর্ত্তন করিতে পারিলেন না। কলিকাতা সহরে দ্রব্যাদি দুর্ম্মূল্য হইলেও ৩৫ টাকায় তিনটী লোকের খরচের কোন কষ্ট হয় না।

এদিকে সুলোচনাও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি যখন শুনিলেন যে, নরেশ বাবু তাঁহাদের বাসায় থাকিবেন না, তখন তাঁহারই অনুরোধে সতীশ ১২ টাকা ভাড়ায় অনতিদূরবর্ত্তী ছোট একটী বাড়ী নরেশ বাবুর জন্য স্থির করিয়া দিলেন। এমন ছোট বাড়ীতে নরেশ বাবুকে রাখা সতীশের ইচ্ছা ছিল না ; কিন্তু ভাল বাড়ী নিকটে ছিল না। সুলোচনার ইচ্ছা নরেশবাবু খুব নিকটে থাকেন। তাই এই ছোট বাড়ীটাই ভাড়া লইতে হইয়াছিল।

সুলোচনা প্রতিদিন দুইবেলা নানাপ্রকার তরকারী ব্যঞ্জন রাঁধিয়া নরেশ বাবুর বাসায় যথাসময়ে পাঠাইয়া দিতেন ; অপরাহ্নকালে নরেশ বাবু ও ভবেশের জন্য ভাল ভাল জলখাবার প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতেন ; সপ্তাহের মধ্যে তিন চারিদিন রাত্রিতে ভবেশকে সতীশের বাসাতেই আহার করিতে হইত। নরেশবাবু কিছু বলিলে সতীশ রাগ করিত।

আর বিশু দাদা ! বিশুদাদা মনে করিয়াছিল নূতন বাসা হইল, সুতরাং কাজ কর্ম্মের গোলযোগে তাহার যথেষ্ট অবকাশ থাকিবে না ; তাহার আসল কাজের সময় কম হইবে। কিন্তু দুই চারি দিনের মধ্যেই সে দেখিল যে, সুলোচনার সুবন্দোবস্তে তাহাকে আর ভৃত্যের কাজ করিতে হয় না। প্রাতঃকাল হইতে না হইতেই সতীশের বাসার ঝি আসিয়া পরেশ বাবুর বাসার সমস্ত কাজ কর্ম্ম শেষ করিয়া দেয়। বাজারের সময় সতীশের চাকরই বিশু দাদার নিকট হইতে বাজারের দ্রব্যাদির কথা শুনিয়া যায় ; কোনদিন বা বাজার খরচের পয়সা লইয়া যায়, কোনদিন বা লয় না ; দিতে চাহিলে বলে "বাজার আগে আনি, তার পর হিসাব করিয়া পয়সা লইয়া যাইব।" কিন্তু আর সে লয় না, বিশু দাদা পয়সা দিতে গেলে বলে "মা ঠাকুরুণের



নিষেধ, পয়সা নিতে পারবো না" বিশ্বনাথ দেখিল এ ভারি বিপদ ; তাই মধ্যে মধ্যে সে বলিত "আজ আমাদের কিছু দরকার নাই।" তাহার পর সতীশের চাকর চলিয়া গেলে নিজে বাজার করিয়া আনিত।

বিশ্বনাথ যে কাজের জন্য কলিকাতায় আসিয়াছে তাহা কি সে ভুলিতে পারে ? দিন রাত তাহার সেই এক ভাবনা। সে মনে করিয়াছিল কাজটী বড়ই সহজ, খুঁজিতে খুঁজিতে সে একদিন তাহার দিদিকে দেখিতে পাইবেই। কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া বিশ্বনাথ একটু দমিয়া গিয়াছিল। সে যদিও পূর্ব্বে দুই একবার কলিকাতায় আসিয়াছিল, কিন্তু কলিকাতা সহরটা যে এত প্রকাণ্ড সে ধারণা তাহার ছিল না ; সে কলিকাতা সহরটাকে তাহাদের হুগলী হইতে একটু বড় বলিয়াই জানিত। এবার কলিকাতায় আসিয়া তাহার সে ভ্রম ঘুচিয়া গেল। এত বড় সহর, এত রাস্তা, এত বাজার, এত বাড়ী—ইহার মধ্যে সে কতদিন খুঁজিবে। হায় ! তবে কি তাহার আশা পূর্ণ হইবে না ? তবে কি সে তার দুঃখিনী দিদিকে চিরদিনের মত বিসর্জ্জন দিয়া জীবন ধারণ করিবে ? না,—না, তাহা কিছুতেই হইবে না ; জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সে সুমতির অনুসন্ধান করিবে। হৌক কলিকাতা বড় সহর, থাকুক কলিকাতায় হাজার রাস্তা ঘাট, সে সমস্ত সহর ঘুরিয়া দেখিবে।

কিন্তু সে অবিলম্বেই অনুসন্ধান আরম্ভ করিতে পারিল না। তাহার বিশ্বাস হইয়াছিল দিনের বেলায় অনুসন্ধান করিয়া সে সুমতিকে বাহির করিতে পারিবে না। তাহার সেই দিদি—তাহার সেই আদরের ধন কি এই কলিকাতা সহরে দিনের বেলায়, এত লোকের মধ্যে বাহির হইতে পারে ? সুমতির অনুসন্ধান করিতে হইলে রাত্রিকালেই বাহির হইতে হইবে। কিন্তু এক বিপদ। সে যে রাস্তা চিনিয়া বাসায় আসিতে পারিবে না। ইহারই মধ্যে দুইদিন সে পথ হারা হইয়াছিল ; শেষে অনেক কষ্টে বাসায় আসিয়াছিল। দিনের বেলাতেই যদি পথ হারাইতে হয় তাহা হইলে রাত্রিকালে যে সে পদে পদে পথ হারা হইবে, তাহার উপায় কি ? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে স্থির করিল যে, আপাততঃ কয়েকদিন সে কলিকাতার বড় বড় রাস্তাগুলি চিনিয়া লইবে, তাহার পর গলির মধ্যে গেলেও সে যে কোন প্রকারে পরিচিত বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িতেই পারিবে। এই ভাবিয়া সে মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলেজষ্ট্রীট, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, চিৎপুর রোড, গঙ্গার ধারের রাস্তা প্রভৃতিতে প্রতিদিন দিবাভাগে যাতায়াত আরম্ভ করিল।

তাহার বিশ্বাস ছিল, এই সকল বড় রাস্তায় কোনদিন সুমতি বাহির হইবে না। যে এতকাল পল্লীগ্রামে প্রতিপালিত হইয়াছে সে কি এত বড় সহরের বড় বড় রাস্তায় কখন চলিতে পারে? সুমতি নিশ্চয়ই কোন গলির মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে। তাহার পর তাহার সেই গল্পের কথা! সে সেকথাত ভুলিতে পারে নাই। সুমতি গঙ্গার ধারে কোন গলির মধ্যে বাস করিতেছে এ বিশ্বাস তাহার মনে দৃঢ় হইয়াছিল। কিন্তু রাত্রিকালে অখিল মিস্ত্রীর লেন হইতে গঙ্গার ধারে যাওয়া বড় সহজ কথা নহে; আর যদিও বা যাওয়া যায়, তবু গঙ্গার ধারের গলিগুলির মধ্য হইতে বাহির হইয়া রাত্রিতে অখিল মিস্ত্রীর লেনে ফিরিয়া আসা তাহার পক্ষে বড় সহজসাধ্য হইবে না। দুই তিন দিন এ পথ ওপথ ঘুরিয়া শেষে সে স্থির করিল যে, চিৎপুর রাস্তাটা আগা-গোড়া তাহাকে চিনিয়া লইতে হইবে; তাহা হইলে গঙ্গার ধারের পথ আর তাহার ভুল হইবে না। এই স্থির করিয়া তিন চারিদিন মধ্যাহ্নে আহারের পর সে বরাবর চিৎপুর রোডে চলিয়া যাইত এবং সেখান হইতে যে যে পথে গঙ্গার ধারে যাওয়া যায় সেই সকল পথে গঙ্গার ধারে যাইত এবং ফিরিয়া আসিত। এদিকে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাসায় না আসিলে নরেশ বাবুর আহারা-দির কষ্ট হইবে সে চিন্তাও তাহার ছিল। তাই সে সন্ধ্যার মধ্যেই বাসায় ফিরিত।

এইভাবে আট দশদিন গেল। বিশ্বনাথ এ কয়দিন প্রত্যহ গড়ে চারি পাঁচ ক্রোশ পথ হাঁটিত এবং সন্ধ্যার সময় ক্লান্তপদে বাসায় ফিরিত। রাত্রিতে আহারাদির পর একবার সুলোচনাকে না দেখিয়া সে থাকিতে পারিত না। নরেশ বাবু বলিতেন "বিশু! সারাদিন পথে পথে হাঁটিয়া বেড়াইয়া আর লাভ কি? সে আশা ছাড়িয়া দেও।" বিশ্বনাথ সে কথায় কর্ণপাতও করিত না। নরেশ বাবু যখন তাহাকে উপদেশ দিতে অগ্রসর হইতেন তখন সে ধীরে ধীরে বাসা হইতে বাহির হইয়া সুলোচনার নিকটে যাইত। সুলোচনাও প্রতি রাত্রিতে পথের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। তাঁহার মনে হইত, আজ হয়ত বিশু দাদা সুমতিকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার বাসায় উপস্থিত হইবে। কিন্তু রাত্রি আটটা নটার সময় যখন বিশ্বনাথ সুলোচনার গৃহে প্রবেশ করিত, তখন নিরাশায় সুলোচনার বুক ভাঙ্গিয়া যাইত। তিনি নিতান্ত কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করিতেন "বিশু দাদা আজ কোন্ দিক গিয়া-ছিলে? কোন খবর পেলে কি?" বিশু দাদা মাথা নাড়িয়া বলিত "দিদি ঠাকরুণ, আজও খোঁজ আরম্ভ করিতে পারি নাই। এখনও যে পথ ঘাট চিনিয়া লইতে পারি নাই। আর দুই চারিদিন গেলেই আমি রাত্রিকালে বাহির হইতে পারিব।"



তাহার পর অনেকক্ষণ দুইজনে কথাবার্ত্তা হইত। বিশ্বনাথ সুলোচনাকে দুই চারিটী গান শুনাইয়া গভীর রাত্রিতে বাসায় যাইবার জন্য বাহির হইত। তাহার প্রাণের মধ্যে যে আগুন জ্বলিয়াছিল তাহার তেজে বিশ্বনাথের বুক পুড়িয়া যাইত। সে পথে যাইতে যাইতে গলা ছাড়িয়া মেঠো সুরে গান ধরিত—

"আসার আশায় দীন দরদি! আমি আর কত দিন রবো।"

গভীর রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া অখিল মিস্ত্রীর লেনের মধ্য দিয়া যখন সে হৃদয়ভেদী নিরাশার সুরে এই গান গাহিয়া চলিয়া যাইত তখন—এত রাত্রিতেও রাস্তার পার্শ্বের দুই চারিখানি বাড়ী হইতে দুই চারিটী রমণী মুখ বাড়াইয়া তাহার এই গান শুনিত; দুই একজন ডাকিয়া বলিত "ও ভিখিরি! আমাদের বাড়ীতে গানটা গেয়ে যাও।" বিশ্বনাথ সে কথা শুনিয়াও শুনিত না—সে নিজের মনে গাইয়া যাইত—

"আসার আশায় দীন দরদি! আমি আর কত দিন রবো।"

ক্রমশঃ—শ্রীজলধর সেন।

---

## "অমিল"

জাগি আজি বিশ্বপটে, প্রকৃতি সুন্দরী,
ছন্দোবন্ধে শোভিতেছে কবিতার সম।
কি সৌন্দর্য্য, কি মাধুরী, ঢলে অঙ্গ ভরি,
"বর্ণে বর্ণে তালে তালে লাস্য মনোরম।
রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সুষমা বিকাশে,
কত অলঙ্কারে তুমি রয়েছো ভূষিয়া।
কূজনে, সঙ্গীতে মন্দ্রে. নানা অনুপ্রাসে
করিতেছ মধুবৃষ্টি শ্রবণে পশিয়া।
ফুলে, ফুলে নারীনরে, বিটপী লতায়—
লহরে, লহরে, কিবা নীহারে নীহারে,
কি সুন্দর, মিল আহা সিন্ধু জ্যোছনায়।
জগৎ উঠেছে মাতি মিলন ঝঙ্কারে।
এক পংক্তি ছন্দোবন্ধ, রস মিল হীন,
আমি শুধু এ সৌন্দর্য্য করেছি মলিন।

শ্রীকালিদাস রায়।

# গ্রন্থ-সমালোচনা।

১। আনন্দময়ী, ৺রজনীকান্ত সেন প্রণীত, মূল্য ছয় আনা।

গ্রন্থখানি শুধু আমরা পড়িয়াই নিশ্চিন্ত হইব না, শুধু ইহার ভক্তিরসে উচ্ছল কবিতাগুলি উপভোগ ও সাহিত্য-ক্ষেত্রে ইহার আসন নির্দ্দেশ করিয়া আমরা ক্ষান্ত হইব না; গ্রন্থখানি প্রত্যেক বাঙ্গালীর সাদরে তুলিয়া রাখা উচিত, ইহা দেখিবার জিনিস, দেখাইবার জিনিস, মৃত্যুর বিভীষিকা দেখিতে দেখিতে অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও সাধক কতদূর চিত্ত সংযত করিয়া রাখিতে পারে, পার্থিব শত দুঃখ জ্বালার মধ্য দিয়া ভক্তের প্রাণ কত সরলতার সহিত ভগবানের প্রতি ধাবিত হয়, গ্রন্থখানি তাহারি অপূর্ব্ব উদাহরণ। ইহাতে পুরাতন রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতির নূতন সংস্করণ দেখিতে পাই।

যশোদা শ্রীকৃষ্ণ, মেনকা গৌরী প্রভৃতি কল্পনার সত্য আছে কিনা তাহার মীমাংসার প্রয়োজন নাই। তবে ইহাতে যে একটা চিরন্তন মাধুর্য্য আছে, তাহা কোনোমতেই অস্বীকার করা যায় না; এই মাধুর্য্য উক্ত কল্পনা গুলিতে সত্যের আরোপ করিয়াছে; রজনীকান্তের "আনন্দময়ী" সে সত্যকে ক্ষুণ্ণ হইতে দেয় নাই। ইহার অধিকাংশ গানে মাতৃহৃদয়ের বাৎসল্য ও স্নেহ প্রবলতা বর্ত্তমান, অনেক স্থলে একদিকে শরৎসমাগমে দেবীর পূর্ণোজ্জ্বল পিতৃগৃহের হাস্যোৎফুল্ল মূর্ত্তিখানি, আর একদিকে মাতার স্নেহনিস্যন্দিনী দৃষ্টি চক্ষুর সম্মুখে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

আশা করি, "আনন্দময়ী" বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে, ভক্তিপ্রাণা গৃহাঙ্গনা ও ভক্ত পাঠকের মনোরঞ্জন করিবে।

২। ঘরের কথা (গল্প গুচ্ছ), শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, ৪৭ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট বাণী পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য, মূল্য বারো আনা।

ফকির বাবুর গল্পের সহিত "মানসীর" পাঠকগণ একেবারে অপরিচিত নন। তাঁহার গল্পগুলিতে নূতনত্ব আছে, আজ কালকার অনেক অসার, দুর্নীতিমূলক গল্পের অপেক্ষা "ঘরের কথার" গল্পগুলির স্থান উচ্চে, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় একটি অনতীদীর্ঘ ভূমিকা লিখিয়া গ্রন্থখানির সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করিয়াছেন। ঘরের কথাই গ্রন্থখানির প্রধান অবলম্বন। পোষ্ট পিয়ন প্রিয়নাথের চিঠি বিলানোর সুখ, কল্যাণীর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনের ক্রম পরিবর্ত্তন সুন্দর ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। লেখক emotion এর প্রাচুর্য্য ও আভ্যন্তরীণ নীতির প্রতি সমান দৃষ্টি রাখিয়াছেন। "বেশ-বিভ্রাট", "মিলন" প্রভৃতি গল্পে বেশ একটু শিক্ষা আছে। "কৃপনের শাস্তি" হাস্যরসাত্মক। মোটের উপর গল্পগুলি চিত্তাকর্ষক, পড়িলে সময় বৃথা যাইবে না। আমরা গ্রন্থকারের নূতন উদ্যমকে সাদরে আহ্বান করিতেছি।

বইখানির ছাপা কাগজ ভাল। ছাপার ভুলও খুব কম।

---



তীর্থরেণু—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত, প্রকাশক শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। ২২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসে প্রাপ্তব্য, মূল্য এক টাকা।

গ্রন্থখানি কতকগুলি কবিতার সমষ্টি, সবগুলিই অনুবাদ। নানা দেশের ভাব সরস সহজ ভাষায় জীবন্ত রাখিয়া কবি বাস্তবিকই বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি বিধান করিতেছেন। বিদেশের জিনিসকে ঘরের জিনিস করিয়া আনা বড় সহজ কথা নয়। সত্যেন্দ্র বাবুর এ শক্তি আছে। তাঁহার রচনাগুলি কেবল অনুবাদ নয়, স্থানে স্থানে সেগুলিকে এক একটী নূতন কাব্য বলা যায়। মূলকে অবলম্বন করিয়া এক একস্থানে লেখক আপনার উন্নত কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। মোটের উপর সত্যেন্দ্র বাবুর কবিতাগুলি শুধু অনুবাদ বলিয়া পড়িলে চলিবে না, অনুবাদ হিসাবে পড়িতে গেলে পাঠককে স্থানে স্থানে নিতান্ত হতাশ হইতে হইবে। এগুলি মৌলিক রচনার মতই বঙ্গভাষার সম্পত্তি। বেদ ও উপনিষদ হইতে যে অংশগুলি অনুদিত হইয়াছে, অনুবাদেও তাহার গাম্ভীর্য্য ও সরসতা বর্ত্তমান।

বইখানির ছাপা ও কাগজ ভাল, বহিরবয়বও সুন্দর।

মাধবী—শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ প্রণীত। মানসী আফিস ও ২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, মজুমদার লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। মূল্য আট আনা।

গ্রন্থখানি কতকগুলি কবিতার সমষ্টি। স্থানে স্থানে প্রকৃত কবিত্বরস পাওয়া যায়। লেখক নবীন, আমরা তাঁহাকে আদরে সাহিত্য-ক্ষেত্রে আহ্বান করিতেছি। বইখানির সর্ব্বত্র হৃদয়ের উচ্ছ্বসিতভাবের সহিত কবিত্বের অল্পবিস্তর সংমিশ্রণ আছে। ভাব উচ্ছল হওয়াতেই স্থানে স্থানে কবির প্রলাপের উদাহরণও পাওয়া যায়। এখন এক ভাব, একটু পরে একেবারে ভিন্ন ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে গ্রন্থখানির কবিতাগুলি কৃতিত্বের সহিত সাজানো হয় নাই। গ্রন্থকার এক সময়ে কাব্য সাহিত্যে খ্যাতিলাভ করিতে পারিবেন। কতকগুলি কবিতা 'কবে', 'কেন আসি' প্রভৃতি আমাদের ভালই লাগিয়াছে।

'মাধবী'র বাহিরের আকৃতি ভাল। ছাপা আরো ভাল হওয়া উচিত ছিল।

দারজিলিং—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র দোবে প্রণীত, মূল্য দুই টাকা ছয় আনা। সুন্দর আর্ট কাগজে মনোরম ছাপা, অনেকগুলি বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত ও বহুসংখ্যক হাফ্‌টোন চিত্র দ্বারা পরিশোভিত। সত্য বলিতে কি, পুস্তকখানির বহিরবয়ব যেমন সুন্দর, অভ্যন্তরও তেমনি চিত্তাকর্ষক। গ্রন্থখানি হাতে করিলে মনে আনন্দ হয়, কেননা এরূপ পুস্তক বাঙ্গালা গ্রন্থরাজির মধ্যে নূতন। ইহার মূল্য তুলনায় যৎসামান্য। "সেই বিহগ-কাকলী-মুখরিত, কুসুম-সুবাসিত, রমণীয় কুঞ্জের ভিতর দিয়া পর্ব্বত প্রদেশের উন্মুক্ত বায়ু সেবন করিতে করিতে ভ্রমণ করিলে মন যেরূপ প্রফুল্ল হয়" এই গ্রন্থখানি পড়িলেও সেইরূপ আনন্দ হইয়া থাকে।

এই গ্রন্থ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ। সুললিত সরস ভাষায় লিখিত বর্ণনাগুলি বেশ সুন্দর, হৃদয়গ্রাহী ও সুখপাঠ্য হইয়াছে, গ্রন্থখানি উপন্যাসের মত—পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না। আশা করি বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে ইহার আদর হইবে।

## মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

সাহিত্য, ভাদ্র। শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের "ধীমানের ভাস্কর্য্য" উল্লেখযোগ্য রচনা। শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের "স্বায়ত্ত শাসনের সুখ" মন্দ হয় নাই, মাঝে মাঝে হাস্যরসটুকু বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। "কালিদাস ও ভবভূতি" প্রবন্ধে শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় রাম ও দুষ্মন্তের চরিত্র লইয়া কালিদাস ও ভবভূতির পরস্পর পার্থক্যটুকু দেখাইতে গিয়াছেন। ভবভূতির উত্তর চরিতের সমালোচনাই রচনার অনেকটা অংশ অধিকার করিয়াছে। মালতীমাধবের গোড়ায় যে সকল সমালোচকের প্রতি লক্ষ করিয়া ভবভূতি দু' একটি কথা বলিয়াছেন, রায় মহাশয় বোধ হয় তাঁহাদের দলে নন, তিনি ভবভূতির "সমানধর্ম্মা" অথবা "মূদ্ধি বর্ত্ততে"। শেষের কথাই ঠিক, ব্যাস বাল্মীকির আসনও টলিয়াছে। বঙ্কিম বাবুর "উত্তরচরিতের" শুধু সারাংশ অবলম্বন না করিয়া তাহার নম্র সুরটুকু পর্য্যন্ত বজায় রাখিলে বোধ হয় মানহানি হইত না, এত বাচালতাও প্রকাশ পাইত না। দুই একটা কথা লইয়া বিশেষ আলোচনা করিতাম, কিন্তু স্থান ও সময় দুয়েরি অভাব। "গৌড়ীয় নৌ-শিল্প" বিবিধ তথ্যে পূর্ণ। "বিদেশী গল্প" অনুবাদ। "হিমারণ্য" চলিতেছে। শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয়ের "আহ্বান" শীর্ষক কবিতাটিতে গভীর ভাব নিহিত আছে। "সহযোগী সাহিত্যে" দুয়েকটি ঐতিহাসিক কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। "ভারতীয় চিত্রকলা" শ্রীসুরেশ সমাজপতি মহাশয়ের রচনা; যদি কেহ গালাগালি শিখিতে চান, কেমন করিয়া ভদ্রলোকদের অপভাষায় লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিতে হয়, তাহা যদি জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁদের ঐ প্রবন্ধ পড়া উচিত। লোকে এক একটা বিষয় আলোচনা করিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করে, কিন্তু সুরেশ বাবু গালাগালি দিয়া নিজেকে জাহির করিয়াছেন। মন্দ ব্যবসায় নয়! হায় বঙ্গভাষা, হায়রে বঙ্গসাহিত্য! পুরাতন আড্ডাধারীদের কথা সাহিত্যে লিপিবদ্ধ করিয়া, দু একটি ছাপার ভুল ধরিয়া লেখককে নীচ কটুকথা বলিয়া আর হাততালি পাওয়া যায় কি? নাক তুলিয়া পরকে বিদ্রূপ করিলেই বড় হওয়া যায় না। পরকে "ছোট" "কূপমণ্ডূক" বলিবার পূর্ব্বে একবার নিজের দিকে চাওয়া ভাল। কবিতা বুঝি আর নাই বুঝি, রবিবাবুর "বিপুল নীড়ে" কথাটির ভাব গ্রহণ করিতে পারি আর নাই পারি, নাক না তুলিলে যে সম্পাদকীয় গাম্ভীর্য্য থাকে না। হায়! কাব্যচর্চ্চাও সাহিত্য-সম্পাদকের বিড়ম্বনা। "বৈদ্যনাথের গরু" "হানুকরণ" "মহীরাবণের বেটা অহিরাবণ" "পশ্চাদ্ভাগ দেখহ" এ সমস্ত "সুরেশচন্দ্রী" প্রয়োগে কাণ ঝালাপালা হইয়াছে। নূতন লেখক হইলেই তিনি মহিরাবণের বেটা অহিরাবণ হইবেন, আর নিজেরা যে ভস্মলোচন হইয়া মহাকবিদের কাব্যগুলি পোড়াইবার সাজসরঞ্জাম করিতেছেন, তাহার উপায় কি? নিজেদের লেখাগুলি চোখের সামনে ধরিয়া দিলে দর্পনাস্ত্রের কাজ হয় না কি? সম্পাদক মহাশয় সংযত হইয়া দিন কতক সমালোচনা শিক্ষা করুন! এখন আর মিথ্যা বাগাড়ম্বর সাজে কি?

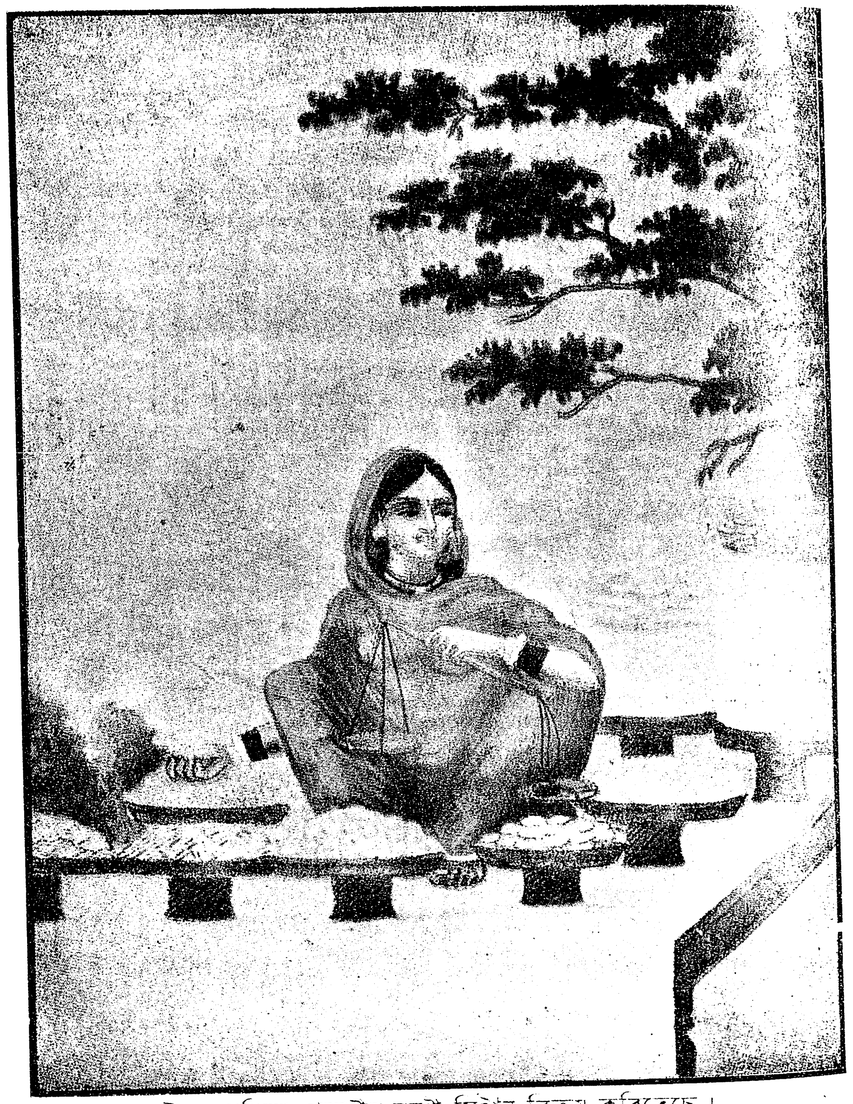

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশীয় রমণী মিষ্টান্ন বিক্রয় করিতেছে।

Blocks by G. N. Mukherji, Pro. Mohila Press.

Mohila Press Co.

# মানসী

দ্বিতীয় ভাগ ] পৌষ ১৩১৭ সাল। [১১শ সংখ্যা।

## বিশুদাদা।

(১০)

পাঁচ সাত দিন পথে পথে বেড়াইয়া বিশ্বনাথ কলিকাতার কয়েকটী বড় রাস্তা বেশ চিনিয়া লইল। তখন তাহার ভরসা হইল যে, এখন অপরিচিত গলি পথে প্রবেশ করিলে সে পথ হারাইবে না, যে প্রকারে হউক কোন একটা বড় রাস্তায় উপস্থিত হইতেই পারিবে। সুতরাং আর কালবিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই।

এখন বিশ্বনাথ প্রত্যহ রাত্রি আটটার পর বাসা হইতে বাহির হয়। অখিলমিস্ত্রির লেন হইতে বাহির হইয়াই সে মৃজাপুর ষ্ট্রীট, কলুটোলা ষ্ট্রীট, মুর্গীহাটা, ক্যানিংষ্ট্রীট দিয়া একেবারে গঙ্গার তীরে উপস্থিত হয়। সে স্থির করিয়াছে প্রথমে সে গঙ্গার তীরে যে সমস্ত স্থান তাহাই অনুসন্ধান করিবে, তাহার পর অন্যকথা;—তাহার বিশ্বাস গঙ্গাতীর অঞ্চলেই সুমতিকে সে পাইবে।

ক্যানিংষ্ট্রীট দিয়া যেখানে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হওয়া যায় সন্ধ্যার পর সেদিকে লোকের বড় একটা গতিবিধি থাকে না, সে অঞ্চলে দোকান আফিস প্রভৃতি ব্যতীত বাসা বা বসতবাড়ী মোটেই নাই, সুতরাং বিশ্বনাথকে গঙ্গার তীর ধরিয়া বরাবর নিমতলা ঘাট পর্য্যন্ত আসিতে হয়; তাহার পর সে দক্ষিণ পার্শ্বের কোন গলিতে প্রবেশ করে।

তিন চারিদিন সে এই ভাবেই যাতায়াত করিল; কিন্তু তাহার অভীষ্ট ফললাভের কোন সম্ভাবনাই দেখিল না। তখন সে রাস্তা পরিবর্ত্তন করিল।

সে তখন প্রথমেই একেবারে বাগবাজারের খালের ধারে আসিত, তাহার পর গঙ্গার তীরের দিকে অগ্রসর হইত।

বিশ্বনাথ খুব সুকণ্ঠ না হইলেও সে বেশ গলা ছাড়িয়া গান করিতে পারিত এবং যাহা সে গান করিত তাহাতে সে প্রাণ মন ঢালিয়া দিত। এই কারনেই তাহার গান শুনিতে বড়ই মিষ্ট লাগিত। পাড়াগাঁয়ে বাস, কাহারও নিকট গান শিখিবার সুবিধাও তাহার কোন দিন হয় নাই। বৈষ্ণব ভিখারী বা গ্রামের দুই চারিজনের মুখে যে সমস্ত গান শুনিয়াছিল, তাহারই গোটাকয়েক সে জানিত। সে সকলই দেহতত্ত্বের গান ও শ্যামা সংগীত। এখন সেই গানগুলি তাহার বড়ই কাজে লাগিল।

বিশ্বনাথ স্থির করিল, সমস্ত পথই গান করা তাহার সাধ্যে কুলাইবে না। যেখানে দেখিবে গৃহস্থপল্লী বা বস্তি, সেইখানেই সে গান করিবে; বড় রাস্তায় গান করিবে না। সে আরও একটা কথা স্থির করিয়াছিল, গঙ্গা দর্শন করিবার পর সে গান আরম্ভ করিবে। তাহার বিশ্বাস মা গঙ্গা কৃপা করিয়া তাহার সহায় না হইলে সে এই প্রকাণ্ড সহরের মধ্য হইতে তাহার দিদিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে না। তাই সে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইত। প্রণাম করিয়া আগে সেই কলুষনাশিনী জাহ্নবীকে একটা গান শুনাইত; তাহার পর সেই গান ধরিয়াই সে কোন গলির মধ্যে প্রবেশ করিত।

সেই সময়ে কোন ব্যক্তি যে কোন দিন রাত্রি নয়টার সময় বাগবাজার অঞ্চলে গঙ্গার তীরে উপস্থিত হইলে দেখিতে পাইত মাথায় চাদর বাঁধা, যষ্টি হস্তে একটী পুরুষ সমস্ত প্রাণ মন ঢালিয়া দিয়া গান করিতেছে—

আজ আমার এই নিবেদন, লজ্জাবারণ
কর মা লজ্জারূপিনী।
মা তোমার যে নাম জপে, হৃদয় কূপে,
নিরজনে যোগী মুনি;
সেই নাম আজ দশের মাঝে, এমন সাজে,
গাইতে এলাম ও জননী।
কাঙ্গালের গেছে সজ্জা, লোকলজ্জা,
ঐ নামে পাগল দিন রজনী;
নামে না হয় কলঙ্ক, এই আতঙ্ক,
দেখিস আতঙ্কবারিণী।



প্রাণের আবেগে বাউলের সুরে বিশ্বনাথ যখন গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া যুক্তকরে এই গান গায়িত তখন মনে হইত মা গঙ্গা বুঝি স্তব্ধ হইয়া সাধকের এই প্রাণের প্রার্থনা শুনিতেছেন, তখন মনে হইত গঙ্গাতীরের গগন পবন যেন এই পবিত্রহৃদয় গায়কের কণ্ঠস্বরে পূর্ণ হইয়া যাইতেছে।

গান শেষ হইলে বিশ্বনাথ ভক্তিভরে মা গঙ্গাকে প্রণাম করিয়া বলিত, "মা, দেখিস। সন্তানের মুখ রাখিস্ মা! তোর কাছে আর কিছুই চাই না মা! তার সর্ব্বাঙ্গের ধূলা ঝেড়ে আমি একবার তাকে কোলে করি! পতিত পাবনি! পতিতকে উদ্ধার করিস্ মা!"

(১১)

পাড়ার মধ্যে প্রবেশ করিয়াই প্রতি রাত্রিতে প্রথমেই সে গাইত—

সারা বরষ দেখিনি মা! মা তুই আমার কেমন ধারা।
নয়নতারা হারিয়ে আমার অন্ধ হোলো নয়ন তারা।
এলি কি পাষানী ওরে, দেখবো তোরে আঁখি ভোরে,
কিছুতেই থামেনা যে মা, পোড়া এ নয়নের ধারা।

কত গৃহস্থের মেয়ে এই গান শুনিয়া দ্বারের নিকট আসিয়া ভিখারীকে পয়সা চাউল দিতে চাহিত। বিশ্বনাথ বলিত, "মা সকল, আমি পয়সার ভিখারী নই। তোমাদের মঙ্গল হউক। আশীর্ব্বাদ কর মা! আমার যেন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।"

ভিখারীর কথা শুনিয়া হয় ত কোন বর্ষিয়সী বলিতেন "তা হবে বাবা, তা হবে! মা দুর্গা তোমার মঙ্গল করবেন। আর একটা গাওনা বাবা?"

বিশ্বনাথ তখন গান ধরিত—

মায়ের এমনি বিচার বটে।
যেজন দিবানিশি দুর্গা বলে,
তারই কপালে বিপদ ঘটে।

হুজুরেতে আরজী দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি করপুটে;
কবে আদালত শুনানি হবে, নিস্তার পাব এ সঙ্কটে।

বিশ্বনাথ চারিদিকে চাহিয়া দেখিত; যাহার জন্য সে আজ ফকির, যাহার উদ্দেশে সে আজ রাত ভিখারী, তাহাকে সে দেখিতে পাইত না। তখন দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে বলিত "যাই মা, রাত হোলো, অনেকদূর যেতে

হবে। আর একদিন এসে গান শুনিয়ে যাবো।" এই বলিয়া সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইত। দূর হইতেও শুনিতে পাওয়া যাইত ভিখারী গায়িতেছে,

"মায়ের এম্‌নি বিচার বটে!"

এমনই করিয়া সপ্তাহকাল কাটিয়া গেল। প্রতিদিন রাত্রি আটটার পরে সে বাসা হইতে বাহির হয়, আর রাত্রি এগারটা বারটার সময় ক্লান্তপদে নিরাশ হৃদয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে অখিলমিস্ত্রির লেনের বাসায় ফিরিয়া আসে।

এদিকে বিশ্বনাথ যতক্ষণ ফিরিয়া না আসে সুলোচনা ততক্ষণ নিদ্রা যাইতে পারেন না। সমস্ত কাজকর্ম্ম শেষ হইলে তিনি শয়ন ঘরের রাস্তার দিকের জানালা খুলিয়া পথের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকেন। তাঁহার মনে হয় আজ হয়ত বিশুদাদা সুমতিকে সঙ্গে লইয়া আসিবে। বিশ্বনাথও প্রতি রাত্রিতে সুলোচনার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া বাসায় যায় না। সতীশের বাসার নিকটে আসিয়াই প্রতি রাত্রিতে বিশ্বনাথ গান ধরে—

আশার আশায় দীন দরদি! আমি আর কতদিন রবো।

এই গান শুনিয়াই সুলোচনা বুঝিতে পারেন বিশ্বনাথ আজ নিরাশ হৃদয়ে ফিরিয়া আসিয়াছে। সুলোচনা নিজেই নীচে যাইয়া দ্বার খুলিয়া দিয়া বিশ্বনাথকে শয়ন ঘরে লইয়া আসেন এবং সেদিন সে কোথায় গিয়াছিল, কি দেখিয়াছিল, কে কি বলিয়াছিল, সমস্ত কথা একটী একটী করিয়া জিজ্ঞাসা করেন। কোনদিন হয়ত সতীশ সেখানে উপস্থিত থাকে, কোন দিন হয় ত তখনও সে নীচের বৈঠকখানা হইতে উপরে আসে না। যেদিন সতীশের সহিত বিশ্বনাথের দেখা হয়, সেদিন সতীশ বিশ্বনাথকে ক্লান্ত ও মর্ম্মপীড়িত দেখিয়া বড়ই কষ্ট অনুভব করে। সে বলে "বিশুদাদা, তুমি অসাধ্য সাধনে হাত দিয়াছ। এমন করিয়া কতদিন পথে পথে বেড়াইবে। এই প্রকাণ্ড কলিকাতা সহরের কোথায় তুমি সুমতির খোঁজ পাইবে। আর সুমতি যে কলিকাতাতেই আছে তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? কেন মিছে কষ্ট পাও বিশুদাদা! তার আশা কি তুমি ছাড়তে পার না। সে যদি আমাদেরই হোতো তা হোলে কি সে এমন কোরে কোথা যেতে পারে? তা হোলে কি সে এতদিন এমন কোরে থাক্‌তে পারে? তুমি আর বৃথা কষ্ট কোরো না। যা হবার হোয়ে গেছে। মনে কর না কেন যে, সে এ জগতে নেই; তা হোলেই ত সব মিটে যায়। এমন কোরে পথে পথে ঘুরে তুমিই বা কষ্ট



পাও কেন, কাকাকেই বা কষ্ট দেও কেন? তোমার জন্যই ত তিনি সুমতিকে ভুলতে পারছেন না।"

বিশ্বনাথ নীরবে সতীশের কথাগুলি শুনিয়া যায়। শেষে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলে "দেখ, যতদিন আমার এদেহে প্রাণ আছে, ততদিন আমি তাকে দেখবার আশা ছাড়বো না। যে কয়দিন আমার পায়ে বল আছে, সে কয়দিন আমি পথে পথে বেড়াব। তুমি কি বুঝবে ভাই! দিদি আমার কত আদরের ধন! আমি তাকে যে কোলে পিঠে কোরে মানুষ কোরেছি! সেই যেন আমাদের বাঁধন ছিঁড়ে পালিয়েছে, আমার যে ছেঁড়েনি ভাই! আমি যে এখন তাকে সকল সময় চোখের সামনে দেখতে পাই। আমার জন্যে ভেবো না ভাই! আমি সব কষ্ট সহ্য কোরতে পারবো; কিন্তু সে যে কাতর হোয়ে চারদিক অন্ধকার দেখছে——"

বিশ্বনাথের আর কথা বাহির হইত না; চোখের জলে তাহার বুক ভাসিয়া যাইত। এমনই ঘটনা প্রায়ই হইত। বিশ্বনাথের কথা শুনিয়া সুলোচনাও কাঁদিয়া ফেলিতেন; দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতেন "যাও বিশু দাদা। বাসায় যাও। কাকা বাবু হয়ত এখনও বসিয়া আছেন।"

বিশ্বনাথ তখন সতীশের বাসা ত্যাগ করিয়া নিজের বাসায় যাইত। এইভাবে প্রায় দেড়মাস কাটিয়া গেল।

(১২)

আজ ভবেশের পরীক্ষার ফল বাহির হইবে। প্রাতঃকালেই ভবেশকে ডাকিয়া সতীশ বলিল "আজ তোমার পরীক্ষার ফল বাহির হইবে। আমি কোর্ট হইতে ফিরিবার সময় তোমার ফল জানিয়া আসিব। সিনেট হাউসে আজ যে ভিড় হইবে তাহাতে তুমি সেখানে যাইয়া কিছুই জানিতে পারিবে না। আজ শনিবার, আমি একটার মধ্যেই কোর্ট হইতে বাহির হইব। তুমি বাসাতেই থাকিও। আমি আসিয়া সংবাদ দিব।'

ভবেশ কিন্তু সতীশের কথামত বাসায় বসিয়া থাকিতে পারিল না; সে বেলা বারটার সময়ই সিনেট হলের সম্মুখে গেল। সেখানে লোকারণ্য; কাহার সাধ্য অগ্রসর হয়। ভবেশ পল্লীগ্রামের বালক, সে অগ্রসর হইতেই সাহসী হইল না। সিনেট-হলের বারান্দার একপার্শ্বে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নরেশবাবু কিছুক্ষণ বাসাতেই অপেক্ষা করিলেন; অবশেষে তিনিও স্থির

থাকিতে পারিলেন না, বিশ্বনাথকে সঙ্গে লইয়া সিনেটহলের সম্মুখে গেলেন। তিনি দেখিলেন যে, ভিতর হইতে সংবাদ পাওয়া ব্যতীত বাহিরে দাঁড়াইয়া কোনই ফল নাই। তাঁহার পরিচিত এমন কেহই নাই যে, তাঁহাকে অনুরোধ করেন। ভবেশ নরেশবাবুকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল "বাবা ওখানে গিয়ে কোনই ফল হবে না ; এস আমরা গোলদিঘীতে দাঁড়াইয়া থাকি। সতীশদাদা এখনই আসিবেন ; তিনি খবর আনিতে পারিবেন।" তাঁহারা তিন জনেই তখন গোলদিঘীর ধারে যাইয়া একটা বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন।

ভবেশ সেখানে বসিয়া পথের দিকেই চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরেই সে দেখিল যে, সতীশ একখানি ট্রাম হইতে লাগিল। ভবেশ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল" বাবা, ঐ দেখ সতীশদাদা, দাদাকে ডাকবো," নরেশবাবু বলিলেন "না, ওকে ডেকে কাজ নাই। ও যখন বাহির হইবে তখন গেলেই হবে।"

সতীশের সহিত সিনেট আফিসের প্রধান বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর পরিচয় দিল। সৌভাগ্যক্রমে সেই সময়ে তিনি বাহিরের বারান্দায় আসিয়াছিলেন। সতীশকে দেখিয়াই বলিলেন "কি সতীশবাবু! এখানে যে। আপনার কেউ একজামিন দিয়াছে না কি?" সতীশ বলিলেন, "আমার ছোট ভাই একজামিন দিয়াছে; তার অদৃষ্টে কি হোয়েছে তাই জান্‌তে এসেছি।" "বেশ, বেশ, আসুন, ভিতরে আসুন।" এই বলিয়া তিনি সতীশকে ঘরের মধ্যে লইয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরেই সতীশ তাড়াতাড়ি সিনেট-হল হইতে বাহির হইয়া সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিলেন। ভবেশের দৃষ্টি সেই দিকেই ছিল। সতীশকে বাহির হইতে দেখিয়া ভবেশ নরেশবাবুকে বলিল "বাবা, সতীশদাদা ঐ নামিতেছেন।" এই কথা শুনিয়াই নরেশবাবু সতীশের দিকে অগ্রসর হইলেন ; ভবেশ ও বিশ্বনাথও তাঁহার সঙ্গে গেল। ভবেশ এক দৌড়ে সতীশের নিকট উপস্থিত হইল। সতীশ আনন্দে অধীর হইয়া ভবেশকে কোলের মধ্যে টানিয়া বলিলেন "ভবেশ, তুমি ফার্ষ্ট ডিবিসনে পাশ হইয়াছ।" তখনই তাহার দৃষ্টি নরেশবাবুর উপর পড়িল। সে বলিল "কাকাবাবু, ভবেশ ফার্ষ্ট ডিবিসনে পাশ হইয়াছে ; mathematicsএ সে সকলের অপেক্ষা অধিক নম্বর পাইয়াছে। যে রকম দেখিলাম ও শুনিলাম তাহাতে ভবেশ বোধ হয় competitionএ যাইবে।" নরেশবাবু এই কথা শুনিয়া আনন্দে অশ্রুজল



সংবরণ করিতে পারিলেন না ; ভবেশকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

বিশ্বনাথের আনন্দ দেখে কে! এত লোকের মধ্যে না হইলে সে ভবেশকে কোলে করিয়া নাচিত।

তখন চারি জনে বাসার দিকে আসিতে লাগিলেন। সতীশ বলিল, "কাকাবাবু, ভবেশকে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াইব। যত খরচ লাগে আমি দিব। ভগবান ওকে বাঁচাইয়া রাখুন।" নরেশবাবু কি বলিয়া সতীশকে আশীর্ব্বাদ করিবেন খুঁজিয়া পাইলেন না। তিনি নীরবে সতীশের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বাসার নিকট আসিয়া বিশ্বনাথ আর পশ্চাতে থাকিতে পারিল না, সে দ্রুতগতিতে এই সংবাদ সুলোচনাকে দিবার জন্য অগ্রসর হইল। সুলোচনাও দ্বিতলের জানালায় বসিয়া সকলের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। বিশ্বনাথ দ্বারের নিকটে আসিয়াই উপরের দিকে চাহিয়া চীৎকার পূর্ব্বক বলিল "দিদি ঠাকুরুণ, দাদা পাশ।"

বাসায় আনন্দের হাট বসিয়া গেল। সতীশ চাকরকে তখনই বাজারে পাঠাইলেন এবং বাড়ীর মধ্যে বলিয়া পাঠাইলেন, "আজ ভাল করিয়া খাওয়া দাওয়ার উদ্যোগ করা হউক। আজ আর নরেশ বাবু বাসায় যাইতে পারিবেন না।" নরেশবাবু সতীশের নিমন্ত্রণ পরমানন্দে গ্রহণ করিলেন। সতীশ তখন আরও তিন চারিটি বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য তাহার কেরাণীকে পাঠাইয়া দিল।

বিশ্বনাথ বাড়ীর মধ্য হইতে বাহিরে আসিয়া বলিল "কাকাবাবু, আজ আমার ছুটী।"

নরেশবাবু বলিলেন, "ছুটী কেন বিশ্বনাথ? তোমার ত সকল সময়ই ছুটী।"

বিশ্বনাথ বলিল, "আজ আমি সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ভিক্ষায় বাহির হইব।"

সতীশ। বিশু দাদা, আজ বাহির না হইলেই ভাল হয়। আজ ভাল করিয়া খাওয়া দাওয়ার আয়োজন কর। আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন।

সতীশের কথা শুনিয়া বিশ্বনাথের প্রাণের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল ; কিন্তু সে মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিতে পারিল না ; নরেশবাবু যদি সেখানে উপস্থিত না থাকিতেন তাহা হইলে সে মনের কথা সতীশকে বলিতে পারিত।

বিশ্বনাথকে হঠাৎ বিমর্ষ দেখিয়া সতীশ তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিল;—বুঝিতে পারিল যে, আজ এই আনন্দের দিনে সুমতির কথা তাহার প্রাণে বড়ই বাজিতেছে। সতীশ তখন বলিল, "তা বিশুদাদা, তোমার আজ ছুটীই হইল। কিন্তু দেখ, আজ বেশী রাত্রি করিও না। নটার মধ্যেই খাওয়ার আয়োজন শেষ হইবে। তুমি তাহার পূর্ব্বেই ফিরিয়া আসিও।"

নরেশবাবু বলিলেন, "বিশ্বনাথ, আজ কি না বাহির হইলেই নয়। কেন মিছে কষ্ট কর, বিশ্বনাথ!" তিনি আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। বিশ্বনাথ তাঁহার কথার কোন উত্তর না দিয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল।

সুলোচনা তখন বড়ই ব্যস্ত। চাকরকে বাজারের জিনিসের ফর্দ্দ করিয়া দিতেছেন, ঝিকে বাটনা বাটিবার উপদেশ দিতেছেন; বামুনঠাকুরকে কি কি রান্না হইবে তাহার কথা বুঝাইতেছেন। এমন সময় বিশ্বনাথ সেখানে উপস্থিত হইয়া ধীরে ধীরে বলিল, "দিদি ঠাকুরুণ, আজ আমার ছুটী।"

সুলোচনা। সে কি বিশুদাদা! আজ ছুটী কিসের? তুমি আজ আর কোথাও যেতে পারছো না। আমি একেলা মানুষ। তুমি এখনই মহেশের সঙ্গে বাজারে যাও। মাধববাবুর বাজারে কি আর সব জিনিস মিল্‌বে? সেই বৌবাজারে যেতে হবে। সেখান থেকে যা যা পাওয়া যায়, তুমি নিয়ে এসো; মহেশ এখন হগ সাহেবের বাজারে যাবে। সে একেলা ত সব দিক কোরে উঠ্‌তে পারবে না। বেশী রাত্রি হোলে বাবুদের কষ্ট হবে।"

বিশ্বনাথ তখন, ধীরে ধীরে বলিল, "তা হবে না দিদি ঠাকুরুণ, আজ আমাকে বেরুতেই হবে।"

বিশ্বনাথের এই কথা শুনিয়া সুলোচনা তাহার মুখের দিকে চাহিলেন; দেখিলেন বিশ্বনাথের চক্ষু জলে ভরিয়া গিয়াছে। সুলোচনার আর বুঝিতে বাকী রহিল না। আজ এই আনন্দের দিনে বিশ্বনাথের বুকে বড় ব্যথা বাজিয়াছে, আজ সে সুমতির অভাব বড়ই অনুভব করিতেছে।

সুলোচনা তখন বলিলেন, "বিশুদাদা, তুমি একটু বোসো; আমি মহেশকে বিদায় করি; ঝিকেই তার সঙ্গে বৌবাজার পর্য্যন্ত পাঠিয়ে দিই।" এই বলিয়া তিনি বাজার হাটের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন, বিশ্বনাথ বসিয়া বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল।

আজ তাহার হৃদয়ের মধ্য হইতে কে যেন বলিতেছে, "বিশ্বনাথ, আজ বাহির হও—আজ বসিয়া থাকিও না," এমন করিয়া এত দিনের মধ্যে কেহ



ত তাহাকে বাহিরে যাইতে বলে নাই,—এত দিনের মধ্যে কোন দিন ত এ ভাবে কেহ আশার বাণী তাহার কানে শুনায় নাই। আজ তবে এ কি? বিশ্বনাথ যেন দিব্যকর্ণে শুনিতে লাগিল "বাহির হও—বাহির হও," আত্মহারা হইয়া বিশ্বনাথ আজ এই দৈববাণী শুনিতে লাগিল।

সহসা "বিশুদাদা!" এই ডাক শুনিয়া তাহার জ্ঞানসঞ্চার হইল; সে সুলোচনার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল "কি, দিদি ঠাকুরুণ।"

সুলোচনা। কি ভাব্‌চো বিশুদাদা!

বিশ্বনাথ চারি দিকে চাহিয়া দেখিল ঘরের মধ্যে সুলোচনা ব্যতীত আর কেহ নাই। তখন সে বলিল "দিদি ঠাকুরুণ, আজ কে যেন আমাকে বোল্‌ছে বাহির হও—বাহির হও। আমার প্রাণের মধ্যে থেকে এমন কোরে কেউ কোন দিন ত কথা বলে নাই। আজ আমাকে যেন দুই হাতে কে ঠেলিয়া বাহির করিতে চাহিতেছে।" বিশ্বনাথ আর কথা বলিতে পারিল না।

সুলোচনা বলিলেন, "বিশুদাদা, আমি কি বুঝি বল। তবে আমার মনে হয়, আজ বুঝি দিদিকে তুমি দেখতে পাবে। যাও দাদা, এখনই যাও। হে মা দুর্গা, আজ যেন আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়—আজ যেন বিশুদাদা দিদিকে নিয়ে ঘরে ফিরিয়া আসে।" এই কথা বলিয়া সুলোচনা গলায় বস্ত্র দিয়া প্রণাম করিলেন। বিশ্বনাথও সেই দুর্গতিনাশিনী দুর্গাকে উদ্দেশে প্রণাম করিল।

সুলোচনা বলিলেন, "বিশুদাদা, একটু অপেক্ষা কর। আজ তোমাকে মিষ্টি মুখ করিয়ে দিই। আজ যেন তুমি মিষ্টি কথা নিয়ে ঘরে এসো।"

বিশ্বনাথ কাতর কণ্ঠে বলিল, "মা—জগদম্বার ইচ্ছা!"

( ১৩ )

সুলোচনার নিকট হইতে বিদায় হইয়া বাহিরে আসিলে নরেশ বাবু বলিলেন, "বিশ্বনাথ, চল একবার বাসায় যাই; একটু দরকার আছে।" বিশ্বনাথের আর বিলম্ব সহিতেছিল না; বেলা প্রায় অপরাহ্ণ—চারিটা বাজিয়া গিয়াছে। বিশ্বনাথ দ্বিরুক্তি করিতে পারিল না। নরেশবাবুর সহিত বাসায় যাইতে বাধ্য হইল।

বাসায় পৌঁছিয়া নরেশবাবু বলিলেন, "বিশ্বনাথ, তুমি একটু অপেক্ষা কর। আমি দুই খানি চিঠি লিখি। বাড়ী থেকে এসে অবধি আর কোথাও কোন সংবাদ দিই নাই। ভবেশের পাশের খপরটা সরকার দাদাকে ও হেডমাষ্টার বাবুকে না লেখা ভাল দেখায় না। কি বল, বিশ্বনাথ!"

বিশ্বনাথ নিতান্ত অনিচ্ছা ক্রমেই বলিল, "ত বটেই ত! তা কাকাবাবু,তুমি তাড়াতাড়ি চিঠি দুইখানা লিখে ফেল,আমি ততক্ষণ ঘরের কাজগুলো সেরে নিই।"

কতদিন পরে আজ নরেশবাবু বাড়ীতে পত্র লিখিতে বসিলেন। পত্র লিখিবেন কি—কলম হাতে করিয়া কত কথা ভাবিতে লাগিলেন। সেই তাঁর পল্লীভবন,—যেখানকার প্রত্যেক দ্রব্যের সহিত তাঁহার চিরজীবনের সম্বন্ধ—সেই সোণার গ্রাম, সেই সুখের সংসার—সেই আনন্দের হাট! হায়! আজ সে সব কোথায় গেল! আজ তিনি নির্ব্বাসিত। আজ নিজের জন্ম ভূমিতে তিনি যাইতে পারেন না। তাঁর সেই শৈশবের ক্রীড়াক্ষেত্র, যৌবনের আনন্দকানন কোথায় রহিয়াছে! আর তিনি আজ বিদেশে ঘৃণিত অভিশপ্ত জীবন যাপন করিতেছেন। তাঁহার মত হতভাগ্য কে আছে? তাঁহার সুখের সংসারে কে আগুন লাগাইয়া দিল? এত দিন পরে তাঁহার সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর কথা মনে হইল। কোন পাপে ভগবান তাঁহার অদৃষ্টে এত কষ্ট, এত দুঃখ লিখিয়াছেন? আজ ভবেশ পাশ হইয়াছে,—তাহার ভবিষ্যত জীবন উজ্জ্বল হইবে। কিন্তু আজ যদি তাহার স্নেহময়ী মাতা জীবিতা থাকিতেন,—আজ যদি সুমতি——? তিনি আর ভাবিতে পারিলেন না। এতদিনের অবরুদ্ধ অশ্রু আজ আর নিষেধ মানিল না। তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, তিনি বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন। যে মর্ম্মভেদী যন্ত্রণাকে তিনি বুকের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়াছিলেন, আজ তাহা পাষাণ বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইল।

বিশ্বনাথ একটু পরেই বাহিরে আসিয়া দেখে নরেশ বাবু বালকের মত কাঁদিতেছেন। সে তখন ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। অশ্রুজলে নরেশ বাবুর যন্ত্রণা কিঞ্চিৎ দুর হইলে তিনি কাগজ কলম লইয়া পত্র লিখিতে লাগিলেন। অতি সংক্ষেপে ভবেশের পাশের সংবাদ লিখিয়া তিনি বিশ্বনাথকে ডাকিলেন। বিশ্বনাথ এই ডাকের অপেক্ষায় বসিয়াছিল। নরেশবাবু পত্র দুইখানি তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, "বিশ্বনাথ, আজ বাহিরে না গেলেই ভাল হোতো। তা যাও, কিন্তু দেখিও, বিলম্ব করিও না। তুমি না এলে সতীশ হয় ত বসিয়া থাকিবে।"

"আমি আজ আর বেশী দেরি কোরব না।" এই কথা বলিয়া বিশ্বনাথ তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল। তখন আর বেলা ছিল না, সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। বিশ্বনাথ তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিল।



আজ অমাবস্যা। বিশ্বনাথ মনে মনে স্থির করিল, আজ সে সোজা পথে গঙ্গার তীরে কাশী মিত্রের স্নান ঘাটে উপস্থিত হইবে। ঘাটের উপরেই শ্মশানেশ্বরের ক্ষুদ্র মন্দির। আজ সে শ্মশানেশ্বরকে প্রণাম করিয়া তবে কোন পল্লীতে প্রবেশ করিবে।

বিশ্বনাথ যখন বাগবাজারের মদনমোহন বিগ্রহের বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখন দেখিল দলে দলে স্ত্রীলোক শ্মশানেশ্বর দর্শনে যাইতেছে। সহরের উত্তরাঞ্চলের অনেক গৃহস্থ মহিলা, অনেক বারাঙ্গনা অমাবস্যার রাত্রিতে শ্মশানেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম করিতে গমন করিয়া থাকে।

মদনমোহনের বাড়ীর সম্মুখ দিয়াই একটী পথ গঙ্গার দিকে গিয়াছে। বিশ্বনাথ সেই পথ দিয়া গঙ্গার তীরে উপস্থিত হইল। সম্মুখেই কাশী মিত্রের ঘাট। গঙ্গাতীর অন্ধকার। রাস্তায় যে কয়েকটী আলোক স্তম্ভ আছে, তাহার উপরিস্থিত গ্যাসের উজ্জ্বল আলোক সেই অন্ধকার রজনীকে যেন আরও অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়াছে। সম্মুখে পতিত পাবনী গঙ্গা আপন মনে কুলকুল ধ্বনি করিয়া সেই অন্ধকারে কোথায় ছুটিয়া যাইতেছে। নদী-গর্ভে দুই চারি-খানি নৌকা হইতে ক্ষীণ আলোক রশ্মি নদীবক্ষে পতিত হইয়া চিক্ চিক্ করিতেছে। সম্মুখেই সেই মহাশ্মশান!

সহরের জন কোলাহল নীরব হইয়াছে। শ্মশানভুমি হইতে চিতার আলোক আকাশপথে কিছুদূর উঠিয়াই বিলীন হইয়া যাইতেছে। বিশ্বনাথ, কি জানি কেন, আজ সেই শ্মশানক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। দেখিল কেবল একটী চিতা জ্বলিতেছে। কয়েকজন লোক সেই চিতার অনতিদূরে বাসিয়া আছে।

বিশ্বনাথ একবার সেই চিতা প্রদক্ষিণ করিল, তাহার পর সেই চিতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যুক্তকরে গান ধরিল,—

শ্মশান ভাল বাসিস্ ব'লে শ্মশান কোরেছিস্ হৃদি।
শ্মশানবাসিনী শ্যামা নাচ্‌বি ব'লে নিরবধি।
আর কোন সাধ নাই মা চিতে,
চিতার আগুণ জ্বল্‌ছে চিতে,
তাই, চিতাভস্ম চারিভিতে, দেখ্‌বি শ্যামা আসিস্ যদি।

সেই অন্ধকার রজনীতে কলনাদিনী পতিতপাবনী ভাগিরথীর তীরে, সেই পবিত্র শ্মশানপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া বিশ্বনাথ প্রাণ খুলিয়া গান গায়িতে লাগিল।

দুইবার তিনবার সেই গানই গায়িল, তবুও তাহার প্রাণ শীতল হইল না—তবু তাহার হৃদয় ভেদ করিয়া গীতধ্বনি উঠিতে লাগিল—

"শ্মশান ভাল বাসিস ব'লে শ্মশান করেছিস্ হৃদি।"

তাহার সেই গান শুনিয়া অনেকগুলি স্ত্রীপুরুষ সেখানে—সেই শ্মশানভূমিতে—সেই চিতার পার্শ্বে উপস্থিত হইল। বিশ্বনাথের সে দিকে দৃষ্টি নাই। সে সেই প্রজ্বলিত চিতার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া এক মনে শ্মশানবাসিনী ত্রিলোকতারিণীকে ডাকিতে লাগিল। উপস্থিত নরনারীগণ সেই গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। কাহারও মুখে একটী কথা নাই।

ধীরে ধীরে গানের সুর নামিয়া আসিতে লাগিল। ঘোরা অমাবস্যা রজনীতে এই শ্মশানভূমিতে, এই চিতার সম্মুখে এমন প্রাণস্পর্শী সঙ্গীত শুনিয়া শ্রোতৃবর্গের হৃদয় গলিয়া গেল। বিশ্বনাথের কণ্ঠস্বর ক্রমে নামিয়া আসিতে লাগিল। অবশেষে সে গান ছাড়িয়া দিল, অবনত মস্তকে সম্মুখস্থিত চিতাকে প্রণাম করিয়া ধীর পদবিক্ষেপে শ্মশানভূমি ত্যাগ করিয়া শ্মশানেশ্বরের মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইল।

অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই শ্মশানেশ্বরের সন্ধ্যা আরতি হইয়া গিয়াছে; কিন্তু এখনও জনতা কমে নাই। অনেকগুলি রমণী মন্দিরের সম্মুখে করজোড়ে দাঁড়াইয়া আছে। মন্দিরের মধ্যে একটী ক্ষীণ আলোক জ্বলিতেছে। মন্দিরের সম্মুখেই পোর্টকমিসনরদিগের রেলপথ। বিশ্বনাথ সেই রেলপথের উপর দাঁড়াইয়া ভক্তিভরে শ্মশানেশ্বরকে প্রণাম করিল। তাহার পর পার্শ্বে ফিরিয়া ভাগিরথীকে প্রণাম করিয়া গান ধরিল——

শুনেছে তোমার নাম, অনাথ আতুর জন,
তাই, এসেছে তোমারি দ্বারে, শূন্য ফেরেনা যেন।
কাঁদে যারা নিরাশায়, আঁখি যেন মুছে যায়,
যেন গো অভয় পায় ত্রাসে কম্পিত প্রাণ।
আহা, কতশত আছে দীন, অভাগা আলয়হীন,
শোকে জীর্ণ প্রাণ কত, কাঁদিতেছে নিশিদিন;
পাপে যারা ডুবে আছে, যাবে তারা কার কাছে,
কোথা আর পথ আছে, দাও তারে দরশন।

গান শেষ হইলে বিশ্বনাথ একবার চরিদিকে চাহিয়া দেখিল, দেখিল অনেকগুলি রমণী সেইস্থানে দাঁড়াইয়া তাহার গান শুনিতেছে। সে একবার



সকলের মুখের দিকে চাহিল; কিন্তু যে মুখখানি দেখিবার জন্য তাহার প্রাণ আকুল, যে মুখখানি দেখিবার জন্য আজ সে ভিখারী সাজিয়াছে, সে মুখখানি সে দেখিতে পাইল না। গভীর মর্ম্মবেদনায় কাতর হইয়া বিশ্বনাথ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

বিশ্বনাথকে নীরব দেখিয়া একটী রমণী বলিলেন "বাবা, আর একটা গাও। আহা, তোমার গলা কি মিষ্টি!"

বিশ্বনাথ মাথা তুলিয়া সেই রমণীর দিকে একবার চহিয়া তাহার পর কাতর কণ্ঠে বলিল "মা গো, আর গান গাইতে ইচ্ছা করে না। গান যে কেউ শোনেনা মা! যাকে গান শোনাবার জন্য এত কাতর, সে যে একদিনও আমার গান শুন্‌লো না।"

রমণী বলিলেন "তা বাবা, ভক্তি কোরে গাও। সে শুন্‌বে বই কি? ভক্তের ঢাক না শুনে কি ভগবান পারেন। গাও বাবা, গাও।"

বিশ্বনাথ তখন গান ধরিল——

ওগো, কারে বা শুনাই গান
ওই দাঁড়ায়ে রয়েছে বাবা ভোলানাথ অতি নিদয় পাষাণ।
পথে পথে আমি কাঁদিয়া বেড়াই,
যারে দেখি আমি তাহারে সুধাই,
কেহত জাগেনা, কেহত বলেনা, কেহত দেয়না কান।
আর কতদিন কাটাব এ ভাবে,
হৃদয়ের জ্বালা কবে বা জুড়াবে,
কবে দেখা হবে, কবে কথা কবে, কবেগো জুড়াবে প্রাণ।

"আর গাইতে ভাল লাগেনা মা!" বলিয়া বিশ্বনাথ উঠিয়া দাঁড়াইল; আবার সতৃষ্ণ নয়নে সে চারিদিক দেখিল। তাহার মনে হইল কে যেন এতক্ষণ মন্দিরের পার্শ্বে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া তাহার গান শুনিতেছে। বিশ্বনাথ কি ভাবিয়া দুই এক পদ অগ্রসর হইল। তখন সে দেখিল সত্যসত্যই মন্দিরের পার্শ্বে মলিনবসনা একটী রমণী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বিশ্বনাথকে সেইদিকে আসিতে দেখিয়া রমণী দ্রুতপদে সেখান হইতে বাহির হইয়া গঙ্গাতীরের দিকে গেল। বিশ্বনাথের এ গতি যেন পরিচিত; কিন্তু সে সাহস করিয়া রমণীর অনুসরণ করিতে পারিল না। স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল রমণী কোন্‌দিকে যায়। সে দেখিল গঙ্গার তীরে কাশীমিত্রের

ঘাঠের পার্শ্বেই যে একটা ছোট বটগাছ আছে, রমণী সেই গাছের ছায়ায় অন্ধকারে মিশাইয়া গেল। এ রমণী কে, জানিবার জন্য বিশ্বনাথের কেমন একটা আগ্রহ হইল। সে তখন গান ধরিল—

"আসার আশায় দীনদরদি! আমি আর কতদিন রবো।"

এই গানটি গাইতে গাইতে সে ধীরে ধীরে সেই বৃক্ষের দিকে চলিল। বৃক্ষের নিকট যাইয়া দেখে সেই মলিনবসনা রমণী বৃক্ষের কাণ্ডে মাথা রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছে। অন্ধকারে তাহার মুখ দেখা যাইতেছে না। বিশ্বনাথ আরও একটু অগ্রসর হইল; তখনও সে গান করিতেছে—

"আসার আশায় দীনদরদি! আমি আর কতদিন রবো।"

বিশ্বনাথের এই গান শুনিয়া এবং তাহাকে বৃক্ষতলে আসিতে দেখিয়া রমণী আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার হৃদয় ভেদ করিয়া ক্রন্দন ধ্বনি উত্থিত হইল। রমণী তখন চীৎকার করিয়া বলিল "বিশুদাদা—আমার বিশুদাদা!" তাহার পরেই সে মুর্চ্ছিতা হইয়া সেই বৃক্ষতলে পড়িয়া গেল।

বিশ্বনাথ একলম্ফে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া রমণীকে কোলে করিয়া বসিল। দেখিল সে সংজ্ঞাহীনা। তখন সেই নীরব নিস্তব্ধ নিশীথে, সেই পবিত্র সলিলা ভাগিরথীর তীরে, সেই নক্ষত্র চর্চ্চিত নীলচন্দ্রাতপতলে, সেই মলিনবসনা রমণীকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বিশ্বনাথ ডাকিল "দিদি!"

বিশ্বনাথের সেই করুণ কণ্ঠস্বরে গঙ্গাতীর ভরিয়া গেল, সম্মুখে কলনাদিনী ভাগিরথী যেন সেই স্বরলহরী বুকে লইয়া নাচিতে নাচিতে সাগরাভিমুখে চলিল। মাথার উপরের বৃক্ষশাখা যেন আনন্দে সেই স্বরের প্রতিধ্বনি করিল।

বিশ্বনাথ আবার ডাকিল "দিদি!" ধীর, কাতরকণ্ঠে, সুমতি উত্তর দিল "বিশুদাদা!"

ক্রমশঃ

শ্রীজলধর সেন।

---



# নৈদাঘ-নিশীথ-স্বপ্ন।

## দ্বিতীয় অঙ্ক।

### প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বৈজয়ন্তী নগরীর নিকটস্থ বন।

( বিপরীত দিক হইতে একজন পরী এবং পঞ্চুর প্রবেশ। )

পঞ্চু। কিলো পরি! কোথায় যাচ্ছ?

পরী। পর্ব্বতে, গহ্বরে
অরণ্য ভিতরে
কণ্টক বনে।
সমুদ্রেরজলে,
জ্বলন্ত অনলে,
ভ্রমি ফুল বনে, আনন্দ মনে।
জ্যোৎস্নায় জিনিয়া, চঞ্চল পায়,
পরীগণ বেগে ছুটিয়া যায়—
আদেশেন যবে পরীর রাণী;
গাঁথি রত্নমালা জলধির তলে,
অবচয়ি মধু কুসুম-দলে,
নক্ষত্রের জ্যোতিঃ হরিয়া আনি।
আজি পুনঃ যাই আদেশে তাঁহার,
গোলাপের দলে ঝুলাতে নীহার,
আসিবেন হেথা পরীর রাণী।

পঞ্চু। পরীরাজ আজি হেথা উৎসব-কারণ
আসিবেন; সাবধানে ক'রো আগমন,
রাণীসহ চারি চক্ষু না হয় মিলন।
অতীব সুন্দর এক নৃপতি-তনয়,
হরিয়া এনেছে রাণী কৌতুহলময়।

সহচর করি সঙ্গে রেখেছে তাহায়,
জ্বলে রাজা ঈর্ষানলে দেখিয়া যুবায়।
চাহে রাজা, নিজে তারে অনুচর ক'রে,
পাঠাইতে দূর দেশে, বন-বনান্তরে।
কিন্তু রাণী যুবকে না ছাড়ে, প্রাণপণ,
সাজায় কুসুম দামে হৃদয়-রঞ্জন।
দু'জনে যথায় মিলে—বনে, উপবনে,
নির্ঝরিণী-কূলে চারু নক্ষত্র কিরণে—
কুটিল কলহ বাধে ; ভয়ে পরীগণ
ফুলে ফুলে লুকাইয়া বাঁচায় জীবন।

পরী। চিনেছি তোমায় আমি, চিনেছি এখন,
তুমি সে চতুর পরী, নাম "পঞ্চানন।"
সেই তুমি, গ্রামে গ্রামে কুমারী সকলে,
ভয় দেখাইয়া, শূন্যে হাস কুতূহলে ;
সর চুরি কর তুমি গোয়ালিনী ঘরে,
কাঁটা ফুটাইয়া দেও মালিনীর করে।
কভু তুমি পশ গিয়া দুধের ভিতরে,
অনিশ্বাসে মথি দুধ গোয়ালিনী মরে।
নিশীথ-পথিকগণে পথ ভুলাইয়া,
হাস তুমি উচ্চ হাসি, করতালি দিয়া।
যাহারা তোমায় বলে সাধু "পঞ্চানন",
সাধিতে তাদের কার্য্য কর প্রাণপণ।

পঞ্চু। ধরা পড়েছি।
আমি সে আমোদ প্রিয় পরী নিশাচর,
সতত আমোদে বঞ্চি "অনঙ্গ" অন্তর।
ঘুঁড়ী হয়ে ডাকি আমি ঘোঁড়া যায় ছুটে,
সহিসেরা দেয় গালি, শানে মাথা কুটে।
বীরাঙ্গণা-পান-পাত্রে লুকাইয়া থাকি,
অধরে তুলিতে সুরা তোঁ ভোঁ করে ডাকি।
"বাবাগো" ! বলিয়া মাগী পাত্র দেয় ফেলে,



হাসির তরঙ্গ উঠে নাগর মণ্ডলে।
ঠানদিদি গল্প ছাঁদি আসর-জাঁকান,
আমাকে ত্রিপদী ভাবি বসিবারে যান।
কটাক্ষেতে আমি হই অন্তর তখন,
চিতপাত হ'য়ে বুড়ী ভূতলে পতন।
কাশে বুড়ী, নানা ছন্দে অধঘণ্ঠা ধরি,
আনন্দে বালকবৃন্দ যায় গড়াগড়ি।
বাপ্‌রে ! ওই অনঙ্গ আস্‌ছে।

পরী। ঐ আমার রাণীও আসছে। আজ একটা লঙ্কাকাণ্ড হবে দেখ্‌ছি।

( এক দিক হইতে পারিষদ সহ অনঙ্গ, অন্য দিক হইতে পরিচারিকা সহ ত্রিতারার প্রবেশ। )

অনঙ্গ। কি মানিনী ত্রিতারা, এই জ্যোৎস্না রাত্রিতে কেন ?

ত্রিতারা। কি ঈর্ষাতুর অনঙ্গ ? পরীগণ ! সরে যা। তুমি কি জান না, আমি তোমার আশা ত্যাগ ক'রেছি ?

অনঙ্গ। পাপীয়সি ! আমি কি তোর স্বামী নহি ?

ত্রিতারা। তেমতি আমি কি পত্নী নহিগো তোমার !
কিন্তু জানি, পরীরাজ্য করি পরিহার,
গিয়াছিলে কোথা তুমি, বাঁশরীর স্বরে,
প্রণয়-কবিতা-হারে, হরিদ্বার তরে,
প্রেমময়ী প্রণয়িনী হেমলতাময় ?
জানি, নাথ, আজি কেন হেথা আগমন ;
হবে সেই বীরাঙ্গনা প্রেয়সী তোমার—
রাজা-সুরেশ্বর রাণী। পেয়ে সমাচার,
আসিয়াছি সাজাইতে ফুলশয্যা তার।

অনঙ্গ। নির্লজ্জ ত্রিতারা, ছিছি, বলিলে কেমনে
এমন কলঙ্ক কথা ! ভাবিয়াছ মনে,
জানি নাই, তব প্রেম সুরেশ্বর-সনে।
তুমি না হরিয়াছিলে—ভুলেছ কি আর ?
হৃতা "সুরবালা" হতে হৃদয় তাহার ?

ত্রিতারা। এ সব নিশ্চয় তব ঈর্ষার সৃজন।
মধ্যম বসন্ত হতে মিলেছি যখন,
কিবা গিরি, কি গহ্বরে, অরণ্যে, কান্তারে,
নির্ম্মল নির্ঝর কুলে, স্রোতস্বতী-ধারে,
কিম্বা সমুদ্রের চারু ধবল বেলায়,
নাচিত অপ্সরা নিত্য, চুম্বিয়া ধরায়,
মধুর স্বননে যবে সমীরণ বহে।
ভাঙ্গিয়াছ ক্রীড়া তুমি ঈর্ষার কলহে।

অনঙ্গ। যদি শোধরাইতে চাহ, তাহা অনায়াসে পার। সেই ছোঁড়াটাকে আমার অনুচর করিতে দাও।

ত্রিতারা। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকিও!
এই পরীরাজ্য যদি দেও বিনিময়ে,
তবু না পাইবে তারে। জননী তাহার
ছিল উপাসক মম। দূর, সুবাসিত
ভারত-সমীরে বসি নিশীথ-সময়ে,
কতই রূপসী কথা, শুনাত আমারে,
অভাগিনী; কত সুখে, নীল-সমুদ্রের
সুবর্ণবালুকাময়ী সৈকতে বসিয়া,
হাসিতাম দুই জনে—দেখি ক্রীড়াশীল,
সমীরণে গর্ভবতী তরণীর পাল।
অনুকারি সেই পাল, পূর্ণ গর্ভবতী,
চঞ্চল চরণে চলি সৈকতে বেলার,
আনিত শম্বুক, শিলা, কতই আদরে—
যেন কত বহুমূল্য বাণিজ্যের ধন।
কিন্তু অভাগিনী হায়! আছিল মানবী;
মরিল প্রসব কালে। মাতৃহীন শিশু
পালিতেছি, জননীর স্মৃতি-নিদর্শন—
প্রাণান্তে তাহারে নাহি ছাড়িব কখন।

অনঙ্গ। তুমি আর কতদিন এই বনে থাকিবে?

ত্রিতারা। সম্ভবত সুরেশ্বরের বিবাহ পর্য্যন্ত। তুমি যদি আমাদের সঙ্গে



নাচিতে ইচ্ছা কর, এবং আমাদের জ্যোৎস্না-ক্রীড়া দেখিতে ইচ্ছা কর, তবে আমাদের সঙ্গে আইস; না হয়, এখান হইতে যাও, আমি তোমার ক্রীড়া স্থান অনুসরণ করিব না।

অনঙ্গ। আমাকে সেই ছোঁড়াটাকে দেও; তা হ'লে আমি তোমার সঙ্গে যাই।

ত্রিতারা। বলিয়াছি, এই সমুদয় পরী রাজ্যের বিনিময়েও দেব না।

পরীগণ! চল। তোমার দিব্বি, যদি আমি আর এখানে থাকি।

( সঙ্গিনীদিগের সহিত ত্রিতারার প্রস্থান।

অনঙ্গ। আচ্ছা, যাও। এই বন পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই আমি এই অপমানের প্রতিফল দিচ্ছি। পঞ্চু! শোন্! তোর মনে আছে,—
সমুদ্রের অন্তরীপে বসি এক দিন,
শুনিতেছিলাম সুখে মধুর সঙ্গীত—
মকর-বাহিনী এক বারিদেবী মুখে।
উত্তাল জলধি সেই সুমধুর স্বরে
ধরিলা প্রশান্ত ভাব; নক্ষত্র নিচয়
খসিয়া পড়িতেছিল উন্মত্তের মত—
শুনিতে সে বারিজার তরল সঙ্গীত।

পঞ্চু। হাঁ, মনে আছে।

অনঙ্গ।— ঠিক সেই সময়ে, সখে! দেখিলে না তুমি।
দেখিলাম শূন্য পথে সশস্ত্র মন্মথ—
উপরে শীতল চন্দ্র, নীচে ধরাতল—
সুচারুহাসিনী এক সিমন্তিনী-পানে
হানিলা সুতীক্ষ্ণ শর, শরাসন হ'তে,
শতকোটী চিত্ত বাণ বিঁধিতে সক্ষম।
কিন্তু মদনের সেই জ্বলন্ত সন্ধান,
সজল চন্দ্রমা লোকে নিবিল সহসা;
চলি গেলা বামা, রূপে জগতের রাণী;
কুমারী চিন্তায় মগ্না, কল্পনা-স্বপনে।
তখন কামের বাণ হইল পতন
এক ক্ষুদ্র শ্বেত পুষ্পে, আরক্ত এখন

প্রেম-অস্ত্রাঘাতে। তুমি যাও, ত্বরা করি
আন সেই ফুল ; রস সরস যাহার—
দিলে নিদ্রা নিমীলিত নয়ন পল্লবে,
কিবা নর, কিবা নারী, নিদ্রান্তে যাহারে—
দেখিবে প্রথম চাহি, হবে তার তরে
প্রণয়ে পাগল। তুমি যাও, আসিও ফিরিয়া
আঁখির পলকে পুনঃ। এক দণ্ডে আমি—
দিব উত্তরীয় এই পৃথিবী গলায়।

( পঞ্চুর প্রস্থান।

অনঙ্গ। এই ফুলটা পেলে, ত্রিতারা কোথায় ঘুমায়, তা দেখ্‌বো এবং তার চক্ষে উহার রস দেব। ঘুম ভেঙ্গে, সে সিংহই দেখুক, ভালুকই দেখুক, বাঘই দেখুক, আর ষাঁড় বাঁদর কিংবা বনমানুষই দেখুক, পাগলের মত তার পিছে ছুটে যাবে। আর একটী শিকড়ের রস দিলেই এই ভ্রম কেটে যাবে। কিন্তু তা করার পূর্ব্বে ছোঁড়াটাকে হাত করতে হবে। এরা আবার কে ?—তা আমাকে ত দেখ্‌তে পাবে না। মজা ক'রে এদের কথাটী শুনে নিই।

( বিপিন ও তৎপশ্চাৎ মানদার প্রবেশ। )

বিপিন। আমি ত তোমাকে বলেছি যে, আমি তোমাকে ভাল বাসিনে; তবু কেন তুমি আমাকে ভুতের মত তাড়িয়ে বেড়াচ্ছ ? বিনোদ এবং সুন্দরী প্রমদা কোথায় ? আমি একটীকে খুন্ করবো, আর একটী আমাকে খুন করে রেখেছে। তুমি বলেছিলে না—তারা এই বনে পালিয়ে এসেছে ? কিন্তু, তারা কই ? তুমি যাওনা ? ভাল জ্বালাতন করলে যে !

মানদা। নিষ্ঠুর ! আমায় কেন কর আকর্ষণ,
চুম্বক হৃদয় তব, লৌহ মম মন ;
তব আকর্ষিণী-শক্তি কর পরিহার,
তোমার পশ্চাতে আমি যাইব না আর।

বিপিন। আমি কি তোমায় অনুরক্ত করিতে চেষ্টা করি ? আমি কি তোমায় বলি যে, আমি তোমার সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়াছি ? বরং আমি কি তোমায় স্পষ্টাক্ষরে বলি নাই যে, আমি তোমাকে কখনও ভালবাসি নাই, ভালবাসিতে পারিব না ?



মানদা। আমি তথাপি তোমাকে ভালবাসি। আমি তোমার কুক্কুর। বিপিন, তুমি আমাকে যত প্রহার কর, আমি তত তোমার শরীর লেহন করি। আমাকে নিতান্ত পক্ষে তোমার কুকুরটীর ন্যায় ব্যবহার কর. মার, পদঘাত কর, তথাপি তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে অনুমতি দেও। তোমার প্রণয়ে ইহার অপেক্ষা নীচস্থান আর কি হইতে পারে ? তথাপি আমার পক্ষে তাহা স্বর্গ।

বিপিন। দেখ, আমার ঘৃণা আর অধিক উত্তেজিত করিও না। তোমাকে দেখিলে আমার গায়ে জর হয়।

মানদা। তোমাকে না দেখিলে আমি পীড়িত হই।

বিপিন। সহর ছেড়ে, যে তোমাকে ভালবাসে না—তাহার সঙ্গে রাত্রিতে একাকিনী তোমার ঐ নবীন যৌবনরত্ন লইয়া বনে প্রবেশ করা, তোমার পক্ষে নিতান্ত নির্লজ্জের কার্য্য হইয়াছে।

মানদা। তোমার চরিত্রে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে।
যখন নিরখি আমি তোমার বদন,
রজনী তখন মম নাহি লয় মনে।
কেমনে বলিব বল, অরণ্য নির্জ্জন ?
তুমি যার আছ কাছে, আছে ভূমণ্ডল।
বিপিন ! আমার তুমি সংসার সকল।

বিপিন। আমি এখনই ঐ জঙ্গলে লুকাব, তুমি হিংস্র বন্যজন্তুর মুখে পতিত হবে।

মানদা। হিংস্রতম পশু যেই তাহারো হৃদয়,
কঠিন তোমার মত না হবে কখন।
পালাও, ইহাতে কিছু কলঙ্ক তোমার ;
পালাবেন ইন্দ্র, শচী ছুটিতে পশ্চাতে,
পলাইবে ব্যাঘ্র পড়ি হরিণীর হাতে।
পলাইবে শ্যেনপক্ষী দেখি কপোতিনী,
পলাইবে বীর দেখি অবলা রমণী।

বিপিন। আমি বাপু, তোমার সঙ্গে আর ছড়া কাটতে পারি না, তুমি আমাকে যেতে দাও। তুমি যদি তবু আমার পিছে পিছে এস, তবে এই বনে আমি তোমার অপমান করিব।

মানদা। হা অদৃষ্ট! দেবালয়ে, নগরে, প্রান্তরে।
কোথা নাহি অপমান করিছ আমার;
নারীর সম্মান তুমি জাননা কি হায়!
না সাধে রমণী, সাধে পুরুষ বামায়।
যাইব পশ্চাতে, হ'ক স্বরগ নরক,
প্রণয় পাশক হ'ক জীবন-ঘাতক।

( প্রস্থান।

অনঙ্গ। যাও শশিমুখি! নাহি ছাড়িতে এ বন,
সে যাবে পশ্চাতে, তুমি পালাবে তখন।

( পঞ্চুর প্রবেশ )

ফুল এনেছ! সাবাস পঞ্চু!

পঞ্চু। এই নিন্।

অন্ধক। দাও, আমাকে দাও।
জানি আমি সেইস্থান স্রোতস্বতী তীরে;
যথায় বাসন্তী-লতা চন্দ্রাতপ তলে,
কুসুম-পল্লব-কক্ষে, স্নাত চন্দ্র-করে,
কুসুম শয্যায় শুয়ে, ত্রিতারা সুন্দরী,
নিদ্রাযায় নৃত্যশ্রমে, পুষ্প আবরণে
লুকাইয়া পুষ্পময়ী মূরতি তাহার,
যাইব তথায়; দিলে এই পুষ্পরস
নয়নে তাহার, হবে নিদ্রান্তে হৃদয়
সংখ্যাতীত ঘৃণাস্পদ কল্পনা পূরিত।

পঞ্চু, তুমি ইহার কিঞ্চিৎ অংশ লইয়া এই বনের মধ্যে প্রবেশ কর। দেখিবে, একজন সুন্দরী যুবতী, একজন দম্ভপূর্ণ যুবকের প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছে। তুমি ঐ ফুলের রস তার চোখে দিবে; কিন্তু এমনই সময়ে দিবে, যেন নয়ন মেলিলে সেই স্ত্রীলোকটিই তাহার প্রথম দৃশ্য পদার্থ হয়। কাক ডাকিবার পূর্ব্বে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে।

( ক্রমশঃ )

৺নবীনচন্দ্র সেন।



# কালীপ্রসন্ন প্রসঙ্গ।

সাহিত্য গগনের পূর্ব্বভাগে যে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক এতকাল ধরিয়া স্বীয় বিমল আলোকছটায় পশ্চিমাকাশ পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত করিয়াছিল, সে জ্যোতিষ্ক আজ খসিয়া পড়িয়াছে; আর সে মনোমুগ্ধকর আলোক আমরা দেখিতে পাইব না। এতকাল পর্য্যন্ত তাহা হইতে যে তেজঃ ক্ষরিত হইয়াছে, যে দীপ্তি স্ফুরিত হইয়াছে, সেই তেজ, সেই দীপ্তিই চিরকাল বঙ্গ সাহিত্যাকাশকে আলোকিত রাখিতে সমর্থ হইবে। উজ্জ্বল নক্ষত্রটি নিবিয়া গিয়াছে বটে কিন্তু তাহার জ্যোতিঃ নিভিবার নয়, নিভিবে না। সূর্য্যদেব যখন অপসৃত হন তখন তিনি চন্দ্র, ওষধি প্রভৃতিতে নিজ তেজঃ নিক্ষেপ করিয়া যান; পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্য সূর্য্য কালীপ্রসন্নও ইহজগত হইতে নিজ রশ্মি সংযমন পূর্ব্বক লোকান্তরে গমন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার যে তেজোরাশি সাহিত্য গগনে নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন, সেই তেজই চিরকাল "গৌড়জনের" চিত্তে সমভাবে বিচরণ করিবে!

কালীপ্রসন্নের ন্যায় ক্ষণজন্মা পুরুষগণ সংসারে অমর। মৃত্যু তাঁহাদের জড়দেহের বিনাশ সাধন করিতে পারে বটে কিন্তু তাঁহাদের কীর্ত্তিশরীর অবিনশ্বর, অক্ষয়! বাঙ্গলাভাষার সহিত যাঁহার কিঞ্চিন্মাত্রও পরিচয় আছে কালীপ্রসন্নের নাম তাঁহার কাছে অপরিচিত নহে। বালকের নিকট তিনি বালোচিত মধুর নাচনি ছন্দে কখন শিকলিকাটা টিয়ার কাহিনী বলিয়া, কখন রূপের সঙ্গে গুণের তুলনা করিয়া কোমল কবিতার কবিরূপে পরিচিত। যুবক ও প্রৌঢ়াদির মধ্যে কে এমন বাঙ্গালি আছেন যিনি তাঁহার "গম্ভীরপদা সরস্বতী"র সহিত অপরিচিত? ভাওয়ালের দেওয়ান তীক্ষ্ণবুদ্ধি সুচতুর কার্য্যদক্ষ কালীপ্রসন্নকে বঙ্গের অনেকেই না চিনিতে পারেন. রাজসম্মান ভূষিত রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্নের নাম বহুব্যক্তির নিকট অজ্ঞাত থাকিতে পারে, বঙ্গীয় পণ্ডিত সভার আশীর্ব্বাদী বিদ্যাসাগর লাঞ্ছিত কালীপ্রসন্ন সকলের পরিচিত না হইতে পারেন, কিন্তু প্রভাত চিন্তা, নিশীথ চিন্তা. ভ্রান্তিবিনোদ, প্রমোদলহরী, মা না মহাশক্তি, জানকীর অগ্নি পরীক্ষা, ছায়াদর্শন ইত্যাদি গ্রন্থরত্নাবলীর প্রণেতা বঙ্গভারতীর ভক্ত নন্দন, "বান্ধবে"র প্রবীণ সম্পাদক কালীপ্রসন্ন বঙ্গবাসীর কাহার নিকট অপরিচিত? তিনি আজীবন কঠোর সাধনা দ্বারা বাণীচরণ সেবায় সিদ্ধিলাভ করিয়া মাতার আশীর্ব্বাদী যশোনির্ম্মাল্য লাভে ধন্য হইয়া মরজীবনে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। বঙ্গ ভারতীর শ্রীঅঙ্গে

যিনি হীরকমণিমুক্তা খচিত অমূল্য অলঙ্কার রাজি পরাইয়া সেবাভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, যিনি বঙ্গের 'ইমারসন' বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহার পরিচয় কি আর নূতন করিয়া দিতে হইবে ?

অতি অল্পদিন ( গত শ্রাবণ মাসে ) হইল কালীপ্রসন্নের অমর আত্মা ইহ-লোক পরিত্যাগ করিয়া বাণী চরণারবৃন্দে মধুপান লালসায় সুরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন ; এখনও তাঁহার গ্রন্থাবলীর উৎকর্ষ বিচারের সময় আসে নাই। অন্ততঃ অদ্য আমরা সে বিষয়ের কোন প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিতেছি না।

সৌভাগ্যক্রমে বর্ত্তমান লেখকের কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের সহিত দুইবার সাক্ষাৎ এবং আলাপ হইয়াছিল। সেই মধুর স্মৃতি অবলম্বন করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিব বলিয়াই এ প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি।

বাল্যকাল হইতে কালীপ্রসন্নের গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া তাঁহার প্রতি একটি শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম, যতই বয়সের বৃদ্ধি হইতেছিল ততই সেই ভাব বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। পরে সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া যখন অর্থ অভিলাষে" "ভূমণ্ডলে ছুটাছুটী" আরম্ভ করিলাম তখনও বহুদিন পোষিত আশার সাফল্য লাভের কোন সুবিধা অনেকদিন করিতে পারি নাই। তৎপর কর্ম্মসূত্রে ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত মহকুমা চাঁদপুরে যখন অবস্থান করি, সেই সময় মনে হইল যে ঢাকার এত কাছে যখন আসিয়াছি তখন এই মনস্বী মহাপুরুষের সাক্ষাৎলাভ দ্বারা আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিতে আর দ্বিধা করা কর্ত্তব্য নহে। এই বিবেচনায় কোনও একটা ছুটি উপলক্ষে আরও ২।১টি বন্ধুর সহিত ঢাকা নগরীতে গমন করিলাম। তথায় আমার কোন আত্মীয়ের বাসাতেই আমি অবস্থান করিলাম এবং একদিন কালীপ্রসন্ন বাবুর সহিত দেখা করিতে তাঁহার ঢাকার বাড়ীতে গমন করিলাম।

সুবৃহৎ বৈঠকখানার একপার্শ্বে চেয়ার, টেবিল, আলমারী প্রভৃতি সুসজ্জিত, একপার্শ্বে তক্তাপোষ দ্বারা ফরাস বিছানা বিস্তৃত রহিয়াছে। আমি অন্য একটী বন্ধু সমভিব্যাহারে যখন তথায় উপস্থিত হইলাম তখন সেখানে আরও দুই এক জন লোক উপস্থিত ছিলেন। আমরা উপস্থিত হইবামাত্রই আমাদের সাদরে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিয়া কালীপ্রসন্ন বাবু অন্য ভদ্রলোকগণকে শীঘ্রই বিদায় করিয়া দিলেন এবং অতীব বিনয় সহকারে আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার সঙ্গী বন্ধুটি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ; তিনি এক খানি দার্শনিক বাঙ্গলা পুস্তক প্রণয়ন করিয়া তাহা কালীপ্রসন্ন বাবুকে উপহার পাঠাইয়াছিলেন



আমি তাঁহার পরিচয় প্রদান করাতেই তিনি বলিলেন "উঁহার পুস্তকখানি আমি অতীব আনন্দ সহকারে পাঠ করিয়াছি। তাঁহার ভাষার বিশেষরূপ প্রশংসা করিলেন এবং গ্রন্থোল্লিখিত মত সমূহ সম্বন্ধে তাঁহার নিজ মত প্রকাশ করিলেন। যেখানে পণ্ডিত মহাশয়ের মতের সহিত নিজ মতের ঐক্য হয় নাই সেস্থানে কিরূপ বিনয় ও নম্রতা সহকারে যে তাহা বলিলেন সে কথা আমি লিখিয়া প্রকাশ করিতে পারি না।

তার পর আমার পরিচয় প্রদান করা হইল। আমার নামটি শ্রবণ করিয়াই তিনি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনিই ত অনেক মাসিক পত্রে প্রবন্ধাদি লিখেন ?" আমি বলিলাম "আজ্ঞা হাঁ !"

তিনি বলিলেন, "আপনি আমার আরও নিকটে আসুন। আপনার লেখা পড়িতে আমি বড় ভালবাসি ! আমি বড় আনন্দিত হইলাম যে আজ আপনার ন্যায় ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎলাভ হইল।" কি বিনয় ! কি নম্রতা ! যিনি বঙ্গসাহিত্য তরণীর একজন প্রধান কাণ্ডারী, যাহার লিপিকৌশলে বঙ্গভাষার শ্রী-সম্পদ শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে, সেই মহারথী আমার ন্যায় নগণ্য ব্যক্তির লেখা পড়িতে ভালবাসেন ; আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাতে আনন্দিত হন ! তারপর আমার প্রণীত 'কয়েকখানি পত্র' ও 'সতীপ্রশস্তি' নামক দুইখানি পুস্তক পূর্ব্বেই তাঁহাকে উপহার পাঠান হইয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে কথা তিনি নিজেই তুলিলেন। তিনি বলিলেন আপনার 'কয়েকখানি পত্র' খানির সমালোচনা "বান্ধবে" প্রকাশ করিতে পারি নাই, তাহার কারণ সে বইখানি আমি আর পাই নাই। প্রথম পাইয়া কিছুদূর পড়িবার পর উহার সম্বন্ধে দুটো ভাল কথা বাটীর মধ্যে বলিয়াছিলাম। তার পর তাহা মেয়েদের হাতে হাতেই ফিরিতেছে। এই আপনার পক্ষে খুব বড় প্রশংসাপত্র নয় কি ?" বলিয়া হাসিলেন। "সতী প্রশস্তি বেশ সৎ গ্রন্থ ! সংস্কৃত ভাষার উপর যে আপনার দখল আছে তাহার পরিচয় পুস্তকের সর্ব্বত্র।" এই বলিয়া তিনি পুস্তকের ২।৪ স্থান উল্লেখ করিয়া সংস্কৃত বচনের সঙ্গে তাহার সমন্বয় করিয়া দিলেন।

তার পর বাঙ্গলা লেখন পদ্ধতির বিষয় কথা। তিনি বলিলেন যে আপনার মত যাঁহারা সংস্কৃত ও ইংরাজি উভয় ভাষাই জানেন তাঁহারা চেষ্টা করিলে ভাষার সম্পদ যথেষ্ট বৃদ্ধি করিতে পারেন। তাঁহার মতে যাঁহারা বাঙ্গলা ভাষার সেবা করিবেন তাঁহাদের সংস্কৃত আলোচনা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। সংস্কৃতের

অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে রত্নরাজি আহরণ পূর্ব্বক বঙ্গভাষাকে সুসজ্জিত করিতে হইবে ইহাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। আমাকে বলিলেন "আপনার লেখা দেখিয়া বোধ হয় আপনিও অনেকটা এই রীতিরই পক্ষপাতী। আমার লেখা আপনি পড়িয়াছেন ত! সেগুলি আপনার কাছে কেমন বোধ হয়?"

আশ্চর্য্য! তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন তাঁহার লেখা আমার কাছে কেমন বোধ হয়! আমি বলিলাম "জন্মকাল হইতেই আপনার লেখা আমি পাঠ করিয়াছি। ভাল না লাগিলে এত পড়িব কেন?"

এদিকে সন্ধ্যা হইয়া গেল। সান্ধ্যকৃত্যাদি সমাপনের সময় উপস্থিত দেখিয়া আমরা বিদায় প্রার্থনা করিলাম। তিনি বলিলেন "হাঁ, সে বটে কিন্তু আপনাদিগকে যে ছাড়িতে ইচ্ছা করে না। আপনাদের সঙ্গে বড় আনন্দে আছি। আর একদিন একটু বেলা থাকিতে আসিবেন। বলুন, আসিবেন তো?" আমরা সানন্দে স্বীকৃত হইলাম। তারপর তিনি বিদায় অভিবাদন করিয়া আমাকে বড় স্নেহের সহিত বলিলেন "আপনাকে আমি বড়ই ভাল বাসিতেছি। বলুন, আপনার সঙ্গে আলিঙ্গন করি। এই বলিয়া বড়ই আবেগভরে বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিলেন। কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রত্যভিবাদন করিয়া সেদিনকার মত উভয়ে চলিয়া আসিলাম।

তারপর আর একদিন তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। সে দিনও তিনি এরূপ ভাবে আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন যে আমি অতীব কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলাম। দুই একটা অন্য কথার পর আবার সাহিত্যালোচনার কথাই উঠিল। ইংরাজি ভাষায় ভাল ভাল সাহিত্যগ্রন্থ বাঙ্গলায় অনুদিত হয়, এ বিষয়ে তাঁহার বেশ আগ্রহ দেখিলাম, তবে তিনি বলিলেন যে, অনুবাদ এরূপ হওয়া আবশ্যক যে পাঠ করিবার সময়ে তাহাকে অনুবাদ বলিয়া বুঝিতে পারা না যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রণীত আখ্যান মঞ্জরী প্রভৃতি বালক পাঠ্য পুস্তক, ভ্রান্তি বিলাস এবং সীতার বনবাসের কথাও দৃষ্টান্ত স্বরূপে তিনি উল্লেখ করিলেন। আর বলিলেন, বর্ত্তমানে অনেক পাশ্চাত্য ভাষায় কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ বাঙ্গালা লেখা আরম্ভ করিয়াছেন, ইহা বড়ই আনন্দের কথা, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকের বাঙ্গলাভাষায় রচনাপ্রণালী সম্বন্ধে যে একটা উপেক্ষার ভাব আছে দেখা যায়, ইহাই বড় দুঃখের বিষয়। তাঁহারা মনে করেন যে তাঁহারা যাহা লিখিবেন তাহাই সিদ্ধ প্রণালী বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। এটা মনে করা ভুল।



রমেশচন্দ্রের মত প্রতিভা সকলের নাই; আর রমেশচন্দ্রও বাঙ্গলা লিখিতে আরম্ভ করিয়া তাহার রচনা বিষয়ে সাধনা না করিয়াছেন এমন নহে। তিনি দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুই একটি লেখকের রচনা হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলেন।

তারপর তাঁহার নিজের বাল্যকালের শিক্ষার কথা বলিলেন। কিরূপে মৌলবীর নিকট তিনি পার্শী পড়িতেন, কিজন্য তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে হইল, সে সব কথা হাসিয়া হাসিয়া বলিতে লাগিলেন। তারপর কোন সময়ে সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠ করেন এবং সংস্কৃতের আলোচনা বিশেষরূপে করিতে আরম্ভ করেন তাহাও বলিলেন।

আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কত দিন হইতে আপনি বাঙ্গলা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন?" আমি আমার গত জীবনের অনেক গুলি কথা তাঁহাকে বলিলাম। শুনিয়া তিনি সস্নেহে বলিলেন, "আপনি তবে তো বাঙ্গলার একজন সাধক!" আমি বড়ই কুণ্ঠিত হইয়া বলিলাম "আজ্ঞে তাই যদি বলেন তবে আমি বিল্বমঙ্গলের "সাধকের" মত সাধক!" তিনি খুব হাসিলেন, পরে জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা লিখিবার সময় কোন আদর্শ লক্ষ্য করিতেন কি?"

আমি বলিলাম "৺অক্ষয়কুমার দত্তের চারুপাঠ ১ম ভাগ বোধোদয়ের পরে পড়ি। তাঁহার সেই লেখার অনুকরণ করিতেই ঘন ঘন চেষ্টা করিতাম। তারপর বিদ্যাসাগর মহাশয়, বঙ্কিম বাবু, রমেশ বাবু ও আপনার লেখা অনুকরণের চেষ্টা করিতে ছাড়ি নাই। রমেশ বাবুর 'শতবর্ষ' পুস্তক প্রকাশিত হইলে তাঁহার জীবন প্রভাত ও জীবন সন্ধ্যার লেখার প্রণালীটার উপর আমার বড়ই ঝোঁক পড়ে। পরে বিশেষ করিয়া কাহারও অনুকরণ করিতে চেষ্টা করি নাই। কালী প্রসন্ন বাবু বলিলেন "এই অনুকরণ কিভাবে করিতেন?"

আমি বলিলাম "যার লেখার অনুকরণ করিতাম, তাঁর লেখাগুলি বিশেষরূপে পড়িয়া শেষে ক্রমাগত কয়েকমাস ধরিয়া প্রত্যহ হস্তলিপিতে সেইধরণে নিজ রচনা লিখিতে চেষ্টা করিতাম।"

কালীপ্রসন্ন বাবু বলিলেন "ঠিক, আপনার লেখা আমি যাহা পড়িয়াছি তাহা হইতেও ইহা অনুমিত হয় আমি বড় সুখী হইলাম। আপনি বাঙ্গলা ভাষাকে আন্তরিক ভালবাসেন। চিরকাল ইহাতেই রত থাকুন।" তারপর বলিলেন "আমার বান্ধব আপনার লেখা হইতে বঞ্চিত থাকিবে কেন? আপনাকে বান্ধবে লিখিতে হইবে।"

তাঁহার অনুরোধে পরে আমি "বৈষ্ণবশাস্ত্র চিত্রাবলী" নামে "কলঙ্ক ভঞ্জন" নামক প্রথম প্রবন্ধ তাহাতে দিয়াছিলাম এবং তজ্জন্য আশাতীত উৎসাহপূর্ণ প্রশংসা তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছিলাম। পরে নানা কারণে আর কোন লেখা তাহাতে দেওয়া হয় নাই।

যাহা হউক তৎপরে পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে কথা উঠিল। সকলেই জ্ঞাত আছেন শেষ বয়সে প্রেততত্ত্ব বিষয়ে তিনি বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন এবং তৎসম্বন্ধীয় বহু পুস্তক তিনি পাঠ করিয়াছিলেন। বয়সে বৃদ্ধ হইয়াও জ্ঞানতৃষ্ণায় তিনি যুবক ছিলেন। প্রেততত্ত্ব বিষয়ক বহু পুস্তক তাঁহার পুস্তকাধারে সঞ্চিত ছিল। তিনি আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিলেন "আপনি আমার সম্মুখে উপস্থিত আছেন ইহাও আমি যেমন বিশ্বাস করি, প্রেততত্ত্বেও আমি তেমনি বিশ্বাস করি।"

মৃত্যুর পরে যে অন্য লোকে আত্মাগণ সূক্ষ্ম দেহধারী হইয়া ইহজীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা লইয়া বাস করে সে বিষয়েও তাঁহার যেমন দৃঢ় বিশ্বাস, পুনর্জন্ম নাই এ বিষয়েও তাঁহার বিশ্বাস তেমনই অটল দেখিলাম। তিনি আমাকে এই বিষয়ের পুস্তকাদি পাঠ করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন আর বলিলেন আজ সন্ধ্যা হইয়া গেল, আর একদিন আসিলে আমার সামান্য (?) অভিজ্ঞতার ফল আপনাকে বুঝাইয়া দিব।

তারপর আমি তাঁহাকে চাঁদপুরে একবার বক্তৃতা দিতে গমন করার বিষয়ে অভিমত জিজ্ঞাসা করি তিনি তাহাতে অর্দ্ধ সম্মতি জ্ঞাপন করেন। যাঁহারা কালীপ্রসন্ন বাবুর পুস্তক পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা অনেকে বোধ হয় জানেন না যে তিনি কিরূপ বক্তা ছিলেন! বাঙ্গলা ভাষায় ওজস্বিনী বক্তৃতা করিতে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ বাগ্মী ছিলেন তাহা যাঁহারা তাঁহার কলিকাতায় প্রদত্ত বক্তৃতা শুনিয়াছেন তাঁহারা একবাক্যে স্বীকার করিবেন। সুমার্জ্জিত সুললিত পদ বিন্যাস সংযুক্ত, সুগঠিত দীর্ঘসমাসবহুল বাক্যাবলী সমাকীর্ণ এরূপ সতেজ অনর্গল বক্তৃতা বাঙ্গলা ভাষাতে হইতে পারে এই ধারণাই ইঁহার বক্তৃতা শ্রবণের পূর্ব্বে অনেকের ছিলনা।

যাহা হউক আমি সেদিন বিদায় লইলাম। তিনি পূর্ব্বদিনের মত সস্নেহে আমাকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন দানে মুগ্ধ ও আপ্যায়িত করিয়া অশেষ মঙ্গলকামনাসহ বিদায় দিলেন। তারপর তাঁহার সহিত চাক্ষুষ আলাপের সৌভাগ্য আর আমার হয় নাই। কিন্তু আমার ন্যায় ক্ষুদ্র একজন সাহিত্য সেবকের সহিত তিনি



যেরূপ স্নেহ ও সহানুভূতি পূর্ণ ব্যবহার করিয়াছিলেন, যেরূপভাবে আমার সহিত আলাপ করিয়াছিলেন এবং আমাকে পরামর্শ দিয়াছিলেন সে ভাবটি চিরকাল আমার হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে।

কালীপ্রসন্নবাবু কিরূপ ভক্তিভাবে বাগ্‌দেবীর সেবা করিতেন তাহা কি বলিব! তিনি যে পুস্তকাদি পাঠ করিতেন, তাহাতে প্রণত হইতেন এবং পাঠ শেষেও পুনরায় প্রণাম করিতেন ইহা তাঁহার পুত্রগণের মুখেই শুনিয়াছিলাম। তাঁহার সঙ্গে আলাপেও আমার তাহাই ধারণা হইয়াছিল।

আজ তাঁহার লোকান্তর গমন সংবাদে সেই পূর্ব্বস্মৃতি আমার হৃদয়ে জাগ্রত হইয়া আমাকে এই প্রবন্ধদ্বারা তাঁহার পবিত্র স্মৃতির তর্পণ করিতে নিযুক্ত করিয়াছে! ভগবানের চরণে তাঁহার আত্মা চিরশান্তিলাভ করুন এই প্রার্থনা।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

---

# লজ্জার উৎপত্তি ও অভিব্যক্তি।

সকল প্রকার লজ্জাতেই মুখ লাল হয়। তবে সকল স্থানেই ইহা দোষাবহ নয়। Shame দুষ্কার্য্যজনিত লজ্জা ও modesty অপ্রগল্‌ভতা, বিনয়নম্রতা বরঞ্চ প্রশংসার বিষয়। কিন্তু shyness আলাপ বিমুখতা, লোকভীরুতা প্রভৃতি সম্বন্ধে এ কথা বলা যাইতে পারে না। যে ব্যক্তি shy লাজুক সে পাঁচজনের সম্মুখে আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে না—লোকের সামনে কোন কাজ করিতে সে কুণ্ঠিত হয়—সুতরাং জীবনে সে কোন একটা কাজের মত কাজে হাত দিতে পারে না - তাহার জীবন বিফল হয়। এই সকল ব্যক্তির আত্মানুভূতি কিছু অতিরিক্ত রকমে পরিণতি প্রাপ্ত হয়—কিন্তু অতিরিক্ত আত্মবোধ হইলেই যে লোকে shy লাজুক হয়, তাহা নয়, ইহার উপর আপনার সম্বন্ধে কোন না কোন বিষয়ে কিছু হীন ধারণা থাকা আবশ্যক। Shyness লোকভীরুতার আরও একটি উপাদান—লোকের মতামতের উপর আস্থা স্থাপন। লোকের কথায় যে ব্যক্তি বিচলিত না হয়, সে কিছুতেই লজ্জিত হয় না, আপনার সম্বন্ধে মন্দ ধারণা থাকিলেও নয়। তাহা হইলে shyness, লোকভীরুতা তিনটি অবস্থার উপর নির্ভর করে ( ১ম ) অতিরিক্ত আত্মবোধ বা আত্মানুভূতি। ( ২য় ) আত্মগৌরবের অভাব; ( ৩য় ) অপরের মতের প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থা স্থাপন।

Shame গর্হিতাচরণ জনিত যে লজ্জা তাহা ( ১ম ) প্রকৃত অপরাধ বা কোন পাপ কার্য্য করনান্তর ( যেমন মিথ্যা কথা বলা, চুরি ডাকাতি করা ইত্যাদি ) বা ( ২য় ) শিষ্টাচার সম্বন্ধে কোন ত্রুটিবশতঃ ( যেমন গুরুজনকে ভক্তি না করা, কুসঙ্গে থাকা ইত্যাদি ) উৎপন্ন হয়।

Shyness ও shame সম্বন্ধে অধিক আর কিছু বলিবার নাই, কিন্তু modesty সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিবার আছে সুতরাং ইহার উৎপত্তি ও অভিব্যক্তি সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাক্।

modesty এক প্রকার ভয়। এই ভয়ের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া মানুষের কতকগুলি বিষয়ে আত্মসংবরণের চেষ্টা জন্মাইতে দেখা যায়। modesty স্ত্রী জাতিরই বিশেষগুণ, পুরুষের যে ইহা নাই তাহা নহে, তবে নারীজাতির মধ্যে এই লজ্জার ভাবটি খুব বেশি পরিমাণেই লক্ষিত হয়। যে নারীর ইহা নাই তাহার প্রতি কোন সুস্থ, স্বাভাবিক চিত্তবিশিষ্ট পুরুষের মন আকৃষ্ট না হওয়াই সম্ভব।

এই লজ্জার উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কথা বলিয়াছেন। Herbert Spencer, Sergi প্রভৃতির মতে, মানুষ যেদিন হইতে বস্ত্র পরিধান করিতে শিখিয়াছে সেইদিন হইতেই ইহার সৃষ্টি। ইহা কিন্তু সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। পৃথিবীর বহুস্থানে, এমন অনেক অসভ্য বর্ব্বর জাতি আছে যাহাদের মধ্যে এখন পর্য্যন্তও বস্ত্র ব্যবহারের প্রচলন হয় নাই, কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা যে একবারে নির্লজ্জ সে কথা বলিতে পারা যায় না।

লজ্জা যে ভয়ের উপর সংস্থাপিত তাহার আর সন্দেহ নাই। modesty লজ্জা কতগুলি ভয়ের সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নয়। লজ্জোৎপাদক ভয় সমূহ প্রধানতঃ দুই প্রকার। এক প্রকার ভয় মানুষ উত্তরাধিকারী সূত্রে তাহার পূর্ব্বগামী জীব হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে ইহা কেবল স্ত্রীলোকের মধ্যেই সংরক্ষিত হইতে দেখা যায়। ইহাকে গৌন ভয় বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয় প্রকার ভয় মানুষের স্বোপার্জ্জিত—ইহাতে স্ত্রী পুরুষের কোন ভেদ নাই—ইহাকে সামাজিক ভয় বলিতে পারা যায়।

একটি শিশুর লোকভীরুতা হয়ত খুবই থাকিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত লজ্জা বলিলে যাহা বুঝায়, শিশুর তাহা কিছুই থাকে না। সে হয়ত ফস্ করিয়া এমন একটি কথা বলিয়া বসে কিম্বা এমন কোন কাজ করে যাহাতে উপস্থিত সকলকেই চমকিয়া উঠিতে হয়। ইহা কিন্তু স্থির নিশ্চয়, শিশুর যদি লজ্জা



বোধ থাকিত তাহা হইলে কখনই ওরূপ করিতে পারিত না ; ইহাত আমরা প্রতিদিনই লক্ষ্য করিয়া থাকি, শিশুকে সভ্য হইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলে, সে কেমন নির্দ্দোষভাবে তাহা উপেক্ষা করিয়া থাকে। কাপড় পরিবার জন্য উত্যক্ত করিলে, সে হয়ত তাহা পরিবে কিন্তু এমনি ভাবে হয়ত পরিবে যে সভ্য সমাজে বস্ত্র পরিধানের যে সার্থকতা তাহার প্রতি একবার ভ্রূক্ষেপও করিবে না।

প্রকৃত লজ্জা যৌবনাগমনের পূর্ব্বে হয় না। ইহার কারণও যে নাই, তাহা নয়। যে ভয় হইতে লজ্জার উৎপত্তি, যৌবনের পূর্ব্বে সে ভয়েরও কোন কারণ থাকে না। যৌবন সমাগমে নারী জাতীর মনে পুরুষ কর্ত্তৃক আক্রমণের একটা ভয় জন্মায়। এই ভয় হইতে লজ্জার সৃষ্টি হইয়াছে। গৌণ ভয় লজ্জার আদিম ওঅকৃত্রিম কারণ, কিন্তু ইহাই একমাত্র কারণ নয়। ইহাতে কেবল নারী জাতির লজ্জা সম্ভব, পুরুষের নয়। বসন ভূষণ প্রভৃতির ব্যবহার সুধু এই জাতীয় ভয় হইতে হইয়াছে, তাহাও বলা যায় না। লজ্জার দ্বিতীয় কারণ সামাজিক ভয়, ইহার বিষয় বলিতেছি।

সভ্য অসভ্য সকল জাতির মধ্যেই কতকগুলি সাধারণ প্রবৃত্তি আছে। ঘৃণা প্রবৃত্তি ইহাদের অন্যতম। কতকগুলি কাজ আছে সেগুলি হয়ত আমাদের শরীরের জন্য অত্যন্তই আবশ্যক কিন্তু সেগুলি যদি কেহ আমাদের চক্ষুর সম্মুখে সম্পন্ন করে তাহা হইলে সে ব্যক্তির প্রতি আমাদের ঘৃণার উদ্রেক হয়। অপরের যে কাজটি আমাদের নিকট হেয় ও ঘৃণাকর বলিয়া বিবেচিত হয় আমরা স্বয়ং অপরের সম্মুখে স্বভাবতই সেরূপ কাজ করিতে সঙ্কুচিত হই। এখন কথা এই কিরূপ কাজ আমাদের চক্ষে স্বভাবতঃ ঘৃণাকর ও হেয় বলিয়া বিবেচিত হয়? Richet (রিচেট্) বলেন—যাহা কিছু বিপদ জনক ও অমঙ্গলকর, তাহাই আমাদের দৃষ্টিতে ঘৃণাকর ও হেয় বলিয়া বোধ হয়। মল মূত্র প্রভৃতি প্রত্যক্ষ ভাবে আমাদের কোন কাজে আসে না, উপরন্তু এ সকল আমাদের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর, এই জন্য কোন আদিম যুগ হইতে এই সকল দ্রব্য মানুষের নিকট অস্পৃশ্য হেয় বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। সুধু তাহা নহে—মল মূত্র প্রভৃতির সহিত আমাদের শরীরের যে যে অংশের সম্বন্ধ সে স্থানগুলিও হেয় ও অস্পৃশ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। সেই কারণে, এই সকল বিষয়ে সর্ব্বদেশে, সকল জাতির মধ্যে এরূপ গোপনতা। সেই কারণেই শরীরের এই সকল ঘৃণাকর অপবিত্র স্থলগুলিকে প্রচ্ছন্ন ও লুক্কায়িত রাখিবার চেষ্টা দেখা যায়।

এবং সেই চেষ্টার ফলে বস্ত্র ব্যবহার রীতির আবিষ্কার হইয়াছে। তবে বস্ত্র ব্যবহারের ইহাই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। বর্ব্বর অসভ্য জাতির নিকটেও নগ্নতা লজ্জাকর বলিয়া বিবেচিত হয়, সুতরাং নিজের অশোভনীয়তা প্রচ্ছন্ন রাখাও বস্ত্র পরিধানের একটি প্রধান উদ্দেশ্য বলিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে আহার সংক্রান্ত একরূপ লজ্জার উল্লেখ করা আবশ্যক। অপরের সম্মুখে আহার করিতে অনেকের লজ্জা হইতে দেখা যায়। এ লজ্জার উৎপত্তি কোথায় তাহা বুঝা বড় শক্ত নয়। রাম উদর পুরিয়া পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করিতেছে, শ্যামের তাহা ঘটিতেছে না। এরূপস্থলে শ্যামের মনে ক্রোধ, হিংসা, ঘৃণা প্রভৃতি জন্মান অতিশয় স্বাভাবিক। ইহা হইতেই গোপনে আহার প্রভৃতির সৃষ্টি। আহার সম্বন্ধে পুরুষ অপেক্ষা রমণীর অধিক লজ্জা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার কারণ স্ত্রীলোকদের হৃদয় পুরুষের অপেক্ষা অধিকতর ভাব প্রধান। পরের মনে যাহাতে ব্যথা জন্মাইতে পারে রমণী তাহা সহজে করিতে পারে না।

লজ্জার উৎপাদন পক্ষে ঘৃণা-ভয় বড় সামান্য কারণ নয়। কাহারও মনে যদি এমন বিশ্বাস জন্মায়, কোন বিশেষ ব্যক্তির নিকট তাহার কোন আচরণ ঘৃণাকর বলিয়া বিবেচিত হইবে না, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির নিকট সেই কাজ করিতে তাহার কোনরূপ সঙ্কোচ জন্মায় না। প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে পরস্পর এইরূপ আত্মবিশ্বাস থাকায়, লজ্জার বাধা অনেকটা শিথিল হইতে দেখা যায়।

প্রধানতঃ শরীরের নিম্নাংশেই লজ্জা কেন্দ্রীভূত। তাহার কারণ—যে দ্বিবিধ ভয় হইতে লজ্জার উৎপত্তি, তাহাদের মূল কারণও ওই অংশে সংস্থিত। এই নিমিত্ত শরীরের এই অংশটাকে প্রচ্ছন্ন ও গুপ্ত রাখিবার জন্য মানুষের এত ব্যাকুলতা, এত চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়।

লজ্জার তৃতীয় কারণ—দেশাচার, ধর্ম্মাচার প্রভৃতি। দেশ বিভেদে জাতি বিভেদে আচারের বিভিন্নতা দেখা যায়। প্রচলিত আচার বিরুদ্ধ কোন কাজ করা লজ্জাকর বলিয়া বিবেচিত হয়। আমাদের দেশে স্ত্রী পুরুষের দিবাভাগে সাক্ষাৎ এককালে দেশাচার বিরুদ্ধ ছিল সুতরাং লজ্জাকর বলিয়া বিবেচিত হইত। এদেশে স্ত্রীলোকে ঘোমটা দেয়, পূর্ব্বে দিত না। মুসলমানদিগের আগমন হইতেই অবগুণ্ঠন প্রথার প্রবর্ত্তন হইয়াছে। মুসলমানেরাও সম্ভবতঃ আরববাসীদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রাচীন আরবে স্ত্রী

# মানসী

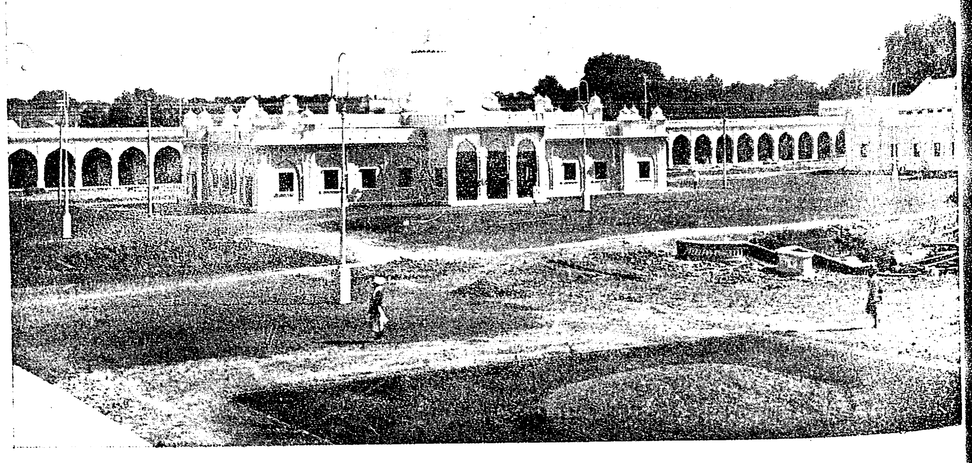

এলাহাবাদ প্রদর্শনীর সাধারণ দৃশ্য।

*Printed by K. V. Soyne & Bros.*



রমণীরাই অবগুণ্ঠন দিত তাহা নহে, সুশ্রী পুরুষগণও অবগুণ্ঠন ব্যবহার করিত। মুখ না ঢাকিয়া তাহারা লোকের সম্মুখে বাহির হইত না। ইহার মূলে একটা কুসংস্কার জড়িত ছিল—আরববাসীরা মনে করিত সুন্দর মুখ দেখিলেই লোকে "দৃষ্টি" দিবে, তাহাতে ওই সুন্দর মুখের অধিকারী বা অধিকারিনীর অমঙ্গল হইবে।

লজ্জার সহিত বসন ভূষণের যে সম্বন্ধ প্রসঙ্গক্রমে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। বসন ভূষণ ধারণ হইতেই যে লজ্জার উৎপত্তি একথা বলা যায় না। বসন ভূষণের আবিষ্কার হইবার পূর্ব্ব হইতেই লজ্জা বিদ্যমান আছে। দেহজাত লজ্জা জন্মাইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই আচার ব্যবহারে লজ্জা ছিল তাহার অনেক প্রমাণ থাকিতে দেখা যায়। বসন ভূষণের আবিষ্কার সম্ভবতঃ লজ্জার গৌণফল হইতেই হইয়াছে।

পুরুষের আক্রমণ ভয় হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টাতেই লজ্জার সৃষ্টি—কাল সহকারে সুধু আক্রমণ ভয় নয় রমণীর দেহের প্রতি পুরুষের নেত্র পতিত হওয়ার যে ভয় তাহাতেই লজ্জার পরিণতি প্রাপ্তি। রমণীর দেহের যে যে অংশে পুরুষের নেত্র নিপতিত হইবার সম্ভাবনা সেই সেই অংশগুলিকে আচ্ছাদিত রাখিবার জন্য রমণীর চেষ্টা।

আদিম বর্ব্বরতা ত্যাগ করিয়া, মানুষ যখন সমাজবদ্ধ অবস্থায় বাস করিতে শিখিল সে সময় পুরুষের হস্তে রমণীর লাঞ্ছনার তেমন আশঙ্কা রহিল না বটে, কিন্তু দৃষ্টি ভয়ত গেলনা। রমণী আত্মরক্ষার জন্য যে সকল ছলকলা, হাবভাব শিখিয়াছিল, এ সময় পুরুষের দৃষ্টিভয় হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে সেইগুলি প্রয়োগ করিতে ধরিল। ফলে ব্যাপারটা অনেকটা রঙ্গাভিনয়ের মত হইয়া দাঁড়াইল। প্রকৃত ভয়ের কোন কারণ নাই, অথচ আত্মরক্ষার চেষ্টা—ইহার গৌণফল রমণীর প্রতি পুরুষের চিত্ত আকর্ষণ ভিন্ন আর কিছুই নয়। ইহাই কালক্রমে courtship এ পরিণত হইল। রমণীর মুখের দিকে চাহিলে, তিনি যে মাথায় কাপড়টা টানিয়া চক্ষুদুটি ঈষৎ মুদিত করেন, অবস্থা বিশেষে ইহা পুরুষের চিত্তহরণের একটা উপায়স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল।

আবার এদিকে ঘৃণা উদ্রেকের ভয়ও লজ্জার উৎপত্তির একটী কারণ। ইহা নিবারণের জন্য মনুষ্যের মধ্যে বসন ভূষণের প্রচলন হইল। এই বসন ভূষণই আবার সময় বিশেষে রমণীর প্রতি পুরুষের চিত্ত আকর্ষণের একটা উপায় স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। খুব সভ্য সমাজেও, রমণীদিগের মধ্যে যেরূপ ভাবের

বেশভূষার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে খুবই অনুমান করা যায় বেশ ভূষার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র সংবরণ নয় তাহার সঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণও আছে। উচ্চ কুলোদ্ভবা হিন্দু বিধবার বেশভূষার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইহার সত্যতা আরও সুস্পষ্ট হইবে। তিনি আপনার অঙ্গে কোনরূপ ভূষণ ধারণ করেন না কোনরূপ সুদৃশ্য বস্ত্র পরিধান করেন না। এ সকলের উদ্দেশ্য—তাঁহার প্রতি যাহাতে পুরুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয় তাহারই একমাত্র চেষ্টা। বসন ভূষণের উদ্দেশ্য তাহা হইলে সুধু গোপন করা নয় সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করাও বটে।

শিল্পকলার উন্নতির সহিত বসন ভূষণেরও নানারূপ উন্নতি হইয়াছে। দেহের শোভা ও সৌকুমার্য্য বৃদ্ধিকর নানাবিধ বস্ত্রাভরণের আবিষ্কার হইয়াছে। এই সকল ধারণে রমণীর স্বভাবিক রূপ আরও বর্দ্ধিত হইতে দেখা যায়। যাহাতে বাহার ও শোভা বৃদ্ধি করে, তাহা যে লোকের নয়নাকর্ষক হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? এইরূপে কালক্রমে বস্ত্রাভরণ প্রভৃতি মর্য্যাদা ও গৌরব বৃদ্ধিকর বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী।

---

# ৺রমেশচন্দ্র দত্ত।

## তৃতীয় অধ্যায়।

আলিপুর, জঙ্গীপুর, বনগ্রাম ও মেহেরপুরে এসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য—"Bengal Magazine" পত্রে প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশ—Peasantry of Bengal পুস্তকে বঙ্গীয় কৃষককুলের দুর্দ্দশা বর্ণন।

কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়া রমেশচন্দ্র তদানীন্তন বঙ্গেশ্বর সার জর্জ্জ ক্যামবেলের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ছোটলাট তাঁহার বাক্যালাপে প্রীত হইয়া ১৮৭১ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে, তাঁহাকে আলিপুরের এসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করেন। তথায় বৎসরাধিক কাল থাকিয়া, ১৮৭২ সালের ৭ই নবেম্বর তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত জঙ্গীপুর মহকুমার ভার প্রাপ্ত হন। ১৮৭৩ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি তিনি নদীয়া জেলার বনগ্রাম মহকুমায়



বদলি হন। রমেশচন্দ্রের বনগ্রামে রাজকার্য্য সম্বন্ধে তাঁহার শ্যালীপতিভ্রাতা শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ লিখিয়াছেন:—"তিনি বনগ্রামে অবস্থানকালে গ্রামে গ্রামে পাঠশালা ও নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিবার অনুমতি দিয়া নিরক্ষর লোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার অনেক সুবিধা করিয়াছিলেন। তখন তিনি মফঃস্বল পরিদর্শন, ছাত্রদিগকে উৎসাহ ও পারিতোষিক দান, গুরুমহাশয়দিগের কার্য্য দেখিয়া বেতন বৃদ্ধি করা ইত্যাদি কার্য্যদ্বারা গ্রামবাসী ইতর সাধারণ লোকদিগকে বিদ্যার পথে অগ্রসর করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় বনগ্রামের কতক উন্নতি হইয়াছিল। তথাকার ভগ্ন ইস্কুলগৃহ নির্ম্মাণের সময় তিনি দেড় শত টাকা দান করিয়াছিলেন। তিনি কোন কোন দরিদ্র বালককে অর্থ দিয়া ইংরাজী লেখাপড়া শিখাইতেন, এবং স্বামীপুত্রহীনা নিরাশ্রয়া বিধবা রমণীদিগকে সাহায্য করিতেন।"

১৮৭৪ সালের ৮ই মে তারিখে, রমেশচন্দ্র নদীয়া জেলায় মেহেরপুর মহকুমায় বদলি হন। আশুবাবু লিখিয়াছেন:—"সেই সময়ে নদীয়া জেলার পশ্চিম প্রদেশে, বিখ্যাত পলাশির যুদ্ধক্ষেত্রের সন্নিহিত স্থানে, অতিশয় অন্নকষ্ট হইয়াছিল। নদীর জল বর্দ্ধিত হওয়ায় দেশ প্লাবিত ও শস্য সকল নষ্ট হইয়াছিল। কত নরনারী অন্নাভাবে শীর্ণ কলেবরে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত। শিশুসন্তানগণ মাতৃস্তনে দুগ্ধাভাবে হতশ্রী হইয়াছিল ও দিবারাত্র ক্রন্দন করিত। এই ভয়ানক অন্নকষ্ট নিবারণ জন্য, তিনি স্থানে স্থানে অন্নছত্র খুলিয়া, অসংখ্য লোকের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। কার্য্যক্ষম লোকদিগকে রাস্তা নির্ম্মাণের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যহ প্রত্যূষে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত স্থান সকল পরিদর্শন ও লোকদিগের আহারের তত্ত্বাবধান করিতেন। যে সকল অন্তঃপুরবাসিনী দরিদ্রা মহিলাগণ প্রকাশ্যস্থানে আসিতে সঙ্কুচিতা হইতেন, তাঁহাদিগকে চাউল ও পয়সা পাঠাইয়া দিতেন। তাঁহার সুবন্দোবস্তে অচিরকাল মধ্যে দুর্ভিক্ষের উপশম হইয়াছিল, এবং তিনি গভর্ণমেণ্ট হইতে সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।"

দুর্ভিক্ষ নিবারণের পর, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ১০ই নবেম্বর, রমেশচন্দ্র পুনর্ব্বার বনগ্রামে প্রত্যাগমন করেন। আশু বাবু লিখিয়াছেন:—"বনগ্রাম এলাকার কোন জমিদার জমির খাজনা অতিরিক্ত বৃদ্ধি করিয়াছিল। প্রজারা বর্দ্ধিত হারে খাজনা দিতে অস্বীকার করায়, জমিদার ও প্রজাদিগের মধ্যে ঘোর বিবাদ উপস্থিত হয়। প্রজারা জমিদারের নামে ফৌজদারি আদালতে নালিশ করে,

তিনি উভয় পক্ষের লোকদিগকে ডাকাইয়া, তাহাদিগের সম্মতিক্রমে জমির খাজনা নির্দ্ধারিত করিয়া আপোষে মোকদ্দমা মিটাইয়া দিলেন।"

মাইকেল ও বঙ্কিমের ন্যায় রমেশচন্দ্রের গ্রন্থকার হইবার প্রথম উদ্যমগুলি ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত। হুগলী কলেজের অধ্যাপক স্বর্গীয় রেভারেণ্ড লাল বিহারী দে, ১৮৭২ সালের আগষ্ট মাসে "Bengal Magazine" নামে এক খানি মাসিকপত্র প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। রমেশচন্দ্র ঐ পত্রে "Arcydae" ( অর্থাৎ R C. D. ) এই ছদ্মনামে নিয়মিতরূপে চারি বৎসর কাল লিখিয়াছিলেন। "Bengal Magazine"এ প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া ভবিষ্যতে "Peasantry of Bengal" এবং "Literature of Bengal" নামক দুইখানি পুস্তক বাহির হয়। উক্ত মাসিক পত্রে রমেশচন্দ্রের কয়েকটী ইংরাজী কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল—তিনি সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন নাই। ১৮৭৩ সালের জুন মাসের "Bengal Magazine"এ প্রকাশিত কবিতাটী উদ্ধৃত হইল :—

THE LAST DREAM OF LIFE.

( By Arcydae ).

I

——Ah who shall say
Why hopes and passions in me start,
And struggling in a fearful fray
Oppress my weary sunken heart ?
If hopes are cherished to be lost,
And passions felt but to be crost,
In tumult perish all
And thunder most when deepest fall,
Like cataracts the ear appal.

II

High hopes were mine when life began,
And pleasure softly flitting past,
First friendship's dream before me shone,
I fondly hoped the dream would last ;
But friends were strewn before, behind,
Like chaff before the angry wind,—
Each busy in his sphere,



Each in his round of hope and fear,
Each in his round of joy and care.

III

And Love ! thou cherub from the skies,
On thy sweet hopes I fondly trusted,
On thee I fixed my wistful eyes,
On thy delusions long I rested.
Of youth's fond eye the fondest beam,
Of youth's wild heart the wildest theme,
The longest cherished dream.
Alas ! now dried the heavenly stream,
In darkness quenched the lightning gleam.

IV

Dream after dream by shadows crost,
Like silence after thunder's roll,
Like lurid flames in darkness lost.
And shadows thicken on my soul !
Life's hopes are almost all o'ercast,
Ere yet my sunny youth be past,
Ere cold this cheerless heart !
Then wherefore still new passions start ?
Then wherefore acheth still my heart ?

V

There's one hope yet ; still shines afar,
Like some unearthly fitful flame,
Ambition's boldly throbbing star,
The radiant beaming star of fame !
Blazing deed and breathing thought,
Burning thoughts to madness wrought,
For this my bosom burns ;
If this lost hope now adverse turns,
I care not,—dust to dust returns.

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "Peasantry of Bengal" নামক পুস্তকে, যুবক রমেশচন্দ্র বঙ্গীয় কৃষকগণের দুর্দ্দশা, জমিদার ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে যে সকল অভিমত প্রকাশ

করিয়াছিলেন, প্রায় পঁচিশ বৎসর পরে প্রৌঢ়বয়স্ক রমেশচন্দ্র ঠিক তাহার প্রতিকূল মত প্রচার করিয়া ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করেন। উক্ত পুস্তক এক্ষণে বাজারে পাওয়া যায় না—রমেশচন্দ্র উহার পুনর্মুদ্রণ করেন নাই। ঐ গ্রন্থ হইতে কয়েকস্থল উদ্ধৃত করিয়া তাহার ভাবার্থ দেওয়া হইল ঃ—

(১) "Public opinion, such as it is in this country, is one sided and partial, and would oftener mislead than lead in the right direction. In advocating our rights, we often betray ourselves sadly wanting in sympathy for the uneducated millions, who really constitute the nation. Whoever has carefully examined the proceedings of our associations and the articles in our newspapers must be painfully alive to the truth of this remark. Rights of our educated countrymen to be employed in the higher grades of public service, rights of the leaders of our community to a place in the legislative councils, rights of zemindars to exemption from all land impositions,—these have been frequently advocated and insisted upon with vigour and eloquence ;—but the claims of the peasantry to be educated and to be represented, to be freed from the trammels of ignorance and saved from the oppression of zemindars,—such ideas have invariably emanated from our rulers and not from us. While legislation has been busy for the best part of a century in restricting the powers of the zemindars, our press, English or Vernacular, sees no such necessity,—while legislation for the past several years has been planning mass education, we have been calculating the probable loss that such a measure would inflict on high education. And yet high education concerns hardly one man in a thousand, and all that has been written or spoken in its favour,—all that has fired the patriotism of our countrymen and has filled the columns of our newspapers was for the interest and benefit of our man in a thousand,—the claims of the remaining nine hundred and ninety-nine being ignored or forgotten." ( Preface, pp. V to VII. )

ভাবার্থ ঃ—এদেশে সংবাদপত্রে বা সভাসমিতির মন্তব্যে সাধারণের মত



বলিয়া যাহা ঘোষিত হয়, অনেক সময়েই তাহা রাম-ছাড়া রামায়ণ। তাহাতে দেশের অস্থিমজ্জা স্বরূপ কোটী কোটী অশিক্ষিত ও দরিদ্র নরনারীর স্বাস্থ্য, শিক্ষা বা অর্থাগম সম্বন্ধে কোন চিন্তা বা সমবেদনার কথা দেখা যায় না। ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নানাবিধ অভাব ও অভিযোগ, নেতৃগণের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইবার আন্দোলন—দেশের কথা বলিতে আমরা এইরূপ কয়েকটী বিষয় ভিন্ন আর কিছুই বুঝি না। দেশের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ও ধনী সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার চেষ্টায় অবশিষ্ট সাড়ে পনের আনা অশিক্ষিত ও দরিদ্র অধিবাসীর সুখ দুঃখের কথা আমাদের মনে স্থান পায় না। আমাদের দেশের বিদেশী ও ও ভিন্নধর্ম্মী রাজা, জন সাধারণের হিতার্থ আমাদের অপেক্ষা অধিক মনোযোগ প্রকাশ করেন।

(২) "We do not know if it is very complimentary to our nation that they have always been but too ready to embrace the manners, and when necessary the religion, of the governing race. The tall and somewhat thick-skulled peasantry of Behar clung to their own religion, though they were not far from the capital and seat of the Moslem Empire ; but the Bengali changed his religion and manners fast enough till half the population turned Mehomedans." ( pp. 8-9 ). "The English Government manifests no partiality for those who embrace the religion of the governing race, and so very few of our countrymen have embraced the Christian religion. But the present Government does shower favour on those who learn the English language, acquire English sentiments and feelings, and imbibe English opinions in social and other matters. The people of Bengal, as distinguished from those of Behar, Orissa &c, have not been slow to perceive this, and have fast adopted the means of improvement afforded by our Government. The phenomenon of an Anglicised Hindu is to be found only in Bengal- In so far as the conversion in thought and ideas is sincere, it is certainly productive of good,—but often the appearance of liberalism is put on to prosper in the world, or win the respect of the governing race and then the thing is downright hypocrisy." ) Page 10 ).

ভাবার্থ :—বঙ্গদেশের অধিবাসীবর্গ চিরকাল তাঁহাদের বিজেতৃগণের ধর্ম্ম ও আদব কায়দা গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু বিহার ও উড়িষ্যার লোকে এরূপ করেন নাই। মুসলমান রাজত্বকালে বঙ্গদেশের নিম্নজাতীয় লক্ষ লক্ষ হিন্দু মহম্মদীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করে, তাহার ফলে এখন বঙ্গদেশের প্রায় অর্দ্ধেক লোক মুসলমান। ইংরাজের নিকট প্রশ্রয় পাইবার লোভে কেবলমাত্র বাঙ্গালীর মধ্যেই একটী আধাফিরিঙ্গি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়াছে। ব্যক্তিগত সুখের জন্য আমাদের মধ্যে অনেকেই ধর্ম্ম ও সামাজিক কল্যাণে জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত।

(৩) "On Lord Cornwallis's head will rest the guilt, that the most fertile source of revenue in a fertile country has been closed up for ever,—that the extension of cultivation has increased, not the wealth of the cultivators, but the number of a class of impoverished idlers, the zemindars with a two-anna or one anna share of the ancestral estate. On his lordship's head rests the blame, that we do not yet see the faintest glimmerings of rural civilisation, that the ryot of the present day is as thoughtless and improvident a creature as he was centuries ago, despite the notions of enlightenment imported from the west, despite the energetic efforts of English administration to remedy the defect." ( page 49 )

ভাবার্থঃ—লর্ড কর্ণোয়ালিস ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া জমিদারগণের যেরূপ সুবিধা করিয়াছেন, কৃষক প্রজাগণের সেইরূপ সর্ব্বনাশও করিয়াছেন। কর্ণোয়ালিসের মোহবশতঃ বঙ্গদেশ হইতে লভ্য সরকারী রাজস্বের হ্রাস হইয়াছে, এবং কয়েকজন অকর্ম্মণ্য জমিদার ও পত্তনীদারের উদরপূর্ত্তি ও বিলাসের উপকরণ জুটাইবার জন্য দেশের অস্থিমজ্জারূপ কৃষককুল জন্মের মত পরমুখাপেক্ষী নির্ব্বোধ জীবশ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে।

(৪) "We would strongly recommend the abolition of the *mukteare* system as it prevails at present in our country. .....The muktears coach parties and witnesses in falsehood invented for the occasion, and invest simple cases with huge fabrications, and so attempt to defeat the purposes of justice. .....We do not konw how far even the



employment of Barristers and Vakeels by private parties in the superior courts serves the purposes of justice. The rich criminal secures the highest talent and eloquence to screen him from deserved punishment, the poor man who seeks justice has none to advocate his claims and many to oppose them." ( Page 103 ). "The *amlahs* of our courts, humble to servility before the hakim, haughty and overbearing towards all outsiders, and in corruptness and dishonesty yielding to no class of people on the face of the earth." (page 104).

ভাবার্থঃ—পল্লিগ্রামের মোক্তারগণ নিরক্ষর কৃষকদিগকে কেবল মিথ্যা কথা কহিতে শিক্ষা দেয়, সেই জন্য মোক্তারকুলের উচ্ছেদ সাধনই শ্রেয়ঃ। আদালতের পাপিষ্ঠ আমলাগণ জলৌকার ন্যায় কৃষকগণের রক্ত শোষণ করে। ব্যারিষ্টার ও উকিলেরা ধনী মক্কেলের পক্ষে দাঁড়াইয়া বিচারকের চক্ষে ধূলি দিতে চেষ্টা করে। দরিদ্র ও অশিক্ষিত কৃষককুলের সকল দিকেই বিপদ—তাহাদের জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাগ।

(৫) "The ryots complain with justice, but complain in vain, that the kind care manifested by the British government in the Revenue laws to protect their interest is all in vain, for the remedy afforded therin, viz. by complaining in Civil courts against unjust exactions and unlawful ousting is too expensive for them to adopt ; and law therefore is in many cases a dead letter to them." ( page 112). "The Bengali is naturally so averse to actual violence and warfare that, so long as there is the remotest possibility of justice being obtained at a court of law, he will not go to actual fighting ; and it is only when our civil courts literally scare him away with a cheerless prospect of delay and expense that he involuntarily has recourse to the last means left." (page 113 ).

ভাবার্থঃ—ইংরাজ-রাজের বিধিব্যবস্থাগুলি মঙ্গলকর, কিন্তু আদালতে গিয়া মোকদ্দমা চালাইতে এত অবসর ও অর্থের প্রয়োজন, যে আইনের সাহায্যে নিজের স্বার্থ বজায় করা দরিদ্র কৃষকগণের পক্ষে অসম্ভব। স্বভাবতঃ নিরীহ হইলেও, তাহারা এইহেতু সময়ে সময়ে আইন অমান্য করিয়া, পরস্পরের মধ্যে লাঠালাঠি করিতে বাধ্য হয়, এবং তজ্জন্য নানাপ্রকার নিগ্রহ ভোগ করে। আদালতগুলি কৃষকদিগের অত্যন্ত অল্প উপকারই সাধন করে।

(৬) "At one time cotton spinning was the chief occupation of most village women, and specially widows, but in the present days the thread and fabrics imported from Manchester are so much cheaper and better than what is produced at home, that the home products fail to find an adequate market, and both spinning and weaving have much decreased in late years,—thereby inflicting a serious loss on the weaver castes of Bengal. Some of our countrymen diplore this as an unmitigated evil, but judging impartially we are bound to say that the benefits derived greatly preponderate the evil. The evil concerns only one particular class, viz. the weavers, and also to a very small extent those women who used to derive some profit from spinning. In any European country the evil would not have been felt, in as much as the weaver capitalists on finding their trade unprofitable would at once have turned their capital to more lucrative manufactures ; but in a country like Bengal, where custom is the law of the land, and weavers are weavers not by choice but by birth, and cannot soon choose a different profession, the evil no doubt is long felt. But the benefits derived are national and universal,—the titled Raja, the respectable Government servant, the village Mahajan and gomasta, the plodding ryot, all get better clothing at a cheaper price." ( pp. 144 ).

ভাবার্থঃ—কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এদেশের তন্তুবায়কুল কাপড় বুনিয়া, এবং দরিদ্রা রমণীগণ চরকায় সুতা কাটিয়া, দিনপাত করিত। বিলাতী কাপড়ের আমদানিতে তাহাদের অন্ন উঠিয়াছে। নিরপেক্ষভাবে দেখিতে গেলে, ইহাতে সমগ্র দেশের ক্ষতি হয় নাই, দেশের অধিবাসীগণের এক শ্রেণীর ক্ষতি হইয়াছে। এখন ধনাঢ্য জমিদার হইতে নিরন্ন কৃষক পর্য্যন্ত প্রায় সকল শ্রেণীর লোকে বিলাতে প্রস্তুত সুলভ ও উত্তম কাপড় পাইয়া উপকৃত হইয়াছে।

শ্রীগৌরহরি সেন।

---



# মৃত্যুর দান। *

তুমি সদা ডেকে বল সকালে সন্ধ্যায়,
"হেথা নিরালয়ে আমি একা অসহায়।"
এই পথ ধরি যবে চলি কোন দিন,
বজ্র সম বাজে বুকে ভাষা মৃদু ক্ষীণ।
মনে পড়ে একদিন প্রভাত বেলায়,
ধরিত্রীর কোলে দিনু সঁপিয়া তোমায়।
জননীর বুক ফাটি তপ্ত রক্ত ধারা,
অশ্রুরূপে করেছিল ম্লান আঁখিতারা।
কেঁদে কেঁদে বলেছিনু 'হে মাতঃ ধরণি!
বুকে রেখ চিরদিন হৃদয়ের মণি।
জীবিত রেখেছে সেই আপন সন্তানে
জননী নিভৃতে তারে স্নেহ স্তন্য দানে।
তাই আজি দেখিলাম সন্ধ্যাবেলা আসি,
পুষ্পরূপে ফুটিয়াছে তব শুভ্র হাসি।
তোমার সৌরভে স্নিগ্ধ ধরণী আকাশ
তোমারি লাবণ্যে শুভ্র জ্যোতির বিকাশ।
মৃত্যু কোথা! বিলায়েছ ক্ষুদ্র আপনায়
এ জগতে বর্ণগন্ধ আলোক ধারায়
তুমি আজ নামিয়াছ পুষ্পবৃষ্টি সম,
অশ্রুসিক্ত মোহে অন্ধ হৃদয়েতে মম।
অমর হইয়া আছ বকুলের তলে
উচ্ছল আনন্দ তাই পত্রপুষ্পদলে।,
মলয় পাড়ায় ঘুম, পাখী গায় গান ;
চির লীলাময়ী তুমি মরণের দান!

শ্রীঅনন্তনারায়ণ সেন।

---

* ইটালী গভর্ণমেণ্ট সেমিটী তে লেখকের শিশুকন্যা 'লীলার' সমাধি দেখিয়া লিখিত।

# বঙ্গরমণী।

## কন্যার শিক্ষা ও বিবাহের বয়স।

যে সমাজে রমণীর এতাদৃশ সম্বর্দ্ধনা, সম্মান ব্যবস্থিত হইয়াছে, সেই সমাজে রমণীকে পুরুষের অধীনা দাসী করিতে কখনই শাস্ত্রকারেরা বিধান করেন নাই। সুতরাং কৌমারে স্ত্রীশিক্ষার সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়া শাস্ত্রকারেরা বিবাহ পদ্ধতি সম্বন্ধে সুনিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। প্রথমেই বালিকার কিরূপ বয়সে বিবাহ দেওয়া উচিত, তাহাই বিবেচিত হইতেছে। একদিকে যেমন অষ্টম বর্ষে গৌরীদানের কথা লিখিত আছে, অপর দিকে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে স্থান কালাদি বিবেচনায় চতুর্দ্দশ বৎসরে বিবাহের ব্যবস্থাও লিখিত আছে। কেবল ইহাই নহে—মনু স্পষ্টই লিখিয়াছেন, সুপাত্র না পাইলে আজন্ম কুমারী রাখাও শ্রেয়—তথাপি গুণহীন পাত্রের করে কন্যাকে অর্পণ করা অবিধেয়। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, কন্যা অষ্টম বর্ষে যদি বিবাহযোগ্য হয়—যদি সৎপাত্র পাওয়া যায়, এবং সর্ব্বপ্রকার বিবাহ বিধেয় বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে বিবাহ দেওয়া উচিত। দুঃখের বিষয়, এ সকলের প্রতি অধুনা বঙ্গবাসীর দৃষ্টি নাই; বিচার বিতর্ক না করিয়া সম্মতি অসম্মতির কথা ত্যাগ করিয়া অনেক কুসংস্কারাপন্ন জনক জননী সুকুমারমতি বালক বালিকাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিয়া আজীবন কঠোর যন্ত্রণাভোগের ব্যবস্থা করিয়া তুলেন।

ইহা কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন না যে, দূরদর্শী ঋষিগণ বিবাহের কাল, প্রভৃতির বিষয় আদৌ চিন্তা করেন নাই। বালিকার যদি অল্প বয়সেও বিবাহ হয়, তথাপি অন্যান্য সংস্কার,—যথা দ্বিরাগমন, সীমন্তোন্নয়ন, গর্ভাধান প্রভৃতি পালন করিতে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইয়া যায়। শাস্ত্রে সংস্কারাদি সম্বন্ধে যেরূপ বিধান আছে, এখন তাহা নামে মাত্র পর্য্যবসিত হইয়াছে, অথচ যাহা কিছু মন্দাংশ তাহাই পালিত হইতে থাকে। ইহার ফলে সমাজের পতন অবশ্যম্ভাবী হইতেছে। যদি শাস্ত্রাদেশ মান্য করিতে হয়, তাহা হইলে উহা সম্পূর্ণভাবে পালন করা উচিত। নতুবা কিয়দংশ পালন করিব, আর কিয়দংশ ত্যাগ করিব, ইহাকে শাস্ত্রাদেশ পালন করা বলা যাইতে পারে না। তর্কানুরোধে যদি স্বীকার করাই যায় যে, বাল্য-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত কার্য্য, তাহা হইলে সুদ্ধ বাল্য-বিবাহ বলবৎ রাখিব, আর অন্যান্য সংস্কার ত্যাগ করিব ইহা কি প্রকৃত হিন্দু ধর্ম্মসম্মত কার্য্য হইতে পারে?



যাহার বিবাহ হইবে, সে যদি বিবাহের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারে, তাহা হইলে 'পড়াপাখীর মতন' মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া কি ফল হইয়া থাকে? ইহা বোধ হয় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন, জন্ম মৃত্যু বিবাহের ন্যায় মানবজীবনের আর কোন বৃহৎ ঘটনা নাই। বিবাহ একটা প্রধান সংস্কার, হিন্দুর বিবাহ কেবল চুক্তি নহে—ঐহিক পারলৌকিক সম্বন্ধবিশিষ্ট। এরূপস্থলে বিবাহের প্রকৃত অর্থ যখন বর কন্যার সম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত হইবার সম্ভাবনা, সেই সময়েই বিবাহের ব্যবস্থা করা সমীচীন নহে কি? আমাদিগের মনে হয়, ইহার নিমিত্তই শাস্ত্রকারগণ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বয়সের উপযুক্ততা সম্বন্ধে স্থির নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন।

শাস্ত্রে সৎপাত্রে কন্যাদানের বিধান আছে। কয় জন জনক বা অভিভাবক এখন সৎপাত্রের কথা ভাবিয়া থাকেন? বিবাহে যেরূপ পণাদির ব্যয়বাহুল্য ঘটিয়াছে, তাহাতে কোনপ্রকারে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার পাইলেই অনেকেই বাঁচেন। কাযেই পাত্রের গুণাদির বিচার অপেক্ষা ব্যয়-বিচার সর্ব্বাগ্রে মনোমধ্যে উদিত হইয়া থাকে। এইরূপে শাস্ত্রাদেশ লঙ্ঘনের জন্য হিন্দুশাস্ত্রমতে জনক জননী বা অভিভাবকমণ্ডলীকে নিরয়গামী হইতে হয় নাকি?

বাল্য বিবাহ শাস্ত্রীয় বিধান বলিয়া যাঁহারা দুগ্ধপোষ্য বালিকার বিবাহে সতত তৎপর, আমরা তাঁহাদিগের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারি না। যেরূপ দিনকাল পড়িয়াছে, দেশের ও সমাজের অবস্থা যেরূপ ঘটিয়াছে তাহাতে আমরা পদে পদে শাস্ত্র বিধি অবহেলা করিয়াছি, সকল বিধির প্রতি আমাদিগের আদৌ দৃষ্টি নাই, অথচ কেবল গৌরীদানের জন্য লালায়িত ইহা কমবুদ্ধির পরিচয় নহে কি? বিধিনিষেধ মানিতে হইলে সকল বিধিনিষেধ মানিয়াই চলা উচিত। যদি শাস্ত্রসঙ্গত সংস্কারাদি মানিয়া চলা হয়, যদি পুত্রের ও কন্যার শিক্ষার প্রতি প্রযত্নপর হইতে হয়, বিবাহের পর সকল অনুষ্ঠানই কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রাদেশের দোহাই দেওয়া চলে, কিন্তু কোথাও কিছুই নাই পদে পদে শাস্ত্রের মস্তক চর্ব্বন করিতেছি, আর কন্যাদানের সময় অথবা বিধবাবিবাহের সময় যত শাস্ত্র কথা উত্থাপন করিয়া থাকি ইহা ভণ্ডামী ব্যতীত আর কিছু কি?

মনুষ্যমাত্রেরই রুচির পার্থক্য আছে। আমি যাহা ভালবাসি অন্যে তাহা ভালবাসিতে না পরে। এরূপ স্থানে, কি স্ত্রী কি পুরুষ উভয়েরই মনোমত পাত্রপাত্রী স্থির করিয়া অভিমত প্রকাশ করিবার স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে থাকা উচিত। হিন্দুর বিবাহ যখন চুক্তি মাত্র নহে ইচ্ছা করিলেই বিবাহচ্ছেদ

করিবার যখন উপায় নাই, স্ত্রী অথবা স্বামী পরস্পর পরস্পরকে যখন ত্যাগ ( Divorce ) করিতে পারেন না তখন উভয়ের এরূপ বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত নয় কি, যখন উভয়েই উভয়ের মনোবৃত্তি প্রভৃতি পরিজ্ঞাত হইয়া বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইবার সম্বন্ধে স্বাধীন মত প্রকাশ করিতে পারে? শাস্ত্রের কথা পরিত্যাগ করিলেও বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থাতেই হিন্দুর বিবাহ বন্ধন আমরণ ছিন্ন হয় না বলিতে হইবে। যাহার সহিত আমরণ সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে তাহার প্রকৃতি বিদ্যাবুদ্ধি কুলশীল বংশমর্য্যাদা রূপ গুণ পরস্পরের জানিবার এবং বুঝিবার অবসর পওয়া উচিত নয় কি?

কেহ এরূপ মনে করিবেন না, আমরা পাশ্চাত্য সমাজের ন্যায় স্বাধীন প্রেম বা কোর্টসিপের পক্ষপাতী। আমাদিগের বক্তব্য বিবাহ সম্বন্ধে অভিভাবকগণ যেরূপ সকল দিকে বিবেচনা পূর্ব্বক অভিমত প্রকাশ করিবেন পাত্র ও পাত্রী তদ্রূপ মত প্রকাশ করিতে পারিবেন, এরূপ বিধান প্রবর্ত্তিত হউক।

পাত্রীর পাত্রমনোনয়ন প্রথা কেবল যে পাশ্চাত্য সমাজে প্রচলিত তাহা নহে। আর্য্যজাতি যখন সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরূঢ় হইয়াছিলেন, তখন মনোনয়ন প্রথা সম্যকরূপে প্রচলিত ছিল। সকলেই জানেন এদেশে একপ্রকার বিবাহ প্রথা পূর্ব্বে প্রচারিত ছিল না। প্রাজাপত্য গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস আসুর পৈশাচ প্রভৃতি বিবাহের ব্যবস্থা হিন্দুশাস্ত্রে প্রচলিত হয়। যে সমাজে স্বয়ম্বর প্রথা প্রচলিত ছিল সে সমাজে নারিজাতির বিবাহসম্বন্ধে স্বাধীনমত প্রকাশের ক্ষমতা যে অক্ষুণ্ণ ছিল তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

এখন যদি কেহ বলেন যে সমাজে পূর্ব্বে যে সকল বিধিনিষেধ প্রচলিত ছিল, এক্ষণে তাহার অনেকগুলিই নাই; প্রত্যেক যুগেই সমাজের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সুতরাং সামাজিক আচার ব্যবহার রীতি পদ্ধতিরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এরূপ স্থানে পূর্ব্ব যুগের আচার ব্যবহারের দোহাই দেওয়া কোনমতেই যুক্তিসিদ্ধ নহে।

আমরা এই শ্রেণীর আপত্তিকারীদিগের উক্তির বিরুদ্ধে বলিতে পারি যে বর্ত্তমান কালে কন্যার বিবাহের বয়স নানা কারণে ১২।১৩ এমন কি ১৪।১৫ বৎসর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিবাহের ব্যয় সুপাত্রের অভাব প্রভৃতি এই বয়োবৃদ্ধির মুখ্য কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণ কায়স্থের ঘরে গৌরীদানের প্রথাটা একবারে উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। ইহাতে লোকে এক্ষণে আর নিন্দাভাজন হইতেছেন না। সুতরাং যাঁহারা যে



বয়সে ইচ্ছা, কন্যার বিবাহ দিতে পারিবেন, এরূপ ব্যবস্থা নিয়ম না রাখিয়া বরাবর একটা নির্দ্দিষ্টসীমা করিয়া দেওয়া ভাল। আমাদিগের মনে হয়, যদি এরূপ নিয়ম করা হয় যে ১৪ বৎসরের কম কেহ কন্যার বিবাহ দিতে পারিবেন না, তাহাহইলে কেবল যে সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করা হয় তাহা নহে অনেকের পক্ষে ব্যক্তিগত সুবিধাও হইতে পারে। ইহাতে বাল্যবিবাহ রোধ, বিবাহে কন্যার অভিমত প্রকাশের ক্ষমতা প্রভৃতি হইতে পারে।

কেবল তাহাই নহে। সকলেই সহবাস সম্মতি আইনের কথা অবগত আছেন। ১২ বৎসরের ন্যূনবয়স্কা স্ত্রীর সম্মতিদানের ক্ষমতা নাই গবর্ণমেণ্ট তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাইলে স্বামীকে কারাযন্ত্রনা ভোগ করিবার ব্যবস্থা আছে। এই জন্য ১২ বৎসরের ন্যূন বয়সের বালিকার পাণিপিড়নের নিয়ম কখনই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। যখন সম্মতি আইন বিধিবদ্ধ হয় তখন এদেশে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পর কি হইল? সেই হিন্দুধর্ম্ম সেই জাতিশিক্ষা সমান ভাবে চলিয়া আসিতেছে, সম্মতি আইনের জন্য হিন্দুসমাজের তিলমাত্র ক্ষতি হয় নাই—বরং উন্নতিই সাধিত হইয়াছে।

সকল দেশে সকল সমাজে সংস্কারের কথা উত্থাপিত হইলেই একটা গণ্ডগোল পড়িয়া যায়। সমাজে অনুদারতা অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়া থাকে, তাই উদারভাবের উন্মেষ সংস্কারের প্রবর্ত্তনে সঙ্কীর্ণমনাদিগের মনে আশঙ্কার উদ্রেক করিয়া থাকে। শিক্ষা, দীক্ষা, সভ্যতা প্রভৃতির প্রচার না হইলে অনুদারতা, সঙ্কীর্ণতা সহজে তিরোহিত হয় না। সকল দেশেই, সকল সমাজেই শিক্ষিত, সভ্য লোকের সংখ্যা অপেক্ষা অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত লোকের সংখ্যাই অধিক আছে। ইহার মধ্যে ভারতে অশিক্ষিত, নিরক্ষরের সংখ্যা ত আরও অধিক, কাজেই এদেশে সংস্কারের নামে লোকে প্রথমেই অধিকতর শিহরিয়া উঠে। অশিক্ষিত লোকদিগকে সংস্কারের নামে ভীত চকিত দেখিয়া শিক্ষিত লোকে যদি সংস্কার প্রবর্ত্তনে পশ্চাৎপদ হন্ তাহা হইলে শিক্ষিত লোককে নিন্দাভাজন হইতে হয়, সমাজের কল্যাণ কিছুতেই সাধিত হইতে পারে না। শিক্ষিত শ্রেণী অশিক্ষিত শ্রেণীর পথপ্রদর্থক হইয়া থাকেন। যাঁহাকে পথ পরিষ্কার করিতে হয়, তাঁহাকে নানারূপ ক্লেশভোগ করিতে হয়। তাই সংস্কারের জন্য মস্তকের উপর দিয়া নানারূপ ঝঞ্ঝাবাত

বহিয়া যায়, সংস্কারকের দলকে নানারূপ নিগ্রহভোগ করিতে হইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। শাক্যসিংহ, যিশু, মহম্মদ, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি মনীষিগণের জীবন-বৃত্ত পাঠ করিল,আমাদিগের উন্নতির যথার্থ উপলব্ধি হইবে।

আমাদিগের মনে হয় অন্য কোন কারণে না হইলেও কেবল সহবাস আইনের হেতু কন্যার বিবাহের বয়স ১২ বৎসরের অধিক হওয়া উচিত। কারণ ১২ এবং ১৩ বৎসর বয়সের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা সুকঠিন। যদি ঘটনাবশে সম্মতি আইনের বিপাকে কাহাকেও পতিত হইতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে কন্যার বয়স ১৩ হইয়াছে, ইহা নিঃসংশয়রূপে প্রমাণ করা সুকঠিন হইতে পারে। এরূপস্থলে ১৪ বৎসর বিবাহের বয়স নির্দ্দেশ করা কোনমতেই অন্যায় হয় না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি,স্ত্রীলোকের বিবাহসম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিবার ক্ষমতা হইতে পারে, এরূপ বয়স "১৪ বৎসর" নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বিবাহে কন্যার মতামত গ্রাহ্য করা কেন প্রয়োজন, তাহাও পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। সংসারে পুরুষ নানাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকে, কিন্তু স্ত্রীলোকের জীবনের প্রধান ও প্রথম ব্রত প্রেম। এ সম্বন্ধে লর্ড বাইরণ লিখিয়াছেন.

"Man's love is of man's life a thing apart
T'is woman's whole existence : man may range
The court, camp, church, the vessel and the mart ;
Sword, gown, gain, glory, offer in exchange
Pride, fame, ambition to fill up his heart,
And few there are whom these can not estrange ;
Men have all these resources, she but one,
To love again, and be again undone.

রমণীর হৃদয় যে কোমলতার আধার দয়া দাক্ষিন্যের প্রস্রবণ, মায়ামমতার লীলানিকেতন প্রণয় প্রীতির কেন্দ্রস্থল তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। অস্ফুটন্ত কোরককে লইয়া পদদলিত করা যদি নির্ম্মমতা হয়, তাহা হইলে সংসার জ্ঞানবিরহিতা, ধূলিখেলায় নিরতা, বালিকাকে তাহার মনোভাব পরিজ্ঞাত না হইয়া একজনের করে চিরতরে অর্পন করা নৃশংসতা নহে কি ? তুমি পিতা হইয়া, মাতা হইয়া, ভ্রাতা হইয়া, খুল্লতাত হইয়া, মাতুল হইয়া, আত্মীয় স্বজন হইয়া কি করিয়া সরলা বালিকাকে সংসারের বিষম ফাঁদে নিপতিত



করিতেছ ? তাহার যে জীবনসহায় হইবে তাহার রীতি নীতি, শিক্ষা দীক্ষা আচার ব্যবহার, কুল শীল, চাল চলন কিছুই বুঝিল না জানিল না, সমাজের কঠোর নিয়মে অভিভাবকবর্গের প্রপীড়নে আজন্ম পরিনয় সূত্রে বালিকা আবদ্ধ হইল। তাহার পর সংসারের ভার বহন করিয়া যখন সময় আসিল, তখন সে দেখিল যাহার সহিত উদ্বাহ বন্ধনে সে আবদ্ধ হইয়াছে সে নরাকার পশু। এখন ভাবিয়া দেখুন, ঐরূপ স্বামীর সহিত একত্রে বাস করা, কিরূপ কষ্টদায়ক প্রাণান্তকর।

শ্রীতারাপ্রসন্ন মিত্র।

---

# যুগল বিধবা।

আয় সখি খুলে দিই বিনানো বেনীটী তোর
তুইও দে সখি ! খুলে সাধের কবরী মোর।
কাটি আয় দুজনায় দুজনার কেশভার
মুছে ফেলি আয় সখি ললাটিকা দোঁহাকার।
বলয় বাজিয়া ওঠে আঁধার হৃদয় মাঝ
বেদনা জাগাতে যদি বলয় রাখি কি কাজ ?
তারপর—নয়নের বিদ্যুৎ নিঙাড়ি আয়,
যতনে মিশায়ে দিই আকাশ বিজলি গায় !
অধরের হাসিটুকু কি সাধে ফুটাবি আর !—
হক্ তাহা পরিণত তপ্তশ্বাসে বেদনার !
স্বামীসনে সুখরাজ্য হয়েছে তো অন্তর্হিত—
প্রবৃত্তির চিরদ্বন্দ্ব পড়ে থাক চিরমৃত !
সুখের সংসার গেছে ! আয় বোন্ দুজনায়
দুখের ত্রিদিব গড়ি বিধবার বেদনায় !—

শ্রীপাঁচুলাল [illegible]

---

# অসমাপ্ত কাব্য।

অরবিন্দ নাথ যখন প্রথম জে,াতিপ্রকাশ মিত্রের নিকট মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে কর্ম্ম সহচরের পদে নিযুক্ত হইলেন, তখন কে জানিত যে এক দিন সেই আশ্রয় আশ্রিত সম্বন্ধ ঘুচিয়া উভয়ের মধ্যে এক অপূর্ব্ব সৌখ্যের সম্বন্ধ জন্মিবে। জ্যোতিপ্রকাশ বাবু যখন চল্লিশের ঘর অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়ত্বে প্রতিষ্ঠিত তখন অরবিন্দ পঞ্চবিংশতি বর্ষীয় যুবক। তাঁহাদিগের এই অসমবয়সের বন্ধুত্ব একটু অস্বাভাবিক বলিয়া আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবদিগের মধ্যে অনেকেই বিদ্রূপ করিত, তার পর পাঁচ ছয় বৎসর একত্র বসবাস করিয়া একদিন যখন অরবিন্দ সহসা বন্ধুর আশ্রয় ত্যাগ করিল, তখন পরোক্ষে অনেকে অনেক কথা কহিল কিন্তু জ্যোতিপ্রকাশ বাবু জানিতেন, তাঁহাদিগের ভাবের অভাবে সে বিঘ্ন ঘটে নাই।

জ্যোতিপ্রকাশ মিত্র প্রভূত ধনশালী পিতার একমাত্র সন্তান, পিতা বর্ত্তমানেই এল, এ পাশ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সম্বন্ধ শেষ করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর জননীকে লইয়া তিনি কলিকাতার অনতিদূরে গঙ্গাতীরস্থ বাগান বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন। পিতৃত্যক্ত স্থাবর অস্থাবর বহু সম্পত্তি পাইয়াও তাঁহার চিত্ত বিকৃতি প্রাপ্ত হয় নাই, তাহার একমাত্র কারণ জ্যোতিপ্রকাশের অন্তরে অসাধারণ জ্ঞানের পিপাসা এবং উচ্চ আদর্শ ছিল। তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় সাহিত্য চর্চ্চায় কাটাইতেন্।

শোনা যায় বাল্যকাল হইতেই জ্যোতিপ্রকাশের একটু ভাবাধিক্য ছিল। যৌবনারম্ভ হইতে অনেকের প্রেমসাগরে হাবুডুবু খাইয়া, বহুবার ভগ্নহৃদয়ের দুঃখ ভোগ করিয়া অবশেষে যখন তিনি বুঝিলেন যে ভাবের আধিক্য কিছু নয় তখন অধিক বয়সে জননীর অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া প্রেম ছাড়াইয়া দ্বাদশবর্ষীয় রাজলক্ষ্মীকে বিবাহ করিয়া ফেলিলেন, এবং দেখিলেন হৃদয় জিনিষটা এতই প্রকাণ্ড যে বহুবার ভগ্ন হওয়া সত্ত্বেও রাজলক্ষ্মীর জন্যও কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট আছে। তার পর জননীর মৃত্যুর পর এক সময় দেখিলেন ষোড়শবর্ষীয়া রাজলক্ষ্মী "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা"বৎ তাঁহার অন্তরে বাহিরে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পড়িয়াছে।

জ্যোতিপ্রকাশের কি ইংরাজি কি বাংলা সব কাব্য ইতিহাস ও নাটকে সমান রুচি ও অধিকার ছিল। এক সময় তাঁহার এক খেয়াল চাপিল—মনে



মনে ভাবিলেন এদেশের রঙ্গমঞ্চে যে সকল কুরুচিপূর্ণ হাস্যোদ্দীপক নাটকের অভিনয় হয়, সেগুলির একেবারে লোপ হওয়া আবশ্যক, তৎপরিবর্ত্তে ভাল ভাল বিষয়ে কাব্য নাটকাদি লিখিয়া ওই সকল রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করাইতে পারিলে দেশের একটা মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। জ্যোতিপ্রকাশ বাবু যখন শুনিলেন অরবিন্দ ভাল ভাল মাসিক পত্রিকায় লিখিয়া থাকেন এবং সাহিত্য জগতে তাঁহার খ্যাতিও আছে তখন মনে করিলেন ঠিক এই লোকটিকেই যেন এতদিন ধরিয়া অন্বেষণ করিতেছিলেন, সেইদিন হইতে অরবিন্দকে সঙ্গী করিয়া লইলেন, বয়সের পার্থক্য সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে যে অবিচ্ছেদ—বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল তাহাকে মোহ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

জ্যোতিপ্রকাশ বাবুর বাগান বাড়িটী দ্বিতল, উপরে গৃহিণী রাজলক্ষ্মীর মহল নীচে বাবুর বৈঠকখানা। পশ্চাতে নির্ম্মল ও স্বচ্ছসলিল পূর্ণ দীর্ঘ সরোবর, পর পারে আমবাগানের ভিতর অরবিন্দনাথের জন্য একখানি সুন্দর বাঙ্গলো প্রস্তুত হইয়াছে, সেইখানে জ্যোতিপ্রকাশ সন্ধ্যার পর অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত অরবিন্দনাথের সংসর্গে সাহিত্য চর্চ্চায় কাটাইয়া থাকেন। এপারে বাঁধানো ঘাটের উপর রাজলক্ষ্মীর শয়নকক্ষসংলগ্ন খোলা ছাদ, সন্ধ্যার পর তিনি প্রত্যহ সেই খোলা ছাদেই ঘুরিয়া বেড়ান।

প্রায় আট বৎসর যাবৎ রাজলক্ষ্মীর বিবাহ হইয়াছে, সন্তানাদি হয় নাই, সুতরাং স্বামীই তাহার সংসারে একমাত্র বন্ধন, নিঃসন্তান রমণীর যত আশা ভরসা একমাত্র স্বামীতেই নিহিত ছিল। অরবিন্দ তাঁহাদিগের পরিবারভুক্ত হইবার পর এক সময় রাজলক্ষ্মীর মনে হইল স্বামীর সে মন আর নাই, তাঁহাকে দেখিবার জন্য কারণে অকারণে বার বার ঘুরিয়া ফিরিয়া আর আসেন না, নিঃসঙ্গ দিনগুলি কেমন করিয়া কাটিবে সে চিন্তায় আর চঞ্চল হন না, তেমন আদর তেমন সোহাগ করিবার অবসরই পান না। রাজলক্ষ্মীর মনে একটা মহা বৈন্যের সৃজন হইল। অনুসন্ধানে জানিতে পাইলেন যে ব্যক্তি আমতলার ঘরে থাকে, তাকে লইয়াই বাবু ব্যস্ত, কিন্তু সে কে? সকলে জানে বাবুর এক বন্ধু সেখানে থাকে, রাজলক্ষ্মীর সে কথা বিশ্বাস হইল না ভাবিলেন বন্ধুর সঙ্গে আরও কে হয়ত গোপনে আছে, তাঁহার মনে রাগ ও হিংসার সহিত মহা ঔৎসুক্যের উদয় হইল, সেই মুহূর্ত্তে স্থির হইয়া গেল যেমন করিয়া হউক যে স্বামীর মন হরণ করিয়াছে তাহার সর্ব্বনাশ করিতে হইবে। মন খুলিয়া কথা কহিবার একমাত্র লোক নিত্যদাসী, তাহারই শরণাপন্ন হইয়া সাহায্য প্রার্থনা

করিবামাত্র সে কল্পিত কালামুখীর উদ্দেশ্যে যথোচিত গালিবর্ষণ করিতে কসুর করিল না, এবং তাহাকে সত্বর উচ্ছেদ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া রাজলক্ষ্মীকে বিস্তর সাহস ও সান্ত্বনা প্রদান করিল।

রাজলক্ষ্মীর মন যখন ঈর্ষা ও বিষাদে পূর্ণ হইয়া উঠিল সেই সময় একদিন শুনিলেন স্বামী কলিকাতায় যাইতেছেন। স্বামী চলিয়া গেলে নিত্যের সহিত পরামর্শ হইল যে গভীর রাত্রিকালে সকলে নিদ্রিত হইলে গোপনে যাইয়া দেখিতে হইবে আমতলার বাঙ্গলোতে কে কে থাকে। বাবুর অনুপস্থিতিতে সকলেই সকাল সকাল ছুটী পাইয়াছে, গৃহিণীও সেদিন সন্ধ্যা না হইতেই আহার শেষ করিলেন—সকলেই আপন আপন কাজ সমাপন করিয়া অবসর গ্রহণ করিলে চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ হইয়া আসিল। রাত্রি এক প্রহর অতীত, আকাশে খণ্ড চন্দ্রের সামান্য আলো ফুটিয়া উঠিয়াছে সেই আলোকে নিত্যদাসীর পশ্চাতে রাজলক্ষ্মী চুপি চুপি চলিলেন।

তখন সবে ফাল্গুন মাসের প্রথর বসন্ত আরম্ভে মৃদু মন্দ হাওয়ায় আম্র মুকুলের গন্ধে বাগান ভরিয়া গিয়াছে, অদূরে পুষ্করিণী। নিভৃত নির্জ্জন কক্ষে মুক্ত বাতায়ণ পার্শ্বে বসিয়া একাকী অরবিন্দনাথ, আর কেহ কোথাও নাই। সম্মুখে টেবিলে কেরোসিনের ল্যাম্প জলিতেছে—লিখিবার সরঞ্জাম খাতা পেনসিল পড়িয়া রহিয়াছে,—লিখিতে লিখিতে কি জানি কি বাধা পাইয়া পাপিয়ার করুণ সুরের সঙ্গে সঙ্গে বিরহীর বেদনা অনুভব করিয়া মন যেন অদৃশ্য কল্পনা রাজ্যে বিচরণ করিতে গিয়াছে। রাজলক্ষ্মী অন্ধকারে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই সৌম্য শান্ত সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া নিঃশব্দে ফিরিলেন, তাহার চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইল, রাজলক্ষ্মী সেই প্রথম দিন ভাবিলেন পুরুষ মানুষ এমন সুন্দর হয়।

সেবার কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিবার পর রাজলক্ষ্মী একদিন স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমতলার বাঙ্গলোতে কে থাকে সে কে এবং কি করে? জ্যোতিপ্রকাশ সেদিন অরবিন্দ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া ফেলিলেন তাহার রূপ, গুণ, বিদ্যা, বুদ্ধি, তাহার রচনার অদ্ভুত ক্ষমতা, কি করিয়া তাহাকে পাওয়া গেল এবং তাহাকে পাইয়া কত বড় একটা অভাব পূর্ণ হইয়াছে, অরবিন্দ নাথের নিষ্কলঙ্ক চরিত্র তাহার মনে কি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

রাজলক্ষ্মী চক্ষু কর্ণ বিস্তার করিয়া একাগ্র মনে শুনিলেন। প্রথম দর্শনে তাঁহার অন্তরে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহার উপর শ্রদ্ধা ও ভক্তি



সংযোজিত হইল। চিত্রকর যেমন একটী রেখায় মনুষ্যমূর্ত্তি আঁকিলে ক্রমে মনের মতন চক্ষু কর্ণ হস্ত পদাদি নানা বিচিত্র বর্ণে স্পষ্ট করিয়া ফুটাইয়া তোলে, সর্ব্বশেষে চোখের ভাবটী দিয়া পূর্ণ সৌন্দর্য্য বিকাশ করে, রাজলক্ষ্মী সেইরূপে ক্রমে ক্রমে আপন মনে একটী আদর্শ গড়িয়া অরবিন্দকে সেই পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইলেন। স্বামীর নিকট শুনিলেন এক অপূর্ব্ব কাব্য রচিত হইতেছে, প্রস্তাব জ্যোতি প্রকাশের, অরবিন্দ তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতেছেন, শীঘ্রই কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে তাহার অভিনয় হইবে। তৎপূর্ব্বেই সে কাব্য কিরূপ রচনা হইয়াছে শুনিবার ইচ্ছা রাজলক্ষ্মীর খুবই প্রবল হইয়া উঠিল, কিন্তু কি করিয়া শোনা যায়! রাজলক্ষ্মী ভাবিলেন তাও কি সম্ভব! কিন্তু অতি সহজেই অসম্ভব সম্ভব হইয়া গেল। অনেক ইতস্ততঃ করিবার পর স্বামীকে বলিবা মাত্র তিনি অত্যন্ত উৎসাহ প্রকাশ করিয়া কহিলেন "সে আর একটা বেশী কথা কি? আজই অরবিন্দকে ডেকে আনব, সে বড় সুন্দর পড়তে পারে, পড়ে শোনাবে।" লজ্জা ও ভয়ে রাজলক্ষ্মীর মন কাঁপিয়া উঠিল। জ্যোতিপ্রকাশ আরও বলিলেন "অরবিন্দ আমার বিশেষ বন্ধু, তাতে ছোট ভাইএর মত, তার কাছে যাবে তাতে আপত্তিই বা কি, লজ্জাই বা কেন?" কিন্তু কি একটা ভাব যেন রাজলক্ষ্মীর মনে ক্ষণে ক্ষণে উদয় হইয়া তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল যেন কাজটা ভাল হইবে না তথাপি কাজটা হইয়া গেল।

সন্ধ্যার পর যখন জ্যোতিপ্রকাশ স্বয়ং অরবিন্দকে লইয়া আসিলেন, প্রথমতঃ রাজলক্ষ্মী পলায়ন করিলেন কিন্তু স্বামী হাত ধরিয়া সম্মুখে লইয়া আসার পর সঙ্কোচের ভাবটা কতক দূর হইল। অরবিন্দনাথ অনেক দিন ধরিয়া রাজলক্ষ্মীর কথা শুনিয়া আসিতেছেন, সে দিন দেখিলেন তাহার স্নিগ্ধ শ্যামবর্ণের সহিত বিস্তৃত উজ্জ্বল চক্ষু দুটীতে ও ঈষৎ খর্ব্ব নাসিকাতে বড়ই মানাইয়াছে, কপালে সিঁদুরের বিন্দু ও প্রকোষ্ঠে সুবর্ণ কঙ্কণ, দুইহাতে গৃহলক্ষ্মীর পূর্ণ চিহ্ন বিদ্যমান, তাঁহার পদাঘাতে অশোক ফুল না ফুটিলেও চলনের ভিতর কি এক অপরূপ সৌন্দর্য্য আছে, বর্ণনা করা যায় না। রাজলক্ষ্মী যেন আপন গৌরবে উন্নত অথচ নম্র। জ্যোতিপ্রকাশ বাবু যখন হাসিতে হাসিতে কহিলেন "ইনিই আমার গৃহলক্ষ্মী, নাম রাজলক্ষ্মী" তখন অরবিন্দনাথের মস্তক ভক্তিভরে নত হইল।

দেখিতে দেখিতে এক মাস অন্তে বাসন্তী পূজা সমাগমে পৃথিবীময় আনন্দের

হিল্লোল বহিল। রাজলক্ষ্মী পূজা উপলক্ষে কলিকাতায় আসিলেন। বাড়ীতে পূজা, তিন দিন ধরিয়া সমারোহ ব্যাপার চলিল, আত্মীয় কুটুম্বের যাতায়াতে, সকলকে অভ্যর্থনা করিতে, পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করাইতে, সকলের সহিত যথাযোগ্য শিষ্টালাপ করিতে, রাজলক্ষ্মীর বিন্দুমাত্র অবসর নাই তথাপি তাহার মন বাগান বাড়ির সেই ছোটখাটো সংসারটীর জন্য উতলা হইয়া উঠিল। পূজা শেষ হইতে না হইতে তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিলেন।

তখন ভরপূর বসন্ত, বাগানটী ফলে ফুলে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসার পর রাড়লক্ষ্মীর মন যেন নূতন হইয়া উঠিল। তাঁহার জীবনে আর কখনও বসন্ত আসিয়াছিল কি না স্মরণ নাই এবার যেন নবীন বসন্তে গাছপাতা ফুল ফল সব জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, সেই সুখ সম্পদ বেষ্টিত সংসার হইতে তাঁহার মন যেন ছুটিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। ঘর সংসারের কাজ আর ভাল লাগে না, মূর্খ ননদের সংসর্গ যেন অসহ্য, তখন লেখা পড়ায় মন বসিল, নূতন কাব্য নূতন নাটক পড়িবার ইচ্ছা ক্রমেই প্রবলতর হইয়া উঠিল, স্বামীর অনুমতি ক্রমে অরবিন্দের নিকট হইতে নিত্য নূতন কাব্য ও কবিতার খাতা আসিতে লাগিল। কখনও কখনও অরবিন্দ স্বয়ং আসিয়া কবিতা পাঠ করিতেন, রাজলক্ষ্মীর লজ্জা সঙ্কোচ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল।

যে দিন জ্যোতিপ্রকাশ এবং অরবিন্দলিখিত নূতন কাব্যের প্রথম অভিনয় হইল, কলিকাতা সহরময় তাহার প্রশংসা ছড়াইয়া পড়িল, বন্ধু বান্ধবগণ উভয়কে অভিবাদন করিয়া পরম আনন্দে ফুলের মালা পরাইয়া দিল; জ্যোতি প্রকাশ বাড়িতে পৌঁছিয়া রাজলক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে ছুটিলেন, গলার মালা খুলিয়া তাঁহাকে পরাইয়া পরমতৃপ্তি লাভ করিলেন। কিন্তু বিজয় উল্লাসে উল্লসিত চিত্তে দুই বন্ধু একত্র ফিরিয়া আসার পর যখন অরবিন্দ তাঁহার নিভৃত গৃহকোণে বসিয়া কল্পনা চক্ষে দেখিতে পাইলেন রাজলক্ষ্মী হাসি মুখে অগ্রসর হইয়া জ্যোতি প্রকাশের গলায় বিজয় মাল্য পরাইতেছেন তখন সেই শূন্য ঘরের অসীম নির্জ্জনতা তাঁহাকে সবলে চাপিয়া ধরিল সেই মুহূর্ত্তে অরবিন্দ অনুভব করিলেন যে সংসারে তাঁহার কোনও বন্ধন নাই, তিনি একেবারে একা। এমন সময় নিত্যদাসী আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল এক খানা চিঠি ও একটী কাগজের মোড়ক হাতে দিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া চলিয়া গেল। কম্পিত হস্তে চিঠি খুলিয়া অরবিন্দ পড়িলেন,—



বিজয়মাল্য তোমারই প্রাপ্য। মনের ভাব ভাষায় ব্যক্ত না করিলে তাহার কোনও মূল্য নাই।

পত্রে সম্বোধন নাই, সাক্ষর নাই, অতি সংক্ষেপে কয়েকটী কথা মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছে, পাতার মোড়কটী খুলিয়া মালাছড়া গলায় পরিয়া আবার কি মনে করিয়া খুলিয়া সযত্নে তুলিয়া রাখিলেন, অরবিন্দ বুঝিলেন সে দিন তাঁহারই জয়।

যতই সময় কাটিতে লাগিল, অরবিন্দের প্রেম প্রীতি ভক্তি যাহা কিছু ছিল, সমস্তই রাজলক্ষ্মীর উপর প্রসারিত হইল। সময়ে সময়ে স্বামীর অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া রাজলক্ষ্মী আপন ইচ্ছা ও অবসর মত অরবিন্দকে তলব করিতেন। তারপর এক সময় রাজলক্ষ্মী ভাব যোগাইতে থাকিলেন আর অরবিন্দ সে ভাব লইয়া রাশি রাশি কবিতায় আমতলার বাঙ্গলা ছাইয়া ফেলিলেন।

ইতি মধ্যে বিশেষ কায উপলক্ষে জ্যোতিপ্রকাশের কলিকাতা যাওয়া অনিবার্য্য হইয়া উঠিল, সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে জ্যোতিপ্রকাশ উপরে আসিয়া স্ত্রীর নিকট বিদায় লইয়া চলিলেন, রাজলক্ষ্মী ছাদে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন, বাড়ীর বাহির হইয়া গেলে নিশ্চিন্ত মনে সন্ধ্যার স্নানান্তে বেশভুষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এ দিকে অরবিন্দ সারা দীর্ঘ দিন ছট্‌ফট্ করিয়া কাটাইয়াছেন, আজ তাঁহার পক্ষে একটী বিশেষ দিন কারণ রাজলক্ষ্মী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার গৃহে আসিতেছেন। অরবিন্দ সযত্নে ঘর খানি পরিপাটী করিয়া সাজাইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। রাজলক্ষ্মী গোলাপফুল ভাল বাসেন তাই রাশীকৃত গোলাপ আনিয়া নিজের হাতে যথা স্থানে রাখিয়াছেন, পথের পানে চাহিয়া বসিয়া আছেন কখন সেই সুন্দর চরণস্পর্শে শুষ্ক পত্র মর্ম্মরিয়া উঠিবে, কখন তাঁহার কুটীর দ্বারে উজ্জ্বল আনন্দ প্রতিমা ফুটিয়া উঠিবে, অরবিন্দ আর স্থির থাকিতে পারিতেছেন না, উঠিয়া চঞ্চল পদে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সহসা যেন কাহার পদশব্দ কর্ণে পহুঁছিল, ত্রস্তপদে দ্বার অভিমুখে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন সম্মুখে চৌকাঠের পরপারে দাঁড়াইয়া জ্যোতিপ্রকাশ।

পথে চলিতে চলিতে বিষধর সর্প দেখিয়া মানুষ যেমন অজ্ঞাতসারে সরিয়া দাঁড়ায় অরবিন্দ সেইরূপ আপনার অজ্ঞাতসারে চমকিয়া পিছু হটিলেন, বিদ্যুতের শিখা আপদ মস্তক বহিয়া তাঁহাকে যেন মাটীতে পুঁতিয়া রাখিল। প্রথম ধাক্কা কাটিয়া গেলে; আপন অবস্থা স্মরণ করিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় কহিলেন "আপনি

তবে যান্‌নি ?" জ্যোতিপ্রকাশ গম্ভীর ভাবে কহিলেন, "না বেরুতে দেরী হয়ে গেল তাই আজ যাওয়া হোলো না।" অরবিন্দ কহিলেন "ঘরে এসে বস্‌বেন না ? "জ্যোতিপ্রকাশ পূর্ব্ববৎ অন্যমনস্ক ভাবে কহিলেন" "ঘরে আসব ?—ভাবছি অসময়ে এসে তোমার উপর উৎপাত করলুম নাতো ? বাঃ ! আজ তোমার ঘরের চেহারা যে বদ্‌লে গেছে দেখ্‌ছি—মনে হয় যেন কারু আশায় ঘর সাজিয়ে বসে আছ। অরবিন্দ হাসিয়া সে কথা চাপা দিয়া কহিলেন" যে নূতন নাটকের প্রস্তাব ছিল সেইটা এখন আরম্ভ করা যাক।"

জোতি। আজ একটী বেশ নূতন ধরণের গল্প আমার মাথায় এসেছে—গল্পটী যে খুব সুখপ্রদ তা নয়, তবে সরস বটে তার অভিনয় বোধ হয় বেশ হবে, সেই কথাই তোমাকে বল্‌তে এসেছি।

অরবিন্দ। তা'হলে আগেকার প্রস্তাবটা আপাততঃ স্থগিত থাকবে ?

জ্যোতি। হাঁ, হাঁ, আগে এই নূতন গল্পটা দুজনে মিলে ঠিক করে নেওয়া যাক। গল্পটা বেশ নতুন রকমের, তার প্রধান উদ্দেশ্য প্রতিহিংসা। শেষটা যে কি রকম হওয়া উচিত বুঝতে পারছি না, তাই তোমার সাহায্য চাই, বুঝলে ?

অরবিন্দ। আজ্ঞে হাঁ।

জ্যোতি। ভাবটা বলি শোনো। এবার আর মিলন নয়, মিলন দেখে সবাই হয়রাণ হয়ে গেছে, এবার বিচ্ছেদ দেখাতে হবে।

অরবিন্দ। কি রকম বুঝতে পারছি না—তারপর ?

জ্যোতি। এই মনে কর নায়িকার স্বামীর বন্ধু ঘটনাক্রমে নায়িকারই প্রণয়ী হ'য়ে পড়ে বুঝলে ? সে অবস্থায় স্বামীর কি করা কর্ত্তব্য ? ক্ষমা করলে সে কাব্য হাস্যোদ্দীপক হয়ে পড়ে। আর প্রতিহিংসা নিলে সেটাকে বিয়োগান্ত করতে হয়। আমার কিন্তু সেই পছন্দ। আমার মতে স্বামীর বন্ধুটীকে হত্যা করা উচিত, অবশ্য কৌশলে। মনে কর স্বামীটীর যেন খুব কঠিন মন। সহসা যখন দেখতে পেলে তার পরম বন্ধু বিশ্বাস ঘাতক হয়েছে তখন সে যেন ক্ষমা করলেও করতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মের বিচার দেখাতে হবে তো ? যে পাষণ্ড বন্ধুর আচ্ছাদনের ভিতরে থেকে গোপনে কাল সাপের মত দংশন করতে পারে তার শাস্তি নিতান্তই আবশ্যক। স্বামী যেন, মনে কর, স্ত্রীকে খুবই ভালবাসে, তাকে হত্যা করতে কিছুতেই পারে না, অথচ প্রণয়ীটিকে হত্যা করলে তারও যথেষ্ট শাস্তি হবে জানে। কিন্তু কি উপায়ে হত্যা করা যায় ; তুমি কি বল ?



এতক্ষণ অরবিন্দ ইচ্ছা সত্ত্বেও সাহস করিয়া চোখ ফিরাইতে পারেন নাই স্থির দৃষ্টিতে জ্যোতিপ্রকাশকেই দেখিতে ছিলেন—তাঁহার চোখে ও মুখের ভাবে সত্য কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যায় কিনা। অরবিন্দ দেখিলেন তাঁহার স্বাভাবিক উজ্জ্বল মুখশ্রী যেন বিমর্ষভাবাপন্ন, কথা কহিতে কহিতে সেই উদার নয়ন মাঝে মাঝে যেন হিংস্রভাব ধারণ করিতেছে। অরবিন্দ বিশ্বাস ঘাতকতা করেন নাই, তথাপি ভয় হইল, অবিবেচনায় অযথা রাজলক্ষ্মীকে সন্দেহ লিপ্ত করিয়াছেন সন্দেহ নাই। রাজলক্ষ্মীর অন্তকার অভিপ্রায় সম্বন্ধে কিছু শুনিয়া থাকিলে জ্যোতিপ্রকাশ বাবু বিশ্বাসঘাতকতা কল্পনা করিয়া কঠিন শাস্তি বিধান করিতে উদ্যত হইবেন বিচিত্র কি ? অরবিন্দ কত কথাই ভাবিলেন একবার হাসিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু জ্যোতিপ্রকাশের কঠিন অটল দৃষ্টিতে সে হাসি মিলাইয়া গেল, তখন কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন "এই আপনার গল্প ? নিতান্ত মন্দ নয়, কিন্তু হত্যাটা কিরকম" ? তাঁহাকে ভ্রুকুঞ্চিত করিতে দেখিয়া জ্যোতিপ্রকাশ কহিলেন "ওবিষয়ে আর কোনও দ্বিধা করবার দরকার নেই, হত্যা চাই।"

অ। বিয়োগান্ত করলে লোকে পছন্দ করবে কিনা তাই ভাব্‌ছি।

সেবার জ্যোতিপ্রকাশ হো হো শব্দে অট্টহাসি হাসিলেন। অরবিন্দনাথের সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল, জ্যোতিপ্রকাশ কহিলেন "কারু পছন্দ হোলো কিনা তাতো আমি জানতে চাইনে। আমি প্রতিহিংসা দেখাতে চাই, এমন ভীষণ হবে যে সে দৃশ্য দর্শকদের মনে লেগে থাকবে। কিন্তু এদৃশ্য কি করে অভিনয় করা যায় তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

অ। মৃত্যুতে শেষ করবেন একেবারেই কি স্থির করেছেন ?

জ্যোতি। নিশ্চয়! তুমি এখনও সংসারে অনভিজ্ঞ, জীবনের বিকৃত দিক্‌টার স্বাদ এখনও পাওনি, কেবল কবিতা ও কল্পনার ভিতর দিয়েই যাচ্ছ তাই মৃতুটাতে এত ভয়। সবই যখন মিথ্যা, সংসারই যখন অনিত্য তখন মৃত্যুতে আর ভয় কি ? তা ছাড়া মাসে মাসে বদলও একটু আধটু দরকার। কবিতা, কল্পনা প্রেম ও মিলন আর চিরকাল কাহাকে ভাল লাগে ? শোনো অরবিন্দ, আমার মনের ভাব স্পষ্ট করেই বল্‌ছি তোমার মতটাও সরল মনে বল।

অ। আপনার যা ভাল মনে হয় তাতে আমার কোনই আপত্তি নেই।

জ্যো। আচ্ছা তার পর শোন, স্বামীর চরিত্র যেন খুবই সরল অথচ দৃ. তাই বন্ধুর উপর অসাধারণ বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। আমার গল্প—না, এখ

আমাদের উভয়ের বলা যেতে পারে—এ গল্পের মর্ম্ম এই, যে বন্ধুকে অকপট মনে বিশ্বাস করা হয়েছিল সে অবিশ্বাসী হ'ল, এখন প্রতিশোধ নেওয়া যায় কি উপায়ে এবং তারপর কি হবে সেটা তুমি ভেবে ঠিক করে নাও।

অরবিন্দ বজ্রাহতের ন্যায় জ্যোতিপ্রকাশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, দারুণ সংশয় তাঁহাকে প্রতিমুহূর্ত্তে পীড়ন করিতে লাগিল, না জানি জ্যোতি-প্রকাশ বাবুর মনে কি আছে। কেহ কিছু বলিয়াছে কি? বলিবারই বা কি আছে; অরবিন্দ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিলেন "যদি আপনার বন্ধুকে হত্যা"।—জ্যোতিপ্রকাশ তাঁহার কথা সংশোধন করিয়া কহিলেন "হাঁ কাব্যে যে বন্ধুকে শাস্তি দিতে হবে তার কি?

অ। তাকে যদি নির্দ্দোষী প্রমাণ করা যায়। বন্ধুর বাড়িতে সর্ব্বদা যাতায়াতে তার স্ত্রীর কুহকে পড়ে সামান্য ভুল হতেও পারে তো? মনে করুন স্বামীর তুলনায় স্ত্রীর বয়স খুবই কম সে অবস্থায়—। জ্যোতিপ্রকাশ তাহার কথায় বাধা দিয়া কহিলেন "থাম থাম স্ত্রীর বয়স কম আমি বলেছি কি?"

অ। আজ্ঞে না, কল্পনা করে নেওয়া যেতে পারে!

জ্যো। আচ্ছা, তারপর কি বল্লে! স্ত্রীর কুহক! আমি তো স্ত্রীটীকে আদবেই চপল 'কুহকিনী মনে করছি না? আমি ধরে নিচ্ছি একটী ধীর শান্ত বুদ্ধিমতী স্ত্রী যে স্বামী ছাড়া কিছু জানত না—যতদিন না সেই পাষণ্ড বিশ্বাস ঘাতক বন্ধু তাকে অন্য পথ দেখিয়ে ছিল—এই তো আমার ধারণা, তানা হলে তো সব মাটী, গল্প জমবে কেন?

অ। আপনি সত্যি বিশ্বাস করেন স্ত্রীর কোনও দোষ নেই? অরবিন্দ আরও কি কহিতে যাইতে ছিলেন, তাঁহাকে বাধা দিয়া জ্যোতিপ্রকাশ কহিলেন "রোসো—বিশ্বাসের কথা তুলছো কেন? আমার ধারণা তাই। মনে কর সেই বিশ্বাস ঘাতককে যদি তার ঘরে হত্যা করে ফেলে রাখা যায়! শুনতে কি রকম লাগছে? দেখতে অবিশ্যি খুবই শোকাবহ হবে।"

অ। নতুন কিছুই নয়, তবে সেটা পশুর মত কাজ হবে।

জ্যো। তা যাই হোক, এমন দৃশ্য হবে কিনা যাতে দর্শক কূল, ভয়ে বিস্ময়ে থরহরি কেঁপে উঠবে। সকলে বুঝবে বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি কি করে দিতে হয়। আচ্ছা বন্দুকের গুলি কি রকম? সেটা কি সুবিধে হবে মনে কর? অরবিন্দকে নিরুত্তর দেখিয়া জ্যোতিপ্রকাশ আবার কহিলেন "তোমার এখানে বন্দুক আছে?"



অ। এখানে? না, না, এখানে বন্দুক নেই। বন্দুক দিয়ে কি করবেন?

জ্যো। একবার অস্ত্রটা দেখতাম, থাক্ তোমার ঘরে বন্দুকনেই যখন তখন তো চুকেই গেল।

অরবিন্দনাথের তখনকার মনের অবস্থা বর্ণনাতীত, সেদিকে জ্যোতি-প্রকাশের লক্ষ্য নাই তাঁহার কাব্য লিখিত হত্যার উপযোগী অস্ত্র অন্বেষণেই যেন তিনি চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার আনন্দ ধ্বনি শুনিয়া অরবিন্দ সচকিত হইয়া উঠিলেন, সম্মুখে তাকের উপর হইতে চামড়ার খাপে মোড়া এক খানা ছোরা টানিয়া বাহির করিয়া জ্যোতিপ্রকাশ কহিলেন "বাহবা; বাহবা! এরকম অস্ত্র হলে মন্দ হয় না তো?" খাপ হইতে খুলিয়া অস্ত্রখানা ভাল করিয়া দেখিলেন প্রদীপের আলোকে ছোরা খানা চক্‌মক্ করিয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিলেন "এখানা সংগ্রহ করলে কোত্থেকে হে? এতে আবার কি লেখা আছে দেখছি?" অরবিন্দ কহিলেন "ওখানা নেপালি খুকরি, নেপালি ভাষায় একটা কথা লেখা আছে, তার মানে 'শোনিত পিয়াসী'। জ্যোতিপ্রকাশ মহা উৎসাহে কহিলেন" বা! বেশ, 'শোণিত পিয়াসী' কাব্যের নামও বেশ চলতে পারে, কি বল? এবার জ্যোতিপ্রকাশ যেন মন খুলিয়া হাসিলেন। অরবিন্দ তখন সাহস পাইয়া কহিলেন "আপনি কি সত্যি মনে করেন মৃত্যুতে শেষ হলে কাব্য ভাল হবে? আমি অবিশ্যি ঐ কথা বলতে চাইনে যে বন্ধু যদি সত্যি বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করে থাকে তো তাকে ক্ষমা করা হোক, কিন্তু মনে করুন হঠাৎ স্বামী বুঝতে পারলে যে তাঁর সন্দেহ মিথ্যা তাকে যতটা দোষী মনে করে ছিলেন ততটা দোষী সে নয়, তখন মিলনের আনন্দে শেষ করা যেতে পারে।

জ্যো। তুমি দেখছি মিলনের জন্য ভারি ব্যস্ত। আমার মিলনে বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে, আমি চাই বিরহ শুধু তা নয়—ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসা। সেক্ষপীয়রের "ওথেলো" নাটকের শেষ যেমন, তেমনি ভীষণ হত্যার দৃশ্যে সমস্ত কলিকাতা সহর কণ্টকিত হয়ে উঠবে।

"কলিকাতা সহর কণ্টকিত" কথাটা অরবিন্দের ভাল লাগিল না। দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলেন সমস্ত দৈনিক পত্রে বড় বড় অক্ষরে লেখা "জ্যোতি-প্রকাশ মিত্রের বাগান গড়িতে ভীষণ হত্যা"— কি জীবন্ত অভিনয়!

জ্যোতিপ্রকাশ আবার কহিলেন "মনে কর একদিন রাত্রি প্রভাতে সকলে দেখলে প্রণয়ীর মৃত দেহ পড়ে আছে, তার বুকে এই রকম এক খানা ছোরা

বসান। প্রণয়িণী অবিশ্যি সত্য ঘটনা কি তা বুঝবে, কিন্তু অন্য সকলে অনুমান করবে আত্মহত্যা। কি বল?

অ। মন্দনয়, কিন্তু সত্য কথা কতদিন গোপন থাকা সম্ভব?

জ্যো। তার জন্য ভাবনা কি? কোনও রকমে মিটিয়ে দেওয়া যাবে। শাস্তিটাই দেখান উদ্দেশ্য, সেই খানে শেষ করলেই হোলো। কিন্তু তুমি কোন্‌টা পছন্দ কর?

অ। আমি? আমি পছন্দ?

জ্যো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার মতে কোন রকমে শেষ হলে ভাল হয়?

ভয়ে অরবিন্দনাথের কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়াছে, তাহার বাক্য সরিতেছে না অনেক কষ্টে কহিলেন "এখনও ভাল করে বুঝতে পারছিনা, একটু ভেবে কাল আপনাকে বলব।" তখন তাঁহার চক্ষু জ্যোতিহীন হইয়া আসিয়াছে, ক্রমে মস্তক টেবিলের উপর ঢলিয়া পড়িল, তাঁহার অবস্থা দেখিয়া জ্যোতিপ্রকাশ ব্যস্ত হইয়া কহিলেন "একি।" তখনও ছোরা খানা তাঁহার হাতেই আছে, অরবিন্দের অর্দ্ধ অচেতন কর্ণে সে স্বর দ্বিগুণিত হইয়া প্রবেশ করিল, তিনি চক্ষু উন্মীলন করিয়া উন্মুক্ত ছোরা হস্তে জ্যোতিপ্রকাশকে সম্মুখে দেখিয়া ভাবিলেন এইবার শেষ, মুহূর্ত্তের নিমিত্ত যেন বুঝিলেন মৃত্যুটা কি। সভয়ে চক্ষু নিমীলিত করিয়া ইষ্ট দেবতা স্মরণ করিতে লাগিলেন, তাঁহার মুখ তখন বিবর্ণ হইয়াছে, কপাল ও হস্ত পদদ্বয় ঘর্ম্মাক্ত ও শীতল হইয়া আসিয়াছে। জ্যোতি-প্রকাশ সেই সময় তাঁহার পিঠ চাপড়াইয়া ঝাঁকানি দিয়া কহিলেন "তোমার আজ কি হয়েছে বলত? স্ত্রীলোকের মত মুচ্ছো যাচ্ছ কেন? সেই সময় অরবিন্দের সংজ্ঞা আসিল তিনি কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন "কদিন থেকে ভাল ঘুম হচ্ছে না শরীরটা খুবই দুর্ব্বল বোধ হচ্ছে।"

জ্যোতি। তুমি বোধ হয় মস্তিষ্কের উপর বেশী অত্যাচার কর সেটা উচিত নয়। যাক, এসে তোমাকে কষ্ট দিয়ে গেলাম কিছু মনে কোরোনা। আমি না এলে তোমার সময়টা বোধ হয় অনেক ভাল কাটত। কাব্যটা গড়ে তোলা শক্ত হবে, তবু তুমিও ভেবে দেখ আমিও ভাবি কি করে বেশ সহজ ও স্বাভাবিক করে তোলা যায়। তোমার অবস্থা দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে অভিনয় করাতে পারলে লোকের মনে খুব ভয় ও বিস্ময়ের সঞ্চার হবে।

জ্যোতিপ্রকাশ চলিয়া যাইতে যাইতে হাসিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, ছোরা খানা রাখিয়া কহিলেন "বাঃ এখানা নিয়ে যাচ্ছিলাম, আপাততঃ আমার



দরকার নেই"। সেই অবসরে এক গোছা গোলাপ ফুলদানী হইতে তুলিয়া লইয়া কহিলেন "আমার গৃহিনী গোলাপ বড় ভাল বাসেন—তাঁকে দেওয়া যাবে, কি বলহে তোমার কোনও আপত্তি নেই তো?" অরবিন্দ নিরুত্তরে তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিলেন—ঘরের বাহিরে যাইয়া জ্যোতিপ্রকাশ-বাবু কহিলেন "বেড়ে রাতটী হয়েছে, প্রিয়জনের সহবাসে কাটাবার মত বটে, কিন্তু বিরহীর পক্ষে ভয়ানক, তুমি আবার রাত জেগে হা হুতাশ কোরো না যেন, একটা ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি, খেয়ে শুয়ে পড়, আজ আর কাব্যের কথা ভেব না কাল তোমার শরীর ভাল থাকলে আবার আলোচনা করা যাবে।"

অরবিন্দ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় মস্তক অবনত করিলেন; পর মুহূর্ত্তে জ্যোতিপ্রকাশ বাবু অদৃশ্য হইলে ঘরে ফিরিয়া অবসন্ন দেহে বসিয়া পড়িলেন, সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল, তাঁহার বক্ষস্থিত রক্তপিণ্ডের চঞ্চলতা বাহিরে প্রকাশ পাইল, সমস্ত রক্তপিণ্ডটা কে যেন সবলে চাপিয়া ধরিয়া মাঝে মাঝে ছাড়িয়া দিতেছে সেই সঙ্গে রক্তরাশি শিরায় শিরায় বেগে প্রবাহিত হইতেছে। কতক্ষণ এইভাবে কাটিল ঠিক নাই। এক সময় অগাধ জলের নীচে চাপিয়া ধরিয়া ছাড়িয়া দিলে যেমন মানুষ নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচে তেমনি একটী গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অরবিন্দ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কপালের ঘাম মুছিয়া কি মনে করিয়া কহিলেন "উঃ কি দারুণ সংশয়, এখন মনে হচ্ছে আগা গোড়াই আমি ভুল বুঝেছি তিনি কোনও সন্দেহ করেন নি, কিন্তু ভগবান! কি পরীক্ষায় ফেলেছিলে, ভালই করেছ।"

পরদিন প্রভাতে একখানি পত্র লিখিয়া অরবিন্দ জন্মের মত জ্যোতিপ্রকাশ বাবুর বাগান বাড়ি ত্যাগ করিলেন; রাজলক্ষ্মীকে লিখিলেন।

"মোহ অন্ধ, তাই কোনও বিচার করি নাই। ভাবিয়া দেখিলাম আর এখানে থাকা শ্রেয় নয় তাহাতে সকলেরই অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। আমি জন্মের মত বিদায় লইলাম।"

জ্যোতিপ্রকাশ বাবুও ঠিক সময় পত্র পাইলেন অরবিন্দ লিখিয়াছেন—

"গত কল্য শরীর অসুস্থ বোধ করায় ভাল করিয়া কথা কহিতে পারি নাই বাবু পরিবর্ত্তন ইচ্ছায় দূরদেশে যাইব সংকল্প করিয়াছি। আর নূতন কাব্যে যোগ দিতে পারিলাম না। ভুল ভ্রান্তি মার্জ্জনা করিয়া প্রসন্ন মনে বিদায় দিবেন।"

ছয় বৎসরের প্রিয় সহচরকে বিদায় দিয়া জ্যোতিপ্রকাশের অন্তরে যে বেদনা

লাগিয়াছিল তাহা তাঁহার অন্তরই জানিল বাহিরে কখনও প্রকাশ পায় নাই কিন্তু কাব্য আলোচনা চিরদিনের মত শেষ হইল। সেদিন আহার করিতে করিতে রাজলক্ষ্মীকে বলিলেন "অরবিন্দ আজ কোথা গেল"। রাজলক্ষ্মী অত্যন্ত অন্যমনস্ক ভাবে কারণ জিজ্ঞাসা করায় কহিলেন "জানিনা সে বল্লে তার শরীর ভাল বোধ করছে না, তাই হাওয়া বদলাতে গেল। কিছুদিন থেকে তাকে অন্যমনস্ক দেখছিলাম বটে"। রাজলক্ষ্মী এবার একটু হাসিয়া কহিলেন "হয়ত ভদ্রলোক কাউকে ভালবাসে তাকে বিয়ে করতে গেল।"

জ্যোতিপ্রকাশের আহার সমাপ্ত হইল—হাত ধুইতে ধুইতে বলিলেন "বিয়ে করতে! বিয়ে জিনিষটা মন্দ নয় যদি বাগাতে পারা যায়। যতদিন বিশ্বাস থাকে ততদিন শান্তি—তার পর অবিশ্বাস সন্দেহ এলেই সব মাটী। যার শান্তি—তার পক্ষে বেশ, তবে সকলের অদৃষ্ট সমান নয় কারণ তোমার মতন লক্ষ্মী সকল ঘরে নেই তো? জ্যোতিপ্রকাশ রাজলক্ষ্মীর লজ্জাবনত আরক্ত মুখের দিকে চাহিয়া হাসিলেন।

শ্রীঅমিয়া দাস গুপ্তা।

---

# বাঙ্গলা নাটক সমালোচনা।

তারপর এই দৃশ্যেই কবি 'ক্ষমতার মোহ' দেখাইয়াছেন, অনেক প্রধান মন্ত্রী হইলেও নুরজাহানের কাছে ইংরাজ-দূতের আরজী পেশ করিয়া তাহার ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। তারপর নুরজাহান ক্ষমতার যথোচিত ব্যবহারের জন্য একটা প্রতিশোধের কল্পনা করিতে লাগিলেন। প্রতিশোধটা কি তাহা নাটককার এখানে বলিলেন না কারণ ঐ টা অবলম্বনে তিনি নুর-জাহান-চিত্রে জটীলতা বজায় রাখিবেন। এই দৃশ্যে নুরজাহান শাহজাহানের মনে ভবিষ্যৎরাজ্যস্পৃহা জাগাইবার চেষ্টা করিলেন এবং বন্দর রাজের দ্বারা খসরুকে মারিবার ব্যবস্থা করিলেন।

এই দৃশ্যেই নুরজাহান চক্রান্তেরও বীজ বপন করিয়াছেন। শাহ্‌রিয়ারের ভবিষ্যৎ পথ পরিস্কারের জন্য তিনি এই দৃশ্যে খসরু ও খুরমের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা উস্‌কাইয়া দিলেন। খুরম অল্পকথায় ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া চলিয়া



গেলে,—নুরজাহান বলিলেন—"এই খুরমকে আমি ভাল বাসি না, বরং একটু ভয় করি। * * * আমার উপর তার একটা দর্পের—তাচ্ছিল্যের ভাব আছে। ক্রমে তাকেও সরাবো। (এই পরিবারকে আমি অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর্ব্বো।"—আমরা জিজ্ঞাসা করিব না যে কেন? কারণ কবি দ্বিজেন্দ্রলাল হয়ত বুঝিয়াছেন যে পাঠক বা দর্শকদিগকে কার্য্যের সঙ্কল্প অবগত না করাইয়া নাটকের পাত্রপাত্রী দ্বারা প্রহেলিকার মত কতকগুলা কার্য্যের অনুষ্ঠান করাইলেই, তাঁহার নিজের সঙ্কল্প—অর্থাৎ "নুরজাহান চরিত্রটিকে জটীল করা"—অতি সহজেই সিদ্ধ হইবে;) কিন্তু তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে শাক দিয়া মাছ সকল সময় ঢাকা যায় না। লুকাইবার বিষয়টা ঠিক কথায় প্রকাশ করিতে যে কয়টি শব্দের আবশ্যক, ঠিক সেই কয়টি শব্দদ্বারা প্রকাশিত না হইলেও যদি ভাবভঙ্গীতে প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহা হইলেও যে কৌশল তিনি খেলাইতে চাহিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণই নষ্ট হইয়া যাইবে! এস্থলে তাহাই হইয়াছে। নুরজাহান হাঁ করিতেই তাঁহার সমস্ত সঙ্কল্প ফুটিয়া পড়িয়াছে, সুতরাং নূরজাহানের পরিকল্পিত—জাঁহাগীরের ক্রোধে খুরমের হত্যা কণ্টকে কণ্টক দূর করিবার কৌশলটার বাহার পাঠক বা দর্শকের সম্মুখে বেশ রঙিলা বলিয়া ঠেকিবে না।—কিছুতেই নহে, কারণ নুরজাহানই বলিয়া দিলেন "ক্রমে তাকেও আমি সরাবো"। (—ইহার পর এই দৃশ্যের শেষে নুরজাহান যে বিশ্ব-প্রহেলিকার আবৃত্তি করিলেন, তাহার গুরুত্ব কোথাও পৌঁছিল না—)প্রহেলিকা টুকু এই,—"একই শক্তিবলে গ্রহ উপগ্রহ তাদের নিয়মিত কক্ষে ঘুরে, আবার ধূমকেতু মহাশূন্য ভেদ করে চলে যায়। একই শক্তি বলে মেঘে মিষ্ট বারিধারা বর্ষণ করে, আবার আকাশে বজ্র হাহাকারে ফেটে পড়ে। একই শক্তি বলে বিগলিত তুষার নদনদীর স্নিগ্ধোচ্ছ্বাসে ধরণীকে উর্ব্বর করে, আবার বিরাট জলপ্রপাতের মহা আঘাতে তার বক্ষ বিদীর্ণ করে।"—(এই চুম্বক বর্ণনাগুলির সার্থকতা কোথা?) দ্বিজেন্দ্রবাবু কি বলিতে চাহেন, ধূমকেতুর উদয়াস্তের গ্রহ উপগ্রহের কক্ষাভ্রমণের ন্যায় কোন নিয়ম নাই? মেঘে মিষ্ট বারিধারা বর্ষণ আর আকাশে বজ্র বিদীর্ণ হওয়া যে একই নিয়মে ঘটে না, হাসির গানের কবি এটা জানিলে বোধ হয় এ নিরর্থক রচনায় দর্শক পাঠককে উৎপীড়িত করিতেন না। নদ-নদী ধরণীর যে অংশকে—উর্ব্বরতা দান করে সে অংশে কখনও জলপ্রপাত থাকে না—নদ নদী সমতলে

পৃথিবীর মৃত্তিকাময় পৃষ্ঠে উর্ব্বরতা দান করে, আর জলপ্রপাত অত্যুচ্চ পর্ব্বত-শীর্ষ হইতে নিম্নস্থ কঠিন প্রস্তরক্ষেত্রেই পতিত হইয়া থাকে এই সামান্য ভৌগোলিক জ্ঞানলাভের জন্য চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ আবশ্যক করে না,—স্কুল-পাঠ্য যে কোন ভূবিবরণ পাঠ করিলেই জানিতে পারা যায়। আমরা দেখিতেছি দ্বিজেন্দ্র বাবুর এতটুকুও অবসর ঘটে নাই।—এই দৃশ্যে দ্বিজেন্দ্রবাবু একটা বিষয়ে সঙ্কল্পচ্যুত হইয়াছেন। দৃশ্য-শেষে তিনি নুরজাহানের গতি-উপদেশ করিয়া "প্রস্থান" বাক্যটি ছাপিয়া দিয়াছেন। এটা হয় "স্বভাবে করায় কর্ম্ম কি দোষ আমার"—অর্থাৎ পূর্ব্বের অভ্যাস-বশে লেখিয়া ফেলিয়াছেন আর এ নাটকের নূতনত্বটুকু তাহাতেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে, আরনা হয়, "প্রুফ" দেখিবার সময়ে অসাবধানতায় বা তাড়াতাড়িতে "প্রস্থান" শব্দটি "Omit" করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন।

তৃতীয় দৃশ্যে নুরজাহানের শিক্ষায় বন্দর রাজের কৌশলে শাহাজানের শিবিরে খসরুর হত্যা ঘটিল। দোষটা শাহজানের স্কন্ধে চাপিল।

চতুর্থ দৃশ্যে জাহাঙ্গীরের ভুল বিশ্বাস শাহজাহান খসরু-হত্যায় অপরাধী ইহা ভাঙ্গিবার জন্য আসক চেষ্টা করিতেছেন। নূরজাহান জাহাঙ্গীরের ন্যায়পরতার কাছে আত্মীয়তা কুটুম্বিতা কিছু নয় বলিয়া তাঁহাকে শাহজাহানের বিরুদ্ধে তাতাইয়া তুলিতেছেন। জাহাঙ্গীর তাহাই বুঝিয়া সরিয়া গেলেন। আসক নূরজাহানের কু-পরামর্শের জন্য মৃদু তিরস্কার করিতে গিয়া তাড়া খাইয়া সরিয়া পড়িলেন। তার পর—নূরজাহান নিজের সঙ্কল্প ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন—'খসরু এক—শেষ হো'ল। শাহজান দুই—আরম্ভ হোয়েছে। তার পর পরভেজ তিন—এখনও আরম্ভ হয় নি। তারপর সাম্রাজ্য, নূর-জাহানের আর তার কন্যা লয়লার।'

ইহার পর পুত্রহারা রেবার প্রবেশ—ও মৃদু তিরস্কার ও প্রস্থান, পরে লয়লার প্রবেশ ও খসরু হত্যার জন্য তীব্র তিরস্কার। নূরজাহান বেশ সন্তোষ-জনক কারণ দেখাইতে না দেখাইতে অস্থিরমতি লয়লা মনুষ্যত্বের দিক হইতে মায়ের সঙ্গে সন্ধি ভাঙ্গিয়া দিয়া চলিয়া গেল। রেবা—নূরজাহানকে তাহার কৃত কর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত বোধে তাহার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিবেন বলিয়া চলিয়া গেলে নূরজাহান সে মহানুভাবা রাজ্ঞীর মহত্বে পরাজিত হইয়া বড় ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িলেন।

নূরজাহান এখানে যে ভাবে চিত্রিত তাহাই যদি কবির উদ্দেশ্য হয় তবে



বেশ ভালই হইয়াছে, কিন্তু লয়লার কথায় ও নূরজাহানের স্বগত বাক্যে সঙ্কল্পটা পাতলা হইয়া যাওয়ায় নাটকের এক প্রকারে এইখানেই সমাপ্তি হইয়া গেল। নাট্য-কৌশলের পক্ষে সেটা ভাল নয় নাই। দর্শকের বা শ্রোতার আগ্রহ এ সকল কথার পর বড় শিথিল হইয়া পড়ে। নাটকের এরূপ গ্রন্থি খুলিবার স্থান তৃতীয় অঙ্ক নহে, চতুর্থাঙ্কের শেষে হইলেই ভাল হয়।

তৎপরে পঞ্চম দৃশ্যে শাহজাহান নূরজাহানের অভিসন্ধি বুঝিয়া তাঁহার প্রভুত্ব অস্বীকার করিবার জন্য বাদশাহের পত্রের উত্তর না দিয়া বিদ্রোহী হইলেন। এই দৃশ্যের শেষে খাদিজা একা একা চলিয়া গেল—"পুণ্য হাতের কাছে রয়েছে—এত কাছে, এত সহজ, তবু বিশ্বময় মানুষ তাকে হাতড়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে।—শুদ্ধ ভালবেসে যখন মানুষ সুখী হোতে পারে। শুদ্ধ ভালবেসে"—

তখন আমরা বলি দ্বিজেন্দ্র বাবু যদি নূরজাহান চরিত্রটি জটিল করিয়া আঁকিবার সঙ্কল্প না করিয়া খাদিজার মত সহজ সরল করিয়া আঁকিতেন, তাহা হইলে বেশ ভাল হইত। জটীল নূরজাহান কুটীল নূরজাহান আঁকিবার দোষে এবারটা দৃশ্যে বোকা বণিয়া গিয়াছে, তাহার পরামর্শ সব কাঁচা হইয়া গিয়াছে,—লয়লা তাহা ধরিয়াছে, রেবা তাহা ধরিয়াছে, আসক তাহা ধরিয়াছে আর শাহজাহান যে বহু দূরে আছে সেও ধরিয়াছে—অতএব নূরজাহান মাটী হইয়া গিয়াছে বলিতে হইবে বৈ কি? দ্বিজেন্দ্র বাবু আমাদের রায়ে রায় দিবেন না, কারণ তিনি বলিবেন, তাঁহার জাঁহাগীর তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তা ঠিক্—কিন্তু সেটা নূরজাহানের কৌশলের বাহাদুরীতে নয়—বাদশাহের নিজের বোকামীতে।

তার পর ষষ্ঠ দৃশ্যে লয়লা ও শারিয়ারের কথা—কথার মাথামুণ্ড নাই—আছে প্রায় প্রতি পংক্তিতে "বেচারী"—আর অনর্থক শারিয়ার কর্ত্তৃক পরভেজের কাছে নূরজাহান কর্ত্তৃক খসরুহত্যার ষড়যন্ত্র প্রকাশ।

সপ্তম দৃশ্যে রাণা কর্ণসিংহ শাজাহানকে যুদ্ধে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন, কারণ কিছুই নাই—কেবল শরণাগত রক্ষা।

অষ্টম দৃশ্যে শাজাহানের বিচারচ্ছলে প্রকাশ্য দরবারে নূরজাহানের সঙ্গে শাজাহানের বাক্‌যুদ্ধ, মহবৎ খাঁ কর্ত্তৃক নূরজাহানের আদেশ অবহেলা এবং লয়লার ধৃষ্টতা অতি তীব্রভাবে দেখান হইয়াছে—মোগল দরবারে রীতিনীতির

আদ্যশ্রাদ্ধ হইয়াছে—এ দৃশ্যটায় সকলেরই মূলমন্ত্র—"দু কথা শুনিয়ে দিবলো কপট নিঠুর বাঁকা শ্যামে"—অর্থাৎ সকলেই নূরজাহানকে অপদস্থ করিয়া কথা কহিতেছেন, আর জাঁহাগীর সিংহাসনে ভ্যাবাগঙ্গারামের মত চাহিয়া বসিয়া আছেন—জাঁহাগীর চরিত্রটি আমরা এতক্ষণ একপ্রকার সুসঙ্গতই দেখিয়া আসিয়াছি—এ দৃশ্যে তাঁহার এই কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ অভিনয় একবারে মারাত্মক হইয়াছে।

এই দৃশ্যের সমাপ্তিটুকু ইংরাজী Tablaux তাবলোঁর উপর হইয়াছে—নাট্যকার বলিয়া দিতেছেন,- দুইজনে ( নূরজাহান ও লয়লা ) সভা মধ্যে দুই ব্যাঘ্রীর মত পরস্পরের দিকে জ্বালাময়ী দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন—আর যবনিকা পড়িয়া গেল। সমস্ত মোগল দরবার এ দৃশ্যে বজ্রাহত, স্তম্ভিত কেহ কোন কথা বলে না। দ্বিজু বাবুর এই চমৎকারিত্ব ঐতিহাসিক নাটকে একান্ত ছেলেমানুষী বলিয়া মনে হয়। মোগল দরবারের এমন অপদার্থ বর্ণনা আর কেহ কল্পনা করিয়াছেন কি না সন্দেহ, জাঁহাগীরটা সিংহাসনে যে বসিয়া আছে তাহা কেহই গ্রাহ্য করিতেছে না—নূরজাহান নহে, শাহজাহান নহে, মহব্বত খাঁ নহে এমন কি লয়লাও নহে! চমৎকার! এই অলৌকিক দরবারের সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে আবার মোগল দরবারের সভাসদ্‌গণের বিশ্রম্ভালাপের ব্যাপার! স্থানটা এবারেও সেই আসকের বাড়ী; কথাবার্ত্তাও আবার সেইরূপ—কৌতুকের কেন্দ্র আবার সেই বন্দর রাজ—ইয়ারকির মূল মন্ত্র 'বান্দরের রাজার লম্ফ' আর সেই পুরাতন "কেন্নূয়ের মত পাক খাওয়ার" কথা। শেষে এক ব্যক্তি বলিলেন—"কুমার শাহজাহান বল্লেন, যে খসরুকে হত্যা করে আপনি তাঁর যে কি উপকার করেছেন—নিজের ভাইয়েও অমন করে না।"

বন্দররাজ। হেঁ হেঁ এমন কি এমন কি, সামান্য কর্ত্তব্য মাত্র—সামান্য কর্ত্তব্য মাত্র।

১ম। কর্ত্তব্য মাত্র! পাষণ্ড! তোমাকে দেখছি। ( সহসা উঠিয়া পদাঘাত )

সকলে। কি কর কি কর—( ছাড়াইয়া দিল ) বন্দর রাজ। বড় লেগেছে—

১ম। বড় লেগেছে! আবার বলে লেগেছে।



৪র্থ। ওহে করিম আমার বড় একটা গান পাচ্ছে—না গেয়ে থাকতে পাচ্ছি না—শোন—

১ম। রেখে দাও তোমার গান আমি একবার ( বন্দররাজের প্রতি কঠোর দৃষ্টিপাত )

৪র্থ। আরে শোন—(পলায়নোদ্যত রাজাকে ধরিয়া) শুনে যান মহারাজ।

গান।

আমি যদি পিঠে তোর ঐ
লাথি একটা মারিই রাগে।
তোর ত আস্পর্দ্ধা বড়
পিঠে যে তোর ব্যথা লাগে॥
আমার পায়ে লাগলে সেটা
কিছু বুঝি নয়কো বেটা।
নিজের জ্বালাই নিয়ে মরিস
নিজের কথাই ভাবিস আগে।

* * *

বরং উচিত আগে আমার
পায়ে হাত তোর বুলিয়ে দেওয়া।
পরে ধীরে ধীরে পিঠের দাগটা মুছে নেওয়া
পরে বলা ভক্তি ভরে "প্রভু অনুগ্রহ ভরে।
পশ্চাতে মেরেছো, একবার মারো দেখি পুরোভাগে
দেখি সেটা কেমন লাগে।"

আসক দিল্লীশ্বরোহবা জগদীশ্বরোহবা জাঁহাগীর বাদশাহের প্রধান মন্ত্রী; তাঁহার বাড়ীতে এই তাড়িখানা কতদিন হইতে স্থাপিত হইয়াছিল আর দ্বিজেন্দ্র বাবুকে তাহার এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ রিপোর্ট কোন ঐতিহাসিক দিয়া ছিলেন, নাট্যকার তাহা ফুটনোটে লিখিয়া দিলে এসিয়াটিক সোসাইটি ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ঐতিহাসিক গবেষণার বিশেষ সাহায্য হইত। গানটায় purpose থাকিতে পারে কিন্তু এদৃশ্যে সংলগ্নতা কিছুই নাই—আর যাহা আছে বলিয়া কবি ও কবির অনুচরেরা বিভোর সেই হাসি—একবিন্দুও নাই, তীব্র শ্লেষ আছে বটে, কিন্তু সেটা এমন অপাত্রে ( বন্দররাজের প্রতি ) প্রযুক্ত হইয়াছে যে তাহার সম্বন্ধে কোন অর্থই হয় না। গায়ক যথার্থই

বলিয়াছেন—"আমার গান পাচ্ছে", আর এ গান পূর্ব্ব হতে জানা থাক্‌লে সকল শ্রোতাই বন্দররাজের মত পালাইতে বাধ্য হইতেন আর একান্ত যদি শোনাইতে হয় তবে তাহাও ঐ বন্দররাজের মত কাহাকেও ধরিয়া বাঁধিয়া শুনাইতে হইবে! (এ সকল দৃশ্যে না আছে বাক্‌চাতুর্য্য, না আছে রসাভাষ, না আছে রসালাপ, না আছে ভদ্রোচিত ব্যবহার—অথচ এগুলাকে মোগল দরবারের রাজা মহারাজা, আমীর ওমরাহ বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে। হায় হায়! কাব্যে দুর্নীতি যাঁহার চক্ষুশূল তাঁহার কাব্যে আমাদের এতটা অশিষ্টতা দেখিতে হয় আর মনঃপীড়া ভোগ করিতে হয়—এ বড় বালাই! তার পর এই দৃশ্যটার সঙ্গে আমরা যে তাড়িখানার বা ধান্যেশ্বরী পানের আড্ডার তুলনা করিলাম সেটাও আমাদের মনগড়া কথা নহে। কবির এই আড্ডার মালিক মোগল বাদশাহের প্রধান মন্ত্রী—আসক খাঁ আসিয়া হুকুম দিলেন "বাদশাহের হুকুম যে আপনারা আজ রাত্রে সবাই মদ খান আর স্ফূর্ত্তি করুন"। তার পর আসক নূতন ইয়ারকির পত্তন করিয়া বলিলেন—বাদশাহ নিজে কান বিঁধিয়ে কুণ্ডল (মাকড়ী) পরেছেন আর হুকুম দিয়েছেন সব সভাসদ্‌দের কান বেঁধাতে হবে আর কুণ্ডল পরতে হবে।" তার পর আসককে সম্রাটের শালা বলে ঠাট্টা বিদ্রূপ আছে! এখন পাঠকবর্গ বিচার করুন—দ্বিজেন্দ্র বাবুর এমন সরস দৃশ্যটি তাঁহারই মতে তাড়িখানা না হইয়া মোগল বাদশাহের মন্ত্রীর বাড়ীর বৈঠকখানা হইতে পারে কি?)

---

## বিশ্বাস।

( ডাচ্‌ কবি ডেজেন্‌ষ্টেট্‌ হইতে )

বিশ্বাস করিস্‌, বাছা, ফুল্ল ফুলে, পাখীর উল্লাসে,
নিষ্কলঙ্ক সূর্য্যালোকে রাখিস্‌ বিশ্বাস ;
যে মনে পড়েনি দাগ, যে আঁখি প্রীতির ভাষা ভাষে
তার কাছে অসঙ্কোচে যাস।
দুঃখ, সুখ,—যে খুসী সে দাঁড়াক দুয়ারে এসে তোর,—
পীড়িয়া বীণার তার যা' সুখী বাজাক্‌,



টলিস্‌ নে, ওরে বাছা, হারাস্‌ নে বিশ্বাসের জোর
ওই জোরে খুসী তুই থাক্‌।
কেনা জানে টুটে যায় কুসুমের সুষমা দুদিনে,
তিক্ত হয় মধুময় সুখময় স্মৃতি ;
তবু, যে, উদয়-তটে,—স্বপ্নে তারে নিতে হয় চিনে,
বিশ্বাসে সে আলোকিছে নিতি।
বিশ্বাস করিস, বাছা, বিশ্বাসের রাখিস্‌ ক্ষমতা,
ওরে সদানন্দ শিশু! সঙ্কোচে মলিন!
কল্য যে মিশিবে শূন্যে, অশ্রুশেষ হবে যার কথা,
ইন্দ্রধনু আজি সে রঙীন্‌।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

---

## চিত্র পরিচয়।

পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান সংখ্যায় উত্তরপশ্চিমদেশবাসী প্রকাশিত রমণীর দুখানি ছবি আমরা মান্যবর শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকট পাইয়াছি। রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেব বাহাদুর লর্ড হার্ডিঞ্জের সময় সিক ওয়ারে গভর্ণর জেনারেলের সহিত তোপখানার দাওয়ান হইয়া গিয়াছিলেন, সেই সময় দিল্লী হইতে ছবি দুখানি লইয়া আসেন। ইহা হইতেই এগুলি কত পুরাতন তাহা অনুমান করা যায়।

---

## মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

বাণী, আশ্বিন, কার্ত্তিক। আশ্বিন ও কার্ত্তিক দুই সংখ্যা এক সঙ্গে মুদ্রিত হওয়ায় "বাণী"র আকার কিছু বাড়িয়াছে। তবে এ বৃদ্ধি নিতান্ত অসার ও রোগমূলক না হইয়া যে সারবান হইয়াছে ইহা আনন্দের বিষয়। প্রবন্ধগুলির বিষয় বিভাগ করিয়া সম্পাদক মহাশয় বাণীতে নূতনত্ব দেখাইবার যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সফল হয় নাই। বাস্তবিক এরূপ বিভাগ সর্ব্বত্র ন্যায়সঙ্গত হয় না, প্রায়ই কোন কোন না একটি দোষ আসিয়া পড়ে। "সাহিত্য ও আলোচনা"র মধ্যে অনেক বিষয় থাকিতে পারিত। গল্প, কবিতা সমালোচনা বা অন্যান্য কতকগুলি বিশিষ্ট প্রবন্ধকে এ বিভাগ হইতে স্থানান্তরিত করা

আবশ্যক বলিয়া বোধ হয় না। "সাহিত্য" কথাটি লইয়া বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন দেখিতেছি। "ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব" বিভাগে কতকগুলি সারবান রচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মহারাজ দনুজরায়, পাটলীপুত্র প্রভৃতি বাণীর এই বিভাগটিকে গৌরবান্বিত করিয়াছে। "ইংরাজী শিক্ষা" প্রবন্ধে লেখক কিরূপে ইংরাজী শিখিতে হইবে তাহার উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সর্ব্বত্র একমত হইতে পারিলাম না। "রজনী কান্ত" শীর্ষক প্রবন্ধে দীনেশবাবু ৺রজনীকান্তের প্রতি তাঁহার আন্তরিক স্নেহ ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের "দণ্ড" সারগর্ভ। "বঙ্গভাষায় বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ" ও পিরীতি" প্রবন্ধদুটি শিরোনামার উপযুক্ত হয় নাই। আরো সারগর্ভ হওয়া উচিত ছিল। শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের "মহাভারতের গঠন" ক্রমশঃ প্রকাশ্য। শ্রীদেবেন্দ্র নাথ সেন মহাশয়ের কবিতাদুটির ভাব নূতন না হইলেও মন্দ লাগিল না। "ঈশানচন্দ্র" কবিতায় শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয় সুকবি ৺ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্দভাগ্য উল্লেখ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের "গানে" রবিবাবুর স্পষ্ট ঝঙ্কার পাওয়া যায়—রচনা ভালই হইয়াছে। ৺রজনীকান্তের "শরণাগত" ভক্তের উচ্ছ্বাস। "শেষ আহ্বান" মন্দ হয় নাই। 'জীবন বৃত্তান্ত' বিভাগে "অশ্ব-ঘোষ" ও 'ডাক্তার রামদাসে'র জীবনী ক্রমপ্রকাশ্য। হরিসাধন বাবুর "ভৃগুক্ষেত্র" চিত্তাকর্ষক। শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের "লঙ্কা হইতে বিদায় গ্রহণ" শীর্ষক রচনায় স্বরচিত কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। এই অনুবাদের ভিতরে লঙ্কার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের উপনিষদের প্রাচীনতা" সারগর্ভ। হরিসাধন বাবুর "ঋণ পরিশোধ" শীর্ষক গল্পটি ক্রমশঃ প্রকাশ্য। দ্বিজেন্দ্রবাবু 'গোরার' সমালোচনায় হাত দিয়াছেন, পড়িতে আগ্রহ হয়। মোটের উপর এবারকার বাণী প্রবন্ধ-গৌরবে উচ্চস্থানই পাইবার উপযুক্ত।

উপাসনা আশ্বিন। "উপাসনা" এই মাস হইতে সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। "ব্রহ্মোপাসনাতত্ত্ব" চলিতেছে। "রামায়ণ" শীর্ষক প্রবন্ধে হয়ত দু একটি সুযুক্তিপূর্ণ কথা থাকিতে পারে। কিন্তু উহা এত অসার, এত বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া যে উহা লইয়া বিশেষ আলোচনা করার ধৈর্য্য থাকে না। এমন রচনাও মাসিকে স্থান পায়! উদ্ভিদের "জাতিভেদ" সুপাঠ্য। "মে



মিজারেবল্" ভিক্তর হুগোর উপন্যাসের অনুবাদ ক্রমশঃ প্রকাশ্য। "বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের আইন" চলিতেছে। সুকবি ৺রজনীকান্তের পরলোক গমনে" কবিতাটি মন্দ হয় নাই।

বীরভূমি, প্রথমবর্ষ, অগ্রহায়ণ, শ্রীজিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, বি-এল্, সম্পাদিত। "বীরভূমের বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত সাহিত্যিক শক্তি এই 'বীরভূমি'তে আসিয়া কেন্দ্রীভূত হউক, এই বীরভূমি বিশ্ব সাহিত্য ও সমগ্র বঙ্গীয় সাহিত্যের সহিত বীরভূমবাসীর সম্মিলিত সাহিত্যিক সাধন-প্রবাহের মিলনক্ষেত্র হইয়া পুণ্য প্রয়াগে পরিণত হউক," ইহাই পরিচালকগণের প্রার্থনা। 'বীরভূমি'র উদ্দেশ্য কি তাহা কতক পরিমাণে ইহা হইতেই জানিতে পারা যায়।

বাঙ্গলার সর্ব্বত্র সাহিত্যের উন্নতি হোক, শুধু বীরভূম কেন প্রতি জিলায় ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্যশক্তি উন্নত ও বিকসিত হইয়া সমস্ত বঙ্গের সাহিত্যকে পুষ্ট করুক, এই উদ্দেশ্যই সকলের থাকা উচিত। সকলকে এক স্থানে মিলিতে হইবে, সুতরাং পরস্পর বিচ্ছিন্নতা যত অল্প হয় ততই ভাল। এ বিষয়ে স্বতন্ত্রতা সুলক্ষণ নয়। আশা করি, "বীরভূমি" সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করিয়া ব্যাপ্ত বঙ্গসাহিত্যের অঙ্গ হইতে—শুধু কথায় নয়—কাজেও চেষ্টা করিবে। এক স্থানে পড়িলাম "আমরা বীরভূমবাসী, চণ্ডীদাস আমাদেরই।" এ সকল কথা কেবল সংকীর্ণতাকেই প্রশ্রয় দেয়। আলোচ্য সংখ্যায় "চণ্ডীদাসের নবাবিষ্কৃত পদ," "বঙ্গসাহিত্যে মুসলমান কবি" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আমরা সহযোগীর উন্নতি কামনা করি।

---

## গ্রন্থ-সমালোচনা।

১। রেখা, শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রণীত ২২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত, মূল্য বারো আনা।

'রেখা'র অধিকাংশ কবিতাই প্রীতিপ্রদ। সাময়িক পত্রে ইতিপূর্ব্বে ইহার যেগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বেই পড়িয়াছি ও সেগুলির কবিত্ব রস আস্বাদন করিয়াছি। গ্রন্থখানি কবিজনোচিত করুণভাবে স্থানে স্থানে বড়ই মধুর ও সরস হইয়া উঠিয়াছে। "রেখা" "জ্যোৎস্না-লক্ষ্মী" "চাষার মেয়ের গান" প্রভৃতি কবিতাগুলি উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। প্রকৃতির বর্ণনায় কবি সিদ্ধহস্ত; বর্ণনায় নূতনত্বও সুপষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। "শ্রাবণে," "মিলন," "মাছধরা" "সরোবরে সন্ধ্যা" প্রভৃতি কবিতাগুলিতে এক

একটি অতি সুন্দর চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, বহিঃ প্রকৃতির ছায়ায় অন্ত প্রকৃতিকে কবি সুন্দর সুস্পষ্ট করিয়া অনাইয়া তুলিয়াছেন। কতকগুলি তর্ক ও নীতিমূলক কবিতাও গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অনুবাদকের গুণ গুলিও কবিতে বর্ত্তমান। নির্ব্বাচন শক্তি, বিদেশী জিনিসকে স্বদেশীর মত করিয়া প্রকাশ করার নৈপুণ্য যতীন বাবুর যথেষ্ট পরিমাণে আছে।

৬। সাবিত্রী-সত্যবান ( পৌরাণিক উপাখ্যান ), শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট বেঙ্গল লাইব্রেরী হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ॥ দেড় টাকা।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় গ্রন্থখানির ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। এই ভূমিকার পর আর বিশেষ কোনো বলিবার কথা থাকে না। সাবিত্রী সত্যবানের উপাখ্যান অবলম্বনে গ্রন্থখানি রচনা করিয়া লেখক বঙ্গসাহিত্যের একটা অভাব পূরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তজ্জন্য আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। এরূপ গ্রন্থ সংখ্যায় যত অধিক হয় ততই মঙ্গল। পুরাণে অনেক চরিত্র আছে, সেগুলিও সরল সহজ ভাষায় ফুটাইয়া লেখক যদি ক্রমশঃ তাঁহার পথে অগ্রসর হইতে থাকেন তাহা হইলে তিনি শিশুসাহিত্যের পুষ্টিবিধান করিয়া যশস্বী হইতে পারিবেন আশা করা যায়।

বইখানির ছাপা কাগজ ভাল, বাঁধাই অতিসুন্দর, ইহাতে অনেকগুলি রঙীন ছিব আছে, ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের উপহার দিবার উপযুক্ত।

৩। হৃদয় ও মনের ভাষা—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি. এ প্রণীত। লেখক বলেন, "মস্তিষ্কের ভাষা ও হৃদয়ের ভাষা স্বতন্ত্র, পৃথক। বুদ্ধি ভাবিয়া চিন্তিয়া যা করে, হৃদয় সহসাই তাহা করিতে সমর্থ হয়। সেকরার ঠুক্ ঠাক্, কামারের এক ঘা।" আর একস্থানে বলিয়াছেন, "গদ্য মনের ভাষা। হৃদয়ের ভাষাই কবিতা।" এই উক্তিগুলিকেই পুস্তকের keynote বলা যাইতে পারে। রচনা মধুর ও কবিত্ব পূর্ণ। ভাব গভীর। বিষয়টি অতি নিপুণ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। এরূপ জটিল বিষয় এমন সরসভাবে লিখিতে পারা বড় সহজ কথা নয়। দেশ বিদেশের ভক্ত ও মনীষীদিগের উক্তি ও ভাব গ্রহণ করিলেও লেখক সেগুলিকে এমন একটি নিজস্ব ছাপ দিয়া দেন যে সেগুলিকে আর ধার-করা সামগ্রী বলিয়া মনে করিতে ইচ্ছা হয় না। তাঁহার রচনাবলীর বহুল প্রচার প্রার্থনীয়।

অন্ধাবস্থায় হেমচন্দ্র।

( খিদির পুর হেমচন্দ্র পাঠাগারের সম্পাদক ডাক্তার শ্রীযুক্ত অমূল্য চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত )।

*Printed by K. V. Seyne & Bros.*

# মানসী

দ্বিতীয় ভাগ ] মাঘ ১৩১৭ সাল। [ ১২শ সংখ্যা।

## মনোহারিকা।

১

বন-ফুলের বরণ-মালা
পাতার কোলে দুলিয়ে রে,
বল্ রে তৃণ, বল্ আমারে
কোন্‌খানে সে লুকিয়েছে ?
ঐ নারিকেল গাছের ঘন
কুঞ্জবনের আবছায়ে,
বল্ কোথা তার কুন্দমালা
পথের ধূলায় লুটিয়েছে ?

২

একলাটি সে থাকৃত শুয়ে
সাঁঝের আলোর ঝল্‌মলে,
ডুবিয়ে দিয়ে কোমল তনু
দূর্ব্বাদলের মখ্‌মলে—
এলিয়ে দিত ফুলের-বাজু-
উজল ভুজ-বল্লরী,
কাঁটাহারা-তরুণ-গোলাপ-
শাখার-মতন-ঢল্‌মলে।

৩

দেখেছি তায় লোকের ভিড়ে
রাস-দেউলে দাঁড়িয়ে সে
কল্কা-পেড়ে শাড়ীর কোণা
তর্জ্জনীতে জড়িয়েছে ;
এক-মনে সে শুন্‌তেছিল
কাণুর গানের অন্তরা—
ব্রজ-বধূর দীর্ঘ শ্বাসে
চোখ দিয়ে জল গড়িয়েছে।

৪

সে যে আমার গানের মধু,
মানস-বনের অপ্সরী,
ফুটিয়ে গেছে মালঞ্চে মোর
ফাগুন-মুকুল-মঞ্জরী ;
কোন্ সে দেশে হাওয়ায় ভেসে
কোথায় সে যে লুকিয়েছে—
কতদিন আর পথের পানে
চাইব দিবা-শর্ব্বরী !

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

# লজ্জার উৎপত্তি ও অভিব্যক্তি।

কোন অসভ্য জাতির মধ্যে বস্ত্র ব্যবহার একবার প্রচলিত হইলে তাহার আবশ্যকতার আর একটি কারণ দেখিতে পাওয়া যায়—সেটি পুরুষের আপনার পক্ষে সুবিধার জ্ঞান। আমাদের আদিম অবস্থার কোন বিশেষ স্ত্রী কোন বিশেষ পুরুষের নিজস্ব বলিয়া গণিত হইত না। সমাজ যখন একটু উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল তখন স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হইতে লাগিল। একজনের সম্পত্তির উপর আর একজনের দৃষ্টি পড়ে ইহা কেহই ইচ্ছা করে না।



Waitz, Schuntz, Dilerat প্রভৃতি সমাজ তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণের ধারণা—পুরুষদিগের এই যে ঈর্ষ্যাভয়, ইহা হইতেই মুখ্যভাবে বস্ত্র ব্যবহার এবং গৌণভাবে স্ত্রীজাতির লজ্জার সৃষ্টি হইয়াছে। অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে এখনও কেবল বিবাহিতা স্ত্রীরাই বস্ত্র পরিধান করে। কুমারীরা তাহা করে না, বিবাহের পূর্ব্বে স্ত্রী স্বাধীন থাকে। কিন্তু বিবাহের পর আর তাহা হইবার জো নাই, তখন আর ইহারা নগ্ন থাকিতে পায় না এবং স্বামীর অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। এই সকল অসভ্য সমাজে স্ত্রীর বস্ত্র পরিধান ব্যাপারটা স্বামীর চক্ষে পত্নীরূপ সম্পত্তি রক্ষার একটা নিশান বলিয়া গণিত হইতে থাকে। এইরূপে ( যদিও স্বাভাবিক ভাবে নয় ) নগ্নতা স্ত্রীলোকের পক্ষে লজ্জাকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কালক্রমে পিতা সুধু তার স্ত্রীকে নয়, কুমারী কন্যাদিগকেও সম্পত্তির হিসাবে দেখিতে আরম্ভ করিল ; আর সতীত্ব পূর্ব্বাপেক্ষা পরিণতি প্রাপ্ত হওয়ায়, কি বিবাহিতা, কি কুমারী সকল স্ত্রীলোকের মধ্যেই বস্ত্র ব্যবহারের প্রচলন হইল।

সমাজের উন্নতি ও সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে লজ্জারও নানাবিধ আকৃতিগত পরিবর্ত্তন ও বিস্তার হইতে দেখা যায়। এই যে নব্য ইয়ুরোপীয় সভ্যতা—লজ্জার উপর ইহার বড় কম প্রভাব লক্ষিত হয় না। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংলণ্ড ভদ্রতার যে সকল নব নব ধারা প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল তাহা আমাদিগের নিকট বাস্তবিকই হাস্যকর বলিয়া বোধ হয়। বর্ত্তমান সভ্যতার প্রারম্ভে ফ্রান্সে একদল রুচিবাগীশের উদ্ভব হইয়াছিল ; তাহারা ভাষা, ভাব, শিল্প, কলা প্রভৃতির সংস্কার ও আচার ব্যবহার, বসনভূষণ প্রভৃতিতে লজ্জার পরিসর বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত সতত সচেষ্ট ছিল। Molier তাঁহার বিখ্যাত প্রহসন গুলির মধ্যে এই সব নবোদ্ভূত রুচিবাগীশদিগকে তীব্রভাবে বিদ্রূপ করিতে ছাড়েন নাই। ইংলণ্ডেও Swift, Sterne প্রভৃতি প্রসিদ্ধ লেখকগণ এই রুচির ঢেউ সামলাইতে পারেন নাই। তাঁহাদের রচিত গ্রন্থ মধ্যে বহু শব্দের স্থলে যে সকল লোপ-চিহ্নের সন্নিবেশ থাকিতে দেখা যায়, সে সকল এই উদ্দাম নব্য রুচির ফল ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে ? আমাদের দেশেও এককালে ভারতচন্দ্রের ন্যায় কবির লেখাও খুব আদরের সহিত পঠিত হইত। বলা বাহুল্য নব্যদিগের নিকট এ সকল এখন লজ্জাকর অশ্লীল বলিয়া বিবেচিত হইতে দেখা যায়। আমাদের পিতামহগণ

হয় ত খালি পায়ে আফিস যাইতেন, তাহাতে তাঁহাদের মনে কোনরূপই সঙ্কোচ জন্মাইত না ; আমাদের পায়ে জুতাত থাকিবেই, তাহার উপর মোজা না থাকিলে যেন লজ্জা নিবারণ হয় না। এইরূপে সভ্যতার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে লজ্জারও কতরূপ পরিবর্ত্তন হয়।

ইহা হইতে কেহ যেন এমন মনে না করেন পূর্ব্বাপেক্ষা লজ্জাভাব এখন অধিকতর প্রগাঢ় হইয়াছে ; প্রগাঢ় ত হয়ই নাই বরঞ্চ লঘু ও অল্প হইয়াছে। সভ্য সমাজে কতক গুলি আদব কায়দা বাঁচাইয়া চলিলেই যেন লজ্জা নিবারণ হয়। সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে লজ্জা কতগুলি সামাজিক ও লৌকিক রীতি নীতির মধ্যেই যেন সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। ইহা যেন শিষ্টাচার ও নম্রতার সঙ্গে একীভূত। আদিম বর্ব্বর অবস্থায় লজ্জা অপরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু সভ্য সমাজে ইহা প্রতিদিনই নব নব আকার ধারণ করিতেছে। সভ্যতার ধারা যেমন নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে সেইরূপ দেহজাত লজ্জারও নিয়ত পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায়। আজ শরীরের যে অংশ আবৃত রাখাই রুচিসঙ্গত, কাল হয়ত তাহা উন্মুক্ত রাখাই রুচিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। আমেরিকার আদিম অধিবাসীদিগের ও তুর্কীস্থানের মুসলমানদিগের মধ্যে কিন্তু এরূপ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। ইহাদের লজ্জা খাঁটি লজ্জা। ইহা তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ প্রাকৃতিক গুণ। সভ্যদেশে কোন ব্যক্তি যদি লজ্জার দোহাই দিয়া, তাঁহার নিজের পক্ষে কিংবা জন সাধারণের পক্ষে মঙ্গলকর কোন কার্য্যে আপত্তি করেন তাহা হইলে লোক সমাজে তিনি উপহাসের পাত্র হইবেন। কিন্তু অসভ্য জাতির মধ্যে, প্রাণ গেলেও এমন কাজ সংসাধিত হওয়ার অল্পই সম্ভাবনা আছে।

লজ্জা মানবের একটী সাধারণ ধর্ম্ম বলিতে হইবে। নগ্নকায় আদিম অসভ্য জাতিই হউক, অরে বেশভূষায় সুসজ্জিত সভ্য জাতিই হউক, লজ্জা সকলের মধ্যেই বর্ত্তমান। লজ্জাকে তবে ক্রোধ ভয় প্রভৃতির মত সহজাত ভাব বলা যাইতে পারে না।

কিন্তু লজ্জা যেরূপ সার্ব্বজনীন ও সাধারণ তাহাতে ইহা যে শূন্যের উপর সংস্থিত তাহাই বা কি করিয়া বলা যায়। অন্ততঃ শরীরের কোন একটা বিশেষ ক্রিয়ার উপর ইহার আশ্রয়, সে কথা স্বীকার করিতেই হইবে। সেই শরীর ক্রিয়াটি হইতেছে Varomotor Mechanism অর্থাৎ শিরা ধমনী গুলির



প্রশস্ত ও সঙ্কোচ হইবার যে ব্যবস্থা আছে তাহাই। এইরূপ ব্যবস্থা থাকায় মুখের শিরাধমনীগুলিতে অধিক রক্ত যায়, আর বদনমণ্ডল অধিক রক্তাভ হয়। মুখলাল হওয়া ব্যাপারটি যেন লজ্জার সমর্থক ও পরিচায়ক।

বদন মণ্ডলের এই যে আকস্মিক বর্ণ পরিবর্ত্তন এবং এই পরিবর্ত্তনের পশ্চাতে হৃদয়ে যে ভাবের হিল্লোল ও চাঞ্চল্য থাকে, তাহাতেই লজ্জার উৎপত্তি হয়। কৌশলক্রমে এই হৃদয় চাঞ্চল্যটা যদি প্রশমিত করা যায় তাহা হইলে লজ্জারও হ্রাস হয়—যদিও এক্ষেত্রে লজ্জার কারণটি সমভাবেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে একপ্রকার ভয়—অনেকটা যৌন ভয়—থাকাতে লুকাইবার চেষ্টা হইতেছিল, মন হইতে সেই ভয়টা দূর হওয়ার লজ্জা অর্থাৎ আত্মসংবরণ চেষ্টাও দূরীভূত হইল। মানুষ যে লজ্জানুভব করে তাহার কারণ তাহার মুখ লাল হয় বলিয়া। এই কারণে লজ্জায় মুখ লাল হয়—না বলিয়া মুখ লাল হইতে পারে বলিয়া লজ্জা হয়—বলাই সঙ্গত। এই কারণেই বোধ করি আলোক অপেক্ষা অন্ধকারে লজ্জা কম হয়। সেই জন্যই বড় বড় সহরে রাত্রিকালে নির্লজ্জ পৈশাচিক ব্যাপারের এত প্রাবল্য। পতিতা রমনীর একেইত লজ্জা অল্প, তাহাতে রাত্রে লজ্জার রক্ষণ স্বভাবতই শিথিল হয়। আরও একটি অদ্ভুত ব্যাপার এই যে Shortsighted ( যাহারা দূরের জিনিস দেখিতে পায় না ) ও অন্ধ ব্যক্তি-দিগের লজ্জাবোধ ক্ষমতা স্বাভাবিক ব্যক্তির অপেক্ষা যেন কতকটা অল্প হইতে দেখা যায়। অনেক Shortsighted ব্যক্তির মুখে শোনা যায়, চশমা পরিধানের পূর্ব্বে তাঁহাদিগের যতখানি লজ্জা হয় চশমা পরিলে তাহার অপেক্ষা অধিক লজ্জা বোধ হয়। অন্ধব্যক্তির সম্মুখে কোন কাজ করিবার বেলায় কাহারও লজ্জা হয় না, তাহার কারণ অন্ধের সম্মুখে বিশেষ করিয়া আপনাকে অনুভব করা আবশ্যক হয় না। আত্মানুভূতি বা আত্ম-বোধ হইতেই ভয় জন্মায় এবং সেই ভয় হইতেই লজ্জার উৎপত্তি হয়। দেশবিশেষে সমাজ বিশেষে লজ্জার রূপান্তর হয় বটে, কিন্তু ইহার একবারে তিরোভাব হইতে দেখা যায় না। সমাজের সকল অবস্থাতেই লজ্জা মানবপ্রকৃতির একটা বিশেষ ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। মুখ লাল হওয়া ব্যাপারটি দ্বারা ইহা যুগ যুগান্তরে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে লজ্জার পরিসর বৃদ্ধি হয় বটে কিন্তু ইহার গভীরতার বৃদ্ধি না হইয়া বরঞ্চ হ্রাস হইতে থাকে।

অসভ্য বর্ব্বরদিগের মধ্যে লজ্জা অনেকটা মৌলিকভাবে সংরক্ষিত হয়। অপেক্ষাকৃত সভ্যসমাজে একবার যখন নব্য সভ্যতা প্রবেশলাভ করে, তখন উহার জীবনে, সাহিত্যে, শিল্পকলায় নব্য রুচির প্রবর্ত্তনের একটা উন্মাদ ব্যাকুলতা দৃষ্ট হয়; যেন সে প্রমান করিতে চাহে সে কোন কালেই অসভ্য ছিল না। প্রাচীন সভ্য সমাজে লজ্জা ও রুচি এরূপ বিকটভাবে প্রকট হইতে দেখা যায় না। সভ্য জাতির মধ্যে আবার উচ্চ শ্রেণীস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে লজ্জা অনেকটা মৌলিক অজেয় আকারে থাকে। লজ্জাকে আত্ম গৌরবের অংশ বিশেষ বলা যাইতে পারে; কিন্তু ইহাও সত্য যে পূর্ণ পরিণত ব্যক্তির পক্ষে আত্মসম্মান বোধ আবার অতিরিক্ত লজ্জাকে দমন করিয়া রাখে। সভ্যতার বৃদ্ধি হইলে, লজ্জা আপনা হইতেই কতকটা শমিত হইতে বাধ্য। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, লজ্জার কারণসমূহ কতকগুলি ভাবের উপর সংস্থাপিত। এই সব ভাব দ্বারা অসভ্য অশিক্ষিত ব্যক্তির চিত্ত যতটা চঞ্চল হওয়া সম্ভব, সভ্য সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের ততটা সম্ভব নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ঘৃণাভাবটির উল্লেখ করা যাক। জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে ঘৃণার হ্রাস হইতে দেখা যায়।

পদার্থের যথার্থ উপলব্ধি করিতে পারিলে, উহার মধ্যে ঘৃণা উদ্রেকের বড় একটা কিছু থাকিতে পারে না। পচা ডিম্বের গন্ধ অনেকের নিকট ঘৃণাকর কিন্তু যিনি কেমিষ্ট তিনি ইহার মধ্যে ঘৃণাকর কিছুই দেখিতে পান না। তাঁহাকে যে অষ্ট প্রহর Sulphuretted hydrogen লইয়া কারবার করিতে হয়। দেশাচার যাহা এককালে লজ্জার কারণ স্বরূপ ছিল এখন আর উহার তেমন স্থান নাই এখন উহ etiquette শিষ্টাচারের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। স্ত্রীকে সম্পত্তির হিসাবে দেখা হইতে যে লজ্জার উৎপত্তি হইয় ছিল, বর্ত্তমান কালে সমাজে তাহার কোন নিদর্শন নাই বলিলেও চলে। লজ্জার হাব ভাব ছল কলা গুলি যাহা এককালে পুরুষের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার অভিপ্রায়ে স্ত্রীজাতি কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইত, এখন আর উহাদের সে অভিপ্রায়ে ব্যবহার হয় না। এখন এগুলি Grace অর্থাৎ চারুতায় পরিণত হইয়াছে। হউক চারুতা, ওই চারুতার মধ্যেই শ্রীমতীদিগের লজ্জা বিদ্যমান রহিয়াছে। লজ্জাকে সমাজ হইতে দুর করা একবারেই অসম্ভব এবং তাহা বাঞ্ছনীয়ও নহে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী।



# অর্থনীতি।

আমরা শ্রম বিভাগের "গুণ" বা "সুবিধা" গুলিই উল্লেখ করিলাম। কিন্তু ২৩ স্থলে ইহাতে যথেষ্ট অসুবিধাও হয়। এক খানি চেয়ার নির্ম্মাণের জন্য যদি আসন প্রস্তুতে একজন, হাত ও পায়ের জন্য অন্য এক জনকে নিযুক্ত করা যায়, তাহা হইলে অনেক সময় চেয়ার ঠিক "ফিট" করে না। অনেক কাটিয়া ছাটিয়া ঠিক করিয়া লইতে হয়। বাজারের সাধারণ চেয়ার এই জন্য খরিদ্দারের অনেক সময় মনঃপুত হয় না। সাধারণতঃ, দোকানদার এক জনের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে যে এ মাসে তাহাকে এতগুলি পা দিতে হইবে; অপরের সহিত আসনের বন্দোবস্ত করে। দোকানে দোকানদার সব জোড়া দিয়া চেয়ার প্রস্তুত করে এবং যথেষ্ট পুডিং দিতে বাধ্য হয়। এই একটী অসুবিধা। আবার একঘেয়ে কাজ করিতে করিতে অনেক সময় সঙ্কীর্ণতা আসিয়া পড়ে। রহস্যপ্রিয় বিলাতী সংবাদ পত্র অনেক সময় আমাদের দেশীয় টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেণ্টের কেরাণীগুলির কথা লিখিতে যাইয়া লেখে "Tiger on Platform, wire instructions"। এ গল্পগুলি কতদূর সত্য তাহা তাহারাই বলিতে পারেন। তবে অনেক সময় একই রকমের কাজ করিতে করিতে যে "একঘেয়ে" ভাব আসে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। "মাছিমারা কেরাণী" প্রবাদ বাক্যের সার্থকতা ইহা হইতেই পাওয়া যায়।

অবাধ বাণিজ্যকে এক প্রকার শ্রমবিভাগ বলা যাইতে পারে। এক এক দেশে এক এক দ্রব্য অনায়াসেই উৎপন্ন করা যায়। আবার সেই দেশেই অন্য কোন দ্রব্য অতি কষ্টেও উৎপন্ন করা যায় না। এ ক্ষেত্রে যে দেশে কোন দ্রব্য সহজেই উৎপন্ন হয় সেই দেশে কেবল ঐ দ্রব্যই অনায়াসে উৎপন্ন করিয়া এবং যে দ্রব্য সহজে হয় না তাহা অপর স্থল হইতে (অর্থাৎ যে স্থলে ইহা সহজ সাধ্য) আমদানী করিলে উভয় দেশেরই সুবিধা। নিম্নবঙ্গে চাউল প্রচুর পরিমাণে জন্মে এবং বিহারে যথেষ্ট গম হয়। ঐ গম ও চাউল বিনিময়কে একরূপ শ্রমবিভাগ বলা যায়। *

শ্রম বিভাগে যেমন পরিশ্রমের অর্থোৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হয়, সমবায়

* "Free trde is simply an extension of the principle of the division of labour. By breaking down the artificial barriers which have been erected between nations, each country instead of being obliged to depend entirely

শক্তির প্রয়োগেও সেইরূপ উহার অর্থোৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়। নদীগর্ভ হইতে নোঙর তুলিতে একটী লোকের যথেষ্ট অসুবিধা ও ক্লেশ হয় এবং সময়ও যথেষ্ট যায়, কিন্তু কয়েকজনে মিলিয়া অনায়াসে ঐ কার্য্য শেষ করিতে পারে। এই সমবায় পরিশ্রম দুই প্রকারে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম, অবিমিশ্রিত এবং দ্বিতীয় মিশ্রিত। কয়েক জন লোক মিলিয়া যখন একই কার্য্য সম্পাদন করে, তখন উহাকে অবিমিশ্রিত পরিশ্রম বলা যায়। দশ পনের জন লোক মিলিয়া এক খানি গাড়ী ঠেলিয়া লইয়া যাওয়াকে এই প্রকার পরিশ্রম আখ্যা দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে, যখন একই কার্য্য সম্পাদন করিতে ভিন্ন ভিন্ন লোক, ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করে, তখন উহাকে মিশ্রিত সমবায় বলা যায়। বস্ত্র প্রস্তুতের কথা ধরুন। এক খানি বস্ত্র প্রস্তুত করিতে এক দল লোক তুলা জন্মায়, অন্য দলে সূত্র প্রস্তুত করে, অন্য দলে বয়ন করে, এবং এই বিভিন্ন দলের সমবেত কার্য্য দ্বারা উদ্ভূত দ্রব্যের নাম বস্ত্র। ব্যবসায়ে সমবায় পরিশ্রমের শক্তির প্রতি যে সুদৃষ্টি পড়িয়াছে ইহা অতি শুভমুহূর্ত্তেই পড়িয়াছে বলিতে হইবে। প্রতি প্রদেশে এইরূপ সমবায় শক্তি পরিচালিত সমিতি ইত্যাদি গঠিত হইয়াছে এবং ইহার ফলে দেশে যে শীঘ্রই এক নূতন বাতাস বহিবে—তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহও যে নাই ইহা বলিলে কোনরূপ অত্যুক্তি হইবে না।

পরিশ্রমোৎপাদিত ফলে কি প্রকারে অধিক পরিমাণে কার্য্য করা হইতে পারে তাহার অনেকগুলি কারণ আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। যন্ত্রাদির অধিক ব্যবহার, শ্রমিকদিগের নৈপুণ্য, বুদ্ধি, সততা, বিশ্বস্ততাও এ ক্ষেত্রে উল্লেখ যোগ্য। শ্রমিকদিগের নৈপুণ্য দ্বারা যে পরিশ্রমের অর্থোৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায় ইহা বোঝান নিষ্প্রয়োজন। শ্রমজীবিগণের বুদ্ধিমত্তার উপরও যথেষ্ট নির্ভর করে। অজ্ঞ কারিকরকে ঠিক যে ভাবে কার্য্য করিতে বলা যায়, সে ঠিক ঐ ভাবেই কার্য্য করে—কোন প্রকার ব্যতিক্রম হইলেই তাহার আর কার্য্য করিবার শক্তি থাকে না। "এক হাতে তৈল, এক হাতে নূন" এইরূপই সে কার্য্য করে। সততা প্রভৃতির কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

on home manufactures, can divide its energies to those branches of trade and agriculture to which natural circumstances or national peculiarities have specially adopted it" Fawcet.



যন্ত্রাদির ব্যবহার প্রসঙ্গে অনেকেই বলেন যে ইহাতে উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়। তবে, আমাদের দেশে কতদূর ইহা প্রযুজ্য হইতে পারে, সে বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। আমাদের দেশে মিলে বা ফ্যাক্টরীতে যে পরিমাণ মজুর আছে, তাহা অপেক্ষা অনেক লোক নিজ নিজ বাড়ীতে থাকিয়াই কার্য্য করে। কলিকাতা শিল্প প্রদর্শনীতে মহারাজ গুইকোয়ার বাহাদুর একটী মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা সুদীর্ঘ হইলেও উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তিনি বলিয়াছিলেন—

"India is and will always remain a country of cottage industries where hundreds and thousands can work in mills and factories, millions or tens of millions work in their own huts ; and the idea of greatly improving the condition of the labourers of India, merely by adding to mills and factories is only possible for those who form their opinions 6000 miles away. No, gentlemen, any comprehensive plan of improving the condition of one industrial classes must seek to help the dwellers in the cottages. It is the humble weavers in towns and villages, the poor braziers and coppersmiths working in their sheds, the resourceless potters and ironsmiths and carpenters who follow their ancestral vocations in their ancestral homes, who form the main position of their industrial population and who demand our sympathy and keep. গুইকোয়ার মহোদয়ের মতে আমাদের দেশে মিল ইত্যাদি স্থাপন করা অপেক্ষা গ্রামে গ্রামে যাহাতে এই সকল তন্তুবায় বা অন্যান্য কারিকরগণ তাহাদের পৈতৃক বাস ভবনে থাকিয়া তাহাদের পৈতৃক কার্য্যেই লিপ্ত থাকিতে পারে তজ্জন্য সকলেরই চেষ্টা করা উচিত।

সংক্ষেপে কি কি প্রকারে শ্রমিকদিগের অর্থোৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায় তাহা নিম্নে বিবৃত করা গেল—

| | | |
|---|---|---|
| শ্রমবিভাগ | নৈপুণ্য | |
| সমবায় শক্তি প্রয়োগ | বুদ্ধিমত্তা | উন্নতি, শিক্ষা |
| যন্ত্রাদির ব্যবহার | নৈতিক চরিত্র | |
| মূলধন বৃদ্ধি | বিশ্বস্ততা | |

একটী মাত্র কথা বলিয়া অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করিব। আমাদের দেশে শ্রমিকের অভাব নাই—অভাব তাহাদের যাহাতে অজ্ঞতা ও কুসংস্কার

দূর হয় তাহার চেষ্টা। অভাব শিক্ষা। এই শিক্ষা বিস্তৃতির সহিত আমাদের অনেক অভাব দূরীভূত হইবে।

## মূলধন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অর্থোৎপাদন করিতে হইলে ভূমি ও পরিশ্রম যেরূপ আবশ্যক, মূলধনেরও তদ্রূপ আবশ্যকতা। সহজেই ইহা প্রতীয়মান হয় যে শ্রমজীবিগণ যখন কোন কার্য্যবিশেষে অর্থোৎপাদনে নিযুক্ত থাকে, তখন তাহারা যে দ্রব্য ভবিষ্যতে উৎপন্ন হইবে উহার উপর নির্ভর করিয়া বর্ত্তমানে জীবন ধারণ করিতে পারে না। কৃষক বৎসরের প্রারম্ভে ভূমি কর্ষণ করে; ঐ ভূমি হইতে হৈমন্তিক ধান্য হইবে, কিন্তু কৃষকগণকে ঐ ধান হওয়ার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত খাওয়াইবার জন্য, প্রভুকে পূর্ব্ব হইতেই বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছে। অর্থাৎ তাহাদের প্রভু যে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে তাহা হইতে কৃষককে বেতন দিতে হইবে। এই কারণে পূর্ব্বে উৎপাদিত অর্থের অংশ বিশেষ আশু ব্যবহারের জন্য না রাখিয়া দিলে ভবিষ্যৎ অর্থাগম হয় না। যে অর্থ এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আলাহিদা করিয়া রাখা হয় তাহাকেই মূলধন বলে, অর্থাৎ যে অর্থ হইতে ভবিষ্যতে অন্য অর্থ উৎপন্ন হয় তাহাই মূলধন। অনেকে এই প্রসঙ্গে আপত্তি করেন যে অর্থোৎপাদনে মূলধনের আবশ্যকতা নাই। কারণ স্বরূপ তাঁহারা বলেন যে অসভ্য আদিম মনুষ্যগণ স্বচ্ছন্দে বনজাত ফলমূলে জীবন ধারণ করিতে পারিত এবং সেজন্য তাহাদের মূলধনের আদৌ প্রয়োজন ছিল না। কোন সভ্য ব্যক্তিকে কোন জনমানবহীন দ্বীপে উলঙ্গ অবস্থায় রবিনসন ক্রুসোর ন্যায় ছাড়িয়া দিলে, উক্ত সভ্য ব্যক্তি তাহার নিজের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই উৎপন্ন করিতে পারে। এতদুত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে অসভ্য ব্যক্তি যখনই শীকড় খুঁড়িবার জন্য কোন প্রস্তর কিংবা লৌহ ব্যবহার করে, ঐ প্রস্তর বা লৌহ তাহার মূলধনান্তর্গত নহে কি? রবিনসন ক্রুসো পরদিন দিন ভরিয়া নৌকাগঠনে নিযুক্ত থাকিবার কল্পনা করিয়া যদি পূর্ব্বদিন কেবল শস্যসঞ্চয় বা খাদ্যের জোগাড় করিয়া রাখে তবে সে কি মূলধন সংগ্রহে বা সঞ্চয়ে তৎপর হইল না?

অনেকে "অর্থ" ও "মুদ্রা" একই অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ অর্থে ও মুদ্রায় যথেষ্ট প্রভেদ। অর্থের অর্থ আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি



মুদ্রা প্রচলিত "টাকা"। যে কোন দ্রব্য ভবিষ্যৎ অর্থোৎপাদনে সহায়তা করে তাহাই মূলধন। কোন ব্যক্তিকে তাহার মূলধন কত জিজ্ঞাসা করিলে সে নিশ্চয়ই বলিবে যে এত টাকা তাঁহার পুঁজি। শুধু এই পুঁজিকে মূলধন বলা যায় না। ইহা মুদ্রা বা টাকা। এই মুদ্রা দ্বারা অন্যান্য দ্রব্য কিনিয়া অর্থাগম করিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে কৃষকের মূলধন ধরিতে গেলে শুধু তাহার টাকার পরিমাণ ধরিলে হইবে না—তাহার গরু, ভেড়া বা বীজ অর্থাৎ ভবিষ্যৎ অর্থোৎপাদনে যাহা যাহা সাহায্য করে তাহাই মূলধন। এইজন্য সকল মূলধনই অর্থের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু সকল অর্থই মূলধন নহে।

আমরা মূলধন কি তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এইক্ষণ মূলধন সম্বন্ধে কয়েকটী প্রস্তাব বিচারের প্রয়াস পাইব। সঞ্চয় না করিলে মূলধন পাওয়া যায় না, কিন্তু অনেকে ইহাতে মনে করেন যে, যে অর্থ সঞ্চয়ের জন্য মাত্র আলাহিদা করিয়া ফেলিয়া রাখা হয় তাহাই মূলধন। এ সম্বন্ধে একটী বিষয় প্রণিধান করা কর্ত্তব্য। মূলধন আংশিক বা সম্পূর্ণ ব্যয় না হইলে ইহার কার্য্য সম্পাদন হইতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রমিকগণের বেতনের কথা ধরুন। শ্রমিকদের বেতন মূলধন হইতেও দেওয়া হয় এবং এই বেতনই তাহাদের অভাব মোচন করে। যদি কাহারও যথেষ্ট ধান্য মজুদ থাকে, তিনি উহা যখন ইচ্ছা তখনই মূলধনরূপে ব্যবহার করিতে পারেন, কিন্তু যতক্ষণ ঐ ধান্য কেবলমাত্র জমা থাকে ততক্ষণ ইহাকে মূলধন বলা যাইতে পারে না। যে মুহূর্ত্তে ইহা শ্রমজীবিগণের কার্য্যে লাগান যায় তখনই ইহাকে মূলধন বলা যায়। যন্ত্রাদির সম্বন্ধেও এ দৃষ্টান্ত প্রযুজ্য। বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলে তাঁত চালাইবার জন্য এঞ্জিন আছে। এই এঞ্জিন স্বকার্য্য সাধন করিতে করিতে প্রতি মুহূর্ত্তেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু প্রতিমুহূর্ত্তেই ইহা অর্থোৎপাদনে সহায়তা করিতেছে। যখন এঞ্জিন বন্ধ থাকে, তখন অবশ্যই ইহা অর্থোৎপাদনে সহায়তা করে না এবং সেই জন্য অর্থোৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে ইহা ক্ষয় হইতেছে। এই কারণেই বলা হয়, যে, দেশের যে মূলধন ভবিষ্যৎ অর্থোৎপাদনে ব্যবহৃত হইতেছে তাহা আংশিক বা সম্পূর্ণ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া অর্থোৎপাদনে সাহায্য করিতেছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কৃষকের গরু, ভেড়া, বীজ সকলই মূলধন অর্থাৎ ইহারা ভবিষ্যৎ অর্থোৎপাদনে সাহায্য করে। চাউল গমও মূলধন, এবং কল কব্জা যন্ত্রাদিও মূলধন। কিন্তু এই প্রকার মূলধনের মধ্যে যথেষ্ট বিভিন্নতা

আছে। এইজন্য পণ্ডিতগণ মূলধনকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া দুটী বিভিন্ন নাম প্রদান করিয়াছেন। প্রথমতঃ চাউল, গম ইত্যাদিকে circulating বা ভ্রাম্যমান মূলধন বলিয়াছেন। ইহারা একবারের বেশী দুইবার কার্য্যে লাগে না। কিন্তু যন্ত্রপাতিগুলি বহুবৎসর এমন কি ১।১ শতাব্দী পর্য্যন্ত ব্যবহার করা যাইতে পারে। সেইজন্য ইহাদিগকে fixed capital বা স্থায়ী মূলধন বলা হয়। ভ্রাম্যমান মূলধনের লাভ অব্যবহিত, কিন্তু স্থায়ী মূলধনের লাভ ধীরে ধীরে পাওয়া যায়।

যন্ত্রপাতির উৎকর্ষ যতই বৃদ্ধি হয় সাধারণতঃ মূলধনের উৎপাদিকা শক্তি ততই বাড়ে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করা গিয়াছে। তবে সাধারণ ভাবে বলা যাইতে পারে যে যদি এঞ্জিন, মেশিন ইত্যাদি না থাকিত তবে মূলধনের উৎপাদিকা শক্তি অনেক কম হইত। অল্প পরিশ্রমে এবং অল্প মূলধন ব্যয় করিয়া যন্ত্র সাহায্যে যথেষ্ট অর্থ উৎপাদিত হয়।

আমরা ভূমি, পরিশ্রম ও মূলধন সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছি তাহা সাধারণ ভাবেই করা হইয়াছে। তবে, দেশ কাল পাত্রভেদে ইহার কিছু কিছু ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের কথা ধরুন। ভারতবর্ষে ভূমি ও পরিশ্রমের অভাব একপ্রকার নাই বলিলেই হয় কিন্তু মূলধনের যথেষ্ট অভাব আছে। মূলধন থাকিয়াও নাই। বস্তুতঃ আমাদের বর্ত্তমান প্রধান অভাব হইতেছে মূলধনের, এবং কি প্রকারে অধিক মূলধন ব্যবসায়ে প্রয়োগ করা যাইতে পারে সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিরই এবিষয়ে মনোনিবেশ করা উচিত। নানা উপায়ে আমাদের এই অভাব পূরণ করা যাইতে পারে। গবর্ণমেণ্টের ১০৫ কোটী টাকার দেনা ( যাহাকে কোম্পানীর কাগজ বলে ) আছে, ঐ টাকার মধ্যে ৫৫ কোটী টাকা ভারতবাসীর দত্ত। এই ৫৫ কোটী টাকাই আমাদের ব্যবসায়ে একেবারে প্রয়োগ করা সম্ভব না হইতে পারে, যদি ইহার কিছু অংশও প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে অনেক দূর কার্য্যে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। গবর্ণমেণ্ট ৩৲ কি ৩৷৷০ টাকা সুদ দেন কিন্তু ব্যবসায়ে ইহাপেক্ষা যথেষ্ট লাভ। তৎপর, পোষ্ট আফিসের সেভিংস ব্যাঙ্কে ( Savings Bank ) প্রায় পঞ্চদশ কোটী টাকা জমা আছে এবং এই টাকার মধ্যে ১৩ কোটী টাকা ভারতবাসীদের জমা। অবশ্য এই টাকার কিয়দংশও অনায়াসে ব্যবসায়ে লিপ্ত করা যায়।

মূলধন না হইলে কোন কার্য্যেই অগ্রসর হওয়া যায় না। শিল্প বাণিজ্যের



কথা দূরে রাখিয়া গরীব কৃষকদের কথা ধরুন—একই অবস্থা—একই উত্তর—মূলধনের অভাব। কাহারও হয়ত লাঙ্গলের গরু কিনিবার সামর্থ্য নাই—জমি পতিত রহিয়াছে। কাহারও বীজের অভাবে জমি বুনান হইতেছে না। সর্ব্বত্রই এক অভাব। * ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ; কৃষির উন্নতিতেই আমাদের উন্নতি—মূলধন অভাবে কৃষির উন্নতি হইতেছে না একথা সকলেরই মনে করা উচিত। বিশেষতঃ কৃষির উন্নতিতেই বস্ত্র শিল্পের উন্নতি। প্রায় ৩০ কোটী টাকা এই বস্ত্রশিল্পে এইক্ষণ লাগান আছে, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে ইহা আরম্ভ মাত্র। *

এই মূলধনের অভাব আমরা বর্ত্তমানে বৈদেশিক মূলধন দ্বারা মোচন করিতে পারি। বাস্তবিক পক্ষে আমাদের অনেক অভাব এই প্রকারেই মোচন হইতেছে। মহামান্য গুইকোয়ার মহোদয় বলিয়াছেন "Our serfdom to foreign capital and to foreign enterprise can scarcely be more complete." সত্য, কিন্তু বর্ত্তমানক্ষেত্রে বৈদেশিক মূলধন ব্যতীত আমাদের অন্য কোন উপায় দেখিনা। আমাদের শিল্পোন্নতি, বৈদেশিক মূলধন ব্যতীত সম্ভব নহে। এবিষয়ে জাপানেও পূর্ব্বে যথেষ্ট অভাব ছিল এবং রাজনীতিজ্ঞগণের এ বিষয়ে মতভেদও ছিল। কিন্তু পরলোকগত মার্কুইস ইটো প্রমুখ ব্যক্তিগণের পরামর্শে জাপানীরা এইক্ষণ যথেষ্ট বৈদেশিক মূলধন দ্বারা নিজেদের শিল্পোন্নতি করিতেছে। জাপানে United chamber of Commerceর সভাপতি বেরণ সিবুসয়ার ও এইমত। তিনি বলেন যে "যখন জাপানী মূলধনে সকল কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া সম্ভব নয়, তখন দেশের বৈভব বৃদ্ধির জন্য বৈদেশিক মূলধন আমদানী অবশ্য কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়

---

* All alike are tied down by the want of capital which compels them to make an inadequate use of their holding." (The present position of the Agricultural Industry in the United provinces by Mr. Moreland, Director of Agriculture, u. p). And again "The supply of cheap capital stands out clearly as the central factor in the problem of agricultural improvement."

* "A hundred million pounds sterling so borrowed from the foreign capitalist on easy terms and judiciously laid out, would not only be the means of enabling us to start numerous industrial enterprises on the newer lines but also of effecting a vast ameliorative change in the economic life of the people so as to send light and hope, comfort and joy, into thousands of cheerful homes in a way of which we could have at present but a dim idea."

শিল্পসমিতির সভাপতি সার ভিটলদাস দামোদর থাকারসে বলিয়াছিলেন "আমাদের বৈদেশিক মূলধন ব্যতীত চলিবে না। "কৃত্রিম ভাবুকতা" (যাহাকে Sentimentalism বলে) করিয়া যদি আমরা বৈদেশিক মূলধনের সাহায্য গ্রহণ না করি, তাহা হইলে আমাদের দূরদৃষ্টিতারই অভাব বলিতে হইবে। আমাদের বৈদেশিক মূলধনের সাহায্য গ্রহণ করিতেই হইবে। তবে যত কম সুদে পারি তাহা দেখা উচিত।" তৃতীয় শিল্প সমিতির অধিবেশনে দেওয়ান বাহাদুর অম্বালাল সকরলালও এই উক্তির সমর্থন করিয়া বলিয়াছিলেন। তিনি কনোজবাসীদিগের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে তাঁহারা যেরূপ কানাডার উন্নতিতে যুক্তরাজ্যের মূলধনের সাহায্য গ্রহণ করেন আমরাও সেইরূপ করিব। রাও বাহাদুর যশীও বলিয়াছিলেন যে বৈদেশিক মূলধনের সাহায্য না হইলে আমাদের শিল্পোন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।

এই বৈদেশিক মূলধনে যে আমাদের যথেষ্ট ক্ষতি ও অসুবিধা না হইতেছে তাহা নয়। শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক যদুনাথ সরকার মহাশয় সত্যই লিখিয়াছেন "It would have been better for the nation if those natural resources had remained undeveloped for a generation or two and then have been worked by the newly awakened and highly trained native industrialists of the future instead of being exploited by foreigners as they now are."কিন্তু ১৯০৩ সনের ৫ই মার্চ্চ তারিখের Statesman পত্রিকার মতও (they receive a greater or smaller quota or the value of the mineral wealth extracted in other forms such as wages and royalties. বর্ত্তমান ক্ষেত্রে, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহা বুঝি তাহাতে বৈদেশিক মূলধন ব্যতীত আমাদের উপায় নাই। যদি কোন দিন আমাদের লক্ষ্মীর বরপুত্রগণ তাঁহাদের মজুদ টাকা বাহির করেন তবে আমাদের আর বৈদেশিকের নিকট মূলধনের জন্য হস্ত পাতিতে হইবে না। ভারতবর্ষে নাকি মজুদ টাকার পরিমাণ ৮২৫,০০০,০০০,০ টাকা। এই টাকা বাহির হইলে আমাদের আর কোন অভাব থাকিবে না।

ভারতবর্ষে সবই আছে! অর্থের অভাব নাই, প্রকৃতিদত্ত দ্রব্যের অভাব নাই। অধিবাসীরা মিতব্যয়ী, পরিশ্রমী। ভূমি উর্ব্বরা, শ্রমজীবিরও অভাব



নাই। সবই আছে আবার কিছুই নাই। * অজ্ঞতা তিমিরে ডুবিয়া অর্থের অভাব দেখিতেছি।

যাহা হইবার হইয়াছে। গতশোচনায় ফল নাই। আমাদের এইক্ষণ কার্য্য করিতে হইবে ফল ভগবানের হাতে।

কর্ম্মণ্যে বাধিকরস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্ম ফল হেতুর্ভূর্মো তে সংগোঽস্তু কর্ম্মণি॥

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

---

## ভুল।

হায় শুধুই দেখিতে আসি মুখখানি তার
তাও কতছলে লুকাইতে চায়,
যেন মায়াবীর মত মুখ দেখে একবার
তার প্রাণখানি হরে নিব, হায়!
সেকি বুঝেনা, বুঝেনা, হায়, মন যে কেমন,
মনে দীন ধনী সমান সবাই;
সেযে দেখিতে চায় না মোরে দেখে না কখন,
তবু তারেই দেখিতে আমি ধাই!

হায় শুধুই দেখিতে আসি হাসিটুকু তার,
তাও কত ছলে লুকাইতে চায়,
পাছে তার হাসি দেখে আমি হাসি একবার,
যেন কত দোষ, কত পাপ তায়!
সেকি জানেনা জানেনা রীতি হাসির দেশের,
হায় কতটুকু হাসির পরাণ!
মধু অধরেও হাসির যে খেলা নিমেষের
শেষে শোচন স্মরণ দিনমান।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ঘোষ।

---

* "India the land of the Pagoda tree! India the mine of wealth! India, the wonder and admiration of Marco Polo and of travellers of former times! India in Poverty!! Midas starving amid heaps of Gold does not afford a greater paradox; Yet here we have India. Midaslike, starving in the midst of untold wealth," Slr Guildford Mollesworth.

# কালকা-পথে।

বাঙ্গালী ভদ্রলোকটির নাম আমি ভুলিয়া গিয়াছি, তিনি জাতিতে কায়স্থ। শুনিলাম, তাঁহার বাড়ী হুগলী জেলার মধ্যে তারকেশ্বরের নিকট হরিপাল গ্রামে। বেচারী ম্যালেরিয়ার ভয়ে দেশত্যাগী। আজ দুই বৎসর যাবত তিনি দেশে যান নাই। তাঁহার বর্ত্তমান আকৃতি দেখিলে মোটেই মনে হয় না যে তিনি কোনো দিন দুরন্ত ম্যালেরিয়ার কবলে পতিত হইয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, এই দুই বৎসরে তাঁহার নূতন স্বাস্থ্য লাভ হইয়াছে; এক দিনের জন্যও কোনো রূপ অসুখ নাই, তবে স্বদেশবাসীর সহবাস হইতে বঞ্চিত আছেন বলিয়াই তাঁহার দুঃখ।

বহুদিন পরে বাঙ্গালীর সঙ্গলাভ তাহার নিকট বেশ একটা অভিনবত্ব আনিয়া দিল। আমরাও অসহায় অবস্থায় তাঁহাকে দেবতার আশীর্ব্বাদের মত পাইয়া যে কি পর্য্যন্ত উল্লসিত হইয়াছিলাম তাহার স্বরূপ বর্ণনা দুরাকাঙ্ক্ষা।

দেশ যতই কুৎসিত হৌক, যতই অশান্তিকর হৌক, যতই অমঙ্গলকর হৌক তবুও কেমন একটা "টান" অজ্ঞাতসারে মনের মধ্যে অবস্থান করে, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ এই প্রবাসী ভদ্রলোকের প্রতি কথায়, প্রতি প্রশ্নের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল। আমাদের নিবাস কোথায়, কোথায় আসিয়াছি, কয়দিন থাকিব, এখানে কেমন করিয়া আসিলাম, এ বৎসর ও দিকে ম্যালেরিয়া কিরূপ, আমাদের গ্রামের কোনো খপর রাখেন কি, প্রভৃতি উপর্য্যুপরি প্রশ্নমালায় তিনি আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। আমরাও যতদূর সম্ভব কথার উত্তর দিয়া ভদ্রলোককে সুখী করিতে প্রয়াস পাইলাম।

অল্পক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, "অপরাধ মাপ্ করবেন, আপনাদের পেয়ে এত আনন্দ হয়েছে, যে তা আর মুখে বলতে পারি না আপনাদের আহারাদি ব্যবস্থা করবার কথা পর্য্যন্ত ভুলে গেছি" বলিয়া তিনি ছুটিয়া গৃহের বাহিরে গেলেন, তারপর তখনি কি ভাবিয়া পুনরাগমন করিলেন। আজ যেন তাঁহার বহুদিন স্তব্ধ কথার স্রোত ছুটিয়াছে, অনর্গল কথা কহাই আজ যেন তাঁর তৃপ্তি!

তিনি বলিলেন, "দেখুন—এখানে কিছুই পাওয়া যায় না। কোনো প্রকারে একবেলা একমুঠা আলোচালের ভাত আর একবেলা খানকয়েক



রুটী আহার করে দিন কাটাচ্ছি—আপনাদের যে কি খেতে দিব তাই ভেবে অস্থির—মশাই দুঃখের কথা কি বলব, এক পয়সার চিনির প্রয়োজন হোলে কালকায় লোক পাঠানো ভিন্ন অন্য উপায় নাই।"

আমি বলিলাম "আপনি আমাদের জন্য ব্যস্ত হবেন না, আমাদের আহারাদির প্রয়োজন নাই। এখন কেমন করে কালকায় ফিরে যেতে পারি তার একটা উপায় করুন। আমাদের আজই কালকায় ফেরা বিশেষ আবশ্যক।"

তিনি বলিলেন "এখানে ত গাড়ী ধরে না।"

"তবে উপায়?" আমার বন্ধু ত মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

আমার মনে দারুণ আশঙ্কা হইল। যে পথে আসিয়াছি যদি সেই পথে পুনরায় ফিরিতে হয় তবেত ফেরার পক্ষে বিশেষ সন্দেহ। একবার ব্যাকুল দৃষ্টিতে চারি দিকে চাহিয়া লইলাম। সেই নীল মেঘরাজির মত গিরিশ্রেণী। যেন মেঘ আর গিরি ছাড়া এ বিশ্বসংসারে কিছুই নাই!

তিনি আমাদের বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া বলিলেন "ভাবনা নাই। বেলা পাঁচটার সময় এক খানা গাড়ি কালকাভিমুখে যায়, যাতে সেটা এখানে থামে, তার জন্য এখনি তার করছি।"

তারপর তিনি দুই মিনিটকাল টেবিলে বসিয়া টক্ টক্ শব্দ করিতে সুরু করিলেন। আমরা শঙ্কিত অন্তরে বিচারপ্রার্থী আসামীর ন্যায় নিশ্চল ভাবে উৎকর্ণ হইয়া তাঁহার প্রতি তাকাইয়া রহিলাম। যদিও সাঙ্কেতিক শব্দের মর্ম্ম আমরা বিন্দু বিসর্গ উপলব্ধি করিতে অসমর্থ, তথাপি মনে হইতেছিল এইবার যে ঘন ঘন দুইটি টক্ টক্ শব্দ হইল, উহার অর্থ "থামিবে! থামিবে!! কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই মনে হইতেছিল—"এখানে কখনো গাড়ি দাঁড়ায় না, আজ বা কেন আমাদের মত অজ্ঞাত সামান্য দুই জন বাঙ্গালীর জন্য থামিবে?

ঠিক এই সময় ভদ্রলোক চেয়ার খানি সজোরে পশ্চাতে ঠেলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন ও বলিলেন "গাড়ি থামিবে, কোনো চিন্তা নাই।" ইহাতে আমাদের অপেক্ষা তাঁহার যেন অধিক আনন্দ হইল। তিনি আবার বলিলেন "বড় কষ্ট হচ্ছে যে আপনাদের পাইয়া কোনোরূপ সমাদর বা অভ্যর্থনা করা দূরে থাক, ক্ষুধা নিবৃত্তির মত এমন কিছুই নাই যাহা দিতে পারি।" আমরা তাঁহার কথায় বাধা দিয়া ওজর করিলাম "সে জন্য কিছু মনে করবেন না। আপনার আগ্রহের মধ্যে যে অভ্যর্থনা ও যত্ন রয়েছে তাঁহার তুলনায় খাওয়া বড়

বেশী বলে মনে হয় না।" তবু ভাবিয়া তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। আমরা আহারাদির প্রতি অমনোযোগিতা প্রকাশ করিয়া গাড়ি কখন আসিবে, এই সকল প্রশ্ন করিতেছিলাম। তিনি বলিলেন সে জন্য কোনো ভাবনা নাই। দুর্ভাবনার হস্ত হইতে নিস্তার পাইলে, স্নান করিবার বাসনা জাগিয়া উঠিল। যতক্ষণ কেমন করিয়া কালকা ফিরিব এই চিন্তা মনে ছিল, ততক্ষণ স্নানাহার কিছুই মনে স্থান পায় নাই। স্নানের কথা শুনিয়া ভদ্রলোক বলিলেন "জল আনাইয়া দিতেছি, এখানেই স্নান করুন, ঝরণার কাছে এখন আর গিয়ে কাজ নাই,—"

"ঝরণা এখান হ'তে কতদূর।"

"বেশী দূর নয়; নিকটেই—ঐ নিম্নের পাহাড়ে। জল অতি সুন্দর ও মিষ্ট। এরূপ জল শুনিয়াছি এ অঞ্চলে কোথাও নাই।"

Point man পোটার প্রভৃতি দুই তিন জন লোককে লইয়া নিজে আমাকে স্নান করাইতে লইয়া চলিলেন। জল অত্যন্ত স্নিগ্ধ ও স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। তারপর তিনি বাসা হইতে খানিকটা চিনি আনাইয়া সরবত প্রস্তুত করিয়া দিলেন। উহা সেবন করিয়া বিশেষ তৃপ্তি অনুভব করিলাম।

স্নানান্তে যখন আমরা ষ্টেশনের বারাণ্ডায় একখানি খাটিয়ার উপর বসিয়া গল্প করিতেছি, তখন মাঝে মাঝে সচকিত দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিক দেখিতে ছিলাম পাছে সেই ভয়ানক জন্তুটি কখন কোনো দিক দিয়া আসিয়া টপ করিয়া আমাকে তুলিয়া লইয়া যায়।

এমন সময় দেখি সম্মুখস্থ পাহাড় হইতে সেই পাঞ্জাবী ভদ্রলোক কতগুলি জ্বালানি কাঠ মাথায় করিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছে। তাঁহার হস্তে একখানি কুড়ুল। আমাদের সন্নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র তিনি মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন খুব কাছাকাছি আসিয়া বলিলেন,

"আপনারা নিশ্চয় আমাকে অসভ্য জঙ্গলী বিবেচনা করছেন। আপনাদের দেশে কোনো ভদ্রলোক এরূপ ভাবে বোঝা মাথায় করিয়া কখন আনেন না, বা পারেন না।"

আমরা বলিলাম "না না ও কথা বলবেন না, নিজের কাজ নিজে করি বলেই ত আমাদের এত অবনতি, এত অধঃপতন হ'য়েছে।"

এই পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটীর মুখে হাসি লাগিয়াই আছে। তিনি উত্তর করিলেন,



"দেখুন এখানে দোকান-পসার নেই, লোকজন নেই, নিজে কাঠ সংগ্রহ না করলে কে করে দিবে বলুন? Point man পোটার বাঘের ভয়ে কেহ উঁচু পাহাড়ে গিয়া কাঠ কাটিতে সাহস করে না। আমি তাহাদের বলিতে ইচ্ছা করি না।

তিনি কাঠের বোঝাটি মাথায় করিয়া হাসিতে হাসিতে আমাদের সহিত কথা কহিতেছিলেন, যেন তাঁহার কোনো রূপ কষ্ট বা ভার বোধ হয় নাই। তাঁহার সেই সরল সহজ শান্ত দৃষ্টিতে বিপুল মনের বল প্রকাশ পাইতেছিল, তাঁহার কথাবার্ত্তায়, হাসিতে চাহনিতে বেশ কেমন একটা মনুষ্যত্বের নিরহঙ্কার ভাব আমাদের সঙ্কীর্ণ সভ্যতাভিমানী মনের উপর তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিতেছিল।

আমরা বেশ গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলাম "ইহাতে লজ্জার কথা কিছুই নাই। বরং গৌরব করিবার কথা—বাঘের মুখ হইতে কাঠ কাটিয়া আনেন।"

তিনি বলিলেন, "এখনি আপনাদের নিকট আসছি, কাঠগুলি দিয়া আসি, নইলে হয় ত রন্ধন বন্ধ যাবে, কিছু মনে করবেন না।"

দুই তিন মিনিটের মধ্যেই তিনি হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া আসিলেন। এই সময় আমি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কতগুলি গিরিস্তরের পর একটী গগন-স্পর্শী গিরিশিরস্থ শুভ্রস্তূপ দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম উহা কি?

তিনি বেশ ভক্তিপরিপূর্ণ স্বরে কহিলেন,—"দেবীর মন্দির"

এই নিরালয় নির্জ্জন পর্ব্বতারণ্যে মধ্যে কে দেবীর প্রতিষ্ঠা করিল! কে ঐ মানব আবাস পরিশূন্য ব্যাঘ্র-ভল্লুক-ভয়-সঙ্কুল স্থানে পূজার্থে দেবীর মন্দির নির্ম্মাণ করাইল! কত কথাই মনে আসিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে বেশ একটী ভক্তির অনাবিল স্রোত হৃদয়ের পরতে পরতে প্রবাহিত হইল।

আমরা তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম "বলুন আমাদের দেবী দর্শন করাইয়া আনিবেন।"

তিনি বলিলেন "কিছু দিন তবে এখানে থাকুন, এক দিনে ত যাওয়া যাবে না। যদি দুই একটী সাধু সন্ন্যাসীর দর্শন লাভ হয় তবে যাওয়া যায়, আমি ত পথ চিনি না।"

"ওখানে কারা থাকে?"

"তাহারা পার্ব্বত্য জাতি, নীচে বড় আসে না, তাহাদের অভাব ওখানেই পূরণ হয় নীচের কোনো সংবাদ বোধ হয় তারা জানে না।"

ষ্টেশন মাষ্টার বলিলেন, "বলেন কি, ও যে শুনেছি, দুই দিনের পথ, তার পর বাঘ ভালুকের হাত থেকে নিস্তার পেলে ত—"দেবী দর্শন আমার মাথায় থাকুন, আমি এখান হ'তেই আজ দুই বৎসর তাঁকে প্রণাম করে আসছি; ধন্য আপনাদের সাহস। পাঞ্জাবী হাসিয়া বলিলেন "সত্যই ঐ খানে পৌঁছিতে দুই দিন লাগে, এখান হ'তে অনেক দূর, তারপর পাহাড়ের পথ চিনিয়া যাওয়া বড় কঠিন ব্যাপার।"

আমি বলিলাম "যাঁহারা পর্ব্বতে বাস করেন, তাঁহাদের নিকট আর শক্ত কি?"

"না মহাশয় ও কথা বলবেন না। আমার জন্ম এই পাহাড়ে, আমার চাকরীও এই পাহাড়ে, তথাপি আজ জোর করে বলতে পারি না যে যতটুকু স্থান আমার জানা আছে, তাহার পথগুলি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পেরেছি। দেখুন না কেন, আজ খানিক পূর্ব্বে, এই সাম্‌নের পাহাড়ে এক বোঝা কাঠ কেটে রেখে এসেছিলাম কিন্তু আনতে গিয়ে আর খুঁজে পাইনি। এখানে অন্য কেহ নাই, যে মনে করবেন, কাঠগুলি আর কেও চুরি করে নিয়ে গেছে। এই পথটি ভালো করে জানা আছে এ গর্ব্ব করবার কারো সামর্থ্য নাই।"

এই স্থান হইতে আমরা দেবী উদ্দেশে প্রণাম করিলাম। তারপর জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কুড়ুল নিয়ে আবার কোথায় যাচ্ছেন!" তিনি বলিলেন "আরো কতগুলি কাঠ কেঠে রেখে আসতে। আপনারা কি আমার সঙ্গে উপরের পাহাড়ে উঠিবেন। চলুন না বেশ সুন্দর একটী ঝরণা আছে দেখবেন, নানা ফলের ও ফুলের গাছ আছে, কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অসংখ্য পথ।"

তখন দুই বন্ধুতে পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করিলাম। তারপর ষ্টেশনমাষ্টারের প্রতি সোৎসুক দৃষ্টিতে তাকাইলাম, তিনি বলিলেন, "গাড়ি আসতে অনেক বিলম্ব আছে। দেখেই আসুন না কেন।"

আমাদের অগ্রে অগ্রে পাঞ্জাবী কুড়ুল হস্তে, দুরন্ত বালকের মত সেই উঁচু নীচু পথ অবলম্বনে বেশ সহজে ছুটিয়া উঠিতে সুরু করিলেন। আমরা তাঁহার অনুসরণ করিতে কেবলই পিছাইয়া পড়িতেছি দেখিয়া, তিনি মাঝে মাঝে দাঁড়ান আর জিজ্ঞাসা করেন "বড় কষ্ট হচ্ছে কি? ধীরে ধীরে উঠিলে



শীঘ্রই ক্লান্ত হয়ে পড়বেন, আমার মত ছুটিয়া ছুটিয়া উঠুন বেশ আমোদ পাবেন, কোনো কষ্ট হবে না।"

আমরা তাহাই করিতে লাগিলাম; তবে আশঙ্কা যথেষ্ট হইতেছিল, পাছে পড়িয়া যাই।

চারিদিকে কেবল পথ, আর জঙ্গল। যতই উপরে উঠিতেছি, ততই মনে হইতেছে আমরা যে পর্ব্বতে ছিলাম, সেইখানেই আছি। পাহাড়গুলি যেন যমজ ভ্রাতা। একটীকে দেখিয়া অপরটিকে ভ্রম হয়। পাহাড়ের উপর নানা জাতীয় বৃক্ষ লতা, কোথায় বৃক্ষে পরিপূর্ণ ফুল হইয়াছে, কোথায় টেপারির একজাতীয় ফল মুক্তার মত রৌদ্র কিরণে ঝিকি মিকি করিতেছে—কোথায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে নাসপাতি ফলিয়া রহিয়াছে, কোথায় বা ঝরণার তুষারশীতল স্ফটীকস্বচ্ছ বারিরাশি ঝর ঝর করিয়া চলিয়াছে, কোনো কোনো স্থানে বিবিধ জাতীয় পার্ব্বত্য কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া আছে, থাকিয়া থাকিয়া নানা রকম বিহগ কুজন শ্রুতিগোচর হইতেছে—আমরা মুগ্ধ হৃদয়ে এই সৌন্দর্য্য বন্যায় ভাসিয়া চলিয়াছি আনন্দে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়াছে, তখন পাঞ্জাবী আমাদের প্রতি ভক্তি-উজ্জ্বল-নয়নে তাকাইয়া বলিলেন "বলুন ত মহাশয় এ সব কাহাদের জন্য রহিয়াছে? এত ফুল অরণ্যে ফুটিয়া অরণ্যেই ঝরিয়া যাইতেছে—এত ফল অকারণ শুকাইয়া নষ্ট হইতেছে ইহার কি কোন সার্থকতা নাই? অবশ্য আছে—বিশ্বনিয়ন্তার প্রেমের রাজ্যে অপ্রনয়ের কিছুই নাই। দেখুন না কেন, পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে তরুলতা, কিন্তু এই সকল সঙ্কীর্ণ পথগুলির উপর এক গাছি কণ্টক দৃষ্ট হয় না। কেহ যেন প্রতিদিন পথগুলির তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে। যেখানে মনুষ্য সমাগম নাই সেখানকার রাস্তা কাহাদের জন্য পরিষ্কার রহিয়াছে। কাহারা এই ভয়সঙ্কুল পথে হাঁটিয়া থাকেন। বলিতে বলিতে তাঁহার স্বর ভক্তি গদ্‌গদ্ হইয়া পড়িল। নয়ন অশ্রুসিক্ত হইল। তিনি নতজানু হইয়া সেই পথের উপর প্রণাম করিলেন। তার পর বলিলেন "আমার মনে হয় এই পথ দিয়া সাধু সন্ন্যাসী গমনাগমন করিয়া থাকেন। পাছে তাঁহাদের চরণে কণ্টক বিদ্ধ হয়, পাছে তাহাদের চলিতে কষ্ট হয়, তাই দয়াল ঠাকুর এই নির্জ্জন পর্ব্বতের পথগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রখিয়াছেন তাই তাঁহাদের ক্ষুধা নিবৃত্তির নিমিত্ত সুমিষ্ট ফল স্তরে স্তরে সাজাইয়া রাখিয়াছেন।"

ভদ্রলোকের কথা শুনিয়া আমরা নির্ব্বাক। ভক্তের চক্ষে সকলি সুন্দর! সকলি অপার্থিব! তাঁহার সেই ভক্তিউজ্জ্বল নয়ন, আনন্দদীপ্ত আনন, সুমিষ্ট বচন, আজও আমরা ভুলিতে পারি নাই।

পাহাড়ের নানাস্থান দেখাইয়া শেষে গাড়ির শব্দ শুনিলে আমাদের লইয়া তিনি নামিয়া আসিলেন। গাড়ি আমাদের জন্য গোমণে ধরিল। বেলা ৬৷৷০ টার সময় তাঁহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া কালকায় ফিরিলাম।

যখন গোমণ হইতে গাড়ি ছাড়ে তখন বাঙ্গালী ভদ্রলোকটির মুখ বিষণ্ণ হইয়া গেল। তিনি পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন "পত্র লিখিবেন"। আমরা যেন তাঁর কতই পরিচিত, কতই আপনার জন। সেই ভক্ত পাঞ্জাবীর কথা গুলি আজও যেন কাণের কাছে ধ্বনিত হইতে থাকে "ভগবানের রাজ্য দেখিয়া গেলেন, বন্ধু বান্ধবদিগের নিকট তাঁহার অপরিসীম দয়ার কথা বলিতে বিস্মৃত হইবেন না"। আজ যতদূর সাধ্য তাহারই বর্ণনা করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

---

# অলঙ্কার নির্ম্মাণে অপব্যয় ও অপচয়।

কখনও দায়ে পড়িয়া কখনও বা শুধু অভ্যাসের দোষে আমরা অলঙ্কার নির্ম্মাণে প্রশ্রয় দিয়া থাকি। তখন যে আমরা কতটা অপব্যয় করিতেছি তাহা বড় একটা মনে আসে না। কিন্তু অবস্থা বিপর্য্যয়ে যদি কখনও সেই অলঙ্কার বিক্রয় করিতে বাধ্য হই, তখন বুঝি স্বর্ণকারের সঙ্গে আধা বখরা করা হইয়াছে।

কাঠ হইতে টেবিল বা বস্ত্র হইতে পোষাক প্রস্তুত করিয়া তাহাদের মূল্য নিরূপণ করিতে হইলে কাঁচা মাল ( raw material ) এবং শিল্পির পারিশ্রমিক উভয়ের সমবায় করিতে হয়। কিন্তু অলঙ্কারের বেলায় যদি ইহাতেই হইত তবে আক্ষেপের বিষয় কিছু থাকিত না। যাঁহারা ভুক্তভোগী তাঁহারা জানেন যে পরিমাণ স্বর্ণ স্বর্ণকারকে দেওয়া হয় সে তাহাতে ইচ্ছামত 'পান' সংযোগ করিয়া থাকে; এবং গহনা লইবার সময় আমরা অই 'পান' যুক্ত অলঙ্কারের ওজনে আমাদের প্রদত্ত খাঁটী সোণার ওজন ধরিয়া লইতে বাধ্য হই। টেবিল বা পোষাক নির্ম্মাণে যে অংশ ছাঁট বা বাদ পড়ে তাহা আর কোন ব্যবহারে



আসে না বলিয়া উহার কোন মূল্য নাই। কিন্তু স্বর্ণের বেলায় ছাঁট অংশ গালাইয়া লইলেই আবার উহা কার্য্যোপযোগী হইল। সুতরাং আমরা যে পরিমাণ স্বর্ণ দিই ততটুকু গহনারূপে ফিরিয়া পাইতে ন্যায়ের দাবী করিতে পারি। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার কম পাই।

কেন? গৃহস্থ স্বর্ণকারকে যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়া আবার কেন এ দণ্ডভোগ করেন? স্বর্ণকার বলিতে পারে অলঙ্কার নির্ম্মাণ সময়ে কতকটা স্বর্ণের অপচয় অনিবার্য্য। সে যখন ব্যবসায় খুলিয়াছে তখন সে এটা কিছু নিজের ঘর হইতে পূরণ করিয়া দিবে না। হয় কিছু সোণা ওজনে কম লইতে হইবে নচেৎ বেশী 'বাণি' বা পারিশ্রমিক দিতে হইবে। কথাটা ঠিক, কিন্তু অনিবার্য্য অপচয়ের পরিমাণ কত? এমন দিন ছিল যখন স্বর্ণকারের প্রত্যেক কথা বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া লওয়া হইত; কারণ তাহার শিল্প কৌশল সাধারণের বোধ্যগম্য ছিল না। এখন আর সেদিন নাই। এখন দেখা যায় স্বর্ণকার তাহার অবলম্বিত প্রণালীর দোষে খানিকটা সোণার অপচয় করিয়া থাকে। তাহার জন্য কি গৃহস্থ দায়ী?

এইখানেই যদি গৃহস্থ নিস্কৃতি পাইতেন তবে তাঁহাকে প্রত্যেক ভরি সোণাতে ৪।৫ চারি পাঁচ টাকা মাত্র দণ্ড দিতে হইত। কিন্তু স্বর্ণকার সব সময়ে সাধু হয় না। সে দেখে সে যাহা দিবে তাহাই খাঁটী সোণা বলিয়া ধরা হইবে; তখন সে গহণা হইতে খানিকটা সোণা সরাইয়া তাহার পরিবর্ত্তে খাদ মিশাল দিয়া থাকে। গহণা নির্ম্মাণকালে উহাতে কতকটা খাদ মিশান অবশ্যম্ভাবী; স্বর্ণকার যে পরিমাণ সোণার অপচয়কে অনিবার্য্য বলিয়া থাকে সচরাচর এই মিশ্রিত খাদের পরিমাণ তাহা পূরণ করিয়া দিতে পারে। স্বর্ণকার যদি সাধু হয় তবে সে এইটুকু মাত্র 'পান' দিয়া সন্তুষ্ট থাকিবে। ইহাতে তাহার গহনার পোড় দেওয়াও হইবে এবং নষ্ট সোণার জন্য তাহাকে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইবে না। ইহা হইলে গৃহস্থের বড় একটা অভিযোগের বিষয় থাকে না; কারণ নিরক্ষর স্বর্ণকার যেরূপ শিখিয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিতেছে মাত্র। আমরা যদি তাহাকে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী অবলম্বন করিতে শিক্ষা না দিই তবে আমরা তাহার কৃত অপচয় বহন করিতে বাধ্য। কিন্তু সে যদি অসদভিপ্রায়ে 'পান' বেশী দেয় তবেই গৃহস্থের সর্ব্বনাশ!

দেখা যাইতেছে গণনার পানের পরিমাণ স্বর্ণকারের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, এবং সাধারণ লোকে ইহার পরিমাণ কত তাহা অনুমান করিতে পারে

না। এইজন্য গহনা বিক্রয় করিতে হইলে কদাচিত উহার গঠন অটুট রাখা হয়। সাধারণতঃ উহা গালাইয়া যে সোণা পাওয়া যায় তাহার বিশুদ্ধতা ( fineness ) এক পরিমাণ নিরূপিত হয়। অর্থাৎ কত টাকায় ভরি এবং ওজনে কয় ভরি ইহাই দেখা হয়। ইহা হইতে সোণার মূল্য পাওয়া যায়। কিন্তু যদি সোণার খাদ থাকে তবে খাঁদের অংশ বাদ দেওয়া হয় এবং ইহাকে খাটী করিবার যে খরচ তাহা স্বর্ণের মূল্য হইতে বাদ পড়ে। অর্থাৎ বিক্রেতাকে মরা সোণা পাকা করিবার খরচ বহন করিতে হয়।

এখন দেখা যাউক গহনা গড়াইয়া আমরা কিরূপ বুদ্ধি প্রকাশ করি। আমার একভরি সোনা আছে। অমি উহা স্বর্ণকারকে একটী অলঙ্কার গড়িতে দিলাম। সে যদি সাধু হয় তবে তিন আনা আন্দাজ সোণা অপচয় করিল এবং প্রায় ঐ পরিমাণ 'পান' দিয়া তাহা পূরণ করিল। তাহার উপর আবার তাহার পারিশ্রমিক বা 'বানি' আদায় করিল। সুতরাং ৩ আনা সোণার মূল্য ও পারিশ্রমিক দিয়া মোটের উপর আমার ৫৬ টাকা খরচ হইল। এই খরচ করিয়া আমি ২২৲ টাকা দামের ১ ভরি সোণার পরিবর্ত্তে ১৮৲ টাকা দরের সোণার একটী অলঙ্কার পাইলাম। ইহাকে যদি আবার পূর্ব্ব অবস্থায় আনিতে হয় তবে আরও ॥০ আনা আন্দাজ পাকা করিতে খরচ হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে ১ ভরি সোণাকে গহনা করিয়া আবার গালাইয়া সেই দরের সোণা করিতে হইলে ৬৲ ৬॥ টাকা আন্দাজ খরচ হয়। আমার নিকট যে সোণা ছিল তাহাকে যদি আমার মূলধন বলিয়া ধরি তবে আমি তাহা হইতে গহনা গড়াইয়া তাহার এক চতুর্থাংশের উপর নষ্ট করিলাম। অর্থের উদ্দেশ্য আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আহরণ করা। অঙ্গ সৌষ্ঠবের জন্য অলঙ্কারের প্রয়োজন আছে তাহা স্বীকার করিলেও অনেক স্থলে গহণা গড়ান একটা রোগের মধ্যে দাড়াইয়াছে। রোগটা কিরূপ মারাত্মক তাহা সহজেই অনুমেয়।

কিরূপে স্বর্ণকারের হাতে সোনার অপচয় হয় তাহা জানিতে হয়ত কাহারও কৌতুহল হইতে পারে, তজ্জন্য সংক্ষেপে আমাদের দেশীয় স্বর্ণকার গণের অবলম্বিত প্রণালী নিম্নে বিবৃত হইল।*

১। সোনা পিটিয়া পাত এবং নক্সা ইত্যাদি প্রস্তুত করিবার সময় হাতুড়ীর আঘাতে, কখনও বা উখার ঘর্ষণে ছোট ছোট সোনার টুকরা পাত হইতে

* History of Hindu Chemistry, voll, pt 198-243.



বিচ্যুত হইয়া পড়ে। সাবধানে না থাকিলে এ গুলি মেঝের ধুলার সঙ্গে মিশিয়া যায়। এজন্য স্বর্ণকারগণ মাঝে মাঝে তাহাদের কর্ম্ম শালের মেঝের ধুলা ঝাট দিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু এ সাবধানতা সত্ত্বেও কিছু পরিমানে সোণা নষ্ট হইয়া থাকে। কারণ যে প্রণালীতে এই ধুলি রাশি হইতে সোণার উদ্ধার সাধন হইয়া থাকে তাহাতে পরিশ্রম খুবই বেশী হইয়া থাকে, কিন্তু সমস্ত সোণা পাওয়া যায় কি না তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ। অপেক্ষাকৃত উন্নত প্রণালী অবলম্বন করিলে পরিশ্রমও অল্প হইত এবং সোণার ও অপচয় নিবারিত হইতে পারিত। তাহা হইলে গৃহস্থেরও ক্ষতির পরিমাণ কম হইত।

২। স্বর্ণকার গহনা নির্ম্মান সময়ে 'পান' ব্যবহার করে ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু কেন করে তাহা বলা হয় নাই। যখন স্বর্ণের পৃথক দুইটী খণ্ডকে অথবা যখন একটীরই দুই মুখে জোড় দিতে হয় তখন 'পান' ব্যবহার করা হয়। 'পান' সোণা অপেক্ষা অল্প উত্তাপে গলে; সুতরাং ইহা দ্বারা সোণাকে না গলাইয়া জোড় দেওয়া যায়। এই রূপে কাঁসারীরা পিতলের ঘড়া গাড়ু সারিবার সময় 'রাং ঝাল' [ রাং tin এবং সীসার মিশ্রনে উৎপন্ন ] ব্যবহার করে, সোণা জোড়া দিবার জন্য যে 'পান' ব্যবহার করা হয় তাহা সোণা এবং রূপার মিশ্রন ( alloy ) মাত্র।

পানে রূপা বর্ত্তমান থাকায় ইহার রং বিশুদ্ধ সোণার মতন হয় না। কিন্তু সৌন্দর্য্য হিসাবে গহনার রং সকল স্থানে সমান হওয়া উচিত। ইহা করিবার জন্য স্বর্ণকারগণ গহনা হইতেই স্বর্ণ লইয়া পানের গায়ে লাগাইয়া থাকে। তাহারা যে প্রণালী অবলম্বন করে তাহা নিম্নে লিখিত হইল :—

একটী পাত্রে আন্দাজ ৩ ভাগ সোরা, ১ ভাগ নুন ও ১ ভাগ ফট্‌কিরি অল্প পরিমাণে জলে গোলা হয়, জলের পরিমাণ এরূপ লওয়া হয় যেন ইহাদের অর্দ্ধাংশ অদ্রাবিত থাকে। পরে পাত্রটীকে আগুনের জ্বালে চাপান হয়; কিছুক্ষণ পরে যখন পাত্র হইতে দুঃসহগন্ধ বাষ্প নির্গত হয় তখন ইহার মধ্যে অলঙ্কার ফেলিয়া দেওয়া হয়। স্বর্ণকার মধ্যে মধ্যে অলঙ্কার গুলি দ্রব্য হইতে তুলিয়া দেখে পানের গায়ে 'ছোপ' ( প্রলেপ ) লাগিয়াছে কিনা। যখন তাহার মনে হয় অলঙ্কারের সকল স্থানের বর্ণ একরূপ হইয়াছে তখন পাত্রটী আগুন হইতে নামাইয়া লয় এবং অলঙ্কার গুলি ধুইয়া ফেলে।

এই দ্রবকে সাধারণ ভাষায় 'যমক' বলে। সোণা সহজে দ্রবীভূত হয় না।

কিন্তু এই যমকে একোয়া রিজিয়া ( aqua regia ) বর্ত্তমান থাকে। ফট্‌-কিরি হইতে সাল্‌ফিউরিক্ এসিড ( Sulphuric acid ) সোরা সংযোগে নাইট্রিক্ এসিড এবং নূন সংযোগে হাড্রোক্লোরিক্ এসিড, উৎপন্ন করে। এই দুইটী এসিডের মিশ্রকেই একোয়া রিজিয়া বলে। ইহার সোণাকে দ্রাবিত করিবার ক্ষমতা আছে, সোনা দ্রাবিত হইলে উহার কিয়দংশ পানের রূপার দ্বারা উহার গায়ে প্রলিপ্ত হয়। এই রূপে পানের গায়েও এক 'ছোপ' ( প্রলেপ ) সোণা পড়াতে সমগ্র গহনার রং দেখিতে এক রূপ হয়। কিন্তু দ্রাবিত সোণার অধিকাংশ দ্রবমধ্যে থাকিয়া যায়।

এই রং করিবার পূর্ব্বে এবং পরে গহনা ওজন করিয়া দেখিলে দেখা যায় প্রায় ভরি প্রতি ১ আনা হইতে ৩আনার সোণা যমকের জলের মধ্যে থাকিয়া যায়। এই সোণার মূল্য ১৷৷০ টাকা হইতে ৪ টাকার মধ্যে।

এক শ্রেণীর লোক যমক হইতে সোণা বাহির করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কিন্তু তাহাদের অবলম্বিত প্রণালী এতই আদিম যে উহাদ্বারা সমগ্র সোণার উদ্ধার হয় না। কতকটা সোণা এই রূপে ইহাদেরও হাত হইতে একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।

পানের গায়ে এক ছোপ সোণা লাগান আধুনিক প্রণালীতে অতি সহজেই সম্পাদিত হইতে পারে। কিন্তু ইহার জন্য গৃহস্থের ভরি প্রতি গড়ে ২ আনা সোণার অপচয় ঘটিয়া থাকে।

৩। গহনার গায়ের সকল স্থানে এক রূপ রং হইলে ইহাতে একপ্রকার লাল রং করিয়া দেওয়া হয়। এই প্রকার রং করার এত প্রচলন যে ইহা না থাকিলে গহনাকে পুরাতন বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

এই রং করিবার কালে যদিও ঠিক সোণার কোন অপচয় ঘটেনা তথাপি সাবধান না থাকিলে অলঙ্কারের রং কাল হইয়া যায়। তখন আবার স্বর্ণ-কারকে উহা পরিষ্কার করিয়া পুনরায় রং করিতে হয়। এরূপ ঘটিলে কিছু অপচয়ের সম্ভাবনা থাকে।

রং করিবার প্রণালী অতি সহজ।* খানিকটা তেতুলের মাড়ী বা শাঁস একটী মাটীর পাত্রে রাখিয়া আগুণে ফুটান হয়। ইহাতে গহনা রাখিয়া

History of Hindu Chemistry তে মিঃ জ্ঞান শরণ চক্রবর্ত্তী যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি তেতুল, সোরা এবং নূনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আমি দেখিয়াছি শেষোক্ত পদার্থ দুইটীর কোনই আবশ্যকতা নাই।



খুব মিহি গন্ধকের গুড়া অল্প অল্প করিয়া ইহার মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হয়। স্বর্ণকার মধ্যে মধ্যে তুলিয়া দেখে গহনার রং ঠিক আবশ্যক মত হইয়াছে কিনা। এরূপ সাবধানতা অবলম্বন না করিলে অর্থাৎ গন্ধক-সংযোগে অধিক ক্ষণ ফুটাইলে সোণার রং অল্পে অল্পে কাল হইয়া যায়। ইহা ঘটিলে তাহার সমস্ত শ্রম পণ্ড হয়, তাহাকে আবার পুনরায় গোড়া হইতে আরম্ভ করিতে হয়।

কিরূপে এই লাল রং হয় এবং কিজন্য অধিক ক্ষণ ফুটাইলে গহনার রং কাল হয় ভাবিয়া দেখিলে গন্ধকের কোন যৌগিক ইহার হেতু বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।* মিঃ চক্রবর্ত্তীর মতে স্বর্ণের কোন অক্সাইড ইহার কারণ। আমি তাঁহার মত সমর্থন করিতে পারি না। আমি দেখিয়াছি সুধু তেঁতুলের মাড়ী এবং গন্ধক দ্বারা বেশ রং করা যায়। সোরা এবং নূন অথবা কেবল নূন ব্যবহার করিবার কোনই আবশ্যকতা নাই। আর তেঁতুলের মাড়ীতে যে সব অম্ল পদার্থ আছে তাহাদের নূন হইতে হাইড্রো ক্লোরিক বা সোরা হইতে নাইট্রিক এসিড উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা নাই। কিংবা নূন ও সোরা এ ভাবে পরস্পর ক্রিয়াশীল হইয়া ক্লোরিণ উৎপন্ন করিতে পারে না। যখন সুধু তেঁতুলে কোন রং হয় না, আর গন্ধক দিলেই রং হয় এবং গন্ধকের পরিমান বেশী হইলে, বা বেশীক্ষণ ধরিয়া ফুটাইলে যখন গহনা কাল হইয়া যায় তখন ইহাযে গন্ধকের কোন যৌগিক তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

রং করিতে গিয়া পাছে কাল হয় এই নিমিত্ত যদিও স্বর্ণকারের আশঙ্কা থাকে তথাপি সে ইহা করিতে বিরত হয় না। তাহার প্রধান কারণ ইহা দ্বারা মরা সোণার রং খাঁটী সোণার মত করা যায়। ইহা অসাধু ব্যক্তির ব্যবসায়ের বিশেষ অনুকুল তাহা বলাই বাহুল্য।

বারান্তরে সোণার অপচয় নিবারণ সম্বন্ধে গুটিকয়েক কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল।

* ক্ষার পদার্থের সাহায্য ব্যতীত গন্ধক সোনার সহিত যুক্ত হইতে পারে না। বৃথা অনুমান করা অপেক্ষা অনুসন্ধানের উপর সিদ্ধান্তের ভার অর্পন করাই শ্রেয়।

# স্বামী।

স্বামী, এ নামে যাঁকে অভিহিত করা হয়, তাঁহার কত কর্ত্তব্য তাহা কি সকলে ভাবে! তা যদি ভাবিত, তাহলে জগতে শতশত নারী দুঃখে ভাসিত না। স্বামীকে কত নামে অভিহিত করা হয়; প্রথম যখন তিনি নারীকে ফুলের মালায় কিনিতে আসেন, তখন সকলে বলে, "বর এসেছে, বর এসেছে।" কি সুন্দর নাম—বর! আমরা যখন ঈশ্বরের কাছে কোন কামনা পূরণের প্রার্থনা করি, তখন প্রথমেই বলি, "দেব, এই বর দাও।" সেই নামটি স্বামীকে কেন দেওয়া হয়? তিনি দেবতার কাছে প্রার্থনীয় বরের মতন চিরসুন্দর থাকিবেন বলিয়া নয় কি? স্বামী নামে লোকে যাহাকে তাহাকে ডাকে না। যিনি স্বর্গ মর্ত্ত্যের রাজা তাঁকে লোকে জগৎস্বামী বলে। আর পৃথিবীর ভিতর যাঁহাদের স্বামী (পতি) বলা যায় তাঁহারাও রাজা (ভূপতি) বা ভূস্বামী। রাজার উপর মানুষ সকল ভার ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত। তিনি প্রজাপালন করিবেন, প্রজাদের অভাব মোচন করিবেন। সুতরাং রাজা হইলেও অনেক কর্ত্তব্য মস্তকে থাকে। কিন্তু নারীর স্বামীর, রাজার চেয়ে কর্ত্তব্য বেশী। তাঁহার কর্ত্তব্যের ত্রুটি হওয়া বড় অন্যায় ও বড় কষ্টের। কেননা নারী যখন তাঁহাকে স্বামীপদে সমাজে বরণ করিয়া লয়, সেতো চির জীবনের মত; অত্যাচারী হইলেও তো উপায় নাই। সেই নিরুপায়া নারীর স্বামীকে বলি তাঁহার কি রাজার চেয়ে কর্ত্তব্য বেশী নয়? ভূস্বামী বা ক্ষুদ্র জমিদার উৎপীড়ক হইলে তাহার প্রতিকার আছে। কিন্তু নারীর স্বামী অত্যাচারী হইলে তাহার কোন উপায় নাই। নীলকণ্ঠের মত সে বিষ কণ্ঠে ধারণ করিতে হয়; গিলিবার যো নাই ফেলিবার যো নাই। পুরুষগণ, তাই বলিতেছি, তোমাদের এত বড় নাম দেওয়া হয়, ও অটল পদ দেওয়া হয়, সে নামের ও পদের অপব্যবহার করিয়া তোমরা কি সুখ পাও? ও পদাশ্রিতাদের পদাঘাত করিয়া কি বাহাদুরি লাভ কর? স্বামীকে দেবতা নামেও অভিহিত করা হয়। যাঁহাদের দেবতা জ্ঞানে নারী পূজা করে, বড় দুঃখ যে সেই দেবতারা দেবত্বের কিছুই রাখেন না। দেবতার প্রধান গুণ ক্ষমা। সেই ক্ষমার কথা তাঁহারা ভুলিয়া যান। স্বামী নারীর প্রধান গুরু; গুরুর কর্ত্তব্য শিষ্যকে কর্ত্তব্যের পথে চালিত করা। নারীর স্বামী-গুরু কেন সে কর্ত্তব্য ভুলিয়া যান ভাবিয়া পাই না। যে স্ত্রী সংসারে কলহ আনয়ন করে, স্বামীর মাতা পিতা



ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতির প্রতি কর্ত্তব্যের ত্রুটি করে, স্বামী-গুরুর কি উচিত নয় সেই স্ত্রীকে কর্ত্তব্যের দিকে চালিত করা? তাহা না করিয়া কেহ কেহ সে বিষয়ে প্রশ্রয় দেন। কেহবা মনে ইচ্ছা থাকিলেও ভয়ে কিছু বলেন না। কেন এরূপ হয়? কেন তাঁহারা মনে রাখেন না, এই সংসার সাগরে, রমণীর তাঁহারাই কর্ণধার, তাঁহারাই প্রধান গুরু? উৎপীড়ক স্বামীর বিষয় ভাবিলে তো প্রাণ ফাটিয়া যায়। বলিয়াছিতো, সে নীলকণ্ঠের বিষ। কিন্তু এইরূপ স্নেহপ্রবণ অন্ধ স্বামীর কথা ভাবিলেও বড় কষ্ট হয়। কারণ তিনি পদাশ্রিতাকে বুকে টানিয়া লইয়া শান্তি দিলেন, স্বামীর কর্ত্তব্যের কতকটা পালন করিলেন; কিন্তু সংসার সমুদ্রে ছাড়িয়া দিয়া হাবুডুবু খাওয়াইতে লাগিলেন; কর্ণধার সোজা পথে নন্দন কাননের পথে তরণী চালিত করিল না, একি কম দুঃখ! স্ত্রীর প্রতি কতখানি কর্ত্তব্য ও কি কি বিষয়ে কর্ত্তব্য সব ভাবিয়া দেখিও। সব রাখিতে পার তো ফুলের মালা দিয়া নারীর জীবন ক্রয় করিও। আর না পার তো এমন করিয়া রমণীকুসুমকে বৃক্ষ হইতে ছিঁড়িয়া আনিয়া শুধু গৃহের শোভাবৃদ্ধি করিও না।

এই কথাগুলি হয়তো অনেকের মনোনীত হইবে না। যাঁহার মনোনীত না হইবে তিনি যেন ক্ষমা করেন, যেন অসন্তুষ্ট না হন। মেয়েরা ঘর ভাঙ্গে, একথা সকলে বলিয়া থাকেন। সেই জন্যই লেখা যে স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ অদূরদর্শী ও নির্ব্বোধ, তাহার উপর অশিক্ষিতা; তাহাদের তো শত সহস্র দোষ থাকিবেই। ঈশ্বর এই জন্যই সকল ক্ষমতা পুরুষদের হাতে দিয়াছেন। গাছের গোড়া শক্ত হইলে ঝড়ে কি তাহাকে উপড়াইয়া ফেলিতে পারে? তোমরা দেবতা, তোমরা শিক্ষিত, তোমরা বলবান, তোমরা আমাদের ঠিক রাখিলেই আমরা ঠিক থাকি। ভাল বাসিয়া আদর করিয়া তোমরা যে কথা বলিবে, আমরা কি তাহাতে না বলিতে পারি? প্রকৃত প্রেম হইলে তাহার বশীভূত না হইয়া কে থাকিতে পারে? প্রেম জগতে কে না চায়? প্রেম কোন মানব মানবীর প্রার্থনীয় জিনিষ নয়? মানুষ তো ছার! স্বয়ং ভগবান প্রেমের কাঙ্গালী, তিনিও প্রেমডোরে ভক্তের কাছে বাঁধা থাকেন। আমরাই যদি দুষ্টা হই, আমরাই যদি তোমাদের সংসারে কলহ পার্থক্য আনয়নের প্রধান কারণ হইয়া থাকি, তোমরা ভাল বাসিয়া আমাদের ঠিক করিয়া লও না কেন? দেখ স্বামীর জন্য স্ত্রীলোক সব ত্যাগ করিয়া আসে। মা বাপ ভাই ভগ্নী এমন কি গোত্র অবধি ত্যাগ করিয়া স্বামীর হয়। স্বামীকে স্ত্রীর জন্য

কিছুই ছাড়িতে হয় না। শৈশবের সেই গৃহ, পিতা মাতার স্নেহময় কোল, ভ্রাতা ভগিনীর প্রীতিপূর্ণ সুখ কিছুই ছাড়িতে হয় না; অথচ ঘরে বসিয়া যাহাকে পাও, সে একান্ত তোমারি হয়, শুধু তাই নয় সে জীবনে মরণে তোমার। তুমি মরিলে সে ভিখারিনী সাজে, তোমারি ধ্যানে সে চিরজীবন অতিবাহিত করে—আর তুমি যার স্বামী, গুরু, দেবতা, এতগুলি নাম ধারণ করিয়া হৃদয়েশ্বর হইয়া বস, তাহাকে প্রেমময়রূপে ভাল বাসিয়া সুখী কর; গুরুরূপে সংসার সমুদ্রে ঠিক পথ দেখাইয়া দাও ইহা সত্য, তোমরা ঠিক পথে চালাইলে তাহারা কখন বেঠিক পথে চলিবে না। তবে এ কথাও সত্য যে সকল স্ত্রীলোক সব ত্যাগ করিয়া আসিলেও, আত্মহারা হইয়া থাকিতে ভাল বাসে না। তা যদি বাসিত তাহলে স্বামীর সৎনামের অপচয় যাহাতে হয়, তা করিত না। তার দেবতাকে সে ঈশ্বরের কাছে মানবের কাছে চিরসুন্দরই রাখিত। কিন্তু তোমরা তো জান তাহারা অবলা ও অশিক্ষিতা তোমরা নিজগুণে তাহাকে সংসারের যোগ্যা ও তোমাদের যোগ্যা করিয়া লও। স্ত্রী, যে শুধু বিলাসবাসনার ও গৃহশোভাবৃদ্ধির জিনিষ ইহাই হয়তো অনেকে মনে করেন। সে যে জীবনসঙ্গিনী, সে যে অর্দ্ধাঙ্গিনী, সে যে সহধর্ম্মিণী, এটা যদি মনে থাকে তাহলে কেন তাহাকে এই সংসার সমুদ্রের ভীষণ তুফানে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হও। তাহাকে ধর্ম্মের, ন্যায়ের, কর্ত্তব্যের পথ দেখাইয়া দাও।

এই সংসারে এখনও ভগবানের আশীর্ব্বাদী ফুলের মত অনেক দেবতা আছেন, যাঁহারা যথার্থ প্রেমময়, যাঁহারা স্বামী, গুরু ও দেবতা নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। যাঁহাদের জন্য কত অশান্তিময় গৃহও শান্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। সকলেই যদি তাঁহাদের মত হয়, ও সকলেই বুঝে যে শুধু ফুলের মালা দিয়া কিনিয়া আনিয়া বর ও স্বামী হইয়া বসিলে হয় না; ইহার ভিতর রাশি রাশি কর্ত্তব্য, ক্ষমা, করুণা, ও সহিষ্ণুতা চাই; তাহলে এই সংসারই তো স্বর্গ হয়। যেখানে শান্তি, সুখ ও প্রেম আছে সেখানেই তো ভগবান স্বয়ং বিরাজ করেন, সেই তো স্বর্গ। এইগুলি মনে রাখিয়া কর্ত্তব্যের কঠিনতা ভাবিয়া স্বামী হইও।

শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী দাসী।



# বিশু দাদা।

( ১১ )

তিথি অমাবস্যা—স্থান মহাশ্মশানের পার্শ্বে গঙ্গাতীর—সময় রাত্রি আটটা—উপস্থিত বিশ্বনাথ ও সুমতি;—দেশ, কাল, পাত্র সমস্তই যেমন হইতে হয় তাহাই হইয়াছিল। ঊর্দ্ধে নক্ষত্রখচিত নীলাম্বর—সম্মুখে কলনাদিনী, পতিত-পাবনী জাহ্নবী—পার্শ্বে একদিকে কাশীমিত্রের শ্মশানঘাট, অপর দিকে ক্ষুদ্র মন্দিরে দেবাদিদেব শ্মশানেশ্বর। হারানিধি খুঁজিয়া পাইবার এইত স্থান—এইত সময়; সংসারের ধূলামাটি মলিনতা ধুইয়া ফেলিবার এইত স্থান—এইত সময়; অনাথ অনাথিনী, কাঙ্গাল কাঙ্গালিনীর শোক সন্তাপ জুড়াইবার এইত স্থান—এইত সময়। এই মহা পবিত্র শ্মশানের দ্বারদেশে—ঐ শ্মশানেশ্বরের মৌন করুণ দৃষ্টির সম্মুখে এই বহুদিনের প্রত্যাশিত সম্মিলন!

যাহার জন্য নরেশ বাবু দেশত্যাগী, যাহার জন্য তিনি এই জনকোলাহল-পূর্ণ মহানগরীতে আত্মগোপন করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কয়েকটা দিন কাটাইতে আসিয়াছেন, যাহার জন্য তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে দিবানিশি হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইতেছে, যাহার জন্য ভবেশ মলিন মুখে দিন যাপন করিতেছে, আর যাহার জন্য বিশ্বনাথ পথের ভিখারী হইয়াছে, আজ সেই সুমতিকে পাওয়া গিয়াছে। বিশ্বনাথ এ সময়ে সুমতিকে কি বলিবে ভাবিয়া পাইতেছে না। যখন সে সুমতির জন্য পথে পথে বেড়াইত, তখন সে মনে করিত সুমতির সহিত সাক্ষাৎ হইলে সে কত কথা বলিবে, কত স্নেহের ভৎর্সনা করিবে, কত আদর করিয়া কত মিষ্ট কথা বলিবে; কিন্তু আজ তাহার কোন কথাই মনে আসিল না- কোন কথাই মুখ দিয়া বাহির হইতে চাহিল না। আজ এই সুদীর্ঘ দেড়মাস যে সম্বোধন করিতে না পারিয়া তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল, আজ সেই 'দিদি' নাম ব্যতীত আর কোন কথাই তাহার মনে আসিল না, মুখে আসিল না। বিশ্বনাথ সুধু ডাকে 'দিদি!' সুমতি শুধু বলে 'বিশু দাদা!'

কিছুক্ষণ পরে বিশ্বনাথের চমক্ হইল—তাহার মনে পড়িল যে, তাহাকে আজ সকাল সকাল বাসায় ফিরিয়া যাইতে হইবে; বাসায় সকলে তাহার জন্য আজ অপেক্ষা করিবে।

সে তখন সুমতিকে বলিল "ওঠ দিদি! চল, বাসায় যাই।"

সুমতি বাসার কথা শুনিয়া কাঁদিয়া উঠিল, এতক্ষণ যে অশ্রুপ্রবাহ তাহার হৃদয়ের মধ্যে আবদ্ধ ছিল—বাহির হইবার পথ পাইতেছিল না, বাসার কথা —বাড়ীর কথা—বিশ্বনাথের মুখে শুনিয়া আর সে অশ্রুপ্রবাহ রোধ করিতে পারিল না। সুমতি কাঁদিয়া বলিল, "বাসা! বাড়ী! বিশু দাদা! আমার ত সে সব কিছু নাই। আমি যে পথের ভিখারিণী।"

আর তাহার মুখ দিয়া কথা সরিল না, আর সে কিছু বলিতে পারিল না। বিশ্বনাথ তাহাকে কোলের মধ্যে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, "কে তুই পথের ভিখারিণী? কে বলিল দিদি! তুই ভিখারিণী? কে বলিল তোর কিছু নাই? সব আছে দিদি আমার! সব আছে।"

"কি আছে বিশু দাদা! কি রেখেছি বিশু দাদা! আমি যে সব ছেড়ে এসেছি ভাই!"

বিশ্বনাথ। ওকি কথা দিদি! আমি যে আজ দেড় বৎসর তোর জন্য —তোর খোঁজে এই কলিকাতার পথে পথে ভিখারীর সাজে বেড়াচ্ছি। তোর জন্য যে কাকাবাবু, ভবেশ, সতীশ, দিদি ঠাকরুণ পথ চেয়ে বোসে আছে দিদি! ওঠ, আর দেরী কোরিস্ না। অনেকদূর যেতে হবে বোন!"

সুমতি। বিশু দাদা! আর ত ঘরে যাবো না ভাই! আমার যে ঘর নেই, আমার ঘর ছিল, আমি সে সব ফেলে এসেছি দাদা! কতদিন এই গঙ্গায় —এইখানে ঝাঁপ দিয়ে মরতে গিয়েছি, কিন্তু মরতে পারিনি। কে যেন আমার হাত ধোরে টেনে রাখ্‌তো—কে যেন আমার কাণের কাছে বোলতো মরিস্‌নে! এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর! তারপর তোর বিশু দাদার সঙ্গে দেখা হবে। বিশু দাদা! তোমার সঙ্গে দেখা হোলো; এখন আমাকে ছেড়ে দেও। মর্‌ব না, মর্‌তে পারবো না। যে বোলেছে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর, তারই কথা শুন্‌বো। আমি আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কোরবো। আমাকে বাসায় ডাকো কেন? আমাকে ঘরের কথা বল কেন? ওসব আমার ফুরিয়ে গেছে। এখন শুধু প্রায়শ্চিত্ত—দাদা! শুধু প্রায়শ্চিত্ত! যেদিন প্রায়শ্চিত্ত শেষ হবে—যেদিন তুষানল সব ছাই হ'য়ে যাবে, সেইদিন মা গঙ্গা আমাকে কোলে স্থান দেবেন। ঘরের কথা বোলো না দাদা! ও কথা তুলো না দাদা! আমাকে যেতে দাও। আমি আঁধারে মিশিয়ে যাই।"

বিশ্বনাথ বলিল, "ও কি বল্‌ছিস্ সুমতি। আমি যে আজ এই দেড়মাস দুবেলা পেট ভ'রে খাইনি। তোর জন্য যে আমি পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি।



তোর জন্য যে কাকা বাবু, ভবেশ দেশ ছেড়ে এসেছে। তারা যে তোর পথ চেয়ে বোসে আছে। তুই যাবি নে? কেন যাবিনে দিদি! আমি যে তোকে নিতে এসেছি! আমি যে তোকে কোলে ক'রে মানুষ কোরেছি। আমি যে তোর কথা ভেবে ভেবে পাগল হবার মত হোয়েছি। তুই যাবিনে? কেমন কোরে আমাকে ছেড়ে যেতে পারিস্ দেখি!"

এই বলিয়া বিশ্বনাথ সুমতিকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিল। তাহার মনে হইল তাহার সেই স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া যাইবার ক্ষমতা সুমতির নাই।

সুমতি বলিল, "বিশু দাদা! কি বোল্‌ছো দেড় মাসের কথা! আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত দেড় মাসে হবে না—দেড় বৎসর—দেড়শ বৎসর—না না দেড় হাজার বৎসরেও আমার পাপের শেষ হবে না। আমি দাদা! আজ এই দেড় মাস ঐ গঙ্গাবাসের ঘরের বারান্দায় পড়ে আছি। আজ এই দেড় মাস আমি কারো সঙ্গে কথা বলি নাই, ঐখানে দিন রাত্রি পোড়ে থাকি। যখন ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হোয়ে পড়তাম, তখন দুই তিনদিন পরে ঐ ওপাশে মদনমোহন ঠাকুরের বাড়ী গিয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌তাম, তারা দুঃখিনী দেখে দুটো ভাত দিত, তাই নিয়ে এই গঙ্গার ধারে—এইখানেই বোসে পোড়া পেটের জ্বালা দূর করতাম; তারপর আবার ঐ গঙ্গাবাসের ঘরের বারান্দায় গিয়ে দু' তিনদিন পোড়ে থাক্‌তাম। তাই এতদিন কোরছি—তাই শেষ দিন পর্য্যন্ত করবো। আজ দেড় মাস পরে তোমার সঙ্গে আজ কথা বোল্‌লাম দাদা!" সুমতির আর কথা সরিল না, তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। বিশ্বনাথের বুকে মাথা দিয়া সে কাঁদিতে লাগিল; তাহার পরিধানের মলিন ছিন্ন বস্ত্র অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সুমতির এই কাহিনী শুনিয়া বিশ্বনাথও কাঁদিতে লাগিল।

একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বিশ্বনাথ বলিল, "সে যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, অদৃষ্টে যাহা ছিল হইয়া গিয়াছে। সে কথায় আর কাজ নাই দিদি! তুই যথেষ্ট কষ্ট পেয়েছিস্, তুই যে এত কষ্ট সোয়ে বেঁচে আছিস্, এই আশ্চর্য্য। যাক্, এখন ওঠ, দিদি আমার! আর বিলম্ব কোরিস্ না; সবাই যে তোর জন্য বোসে আছে। আমি যে আজ তোকে নিয়ে যাবো ব'লে বেরিয়েছি; আজ আমি তোকে ঘরে নিয়েই যাবো। তারপর যা হয় হবে। এ পাগল দাদাকে ছেড়ে আজ আর যেতে পারছিস্ না দিদি!"

সুমতি তখন স্থির হইয়া বলি; তার পর ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল,

"বিশু দাদা! তুমি কি বল্‌ছো, তা কি বুঝতে পারছো। তুমি কা'কে কোথায় নিয়ে যেতে চাও, কার কাছে নিয়ে যেতে চাও? আমি কি কাউকে রেখে এসেছি, আমার বলবার কি কেহ জগতে আছে? তা যদি থাক্‌ত, তাহোলে আমি চোলে আস্‌তাম না;—তা হোলে আমি এমন কোরে পথের ভিখারিণী হ'তেম না। সব বাঁধন কাটিয়ে এসেছি দাদা! সব কেটে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে এসেছি। আর কি জোড়া লাগে দাদা! তুমি ঘরে যাও বিশু দাদা! তোমার সঙ্গে দেখা হবে ব'লে কে যেন আমাকে আশা দিত, তা আজ সফল হ'য়ে গেল। আর কেন? তুমি যাও, আমি এইখানেই থাক্‌বো। লোকে আমাকে বোবা পাগলী বোলে মনে করে, তাই ভাল, সেই ভাল! যাও বিশু দাদা! রাত হোয়ে গেল, তুমি যাও। তারা তোমার জন্য বোসে আছে, আমার জন্য কেউ বোসে নেই দাদা! কেউ নেই!"

সুমতি একটু নীরব থাকিয়া আবার বলিল, "বিশু দাদা! কোন মুখে ঘরে যাবো?—কি বোলে বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়াবো? ভবেশ—আমার সোণার ভাই, ভবেশকে কি বোলবো? সতীশ দাদাকে কি বোলবো? সুলোচনা দিদির কাছে কি বোলে মুখ দেখাবো? না দাদা! আমার আর কোন পথ নেই, আমি যে পথ ধোরেছি এই ঠিক পথ। এ পাপের এই প্রায়শ্চিত্ত। এ পথ থেকে আমাকে ফিরাইও না। এমন মহাপাপিনীকে সংসারের শীতল ছায়ার নিয়ে যেয়ো না, সব পুড়ে যাবে, সব ছারখার হোয়ে যাবে।" এই বলিয়া সুমতি উঠিয়া দাঁড়াইল। বিশ্বনাথ তাড়াতাড়ি তাহার হাত চাপিয়া ধরিল, তাহার পর বলিল "শোন্ দিদি! আমি প্রতিজ্ঞা কোরেছিলাম, দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে তোকে খুঁজবো—তোকে খুঁজে বা'র কোরবো; একবার এই চক্ষে চেয়ে দেখবো তুই কি ভাবে আছিস্, তুই কি অবস্থায় আছিস্; যদি দেখ্‌তে পাই যে, তুই সুখে আছিস্, তুই আমাদের সকলের কথা ভুলে গেছিস্, তুই পাপে ডুবে গেছিস্, তা হোলে তোকে দেখা দিব না, তোর নাম আর মুখে আন্‌ব না, এ বাঙ্গলা দেশে আর থাক্‌ব না একেবারে দেশত্যাগী হ'য়ে চোলে যাব; আর যদি দেখি যে তুই চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছিস্, ভিখারিণীর মত পথে পথে বেড়াচ্ছিস, তা হোলে তোকে বুকে কোরে নিয়ে ঘরে যাবো। আমি যা ভেবেছিলাম, তুই তাই হোয়েছিস্। এখন ভুলে যা দিদি! দেড় মাসের কথা সব ভুলে যা। আয় তোকে কোলে কোরে আবার ঘরে নিয়ে যাই, আবার তোকে তোর



স্থানে বসিয়ে দিই। আর বিলম্ব করিস্ না, রাত হোলো, তারা যে তোর আশায় পথ চেয়ে বোসে আছে। আমাদের বাসা যে অনেক দূর দিদি! অনেক দূর!"

"সে অনেক দূর দাদা! সে অনেক দূর!" ধীরে ধীরে এই বলিয়া সুমতি নীরব হইল; তাহার কথা বলিবার শক্তি যেন সহসা অপহৃত হইল।

বিশ্বনাথ ডাকিল "দিদি!" কোন উত্তর নাই। বিশ্বনাথ আবার ডাকিল "দিদি! সুমতি!" সুমতি কোনই উত্তর দিল না।

বিশ্বনাথ। তোর বিশু দাদার কথার জবাব দিবিনে দিদি!

কোন উত্তর নাই, সুমতি একেবারে নীরব হইল। বিশ্বনাথ মনে মনে ভাবিল, সুমতির এখন আর কথা বলিতে ইচ্ছা করিতেছে না, তাই সে নীরব হইয়াছে। তখন সে বলিল "চল দিদি! একটু পথ হাঁটিয়া চল। ঐ মোড়ের মাথায় গাড়ী পাওয়া যাবে; একখানা গাড়ী কোরে বাসায় যাই।" এই বলিয়া সুমতির হাত ধরিয়া বিশ্বনাথ অগ্রসর হইল, সুমতি বিনা বাক্যব্যয়ে বিশ্বনাথের সঙ্গে চলিল। বিশ্বনাথ পথের মধ্যে কত কথা জিজ্ঞাসা করিল, সুমতি নিরুত্তর; চুপ করিয়া কলের পুতুলের মত বিশ্বনাথের হাত ধরিয়া সে চলিতে লাগিল।

বিশ্বনাথ মনে করিয়াছিল মদন মোহনের বাড়ীর নিকট চিৎপুর রোডের উপরেই ভাড়াটিয়া গাড়ী পাওয়া যাইবে; কিন্তু রাত্রি নটার সময় সেখানে গাড়ী দাঁড়ায় না। বিশ্বনাথ তখন সুমতিকে বলিল "দিদি! আর একটু কষ্ট কোরে হাঁটতে হবে। ঐ শোভাবাজারের মোড়ে গাড়ী পাওয়া যাবে।"

বিশ্বনাথের কথা যেন সুমতির কানেই গেল না, সে যেমন তাহার সঙ্গে যাইতেছিল তেমনই চলিতে লাগিল।

শোভাবাজারের মোড়ের কাছে কয়েকখানি কাপড়ের দোকান তখনও খোলা ছিল। কাপড়ের দোকান দেখিয়া বিশ্বনাথের মনে পড়িল, সুমতির পরিধানে মলিন ছিন্নবস্ত্র রহিয়াছে। তখন সে কাঁধের চাদর খুলিয়া দেখিল যে, চাদরের খুঁটে দুইটী টাকা বাঁধা আছে। বিশ্বনাথ সুমতিকে বলিল "দিদি! এইখানে একটু দাঁড়াও, একখানি কাপড় কিনে নিই; তোমার কাপড় যে ছেঁড়া।"

সুমতি বিনা প্রতিবাদে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল, বিশ্বনাথ পাশের দোকান হইতে তের আনা দিয়া একখানি অতি সরু পেড়ে কাপড় কিনিল।

তাহার পর কাপড়খানি সুমতির হাতে দিয়া বলিল "দিদি! আগে গাড়ী করি, তারপর গাড়ীর মধ্যে তুমি ও ময়লা কাপড়খানা ছেড়ে ফে'লো।"

সুমতি কোন কথা না বলিয়া কাপড়খানি হাতে করিয়া বিশ্বনাথের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। বিশ্বনাথ শোভাবাজারের মোড়ে পৌঁছিয়া দেখিল, কয়েকখানি গাড়ী রহিয়াছে। সে বলিল "গাড়োয়ান! ভাড়া যাবি, বহুবাজার চাঁপাতলা মিরজাপুরের পুকুরের কাছে।" একজন গাড়োয়ান অগ্রসর হইয়া বলিল "কি ভাড়া দিবে? সোয়ারি কই?"

বিশ্বনাথ। এই আমরা এই দুইজনই সোয়ারি। কি ভাড়া নিবি।

তখন চারিদিক হইতে পাঁচ সাতজন গাড়োয়ান আসিয়া বিশ্বনাথকে ঘিরিয়া ফেলিল। কেহ বলে "পাঁচ সিকা," কেহ বলে 'দেড় টাকা'; একজন বলিল "আমার সঙ্গে এক কথা, একটী টাকা যদি দিতে পার, গাড়ীতে উঠে বোসো।"

বিশ্বনাথ তখন সেই এক টাকাওয়ালার গাড়ীই ভাড়া করিয়া সুমতিকে গাড়ীতে তুলিয়া দিল এবং নিজেও গাড়ীতে উঠিল। গাড়ী চলিতে লাগিল।

বিশ্বনাথ তখন সুমতিকে বলিল "দিদি! এইবেলা কাপড়খানা পরে ফেল।" সুমতি সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না—কাপড়খানি হাতে করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

( ক্রমশঃ )

শ্রীজলধর সেন।

---



# রমেশচন্দ্র দত্ত।

## চতুর্থ অধ্যায়।

বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যথাক্রমে এসিষ্টাণ্ট, জয়েণ্ট ও ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য উপলক্ষে খ্যাতি অর্জ্জন—তিন কন্যা ও এক পুত্রের জন্মগ্রহণ এবং চারি কন্যার বিবাহ—ইউরোপে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার পর্য্যটন—"Three years in Europe," "ইউরোপে তিন বৎসর," ও Rambles in India" পুস্তকত্রয় প্রকাশ—সি-আই-ই উপাধি লাভ—কমিশনর পদ প্রাপ্তি—সিভিল সার্ভিস হইতে বিদায় গ্রহণ।

১৮৭৬ সালে ৩১শে আগষ্ট তারিখে, রমেশচন্দ্র কৃষ্ণনগরের অস্থায়ী জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন। ঐ সালের ৩১শে অক্টোবর তারিখের ভীষণ বাত্যা ও জলপ্লাবনে, গঙ্গানদীর মোহানার নিকটবর্ত্তী দক্ষিণ সাহাবাজপুর নামক দ্বীপের প্রায় চল্লিশ সহস্র লোক কালগ্রাসে পতিত হয়। সহস্র সহস্র লোকের মৃতদেহের সৎকার না হওয়ায়, সেই সকল পচিয়া বিসূচিকা রোগ দেখা দেয়। জলের স্রোতে রামের গরু বাছুর শ্যামের বাটীতে, ও শ্যামের গৃহিণী যদুর গৃহে উপস্থিত হওয়াতে, ঐ সকল দ্রব্যের স্বামিত্ব লইয়া মারামারি ও মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। গভর্ণমেণ্ট রমেশচন্দ্রকে দক্ষিণ সাহাবাজপুরে প্রেরণ করিলে, তিনি যে সকল উপায়ে তথায় শান্তি স্থাপন করেন, ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "Rambles in India" পুস্তকে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—

"Herds of cows and buffaloes had been floated twenty or thirty miles from their villages, wooden boxes containing utensils and silver ornaments had been carried away miles from the homes of their owners, and every one kept what he found and gave up what was lost. Some search was however made from time to time for lost property, and occasionally a box of silver things or of brass articles was found by its owner in the keeping of a villager, living perhaps ten miles off. Complaints were brought before me,

but it was impossible to treat as "criminal misappropriation" a practice, which had been so universal, under circumstances so unique. It was decided by the people themselves that the property so found should be restored to its owner, but the finder would keep one quarter of his booty, if he honestly rendered up all the rest. I tacitly acquiesced in this dicision whichwas neither legal nor very just, but which suited the circumstances and notions of the people. Hundreds of complaints were withdrawn, all disputes over properties found were amicably settled, and the people thought a Daniel had come to the judgment seat of Dakhin Shahbazpur! More serious disputes however ensued in another way....Widowers found a difficulty in getting new house-wives for themselves either in the island or from outside it.....and many a fight was fought by eager candidates for the hands of the women who had survived and been widowed by the catastrophe."

১৮৭৮ সালের এপ্রেল মাসে রমেশচন্দ্র দক্ষিণ সাহাবাজপুর হইতে ত্রিপুরায়, তথা হইতে কয়েক মাস পরে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ায় ও ১৮৮০ সালে বাঁকুড়ায় বদলি হন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি বালেশ্বরের অস্থায়ী ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৮৩ সালের এপ্রেল মাস হইতে ১৮৮৫ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত তিনি বাখরগঞ্জের ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে আর কোনও ভারতবাসী এত দীর্ঘকাল ধরিয়া ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যভার প্রাপ্ত হন নাই। দুর্দ্দান্ত লোক-সঙ্কুল বাখরগঞ্জ জেলা সুশাসনে রাখিয়া রমেশচন্দ্র গভর্ণমেণ্টের ধন্যবাদ ভাজন হন। তদানীন্তন বড় লাট লর্ড রীপণ তাঁহাকে সম্মানের সহিত আহ্বান করিয়া, তাঁহার কার্য্যের আন্তরিক প্রশংসা করেন।

"My appointment and administration in Backergunj on this occasion attracted considerable attention. Previous to this I myself and some others of my countrymen had acted as District Officers for short periods for one, two or three months. But this was first instance that a native of India was kept in charge of a District for a considerable length of time, and the step was spoken of as a doubful experiment. The District too was one of the heaviest and most turbulent



in all Bengal, and the period was one of excitement, for the Ilbert Bill agitation greatly exercised the public mind and embittered the public feeling during these years. All's well, however, that ends well; there was not a whisper of discontent or agitation in the District, every thing went on smoothly and well, and I peacefully laid down the reins in 1885 after two years of administration."

১৮৭২ হইতে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে, রমেশচন্দ্রের পারিবারিক জীবনে অনেকগুলি ঘটনা সমাপন্ন হয়। ১৮৭২ সালে তাঁহার তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী অমলা, ১৮৭৩ সালে চতুর্থা কন্যা শ্রীমতী সরলা, ১৮৭৯ সালে একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত অজয়চন্দ্র এবং ১৮৮২ সালে কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুশীলা জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮২ সালে প্রথমা কন্যা শ্রীমতী কমলার সহিত গভর্ণমেণ্টের ভূতত্ত্ব-বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু, বি-এস্-সি, এফ্-জি-এস্, মহাশয়ের, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী বিমলার সহিত এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত বলীনারায়ণ বড়ুয়া মহাশয়ের, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী অমলার সহিত ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদবিহারী দত্ত (মিঃ কে, বি, দত্ত) মহাশয়ের, এবং ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে চতুর্থা কন্যা শ্রীমতী সরলার সহিত সিভিলিয়ান শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম্, এ, আই-সি-এস্, মহাশয়ের বিবাহ হয়।

১৮৮৫ সালে দুই বৎসরের অবকাশ গ্রহণ করিয়া, তাহার কিয়দংশ রমেশচন্দ্র ইউরোপে যাপন করেন. এবার তাঁহার অগ্রজ যোগেশচন্দ্র, বন্ধু শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুপ্ত, সহধর্ম্মিণী, তিন কন্যা ও পুত্র তাঁহার সহিত প্রবাসে গিয়াছিলেন। ১৮৮৬ সালে ইংলণ্ডে পৌঁছিয়া রমেশচন্দ্র যে সকল বিভ্রাটে পড়িয়াছিলেন, "Three years in Europe" * নামক পুস্তকে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। আহার ও বেতন বাবদে একজন পাচিকার জন্য মাসে প্রায় ষাট টাকা ব্যয় করিয়াও তিনি দেখিতেন যে শ্বেতাঙ্গী "ব্রাহ্মণী" ঠাকুরাণী, মাংসওয়ালা ও ফলবিক্রেতার সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া কিছু কিছু আত্মসাৎ করিত। মাসে প্রায় পঞ্চাশ টাকা খরচ করিয়া যে ঝি পাওয়া গিয়াছিল, সে প্রতি সপ্তাহে তাঁহার পুংজাতীয় বন্ধুগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পাইলে, চাকরি

* এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে, ৩য় সংস্করণ ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ও চতুর্থ সংস্করণ ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

ছাড়িয়া দিবে বলিয়া শাসাইত। কলার শুদ্ধ একটী শার্ট কাচাইতে চারি আনার উপর খরচ পড়িত। একটী ভাল কুক্কুটের মূল্য আড়াই টাকা হইতে তিন টাকা পর্য্যন্ত দিতে হইত। বাটীভাড়া ও গ্যাস খরচায় সপ্তাহে তিন গিনির উপর অর্থাৎ মাসে প্রায় দুই শত টাকা পড়িত। মোটের উপর মাসে সহস্রাধিক টাকা ব্যয় করিয়াও তাঁহার কুলাইত না।

ইংলণ্ডের স্ত্রীশিক্ষা ও পরিণয়প্রথা সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র তাঁহার ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "ইউরোপে তিন বৎসর" নামক পুস্তিকায় লিখিয়াছেন ঃ—

"এখানকার যুবতীদিগের বিদ্যাশিক্ষা, পুরুষের মনোহরণের উপায় শিখিবার নিমিত্ত, চিত্তোৎকর্ষ সাধন করিবার উদ্দেশ্যে নহে। অঙ্ক কি বিজ্ঞান, দর্শন কি অন্যান্য দুরূহ শাস্ত্র যুবতীগণের পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে নাই ; কেবল কাব্য, ইতিহাস, আশুবোধ সাহিত্য, উপন্যাস কিঞ্চিৎ ফরাশি ভাষা, নৃত্য, গীত ও বাদ্য, অর্থাৎ যদ্দ্বারা তাঁহারা পুরুষের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিবেন, তাহাই শিখিলে তাঁহাদিগের বিদ্যার পর্য্যবসান হইয়া থাকে। আমাদের দেশে পিতামাতা যেমন কন্যার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হন, ইংলণ্ডে যুবতীগণ আপন আপন বিবাহ জন্য সেইরূপ ব্যস্ত, অথচ মাতাও সাহায্য করিতে ত্রুটি করেন না। সভামধ্যে যুবতী কন্যা স্বাধীনতা প্রকাশ করেন না, সর্ব্বজন মনোরঞ্জিনী ও চারুশীলা হন। সকল বিষয়েই আপনাদিগকে স্নেহশীল ও সুকুমার বলিয়া পরিচয় দেন, যথার্থ মনের ভাব কখনই প্রকাশ করেন না। এরূপ চতুরতা নিতান্ত গর্হিত না হইতেও পারে, কিন্তু ইহা দ্বারা যে মানব-প্রকৃতি অতি অশ্রদ্ধেয় হয়, তাহার কোন সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে যে বিবাহপ্রণালী প্রচলিত আছে, অনেকে তাহার নিন্দাবাদ করিয়া থাকেন। বস্তুত যে প্রথার পরতন্ত্র হইয়া দশম বর্ষীয়া বালিকার স্কন্ধে দুর্বহ চিন্তার ভার অর্পিত হয়, এবং চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে সে গর্ভবতী হইয়া আপন শরীর ও প্রসূত সন্তানের স্বাস্থ্য চিরকালের নিমিত্ত ভগ্ন করিয়া ফেলে, এমন প্রথা যে অতি গর্হিত ও দোষাবহ তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু ইংলণ্ডীয় যুবকগণ স্বেচ্ছামত দারপরিগ্রহ প্রথানুসারে স্বানুরূপ স্বভাবযুক্ত রমণী বাছিয়া লইতে পারেন, সুতরাং বিনা বিবাদ বিসম্বাদে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ও চিরকাল দাম্পত্য প্রণয়ের সুখসম্ভোগের অমোঘ উপায় স্থির করিতে পারেন—যিনি একথা বলেন, তিনি হয় ইংরাজী কুসংস্কারাবিষ্ট, নয় নিজে প্রেম-সরোবরে নিমগ্ন।"



পার্লামেণ্ট মহাসভায় গিয়া রমেশচন্দ্র, গ্লাডষ্টোন, ডিজ্‌রেলী, চেম্বার্লেন প্রভৃতি রাজনৈতিক ধুরন্ধরগণের বক্তৃতা শ্রবণ করিতেন। মহাত্মা ব্রাইট ও ভারতহিতৈষী ফসেট তাঁহাকে বন্ধুর ন্যায় সমাদর করিতেন। ১৮৮৬ সালে স্বর্গীয় লালমোহণ ঘোষ পার্লামেণ্টের সভ্য হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। রমেশচন্দ্র লিখিয়াছেন ঃ—

"I was present at a stirring speech which Ghose made to his constituent and which awakened great enthusiasm in his favour.....Ghose got bespattered with mud once when driving through the conservative side of the town, and Evelyn, the Conservative candidate, got a similar compliment paid to him when driving through liberal ranks !"

অক্সফোর্ডে গিয়া রমেশচন্দ্র আচার্য্য ম্যাক্সমূলারের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, সেই লোকবিশ্রুত অধ্যাপক যথেষ্ট আদর ও সম্মান প্রদর্শন করেন। যে অরণীকাষ্ঠ সংঘর্ষণে বৈদিক ঋষিগণ অগ্নি উৎপাদন করিতেন, অক্সফোর্ডে সেই কাষ্ঠের এক টুকরা দর্শন করিয়া রমেশচন্দ্র প্রীতি লাভ করেন।

১৮৮৬ সালের ২২শে জুলাই, রমেশচন্দ্র, তাঁহার অগ্রজ যোগেশচন্দ্র ও বন্ধু শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুপ্ত, এই তিন জন বঙ্গবাসী, নরোয়ে দেশ দর্শনার্থ ষ্টীমারে ইংলণ্ড ত্যাগ করেন। ইতঃপূর্ব্বে কোনও বাঙ্গালী ঐ শীত প্রধান দেশে গমন করেন নাই। রমেশচন্দ্র লিখিয়াছেন ঃ—

"The presence of three tourists from far off India in these northern seas struck many on board. A Norwegian, who is an English Consul, exchanged cards with us remarking that he had never met, and probably may never again meet people from Calcutta in his own native country !"

২৯শে জুলাই তাঁহারা হামারফেষ্ট নগরে উপনীত হইলেন—ইহার উত্তরে ইউরোপে আর কোনও নগর নাই ! দুই ঘণ্টার মধ্যে তাঁহারা নর্থকেপ বা উত্তর অন্তরীপে আসিয়া পৌঁছিলেন। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে উত্তর অন্তরীপে সূর্য্যদেব একবারও অস্ত যান না, এবং অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে তিনি তথায় একবারও উদিত হন না। নর্থকেপে উপস্থিত হইয়া রমেশচন্দ্রের অন্তঃকরণে যে ভাবস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তিনি তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই কয় পংক্তি পাঠকালে অশ্রুরোধ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে।

"We had reached the point where Europe ends, where the habitation of man terminates, and where the great unknown polar sea begins. It is impossible to describe the exaltation which the tourists felt as these ideas waked in their minds. Groups of Germans sang their national songs... and Americans hoisted their national flag—stripes and stars—over a stick, and drank to the formation of a universal Republic of peace. I will not conceal the pain and humiliation which I felt on that memorable night, among representatives of the free and advancing nations of the earth, rejoicing in their national greatness.....I felt within me that I had no place beside them."

সুইডেন দেশে রেলওয়ে ষ্টেশনে উদরপূর্ত্তির বন্দোবস্ত নূতন রকমের। একটা প্রকাণ্ড টেবিলের উপর ফল, কেক, মাখন ইত্যাদি স্তূপাকারে সাজান থাকে। ইউরোপের অন্যান্য দেশের ন্যায় সেখানে খানসামায় পরিবেশন করে না। রেল-যাত্রীগণ কাঁটা, চামচ, সানক ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া, টেবিলের দ্রব্য সম্ভার হইতে, যাহার যত খুসি জিনিস লইয়া, গলধঃকরণ করে। রমেশচন্দ্র লিখিয়াছেন ঃ—

"I liked this kind of arrangement, being especially blessed with a good appetite and a strong partiality for cream."

ফ্রান্সের রাজধানী পারিস নগরের ড্রেনের মধ্যে লাঠান হস্তে করিয়া ঘুরিয়া, রমেশচন্দ্র প্রচুর আনন্দ উপভোগ করেন। বলা বাহুল্য এই ড্রেনে মলমূত্রাদি নিক্ষিপ্ত হয় না। তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

"The underground drains of Paris are lofty arched passages, running for miles and miles together in different directions, through which one may walk or go in boats:..... As we walked through these drains, each with a lantern in his hand and saw the long lines of sub-terranean passages running in all directions under the town, we were struck with wonder."

হলণ্ডের রাজধানী আমষ্টার্ডেম নগর দর্শনে রমেশচন্দ্র বিস্মিত হইয়াছিলেন। এই নগর প্রায় নবতি দ্বীপের সমাহার এবং ঐ দ্বীপগুলি প্রায় তিন শত সেতু দ্বারা গ্রথিত। আমেষ্টার্ডেম নগরের জমিতে পাঁক এত বেশী, যে



ভিতের মধ্যে বড় বড় কাটের খোঁটা না পুতিলে, ইমারত তৈয়ারি অসম্ভব। ঐ নগরের রাজপ্রাসাদ ও প্রধান গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিতে যথাক্রমে সাড়ে তের হাজার ও ছয় হাজার খোঁটার প্রয়োজন হইয়াছিল। ওলন্দাজগণ স্পর্দ্ধার সহিত বলে "God made the sea, we made the Shore."

ইটালীতে গিয়া রমেশচন্দ্র হার্কুলেনিয়ম ও পম্পিয়াই নগরদ্বয়ের ধ্বংসাবশেষ অবলোকন করেন। প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আগ্নেয় গিরিস্রাবে ঐ দুইটী নগর প্রোথিত হয়। ভূগর্ভে আরোহণ করিয়া রমেশচন্দ্র দেখিলেন, যে অনেকগুলি গৃহের কিছুমাত্র বিকৃতি হয় নাই, এবং বেশ্যালয়গুলির দ্বারে অশ্লীলচিহ্ন খোদিত ছিল। যে আগ্নেয়গিরি প্রসূত কর্দ্দম ও ভস্মে উক্ত নগরদ্বয় বিধ্বস্ত হয়, রমেশচন্দ্র সেই ভিসুভিয়স্ পর্ব্বতের চূড়ায় আরোহণ করিয়াছিলেন।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া, রমেশচন্দ্র পাবনার ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন। তথায় ছয় মাস থাকিবার পর, তিনি ময়মনসিংহে গিয়া সর্ব্বত্র লোকরঞ্জক শাসনকর্ত্তা বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। ময়মনসিংহ হইতে বিদায়কালে তিনি যে কয়খানি অভিনন্দন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার একখানির কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল ঃ—

"যাবে কি হে মহামতি যাবে কি তুমি এখনি ?
এত ত্বরা চলে যাবে স্বপনেও নাহি জানি।
সদা সহাস্য বদন, প্রফুল্ল যুগ্ম নয়ন,
কেমনে ভুলিব তোমার প্রেমপূর্ণ মিষ্টবাণী।
অতি ভদ্র ব্যবহারে, তুষিয়াছ সবাকারে,
তাই তোমারে ঘরে ঘরে, আশীর্ব্বাদ করে শুনি॥
কত যত্ন কত শ্রমে, ভ্রমিয়াছ গ্রামে গ্রামে,
কাঁপিয়াছে দস্যুগণ দণ্ডের বিধান শুনি।
স্থাপিয়াছ শান্তি দেশে, প্রশান্ত গম্ভীর বেশে,
গিয়াছ সর্ব্বত্র তুমি, প্রীতির আহ্বান শুনি।
সারস্বত রঙ্গভূমে, জমিদার সম্মিলনে,
খাটিয়াছ মনে প্রাণে, ডাকিয়াছে যে যখনই॥
তুমি বঙ্গের অলঙ্কার, গাম্ভীর্য্যের পূর্ণাধার,
কি পাপে এ হেন ধনে, হারাই তাহা নাহি জানি।

ধিক্‌রে বরষা তোরে, তোমারই তো অত্যাচারে,
ছাড়ি চলিল আমারে বঙ্গের উজ্জ্বল মণি ॥
নিম্ন ভূমি ভিজা স্থান, নাহি উচ্চ বর্দ্ধমান,
কেমনে রাখিব তোমায় স্বাস্থ্যের করিয়া হানি।
যাও তবে প্রিয়তম, এই আশীর্ব্বাদ মম,
রাখিবেন সুখে তোমায় জগৎ জননী যিনি ॥"

১৮৯০ সালের প্রারম্ভে রমেশচন্দ্র বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। তথায় কয়েক মাস থাকিয়া তিনি দিনাজপুরে বদলি হন। ১৮৯১ সালে তিনি মেদিনীপুর জেলার শাসনভার প্রাপ্ত হন।

১৮৯২ সালে রমেশচন্দ্র সি, আই, ই, উপাধিতে ভূষিত হন।

ম্যালেরিয়া ও বাতরোগ হইতে মুক্ত হইবার জন্য তিনি ১৮৮২ সালের পূজার অবকাশে কাশ্মীর ও পঞ্জাবে ভ্রমণ করেন। তাহাতে আশানুরূপ ফললাভ না হওয়ায়, তিনি ১৮৯৩ সালের আগষ্ট মাসে, জর্ম্মনিদেশের অন্তঃপাতী ওয়াইজবেডেন নগরে Hydropathy মতে চিকিৎসার্থ গমন করেন, এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যে যথেষ্ট উপকার প্রাপ্ত হন। তথায় অবস্থানকালে তিনি সংস্কৃত কিরাতার্জ্জুন নটেকের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছিলেন ও জর্ম্মন ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে রমেশচন্দ্র বর্দ্ধমানের অস্থায়ী কমিশনর নিযুক্ত হন। ইহার পূর্ব্বে আর কোনও ভারতবাসী সিভিলিয়ান এই উচ্চ পদ প্রাপ্ত হন নাই। এই সময়ে তিনি কয়েক মাসের জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার বর্দ্ধমানে কমিশনরী উপলক্ষে রমেশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

"The appointment naturally attracted some attention, and was regarded as a doubtful experiment."

বর্দ্ধমানের পর রমেশচন্দ্র উড়িষ্যার অস্থায়ী কমিশনরের পদে নিযুক্ত হন। তথায় যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিয়া, ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি সিভিল সার্ভিস হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।

সিভিল সার্ভিসের নিয়মানুসারে তিনি আরও নয় বৎসরকাল রাজকার্য্য করিতে পারিতেন। কেন যে তিনি ছাব্বিশ বৎসর কার্য্য করিয়াই, কমিশনরের ন্যায় দুর্লভ রাজপদ পরিত্যাগ করেন, তৎসম্বন্ধে সংবাদ পত্রে দুইটী



কারণ ঘোষিত হইয়াছিল। এক দলের মতে, রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, সাহিত্য চর্চ্চা ও দেশ সেবায় অধিকতর মনোযোগ দিবার উদ্দেশ্যে তিনি সিভিল সার্ভিস ত্যাগ করেন। আর একদল বলেন, যে কৃষ্ণচর্ম্ম বলিয়া কমিশনর পদে স্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্তি না হওয়ায়, তাঁহার আত্মমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়, এবং তিনি অভিমানে রাজকার্য্য হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। হয়ত, একই সময়ে উপরোক্ত কারণদ্বয়ের সমবায় উপস্থিত হইয়াছিল।

পরবর্ত্তী অধ্যায়ে রমেশচন্দ্রের মাতৃভাষাসেবার বিবরণ দেওয়া হইবে।

শ্রীগৌরহরি সেন।

---

# খোকা।

বিচিত্র ও চিত্র তোর—অপূর্ব্ব উজ্জ্বল!
কেমনে প্রকাশ করি? বল্ ওরে বল!
চারিধারে দুঃখভরা বিষাদের রাশি,
তারি মাঝে তুই খোকা আনন্দের হাসি!
চারিধারে বারিহীন শুষ্ক মরুতল,
তারি মাঝে তুই খোকা এক ফোঁটা জল।
চারিধারে হিংসা দ্বেষ—পূর্ণ অবসাদ,
তারি মাঝে তুই খোকা শুভ আশীর্ব্বাদ।
পুষ্পহীন দীন মঞ্চ নাহি শোভালোক,
তারি মাঝে তুই খোকা বাসন্তী অশোক!
নিবিড় জলদ ঘন আঁধার আকাশ,
তারি মাঝে তুই খোকা বিদ্যুৎ-বিকাশ!
মুগ্ধ কবি কি কহিবে—কি কহিবে আর?
কবির সেতারে তুই আনন্দ ঝঙ্কার!

শ্রীবগলারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

---

# জাপানের স্ত্রীজাতির ইতিহাস

ও

## তাহাদের সঙ্গে হিন্দু ললনাগণের শিক্ষার তারতম্য।

পরম কারুণিক পরমেশ্বর সর্ব্বপ্রথম পুরুষ ও প্রকৃতি সৃষ্টি করেন। তাহা হইতেই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। জাগতিক ইতিহাস পাঠে তদ্বিষয় অবগত হওয়া যায়। যে শক্তির প্রভাবে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হইতেছে—যাঁহার মহিমায় শিব শবরূপে পরিগণিত হন সেই শক্তি কোন ক্রমে উপেক্ষার দ্রব্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। যে শক্তির মাধুর্য্যে জগৎ আত্মহারা—পুরুষপ্রকৃতি ছাড়া সেই শক্তিই আদিশক্তি। জগৎ তাঁহারই উপসনার ব্যতিক্রম ঘটাইলে পৃথিবী জীবশূন্য হইয়া যাইত ভগবৎ মহিমার বিলোপ সাধন হইত—ভূমণ্ডল জড় পদার্থের আবাসভূমিরূপে গণ্য হইত। সেই প্রকৃতিরূপিণী আদিশক্তির সম্মাননা সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বজাতি মধ্যে অনুষ্ঠিত হইলে আর জগৎ নিরানন্দের নিবাসভূমি বলিয়া কেহ ধারণা করিতে পারিত না। অদ্য আমরা পাঠক পাঠিকাগণের অবগতির জন্য সেই স্ত্রী-শক্তির কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিব। স্থল আসিয়া-খণ্ডের অধীন জাপান ও ভারতবর্ষ। উভয় দেশের জলবায়ু, সামাজিক রীতিনীতির পার্থক্য থাকিলেও উভয়স্থলের স্ত্রীজাতির বহু সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

জিনজো নারুসী (Professor Jinzo Naruse ) বলিয়া একজন জাপানী অধ্যাপক জাপ-স্ত্রীগণের উন্নতিকল্পে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তিনি যখন দেখিলেন তদ্দেশীয় বামাগণ শিক্ষার পক্ষপাতিনী নহেন তখনই তিনি জাপান পরিত্যাগ করতঃ বিদেশ যাত্রা করেন। বহুস্থান পরিভ্রমণ করিয়া তিনি আমেরিকায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এই প্রকার পরিভ্রমণের একটি বিশেষ কারণ ছিল। তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য এই বিভিন্নদেশে স্ত্রী-জাতির আচার ব্যবহার কি প্রকার তাহা জানিতে হইবে। তিনি আমেরিকা গমন করিয়া বর্ষত্রয় কাটাইয়াছিলেন। এই সময় মধ্যে তিনি উত্তর ( North ) বিভাগের সমগ্র স্ত্রী-কলেজ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন করেন। তথাকার বামা-কলেজগুলিতে সুনিপুণ শিক্ষার ব্যবস্থা অবলোকন করিয়া তিনি একান্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বহুকালের হৃদয়পোষিত



স্ত্রীশিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা যেন ক্রমশঃ হৃদয়ে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিল। তিনি দেশ পর্য্যটনে সন্তুষ্ট হইয়া বিগত ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া রহিলেন। ইতোমধ্যে দেশের সমগ্র সাধারণ ও সরকারী বালিকা-বিদ্যালয় ও স্ত্রী-কলেজগুলি দর্শন করিয়া লন। এবম্প্রকারে জাপানের ললনাগণের শিক্ষা বিষয়ে সবিশেষ জ্ঞানলাভ করতঃ 'স্ত্রী-শিক্ষা' বিষয়ক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন, ইহা দ্বারা জাপানের জাতীয় দৃষ্টি আকর্ষিত হয় এবং সাধারণে পুস্তকের মর্ম্মগ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। এই সময় হইতেই স্ত্রীজাতির উন্নতি-কল্পে বিবিধ উদ্যোগ আলোচনা চলিতে থাকে। উক্ত পুস্তক পাঠেই যে লোকের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহা নহে। তবে উহা বা ঐ পরিবর্ত্তন যে কালের আবর্ত্তনে সংঘটিত হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। যাহা হউক, ভগবৎ কৃপায় তাঁহার আশা যে পূর্ণ হইতে চলিল তাহাতে তিনি উৎফুল্ল হইলেন। যথা সময়ে কতিপয় "কটো জো গাক্কো" ( Koto Jo Gakko ) স্থাপিত হইল। "কটো জো গাক্কো" জাপানী শব্দ। উহার অর্থ উচ্চশ্রেণীর বালিকা বিদ্যালয় সমূহ ( High Schools for Girls ) উক্ত বিদ্যালয় সমূহ প্রতি বৎসর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। বালিকাগণের সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্ত্তমান উচ্চ বিদ্যালয়াদিতে তাহাদের সকলের স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না। সেইজন্য রাজ্য মধ্যে যত্রতত্র বে-সরকারী ( Private ) বালিকা বিদ্যালয়াদিতে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। তাহা-দের শিক্ষোপযোগী পুস্তক, সংবাদপত্র, মাসিকপত্রিকা প্রভৃতি বহুল পরিমাণে দেশমধ্যে ব্যাপৃত হইতে থাকিল। বর্ত্তমানসময় বালিকাগণের শিক্ষার যেন মাহেন্দ্রক্ষণ-যোগ বলিয়া গৃহীত হইল।

অধ্যাপক জিন-যো-নারুসিই সর্ব্বপ্রথম স্ত্রী শিক্ষাপযোগী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। উহা অধিকদিন হয় নাই। দ্বাদশ বৎসর অতীত হইল স্ত্রী-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথম জাপানের রাজধানী টোকিয়োতে গমন করিয়া উক্ত অধ্যাপক স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা জন-গণমধ্যে রাষ্ট্র করিতে থাকেন। তাঁহাকে এইরূপ আন্দোলন অধিকদিন করিতে হয় নাই। মারকুইস্ ঈটো, মারকুইস্ সাইরণজী, কাউণ্ট অকুমা, ব্যারন উটসুমী ও কিটাবাটেক প্রভৃতি মনীষিগণ জিন-যো-নারুসীর সঙ্গে আসিয়া যোগ দিলেন। তাঁহারা আরও বলিলেন বর্ত্তমান সৎকার্য্যে তাঁহারা

স্ব স্ব সামর্থ্যানুসারে সাহায্য করিতে প্রস্তুত। এই সকল অগ্রণী ব্যক্তির সমবায়ে বিগত ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল তারিখে জাপ-ললনাগণের শিক্ষোপযোগী এক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাপিত হইল। এই প্রকার বিদ্যালয়ের মূল-পত্তন কেবল যে জাপানে সর্ব্বপ্রথম করা হইল তাহা নহে—আসিয়া-খণ্ডের অন্য কুত্রাপি তাহা অদ্যাবধি সংগঠিত হয় নাই। বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে অপরাপর বিষয় যথাসময়ে উক্ত হইবে। অধুনা জাপানের কিঞ্চিৎ পুরাবৃত্ত আলোচনা করা যাউক।

## জাপানের পুরাবৃত্ত—

জাপানের পুরাবৃত্ত অতি বিস্ময়কর। বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও পূর্ব্ব-পুরুষ-পূজার প্রবর্ত্তন হইবার পূর্ব্বে জাপ-বামাগণ দেশের উপর অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। উক্ত ক্ষমতা বৌদ্ধযুগের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। তৎকালে তথায় স্ত্রী, পুরুষ সমাজে সমতুল্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইতেন। পুরাকালে ভারতেও একদিন এমন সময় গিয়াছে যখন স্ত্রী, পুরুষ তুল্য পরিমাণে জ্ঞানার্জ্জনে রত থাকিতেন। তখন পুরুষগণ সর্ব্বগুণের আধার ও স্ত্রীগণ অকর্ম্মণ্য ইত্যাকার ধারণা জনসমাজে পরিব্যাপ্ত হয় নাই। তখন রাজনৈতিক আন্দোলনে জাপ রমণীগণ বিলক্ষণ বুদ্ধি মত্তার পরিচয় প্রদান করিত। তথায় ক্রমান্বয়ে নয়জন স্ত্রীলোক স্বীয় বুদ্ধি বলে সিংহাসনাধিরূঢ়া হইয়া জাপানবাসীগণের উপর রাজশক্তি পরিচালনা করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন। তথায় প্রমাণিত হইয়াছে সাধারণতঃ স্ত্রীজাতি পুরুষগণাপেক্ষা শারীরিক, মানসিক বা নৈতিক বলে কোন অংশে হেয় নহে। তাহারা রাজপুত রমণীগণের ন্যায় সৎসাহসীকতার পরিচয় প্রদান করিতে এবং সতীত্বরক্ষা কাংণে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে কিঞ্চিৎ মাত্রও কুণ্ঠিত হইতেন না। সাহিত্য বা কাব্যে তাহারা পুরুষগণাপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। সে সময়ের স্ত্রী চরিত সাহিত্য-গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহাদের নৈতিক চরিত্র নিষ্কলঙ্ক ছিল। জাগতিক ইতিহাস তাহার সম্মান ও প্রশংসাবাদ করিয়া থাকে। এই বাক্যগুলি ভারতীয় রমণীগণের পক্ষে সর্ব্বদা প্রযোজ্য। জাপ-ললনাগণের সাধারণ চরিত্র উৎফুল্ল এবং তাহারা উদ্যমশীলা। তাহাদের চিত্তবিমোহন-শক্তি অতুলনীয়, এবম্প্রকার শক্তি লইয়াই যেন তাহারা জন্মগ্রহণ করিত। তাহাদের জন্ম



প্রাচীন সময়ে কোন প্রকার শিক্ষালয় বিদ্যমান ছিল না তথাপি তাহারা পুরুষ জাতি অপেক্ষা বিদ্যা বা বুদ্ধিমত্তায় কোন অংশে ন্যূন ছিল না। এই প্রকার জাপানের পুরাকালীন রমণীগণের ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সময় জাপ-স্ত্রীগণের গৌরব-রবি অপ্রতিহত ভাবে কর বিস্তার করিতেছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম এবং পূর্ব্ব পুরুষ-পূজা দেশ মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া এক অভিনব ব্যাপার সংঘটিত হইল। স্ত্রীজাতি কি যেন এক নবভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। জাপানবাসীর বলে রাজ্য মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচলন স্ত্রীগণ দ্বারাই পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তাহাদের ঐকান্তিক প্রার্থনায় যেন ভগবান চক্ষুরুন্মিলন করিলে। বৌদ্ধধর্ম্ম দেশের সর্ব্বত্র স্বল্পকাল মধ্যে আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইল। এই প্রকারে জাপানবাসীগণের হৃদয় মন্দির শান্তিময়ের আবাসভূমি হইয়া পড়িল। উক্ত দেশবাসীগণ সদানন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিল।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম আনয়ন করিবার অগ্রণী জাপ-ললনাগণ। বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে গভীর তথ্য পরিজ্ঞাপনার্থে ভারতবর্ষে তিনটি স্ত্রীলোককে প্রেরণ করা হয়। তাঁহাদের নাম যথাক্রমে জেনসিনী ( Jenshinni ), জেনজোনী ( Jengoni ), কেইজেনী ( Keizenni )। এই ললনাত্রয় প্রখ্যাতযশা ছিলেন। ইহারা কেবল ধার্ম্মিক ছিলেন না—রাজনীতি, সাহিত্য, জীবনচরিত, প্রভৃতি বহু বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। তথাকার বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থে ইঁহাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তৎকালে আরও বহু বিদুষী ললনা জ্ঞানজ্যোতিতে দিগবিদিক উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন। তখন বহু স্ত্রী-রচিত গ্রন্থ লিখিত হয়। জাপানের কাব্য এবং সাহিত্য ঐ সময়েই সবিশেষ উন্নতিলাভ করে। এতদ্বিষয়ে মল্লিখিত সুপ্রভাত পত্রিকার "জাপানের সাহিত্য" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

সুখ এবং দুঃখ চক্রাকারে পরিবর্ত্তিত হয়। জাপানের স্ত্রীগণের অবস্থাও তদ্রূপ হইয়া উঠিল। তাহাদের গৌরব অস্তমিত হইতে আরম্ভ করিল তাহাদের সে উদ্যমশীলতা, উৎফুল্লতা কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গেল। জাপ স্ত্রীলোকগণ আর এক পদও অন্দর মহলের বহির্ভাগে অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। এইরূপে তাহারা আংশিক অর্গলবদ্ধ হইয়া পড়িল। তাহাদের বিদ্যা বুদ্ধি যেন কাল আসিয়া গ্রাস করিল। তাহাদের বিদ্যার মধ্যে শিল্পকার্য্য, সূচিকার্য্য, রন্ধনকার্য্য চা-প্রস্তুত এবং পরিবেশন, পুষ্পশয্যা এবং

যৎকিঞ্চিৎ লিখন ও পঠন। তাহাদের মানসিক চর্চ্চা অবহেলার মধ্যে পরিগণিত হইল। বালিকাগণের নৈতিক শিক্ষার মধ্যে তিনটী কার্য্য উল্লেখ যোগ্য। (১) পিতা মাতা যে প্রকার চরিত্রেরই হউন না তাহাদের পরিণয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জনক জননীর সম্পূর্ণ তত্বাবধানে থাকিতে হইবে। (২) বিবাহিতা হইলে স্বামীর অধীনে কালাতিপাত করিতে হইবে। (৩) বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রগণের অধীনে বসবাস করা আইনতঃ সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাদিগকে এইরূপ বন্ধনের ভিতর চিরকাল কালাতিপাত করিতে হইবে। আমাদের ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র উক্ত নিয়মানুযায়ী কার্য্য হইয়া থাকে। জাপানের সঙ্গে ভারতের এই বিষয়ে বিলক্ষণ সমতা দৃষ্ট হয়। তথাকার স্ত্রীলোকগণের ইহাই দ্বিতীয় অবস্থা বুঝিতে হইবে।

যখন তাহারা পাশ্চাত্য শিক্ষালোকে বিভোর হইয়া উঠিল তখন তাহাদের তৃতীয়াবস্থা বুঝিতে হইবে। এইরূপে তাহারা নব আলোকে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। পুরাতন সামাজিক প্রথা সকল খণ্ডিত হইয়া বিলুপ্ত হইয়া যাইতে লাগিল। জাপান যখন বুঝিল পাশ্চাত্য-জ্ঞান-জ্যোতি না হইলে জাপানের উন্নতি সাধন সুদূরপরাহত তখনই উক্ত শিক্ষা বিষয়ে সকলের আগ্রহ জন্মিতে আরম্ভ করিল। যখন শিক্ষা প্রথা দেশের পল্লীতে পল্লীতে, গ্রামে গ্রামে, রাজধানীতে পর্য্যন্ত ব্যাপৃত হইয়া পড়িল স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তখনই সকলে উপলব্ধি করণে সমর্থ হইল। স্থানে স্থানে বালক এবং বালিকাগণের শিক্ষা প্রদান জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাপিত হইল। এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায় জাপানের বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বৈদেশিক ধর্ম্ম সম্প্রদায়গণ প্রধান উদ্যোগী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তথাকার সরকার বাহাদুর এই শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। সকল বালক এবং বালিকাগণের ছয় হইতে বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষালাভ করিবার হুকুম প্রদত্ত হইল। তদনন্তর শিক্ষা সাধারণ লোকের জন্য নহে। অবশেষে ত্রৈবার্ষিক বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়া পুরুষ এবং স্ত্রীগণের প্রবেশদ্বার পৃথক করিয়া প্রস্তুত করা হইল। তাহার কিয়দ্দিন অতিবাহিত হইয়া গেলে রাজকীয় উচ্চ ত্রৈবার্ষিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। উহা কেবল স্ত্রীলোকগণের জন্য। ইহাই বিশ্ববিদ্যালয় হইবার পূর্ব্বে সর্ব্ব প্রধান ছিল। বিগত ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৯১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্ত্রীশিক্ষার ক্রমোন্নতি দৃষ্ট হইতেছে। বালিকাগণ উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে তাহাদের হৃদয় উদার এবং ভাব উন্নত হইতে থাকে। তাহাদের জনক জননী পুরাতন



প্রথানুযায়ী শিক্ষা প্রাপ্ত বলিয়া তাহাদের কন্যাগণের হৃদয়ে অসামঞ্জস্য ভাবের সঙ্গে কোন প্রকারে সমতা হইতে পারেনা সুতরাং পিতা মাতা এবং পুত্র কন্যাগণের মধ্যে দ্বন্দ্বের ভাব লক্ষিত হয়। এই প্রকারে সংসার একটি ঘোর অশান্তির আগার হইয়া পড়ে। জাপানে এই ভাবটি বিশেষভাবে দৃষ্ট হইত। অশিক্ষিত ব্যক্তিবৃন্দ কিন্তু ইহার ভাব সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। তাহারা ভুতকালের প্রথাই সর্ব্বদা গ্রহণীয় ইহাই মনে করে এবং বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে অসংখ্য দোষ, ত্রুটী দর্শন করে। ইহাও সংসার এবং দেশকে অশান্তিময় করিয়া তুলে। বস্তুতঃ অধিকাংশ স্ত্রীলোকগণই আমাদের দেশে যৎসামান্য শিক্ষালাভ করিয়া "অল্পবিদ্যাভয়ঙ্করী" হইয়া উঠে জাপানেও ঐরূপ হইত। ঐ প্রকার শিক্ষায় জীবগণকে স্বার্থপর, একদেশদর্শী, আত্মম্ভরী করিয়া দেয়। অতিরিক্ত শিক্ষিত হইলে আদর্শ রমণীগণের মনের ভাব বিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এমন কি স্ত্রীগণের ভূষণ যে কমনীয়তা তাহা পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হয়। জাপানবাসীগণ যেরূপ ভয় করিয়াছিল তাহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। তাই বলিয়া যে জাপানে আদর্শ রমণী নাই তাহা বলা যায় না। আমরা যাহাকে আদর্শ বলি তাহার ব্যত্যয় ঘটিয়াছে মাত্র।

যাহা হউক, বিদ্যালয়াদিতে যে সকল বালিকা শিক্ষা লাভ করিতে লাগিল তাহাদের কতিপয় গুণ নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইল। কিপ্রকারে তাহারা উত্তম স্ত্রী এবং সৎমাতা বলিয়া গণ্য হইতে পারে তাহার উপায় শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল। এখন এবম্প্রকার শিক্ষারই প্রয়োজন হইয়াছে এবং লোকে তাহাই চায়।

অধুনা আমরা জাপানের স্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

## জাপানে স্ত্রী-বিশ্ববিদ্যালয়।

উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনটি বিভাগ আছে। (১) গার্হস্থ্য বিভাগ, (২) জাপ-সাহিত্য বিভাগ ও (৩) ইংরাজি সাহিত্য বিভাগ। জাপ রমণীগণ যে কোন বিভাগে প্রবেশলাভ করিতে পারে। সর্ব্ব প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় খুলিবার সময় তথাকার কর্ত্তৃপক্ষগণ মনে করিয়াছিলেন প্রত্যেক বিভাগে ৩০টি ছাত্রীর অধিক ভর্ত্তি হইবে না। কিন্তু উক্ত বিভাগত্রয় খুলিবামাত্র প্রায় এক শতটি করিয়া ছাত্রী প্রথম দুই বিভাগে ভর্ত্তি হইল। তাহারা একুনে আড়াই শত

হইল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটী পরীক্ষার প্রস্তুত-বিভাগ খোলা হইল। তাহাতে তিনশত ছাত্রী জুটিল। এই প্রকারে প্রথম বর্ষে ৫০০ শত ছাত্রী, দ্বিতীয় বর্ষে ৮ শত ও তৃতীয় বর্ষে এক হাজার ছাত্রী হইয়াছিল। ইহাতেই বুঝিতে হইবে জাপানে বালিকাগণের শিক্ষা করিবার আগ্রহ কত। এক্ষণে বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী অবলম্বিত হইলে তাহা সুফল কি কুফল প্রসব করিবে তদ্বিষয়ে বিশেষ চিন্তা আবশ্যক। এক্ষণে ঐ শিক্ষা শিল্প, সাহিত্য, গান এবং অপরাপর বহু কলা বিদ্যায় বিভক্ত হইয়াছে এবং জাপ রমণীগণ তাহাই শিক্ষা করিতেছে। কিন্তু তাহাদের মানসিক উন্নতির দিকে কেহই লক্ষ্য করিতেছে না। এই বিষয়ে জাপানবাসীগণ বিলক্ষণ ভুল করিতেছে। বৈজ্ঞানিক এবং নৈতিক বিষয়ে তাহাদের বহুল পরিমাণে উন্নত করা যাইতে পারে। এই সকল বিষয়ে তাহাদের মন গঠিত হইলে তাহারা অপরাপর সাংসারিক কার্য্যেও নিপুণতার পরিচয় দিতে পারে। যাঁহারা স্ত্রীগণকে সৎশিক্ষাদান করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের পূর্ব্বোল্লিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। মানসিক উন্নতি সাধিত না হইলে স্ত্রীলোকের কি প্রকারে উন্নতি হইতে পারে। মানসিক উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। জাপানে যে বিষয়ের অভাব লক্ষিত হইতেছে আমাদের ভারতবর্ষেও সেই অভাবই সমপরিমাণে দৃষ্ট হয়। ইহার প্রতিবিধানের দিকে সকলেরই যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। আর একটি বিষয়ের দিকে সকলেরই সমদৃষ্টি থাকা আবশ্যক। যে কয়েক বৎসর বালিকাগণ পাঠাভ্যাসে রত থাকে ততদিন তাহারা গৃহকর্ম্মাদির কোন সংবাদই লয় না সুতরাং গৃহস্থের করণোপযোগী কোন কার্য্যই শিক্ষা করিবার অবসর পায় না; অতএব বালিকাগণের উক্ত গৃহকর্ম্মাদি শিক্ষা লাভ করিবার জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যপদেশে যদ্দ্বারা নিপুণ এবং কৃতকর্ম্মা গৃহিণীর ন্যায় গৃহকার্য্য শিক্ষা করিতে পারে তবে দেশের একটি অভাব ঘুচিয়া যায়। এই কথা লইয়া জাপানে অত্যন্ত আন্দোলন চলিতেছে। কিন্তু ইহার প্রতিবিধানের কেহই উপায় করিতেছে না। জাপানের এইরূপ অবস্থা। আমাদের দেশেও যে বালিকাগণ অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত শিক্ষাকার্য্যে রত থাকে তাহারা গৃহস্থালীর কার্য্যাদি কিছুই শিক্ষা করে না। উহাতে তাহারা যখন স্বামীগৃহে গমন করে তখন তাহাদের লাঞ্ছনার একশেষ হইতে থাকে। পিতামাতার এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।



জাপানে দূরদেশ হইতে আগতা প্রায় ৫ শত ছাত্রী বোর্ডিং বা ছাত্রাবাসে বাস করে। তথায় গৃহকার্য্য শিক্ষা করিবার জন্য তথাকার কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ যত্ন লইতেছেন; ছাত্রীগণের বাসের জন্য ১৭ খানি বাটী প্রস্তুত হইয়াছে। প্রত্যেক বাড়ীতে ২ টি করিয়া ছাত্রী বাস করিতে পারে এমত ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহারা তাহাদের পরিচারিকাকে মাতৃরূপে গণ্য করে। ছাত্রীগণ পরস্পর ভগিনীরূপে বসবাস করে। তাহাদের বহুকার্য্য নিজ হস্ত দ্বারা করিতে হয়। তাহাতে তাহারা গৃহস্থালীর কার্য্যাদি বিলক্ষণ শিক্ষা করিতে পারে। কখন কখন তাহাদিগকে রান্না, কাপড়কাচা, গৃহ-সজ্জা প্রভৃতি বহু কার্য্য করিয়া লইতে হয়। বোর্ডিংয়ের জাপ-বালিকাগণ গৃহ হইতে বহুদূরে থাকিলেও গৃহের কার্য্যাদি শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়া থাকে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে জাপ-বালিকা ভিন্ন অপর কোন দেশের বালিকা শিক্ষার্থীরূপে গ্রহণ করা হয় না। ইহাই তথাকার নিয়ম। তাহারা স্বদেশের উত্তম প্রথাগুলি কোন প্রকারেই রহিত করে নাই, কিন্তু বিদেশীয় সুপ্রথাগুলিও গ্রহণ করিতে ত্রুটী করে নাই। ইহাই তাহাদের 'পলিসী' বা রীতি। জাপানের ললনাগণ বিভিন্ন দেশের স্ত্রীগণের আচার ব্যবহার, শিক্ষাপদ্ধতি শিক্ষা করিতে অত্যন্ত ভালবাসে, কিন্তু মন্দ অংশ ত্যাগ করিয়া সৎ বিষয় গ্রহণ করে। তাহাদের মত স্ত্রীলোকগণ স্ত্রীলোকের ন্যায় শিক্ষালাভ করিবে না তাহারা সাধারণ নগরবাসীর ন্যায় জ্ঞানলাভ করিবে, তবেই তাহাদের উন্নতি হইবে। জাপানবাসীগণ স্ত্রীলোককে কেমন সম্মান করেন, তাহার আভাষ দিতেছি। তাহারা বলে, আমরা স্ত্রীগণকে আত্মার ন্যায় মনে করিয়া শিক্ষা দান করিব। পরে তাহাদিগকে সমাজের লোক বলিয়া গ্রহণ করিব। সর্ব্বশেষে শক্তিরূপিণী বলিয়া মান্য করিব; তাহারা এই প্রকারে স্ত্রীগণকে সম্মান করিতে না জানিলে অত্যল্প সময়ের মধ্যে এত উন্নতি লাভ করিতে পারিত না।

শ্রীগণপতি রায়।

# মানসী।

হে মানসি, মম পুরে আছ সবটুকু জুড়ে
তবু নাহি হেরি রূপ তব ;
বাহির হইতে ছানি আনিতেছ বক্ষে টানি
রূপ রস গন্ধ নব নব।
আপনি দাও না ধরা, তবু এই বসুন্ধরা
চরণে লুটিয়া পড়ে আসি ;
কি মোহের ইন্দ্রধনু রচিল অরূপ তনু,
মূরছিত তাহে রূপরাশি !
শ্রাবনে আকুল ঝড়ে কুন্তল লুটায়ে পড়ে
চমকে চাহনী বিজলীতে ;
বরষার ধারে তার বিগলিত বেদনার
কি মুরতি পারি যে লখিতে !
শরতে সুনীল নভে শব্দহারা গীতরবে
জোছনার যে মূর্চ্ছনা বাজে,
আলোতে ছায়াতে মেশা মদির স্বপ্নের নেশা
স্খলিত বিহ্বল তারি মাঝে।
বসন্তের আগমনে মঞ্জু গুঞ্জরিত বনে
কুসুমের পরাগ সৌরভে,
বকুল শাখার কোলে তোমার ঝুলন দোলে
পল্লব-মর্ম্মর কলরবে।
নিত্য নব নব রূপে এই মত চুপে চুপে
ভরিয়া উঠিছ তুমি মনে ;
বিচিত্র সে গীতধারা পদতলে পথহারা
বিজড়িত নুপুর-নিক্কনে।
মোর অন্তঃপুরে হেরি হৃদয় গগন ঘেরি
তারার আরতি শিখা জ্বলে ;
সব মধু গন্ধ ভার নিঙাড়ি ঢালিছ সার
আমার এ চিত্ত শতদলে।



সব খানে বিশ্বমাঝে বাহিরাও কত সাজে
তবু নাহি হেরি তব রূপ,
কেবলি রয়েছে জানি ভরিয়া হৃদয়খানি
মানস-মুরতি অপরূপ !

শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

# বাঙ্গালা-নাটক-সমালোচনা।

## [ নূরজাহান ]

( পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর। )

(চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্য—মন্ত্রী আসফের বহির্ব্বাটী আর সময়টা প্রভাত।—এখানে আবার আমাদের সেই চিরপরিচিত তাড়িখানার 'মেম্বর'গুলি অর্থাৎ কবি দ্বিজেন্দ্রলালের কল্পিত 'রাজসভাসদ্‌গণ' বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন। কথোপকথনের বিষয়টা—সেই পুরাতন পদার্থ "বন্দররাজ"।) এবার আর তাহাকে "বান্দর-রাজ" বলিয়া বা "কুম্ভকর্ণের নাতি" বলিয়া ইয়ারকি করা হইতেছে না। এবার কথোপকথনের মুখটায় রাজ্যে রাজ্ঞী-নূরজাহাঁনের প্রভাব ও জাহাঁগীরের খাম-খেয়ালীর আলোচনা সুরু করিয়া বন্দর-রাজের ভুঁড়ির পরিধিটা মাপিয়া তাহা কর্ত্তৃক কুমার খসরুর খুনের কথার আলোচনা জমিয়া উঠিবামাত্র বন্দর-রাজ প্রবেশ করিলেন।—আর যায় কোথা ?—তাড়িখানায় হল্লা পড়িয়া গেল ?—সেই পুরাতন ইয়ারকি কয়টারই মায়া কাটাইতে না পারিয়া চতুর্থ সভাসদ্ বলিলেন—"রাজা থেকে একেবারে মহারাজ—কি লাফটাই দিয়েছেন। বান্দরের রাজার উপযুক্ত লাফ!"—প্রথম সভাসদ্ বলিলেন,—"আবার পাক খাচ্ছে দেখ। পাক খাচ্ছে দেখ,—উঃ কি ঘৃণ্য!" দ্বিতীয় সভাসদ্ বলিলেন—"ঠিক কেন্নুয়ের মত।" তার পর এই মজলিশে অন্যান্য বারের মত মদ বা তাড়ির অন্তঃসলিলার ন্যায় স্রোত বহিল কি না, কবি তাহা না লিখিলেও—তাহা যে চলিল, তাহা আমরা তৎপরবর্ত্তী কর্ম্ম দেখিয়া বুঝিতে পারি, কিন্তু কবি সেটার দুর্গন্ধ ঢাকিবার জন্য ইস্তাম্বুল আতরের একখানা 'লেবেল' চাপা দিয়া দিলেন—লেবেল খানি এইরূপ—

প্রথম সভাসদ্ বলিলেন—"কর্ত্তব্য মাত্র! পাষণ্ড! তোমাকে দেখাচ্ছি—" বলিয়া সহসা উঠিয়া তাহাকে পদাঘাত করিলেন,—অর্থাৎ কুমার খসরুর হত্যার জন্য বন্দরাজের শাস্তির ভারটা তিনি বিবেকের দংশনে—ঘৃণায় নিজ হস্তেইগ্রহণ করিলেন।

তাহার পর অন্য সকলে—

"কি কর! কি কর?—বলিয়া ছাড়াইয়া দিলেন।

বন্দররাজ। উঃ! বড় লেগেছে!

১ম সভা। বড় লেগেছে! বেটার আস্পর্দ্ধা! আবার বলে লেগেছে।

৪র্থ সভা। হাঁ আস্পর্দ্ধাই বটে। ওহে করিম! আমার বড় একটা গান পাচ্ছে। না গেয়ে থাক্‌তে পাচ্ছি না।—শোন।—

১ম সভা। রেখে দাও তোমার গান। আমি একবার (রাজার প্রতি কঠোর দৃষ্টিপাত)।

৪র্থ সভা। আরে শোন—(পলায়নোদ্যত রাজাকে ধরিয়া) শুনে যান মহারাজ!'—ইহার পরেই গান—"আমি যদি পীঠে তোর ঐ, লাথি একটা মারিই রাগে,—তোর ত আস্পর্দ্ধা বড়, পীঠে যে তোর ব্যথা লাগে।"—ইত্যাদি।

সভাসদ্ মহাশয়গুলির বাক্যের বাহার,—ভদ্রতার বাহার—ন্যায়ের ওকালতি করার বাহার এবং অন্যায়ের প্রতি তীব্র আক্রমণের বাহার প্রভৃতি যাহা কিছু আবশ্যক,—কবি সমস্ত ঐ কয়টা বাক্যে বেশ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তিনি সে জন্য আমাদের ধন্যবাদের পাত্র সন্দেহ নাই, কারণ, নবনাটকের জমীদার গবেশবাবুর মো'সাহেবটি কেবল "জল উঁচু-তো উঁচু,—নীচু ত নীচু" করিয়া কোনরূপে জীবনযাত্রাটা নির্ব্বাহের উপায় মাত্র করিত—শাহান্-শাহ্ দিল্লীর বাদ্‌শাহের দরবারী মোসাহেবীর এমন উচ্চ আদর্শ সেই পাড়াগেঁয়ে জমীদারের সভাসদ্ কল্পনাতেই আনিতে পারে নাই, কাজেই নাটুকে নারাণের সে দৃশ্যটা লেখাই বৃথা হইয়া গিয়াছে! তাহার উপর—এটাএকটা নিশ্চয়ই অঘটন-ঘটন-পটিয়সীর লীলা বলিতে হইবে,—রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর বাড়ীতে প্রাতঃকালে, বতকগুলা লোক ঢুকিয়া লাথালাথী, চীৎকার, গান, প্রভৃতি গণ্ডগোল বাধাইয়া দিয়াছে!—ব্যাপারটা কবিবরের সুমার্জ্জিত কল্পনায় কিরূপে দেশকাল পাত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া নাটকে প্রবেশ করিল, তাহা আমরা ধারণা করিতে অক্ষম। তার পর আসফ আসিয়া



জাহাঁগীরের কাণ বিঁধাইবার পরোয়ানা দেখাইয়া—'কিন্তু' আর 'এবং' লইয়া যে রসিকতা করিলেন,—সেটা পণ্ডিত মহাশয়ের ঘণ্টায় কলিকাতার স্কুলের ছেলেদের মুখেই বেশ মানায়। এই "কিন্তু" লইয়া চতুর্থ সভাসদ্ ভয় দেখাইলেন—"দেখো—এর মধ্যে যদি 'কিন্তু' ঢোকাও তো চেঁচাবো!"—তাড়ীখানার একটা কাজ ফাঁক পড়িতেছিল! পাঠকেরা আশ্বস্ত হউন, ঐতিহাসিক নাটকের কবি—মোগলদরবারের সভ্যতা-ভব্যতার সুপটু চিত্রকর—কোন ত্রুটী রাখিয়া যাইবেন না। সকাল বেলা ভদ্র লোকের বাড়ীতে কতকগুলা ভদ্রলোককে (তাই-বলি, নইলে কি বলিব?) দিয়া তিনি চীৎকারও করাইতে পারেন—যদি আপনারা একটা "কিন্তু" ঢুকাইয়া দিতে পারেন। দৃশ্যটা আগাগোড়া এইরূপ। শেষে রাজী-রগবতের উপর একটা "শকার-বকার" হইয়া মধুরেণ সমাপয়েৎ হইল। যথা—

"আসফ কি কর্ব্বেন ঠিক কর্লেন? কাণ বিঁধোবেন না বিদ্রোহ কর্ব্বেন?"

১ম সভা। তুমি ঠাট্টা কর্চ্ছ—সম্রাটের মন্ত্রী হয়ে একেবারে—

৩য় সভা। হাঁ মন্ত্রী হয়েছো, তাও সম্রাটের শালাত্বের জোরে। আমিও যদি সম্রাটের শালা হতাম।

আসফ। হতে কতক্ষণ।—এই কথার পরই দৃশ্যটি শেষ হইয়াছে। এমন করিয়া নটেগাছটিও মুড়ায় না! কথার আকাঙ্ক্ষা থাকিতে পর্দ্দা চাপা দেওয়া নাটককারের কিরূপ কৌশল তাহা বুঝিলাম না।

আমরা পাঠকদিগকে জিজ্ঞাসা করি—বলুন দেখি, এ দৃশ্যটায় কেবল ঐ লাথীর গান গাহিবার লোভে—কবির ভাষাতেই বলি—দ্বিজেন্দ্রবাবুর হঠাৎ ঐ গানটা 'পেয়েছিল'—তাই এ দৃশ্যটা লেখা হইয়াছিল, নতুবা নাটকের হিসাবে ইহার কোন প্রয়োজন আছে কি? সংস্কৃত নাটকের বিষ্কম্ভকে পারিপার্শ্বিকেরা যে কার্য্য করে, কবি দ্বিজেন্দ্রলাল এখানে সেই ভাবে জাহাঁগীরের সৈরেণ্য, খামখেয়ালী বা মাতলামোর হুকুমগুলা ও বন্দররাজের ন্যায় পশুর প্রতি দণ্ড না দিয়া সম্মান সূচক উপাধি দান—ইত্যাদি ব্যাপার বর্ণনা করিতে গিয়া, ন্যায়, নীতি, শীলতা, সম্ভ্রম রক্ষা প্রভৃতি কিছু মানেন নাই—কলমের মুখে তাঁহারই আদর্শ বাদ্‌শাহ জাহাঁগীরের "যা ইচ্ছে তাই হুকুমের" মত তিনিও "যা ইচ্ছে তাই"—লিখিয়া গিয়াছেন।

তাহার পর দ্বিতীয় দৃশ্য—নূরজাহানের কক্ষ—আর সময়টা রাত্রি!—

নূরজাহান একা সে কক্ষে দাঁড়াইয়া স্বগত বাক্যে ( থুড়ি—এ নাটকে স্বগত বাক্য নাই,—আছে যথেষ্ট, তবে কবির ইচ্ছা নহে যে, সেগুলিকে সেই চিরপরিচিত উচ্ছিষ্ট বাক্যদ্বারা অভিহিত করা হয়, অতএব থুড়ি—আত্মবাক্যে) বলিলেন "এও একটা নেশা! ক্ষমতার প্রায় শিখরে উঠেছি, তবু আরও উঠ্‌তে চাই। কিন্তু নূরজাহান! সাবধান! * * * আমার কন্যা—যার জন্য এত মন্ত্রণা, এত চক্রান্ত,—সেও আমার বিরোধী! আর কার জন্য দ্বিধা কর্ব্বো?"—ইত্যাদি,—দ্বিজেন্দ্রবাবুর জটিলতাময়ী নূরজাহান যে মুহূর্ত্তে এই কথাটা এত স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিল, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার সঙ্কল্পিত নাটক শেষ হইয়া গেল! আর অগ্রসর হইবার এক পদমাত্র ভূমিও বাকী নাই। ইহার পর ইতিহাস অগ্রসর হইতে পারে, কিন্তু নাটক আর পারে না; "দলনী কি করিল"—বলিয়া বঙ্কিমবাবু দলনীর ভুলের পর তাহার কার্য্য আর ইতিহাস যে কৌশলে জুড়িয়া সেই ঘটনাটিকে নাটকত্ব দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন,—দ্বিজেন্দ্রবাবু নাটক লিখিতে বসিয়া নিজে ইচ্ছা করিয়া সেটুকু এখানে নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। আমরা এই খানেই 'যবনিকা পতনের' ব্যবস্থা করিতে বলি, কিন্তু ইহার পরও যখন দ্বিজেন্দ্র বাবু এই অঙ্কের আরও কয়টা দৃশ্য এবং আরও একটা অঙ্ক লিখিয়াছেন, তখন আমাদিগকে তাঁহার নূরজাহানের মতই বলিতে হইতেছে—"আর আমাদেরও সাধ্য নাই যে আমাদিগকে ফিরাই।"

ইহার পর সম্রাট্ ও উজীর সেই খানে আসিলেন। মহব্বত খাঁকে বাঙ্গালার সুবেদারী হইতে পাঞ্জাবে বদলী করিবার স্বপক্ষে বিপক্ষে যে সকল কারণ লইয়া সম্রাট, রাজ্ঞী ও উজীরে পরামর্শ হইল, তাহা হয় Leave and Appointment Departmentএর অধিকার ভুক্ত আর না হয় এটর্ণীর "Business"—নাটক কোন মতেই নহে; কারণ নাটকের নায়ক যিনি অর্থাৎ জাহাঁগীর—তিনিই এখানে বিদ্রোহী—তিনি আর এ নাটকে অভিনয় করিতে প্রস্তুত নহেন, স্পষ্ট বলিয়া দিলেন,—"তোমার রাজ্য তুমি শাসন কর প্রিয়ে। এখন নিয়ে এস আমার সাম্রাজ্য—সুরা, সৌন্দর্য্য, সঙ্গীত।" কাজেই নর্ত্তকীরা আসিল—শুধু আসিল না! কবি বলিতেছেন—কক্ষের একটা অন্তরাল হঠাৎ খুলিয়া গেল ও এক অপূর্ব্ব উজ্জ্বল ভূষণে ভূষিত নর্ত্তকীবৃন্দ একটা আলোকের উচ্ছ্বাসের মত সম্রাটের দৃষ্টিপথে উদিত হইল।"—নাটককার এখানে একটা "Stage effect"



দিবার জন্য রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষকে এইরূপ দৃশ্য যোজনার ইঙ্গিত করিয়াছেন!—আসলে কিন্তু ব্যাপারটা "কর্ম্মকারের কুম্ভকার-বৃত্তির" মত অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে! দৃশ্যটি নূরজাহানের কক্ষ—সে কক্ষে সম্রাট ও উজীর আসিয়া মহব্বত খাঁর মত অসীম ক্ষমতাশালী সেনাধ্যক্ষের বিদ্রোহদমনের অতি গোপন পরামর্শ করিতে পারে—অতএব সে ঘরে পর্দ্দার আড়ালে নর্ত্তকীদল দাঁড়াইয়া থাকে—এরূপ সংযোগ অদ্ভুত কল্পনা বটে! তার পর "অন্তরাল হঠাৎ খুলিয়া গেল"—কেন?—নূরজাহান বাদশাহের ইচ্ছামাত্র বাঁদীকে ডাকিয়া এ সম্বন্ধে "সঙ্কেত করিলেন, সে চলিয়া গেল। পরক্ষণেই হঠাৎ"—ইত্যাদি। তাই কি? তা'যদি হয়, তবে এ দৃশ্য এরূপে সাজাইলে নাটকের বর্ণনীয় বিষয়াচিত দৃশ্যের সঙ্গে বেশ মিল খায় না। যে বিষয় মন্ত্রণাগৃহের, তাহা বেগমের বিলাস-কক্ষে কেন?

তাহার পর নর্ত্তকীরা গাহিল। গানটিতে "গম্ভীর গরজন বাজে মৃদঙ্গে, শিঞ্জিনী ঝিনিরিনি উছলে রঙ্গে, বিবিধভঙ্গে—হাস্যে, লাস্যে, বিভ্রম রঙ্গে নাচিছে নটনারী"—কবি এই ব্যবস্থা করিয়া অনুরোধ করিতেছেন "উঠ তবে সঙ্গীত তালেতালে, ছাও গগন সে ঘন শরজালে;"—তাতে হবে কি?—না,—"ছিঁড়িয়া বন্ধনে, ফাটিবে ক্রন্দনে, ক্রমে সে যাবে মিশি আকাশ অঙ্গে, শোক বিনীরব তান-তরঙ্গে,"—কেন? হঠাৎ সঙ্গীতকে এমন করিয়া ক্রন্দনে ফাটিয়া পড়িয়া আকাশে মিলাইয়া যাইবার অনুরোধ কেন?—যদি শোকই আবশ্যক তবে আবার "তান-তরঙ্গে" সেই শোককে "বিনীরব" করিবার প্রয়োজন?—আমরাত এ গানটার ভাব ঠিক বুঝিলাম না,—যাঁহার জন্য গাওয়া হইল, সেই জাহাঁগীর শুনিয়া বলিলেন,—"কি মধুর এই সঙ্গীত, নূরজাহান! সে বাসনা জাগিয়ে তোলে অথচ পূর্ণ করে না—* * * হাউয়ের মত উঠে হাহাকারে চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ে।"—সুতরাং বলিতে হয়, তিনিও বুঝিয়াছেন "কচু"—কারণ হাউই উঠে বটে, ছড়িয়েও পড়ে বটে—কিন্তু সে হাহাকারে ছড়িয়ে পড়ে এ কল্পনা কেবল "একটা নূতন কিছু কর"—ব্যতীত আর কিছুই নহে। কবির ভাবসাগর এই খানেই ক্ষান্ত হয় নাই। জাহাঁগীর সঙ্গীতের কি গভীর সমঝ্‌দার তা একবার দেখুন। তিনি বলিতেছেন,—"সঙ্গীত—যার পান একটা পিপাসা—উল্লাস যেন একটা আক্ষেপ, হাস্য যেন একটা হাহাকার, আলিঙ্গন যেন এক খানা ছোরা;—অমৃত যেন সে গরল; স্বর্গ যেন সে নরক!"—গানের পবিত্রতার উপর এতবড়

আক্রমণ, সঙ্গীতের এতবেশী অপমান—আর কেহ কখন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। সঙ্গীতজ্ঞ দ্বিজেন্দ্রবাবু গানকে এতটা নারকীয় পদার্থ বলিয়া বুঝিয়া রাখিয়াছেন কি অপরাধে, তাহা আমাদের এক দিন অন্যত্র বলিয়া দিবেন কি ?

তাঁরপর আর একটি গান,—

"আমরা এমনিই এসে ভেসে যাই,—
আলোর মতন, হাসির মতন কুসুমগন্ধরাশির মতন।
হাওয়ার মতন, নেশার মতন, ঢেউয়ের মতন ভেসে যাই।

গিরীশবাবুর "বুদ্ধদেব-চরিতে" দেববালারা গাহিয়াছিল, "আমরা কোথা হ'তে আসি, কোথা ভেসে যাই"—আর এই সৌন্দর্য্যবালার কিন্তু "স্বপ্নরাজ্য হতে এসে, ভেসে, স্বপ্নরাজ্যদেশে" যায়। বেশ ভাল কথা; কিন্তু তাহাতে নাটকের কোন কাজটার সুবিধা হইল বুঝিলাম না। গিরীশবাবুর দেববালারা বুদ্ধের বৈরস্য সঞ্চারে সাহায্য করিয়াছিলেন, আর এই সৌন্দর্য্য-বালারা নাট্যশালার অধ্যক্ষের অর্থ সঞ্চয়ে সাহায্য কয়া ব্যতীত আর যে কিছু করিয়াছে, তাহা দেখিতে পাইলাম না। তবে গানটিতে বেশ কবিত্ব ও ভাবের মধুরত্ব আছে।

তারপর আবার Stage effectএর জন্য Stage Managerকে ইঙ্গিত আছে,—"হঠাৎ কক্ষ অতি মৃদু অন্ধকারে ছাইয়া আসিল ও নর্ত্তকীরা নিমেষে অদৃশ্য হইল। নেপথ্যে অতি মৃদুস্বরে বাদ্য বাজিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সে বাদ্য থামিল।"

ইহা হইবে কিরূপে ? বাদশাহী মজলিসে মোমবাতী বা সুবাসিত তৈলের দ্বারা ঝাড়লণ্ঠন জ্বালিয়া আলোকের ব্যবস্থা করিতে হইত। সে আলোকমালার দম কমাইবার মত কোন ব্যবস্থা ছিল না। মিনার্ভা থিয়েটারে বৈদ্যুতিক আলো আছে বোতাম টিপিয়া দিলেই ষ্টেজে মৃদু অন্ধকার ছড়াইয়া পড়িতে পারে; কিন্তু আগরার দুর্গে বেগম মহলে সেকালে তেমন কোন ব্যবস্থা ছিল না বলিয়াই আমাদের জানা আছে।

ইহার পর "সেই নিস্তব্ধ মৃদু অন্ধকারে জাহাঙ্গীর ডাকিলেন,—"নূরজাহান।

নূরজাহান। জাঁহাপনা।

জাহাঙ্গীর। তুমি দেবী না মানবী ?

নূরজাহান। আমি পিশাচী।



এই প্রশ্নোত্তরের পরেই দৃশ্য শেষ! সৌন্দর্য্য-সঙ্গীতের উপাসনা করিতে করিতে হঠাৎ বাদশাহের এ তত্ত্বকথার মীমাংসার বাসনা জাগিল কিসে বুঝা গেল না ? নূরজাহানের এই স্পষ্ট কবুল জবাবের পর বাদশাহের কর্ত্তব্য কিছু ছিল না কি ?

তারপর মহব্বত খাঁর একটা সামান্য আত্মগ্লানি—"বিধর্ম্মী হয়েছিলাম প্রথম যৌবনের উচ্চাশায়, উন্মাদনায়, প্রভুত্বের, রাজসম্মানের লোভে। * * * দেশ ধর্ম্ম ছেড়ে, স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করে, কেন্দ্রচ্যুত হয়ে উদ্‌ভ্রান্ত ধূমকেতুর মত ছুটেছি কোথায় ?" এইটুকু শুনাইবার জন্য একটা অতি ক্ষুদ্র দৃশ্য, দৃশ্যটায় মহব্বত খাঁর পাঞ্জাবে বদলীর খবর আসিয়াছে—মহব্বত শেষে ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন—"নূরজাহান। * * * নিজের হাতে নিজের কবর তৈয়ার কর্চ্ছ,—তোমার বিনাশ বহুদূর নয় ?"

চতুর্থ দৃশ্য—লাহোর প্রাসাদ,—কাল প্রভাত। নূরজাহান একাকী বসিয়া বলিতেছেন,—আমার জীবন একটা গাড়ীর শূন্য গহ্বর, * * * আমি ছুটেছি যেন নিজে থেকে নিজে পালাবার জন্য।"—এই তিন কথার একটা সত্য নহে—তাহা মিথ্যা কথা। জীবনটা শূন্য মনে হইলে,—তাহার সংসারে, রাজ্যে, রাজনীতি চর্চ্চায়,—বিশেষতঃ অতবড় একটা স্বার্থের তাড়নায় (শাহরিয়ার ও লয়লার জন্য সিংহাসন অধিকার উদ্দেশ্যে) এত ফন্দী, ফিকির করা চলে কি ? বর্ত্তমানটা বিরাট-নৈরাশ্য হইলে এই দৃশ্যে মহব্বতের সাক্ষাৎ প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করা চলে কি ? নিজে থেকে নিজে পালাবার জন্য ছুটিলে—এই দৃশ্যে জাহাঙ্গীরের কথার উত্তরে "আমার প্রতি সম্রাটের বিশ্বাস না থাকে, রাজ্যের রশ্মী সম্রাট নিজের হাতে ফিরে নিন"—এই এতবড় অভিমানটা, এতটা অভিনয় করিতে পারা যায় কি ? না, জাঁহাপনার বিরক্তি ঘুচাইবার জন্য এই দৃশ্যেই কিয়ৎকাল স্তম্ভিত থাকিয়া পরক্ষণেই একবারে ন্যাকা সাজিয়া—"কি হয়েছে নাথ ?" বলিয়া ল্যাজে খেলিবার উদ্যোগ করা চলে কি ?

এই কয় দৃশ্যে নূরজাহান যে ভাবে চলিতেছে, তাহাতে নিজের সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত না হইলেও কথায় বার্ত্তায় কবির উদ্দেশ্যমত ফুটিতেছে না। তিনি যাহা ফুটাইতে চাহেন, ভাষার দোষ, স্বগত বাক্যগুলির মধ্যে অসংলগ্নতা দোষ, তাহা অন্যরূপে ফুটাইয়া তুলিতেছে। কবি নিজের সঙ্কল্পের উপযুক্ত ভাষা দিয়া নূরজাহানকে গড়িতে পারিতেছেন না।

জাহাঙ্গীর এই কয় দৃশ্যে বেশ হইয়াছে। গুণে ও রূপে মুগ্ধ হইয়া সমস্ত বিবেক বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা সত্ত্বেও ঘটনাচক্রে কেমন করিয়া লোককে তাহার অনিচ্ছাসত্ত্বে বিপরীত পথে চালিত করে—জাহাঁগীর এই দৃশ্যে তাহা বেশ দেখাইয়া যাইতেছেন, তবে একটা কথা বলিবার আছে। জাহাঁগীর জ্ঞানের যে তীব্রতার সঙ্গে হে যাদুকরী, হে কালভুজঙ্গী, পিশাচী, ইত্যাদি সম্বোধন করিয়া রাজ্যের বিশৃঙ্খলার জন্য আপনাকে কিছুমাত্র দায়ী করিতে প্রস্তুত নহেন,—নূরজাহানের ঘাড়েই সমস্ত কারণ চাপাইতে সর্ব্বদা চেষ্টিত—সে ভাবটা বেশ খাপে নাই, খাপে নাই তাহা আর কোন কারণে নহে—ঐ বাক্যবিন্যাসের দোষে। এরূপ গড়িতে হইলে, তাহার ভাষা অন্যরূপ হওয়া উচিত ছিল।

পঞ্চম দৃশ্যে—উদয়পুরে রাণার প্রাসাদ—কাল মধ্যাহ্ন। রাণা কর্ণসিংহ ও কুমার শাহজাহান উপস্থিত।

এই দৃশ্যে রাণা, শাহজাহান, বিজয়সিংহ, মহব্বত সমস্ত চরিত্রগুলি সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে কেবল রাণা কর্ণের মুখে শেষ সমাজরীতির সমালোচনাটা রাণার মত রক্ষণশীল রাজার মুখে শোভা পায় নাই।

ষষ্ঠ দৃশ্যে নূরজাহানের আদেশ মত মহব্বতের সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ চলিতেছে। এই যুদ্ধ দৃশ্যটা আর কিছুই নহে, কেবল সেই stage effectএর খাতিরে একটা সেতু ভঙ্গের ব্যাপার, আর তাহার নিম্নে মজ্জমান সৈন্যগণের সন্তরণ দেখাইবার জন্য রচিত মাত্র। এসম্বন্ধে বিশেষ বলিবার কিছু নাই।

তার পরের দৃশ্যে সম্রাট মহব্বতের হস্তে বন্দী হইলেন। মহব্বত এই দৃশ্যে বেশ হইয়াছে। জাহাঁগীরও বেশ হইয়াছে, তবে শেষকালে জাহাঁগীরের প্রতি মহব্বতের উপদেশ বাক্যটা সম্রাটের পক্ষে বড় অসম্ভ্রমসূচক হইয়াছে।

সপ্তম দৃশ্যে লয়লা ও শাহরিয়ারের কথোপকথনটি বেশ। লয়লার দাম্ভিকতার মধ্যে নিরীহ রুগ্ন, নির্ব্বোধ স্বামীর উপর একটা সদয় ভালবাসা বেশ ফুটিয়াছে—কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে স্বামী সম্বন্ধে মৃদুশ্লেষ, চাপা ঘৃণাটুকু না ফুটিলে আরও চমৎকার হইত।শাহারিয়ারের দুর্ব্বল আত্মাভিমানটুকু হাস্যকর হইলেও বেশ সহানুভূতির উদ্রেক করে।

অষ্টম দৃশ্যে মহব্বত সম্রাটের দ্বারা নূরজাহানের প্রাণদণ্ডের আদেশ স্বাক্ষর করাইয়া লইলেন। নূরজাহানের গর্ব্ব খর্ব্ব বেশ কৌশলে সম্পন্ন হইয়াছে কিন্তু তাঁহাকে বাঁচাইবার কৌশলটা ভাল হয় নাই।



নূরজাহানের মরিতে অনিচ্ছার যে যে কারণ দেখান হইয়াছে, তাহা একবারে "ছেলে মানুষা" হইয়াছে। সম্রাটের প্রার্থনায় মহব্বত মহত্ত্ব প্রদর্শন করিয়া নূরজাহানকে মুক্তি দিলেন, আর তাহা দেওয়াই উচিত ছিল, তাহাই হইল। তবে মহব্বতও যে জাহাঁগীরের ন্যায় নূরজাহানের অশ্রুজলে গলিয়া গিয়া তাহাকে মুক্তি দিলেন, এ ভাবটা ভাল লাগিল না। মহব্বতের শেষ কয়টি কথা!

"তাই হোক সম্রাট। সম্রাজ্ঞী আপনি মুক্ত! সম্রাজ্ঞী নূরজাহান! আপনার অমানুষী মনীষা, অসাধারণ রূপ, বিশ্ববিজয়িনী শক্তি যা এতদিনে সাধন কর্ত্তে পারে নি, আজ একমুহূর্ত্তে আপনার অশ্রুজল তাই সাধন কর্লে।" ইহার মধ্যে রূপের কথাটুকু না থাকিলেই ভাল হইত।

উহার উল্লেখ সম্রাটের সম্মুখে ধৃষ্টতা নিশ্চয়? কেহ কেহ বলিবেন,—চক্ষুজল মহব্বতকে গলাইয়াছে—এ ভাব কবির নহে। কবি বলিতে চাহেন, নূরজাহানের চক্ষুর জলে সম্রাট মহব্বতের কাছে তাহার প্রাণ "ভিক্ষা" করিয়া লইয়াই বাঁচাইলেন এবং সেই চক্ষুর জলের প্রভাবেই দিল্লীর বাদশাহের একটা হুকুম ফিরিয়া গেল। এ ব্যাখ্যা কিন্তু ঠিক নহে কারণ সম্রাট নিজে তখন বন্দী আর মহব্বতের কবলগত, তাঁহার এইরূপ ভিক্ষা বা অনুরোধ করিতে তিনি বাধ্য। *

তারপর পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য—কাবুলের নিকট প্রাসাদে প্রাতঃকালে জাহাঁগীর ও নূরজাহান দাঁড়াইয়া আছেন। এখানে উভয়ে আপনাদের বন্দিদশার আলোচনা করিতেছেন। নূরজাহান—ইহা কাটাইবার জন্য ছটফট করিতেছেন পথ পাইতেছেন না। শুধু দুটা হা হুতাশ ব্যতীত এ দৃশ্যটায় কিছু নাই।

দ্বিতীয় দৃশ্যে কাবুলের রাস্তায় সন্ধ্যাকালে মহব্বত দাঁড়াইয়া ভাবিতেছেন

---

* শুনা যাইতেছে, কেহ কেহ গতবারে এই নাটক সমালোচনা দেখিয়া বলিয়াছেন,—সমালোচক গোড়ায় নিন্দার সুরে সমালোচনা ধরিয়া এখন প্রশংসার সুরে শেষ করিতেছেন। তাঁহার গালি দিবার ক্ষমতা আর নাই। আমরা বলি, "সমালোচকের গালি দিবার ক্ষমতা কোনদিনই নাই বা তাঁহার সে সঙ্কল্পও নহে। দৃশ্যের পর দৃশ্য বিচার করিয়া তিনি যেখানে যেমন দোষ গুণ পাইতেছেন—তাহাই লিখিয়া যাইতেছেন তবে তাঁহার যুক্তিতর্ক সকলে গ্রহণ করিতে না পারেন। "মানসী" সম্পাদক।

( অবশ্য স্বগত নহে, চেঁচাইয়া )—"শেষে একটা সাম্রাজ্যের ভার আমার হাতে এসে পড়লো—এত আমি চাই নাই।"—এমন সময়ে বেগমের বশীভূত কাবুলীরা দস্যুতার ভাণে তাঁহাকে হত্যার চেষ্টা করিল—বিজয় সিংহের প্রবেশ, যুদ্ধ ও মৃত্যু—মহব্বতের উদ্ধার হইল। মহব্বতের ভুল হইল, এই অপরাধে নির্দ্দোষ নগরবাসী কাবুলীদের হত্যার আদেশ দিলেন।

তারপর তৃতীয় দৃশ্য—সম্রাট শিবির, রাত্রিতে নূরজাহান একাকিনী ভাবিতেছেন—দুনিয়ার ঘটনার উত্থানপতনের লীলা—আর তার সঙ্গে—মানবের অদৃষ্টের বিজড়িত ভাব লইয়া তিনি বিভোর—এমন সময়ে সম্রাট আসিলেন—নগরের কোলাহলের কারণ অবগত হইলেন। সে হত্যাকার্য্যের মূলকারণ নূরজাহান বলিয়াদিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মহব্বতের গ্লানি করিলেন, সম্রাট জীবনদাতার প্রতি এ ব্যবহারের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—"তোমার মরাই শ্রেয়ঃ ছিল। উত্তরে নূরজাহান বলিলেন—"তাহলে সম্রাটের অনুতাপ হয়েছে?" এমন সময় মহব্বত খাঁ আসিলেন, কাবুলীরা আসিলেন—নগরবাসীর হত্যা নিবারণের প্রার্থনা করিলেন—মহব্বত কঠিন ভাবে দৃঢ় রহিলেন—কাবুলী রমনীরা আসিয়া স্ব স্ব প্রাণ বিনিময়ে সন্তান রক্ষা প্রার্থনা করিলেন—মহব্বত বিনা অনুরোধে সম্রাটের নামে আদেশ প্রচার করিয়া হত্যা রহিত করিলেন! মহব্বতের মহত্ব আরও উজ্জ্বল হইল। তারপর বাদশাহ বেগমকে লইয়া মহব্বত তাঁবু ভাঙ্গিয়া আজমীরে যাইতে চাহিলে বাদশাহ বলিলেন—"মহব্বত, এই পিস্তল লও, আমায় বধ কর—এ অসহ্য!" তার পর নূরজাহান শ্লেষ বাক্যে মহব্বতকে বিদ্ধ করিলেন,—মহব্বত তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না,—মহব্বতের এই ধীর স্থির গম্ভীর অবিচলিত ভাব বড় সুন্দর, বড় কৌশলময়,—বড় তৃপ্তিপ্রদ হইয়াছে। তারপর জাহাঁগীর বলিলেন, "তবু যতদিন তোমার ন্যায়ের শাসন ছিল,—মহব্বত খাঁ আমি কথাটি কহি নাই। তুমি আমার শাসন, অন্যায় শাসন বলে, আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিলে, তথাপি—* * আমি এ রকম অন্যায় কখন করি নাই! আমি একের অপরাধে অন্যের হত্যার আদেশ দিই নাই। আমি ন্যায় বিচারে আমার প্রিয়তমা সম্রাজ্ঞীর মৃত্যুদণ্ড দস্তখৎ করে পরে তোমার কাছে আমি, সম্রাট আমি, করজোড়ে তার প্রাণ ভিক্ষা করেছি। আর এই তোমার ন্যায় বিচার! না মহব্বত আমায় বধ কর। তারপর মহব্বত—যে কয়টি কথা



বলিয়া সম্রাটকে রাজ্য ফিরাইয়া দিলেন,—তাহা তেমন সুসঙ্গত মনোমত শব্দমালায় গ্রথিত না হইলেও তাঁহার কার্য্যটি বড় মহত্ব প্রকাশক হইল। সম্রাট নিজে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাতে প্রশংসা করিলেন! মহব্বতের মহত্ব এই দৃশ্যে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর ও মধুর হইয়া ফুটিয়াছে।

তার পর চতুর্থ দৃশ্য আগরায় আসকের বাড়ীর প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া উদয়পুরের রাণা কর্ণসিংহ কথা কহিতেছেন—তখন রাত্রিকাল। কবিরা নিরঙ্কুশ—তাই এমন অসাধারণ সংযোগ করিলেও তাঁহাদের সাত খুন মাপ। কথোপকথন চলিতেছে—সম্রাটের কঠিন পীড়া,—কুমার বঙ্গদেশে মারা গিয়াছেন, নূরজাহান শাহরিয়ারের জন্য সিংহাসন লিখাইয়া লইয়াছেন, মহব্বত খাঁ ফকীরী লইয়া রাজ্য ছাড়িয়া গিয়াছেন ইত্যাদি। এমন সময়ে ফকীর বেশে মহব্বত খাঁ আসিয়া উপস্থিত। দ্বিজেন্দ্রবাবুর কাছে গিরীশ বাবুর মত নাটকের পাত্র পাত্রীর অবাধ গতি, গিরীশ বাবুর ন্যায় তিনিও মনে করেন. যেহেতু এই সকল ব্যক্তি নাটকে অভিনয় করিয়া বেড়াইতেছে, সেইহেতু ইহারা যখন ইচ্ছা যেমন ভাবে যেখানে সেখানে যাইতে আসিতে না পারিলে, নাটক জমিবে কেন? যদি এ জ্ঞান না থাকিত, তাহা হইলে তোমার আমার বাড়ীতে রাতভিখারীর প্রবেশের ন্যায় দিল্লীর বাদ্‌শাহের প্রধান মন্ত্রী আসক খাঁর বাড়ীতে রাত্রিকালে একজন ছদ্মবেশী ফকীর প্রবেশ করিতেছে ইহা সম্ভব হয় কিরূপে? দ্বারে কি রক্ষী ছিল না? তাহারা হয়ত স্ববেশে মহব্বত খাঁকে ছাড়িয়া দিত কিন্তু ছদ্মবেশী, ফকীরবেশী মহব্বত খাঁকে এই রাত্রিতে ছাড়িয়া দিল কিরূপে? মহব্বত খাঁ যদি তাহাদের পরিচয় দিয়াই আসিয়া থাকেন তবে আর এ বেশে আসিবার আবশ্যক কি? তারপর পরামর্শ গুপ্তির আবশ্যকতা কি ছিল না? উঠানে দাঁড়াইয়া পরমুহূর্ত্তে ভারতের ভাগ্যে কি ঘটিবে—তাহা চিন্তা করিতেছেন কে—না—যিনি রাজ্যের কর্ণধার এবং যিনি রাজ্যের একজন প্রধান সামন্ত—আর সেই সময়ে সেখানে বিনা এত্তেলায় একজন ফকীর আসিয়া পঁহুছিল—এ কি বিসদৃশ ব্যাপার? কবিরা এতটা নিরঙ্কুশ হইলে সমালোচকেরা তাঁহাদিগকে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য উচ্ছৃঙ্খল বলিবেন না কেন? তারপর সেই রাত্রিতে উঠানে দাঁড়াইয়া তিন প্রধান রাজপুরুষে বিদ্রোহের পরামর্শ হইল—দুর্ব্বল, পীড়িত, আসন্নমৃত্যু জাহাঁগীরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া শাহজাদা খুরমকে সম্রাট করিবার পরামর্শ স্থির হইল।

হায়, মন্ত্রীর বাড়ীতে কি পরামর্শের জন্য একটা কুঠারী পাওয়া যায় নাই উঠানে দাঁড়াইয়া একার্য্য করিতে হইল! আসফ এইখানে বাড়ীর মধ্যে গেলেন। রাণা কর্ণকে মহব্বত খাঁ একা পাইয়া বলিলেন—"রাণা আপনি আগ্রার সিংহাসনে বসতে চান? * * * ইচ্ছা করলে এই সুযোগে নবহিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপন করতে পারি।" হঠাৎ মহব্বতের এ বিশ্বাসঘাতকতার বুদ্ধি মাথায় কেন এল? দ্বিজেন্দ্র বাবু—তার কৈফিয়ত কোথাও দিলেন না। রাণা এক্ষেত্রে যে উত্তর দিলেন—তাহা রাণা প্রতাপের পৌত্রের মত, রাজপুতের মত, শিশোদীয় কুলের মত হয় নাই—হইয়াছে শান্তিপ্রিয় বাঙ্গালী বৃদ্ধ জমীদারের মত। বাঙ্গালীর মতই তিনি দেখাইয়াছেন,—বলিলেন—"আমি সম্রাট হ'লে সমস্ত হিন্দুর চোখ টাটাবে। আবার দেশে রক্তস্রোত বহিবে। তার চেয়ে পরের শাসনে তারা সুখে আছে।" "তার চেয়ে তারা সুখে আছে"—কার চেয়ে? চোখ টাটানোর চেয়ে—না,—রক্তস্রোত বহাইবার চেয়ে? আমাদের বোধ হয় ইহার কোনটার চেয়েই নহে—স্বজাতীয় ব্যক্তির অধীনতার চেয়ে—ইহাই উদ্দেশ্য—কবিরও বটে—আমাদের বটে; কিন্তু হায়! দ্বিজেন্দ্রবাবুর ভাষা দ্বিজেন্দ্র বাবুকে কি নিষ্ঠুররূপে প্রতারণা করিয়া কি কদর্থই এখানে ঘটাইতেছে! "চোখ টাটাইবার কথায় আমাদের মনে হইতেছে বাঙ্গালী গৃহিনীরা এই 'নজর দোষ' নিবারণের জন্য সুদর্শন শিশুদের নানারূপ রক্ষাবন্ধন করিয়া দিয়া থাকেন,—মহব্বত খাঁও যদি এই নজরদোষভীত রাণার গলায় একটা আমড়ার আঁটি বাঁধিয়া দিতে বা তাঁহার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলীটি দংশন করিয়া মস্তকে নিষ্ঠীবনের ছিটা দিয়া আগরার সিংহাসনে বসাইয়া দিতেন,—তাহা হইলে আর তাঁহার আশঙ্কা থাকিত না।

তারপর কথাটার আর উচ্চবাচ্য হইল না—আসক আসিয়া মহব্বত খাঁকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। দৃশ্য সমাপ্ত হইল। এ দৃশ্যটার প্রয়োজনীয়তা কিছু যে আছে তাহা কাহারও কথায় প্রকাশ পাইল না,—কেবল রাণা কর্ণসিংহের সম্মুখে হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপণের এই সুযোগটা খুলিয়া ধরাটা বেশ সোণার স্বপ্নের মত তৃপ্তিপ্রদ হইয়াছে মাত্র।

তারপর পঞ্চম দৃশ্যে—গোলকুণ্ডার শাহজাদা খুরমের বাসা। রাত্রিকালে খুরম খাদিজার কাছে সম্রাটের মৃত্যু সংবাদ লইয়া উপস্থিত। তিনি পত্র পড়িয়া শুনাইয়া বলিলেন—"সেই দুষ্টা উচ্চাশিনী নারী শেষে পিতাকে হত্যা



করলে।" ইংরাজী ভাষায় বাগভঙ্গী সোজাসুজি বাঙ্গলার হজম করিতে গেলে ভাষার মধ্যে এইরূপ অপচয় জন্মে। এ ভঙ্গীতে বাঙ্গালা ভাষায় বাক্য রচনা করিলে তাহা বাঙ্গালা হয় না। দ্বিজেন্দ্র বাবু যদি ইহা বুঝিতেন, তাহা হইলে "উচ্চাশিনী" শব্দ গড়িতে গিয়া তাঁহাকে ব্যাকরণ চর্ব্বণ করিতে হইত না। উচ্চ আশা যার এই অর্থে হতাশ, নিরাশ, ইত্যাদি পদের ন্যায় বড় জোর 'উচ্চাশ' পদ গড়িতে পারা যায়—তাহাতে ব্যাকরণ বজায় থাকে। তাহার উপর স্ত্রীত্ব প্রয়োগে "উচ্চাশিনী" পদ কল্পনা করা একান্ত বৈদেশিক বলিয়া বোধ হয়—এই পদটি কোন ক্রমেই অন্য সমশ্রেণীর পদাবলীর সহিত খাপ খায় না—উহা 'হতভাগিনীর' সহিত মিলে না,—"দুরাচারিনীর" মত ভাষার বাহিরে পড়িয়া থাকে। কবি যে বাগ্‌ভঙ্গী প্রকাশের জন্য 'উচ্চাশিনী' পদের সৃষ্টি করিয়াছেন—আমাদের ভাষায় সিদ্ধরীতি অনুসারে সেখানে 'দুরাশাবতী' বা 'দুরাশা-শালিনী রমণী' লেখাই কর্ত্তব্য ছিল। তারপর শাহজাদা খুরম খাদিজাকে লইয়া আগ্রা রওনা হইলেন। এইমাত্র ২৫টি পঙ্‌ক্তির কথোপকথনের জন্য এই আর একটা বৃথা দৃশ্য রচনা করিয়া কবি অনর্থক সময় নষ্ট করিয়াছেন,—তবে এই দৃশ্যের মুখবন্ধে খাদিজার গানটা—তা অন্য একস্থানে গাওয়াইয়া দিলেই চলিত এখানেও যে সে গানটায় বিশেষ কোন উপযোগিতা আছে,—তা, দেখা যায় না।

তারপর ষষ্ঠ দৃশ্যে শাহরিয়ায়কে যুদ্ধে উত্তেজিত করার জন্য নুরজাহানের সঙ্গে লয়লার আবার সেই খেউড়ভরা ঝগড়া! আবার লয়লা গর্ভধারিণীকে "মাগী! তুমি এই রোগা পটকা ছোঁড়াটাকে ধরে মহব্বত খাঁর বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে চাও"—তোমার কুমন্ত্রণায় তোমার পক্ষে তোমার সহোদর ভাই পর্য্যন্ত নয়"—ইত্যাদি কথাগুলি আভিধানিক ভাষায় অনুবাদ করিয়া শুনাইতেছেন! মায়ের নাম ধরিয়া মায়ের মুখের উপর উদ্ধতবালিকা যথেচ্ছ কর্কশ শব্দ শুনাইয়া স্বামীকে শাসাইয়া চলিয়া গেলেন। নূরজাহান একটু চিন্তা করিয়া স্বীয় পতন নিশ্চিত জানিয়াও ধ্বংসের দিকে ছুটিয়া চলিলেন—দুরাশা—ক্ষীণাশা হইলেও নূরজাহান তাহারই পশ্চাতে ছুটিলেন। কবি তাঁহাকে বুদ্ধিমতীর মত বলাইয়াছেন,—"নিয়তির অদৃশ্য তর্জ্জনী অদূরে লক্ষ্য করে। আমায় যেন ডেকে বলছে—ঐখানে তোমার সর্ব্বনাশ; তবু তোমায় ঐখানে যেতে হবে।" এইত ব্যাপার—যদি নূরজাহান এতটা নিয়তি-পরিচালিতা পুত্তলিকার মত ক্রীড়াশালিনী হন তাহলে কবির যে

উদ্দেশ্য জটীল চরিত্রের সুন্দর ছবি নূরজাহানে ফুটাইবেন—তাহা তো আর সিদ্ধ হয় না। নূরজাহানের এই ভাব জাগিয়াছে লয়লার সঙ্গে প্রথম কলহের পর হইতে। তখন অবধি আমরা তাঁহার কথাবার্ত্তায় চিন্তায় এই নিয়তির দাসীপনার কথা শুনিয়া আসিতেছি, কাজেই বলিতে হয়,—তখন হইতে কবির সঙ্কল্পিত ছবির নূরজাহান মারা গিয়াছে।

তারপর সপ্তম দৃশ্য—উদয়পুরে—মহব্বত খাঁ কর্ণসিংহ প্রভৃতি আগ্রা জয় করিয়া সম্রাট শাহজাহাঁনকে গোলকুণ্ডা হইতে অভ্যর্থনা করিয়া লইতে আসিয়াছেন, এই দৃশ্যে বন্দররাজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল—সে আর "কেন্নুয়ের মত পাক খেয়ে" দ্বিজেন্দ্রবাবুকে আনন্দিত করিবার জন্য আসফ খাঁর তাড়িখানায় বসিতে পাইল না। রাজাদেশে মহব্বত তাহাকে গুলি করিয়া বধ করিলেন। এ সময় বন্দুক কামান আসিয়াছিল সত্য কিন্তু এ সকল শাস্তি বিধানে বারুদ পিস্তলের গুলির ব্যবহার মোগল দরবারে তখনত হয়ই নাই, তাহার পরেও হয় নাই—এগুলি ইংরাজী নভেলী ঘটনা কবি দ্বিজেন্দ্রের কৃপায় মোগল দরবারে বিস্ফোটকরূপে দেখা দিয়াছে। তারপর রাণা কর্ণসিংহের সঙ্গে "পাগড়ী বদল" করিয়া ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিয়া সম্রাট আগরায় ফিরিলেন।

তারপর অষ্টম দৃশ্যে—পাগলিনী নূরজাহান মেঘগর্জ্জনের মধ্যে নিজের চরিত্র নিজে সমালোচনা করিতে করিতে রাজা লীয়ারের মত বকিতেছেন। নূরজাহান এইখানে দয়াবতী হইয়া হতভাগিনী মায়ের ও অন্ধ স্বামীর প্রতি ইংরাজী ভদ্রতার ভাষায় করুণা করিয়া বলিতেছেন,—"তোমাদের আজ যেমন ভালবাসি, তেমন আর কখনও বাসিনি। আমি এখন তোমাদেরই। এস এস মা,—এসো স্বামী আমার। আমার সহবেদনার অশ্রুজলে নিত্য তোমাদের দুঃখের ক্ষত ধুইয়ে দিই। এখানেই মেয়ের কাজ। এখানেই নারীর সাম্রাজ্য।" এই কথার পর নাটক শেষ হইল।

উপসংহারে আমাদের বলিবার বেশী কিছু নাই। নাটকের সঙ্কল্প হইতে দ্বিজেন্দ্র বাবু যেখানে যাহা কিছু বিশেষভাবে করিতে চাহিয়াছেন—ভাষার দোষে, ভাবের দোষে সেইখানেই দোষ ঘটিয়া গিয়াছে। সঙ্কল্প উচ্চ হইলে তাহার সিদ্ধির জন্য তীব্র সাধনাও আবশ্যক। কবি দ্বিজেন্দ্রলালের তাহাতে যথেষ্ট অভাব দেখা গেল। তিনি সুকবি, সুন্দর ভাবুক, কিন্তু নাটক লিখিবার জন্য কেবল ঐ দুইটি শক্তিই পর্য্যাপ্ত নহে। নাটককারকে সকলদিকে সমান



দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হয়,—তিনি তাহা পারেন নাই। তিনি মানসিক বৃত্তির জটিলতা, সরলতা, বোকামী, ঔদ্ধত্য, মহানুভবতা ইত্যাদি দেখাইতে গিয়া দেশ কাল পাত্রের প্রতি মোটেই দৃষ্টি রাখেন তাই তাঁহার পাত্র পাত্রীগুলি সমস্তই সামান্য নগরবাসী গৃহস্থের অবস্থার লোক হইয়াছে,—বাদ্‌শাহ জাহাঁগীর হইতে সৈনিক বা দূতটা পর্য্যন্ত কেহই মোগল দরবারের ঘনিষ্ট লোককে আদর্শ করিতে পারে নাই। রসিকতাগুলি তাড়িখানার ইয়ারকী হইয়া গিয়াছে। তিনি ইতিহাসের মধ্যে প্রবেশ করেন নাই। যুদ্ধ, হত্যা, অবরোধ, সন্ধি, রাজ্যারোহণ ইত্যাদি ঘটনাগুলির যথাযথ বর্ণনাই নাটকের ইতিহাস নহে। নাটকের ইতিহাসে ঐ সকলের সঙ্গে সামাজিক ইতিহাস, আচার ব্যবহারের ইতিহাস, ধর্ম্মকর্ম্মের ইতিহাস, তৎসময়ের লোকের উপযুক্ত ধ্যান ধারণা ও চিন্তার ইতিহাস বর্ণিত না হইলে;—নাটক মাটী হইবে। এই নাটকে সর্ব্বাপেক্ষা মাটী হইয়াছেন পাত্র সে সম্বন্ধে বহু কথা বলা গিয়াছে। তার পর মাটী—দেশ,—কোনও দৃশ্যে দ্বিজেন্দ্র বাবু আমীর ওমরাহের বৈঠকখানার, মন্ত্রণা গৃহের দেউড়ীর, অন্তঃপুরের উপযুক্ত ব্যবহার প্রতি, মোগল কেল্লা, মোগল দরবার, মোগল রঙমহাল ও মোগল শিবিরের ব্যবহার প্রতি একটুও মনোযোগ করেন নাই।

দ্বিজেন্দ্র বাবুর নাটকের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কাণে বাজে তাঁহার ভাষা। কবিত্বময়ী সরল ভাষার মধ্যে ভাবের গভীরতা প্রবেশ করাইতে গিয়া তিনি এত ইংরাজী বাক্যকে বাঙ্‌লা শব্দের পোষাক পরাইয়া ভাষায় প্রবেশ করাইয়াছেন যে.—সেগুলির জন্য সে কালের বাইবেলের বাঙলা অনুবাদের ভাষাকেও সহজবোধ্য ও অর্থপ্রকাশক বলিয়া মনে হয়। এইরূপ ইংরাজী ভাবের প্রয়োগ গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায় এত বেশী গাঁথা আছে যে প্রকৃত বাঙ্গালা রীতির বিশুদ্ধ রচনা কোন পৃষ্ঠায় আগাগোড়া দেখিতে পাওয়া যায় না। উদাহরণ স্বরূপ যদিচ্ছাপ্রাপ্ত একটা পৃষ্ঠা (৭ম পৃষ্ঠা) হইতে উদাহরণ দিতেছি। এই পৃষ্ঠায় রেবা ও জাহাঙ্গীরের চারিটী উত্তর প্রত্যুত্তরে প্যারা আছে—তাহার তিনটী প্যারা হইতে উদাহরণ দিতেছি,—

১ম প্যারা—"স্বামী! এখনও সেই কথা এদেশে কোনও পত্নী আদর করিয়া ভক্তি করিয়া মুখের উপর "স্বামী" বলিয়া ডাকে না। ইহা ইংরাজী Dear hushandএর অনুকরণ বলিয়া মনে হয়। ২য় প্যারা—"সেই জীবনের রহস্যময় প্রভাতে আমি তোমার হৃদয়তীর্থের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলাম।"

"জীবনের রহস্যময় প্রভাত" ও "হৃদয়তীর্থের উদ্দেশে যাত্রা করা"—খাঁটি ইংরাজী কথাই রহিয়াছে, বাঙ্গালা হয় নাই। ওয় প্যারা—"এ সাম্রাজ্য একখানি মেঘের প্রাসাদের মত আকাশে বিলীন হয়ে যাবে।"—এই উপমা ইংরাজীই রহিয়াছে, বাঙ্গালা ভাষায় এরূপস্থলে আকাশকুসুম, দিবাস্বপ্ন জলবিম্ব প্রভৃতির উপমাই প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন "ঈশ্বর জানেন তোমার ভালবাসার জন্য নিজের সঙ্গে কত যুদ্ধ করেছি"—"যখন লোল বার্দ্ধক্য তোমার উচ্চ ললাটে এসে বস্‌বে"—"অব্যক্ত কাকুতি যা মানুষের অতীত ভাষায় মুখে এসে ব্যক্ত করে"—"উন্মত্ততার মধ্যে শৃঙ্খলা আছে"—ইত্যাদি শত শত উদাহরণ। সাহিত্যে নাটকে এরূপ ভাবে যিনি বিদেশী ভাষা প্রবেশ করাইয়া ভাষার সৌষ্ঠব সম্পাদন করিতে চাহেন, তাঁহার হস্তে—বলিতে কি,—মাতৃভাষার অপমান হয়।

আমরা আর অধিক কিছু বলিব না। দ্বিজেন্দ্র বাবুর প্রতি আমাদের অশেষ শ্রদ্ধা আছে। তাঁহার ন্যায় উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি বাঙ্গালা লিখিতেছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ আশান্বিত হইয়াছিলাম, কিন্তু "নূরজাহান" কেবল নূরজাহান কেন, তাঁহার আরও দুইচারিখানি নাটক দেখিয়া আমাদের হতাশ হইতে হইয়াছে, বুঝিতে হইতেছে,—বাঙ্গালায় নাটক লিখিয়া যিনি এই শ্রেণীর সাহিত্যকে মাতৃভাষার অলঙ্কার করিবেন তিনি এখনও বহুদূরে।

সমালোচনা উপলক্ষে যদি কোথাও কোন অন্যায় ত্রুটী করিয়া থাকি সেজন্য দ্বিজেন্দ্র বাবুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি—ভুলচুক সকলেরই হওয়া সম্ভব।

সমাপ্ত।

(শ্রীতুষিতকুমার তলাপাত্র)

---



# হেমচন্দ্র-সদনে।

সেদিন বড়াল কবির নবপ্রকাশিত কবিতাপুস্তক 'শঙ্খে' পাঠ করিতেছিলাম :—

"হে কবি, হে পূজ্য কবি, চির-দুঃখিনীর
ভক্তিমান কীর্ত্তিমান কৃতজ্ঞ সন্তান!
অন্ধনেত্র—আজীবন ঢালি' নেত্রনীর—
ক্রীতদাসী জননীর হেরি' অসম্মান!
অক্ষরে অক্ষরে তব হৃদয়-রুধির
কি গৌরবে মহাযজ্ঞে করিছে আহ্বান!
নিরাশা নির্ভীক আজ—বিশ্বাস গভীর,
অন্ধ বর্ত্তমান হেরে ভবিষ্য মহান্!
হে দরিদ্র, একদিন ক্ষোভে শোকে দুখে
আলোড়িলে জীবনের উদ্দেশ্য অতল!
হে জয়ন্ত, তব যশোমুকুট-ময়ূখে
জটিল কর্ত্তব্য আজ সরল উজ্জ্বল!
স্বর্ণ-সিংহাসনে নৃপ দু'দিন জীবনে—
চির প্রতিষ্ঠিত তুমি বঙ্গ হৃদাসনে!

হেমচন্দ্রের উদ্দেশে অক্ষয়কুমারের ভক্তিচন্দনলিপ্ত কবিতাপুষ্পাঞ্জলি দেখিয়া আমার হেমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাতের কথা মনে পড়িয়া গেল। যাঁহার কবিতায় বাঙ্গালীর হৃদয়ে নূতন জাতীয় ভাবের তরুণ অরুণ-বিকাশ প্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল; যিনি জাতীয় দুঃখে হৃদয়শোণিতে কবিতা লিখিয়া জাতীয় কবির আসন অধিকৃত করিয়াছিলেন; আমি একবার মাত্র তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম। তখন তিনি জীবিত; কিন্তু জীবন্মৃত। তখন তিনি অন্ধ—জীবনের মধ্যাহ্নে বিপুল অর্থ উপার্জ্জিত করিয়া সায়াহ্নে অপরের দয়াদত্ত সাহায্যে দারিদ্র্যদাবানল হইতে কোনরূপে আত্মরক্ষা করিতেছেন। *

---

* সাহিত্যানুরাগই যে হেমচন্দ্রের দারিদ্র্যের কারণ তাহা অনেকে জানেন না; 'আর্য্যবর্ত্তে' অধ্যাপক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় সে কথা বুঝাইয়াছেন।

সে আজ দশ বৎসরের কথা। মাঘের মধ্যাহ্নে গৃহে বসিয়া লিখিতেছি এমন সময় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগের সঙ্গে তরুণবয়স্ক নবীন লেখক মন্মথনাথ সেন ছিলেন। বোধ হয় মন্মথনাথ তখনও বিদ্যালয়ের ছাত্র; তাঁহার যে সাহিত্যিক প্রতিভা পূর্ণ বিকাশের পূর্ব্বেই মৃত্যু কর্ত্তৃক উৎপাটিত হইয়াছিল সে প্রতিভা তখন কেবল আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করিতেছে। দীনেশ বাবু আসিয়াই প্রস্তাব করিলেন, ক্ষিদিরপুরে হেমচন্দ্রকে দেখিতে যাইতে হইবে। সকলেই সম্মত হইলাম। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ আমাদের সহযাত্রী হইলেন।

আমরা কয়জন তীর্থযাত্রী অপরাহ্নে ক্ষিদিরপুরে উপনীত হইলাম। স্বচ্ছ-সলিলা দীর্ঘিকার কূলে হেমচন্দ্রের ভবন – বৃহদায়তন; কিন্তু তাহার সংস্কারের অভাব গৃহস্বামীর দারিদ্র্য ঘোষণা করিতেছে। একদিন যে গৃহ আশ্রিত, অনুগত, বন্ধু, প্রার্থী প্রভৃতির কলরবে পূর্ণ থাকিত; সে গৃহ যেন জনহীন। আমরা ডাকিলে একজন যুবক আসিলেন। তিনি আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য জানিয়া যাইয়া সংবাদ দিয়া আসিলেন ও আমাদিগকে কবির কক্ষে লইয়া যাইলেন।

আমরা কবির কক্ষে উপনীত হইলাম। একখানি চেয়ারের খাটিয়ার উপর একটি মলিন শয্যা ছিল; তাহাই কবির শয্যা। তাঁহার বেশও শয্যারই মত মলিন। তিনি আমাদিগের অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়াইয়াছিলেন। আমরা তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি শয্যার উপর উপবেশন করিলেন। তিনি মৃদুস্বরে আমাদিগের নাম ও আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছি শুনিয়া তিনি বলিলেন, "আপনাদের অনুগ্রহ যথেষ্ট।" আমরা বলিলাম, তাঁহাকে দেখা আমরা সৌভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করি। তাঁহার নিকট আমাদের ঋণ প্রচুর। আমরা দেশের কৃতিসন্তানদিগের প্রতিকৃতি সংগ্রহ করিতেছিলাম; তাঁহার প্রতিকৃতি সংগ্রহের ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি বলিলেন, "বড়লোকের মধ্যে আমাকে কেন? আমি কি করিয়াছি?" আমরা বলিলাম, তিনি দেশের এক শ্রেষ্ঠ কবি।

তখন তাঁহার শরীর অসুস্থ। তিনি স্বাস্থ্যের জন্য বেড়াইতে চাহেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "এ অবস্থায় কি করিয়া বেড়াইব? গাড়ী রাখিবার সাধ্য নাই।" দৃষ্টিশক্তির কথায় তিনি বলিলেন, একটি চক্ষু অস্ত্র



করাইয়া নষ্ট হইয়াছে। অপরটিও নাই বলিলেই হয়। কেবল দ্বার বা বাতায়ন মুক্ত থাকিলে আলোক কি অন্ধকার বুঝিতে পারেন। আর একটি কেন অস্ত্র করান না, জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "মরিবার বয়স হইয়াছে। শরীরও ভাল নাই।"

আমরা বলিলাম, "সম্ভবতঃ কিছু পড়িয়া শুনাইলে সময় ভাল কাটে। আমরা দূরে থাকি, নহিলে আসিয়া কিছু পড়িয়া শুনাই। আপনার পুরাতন বন্ধুরা নিকটে আছেন; তাঁহারা বোধ হয়, সর্ব্বদা আসিয়া থাকেন।" কবি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন; বলিলেন, "বন্ধু! আমার কি আর বন্ধু থাকিবার সময়? আর সকলে যে যাহার কায লইয়া ব্যস্ত; কেহত আর আমার মত নিষ্কর্ম্মা নহেন!" তাঁহার দৃষ্টিহীন নয়ন দিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

তাঁহার পরিজনবর্গের কথায় তিনি বলিলেন, "তিন পুত্র বর্ত্তমান। কনিষ্ঠ মৃত। জ্যেষ্ঠের রক্ত বমন হয়। মূর্চ্ছারোগও আছে। কয়দিন আছেন, জানি না। আপনারা জানেন কি না জানি না, আমার স্ত্রী আট দশ বৎসর পাগল।" এই দুর্ভাগ্যের কথা বলিয়া তিনি বলিলেন—"কেন যে বাঁচিয়া আছি, জানি না।" তখনও তাঁহার নয়নে অশ্রু ঝরিতেছিল।

"ভারত সঙ্গীতের" উপরে যে টীকা আছে প্রথমে তাহা ছিল না। আবার গবর্ণমেণ্টের তাড়নায় ঐ টীকা দিয়া কবিতাটির স্বরূপ প্রতিভাত করা হয়। কবিকে সে কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন "কিছুই মনে নাই।"

ইহার পর আমরা বিদায় হইলাম। তাঁহারই কবিতার কয়টি চরণ স্মরণ করিতে করিতে ফিরিলাম ঃ—

"হায় মা ভারতী চিরদিন তোর
কেন এ কুখ্যাতি ভবে;
যে জন সেবিবে ও পদযুগল
সেই সে দরিদ্র হ'বে?"

হেমচন্দ্রকে দর্শনের কথা মনে করিলেই আমার ম্যাক্সমুলারের হায়েন-দর্শন মনে পড়ে। সেও এমনই করুণ—এমনই হৃদয়বিদারক দৃশ্য ঃ—

I never came to know Heine. I knew he was in Paris when I was there in 1846, but he was already in such a state of physical collapse that a friend of mine who knew him well, and saw him from time to time, advised me not to go and

see him. However, one afternoon as I and my friend were sitting on the Boulevard, near the Rue Richelieu, sipping a cup of coffee, "Look there", he said, "there comes Heine !" I jumped up to see, my friend stopped him, and told him who I was. It was a sad sight. He was bent down, and dragged himself slowly along, his spare greyish hair was hanging round his emaciated face, there was no light in his eyes. He lifted one of his paralysed eyelids with his hand and looked at me. For a time, like the blue sky breaking from behind grey October clouds, there passed a friendly expression across his face, as if he thought of days long gone by. Then he moved on, mumbling a line from Goethe, in a deep, broken, and yet clear voice, as if appealing for sympathy ;—"Das Maulthier sucht in Dustern seiren Weg" Thus vanished Heine, the most brilliant, sparkling, witty poet of Germany. I have seen him, that is all I can say, as Saul saw Samuel, and wished he had not seen him. However, we travel far to see the ruins of Pompeii and Herculaneum, of Nineveh and Memphis, and the ruins of a mind such as Heine's are certainly as sad and as grand as the crumbling pillars and ruined temples shrouded under the lava of Vesuvvius.

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

---



# মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী, পৌষ। "ভক্ত ও অবমান" প্রবন্ধে শ্রীবিধু শেখর ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভাল করিয়া বুঝাইয়াছেন ভক্তের নিকট অবমান একটা কষ্টের কারণ নয়। লেখক পুরাণাদি হইতে দু একটি উদাহরণ তুলিয়া আপনার বক্তব্যটিকে খুব স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। তবে এ সম্বন্ধে আলোচনা খুবই পুরাতন। "স্নেহের বন্ধন" শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের গল্পটি মন্দ হয় নাই, আরো ছোট হইলে ভাল হইত। "বাঙ্গালা সাহিত্যের ত্রুটি" প্রবন্ধে লেখক স্বাধীন অনুসন্ধান করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি বলেন "বাঙ্গালা সাহিত্যের অনেক লেখককে সাহিত্য-সেবক না বলিয়া সাহিত্যামোদী বলা সমীচীন।" কথাটি বর্ণে বর্ণে সত্য। "বাঙ্গালা হ্যাসনালিটি" ক্রমশঃ প্রকাশ্য। "দেওয়ালের আড়াল" চারু বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত গল্পটির শেষ অংশ আরো মার্জ্জিত হওয়া উচিত ছিল। "জীবন বৈচিত্র্য"—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের রচনাটি সারগর্ভ। "ভারতবর্ষীয় মুসলমান সমাজে হিন্দুয়ানীর মিশ্রণ" শীর্ষক প্রবন্ধে অনেক কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। "প্রয়াগ বা এলাহাবাদ" উল্লেখযোগ্য। "কখন" লাইট বিরচিত Agnes শীর্ষক কবিতার অনুবাদ, নিতান্ত মন্দ নয়। "ভাগ্যচক্র" চলিতেছে। শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয়ের "প্রাচীনকালে শবব্যবচ্ছেদ" শীর্ষক সংকলন চিত্তাকর্ষক। "গরু ও জরু" শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের কবিতা—মন্দ হয় নাই। "নবীন সন্ন্যাসী" চলিতেছে। "ভারতের খটখটি তাঁত" প্রবন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। "আয়ূর্ব্বেদ—আধুনিক রসায়ন" চিত্তাকর্ষক।

মৃণ্ময়ী, অগ্রহায়ণ। শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের 'গীতগোবিন্দের' অনুবাদ চলিতেছে। "ভাষার একত্ব নির্ণয়" শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধ। বিজয় বাবু ভাষার একত্ব নির্ণয়ে লেখকের যে ভুল ধরিয়াছেন তাহার উত্তর স্বরূপ প্রবন্ধটি লিখিত হইয়াছে। "স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ" জীবনী উল্লেখ যোগ্য। "বঙ্কিম বিভ্রাট" প্রবন্ধের শিরোনামাটি ও ইহার উদ্দেশ্য কিছুই বোধগম্য হইল না। আন্দাজে ঢিল মারিতে উপদেশ দেওয়া সব সময়ে ভাল কি ? "নামব্রহ্ম" ও "বৈষ্ণবতত্ত্বের আভাষ" ক্রমশঃ প্রকাশ্য। "তুমি এবং আমি" কবিতাটি মন্দ নয়। "ভক্ত কি চান" এবারে শেষ হয় নাই। একজন সহস্র কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়া কেবল কোশাকুশি নাড়িলে বা

মালা জপ করিলে সাধারণের তাহার প্রতি যে ভাব হয়, মৃণ্ময়ীর উপরও আমাদের ভাব কতকটা সেই রকমের হইয়া আসিতেছে।

আর্য্যাবর্ত্ত, পৌষ। শ্রীবিপিন বিহারী গুপ্ত মহাশয়ের "পুরাতন প্রসঙ্গ" পড়িতে আগ্রহ হয়। এবার কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। লেখক যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে সহজে ও সুন্দরভাবে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। অধ্যাপক রবার্ট কীটাণুতত্ত্বের নূতন নূতন আবিষ্কারের দ্বারা চিকিৎসা শাস্ত্রকে উচ্চতর ভিত্তিতে স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী অনুসন্ধিৎসু পাঠকের অনেক উপকারে আসিবে সন্দেহ নাই। "মৃত্যুমিলন" চলিতেছে। "য়ুয়ন্ চুয়ং বা হিউয়েন্-সিয়াং" সারগর্ভ; ইহাতে চিন পরিব্রাজক হিউয়েন্ সিয়াংএর জীবনী এবং তাঁহার বর্ণিত ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। "মক্ষিকা" প্রবন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। "কৃতজ্ঞতার বিনিময়" গল্পটিতে কোনো বিশেষত্ব নাই। "বেদ কি ?" প্রবন্ধে বেদ অপৌরুষেয় ও অনিত্য একথা ভাল করিয়া বুঝানো হইয়াছে। "পূর্ব্বস্মৃতি" কবিতাটি মন্দ হয় নাই।

---

# গ্রন্থ-সমালোচনা।

১। বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস, শ্রীদুর্গাচরণ সান্যাল সঙ্কলিত, শ্রীফকিরচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত, ১১।১ নবাব্দী ওস্তাগরের লেন শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বাঙ্গালার যে কয়খানি ইতিহাস আছে তাহাদের মধ্যে সান্যাল মহাশয়ের এই গ্রন্থখানি কখনই নিকৃষ্ট স্থান অধিকার করিতে পারে না। গ্রন্থকার যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া এ পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা সফল হইয়াছে। বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাস লিখিতে গিয়া তিনি যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তাহা যে অনুকরনীয় তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সান্যাল মহাশয় যে সকল নূতন ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিয়া পাঠক সাধারণের সম্মুখে আনিয়া দিয়াছেন তাহার জন্য বাঙ্গালী তাঁহার নিকট চিরঋণী থাকিবে। এ গ্রন্থখানি অনেক ভবিষ্যৎ গ্রন্থের ভিত্তিস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে এমন আশা



করা যায়। স্থানে স্থানে এখানি উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষক। বাঙ্গালার ইতিহাসের অভাব সান্যাল মহাশয় কতটা পূরণ করিয়াছেন, একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে।

মালাবিকাগ্নিমিত্র, শ্রীবিমলাদাস গুপ্তা কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনূদিত, ২০৬ নং কর্ণওয়ালিস ষ্টীট, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত, মূল্য ৸০ বার আনা।

গ্রন্থখানির বহিরবয়ব সুন্দর, ছাপা কাগজও ভাল। যতদূর সাধ্য মূলের প্রকৃত অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। লেখিকার উদ্যম প্রশংসনীয়। গ্রন্থখানি গৃহে গৃহে পঠিত হইবার উপযোগী হইয়াছে।

১। বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব—স্বর্গীয় রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত। শ্রীগিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। মূল্য সাড়ে তিন টাকা। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে নূতন পরিচয় দিবার কিছুই নাই। ন্যায়রত্ন মহাশয় বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস প্রথম রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার উপযুক্ত পুত্র এই পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার যশে গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। এই সংস্করণে অনেকগুলি নূতন পরিচ্ছেদ সংযোজিত হইয়াছে। তাহাতে অনেক জানিবার ও শিখিবার বিষয় আছে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই গ্রন্থের একটি সুদীর্ঘ ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি ও প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় আলোচিত হইয়াছে। গিরীন্দ্র বাবু গ্রন্থকারের জীবনী লিখিয়াছেন। যাঁহারা বঙ্গ ভাষার ক্রমোন্নতি অবগত হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে বিস্তর অজ্ঞাত বিষয় জানিতে পারিবেন। আলোচ্য পুস্তকে অনেকগুলি প্রবীন ও নবীন লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও হাফটোন চিত্র দেওয়া হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষাকে যাঁহারা সমাদর করেন তাহাদের নিকট এই পুস্তকের ও যে প্রচুর সমাদর হইবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

ম্যালেরিয়া, শ্রীশৌরীন্দ্র মোহন গুপ্ত এল, এম, এস প্রণীত, মূল্য এক টাকা মাত্র।

আমরা চিকিৎসক না হইয়াও বলিতে পারি গ্রন্থখানি ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত বাঙ্গালীর ও সেরূপ দুর্দ্দশাপন্ন যদি আর কেহ থাকেন তাঁহাদের পাঠ করা উচিত। গ্রন্থখানি আগাগোড়া সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে যাঁহারা চিকিৎসা

বিদ্যার্থী, তাঁহাদের এ গ্রন্থ উপযোগী হইবে সন্দেহ নাই। যাঁহারা আমাদের মত একটু আধটু চিকিৎসা শাস্ত্রের জ্ঞান রাখিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের পক্ষে এখানি অধিক উপযুক্ত কারণ ইহাতে বিশাল চিকিৎসা শাস্ত্রের তিক্ত আস্বাদ কিছু কম্। এই পুস্তকের বিষয়টা অনায়াসে পাঠকমাত্রেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। বইখানি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। এইরূপে এক একটি বিষয় সকলের উপযুক্ত করিয়া লিখিলে গ্রন্থকার যে দেশের একটা খুব উপকার করিতে পারিবেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

রাজা রামকৃষ্ণ, উপন্যাস, শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত। দুর্গাদাস বাবু বঙ্গসাহিত্যে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক, এই উপন্যাসখানি তাঁহার যশঃ অক্ষুণ্ণ রাখিবে একথা সাহস করিয়া বলিতে পারি। "রাজসিংহে" বঙ্কিম বাবু যে শ্রেণীর ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন ইহা সেই শ্রেণীর উপন্যাস। মহারাজ রামকৃষ্ণের জীবনী এই উপন্যাসের মূল অবলম্বন। পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বিশেষ তৃপ্তি পাইয়াছি, কারণ চন্দ্রনাথ বাবুর ভাষায় এ গ্রন্থের ভিতরে "প্রাণ" আছে। পুস্তকখানিতে তাৎকালিক ইতিহাস, সমাজের অবস্থা প্রভৃতি অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের বর্ণনা আছে। গ্রন্থশেষে মনে হয় পুস্তকখানির নাম "রাজা রামকৃষ্ণ" না রাখিয়া "রাজর্ষি রামকৃষ্ণ" রাখিলে অধিকতর সঙ্গত হইত। এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়। দাম মাত্র ১৲ টাকা, গ্রন্থ হিসাবে অতি কম।

কুসুমকামিনী পুস্তকালয়।
১১ই বৈশাখ সোমবার
১৩০১ সাল স্থাপিত
পুস্তক নং
শ্রীললিতরঞ্জন পণ্ডিত